নবপর্যায় ১

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০১

সম্পাদক

শ্রীপ্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য

বিশ্বভারতী পত্রিকা

নবপর্যায় ১

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০১

বিশ্বভারতী পত্রিকা নবপর্যায় ১ : শ্রাবণ- আশ্বিন ১৪০১

সম্পাদক শ্রীপ্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য ০ সহকারী সম্পাদক শ্রীসুবিমল লাহিড়ী

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

মূল্য কুড়ি টাকা

তৃষ্ণা

শ্রীসোমনাথ হোর - কৃত ব্রোঞ্জমূর্তি

বিশ্বভারতী পত্রিকা

নবপর্যায় ১। শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০১

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাণু অধিকারী (মুখোপাধ্যায়)কে লিখিত

১৪ জুলাই, ১৯১৮

শান্তিনিকেতন

রাণু

মনে করেছিলুম কাল তোমার চিঠি পাব। কালই পাওয়া উচিত ছিল। পোষ্ট্ আপিসে কালই নিশ্চয় এসেছিল, কিন্তু পোষ্টমাষ্টারের অসুখ করেচে বলে পশ্চিমের ডাক কাল আমাদের দেয় নি আজ সকালে দিয়ে গেছে। তোমাদের পথের খবর জানবার জন্যে আমার মন উদ্বিগ্ন হয়ে ছিল। আজ সকালে তোমার চিঠি[১] পেয়েই বুঝেছিলুম কার চিঠি। তখন কি করছিলুম সেই কথাটা আগে বলি। কাল রাত্তির যখন আড়াইটা তখন বৃষ্টি আরম্ভ হচ্ছে— তার পরে বরাবর বৃষ্টি চলচেই— চারদিকের মাঠে জল বয়ে যাচ্চে, আকাশ জলে ঝাপ্‌সা, মেঘের কোথাও বিচ্ছেদ নেই। এমন ঘোর বাদলায় ক্লাস হওয়া অসম্ভব, তাই এই সুযোগে এন্ড্রুজ সাহেব[২] তার খাতা নিয়ে সকালেই আমার কাছে হাজির, তাকে 'ঘরেবাইরে'[৩] তর্জ্জমা করে যাচ্চি সে লিখে নিচ্চে। আমি যে-কোণে বসে লিখে থাকি সে-কোণ আজ অন্ধকার, মাঝে মাঝে বৃষ্টির ছাঁট আস্‌চে, তাই আমার শোবার ঘরের পূবদিকের জান্‌লার কাছে বসে বকে যাচ্চি আর এন্ড্রুজ একটা তাকিয়ার উপরে চড়ে বসে লিখ্‌চে এমন সময় ডাকের চিঠি এল। কাল তোমার চিঠি না পেয়ে ভাবছিলুম আজ সকালে চিঠি পাব না, দুপুরের ডাকে পাব—তাই চিঠিগুলো না দেখেই পাশে ফেলে রেখে কাজ কর্‌তে লাগ্‌লুম—কিন্তু একটু বাদেই মনটা উতলা হল—একবার লেখাটার উপর চোখ বুলিয়ে দেখ্‌তেই তোমার হাতের অক্ষর চোখে ঠেক্‌ল। এন্ড্রুজকে বল্লুম, "একটু রোস, আমার চিঠি পড়ে নিই।" তোমার চিঠিখানি পড়লুম। রেলের পথে তোমার মন যে খারাপ হয়েছিল সেই পড়ে আমার বড় কষ্ট হল। তুমি মনে কোরো না আমি বুঝতে পারিনি। সেই বুধবারের দিন[৪] যখন তোমার গাড়ি চল্‌ছিল, আর আমি যখন চুপটি করে আমার কোণে, এবং সন্ধ্যাবেলায় আমার ছাদে বসে ছিলুম তখন তোমার কষ্ট আমাকে বাজ্‌ছিল। আমি মনে মনে কেবল এই কামনা করছিলুম, যে বাদলের উপরে সূর্য্যের আলো পড়ে যেমন ইন্দ্রধনু তৈরি হয়, তেম্‌নি করে তোমার অশ্রুভরা কোমল হৃদয়ের উপরে স্বর্গের পবিত্র আলো পড়ুক, সৌন্দর্য্যের ছটায় তোমার জীবনের এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্ত পূর্ণ হয়ে উঠুক। যাঁর আশীর্ব্বাদে আমাদের জীবনের সমস্ত সুখ ফুলের মত বিকশিত হয় এবং সমস্ত দুঃখ ফলের মত কল্যাণপূর্ণ হয়ে ওঠে, তাঁরই আশীর্ব্বাদ তোমার জীবনের সকল সুখদুঃখকেই সৌন্দর্য্যে এবং মঙ্গলে সার্থক করে তুলুক্। আমি আমার জীবনকে তাঁরই কাছে উৎসর্গ করেছি —সেই উৎসর্গকে তিনি যে গ্রহণ করেচেন তাই মাঝে মাঝে তিনি আমাকে নানা ইসারায় জানিয়ে দেন— হঠাৎ তুমি তাঁরই দূত হয়ে আমার কাছে এসেচ, তোমার উপরে আমার গভীর স্নেহ তাঁর সেই ইসারা। এই

আমার পুরস্কার। এতে আমার কাজে দ্বিগুণ উৎসাহ হয়, আমার ক্লান্তি দূর হয়ে যায়, আমার মনের আকাশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ভগবান তাঁর সেবককে খুসি হয়ে মাঝে মাঝে দেবতার অমৃত পান করিয়ে দেন— তাতে আমাদের শক্তি বেড়ে যায়, অবসাদ দূর হয়। সেই অমৃত তিনি তোমাকে দান করুন— তুমি নূতন শক্তিতে জীবনকে সার্থকতার পথে নিয়ে যাও— তোমার চারিদিককে আনন্দময় কর।

এন্ড্রুজকে বল্লুম, আজ আর লেখা চল্‌বে না। তাকে বিদায় করে দিয়ে আমার সেই কোণ্‌টিতে ফিরে এসে তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে বসেছিলুম। ইতিমধ্যে বৃষ্টি ধরে গেল। তখন মনে পড়ল, কাল একদল গুজরাটি অতিথি আমাদের এখানে আশ্রয় নিয়েচেন। সঙ্গে তাঁদের মেয়েরা আছেন, ছোট ছোট ছেলেও অনেকগুলি। তার মধ্যে চারটি ছেলেকে তাঁরা এখানে ভর্ত্তি করে দিয়ে যাবেন। তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। তাঁরা বেণুকুঞ্জ[৫] পরিপূর্ণ করে আছেন। আমাকে তাঁদের সঙ্গে হিন্দীভাষায় আলোচনা করতে হয়েছিল। ভাগ্যে, তুমি কিংবা শান্তি[৬] সেখানে উপস্থিত ছিলে না তাই 'কে' এবং 'কো' এবং 'মে' এবং হুয়ী হৈ ও হুয়া হৈ এর উপর দিয়ে নির্ম্মম ভাবে আমার জাপানী চটিসমেত হুহু করে চলে গেলুম—ওঁরাও দেখলুম প্রসন্ন মনে সয়ে গেলেন,পুলিসে খবর দিতে ছুটলেন না। বোধ হয় ক'দিন তোমাদের কাছে সেইসব হিন্দী দোঁহা শুনে শুনে আমার অনেকটা উন্নতি হয়েছে— সেইজন্যে আজ এইসব ভারী ভারি [ভারী] জোয়ান মাড়োয়ারীদের সঙ্গে আধঘন্টাকাল অনর্গল হিন্দী বলেও একটা ফৌজদারী বাধ্‌ল না, শান্তিনিকেতনের শান্তি এখনো অক্ষুণ্ণ আছে। এমনি করে হিন্দীভাষার উপরে ঘোরতর দৌরাত্ম্য করে যখন ফিরে আসচি এমন সময় এন্ড্রুজ সাহেব আবার তার "ঘরেবাইরে" এবং খাতাপত্র হাতে নিয়ে আমার পিছন পিছন আমার ঘরে এসে হাজির হল। বেলা দুপুর পর্য্যন্ত তাকে সেই "ঘরেবাইরে" মুখে মুখে তর্জ্জমা করে যেতে হল। তার পরেও তার যাবার ইচ্ছা ছিল না—আমি নেহাৎ জোর করে উঠে নাইতে চলে গেলুম। আজ নাইতে তাই অনেক বেলা হয়ে গেল। কিন্তু আজ যেরকম বাদলা, আজকের দিনে বেলার ঠিক পাওয়া যায় না। আকাশের ঘড়িতে সূর্য্যদেব কাঁটার মত পূব দিক থেকে পশ্চিম দিকে সময় ভাগ করে চলেন— কিন্তু আজ সেই আকাশঘড়ির ডালা বন্ধ— সেইজন্যে মনে হচ্চে যেন সময় চল্‌চে না। আজ খাওয়ার পরে তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে বসেচি। এই চিঠি লেখা শেষ না করে আমি শুতে যাব না— এতে তুমি যদি রাগও কর তাহলেও আমি মানব না। আমি তোমার নিয়ম প্রায় সবই মেনে চল্‌চি। সেই অবধি আমি সভা করিনি— সকাল সকাল শুতে যাই। বিকেলে Oatmeal-এর সঙ্গে মিশিয়ে একটু করে দুধও খেতে আরম্ভ করেচি। চুল নিজে নিজে যতটা পারি আঁচড়াই কিন্তু সে ভাল হয় না। এর মধ্যে একদিন কেবল ছেলেরা আমার কাছে আমার কবিতার ব্যাখ্যা শুন্‌তে এসেছিল, তোমার কথা মনে করে আমি কেবল একটা কবিতা তাদের কাছে ব্যাখ্যা করেছিলুম, সেও জোরে নয়; তারা আর একটা যখন শুন্‌তে চাইলে আমি তাদের কথা শুন্‌লুম না; তাইত সেদিন আমি শ্রান্ত হইনি। আমি যেমন তোমার কথা শুনেচি, তোমাকেও তেমনি আমার কথা শুন্‌তে হবে। ভাল করে দুধ খেয়ে বিশ্রাম করে আগামী পূজোর ছুটির মধ্যে বেশ মোটাসোটা হয়ে (দিনুবাবুর[৭] মত অতটা নয়) আসতে হবে। তোমাকে শ্রীমতী রাণু যাতে না বলি এই তোমার ইচ্ছে— কিন্তু আমাকে যদি "প্রিয় রবিবাবু" বলে চিঠি লেখ তাহলে আমি তোমাকে শ্রীমতী রাণুদেবী পর্য্যন্ত বল্‌তে ছাড়ব না। তুমি আমাকে যদি রবিদাদা বল তাহলে নালিশ থাক্‌বে না। তুমি তোমার এক সন্ন্যাসী দাদাকে বশ করেছিলে, এখন তাঁর পদটা তিনি আমার উপর দিয়ে গেছেন— তোমার সম্ভাষণে তুমি সে কথা যদি বিস্মৃত হও তাহলে চল্‌বে না। তুমি আমাকে বেশ বড় চিঠি লিখেচ, আমিও বড় চিঠি লিখ্‌লুম। তোমার কাছে অঙ্ক এবং ভূগোলে আমি পারব না, কিন্তু তাই বলে লেখায় তোমার কাছে যদি হার মানি তাহলে আমার নোবেল প্রাইজ ফিরিয়ে নেবে। আশাকে[৮] শান্তিকে ভক্তিকে[৯] আমার আশীর্ব্বাদ দিয়ো। তোমার বাব্‌জাকে[১০] বোলো তাঁর শরীর কেমন থাকে আমাকে যেন জানান এবং পূজোর ছুটিতে কিম্বা তার পূর্ব্বেই আমাকে যেন দর্শন দেন, শুধু একলা নয় সে কথা

তাঁকে না বল্লেও বুঝবেন। তুমি যেমন বৌমার[১১] উপরে আমার ভার দিয়ে গেছ তেমনি ছুটি পর্য্যন্ত আমি তোমার মার[১২] উপর তোমার ভার দিলুম, সেটা তিনি যেন মনে রাখেন; এবার যখন তিনি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আস্‌বেন তখন তোমাকে এবং আমাকে ওজন করে পরীক্ষায় বৌমা প্রথম হন কি তোমার মা প্রথম হন তার বিচার হবে। এই পরীক্ষায় বাংলাদেশের গৌরব বেশি কিম্বা কাশীর গৌরব বেশি আমাদের উভয়ের গুরুত্ব অনুসারে সেইটে স্থির হয়ে যাবে। এত বড় দায়িত্ব যখন তোমার উপরে আছে তখন যত পার দুধ খেতে ছেড়ো না। আমার এমন অবস্থা হবে কে দিনুবাবু কে রবিবাবু হঠাৎ চেনা শক্ত হবে। ইতি ৩০ আষাঢ় রবিবার। ১৩২৫

তোমার
রবিদাদা

২

ওঁ

২৫ জুলাই ১৯১৮ শান্তিনিকেতন

রাণু

পর্শু তোমাকে ঝগড়াটে বলে নিন্দে করে চিঠি লিখেচি[১] আর তুমি আজকের চিঠিতে তার প্রমাণ দিয়েচ।[২] আমি যদি তোমার মত হতুম তা হলে শ্রীমতী রাণুসুন্দরী দেবী বলে তোমাকে আজ সম্ভাষণ করতে পারতুম, তাহলে তুমি জব্দ হতে। কিন্তু নিতান্ত ভালমানুষ বলে আমি তোমার পাল্‌টা জবাব দেবার চেষ্টা করিনি। একে ত সময় খুবই কম, তার পরে — আমার বয়স হয়ে গেল কিছু না হোক্ ত সাতাশের[৩] কম হবে না— আমার কি ঝগড়া করে সময় খরচা করার মত অবকাশ আছে? তোমার মত বয়স হলে কি জানি কি করতুম, হয়ত বা ভীষণ রাগের মাথায় শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রীমতী বলে তোমার নামের গোড়ায় একেবারে পাঁচটা শ্রী বসিয়ে দিতুম— রাণুর বদলে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নাম দিতুম— কিন্তু যতই রাগ করিনে কেন কখনই তোমার নামে ভুলেও চারটে শ্রী বসাতুম না। যাই হোক্ সকল কথাতেই দিনুবাবুর মত কিম্বা বৌমার মত হাস্‌লে চল্‌বে না, মাঝে মাঝে দুই একটা গম্ভীর কথাও বল্‌তে হবে। কেননা আমার সঙ্গে তুমি ভাবই কর আর আড়িই কর আমি মানুষটা যা তা তোমাকে পূরোপূরি চিনে নিতে হবে। এটুকু জেনো আমার মধ্যে একটা জায়গা আছে যেখানটা খুবই গম্ভীর— তাকে যদি তোমার পছন্দ না হয় তা হলে আমি যেখানে সত্য সেখানে তুমি আমাকে জান্‌তে পারবে না, আমি যে কেবল মাত্র ভাল করে চুল আঁচড়িয়ে লাল কাপড় পরিয়ে, তিন বাটি দুধ খাইয়ে, সকাল সকাল ঘুম পাড়িয়ে দেবার মানুষ, তা ঠিক নয়।[৪] তা যদি হত তাহলে বৌমা আমাকে এতদিনে সাজিয়ে গুছিয়ে তাঁর ঠেলাগাড়িতে চাপিয়ে হাওয়া খাইয়ে বেড়াতেন। কিন্তু বৌমা যে তা করেন না তার একটি মাত্র কারণ, তিনি আমাকে কেবল বাইরের দিক থেকে দেখেন নি — তিনি জানেন আমার মধ্যে একটি গম্ভীর মানুষ আছে। আমাকে আমার যে ঠাকুর এই পৃথিবীতে পাঠিয়েচেন আমি তাঁকে অন্তরের সঙ্গে মানি, সব চেয়ে বড় বলে মানি— আমি জানি তিনি আমাকে তাঁরই কাজের ভার দিয়ে পাঠিয়েচেন— আমার সমস্ত হাসি ঠাট্টা গল্প গান সুখ দুঃখের মধ্যে এই কথাটি আমি ভুলিনে। যখনি ভুলি তখনি ছোট হয়ে যাই, তখনি দুঃখ পাই। তাঁকে প্রণাম করে তাঁর হাত থেকে আমি আমার জীবনের সমস্ত দান গ্রহণ করতে চাই। আমি যে এখানে শিশুদের সেবা করি, তার কারণ, এদের সেবা করে আমি আমার ঠাকুরের যথার্থ পূজো করতে পারি— নইলে শুধু মন্ত্র পড়ে পুজো হয় না। এই যে আমার ঠাকুরঘরের আমি, এই যে পূজারি আমি, এই আমিই সত্য আমি। আমার এই ভিতরকার আমির সঙ্গে সংসারে যাদের সম্বন্ধ না হয় তারা আমার যত আত্মীয় হোক্ সে সম্বন্ধ সত্য হয় না— সেইজন্যে

সে সম্বন্ধ দুদিনেই ভেঙ্গে যায়। তুমি ছেলেমানুষ, তুমি আমার এইদিকের কথা হয়ত সম্পূর্ণ বুঝবে না। কিন্তু যখন তুমি আমার এত কাছে এসেছ তখন এই কথাটিকে তোমার বুঝতে চেষ্টা করতে হবে— নইলে আমাকে নিয়ে কেবল দুঃখ পেতে থাক্‌বে। আমি তোমাকে অন্তরের সঙ্গে স্নেহ করি, সেই স্নেহ যদি কেবলমাত্র তোমাকে আদর করে মিষ্টি কথা বলে পরিতৃপ্ত হয় তাহলে তোমাকে ফাঁকি দেওয়া হবে। আমার কাছে থেকে তোমাকে বড় কথা সত্য কথা শুন্‌তে হবে, ভাবতে হবে— আমার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ এত সত্য হবে যে, আমার ঠাকুরের উপাসনা আমার ঠাকুরের কাজ তোমার চিন্তায় বাক্যে এবং আচরণে সার্থক হবে। তুমি যে অধীর হবে, অসহিষ্ণু হবে, তুমি যে কেবল নিজের চিন্তা নিয়ে থাক্‌বে, তোমার চারদিকের লোককে প্রাণপণে খুসি করবার চেষ্টা না করবে এ হলে আমার মনের সুরের সঙ্গে তোমার মনের সুরের মিল হবে না। তুমি যদি সবল চিত্ত নিয়ে নিঃস্বার্থ ভাবে প্রসন্ন মুখে সংসারের কল্যাণের দ্বারা আমার ঠাকুরকে প্রত্যহ প্রণাম না করতে পার তাহলে সেটা আমাকে খুব কষ্ট দেবে এবং লজ্জা দেবে। ভালবেসে আমার কাছে যারা এসেচে আমি যদি তাদের সব দিক থেকে ভাল করে তুলতে না পারি, তারা যদি মনে জোর না পায়, তারা যদি পবিত্র হয়ে আপনাকে ভুলে সকলের কল্যাণ করতে না শেখে তাহলে আমি নিজেকে অপরাধী বলে মনে করি— ভয় হয় আমার ভিতরে বুঝি এমন কিছু অভাব ত্রুটি আছে যে জন্যে আমার কাছে এসে কেউ কোনো সত্যকার উপকার পায় না। আমি বড় আশা করে আছি যে, আমার মধ্যে যা কিছু ভালো এবং সত্য তাই দিয়ে আমি তোমার জীবনকে উন্নত উজ্জ্বল সুন্দর পবিত্র এবং সেবাপরায়ণ করে তুল্‌ব। যদি তোমার জীবনে কিছুমাত্র ভার, বা দুঃখ, বা ক্ষুদ্রতা বা ব্যর্থতা আনি তাহলে আমার অনুতাপের সীমা থাক্‌বে না। অবশ্য সংসারে দুঃখ পেতেই হবে, এবং দুঃখের আগুনে আমাদের মনের পাপ পুড়ে গিয়ে আমরা বড় হই অতএব তুমি কখনো দুঃখ পাবে না এমন কথা মনে করতে পারিনে— কিন্তু সেই দুঃখকে খুব উদারভাবে বহন করতে পার সেই দুঃখকে মাণিকের মত তোমার বুকের হার করে রাখ্‌তে পার সেই শক্তি ঈশ্বর তোমাকে দিন্। সেই শক্তি মানুষ কি করে পায়? যত নিজেকে ভুল্‌তে পারে, যত সবাইকে আপন করতে পারে, যত ক্ষুদ্র ঈর্ষ্যা বিদ্বেষ থেকে তার মন মুক্ত হয়— যতই সকলের সঙ্গে আপন আনন্দ ও ঐশ্বর্য্য ভাগ করে ভোগ করতে শেখে। তা যে না করতে পারে দুঃখ তাকে পুড়িয়ে মারে— সে সোনার মত উজ্জ্বল হয় না, তৃণের মত দগ্ধ হয়, পৃথিবীতে মানব জীবন নিয়ে এসেছি— কিছুদিনের মেয়াদ— সেই কয়েকটি বছরকে সুন্দর করে শুভ্র করে ঠাকুরের পায়ে নির্ম্মল ফুলের মত দিয়ে যেতে পারি এই কামনাকেই সব চেয়ে বড় করে রাখ। রাণু, তুমি যদি আমাকে যথার্থ ভালবাস তাহলে আমার ভাল কাজে তোমার আনন্দ যেন হয়, আমি সকলকেই ভালবাসি এতেই যেন তোমার মন প্রসন্ন হয়, যারা আমার কাছে আস্‌বে তাঁরা আমার কাছ থেকে যেন প্রীতির দান ও পূজার নির্ম্মাল্য নিয়ে যেতে পারে এই তোমার যেন বাসনা হয়। আমাকে ছোট করে দেখো না, ছোট করতে চেয়ো না— তাহলেই আমার সঙ্গ পেয়ে আমার স্নেহে আমার আশীর্ব্বাদে তুমিও বড় হয়ে উঠ্‌বে, তোমার মন তাহলে ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্ত হবে। আমি ভিতরের সৌন্দর্য্যকে সব চেয়ে ভালবাসি— যাদের স্নেহ করি তাদের মধ্যে সেই সৌন্দর্য্যটি দেখবার জন্যে আমার সমস্ত মনের তৃষ্ণা। মেয়েদের মধ্যে এই সৌন্দর্য্যটি যখন দেখা যায় তখন তার আর তুলনা কোথাও থাকে না। কিন্তু মেয়েরা যখন কেবল সংসারে জড়িয়ে থাকে, সবতা'তেই কেবল আমার আমার করে, নিজের ছোট ছোট সুখ দুঃখকে নিয়ে পৃথিবীর সব মহৎলক্ষ্যকে আড়াল করে রাখে, যখন তারা বড় চেষ্টার বাধা, বড় তপস্যার বিঘ্ন হয়ে কেবলমাত্র লোকের মন ভোলানোকেই নিজের জীবনের উদ্দেশ্য বলে মনে রাখে তখন বাইরে তাদের যতই সৌন্দর্য্য থাক্ সে সৌন্দর্য্য মায়া মাত্র, সে সৌন্দর্য্য সত্য নয়। আমি এই আশা করে আছি আমার কাছ থেকে তুমি এই কথাটি অন্তরের সঙ্গে বুঝে নেবে— তাহলেই তুমি আমাকে সত্য করে বুঝতে পারবে। আমাকে যদি সত্য করে বুঝতে না পার তাহলে আমাকে সত্য করে ভালবাস্‌তেও পারবে না— তাহলে আমাকে তুমি তোমার খেলার পুতুল করে রাখ্‌তে চাইবে। কিন্তু আমার বিধাতা ত

আমাকে পুতুল করে পাঠান নি— আমার কণ্ঠে তিনি গান দিয়েচেন, আমার হৃদয়ে তিনি প্রেম দিয়েচেন, আমার জীবনে তাঁর আদেশ আছে, আমার ললাটে তাঁর আশীর্ব্বাদ আছে, আমাকে তিনি সংসারের খেলায় ভুলিয়ে রাখ্‌তে দিলেন না— আমাকে তিনি তাঁর কাজে ডেকেচেন— পৃথিবীময় তাঁর কাজে আমাকে ফিরতে হবে— সেই সব কাজে যারা আমার সহায় তারাই আমার আত্মীয় তারাই আমার বন্ধু, আমার ঠাকুর তাদেরই কাছে আমাকে চিরদিন রাখ্‌বেন। ইতি ৯ শ্রাবণ ১৩২৫

তোমার রবিদাদা

৩

ওঁ

২৫ আগস্ট ১৯১৮ শান্তিনিকেতন

রাণু

চার পাঁচ দিন তোমার চিঠি পাইনি আমিও তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে পারিনি। রাগ করে লিখিনি তা মনে কোরো না। কেননা, তোমার উপরে আমি রাগ করতে পারিনে, দ্বিতীয়ত আমি জানি কাশী থেকে আলমোড়া পর্য্যন্ত পৌঁছে তার পরে সেখান থেকে চিঠি রওনা হয়ে এখানে এসে পৌঁছতে প্রায় দশ দিন দেরি হবার কথা। তোমার চিঠি না পেয়েও তোমাকে আমি লিখেছিলুম, সে এতদিনে তুমি নিশ্চয় পেয়েছ। আরো আমি লিখ্‌তে পারতুম কিন্তু আমার ক্লাসের কাজ এখন অনেক বেড়ে গেছে। সকালে যেমন পড়াতুম তেমনি পড়াই, তার পরে আবার দুপুর বেলায় খাওয়ার পরে এন্ট্রেন্সক্লাসের তর্জ্জমা[১] করানোর ভার আমাকে নিতে হয়েচে। তাতে আমার অনেকটা সময় কেটে যায়— তারপরে আগে যেমন পরদিনের পাঠ আমাকে লিখে তৈরি করে রাখ্‌তে হত, এখন তাও করতে হয়। কাজেই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমার একটুও সময় নেই বল্‌তে পার। তুমি ভাবচ আমার পক্ষে এতটা কাজ করা কষ্টকর,— তা নয়। এ আমার ভালই লাগে। আমি বেশ স্পষ্ট দেখ্‌তে পাই এতে ওদের উপকার হয়। মা যেমন ছেলেদের খাইয়ে খুসি হন এ আমার তেম্‌নি —আমি ওদের মনের খোরাক যত পারি যোগাচ্চি, এতে আমাকে খুসি রাখে। বিশেষত দেখি ওরা আমার কাছে এসে পড়তে ভালবাসে— আমি যদি ওদের ক্লাস নেওয়া বন্ধ করে দিই তাহলে ওরা দুঃখিত হয়। এতকাল আমি থার্ড ক্লাসে[৩] ইংরেজি পড়িয়েছি ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে পড়াইনি সেইটে ওদের একটা খেদ ছিল— যেমনি শুনলে ওদের আমি পড়াব অমনি ওরা খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেচে। কিন্তু বরাবর এমন করে সমস্ত দিন পড়ালে চল্‌বে না— তাহলে আমার অন্য সমস্ত কাজকর্ম্ম বন্ধ হয়ে যাবে— তাই ঠিক করেচি আর কোনো একটি মাস্টারকে তৈরি করে নিয়ে তাঁর হাতে ক্লাস ছেড়ে দেব। তুমি যখন এম্ এ, পাস করে তৈরি হয়ে উঠ্‌বে তখন তুমি এই কাজের ভার নিতে পারবে— কি বল ? সেই দশটা বছর এক রকম করে চালিয়ে দিতে পারব। তোমাকে ছেলেরা মানবে ত? তাদের ঠিকমত শাসন করে রাখ্‌তে পারবে? পঞ্চম বর্গের[৪] ছেলেরা আমার ক্লাসে কি রকম চেঁচামেচি গোলমাল করে তুমি ত দেখেইচ— তারা আমার ক্লাসে পড়া খেলা বলে মনে করে, আর আমাকে তাদের খেলার সঙ্গী বলে ঠিক করে রেখেচে। কেন এমন হয় বল ত রাণু? ছোটরা কেউ আমাকে একটুও ভয় করে না— তারা আমাকে তাদের সমবয়সী বলে ঠিক করে রেখেচে। আমি যখন তোমাকে লিখেছিলুম যে, আমাকে তুমি নারদমুনির মত মনে করে হয়ত ভয় করবে, তখন আমি কত বড় ভুলই করেছিলুম— আমি যে ছফুট লম্বা মানুষ, এত বড় গোঁফদাড়িওয়ালা

কিম্ভূতকিমাকার লোক, আমাকে দেখে তোমার মুখশ্রী একটুও বিবর্ণ হল না— এসে যখন আমার হাত ধরলে তখন তোমার হাত একটুও কাঁপ্‌ল না, অনায়াসে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করে দিলে, কণ্ঠস্বরে একটুও জড়িমা প্রকাশ হল না"— একি কাণ্ড বল দেখি? আমার নিজেরই এক এক সময় মনে হয় আমি হয়ত ছদ্মবেশী ছেলেমানুষ, তাই আমি বাইরে যতই বেশি বয়সের সাজ করি না কেন, আমার ভিতরের ছেলেমানুষী ফস্ করে ধরা পড়ে যায়— বিশেষত ছেলেমানুষদের কাছে। আমার ফাল্গুনীতে সেই কথাটাই লিখেচি— পৃথিবীতে বুড়োটাই ফাঁকি, সে একটা মুখস্ মাত্র— জলে স্থলে আকাশে যৌবন আর কিছুতেই মরে না— তাই আকাশের ললাটে বলির [চিহ্ন] নেই, তাই হাজার লক্ষ বৎসরের সমুদ্র আজো ছেলেমানুষের মত কলরোলে নৃত্য করচে, তাই পৃথিবীর শ্যামলতা চিরনবীন, তাই তারাগুলি সদ্যোজাত জ্যোতিঃশিশুগুলির মত অন্ধকারের কোল জুড়ে নীরবে পড়ে আছে। তুমি যে মনে করচ আজ আমার এই "সাতাশ" বছর বয়স থেকে আর পনেরো ষোলো বছর পরে কোনো একদিন আমি আটাশে পড়ব— আমি তা বিশ্বাস করিনে। আমি দেখ্‌চি বরাবর ঐ সাতাশেই আট্‌কে থাক্‌ব। কিন্তু আমার একটা ভাবনা আছে— তুমি যদি তখন হুহু করে বড় হয়ে উ ঠ্‌তে থাক তাহলে আমি কি করব? তুমি তখন হয়ত সবেগে আটাশ ঊনত্রিশ ত্রিশ একত্রিশ পেরতে থাক্‌বে, আর আমি কোনোমতেই তোমার নাগাল পাব না— ঠিক যেন আমি ইস্টেশনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব, আর তুমি রেলগাড়ির মত বাঁশি বাজিয়ে দিয়ে কোথায় ছুট্‌বে ঠিকানাই পাব না।

তোমার নিশ্চয়ই হিমালয়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয় খুবই ভাল লাগ্‌চে। আমাকে দেখেই যেমন ছুটে এসেছিলে তেমনি করেই বোধহয় হিমালয়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে। হিমালয়ের কোলের কাছে ছোট ছোট যে সব ঝরনা কলকল করে ছুটে বেড়াচ্চে, তারা যেমন গিরিরাজের স্নেহের ধন, তুমিও বোধ হয় তেমনি তার আপনার জিনিস হয়ে উঠেচ। ওখানে ঠাণ্ডায় তোমার শরীর নিশ্চয় ভাল হবে— আগেকার চেয়ে ক্ষিদে বেশি হবে— যতক্ষণ পার বাইরের হাওয়ায় দেবদারু বনের ছায়ায় বসে কাটিয়ে দেবে। ঘরের মধ্যে যত কম থাক্‌বে ততই ভাল। এ বৎসর পশ্চিমে বৃষ্টির অভাব ঘটেছে, অতএব পাহাড়ের উপরে বোধহয় এখনো বর্ষা নামেনি— তাহলে সমস্ত দিন বাইরে কাটাতে কোনো অসুবিধা হবে না। বড় চিঠি লিখেচি— কিন্তু আর সময়ও নেই জায়গাও নেই। ইতি ৮ই ভাদ্র ১৩২৫

তোমার রবিদাদা

৪

ওঁ

৯ অক্টোবর ১৯১৮

কল্যাণীয়াসু

রাণু, "প্রিয় রবিবাবু"র যে ব্যাখ্যা দিয়েছ' এর পরে তোমার সঙ্গে আমার আর ঝগড়া চল্‌তেই পারে না। মাঝে মাঝে ঝগড়া করবার একটা উপলক্ষ্য পেলে মনটা খুসি হয়ে ওঠে— কেননা নিশ্চয় জানি সে ঝগড়া বেশ ভাল রকম করেই মিটে যাবে। নইলে যেখানে জানি ঝগড়াটা সত্যিকার ঝগড়া সেখানে আমি বড় ঘেঁষিনে। তাই লোকের কাছ থেকে অনেক সময় অনেক গাল খেয়েচি কিন্তু জবাব দিই নে। কেননা সেখানে জবাব দেওয়াই হার, সেখানে রাগ করাই লজ্জা। কিন্তু রাণুতে ভানুতে যখন ঝগড়া চল্‌বে তখন আমি খুব কসে জবাব দেব, সহজে হার মান্‌ব না। তখন কণ্ঠে আমাদের আওয়াজ যতই চড়তে থাক্‌বে মনে মনে রাণুও হাস্‌বে ভানুও হাস্‌বে। কি বল? হাসাটা আমার স্বভাব— যার সঙ্গে আমার হাসি চলে না তার সঙ্গে আমার কোনো ব্যবহার চলাই শক্ত। যমরাজ যখন সম্বর্দ্ধনা করে নিয়ে যাবার জন্যে দূত পাঠাবেন

তখনো যেন তার সঙ্গে হেসে নিতে পারি। যিনি আমার আকাশের মিতা তিনিও কম হাসেন না— কিন্তু এক এক সময়ে তাঁর হাসি বড় প্রখর হয়ে ওঠে— মানুষের সর্দ্দিগর্ম্মি লাগে। আমার যখন বয়স অল্প ছিল তখন মাঝে মাঝে আমার হাসিও কম প্রখর হয়ে উঠ্‌ত না— সেই খর-দাহনের ইতিহাস তখনকার কাগজপত্র ঘাঁট্‌লে খুঁজে পাবে। কিন্তু এখন আমার সে দিন গেছে। তুমি যে ভানুটিকে পেয়েচ সে সন্ধ্যাবেলাকার ভানু— তার হাসি রঙীন কিন্তু উগ্র নয়, তার হাসি ভূতলকে স্নিগ্ধ চুম্বন করে আনন্দিত— তাকে দিগন্তের বনজঙ্গল আড়াল করে ফেলে, তাদের ডালপালার খোঁচা দিয়ে তার ললাটে আঁচড় কাট্‌তে চায়— কিন্তু সে ক্ষমা করে বিদায় নিতে চায়— আপনার শান্তির মধ্যে আপনি প্রচ্ছন্ন হওয়াই তার কামনা। একটা কথা তোমার চিঠির মধ্যে লিখেচ সেটা আমার কাছে খুব মজার লাগ্‌ল। তুমি লিখেচ যখন তুমি আমাকে প্রথম চিঠি লিখেছিলে— যখন তুমি আমাকে চক্ষেও দেখনি এবং আবিষ্কার করনি যে, আমার বয়স সাতাশ তখনো তুমি আমাকে ভালবাস্‌তে। কেমন করে হল? বোধ হয় পূর্ব্বজন্মে যে সব চিঠি লিখ্‌তে সে চিঠিটা তারই অনুবৃত্তি— তাই একদম লিখে দিয়েছিলে, প্রিয় রবিবাবু, কিছুই ভাব্‌তে হয়নি। এক জন্মের সঙ্গে আর এক জন্ম দৈবাৎ এক এক সময় ঠিক জোড়া লেগে যায়— তখন এক পরিচ্ছেদের সঙ্গে আর এক পরিচ্ছেদের মিলে যেতে আর বিলম্ব হয় না। আমি হয়ত বা আমার সাতাশ বছর বয়সটাকে সেইখান থেকেই সঙ্গে করে নিয়ে এসেচি— কিন্তু সে কথাটা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম। আমার কুষ্টিটা আমার মাথা খারাপ করে দিয়েচে। কিন্তু ইতিহাসে তারিখের ভুল এত আছে যে, আমার ইতিহাসের তারিখেও ভুল থাকা খুবই সম্ভব।

আমাদের বিদ্যালয়ের ছুটি হয়ে গেছে।[২] ছেলেরা সব চলে গেছে— যেখানে ক্লাস নিতুম সেই বটতল একেবারে নিঃশব্দ— কেবল শালিখ পাখীগুলো বোধ হয় আমাকে ঠাট্টা করে মাঝে মাঝে আমার পঞ্চম বর্গের ছাত্রদের মতই খুব গোলমাল করে আমার ক্লাসের নকল করবার চেষ্টা করে। ভেবেছিলুম এইখানেই আমার সমস্ত ছুটিটা নিস্তব্ধ হয়ে কাটিয়ে দেব। কিন্তু সে হয়ে উঠ্‌ল না। একবার মাদ্রাজের দিকে[৩] আমাকে যেতেই হবে। হয়ত কাল পর্শুর মধ্যেই[৪] চলে যাব। শরীরের জন্যে একটু জায়গা বদল করারও দরকার আছে। তাছাড়া আশ্রমে থাক্‌লে আশ্রমে আসার সুখটা পাওয়া যায় না। আশ্রমে আসবার জন্যে মাঝে মাঝে আশ্রম থেকে যাওয়া দরকার। বেশি দেরী করব না— তোমরা দেওয়ালির সময় আসবে এমন আশা আছে— আমি তার আগেই ফিরব। কিন্তু এই ক'দিন হয়ত চিঠিপত্র পাবে না। নাইবা পেলে। চিঠি পাওয়া অভ্যাস হয়ে যাওয়াটা কিছু না। চিঠি না পেয়েও তোমার ভানুদাদার সঙ্গে অনায়াসে তোমার কথাবার্ত্তা চল্‌তে পারে। বাইরের জিনিস যারই উপর আমরা বেশি নির্ভর করতে যাই সেই আমাদের কিছু না কিছু দুঃখ এবং ফাঁকি দেয়ই। বাইরের জিনিস বড় বেশি নড়ে চড়ে, ভাঙে চোরে, হারায় ফুরোয়। সে আমাদের এড়াবার আগেই তাকে এড়িয়ে যাওয়াই সুবিধে। "বীণা বাজাও মম অন্তরে"[৫] অন্তরে যখন বীণা বাজে তখন আর ভাবনা নেই— সে বীণা সাথের সাথী— আর সে বীণা বাজাবার যিনি ওস্তাদ তাঁকে তেমন করে ধরে রাখ্‌তে পারলে আর কোনো ভাবনা থাকে না। সেই বীণা যাতে সব কোলাহল ঢেকে বাজ্‌তে থাকে আমি এইটেই সবচেয়ে কামনা করি— বীণাটিকে যখন বাইরের দিকে খুঁজে বেড়াই তখনি মুস্কিল। তখন তার ছেঁড়ে, তখন তুম্বি ভাঙে, তখন সুর ঠিক থাকে না। আমার ওস্তাদজি আমার হৃদয় থেকে আমার আশীর্ব্বাদ ও আনন্দ নিয়ে তোমার চিত্তবীণাকে বাজিয়ে দিন্, কোনো ডাকহরকরার কোনো দরকার না থাকুক্ এই আমি ইচ্ছা করি। ইতি ২২ আশ্বিন ১৩২৫

তোমার ভানুদাদা

৫

ওঁ

৫ নবেম্বর ১৯১৮ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠির উপরেই তুমি লিখেচ, "আপনি কি করচেন?" আগে তার উত্তরটা লিখে দিই তার পরে অন্য কথা। সকালবেলা থেকেই একটু একটু মেঘ করে আছে, রোদ্দুর এক একবার ফুটে উঠ্‌চে আবার মিলিয়ে যাচ্চে— ঠিক যেন রোদ্দুর দেওয়ালির রাত্রে যাত্রা শুন্‌তে গিয়েছিল, তাই আজও সকাল বেলাতেও ঘুম পাচ্চে, এক একবার চোখ ঢুলে আস্‌চে আবার চম্‌কে উঠে ভান করচে যেন একটুও তার ঘুম পায়নি। আমার আকাশের ভানুদাদার ত এই অবস্থা। কিন্তু তোমার ভানুদাদা খুব সজাগ আছে। সে ব্যক্তি তার সেই কোণের ডেস্কে বসে খাতা খুলে তার বাংলা কবিতার নতুন ইংরেজি তর্জ্জমাগুলি[১] নিয়ে খুব কষে মাজা ঘষা করচে। হঠাৎ এত ব্যস্ততার কারণ হচ্চে এই যে, এই ইংরেজি তর্জ্জমাই আমার পশ্চিম সমুদ্রতীরে তীর্থযাত্রার পাথেয়। বাংলা কবিতার জোরেই— তোমাদের দরজায় গিয়ে দরজা খোলা পেয়েছি— ভানুদাদার দর্শনের জন্যে ছুটে এসেছে আমার বাঙালী রাণু এবং তার সব সভাসদ— আবার ঐ কবিতাগুলিকেই ইংরেজি করে নিয়ে রাজবাড়ির পশ্চিম মহলের সিংহদ্বারও পার হতে পেরেছি। যুদ্ধ থেমে গিয়েচে,[২] পথ খোলসা হয়েচে, আনাগোনার সময় আবার কাছে আস্‌তে চল্‌ল, কাজেই আবার থলি ঝেড়ে দেখ্‌চি আমার তহবিলে কি আছে। হিসাব করে দেখা গেল যা আছে তাতে আমার বেশ চল্‌বে। এ কথা ত তোমার জানা আছে পূর্ব্ব দিগন্ত থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্য্যন্ত ভানুর যাত্রা-পথ— সেই প্রদক্ষিণ শেষ করতে না পারলে ত তার বিদায় মঞ্জুর হবে না— সেইজন্যেই আজ সকালবেলায় কোণে বসে বসে আমার পশ্চিমের পথ পরিষ্কার করতে লেগে গেছি।

তোমার বাবার চিঠিতেই খবর পেয়েছি, নানা ব্যাঘাতে এবার দেওয়ালির ছুটিতে তোমার আসা হল না।[৩] আস্‌তে পারলে খুব খুসি হতুম সে কথা তুমি নিশ্চয় জান। কিন্তু আমার পণ এই যে, যেটা ইচ্ছা করি সেটা যখন না ঘটে তখন ধরে নিই আমার ঠাকুরের ইচ্ছাই ফল্‌ল। তাঁর ইচ্ছাকেই খুব সহজে গ্রহণ করবার জন্যে মনকে প্রস্তুত রেখে দিই। নিজের মুখরা ইচ্ছাটাকে নিয়ে নিজের ভাগ্যের সঙ্গে, হাত পা নেড়ে, গলা চড়িয়ে, কোঁদল করতে আমার ভারি লজ্জা করে। নিজের ইচ্ছাটাকেই যেমন তেমন করে জয়ী করবার চেষ্টা করতে গিয়েই সংসারে যত অনর্থ ঘটে— একথা বেশ জানি, অথচ মাঝে মাঝে ভুলে যাই। কিন্তু ভুল্‌লে চল্‌বে না— ঐ ইচ্ছার দাসত্ব করিয়ে জীবনটাকে রাস্তায় ঘাটে যেখানে সেখানে হয়রান করে বেড়ানোর মত প্রাণের এমন অপব্যয় আর কিছু নেই। যা কাজ তা করব কিন্তু কুলি মজুরের মত ঘন্টায় ঘন্টায় তার মজুরী দাবী করব না। ঠাকুরের সঙ্গে যদি বন্ধুত্ব করতে চাই তবে তাঁর বন্ধুর মতই কাজ করতে হবে— বন্ধু ত খোরাকী চায় না, মাইনে চায় না। যদি কথায় কথায় বল্‌তে থাকি <u>আমার</u> ইচ্ছা পূরণ করে দাও তাহলেই ত মজুরী চাওয়া হল। মজুর মাইনে দাবী করতে পারে কিন্তু প্রভুর সঙ্গে এক আসনের দাবী করতে পারে না ত। ঐ এক আসনের অংশের পরেই আমার লক্ষ্য। সেইজন্যে সংসারে ইচ্ছার দাবী নিষ্ফল হলে হেসে উড়িয়ে দিতে চাই— সব সময়ে জোর থাকে না —কিন্তু তাই বলে হাল ছেড়ে দিলে চল্‌বে না। নিজের ইচ্ছার উপরে নিজে যদি কর্ত্তা হতে পারি তাহলেই বিশ্বের যিনি কর্ত্তা তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে পারি। নইলে দাসের দশা কোনোদিন ঘুচ্‌বে না; আর দাসের মুষ্কিল এই যে, তাকে দরজার পাশে দূরে

দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হয়। আমি পাশে বসবার নিমন্ত্রণের অপেক্ষায় আছি— আজ হোক্ বা কাল হোক্ বা দেরিতেই হোক্। ইতি ১৯ কার্ত্তিক ১৩২৫

তোমার ভানুদাদা

৬

ওঁ

২১ মাঘ ১৩৩০

[শ্রীনিকেতন]

রাণু

লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি মনকে শান্ত কর। তোমার জন্যেই আমি উদ্বিগ্ন হয়েছিলুম। যে একটা জটিল জালের মধ্যে[১] তুমি জড়িয়ে পড়েছিলে, তার জন্যে অনেক পরিমাণে আমিই দায়ী বলে আমি ক্ষুব্ধ হয়েছিলুম। তোমার এই প্রথম বয়েস, এই সময়ে তোমার পড়াশুনো তোমার নিশ্চিন্ত হাসি উল্লাসের মাঝখানে এই সমস্ত উপদ্রব এনে তোমার সমস্ত জীবনকে এমন করে যে একটা ঘূর্ণিপাক খাইয়ে দেওয়া গেল সেটাতেই আমাকে দুঃখ দিয়েচে। তোমার উপর আমি কখনো এমন রাগ করতেই পারিনে যাতে তুমি স্থায়ীভাবে ব্যথা পেতে পার। আমার স্নেহ তুমি হারিয়েচ কল্পনা করে যে কষ্ট পাচ্চ তার কোনো মূল নেই। আমার যে-স্নেহ তুমি এমন করে টেনে নিয়েচ সে আমি কোনোদিন কিছুতেই প্রত্যাহরণ করতে পারিনে। আমার স্নেহে যদি তোমার কোনো সান্ত্বনা থাকে, তাতে যদি তোমার হৃদয়ের ক্ষুধা মেটাতে পারে, তাহলে সে তুমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত মনে ভোগ কর— তার দ্বারা তুমি বল পাও, সুখ পাও, কল্যাণ পাও, এই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি। আমার কক্ষপথে কোথা থেকে কেমন করে তুমি একটি প্রাণের জ্যোতিষ্ক এসে পড়েচ, তোমার সংসারের অভিজ্ঞতা কিছুই নেই, তোমার মন কাঁচা, আমি কি তোমাকে রূঢ়ভাবে আঘাত করতে পারি? তোমার উপরে আমার বেদনাপূর্ণ স্নেহ সর্ব্বদা আপনি গিয়ে বিকীর্ণ হচ্চে। আমার জীবনের দায়িত্ব, কখন্ আমার অগোচরে এবং জানিনে কার প্রেরণায় ক্রমশই বিশ্বব্যাপী হয়ে উঠচে— তার সমস্তটার সঙ্গে তোমার সম্পূর্ণ যোগ হওয়া সম্ভবপর নয়, তুমি ছাড়া আর কারো যে যোগ আছে তাও নয়,— ঐখানে বিধাতা আমাকে অনেক্‌টা পরিমাণে একলা করে দিয়েচেন। কিন্তু তুমি হঠাৎ এসে আমার সেই জীবনের জটিলতার একান্তে-যে বাসাটি বেঁধেচ, তাতে আমাকে আনন্দ দিয়েচে। হয়ত আমার কর্ম্মে আমার সাধনায় এই জিনিষটির বিশেষ প্রয়োজন ছিল, তাই আমার বিধাতা এই রসটুকু আমাকে জুটিয়ে দিয়েচেন। আমার অনেক সহযোগী আছে যারা আমার কর্ম্মে আমাকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে, তুমি তা কর না; আমার জীবনের লক্ষ্যের দিকে তুমি হয়ত আমাকে সম্পূর্ণ বুঝতে এখনো পার না। কিন্তু জীবনের সেই লক্ষ্য যেখানেই থাক্ না, তুমি তোমার সরল প্রাণের অর্ঘ্যের দ্বারা আমার জীবনকেই যা দিয়েচ তুমি কি মনে কর সে আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক? তা যদি হত তা হলে তুমি কখনই আমার কাছে আস্‌তে পেতে না। কেননা আমি জানি আমার ভাগ্যদেবতা আমাকে দিয়ে তাঁর একটা কোনো বিশেষ কাজ আদায় করবেন বলেই শিশুকাল থেকে আমার জীবনকে নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে গড়ে নিচ্চেন। তাঁরি ডাকে আজ হঠাৎ তুমিও আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েচ। কি রকম অভাবনীয়রূপে এসেছ সে কথা মনে করলে আশ্চর্য্য হতে হয় না কি? আমার পক্ষে তুমি যে বন্ধন হয়ে আসবে এ কিছুতে হতেই পারে না, কেননা মুক্ত না থাক্‌লে আমার মধ্যে যা সব চেয়ে বড় তাকে আমি ব্যক্ত করতে পারিনে, আর তা না করতে পারা আমার পক্ষে একরকম মৃত্যুরই মত। সেইজন্যেই তুমি আমার জীবনের প্রাঙ্গণে ফুল-ফোটা লতার মতই এসেচ, বেড়ার মত আস নি। তোমার সেই ফুলের গন্ধ আমার মনে লেগেচে। তারই আনন্দ আমার কাজের অনেক ক্লান্তি দূর করে, এবং

অবকাশের মধ্যে গানের সুর লাগায়। আমি তোমাকে উপেক্ষা করে আমার জীবনের ক্ষেত্র থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি এই কথা কল্পনা করে তুমি নিজেকে কখনো অনর্থক ক্লিষ্ট কোরো না।

আমার শরীরের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু উদ্বিগ্ন হয়ে আমি কলকাতায় এসেছিলুম। মনে হয়েছিল যেন কিছু কল বিগ্‌ড়েচে। আমি মেরামত-করা শরীর নিয়ে ব্যবহার করতে নিতান্তই নারাজ। এখানে এসে নীলরতন সরকারকে[২] দিয়ে দুদিন ধরে দেহটাকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিলুম। তিনি বল্লেন, কল কোথাও কিছুই বিগ্‌ড়োয় নি; বল্লেন আমার নাড়ী যৌবনের নাড়ী। তবে আমি যে কথায় কথায় কেবল ক্লান্ত হয়ে হাঁপিয়ে পড়ি তার কারণ আমার দেহের শক্তি, বিশেষভাবে হৃৎপিণ্ডের শক্তি, অতিরিক্ত খরচ করে দেহটাকে দেউলে করে আনচি— দেহযাত্রার পূর্ণ প্রয়োজনের জন্যে সর্ব্বদা যে পুঁজি হাতে রাখা উচিত অসাবধান হয়ে আমি সেটাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টায় আছি। কিছুকাল সম্পূর্ণ বিশ্রাম করে আবার কিছু মূলধন সঞ্চয় করা বিশেষ আবশ্যক। যাই হোক্ একটা আশ্বাসের কথা এই যে, আমার দেহ মোটরগাড়ির পেট্রল অনেকখানি ফুরিয়ে এসেচে কিন্তু কল কোথাও ভাঙেনি, স্ক্রু কোথাও ঢিলে হয় নি। অতএব এখনো যতদিন দম সম্পূর্ণ ফুরিয়ে না যায় বসন্তের জয়গান করতে পারব।

কিন্তু তুমি এখন মনকে সুস্থির করে পড়াশুনায় লেগে যাও। পরীক্ষাফলের প্রতি উদাসীন হোয়ো না। আমি চীন থেকে[৩] ফিরে এসে তোমাকে প্রসন্ন প্রফুল্ল সুস্থ সবল দেখি যেন। ইতি ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪

তোমার ভানুদাদা

ওঁ

৭
২৮ মাঘ ১৩৩০

[শ্রীনিকেতন]

রাণু,

তোমাকে কথা দিয়েচি যে তোমার চিঠি পেলে তোমাকে চিঠি লিখব— সজ্জনের বাক্য, শাস্ত্রে বলে, গজদন্তের মত, অর্থাৎ একবার যখন বেরিয়ে আসে তখন তাকে ভিতরে প্রত্যাহরণ করা যায় না। আজ সোমবার[১] অপরাহ্ণে তোমার পত্র বহুতর য়ুরোপাগত পত্রের সঙ্গে পাওয়া গেল,— হঠাৎ পত্রের পশ্চিম হাওয়ার ঝড় উপস্থিত হল, বারাণসী, অস্ট্রিয়া, জর্ম্মানি, ফ্রান্স, ইংলন্ড; আমেরিকা থেকে চিঠি এসে আমার ডেস্ক ভরে দিলে। তুমি চিঠি পাঠিয়েচ ৯ই ফেব্রুয়ারিতে, আমি পেয়েচি ১১ই তারিখে। যদিচ আজি [আজই] তার উত্তর লিখ্‌তে বস্‌লুম কিন্তু কালকের আগে ডাকে দেওয়া চল্‌বে না। তুমি পাবে বৃহস্পতিবারে। তুমি যে আমার দুটো পত্র একদিনে পেয়েছিলে তার মধ্যে আমার কোনো চাতুরী ছিল না, খুব সম্ভব প্রথম চিঠি যখন ডাকে দিয়েছিলুম তখন পোস্টের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আমার কাছে ঠাট্টায় পাছে তুমি ঠকো সেইজন্যে আজকাল এত বেশি সাবধান হয়েছ যে খুব সাদা কথাতেও তোমার সন্দেহ হয়। কোন্‌দিন হয়ত বলে বস্‌বে "আপনি ভানুদাদা বলে আমার সঙ্গে চালাকী করেন, নিশ্চয় আপ্‌নি ভানুদাদা নন, নিশ্চয়ই আপনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলে একজন বঙ্গদেশীয় গ্রন্থকার।" তখন আমি কি করে প্রমাণ করব যে,' গ্রন্থকারটা হল বাংলাদেশের পাঠকদের পরিচিত এক ভদ্রলোক, কিন্তু ভানুদাদা তাদের পরিচিত কেউ নয় ; অতএব দুজনে দুই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আছেন তাঁর জগদ্বিখ্যাত প্রতিভা নিয়ে কিন্তু লোকটি মাটির মানুষ, অত্যন্ত বিনয়ী ; আর ভানুদাদা আছেন যাঁকে নিয়ে তিনিও কোনো কোনো মহলে

অত্যন্ত বিখ্যাত হয়ে উঠ্‌চেন, সেই অহঙ্কারে এই ভানুদাদার আর মাটিতে পা পড়ে না। দুজনের প্রকৃতি আলাদা। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়স সম্বন্ধে ঐতিহাসিকরা সম্পূর্ণ নিঃসংশয়; আর ভানুদাদার বয়স সম্বন্ধে তর্ক আছে —অতএব লজিকশাস্ত্র যাঁরা সম্প্রতি অধ্যয়ন করতে সুরু করেচেন তাঁরা কখনই দুজনকে এক ব্যক্তি বলে সন্দেহ করতে পারেন না। আমি পরম্পরায় শুনেচি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনস্মৃতি' বলে একখানি বই লিখেচেন, তার থেকে প্রমাণ হয় তাঁর জীবনও আছে স্মৃতিরও অভাব নেই; আর ভানুদাদাকে দুই একজন যাঁরা জানেন তাঁরা জানেন উক্ত ভদ্রলোকের জীবন বলে পদার্থ ক্ষীণ পরিমাণে যদি বা থাকে স্মৃতি বলে কোনো বালাই নেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সব গান রচনা করেন ভানুদাদা যদি সেগুলি তাঁর বিশেষ পরিচিত কোনো কোনো লোকের কাছে গাইতে চেষ্টা করেন তাহলে তার সুরও ভোলেন কথাও ভোলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে নাটক লেখেন ভানুদাদা তা অভিনয় করবার বেলায় সমস্ত গোলমাল করে' নিজের কথা বসিয়ে দিয়ে কোনোগতিকে কাজ সেরে দেন। কোনো কোনো রসিক লোক সন্দেহ করে যে, ভানুদাদা গান ভুল করেন, নাটকের কথা উলটপালট করে দেন সেটা চিত্তবিক্ষেপের লক্ষণ— সেই চিত্তবিক্ষেপের কারণটি সঙ্গীতসভায় ও নাট্যমঞ্চে সশরীরে উপস্থিত থাকাতেই এইরকম দুর্গতি ঘটে। যা হোক্ জনশ্রুতি সবই যে বিশ্বাস করতে হবে এমন কোনো কথা নেই।

Elmhirst[৩] যখন কাশী দিগ্বিজয় করে আশ্রমে ফিরে এলেন তখন ভানুদাদা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সখে, রাণুনামধারিণী কাশীবাসিনী বালিকাকে কেমন দেখ্‌লে আমার কাছে প্রকাশ করে বল", সাহেব বল্‌লেন, "বন্ধু, She looked very happy." ভানুদাদা স্তব্ধ হয়ে বসে ভাবতে লাগ্‌ল, হঠাৎ এত happiness-এর কারণ কি ঘট্‌ল? দীর্ঘকাল ভেবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লে, "হে প্রিয়দর্শন, তাকে কি কিছু কৃশ দেখ্‌লে? মুখ কি তার পাণ্ডুবর্ণ? সত্য বল, আমার কাছে গোপন কোরো না।" সাহেব বললে, "উদ্বিগ্ন হোয়োনা, বন্ধু, সেই বরবর্ণিনীকে যেমন হৃষ্ট দেখ্‌লুম তেমনি পুষ্টও দেখা গেল, তবে কিনা তার মুখের বর্ণে যে পাণ্ডুতার আভাস পাওয়া গেল সেটা নিশ্চয়ই কোনো প্রসাধনসামগ্রীর গুণে।" ভানুদাদা দীর্ঘতরকাল চিন্তা করে ও দীর্ঘতর নিশ্বাস ফেলে জিজ্ঞাসা করলে, "প্রিয় সুহৃৎ, সেই বালিকার প্রসাধনের উৎসাহ আজকাল কি কিছুমাত্র কমে নি?" সাহেব বল্‌লেন, "ভো বন্ধো, শুনে খুসি হবে আমি যতক্ষণ ছিলেম, তার প্রসাধনপটুত্বের বৃদ্ধি বই হ্রাস ত দেখি নি।" ভানুদাদা ম্লান মুখে পুনশ্চ প্রশ্ন করলে "আকাশের চাঁদকে দেখে তার কি কোনোপ্রকার চাঞ্চল্য লক্ষ্য করে দেখেচ?" সাহেব বল্‌লে, "হে ধীমন্, তার চাঞ্চল্যের জন্যে আকাশের চাঁদের কোনো অপেক্ষা থাকে নি— নিকটবর্ত্তী কারণই যথেষ্ট।" তারপরে ভানুদাদা তাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে উৎসাহ বোধ করলে না। বল্‌লে, "Good night !"

পূর্ব্বেই শুনেচ, রোজ সন্ধ্যাবেলায় মেয়েদের গান শেখাচ্চি। এতদিন প্রায় রোজই একটা না একটা নতুন গান চল্‌ছিল ইদানীং তাদের অনুরোধক্রমে পুরোনো গান ধরা গেছে। গত তিন দিন গানের বদলে তিনটে বড় বড় নতুন কবিতা লিখেচি।[৪] তাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাঠকেরা আশ্চর্য্য হয়ে গেচে। তারা ভেবে রেখেছিল রবিঠাকুরের কবিতার ডানা থেকে তার সব পালকগুলো ঝরে গিয়েচে, এখন সে কেবল গদ্যের চালে মাটির উপরে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াতে পারে, পদ্যের চালে মেঘলোকে উড়তে পারে না। কিন্তু রবিঠাকুর অস্তাচলের ধারে এসেও তার ছটা বিস্তার করচে। তাতে রঙের ঘটার কৃপণতা নেই, বিচারকদের এই মত।

রাত হয়ে এল। আকাশে মেঘ করে রয়েচে— সন্ধেবেলায় একচোট বৃষ্টি হয়েও গেচে— আবার হয়ত মাঝরাত্রে বৃষ্টি পড়বে— হুহু করে বাদলার ভিজে হাওয়া বইচে। সব নিঃশব্দ, কুকুরগুলো পর্য্যন্ত আজ ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে চুপচাপ পড়ে আছে, বাইরের অন্ধকারে কেবল ঝিল্লিধ্বনি শোনা যাচ্চে। এর অনেক আগে শুতে যাওয়া উচিত ছিল— আমার দেহটা কিছুকাল থেকে আমাকে বল্‌চে ছুটি দাও ছুটি দাও। বহুকাল সে

বিনা ওজরে আমার সেবা করেচে, এতদিন পরে তার ত্রুটি হতে আরম্ভ হয়েচে, সেজন্যে সে লজ্জিত— আপনার দৈন্য সে ঢাক্‌তে চায় কিন্তু নানা ছিদ্রে বেরিয়ে পড়ে। আজ আর তাকে তাগিদ্ করব না, বাতি নিবিয়ে দিই, শুতে যাই। কাল সকাল থেকে আমার অন্য কাজের তাগিদ আছে তাই রাত্রেই চিঠি সেরে রেখে দিচ্চি। ইতি ১০ [১১]ফেব্রুয়ারি ১৯২৪

ভানুদাদা

৮

[২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪] [কলকাতা]

রাণু

আজ রবিবার কাল শনিবারে তোমার চিঠি শান্তিনিকেতনে আমাকে খুঁজতে গিয়েছিল। যেখানে ডেস্কে বসে লিখে থাকি সেখানে একবার উঁকি মারলে, দেখ্‌লে কেউ কোথাও নেই। যেখানে বৌমার খাবার ঘরে খেতে যাই সেখানে ঘুরে এল, দেখ্‌লে সেখানেও আমি নেই। লীলমণির[১] কাছে খবর নিতে গেল। হাঁক দিল, লীল্‌মণি, লীল্‌মণি? কোথাও তার সাড়া পেল না। শেষকালে খবর পেলে চিঠির মালেক কলকাতায় চলে এসেচে, আর সঙ্গে এসেচে তার সবেধন লীলমণি। তখন পোষ্ট্‌ব্যাগের মধ্যে দ্বিতীয়বার প্রবেশ করলে আর জোড়াসাঁকোয় আমার দক্ষিণহস্তের উপর অবতরণ করলে। এক ম্যালেরিয়া নিবারিণী সভা হয়েচে তাদের বার্ষিক অধিবেশন[২] উপলক্ষ্যে সভাপতির আসন গ্রহণ করব বলে কিছুকাল পূর্ব্বে কথা দিয়েছিলেম। তাই দায়ে পড়ে এই ক্লান্ত রুগ্ন দেহ টেনে টেনে কলকাতায় এসেচি। ম্যালেরিয়া সভায় বক্তৃতা করে এসেচি যে, ম্যালেরিয়া রোগটা ভাল জিনিষ নয়— ওর সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধ পাতিয়ে শ্রীমতী ম্যালেরিয়াকে অর্দ্ধাঙ্গিনী করবার চেষ্টা করলেও দেখ্‌তে দেখ্‌তে সর্ব্বাঙ্গিণী হয়ে ওঠে। সাধারণত প্রেয়সীরা হৃৎকমলে স্থান গ্রহণ করে থাকেন কিন্তু শ্রীমতী ম্যালেরিয়া হচ্চেন যকৃৎ-বাসিনী, প্লীহাবিনোদিনী। কবিরা বলে থাকেন প্রেয়সীর আবির্ভাবে হৃদয়ে ঘন ঘন স্পন্দন উপজাত হয়; কিন্তু ম্যালেরিয়ার আবির্ভাবে সর্ব্বাঙ্গ মুহুর্মুহু স্পন্দিত হতে থাকে। অবশেষে অত্যন্ত তিক্ত উপায়ে তার বিচ্ছেদ ঘটাতে হয়। কিন্তু তার সঙ্গে একবার মিলন হলে বারে বারে সে ফিরে ফিরে আসে। তাই আমি করুণ কণ্ঠে সানুনয়ে সকলকে অনুরোধ করে বলেছিলেম, "ভদ্রমহিলাগণ, এবং ভদ্রলোক সকল, ধর্ম্মের নামে, দেশের নামে, সর্ব্বমানবের নামে আমি আপনাদের নিবেদন করচি, কদাচ আপনারা ম্যালেরিয়াকে প্রশ্রয় দেবেন না, আপনাদের প্লীহা ও যকৃৎকে কদাচ তার চরণে উৎসর্গ করবেন না। আর যদি কখনো শোনেন মশা কানের কাছে মৃদুমন্দ গুঞ্জনধ্বনি করচে তবে তার সেই মায়ায় ভুলবেন না, যদি দেখেন সে আপনাদের চরণাশ্রয় গ্রহণ করেচে তবে নির্ম্মমভাবে এক চপেটাঘাতে তাকে বিনাশ করতে কুণ্ঠিত হবেন না। উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য ডাক্তারাণ্ নিবোধত!" আমার সেই সারগর্ভ চিন্তাপূর্ণ উপদেশবাক্যে, আমার সেই জ্বালাময়ী বাগ্মিতায় সেই সভায় এমন অল্পবুদ্ধি, এমন জড়প্রাণ একজনও ছিল না ম্যালেরিয়ার অপকারিতায় যার কিছুমাত্র সংশয় ছিল। সকলেই বারবার বল্‌তে লাগ্‌ল "ধন্য সার্ রবীন্দ্রনাথ, ধন্য ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ, ধন্য বিশ্ববরেণ্য কবি, ম্যালেরিয়া যে এমন সর্ব্বনাশিনী একথা এমন ওজোময়ী বিশদ ভাষায় আর কোনোদিন কারো কাছে শোনা যায় নি। আজ হতে আমরা

সকলেই দৃঢ়সঙ্কল্প হলেম আর কোনোদিন ম্যালেরিয়ার প্রতি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা রাখবো না, আর মশা গায়ে বসলেই হয় তালবৃন্তব্যজনে তাকে দূরীকৃত করব, নয় বীরোচিত অধ্যবসায় সহকারে নির্ভয়ে নিঃসংকোচে তাকে যমসদনে প্রেরণ করব।" আমার বক্তৃতার এই আশু ফল দেখে আমি বড়ই তৃপ্তি ও সান্ত্বনা লাভ করেচি। সভা থেকে ফিরে আস্‌তে আস্‌তে চিৎপুর রোডের জনতার মাথার উপর দিয়ে আমার দেশজননীর যেন আশীর্ব্বাণী ট্রামের ঘর্ঘর নিনাদের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আমার কর্ণকুহরে বাজতে লাগ্‌ল— "বৎস, সার্থক তোমাকে জন্ম দিয়েচি।" আমারও মনে হতে লাগ্‌ল, সুজলাসুফলামলয়জশীতলা এই যে সপ্তকোটি কণ্ঠকলকলনিনাদকরালা বঙ্গভূমিতে আমি এতদিন জীবনযাপন করে এলুম, আজ তার ঋণ শোধ করতে পারলুম, আজ আমার ভাই বাঙ্গালীকে— যে বাঙ্গালী প্রতাপাদিত্যের বংশধর, যে বাঙালী সিংহলবিজয়ী বিজয়সিংহের বিজয়গৌরবমণ্ডিত, যে বাঙালী রঘুনন্দনের স্মৃতিভাষ্যের জটিল বটবৃক্ষচ্ছায়ায় লালিত সেই আমার ভাই বাঙ্গালীকে আজ স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছি যে ম্যালেরিয়া একটা রোগ, এবং যে-কেহ স্বাস্থ্য লাভ করতে ইচ্ছুক এই রোগের হাত থেকে তার পরিত্রাণ পাওয়া চাই।

আবার কাল শান্তিনিকেতনে ফিরব। আগামী ১০ মার্চ্চে মঞ্জুর[৩] বিবাহ। সেই বিবাহে আমাকে উপস্থিত থাকতে হবে। বোধহয় ৭ই মার্চ্চ তারিখে কলকাতায় আসব, তারপরে ১৪ই মার্চ্চে চীনে যাত্রা করব। খুব বেশি উৎসাহ বোধ হচ্চে না, কেননা শরীর ভাল নেই। কিন্তু চীনের নিমন্ত্রণ অস্বীকার করা চলবে না।

এতক্ষণ তোমার সঙ্গে হাসি তামাসা করেচি এখন একটু গম্ভীর হতে হবে। ইচ্ছে করে না গম্ভীর হয়ে তোমার মনকে নাড়া দিতে— কিন্তু অত্যন্ত আবশ্যক বলেই তোমাকে বলচি। তোমার একটা কথা বিশেষ জানা উচিত যে তোমার সম্বন্ধে বুড়োদের[৪] বাড়িতে কুশ্রীরকম অপমানজনক কথাবার্ত্তা চল্‌চে। এমন একটা অবস্থায় এসে ঠেকেচে যে তোমার সঙ্গে বুড়োর বিবাহ কোনোমতেই সম্ভবপর নয়। অথচ তুমি এখনো যদি বুড়োকে চিঠি লেখ তাহলে কেবল যে তোমারই আত্মসম্মানের হানি হবে তা নয় তোমার বাপমায়ের প্রতি অবমাননা টেনে আনবে। আমি গোপনে বলচি তোমার সম্বন্ধে তোমার বাবাকে অপমান করতে বুড়োর বাড়ি থেকে আর একটু হলে চেষ্টা করা হচ্ছিল এ সত্ত্বেও যদি তুমি বুড়োকে চিঠি লিখ্‌তে না ছাড়ো তাহলে তাকেও তুমি বিপদে ফেল্‌বে, নিজেদেরও অপমানিত করবে, আর তা ছাড়া এতে আমারও খুব লাঞ্ছনা হবে। আমার সম্বন্ধেও ওদের বাড়িতে আলোচনা চল্‌চে তুমি যদি এখনো আত্মসম্বরণ করতে না পার তাহলে আমার পক্ষেও গুরুতর লজ্জার কারণ হবে। অবশ্য জানি, আমি না বুঝে গোড়াতে প্রশ্রয় দিয়েচি— সেটা আমার গভীর বেদনা ও অনুশোচনার বিষয় হয়ে রয়েচে। অনেকটা পরিমাণে আমারই উৎসাহে যখন বুড়োর প্রতি তোমার হৃদয় আবদ্ধ হয়ে পড়েচে, তখন হঠাৎ সে দিক থেকে তোমার ভালোবাসা প্রত্যাহরণ করতে বল্‌লেই যে অমনি তখনি সেটা সুসাধ্য হবে এটা আশা করাই যায় না। কিন্তু ভালোবাসারও ত একটা আত্মসম্মান এবং একটা দায়িত্ব আছে। বুড়োকে যখন তুমি ভালোবাসো তখন বুড়োর কল্যাণের কথাও ত তোমার ভাবা উচিত।

[ভানুদাদা]

৯

[কলকাতা]

রাণু

কলকাতার ঠিকানায় লিখেচ বলে তোমার চিঠিখানি আজ এইমাত্র পেলুম। তোমাকে যে বেদনা দিয়েছিলুম তারি কান্নার চিঠি এতদিন পেয়ে আসচি। তুমি জান না এতে আমাকে কত ব্যথিত করে

তুলেছিল। আমার পরের চিঠি পেয়ে তোমার হৃদয়ের ক্ষতযন্ত্রণা অনেকটা দূর হয়েচে এইটি জানবার জন্যে আমার মন অপেক্ষা করেছিল। সমুদ্রের উপর দিয়ে যখন ঝড় বইতে থাকে তখন তার সমস্ত অশ্রুরাশি তরঙ্গিত হয়ে ওঠে— ঝড় থেমে যাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ থাকে ঢেউয়ের ভিতরকার সেই কান্না। তোমার এই চিঠির ভিতরেও তোমার ব্যথার সেই ঢেউ এখনো যেন ফুলে ফুলে উঠ্‌চে। যাক্ সে ঝঞ্ঝা কেটে গেছে— এখন তোমার মনের উপর একটি প্রশান্ত প্রসন্নতা মেঘমুক্ত প্রভাত আলোর উপর বিকীর্ণ হোক্। এতে তোমার ভালোই হবে রাণু— দুঃখের এই মন্থনের ভিতর দিয়ে নিজের অন্তরের গভীরতাকে তুমি উপলব্ধি করেচ— এ আর তুমি কখনো ভুল্‌তে পারবে না। কুমারসম্ভবের গল্প ত জান। জীবনকে হাল্কা করে' জীবনের চরম সাধনার জিনিষকে পাওয়া যায় না। গভীর দুঃখের তপস্যায় নিজের পরম পরিপূর্ণতাকে স্পর্শ করা যায়। এই দুঃখের আঘাত তোমাকে চিরদিনের মত উদ্বোধিত করুক, জীবনের উপরিতলের চঞ্চল ফেনিলতার ভিতর দিকে নিমগ্ন হয়ে নিজের মধ্যেকার যা শ্রেষ্ঠ তাকেই লাভ কর। অনেকদিন আমি এই কথা ভেবেচি, আমি ইচ্ছে করেচি, আমি তোমাকে আর কিছু দেবার অবকাশ যদি না পাই তবে যেন তোমার গভীরতম আপনা ক দেখিয়ে দিয়ে যেতে পারি।

চীনে যাবার দিন কয়েক সপ্তাহ পিছিয়ে গেল। ২৩শে মার্চ্চে[১] আমাদের জাহাজ ছাড়বে। পথটা অনেকদূর পর্য্যন্ত খুব গরম হবে। তার পর যখন চীনের উত্তর অংশে যাব তখন আবার ঠাণ্ডা পাব। পথে সমুদ্রের উপর বেশ বিশ্রাম করতে পারব। ঢেউয়ের দোলায় আমাকে আজকাল আর দুঃখ দেয় না। প্রথম যখন সমুদ্রের পরিচয় পেয়েছিলুম[২] তখন সেটা একেবারেই সুখকর হয় নি। তিন দিন এত বেশি কষ্ট হয়েছিল যে যদি জাহাজ ডুব্‌ত তাহলে আমি উদ্বিগ্ন হতুম না। গেলবারে জাপানে যাবার সময় বঙ্গোপসাগরে প্রলয়ঝড়ের দোলা খেয়েও আমি কাতর হইনি। বাইরের দোলায় আমাকে কাবু করে না বটে কিন্তু ভিতরে যাত্রিদের [যাত্রীদের] গোলমাল, আর তাদের সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা জটলা করে থাকা, আমার পক্ষে ভারি অসহ্য। সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত আমরা ইংরিজি জাহাজে[৪] যাবে— অতএব এ কটা দিন ইংরেজের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করতেই হবে। ইংরেজের উপর আমার কোন রাগ নেই কিন্তু এসিয়ার গরম হাওয়ায় যাদের মেজাজ একেবারে পাকা রকমে গরম হয়ে গেচে তাদের কাছে গেলে সাত হাত দূর থেকেই পায়ে যেন কড়া আঁচ লাগতে থাকে। কিন্তু জাপানী জাহাজে ভারি আরাম। ওরা এত ভদ্র, আমাকে এত যত্ন করেছিল,[৫] এবারেও আমাকে ওদের জাহাজে নিয়ে যাবার জন্যে এত আগ্রহ করচে, যে ওদের জাহাজে[৬] আমি যেন মান্য অতিথির মত থাক্‌তে পাব। আরবারে জাহাজের কাপ্তেন আমাকে তার নিজের নাবার ঘর ছেড়ে দিয়েছিল— ডেকের উপরে যেখানে যেমন করে খুসি বসে আমার লেখাপড়া করতে পারতুম। ইংরেজের জাহাজে সে সম্ভাবনামাত্র নেই।

ক্রমে গরম পড়ে আসচে। ক্ষণে ক্ষণে মনের ভিতরটাতে বসন্তকালের ডাক এসে পৌঁচচ্ছে। এখন এই জোড়াসাঁকোর গলিতেও তার স্পর্শ যেন রক্তের মধ্যে নাড়া দিয়ে যায়। এখন কি চীনে যেতে একটুও ইচ্ছে করে? এই রোদ্দুরের রংটা আমার চোখেতে কি রকম নেশা লাগায়। চিরদিনই কি আমার এইরকমই চল্‌বে? ছেলেবেলাতেই এই অপরূপের স্পর্শ যে রকম উতলা করে দিত এখনো ঠিক তাই করে। সেইজন্যেই কোনোমতেই পাকা কাজের লোক হয়ে উঠ্‌তে পারলুম না— প্রকৃতির খেলার অঙ্গনেই আমার সময় কেটে গেল। এই জোড়াসাঁকোর গলিতেও দেখ্‌তে দেখ্‌তে তিনটে কবিতা[৭] লিখেচি। কাগজে ছাপা হলে কোনো সময় পড়ে দেখ্‌তে পাবে। কিন্তু যার কবিতা, তার নিজের মুখে শুন্‌লেই তবে ওর রসটা পুরোপুরি পাওয়া যায়। আমার মুস্কিল এই যে, যে-কবিতা নতুন লিখি তারই রস আমার কাছে তাজা থাকে, পুরোণো হলেই তার সুরটা আমার নিজেরই কাছে মোটা হয়ে আসে, আমি তাকে ঠিক সুরে পড়তে পারিনে। —আগামী রবিবারে কলকাতায় আমার একটা সভাপতির কাজ[৮] করতে হবে— তার পরদিন মঞ্জুর বিয়ে। তারপরে

মঙ্গলবারে শান্তিনিকেতনে গিয়ে জাহাজ ছাড়বার দুই একদিন আগে পর্য্যন্ত চুপ করে বসে চীনের বক্তৃতা[৩] লিখব। ইতিমধ্যে তুমি মনকে ঠাণ্ডা করে বেশ ভালো করে পড়াশুনো করে নিয়ো রাণু। আজ আর দেরি করলে ডাক ধরতে পারা যাবে না।

তোমার ভানুদাদা

১০
[১১মার্চ ১৯২৪]

[কলকাতা]

রাণু

কলকাতায় যখন শেষবার এসেছিলুম তখন তোমাকে শেষ চিঠি লিখেছিলুম। আজ আবার শান্তিনিকেতনে যেতে হবে আজ একখানি চিঠি লিখ্‌তে বস্‌লুম। তোমার সঙ্গে কথা ছিল যে তোমার চিঠি পেলে তবে তার উত্তর দেব, আজ তার ব্যতিক্রম করা হল তার কারণ বলি। কথা ছিল আমাদের জাহাজ ২৭শে মার্চ্চে ছাড়বে— তার পরে হঠাৎ শোনা গেল ২১শে মার্চ্চে । অর্থাৎ আর প্রায় সপ্তাহখানেকের মধ্যে। এই কয়দিন আমার সময় খুব অল্পই থাক্‌বে। আমাকে চেষ্টা করতে হবে চীনের জন্যে একটা লেকচার লিখ্‌তে। তা ছাড়া বিদায়ের পূর্ব্বে এই কয়দিন নানারকম কাজের আর নানারকমের লোকের ভিড় থাক্‌বে। সুবীর[১] এসেছে, তার কাছে শুন্‌লুম যে তোমাদের পরীক্ষা আগামী ৩১শে তারিখে। নিশ্চয়ই এতদিন নানা গোলেমালে তোমার পড়াশোনার পক্ষে অন্তরে বাহিরে নানা রকম ক্ষতি হয়েচে। এই কয় সপ্তাহ বিনা বিঘ্নে, মনকে শান্ত রেখে পরীক্ষার জন্যে ভালরকম করে প্রস্তুত হতে পার এই হলেই ভাল হয়। আমাকে চিঠি লেখবার জন্যে তুমি কিছুমাত্র ব্যস্ত হোয়ো না। যদি এর মধ্যে অল্প কিছু অবকাশ পাও এবং সহজেই লিখ্‌তে পার তাহলে ছোট্ট চিঠিতে তোমার যা কিছু মনের কথা বা গল্প বলবার আছে বল্‌তে পার। চিঠির আয়তন বড় হলেই যে বড় চিঠি তাকে বলে তা নয়। যে চিঠি সহজ স্বাভাবিক, যার ভিতর দিয়ে লেখকের কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পাওয়া যায়, যার ভিতরে মুখ চোখের ইঙ্গিত পর্য্যন্ত যেন প্রকাশ পায় সেই চিঠিই চিঠি। আসল কথা যখন দূরের লোক চিঠির ভিতর দিয়ে সাম্‌নের লোক হয়ে দাঁড়ায় তখনি চিঠির কাজ হয়। কিন্তু যখন কেবল কথা শোনা যায় গলা শোনা যায় না, হাতের অক্ষর দেখা যায় মুখের ভাব দেখা যায় না, তখন সে চিঠি মরা চিঠি। তোমার চিঠিতে তুমি ঠিক প্রকাশ পাও— তার কথা তোমাকে একটুও ছাপিয়ে ওঠে না। আমার চিঠি অনেক সময়েই কেবল রচনা মাত্র। তার কারণ হচ্চে এই, আমি অনেক সময়েই কিছু না কিছু বিষয় নিয়ে চিন্তা করি। এই যে এতকাল ধরে লিখে এসেছি সব লেখাতেই কিছু না কিছু বিষয় আলোচনা করেচি। এই জন্যে কলম হাতে লিখ্‌তে বস্‌লেই অভ্যাসক্রমে মানুষের চেয়ে বিষয়টাই বড় হয়ে ওঠে— তাতে করে চিঠিটা মারা যায়। সাধারণত মেয়েরা পুরুষদের [চেয়ে] ভাল চিঠি লেখে, তার কারণ, মেয়েরা আপনাকে প্রকাশ করে, পুরুষরা চিন্তাকে প্রকাশ করে। তুমি যখন যা' তা' নিয়ে গল্প করে যাও শুন্‌তে বেশ ভাল লাগে, কেননা সেই কথার ধারা তোমার প্রাণের ধারা। তোমার চিঠিও সেই রকম, তাই বল্‌ছিলুম, তুমি যতটুকু সহজেই লিখ্‌তে পার, তাই লিখো, যখন আমার সঙ্গে অল্প একটু সময়ের জন্যে কথা কয়ে নিতে ইচ্ছে হবে তখন লিখো। পড়াশুনো ফেলে তাড়াতাড়ি করে লিখ্‌তে যেয়ো না, তার বেশি লিখ্‌তে হবে তাও মনে কোরো না।

কাল সন্ধের সময় মঞ্জুর বিয়ে[২] হয়ে গেল। আজ সকালে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। বিয়ের কিছুদিন

আগে থাকতেই ওর কান্না সুরু হয়েচে। ওর কান্না দেখে বুঝতে পারি মেয়েদের পক্ষে প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাওয়া বল্‌তে কতখানি বোঝায়। স্বামীর উপর কতখানি ভালোবাসা থাক্‌লে এই বন্ধন ছেদনটা সহজ হয় তা ঠিক বুঝতে পারা পুরুষদের পক্ষে শক্ত। মঞ্জুর এই কান্নাটা নিশ্চয়ই ক্ষিতীশের মনকে খুব বেদনা দিচ্চে, তার মনে হয়ত সংশয় হচ্চে মঞ্জু তাকে যথেষ্ট ভালোবাসে কিনা। এই সংশয়ের উপর এই অনিশ্চয়ের উপরই মানুষের বড় বড় ট্র্যাজেডির পত্তন। আমরা জেনেশুনে যে সব দুঃখের সৃষ্টি করি তার জন্যে প্রস্তুত থাক্‌তে পারি। কিন্তু কেই বা ঠিক করে অন্যের মন বুঝতে পারে, আর নিজের মনই বা নিশ্চিত বোঝে ক'জন। এইরকম আলোআঁধারে নিজের অগোচরেই যতরকম উৎপাতের সৃষ্টি হয়। আমি অনেকবার ভেবেচি মঞ্জু ক্ষিতীশকে ঠিক কতখানি ভালোবাসে? এ তো ভালোবাসার মরীচিকা নয়? মঞ্জুই কি তা ঠিক বল্‌তে পারে? উপস্থিতমত সে কি একটা মনে করে নিয়েছিল, তার পরে তার সত্যের পরীক্ষা ধীরে ধীরে হতে থাকবে। কিন্তু মোটের উপর একথা বলা যায় যে, দুজন মানুষের মধ্যে যদি অত্যন্ত বেশি পার্থক্য না থাকে তাহলে ক্রমে ক্রমে সংসার-বন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের বন্ধনও পাকা হয়ে উঠ্‌তে থাকে। যখন পরস্পরের সুখ দুঃখ ও সাংসারিক ক্ষতিলাভকে একান্তভাবে অন্তরঙ্গভাবে আপন করে নিতেই হয় তখন তারই যোগসূত্র দু'জনকে ধীরে ধীরে এক করে' আনে। জীবনের সম্মিলন থেকেই হৃদয়ের সম্মিলন হতে থাকে। দুজনের সম্মিলিত জীবনের ঐক্যের ভিত্তির উপরেই সংসারের সৃষ্টি হয়। এই সংসারটিই হচ্চে মেয়েদের সৃষ্টিক্ষেত্র, এইখানেই তাদের সমস্ত শক্তি আপনাকে কল্যাণের মধ্যে সুন্দরের মধ্যে প্রকাশ করতে পারে বলে এইখানে যে-মানুষকে মেয়ে আপনার একমাত্র অংশীরূপে পায় তার মূল্য আপনিই তার কাছে বড় হয়ে ওঠে। মঞ্জু আজও তার নিজের সংসারটিকে সৃষ্টি করতে আরম্ভ করে নি বলেই তার মা বাপের সংসার ত্যাগ করে যেতে তার এত কষ্ট হচ্চে। কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে তার আপন জীবন দিয়ে তার সংসার সৃষ্টি করতে পারবে, সেই মুহূর্ত্তেই তার বাপমায়ের সংসার তার কাছে ছায়ার মত হয়ে যাবে।

এবারে এখনো তেমন বেশি গরম পড়ে নি। যদিও এখন বেলা দুটো, তবু হাওয়া তেতে ওঠে নি। বাতাসটি বেশ মিষ্টি হয়ে বইচে, বেশ লাগ্‌চে। তুমি ত আমার এখানকার শোবার ঘরটা জান। সেইখানে বসে লিখচি। সামনে আমার পশ্চিম দিক। গগনদের[৩] বাড়ির সাম্‌নেকার সেই নিম গাছটির পাতায় পাতায় রোদ্দুর ঝিলমিল করে উঠ্‌চে। এ কয়দিন বিয়ের গোলমালের অবসানে আজ ক্লান্তিতে সবাই ঘরে ঘরে ঘুমচ্চে— লাল বাড়িটার[৪] সামনে বাঁশের উঁচু মাচা করে' যে নহবৎখানা তৈরি হয়েছিল সেটা শূন্য এবং নিঃশব্দ পড়ে আছে— ছাদের উপর বাঁশের খুঁটির উপর পাল খাটিয়ে খাবার জায়গা করা হয়েছিল সে সমস্তই অত্যন্ত নিরর্থক ভাবে খাড়া আছে, কোথাও কোনো ব্যস্ততা নেই, জলের জালা, উদ্বৃত্ত কলাপাত, খুরি, উৎসবসজ্জার নানা ভগ্নাবশেষ আবর্জ্জনা হয়ে চারদিকে ছড়াছড়ি যাচ্চে। মিনু[৫] শ্রীমতী[৬] রেখা[৭] প্রভৃতি মঞ্জুর সখীরা পাশের ঘরে বৌমা[৮] আর মীরার[৯] সঙ্গে আলাপ আলোচনায় প্রবৃত্ত, পুপে[১০] তারও পরের ঘরটায় ঘুমচ্চে। কালকের ভোজের উচ্ছিষ্টের আকর্ষণে কাকের দল জড় হয়ে খুব কোলাহল বাধিয়ে দিয়েচে। শরীরটা অবসন্ন হয়ে আছে, কিন্তু এই শান্ত মধুর হাওয়ায় বেশ আরাম বোধ করচি। এইবার চিঠি বন্ধ করে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করা উচিত হবে। কাল অনেক রাত পর্য্যন্ত ঘুমোই নি। তুমি নিশ্চয়ই এখন তোমাদের কলেজে কোনো না কোনো লেকচারে মনোনিবেশ করে আছ— ঠিক এই সময়ে আমি যে তোমাকে চিঠি লিখ্‌চি একথা তোমাদের কল্পনা করবারও অবসর নেই।

ভানুদাদা

কাল ভোরের গাড়িতে শান্তিনিকেতনে যাত্রা করব।

১১

ওঁ

১৩ মার্চ ১৯২৪

[শান্তিনিকেতন]

রাণু,

আমাকে চীন থেকে যে নিমন্ত্রণপত্র[১] পাঠিয়েচে সে বোধহয় তুমি পড়ে দেখেচ। আমাকে ওরা কত আদর করে ডেকেচে আর আমার কাছে কত প্রত্যাশা করেচে। আমি তাদের এই প্রত্যাশা পূরণের যোগ্য কিনা জানিনে, কিন্তু স্পষ্টই ত দেখ্‌তে পাচ্চি আমার উপরে এই কাজেরই ভার পড়েচে। আমাকে দেশে বিদেশে একটা বাণী বহন করে নিয়ে যেতে হবে আমার উপরে সেই হুকুম। সে বাণী যে কার সে আমি অনেক সময়ে নিজেই ভেবে পাই নে। কেননা আমি ত ইচ্ছে করে ভেবে বলতে পারিনে। যেমন দক্ষিণের হাওয়ার মধ্যে যে অরূপ আনন্দ ভেসে বেড়ায় সেই আনন্দটি কেমন করে হঠাৎ বসন্তের লতার মধ্যে রূপ ধরে ওঠে তেমনি আকাশপথে যে অশ্রুত বাণী চলাচল করচে কেমন করে আমার অগোচরে সে আমার কথার মধ্যে স্বরগ্রহণ করে। সেই কথা আমাকে শোনাতে হবে এই হল আমার একমাত্র কাজ। এবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুবাবু[২] যখন আমাকে তিনটে বক্তৃতা[৩] করতে বল্‌লেন আমি কিচ্ছুই ভেবে পাইনি আমি কি বল্‌ব। যখন সেনেট হলে গিয়ে দাঁড়ালুম দেখ্‌লুম অত বড় হলে ঠাসাঠাসি ভর্ত্তি করে লোক বাইরের বারান্দায় পর্য্যন্ত ভিড় করে দাঁড়িয়েচে। সবাই বলে চার পাঁচ হাজার শ্রোতা হয়েছিল। মনের মধ্যে ভয় হল, কিছুই ত তৈরি হয়ে আসি নি; একটুক্‌রো কাগজে এক লাইনও নোট লেখা হয় নি। কিন্তু পালাবার পথ ত ছিল না। উঠে দাঁড়ালুম, যেমন করে হোক বলতে আরম্ভ করলুম। দেখি বলবার কথা ত আপনিই জুটে যাচ্ছে। সে সব কথা যেমন অন্যে শুন্‌চে তেমনি আমি নিজেও শুন্‌চি। সে ত আমারি বানিয়ে বলা কথা নয়। এর থেকে আমি এইটুকুমাত্র বুঝে নিয়েচি যে আমি বাণীর বাহন— কাজেই এই বাণী ছড়িয়ে দেওয়াই আমার কাজ— আমাকে চুপ করে থাক্‌তে দেবে না, আমি একটা জায়গায় বসে থাক্‌তেও পারব না। কাজেই চীন আমাকে ডাক দিলে তখন আমাকে চীনে যেতেই হবে। অথচ আমি যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলে একটা পদার্থের দিকে তাকিয়ে দেখি তখন দেখ্‌তে পাই সে ত বিশেষ কেউ একজন নয়। তাকেই যদি কিছু একটা বল্‌তে হত তাহলে সে নেহাৎ বোকার মত বল্‌ত। তার বিশেষ কিছু জানাশোনাও নেই। হয়ত জানাশোনার বোঝাই দিয়ে যদি তার মনের সমস্ত ফাঁক ভরা থাকত, তাহলে তার মধ্যে দিয়ে আকাশবাণীর ধারা বইত না। বাঁশির সমস্ত ফাঁকটা যদি সোনা দিয়ে বোজানো হয় তাহলে কি বাঁশি বাজে?

তোমাকে যে এই কথাটা আজ লিখ্‌চি তার মানে হচ্চে এই যে, আমি বল্‌তে চাই এতে তুমি আনন্দিত হও। তুমি বিধাতার উপরে ঈর্ষা কোরো না। বোলো না তোমার ভানুদাদাকে যদি নিজের কাজে তিনি দেশে বিদেশে ঘুরিয়ে না বেড়াতেন তাহলে হয়ত তুমি তাকে আরো অনেকটা সময় কাছে পেতে। কিন্তু সেই ফাঁকা ভানুদাদাকে কাছে পেয়েই বা লাভ কি? বিধাতার বরখাস্ত করা সেই ভানুদাদা ত নিতান্তই বাজে লোক। সে তোমাদের কারো পরিচয়েরই যোগ্য হত না। সেই দীপ্তিহীন বাজে লোকটাকে আমি জানি। সে হচ্চে সকাল বেলাকার আলো-নেবানো বাতি— নিতান্ত নিরর্থক। যাকে চীন ডেকেচে, আমার মধ্যে তাকে দেখে তুমি খুসি হও, রাণু। চীন আমাকে না ডাক্‌লে বেশ হত এমন কথা তুমি মনে মনেও বোলো না। আমাকে খর্ব্ব করে' তাতে ত তোমার লাভ নেই— বরঞ্চ তাতে তোমার ভানুদাদার অনেকখানিই বাদ গেল বলে তোমার সেটা লোকসান। আমাকে পৃথিবীতে কেবল একমাত্র যদি তুমিই পেতে তাহলে ত তুমি ঠক্‌তে—কেননা পৃথিবীর সেই একঘরে' হতভাগার মূল্যই বা কি। তোমার কাছে থাকার দ্বারাই তুমি যে আমাকে বেশি পাবে সে

তোমার ভুল। আমাকে জগতের লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পাও যদি তাহলেই তুমি সবচেয়ে বেশি পাবে। আমি নিজে যখন কুঁড়েমি করে' আমার বারান্দার কোণ আঁকড়ে পড়ে থাকি, তখন অনেক সময় নড়তে গা লাগে না— ইচ্ছে করে এইরকম প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকি। তার প্রধান কারণ, সেই ছোট আমিটা যে কত বড় অভাজন তা' আমি জানি— মনে কিছুতেই বিশ্বাস হয় না জগতের বড় ক্ষেত্রে সে কিছুই করতে পারবে— ভয় হয় যে, এবার তার ফাঁকি ধরা পড়বে। তাই ইচ্ছে করে চুপ করে' নিজের কাছে নিজে পড়ে থাক্‌তে। কিন্তু হঠাৎ পেয়াদা এসে জোর করে আমাকে জনসভায় নিয়ে আসে— তখন নিজের মধ্যে পূর্ণকে দেখে বিস্মিত হই। তখন বলি, ফাঁকি ত দেখ্‌তে পাইনে, ভয় কিসের। নিজেকে সেই সার্থক করে দেখার আনন্দ খুব বড় জিনিষ— তাতেই জীবনের সব গ্লানি চলে যায়, ছোট আমিটার সব অপরাধ মোচন হয়। তুমি যদি ভানুদাদাকে ভালোবাসো তাহলে তার এই সার্থকতাকে তুমি অভিনন্দন কর— যাতে সে সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে সঙ্কুচিত হয়ে, ক্ষুদ্রতার ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে, অবসন্ন হয়ে না থাকে সেই কামনা কর। যে কর্ম্ম সত্যই আমার, সেই কর্ম্মেই আমার মুক্তি— সেই মুক্তির মধ্যে যখন আমি নিজেকে দেখি তখনই আমার জীবনের আকাশ প্রসন্ন হয়ে ওঠে— আমার জীবনের সেই প্রসন্নতায় তোমার চিত্ত প্রসন্ন হোক— আমার সঙ্গ পাওয়ার চেয়েও তাতে তুমি আমাকে অনেক বেশি করে পাও এই আমি কামনা করি।

অনেক রাত হল। ইতি ৩০. ফাল্গুন ১৩৩০

ভানুদাদা

১২

১৫ মার্চ ১৯২৪ [শান্তিনিকেতন]

রাণু

তুমি হয়ত ভাবচ এতক্ষণে আমি কলকাতায়। কারণ জাহাজ ছাড়বার সময় কাছে আস্‌চে। কিন্তু এখনো আশ্রম আঁকড়ে আছি। পর্শু মঙ্গলবার[১] বিকেলের গাড়িতে কলকাতায় যাত্রা করব। ইতিমধ্যে এখানে বসে যতটা পারি চীনের লেকচার লেখবার ইচ্ছে আছে। তোমাদের সেই দোতলার ঘরের জানলার কাছে বসে তার প্রথম কয়েকটা পাতা লিখেছিলুম। মনে আছে তোমাকে ঘর থেকে কতবার তাড়া করেচি। কিন্তু খুব বেশিবার নয়। কেবল চার পাতা মাত্র লিখেছিলুম— তার বেশি আর এগোতে দাও নি। তুমি যেমন, তেম্‌নি তোমার একটি জুড়ি আছে সে থাকে আমার মস্তিষ্কের ভিতরে— সেটি হচ্চে আমার কবিতা, আমার গান। সেও যখন জানে আমি চীনের লেকচার লিখ্‌তে বসেচি অমনি বন্ধ দরজা ঠেলে ডাক দেয় "কবি।"— আমি বলি, "থাক্, এখন থাক্, ব্যস্ত আছি।" সে আবার বলে, "কবি, একবার দরজা খোলো, আমি একটুখানি থেকেই চলে যাব।" তখন দিই দরজাটা খুলে— তারপরেই সে আমার মনটি দখল করে বসে, আর গুন্‌গুন্ তার গুঞ্জন চল্‌তে থাকে। সে তার কথা রক্ষা করে, একখানা গান হতেই সে চলে যায়। কিন্তু চলে গেলে হবে কি, মাথার মধ্যে গুন্‌গুন্ থামতে চায় না— চীনের লেকচারটার আর উপায় থাকে না। আসল কথা, বসন্তের আরম্ভকালে এইসব গম্ভীর কাজ করা বড় শক্ত। অন্য সময়ে যে পাগলটাকে ভদ্রতার ছদ্মবেশে প্রচ্ছন্ন করে রাখি, এই সময়টা সে আর বাঁধন মান্‌তে চায় না। সে বলে আমি অত্যন্ত ভদ্রলোকটির মত আমার কর্ত্তব্য কাজ করব না, চিঠি পেলে চিঠির জবাব দেব না, লোক দেখা করতে এলে মধুর স্মিতহাস্যে তাকে অভ্যর্থনা করব না, নীলমণি যখন এসে বল্‌বে স্নানের ঘরে গরম জল দিয়ে এসেচি তাকে

তাড়া করে যাব। কিন্তু পাগলটাকে তার অজ্ঞাতবাস থেকে ছুটি দিয়ে একেবারে ছাড়া দিতে সাহস হয় না। তাহলে সভ্যলোকেরা অবাক হয়ে যাবে, বলবে, রবিঠাকুরের এই দশা? কাজেই জামার সবকটা বোতাম আঁটবার চেষ্টা করি, আর, কি কি উপায়ে মানুষের সদগতি হয় সেই সাধুপ্রশ্ন কেউ জিজ্ঞাসা করলে, খুব গম্ভীরভাবে তার সদ্যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিয়ে থাকি। এইগুলোই হচ্ছে নিজের যথার্থ পরিচয় গোপন করা— কবিঠাকুরকে রবিঠাকুর করে প্রমাণ করা।

আজ নির্জ্জন মাঠের উপর জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েচে। বেশ মধুর হাওয়াটি দিচ্চে। শালবীথিকায় ডালে ডালে শালের মঞ্জরী ধরেচে— চল্‌তে চল্‌তে এখানে ওখানে হঠাৎ তার গন্ধে চমক লাগিয়ে দেয়। যখন সমুদ্রে পাড়ি দিতে থাকব তখনি চাঁদ পূর্ণিমায় গিয়ে পৌঁছবে। নীল সাগরের উপর শুক্লরাত্রি খুব মধুর বটে— কিন্তু তবু, জ্যোৎস্না সেখানে যেন বিধাতার মত। বড় বেশি নিরলঙ্কার, বড় বেশি নিঃসঙ্গ— সেখানে চাঁদ যেন তপস্বী শিবের ললাটের চাঁদের মত। গাছের ছায়াটি না হলে জ্যোৎস্নার ঠিক জুড়ি যেন মেলে না। সেই যেন শ্যামের সঙ্গে রাধার মিলন।

মিস্ গ্রীন[৩] এবারে দেশে চলে যাচ্চে। আমাদের সঙ্গে চীন পর্য্যন্ত যাচ্চে। তার পরে যাবে আমেরিকায়। আজ তার বিদায়ের অনুষ্ঠান হ'ল। লাইব্রেরি ঘরের বারান্দার পরে আলপনা কেটে, ফুল দিয়ে সাজিয়ে, শাঁখ বাজিয়ে, মেয়েদের হাতে তাকে বরণ করিয়ে দামী একটি ময়ূরকণ্ঠী সিল্কের শাড়ি অর্ঘ্য দিয়ে বেশ একটু ধুমধাম করা হল। মেয়েরা গাইলে, "ভরা থাক্ ভরা থাক্" ইত্যাদি। শেষে একটা গান গাওয়ানো হল, তার আরম্ভটা হচ্চে এইরকম—

"পাগল যে তুই, কণ্ঠ ভরে' জানিয়ে দে তাই সাহস করে।"[৪]

ওটা আর কিছু নয়, নিজের পরিচয়টা ঘোষণা করে দিলুম।

আজ বোধ হয় অন্যদিনের চেয়েও বেশি রাত হয়েচে। আমার মগজটা ভিজে স্পঞ্জের মত ঘুমে একেবারে অভিষিক্ত হয়ে আছে। তাহলে এবারে শুতে যাই। কিন্তু দেখেছি শুয়েও ক্লান্তির অবসাদটা যেতে চায় না— ক্লান্তি আমার মেরুদণ্ডটার উপর ভর দিয়ে দিনরাত আমার সঙ্গ নিয়েচে। হয়ত জাহাজ চড়ে সমুদ্রের হাওয়ায় তাকে বিসর্জ্জন দিতে পারব। ইতি ২ চৈত্র ১৩৩০

ভানুদাদা

রাণু অধিকারী রবীন্দ্রনাথকে

[১০-১১ জুলাই ১৯১৮]

প্রিয় রবিবাবু,

এখন গাড়ী চল্‌ছে। আমি খুব কাঁদছি। আপনার জন্যে খুব মন কেমন করছে। আপনি বোধহয় এখন নাইছেন। এখন একটু ২ মেঘলা একটু ২ রোদ। দুটো ছোট ২ ইষ্টিষান পার হয়েছি। আপনার কাছে যেতে ইচ্ছে কর্‌ছে। এখানে গাড়ী খালী। খুব কাঁপছে গাড়ী। এই এখনি একটা ছোট ইষ্টিষানে গাড়ী থাম্‌ল। এই আবার চল্‌ছে। আমার আবার খুব কান্না পাচ্চে। দুধারে জলে ভরা খেত আর মাঠ।

খানিকক্ষণ পরে লিখছি। আপনার নাওয়া হয়ে গেছে কে চুল আঁচড়ে দেবে আপনাকে। একটা ইষ্টিষানে গাড়ী থেমেছে অনেক মেয়ে বউ দেখলাম। আমাদের গাড়ী খালী আছে।

আপনার এখন খাওয়া হয়ে গেছে। রোজ বিশ্রাম কর্‌বেন্। একটুও ভাল লাগ্‌ছেনা। চুপ করে বসে আছি। গাড়ী খুব নড়্‌ছে।

রামপুরহাট। বেশী লোক নেই। কতকগুলি মেয়েমানুষ নথ পরে গেলেন। আমি চুপ করে বসে। সামনেই একটা ইঞ্জিন মালগাড়ীর ওপর। আপনি বোধহয় এখন বিশ্রাম কর্‌ছেন। নলহাটীতে গাড়ী থাম্‌ল। একজন খুব মোটা বাঙালী মেয়েমানুষ গাড়ী উঠ্‌লেন। বাবজাদের[১] গাড়ীতে।

চাৎরা। আপনি কি কর্‌ছেন এসময়। মন কেমন কর্‌ছে।

বাজগাঁও। হিন্দুস্থানী গ্রাম সুরু হল। বাড়ীর টাইলের ছাত্। লোক প্রায় উঠ্‌লই না। প্রায় মেঘ্‌লা। সবুজ মাঠ। আর জলে ভরা খেত্ তার পেছনে জঙ্গল।

পাকুড়। এখানে নথ পরা মেয়েমানুষটী নাম্‌ল। এটা একটু বড় ইষ্টিসান। আর একজন নথ পরা মেয়েমানুষ প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। আমার সন্ধ্যেবেলা ভাল লাগ্‌বে না। আপনারও বোধহয় ভাল লাগ্‌বে না।

বারহাবরা। এটা বেশ বড়। অনেক লোক। কতকগুলি ক্রিশ্চান সাঁওতালী মেয়ে গাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে। একপাশে একটা বড় পুকুর রয়েছে। তার চারিধার গাছে ঢাকা। খুব সুন্দর দেখতে। এখন মেঘলা। আমি এতক্ষণ আপনার কথাই ভাবছিলাম, দূরে একটু ২ সবুজ পাহাড় দেখা যাচ্ছে। গাড়ী দুটো পাহাড়ের ভেতর দিয়ে গেল।

তিন পাহাড়। এখানে একটা পাহাড়ের তলায় কেমন একটা হিন্দুস্থানী গ্রাম। এখন পাঁচটা বেজেছে। আপনার বোধ -হয় লেখাপড়া এখুনি শেষ হল। যদি কিছু সভা হয় তো বেশী জোরে লেক্‌চার দেবেন না।

সাহেবগঞ্জ। এ ইষ্টিসানটা তো বেশ বড়। আমাদের সাম্‌নে টিকিট্ কলেক্টার দাঁড়িয়ে। তাকে দেখে খুব হাঁসি পাচ্চে। এখনো আমাদের গাড়ীতে কেউ আসেনি। আমাদের গাড়ীর সামনে কল। সবাই জল খাচ্ছে। এখন আপনি বোধহয় খাচ্ছেন। আজ সন্ধ্যেবেলা তো আমি আর আস্‌ব না আপনি বোধহয় সভা কর্‌বেন। এবার যেদিন ছাতে বস্‌বেন সেদিন নিশ্চয় আপনার আমার জন্যে মন কেমন করবে। আপনি একলাটী চুপ করে বসে থাক্‌বেন।

কহলগ্রাম। এখানে একটা গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল। সেটা রাত্তির ১/২ টায় বোলপুর পৌঁছোবে। এখনো মেঘলা। দুধারে উঁচু ২ ঘাস। খানিকক্ষণ আগে আমরা সব জলখাবার খেয়েছি। আমি অনেক খেয়েছি। আপনিও বেশী করে দুধ খাবেন। গাড়ীতে কারোর সঙ্গে কথা হয়নি।

সবৌরএ একটা কলেজ দেখ্‌লাম। তার পাশে মাঠে ছেলেরা খেল্‌ছে দেখলাম।

ভাগলপুর। এ ইষ্টিসানটা খুব বড়। বাব্‌জা খাবার কিন্‌ছেন। একজন লোক সেজেগুজে গলায় মালা দিয়ে

আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আম কিনছে।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। ক্রমে অন্ধকার হচ্চে। সব্বাই বলছেন এখন শান্তিনিকেতনের কথা মনে আস্‌ছে। এসময়েই তো আমার সবচেয়ে বেশী আপনার জন্যে মন কেমন কোর্‌বে। কাশীতে গিয়েও কোর্‌বে।

একটা ছোট্ট টনেলের ভেতর গাড়ী গেল। এইবার জামালপুর আস্‌বে। কে জানে কেন হটাৎ বনে গাড়ী থাম্‌ল। আবার চল্‌ছে। অন্ধকার। এখন রাত ৮/৯, আপনি বোধহয় ছাতে কিম্বা কোণের বিছানায় শুয়ে।

জামালপুর। কাল এসময় আপনি গান গাইছিলেন। আমার এখানে ভাল লাগ্‌ছে না। তাইত কাঁদছি। এবার শুতে যাচ্ছি কিন্তু ঘুম হবে না।

রাত ২/১। রাত্তিরে খুব বৃষ্টি হচ্চে। আমার ঘুম আস্‌ছেনা। আপনি এখন বোধহয় ঘুমুচ্ছেন।

আরায় ভোরে গাড়ী পৌঁচেছে। অনেক ঘুমটা পরা হিন্দুস্থানী মেয়ে নাম্‌ল। তারা সব কা কী, না নী সে এইসব বোলে ঝগড়া বাধিয়েছে। আমার গাড়ীতে একটুও ভাল লাগেনি। আপনার কাছে যেতে [ইচ্ছে] করছে। এ চিঠিটা মোগলসরাএ ফেল্‌বো। কাশী গিয়ে কি হল আর একটাতে লিখ্‌ব। দেখুন আপনাকে কত বড় চিঠি দিলাম। আমাদের ঠিকানা ২৩৫ অগস্ত কুণ্ড। দেখ্‌বেন যেন ২৩৫, ৩২৫ কিম্বা ৫৩২ না হয়। আর অগস্ত কুণ্ডটা যেন না ভুলে যান। কেমন বুঝলেন ত।

চারপাতা হয়ে গেছে। আর আঁটছে না।

রাণু। দেবী নয়

পুঃ সকাল বেলা ৯টা। এখন আপনি ছেলেদের পড়াচ্ছেন। আমার পড়তে ইচ্ছে করছে।

২

[জুলাই ১৯১৮]

কাশী

প্রিয় রবিদাদা

কাল আপনার চিঠি পেয়ে খুসী হয়েছি। অন্যদিন খুলে সকালে তার উত্তর দী কিন্তু আজ থেকে morning ইস্কুল ছিল। ভোর পাঁচটায় উঠেই ইস্কুলে গেছি। আর যখন ফিরে এলাম তখন ডাক চলে গেছে। তাইজন্যে দুপুরবেলা প্রায় বিকেলে লিখছি। আপনাকে আর ও কাগচে চিঠি দিতে হবে না। ওর রঙ বেশ কিন্তু কাগচ তো ছোট্ট। ওতে আর দিতে পাবেন না। আপনি ও রকম দুটোতে কেন দেন না। আপনার চিঠি লিখতে খুব বেশীক্ষণ লাগে না। আমি যে বুধবার দিন[এলাম] আপনি কি করছিলেন আমাদের যাবার দিন, তাই ভাবছিলাম।

আর শুনুন আপনি কেন আবার দুষ্টু হয়েছেন। বেশী দুষ্টুমি কর্‌লে আপনার সঙ্গে আড়ি করে দেব। বৌমা আমাকে একটা চিঠি দিয়েছেন। তাতে লিখেছেন যে আপনি খুব জোরে গান করেন, দুধ খেতে চাননা। আর ভাল করে চুল আঁচড়ান না। কেন আপনি এইসব করেন। আবার লিখেছেন দিনুবাবুর মতন মোটা হবেন।[১] আপনি যদি আরো দুষ্টুমি করেন তো আপনার সঙ্গে একেবারে আড়ি করে দেব। রবিদাদা বল্‌ব না আর রবিবাবু বল্‌ব। তখন বেশ হবে। এই দেখুন, এক্ষুনি আমি দুধ খেলাম। প্রায় সবটা। আপনার চাইতে আমি ঢের লক্ষ্মী। আপনি লিখেছেন আমি দুধ খেলে আপনি খুসী হন কিন্তু আপনি কেন খাননা।

আপনার জন্যে আমার খুব মন কেমন করে। সন্ধে বেলায় ভক্তি[২] খেলা করে আমার কিন্তু ভাল লাগে না। আপনি নিশ্চয় সে সময় চেঁচিয়ে ২ গান করেন। আর কর্‌তে পাবেন না। সে সময় তারার গল্প

ভাব্‌বেন। কেমন। আমি পূজোর সময় গিয়ে আপনাকে একটা তোড়া বেঁধে দেব। মালীর চাইতে তোড়াটা ঢের ভাল হবে। আমিও একটা খুব সুন্দর মালা আপনাকে গেঁথে দেব। আচ্ছা শুনুন্ আমি যখনি আপনার কথা ভাবি তখনি কি আপনার গায়ে হাওয়া লাগে? কি ভাবি বুঝতে পারেন? সেই হাওয়া আপনার কেমন লাগে। দেখুন রোদ কমে গেছে বিকেল হয়েছে। লু বন্দ হয়েছে প্রায়। আপনি যে ছবিটা এঁকেছেন সেটা বেশ সুন্দর হয়েছে, সেটা কার? মঞ্জুলিকার? আপনি তো বেশ ছবি আঁকেন। শেখেন না কেন। আমি যে ছবিটা পাঠিয়েছি সেটা কেমন হয়েছে লিখ্‌বেন। দেখুন আমি আপনার চাইতে বড় চিঠি লিখেছি আর একটুও ধরে ২ লিখিনি। আজ কেমন একটা খাতা ছেঁড়া কাগচে চিঠি লিখ্‌ছি। কেমন হয়েছে। বুধবারে উপাসনার পর এ্যানড্রুস জ্বালাতন করেন নি। উনি যদি আপনাকে বেশী ঘরে বাইরে করান তো ওঁকে বল্‌বেন যে আমি আর কখনো ওঁর কাছে পড়্‌ব না। রাণু

৩

[২৭-২৮ জুলাই ১৯১৮]

[কাশী]

প্রিয় রবিদাদা

এখন অনেক রাত্তির হয়ে গেছে। আশা[১] আলো জ্বেলে বসে পড়্‌চে। আর আমি সাম্‌নে বসে চিঠি লিখ্‌চি। আর [আজ] দুপুর বেলা আপনারে চিঠি[২] পেয়েছি। তখন আমি অঙ্ক কস্‌ছিলাম্। আপনার চিঠি পেয়ে খাতা টাতা বন্ধ করে একটা ঘরে গিয়ে প্রথমে পড়লাম। আপনার এ চিঠিটা সব চাইতে বড় কিন্তু আমার কেমন লাগ্‌ল। খুব সুন্দর। আমি প্রথমে চিঠি বুঝতে পারিনি। কিন্তু শেষে বুঝতে পারলাম। আপনি বলেছেন আমি বুঝতে ভাল করে পারবনা। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি লিখেছেন আমি খুব ভাল হলে আপনি আমায় বেশী ভাল বাস্‌বেন। পূজোর সময় আপনি দেখ্‌বেন্ যে আমি ভাল হয়ে গেছি। আগের চাইতে। আমি যখন আপনার চিঠি টিঠি লিখে দেব তখন দেখ্‌বেন আমি ভাল হয়ে গেছি। আর আপনি আমায় রাণু সুন্দরী বল্‌তে পাবেন্ না। বেশ্ হবে। তখন আমায় আপনি বৌমার[৩] মতন বেশী ভালবাস্‌বেন্। হ্যাঁ। আজ আমি সন্ধ্যেবেলা বর্ষশেষ[৪] কবিতাটা মুখুস্ত করছিলাম। আমার এটা খুব শিগ্গির মুখুস্ত হয়ে যাবে। বেশ্ মজা হবে। আশা কাল বোর্ডিঙে যাবে। মন কেমন করছে। এরা সবাই শুয়েছে। আমিও শুতে যাই। হ্যাঁ।

আপনি বোধহয় এখন ছাতে চুপ করে বসে আছেন আর ঠাকুরকে ভাবছেন।

রাণু।

সকাল বেলা লিখ্‌ছি। আজ কিনা রবিবার তাই ইস্কুলে যাইনি। তাই সকাল বেলা চিঠি লিখ্‌ছি। এখন বেশ মেঘ্‌লা।

আমি আপনার চিঠি আবার পড়েছি। আপনি বুঝি ভাবেন আমি শুধু আপনার চুল আঁচড়াতেই ভালবাসি। আপনার চাইতে। তবে আপনিও বুঝতে পারেন নি। আমি আপনার চিঠি এবার থেকে রোজ পড়্‌ব। আপনি কি যাকে ভালবাসেন তারাই খুব ভাল? আমিও তো ভাল হয়ে যাব।

রাণু

আপনি কি করে জান্‌তে পার্‌লেন আমি আপানাকে গম্ভীর বুঝ্‌তে পারিনা। আপনার উপাসনার সময় আমার আপনাকে খুব ভাল লাগ্‌ত। আপনি আপনার ঠাকুরের যে কাজ করেন আমিও সেই সব করব। আমিত আগেই বলেছি। আমিও আপনাকে সাহায্য কর্‌ব। তখন আপনাকে বেশী কাজ কর্‌তে হবে না। আমি

বেশীর ভাগ কাজ করে দেব। তখন আমি বেশী ভাল হব তাই ঠাকুরের পূজোও বেশী ভাল হবে। তখন বেশ্। আমি আর আপনার ওপর রাগ কর্‌ব না। ভাল হব কিনা তাই আর বৃহস্পতি বারে থেকে পশুপতির কাছে গান শিখ্‌ব। হ্যাঁ। পশুপতি বলেছে।

আপনাকে আমি চুমু দিচ্ছি। আপনার কাছে যেতে খুব ইচ্ছে করে। ভাবি।

রাণু

আপনি বেশী করে খাবেন। কেমন? লক্ষ্মী হবেন।

রাণু

৪

[অক্টোবর ১৯১৮]

[মুক্তেশ্বর]

রাণুর ভানুদাদা,

পরশু থেকে আমার অসুখ হয়েছিল। তাই কাল সকালে বিছানায় শুয়ে ছিলাম, এমন সময় ভক্তি আপনার চিঠি[১] এনে দিল। আপনার চিঠি পেয়ে খুব খুসী হোলাম। এবারে কিন্তু আপনি দেরীতে চিঠি দিয়েছেন। আজ আমি কাল্‌কের চাইতে ভাল আছি। আমি কালই আপনার চিঠির উত্তর দিতাম কিন্তু খুব দুর্ব্বল ছিলাম বলে মা বারণ করেছিলেন। কাল বিকেলে এখানে খুব মেঘ করে বিষ্টি হয়েছিল। আমি তখন বিছানায় কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়েছিলাম। এমন সময় ছড়্‌ছড়্ কোরে ছোট ২ শিলা বিষ্টির সঙ্গে পড়্‌তে লাগ্‌ল। ভক্তি শিলা কুড়ুচ্ছিল। আমি কম্বল ছেড়ে [দৌড়ে] বাইরে গেলাম। গিয়ে দেখি সামনে ফুলের গাছএর তলায় ছোট ২ শিলা পড়েছে। আর বারান্ডায় এসে পড়ছে। মা কিন্তু দেখুন জোর কোরে ঘরে সেই বিছানায় শুইয়ে দিলেন। তখন এমন রাগ হচ্ছিল যে কি বলি। তারপর মাকে অনেক বলে জানলার কাঁচ দিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম্। তখন সামনের ফুলের গাছের তলা শাদা হোয়ে গেছে আর সব গাছ নুয়ে পড়্‌ছে, এমন সুন্দোর দেখাচ্ছিল।

আমি যখন আপনাকে প্রথম চিঠি লিখেছিলাম তখনও আপনি আমার কাছে নিতান্ত কেবল মাত্র রবিবাবুই বুঝি ছিলেন! তখনও আমি আপনাকে ভালবাস্‌তাম। কিন্তু তখন্‌কার চাইতে এখন বেশী ভাল বাসি। আমি আপনাকে তো আর ইংরেজি কায়দায় প্রিয় লিখিনি। প্রিয়র বাঙ্‌লা মানে যা হয় তাই লিখেছি। আমি আর কাউকে প্রিয় লিখিও না। আপনি তো কবিতায় অনেক প্রিয় লেখেন, আমি লিখলেই বুঝি যত দোষ। আমি প্রিয় যে চিঠি লেখ্‌বার পাঠ তা জানিও না আপনাকে প্রিয় লাগে বলেই লিখি। আপনি ঠাকুরকে যেমন প্রিয় বলেন, আমিও আপনাকে তেমনি প্রিয় বলি।[২]

ডালহৌসি পাহাড় বুঝি খুব সুন্দর। ওখানে আমার যেতে খুব ইচ্ছে করে। বক্রটা নামটা কি মজার। যেন মার্ত্তণ্ডর[৩] বোন। দেখুন পাহাড়ের গাছগুলো সত্যিই বড় হয়। দেখ্‌লে বড় ভয় করে। এখানে আমরা একটা জঙ্গলে বেড়াতে যাই। সেই জঙ্গলে এত ওক গাছ যে তার ভেতরটা অন্ধকার। সেখানে রাত্তিরে অনেক চিতাবাঘ আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড Stag আসে। এখানে রাত্তিরে বারান্ডায় বার হতে নেই। বাঘ আসে। আমরা বিকেলে সেই বনে একটা প্রকাণ্ড পাথরের উপর বসি। তার সামনেটা খোলা অনেক দূর দেখা যায়। সেই পাথরের সাম্‌নেটা খুব ঢালু। সেই ঢালু দিক্ দিয়ে ওঠা নামা খুব শক্ত। আমাতে ভক্তিতে সেখানে ওঠানামা খেলা করি। খুব মজা হয়। আপনি যদি আস্‌তেন তো আপনাকে নিয়েও খেলা কোরতাম্। পাহাড় আমার বেশ লাগে। আপনার কেমন লাগে? আপনি আমার আদর জানবেন। আর চুমু।

রাণু

শ্রীমতী রাণু অধিকারী(মুখোপাধ্যায়)কে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র ও তাঁকে লেখা রাণুর পত্র বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ থেকে 'চিঠিপত্র'-এর একটি খণ্ডে প্রকাশিত হবে। তারই মধ্য থেকে উভয়ের কয়েকটি অপ্রকাশিত চিঠি এখানে সংকলিত হয়েছে। বালিকা রাণুর চিঠিগুলি তারিখহীন। বিষয়বস্তু ও রবীন্দ্রনাথের চিঠির সঙ্গে মিলিয়ে পত্রের কালানুক্রম নির্ধারিত হয়েছে। উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথের চুয়ান্নটি চিঠি সম্পূর্ণ বা খণ্ডিত আকারে 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' নামে চৈত্র ১৩৩৬-এ প্রকাশিত হয়েছিল। উভয়ের চিঠির বানান মূলানুগ রাখা হয়েছে।

টীকা

রবীন্দ্রনাথের পত্র :

পত্র ১।। ১. দ্রষ্টব্য রাণু অধিকারীর লেখা প্রথম পত্র।

২. চার্লস ফ্রিয়ার অ্যান্ডরুজ (১৮৭১-১৯৪০)।

৩. 'ঘরে-বাইরে' সবুজপত্র পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে মুদ্রিত হয় বৈশাখ-ফাল্গুন ১৩২২ দশটি সংখ্যায়, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩২৩ (১৯১৬) সালে। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর -কৃত উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদ 'A Home and Outside' নামে *The Modern Review* (Jan-Dec 1918) পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে মুদ্রিত হয়ে *The Home and the World* নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (১৯১৯)। এই চিঠি থেকে জানা যায়, অ্যান্ডরুজের অনুলেখনে রবীন্দ্রনাথও মুখে মুখে উপন্যাসটি তর্জমা করেছিলেন, কিন্তু এটির কোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি।

৪. অসুস্থ পিতার সঙ্গে রাণু প্রথম শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন ৪ জুন ১৯১৮ (২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ তারিখে; ২৩ জ্যৈষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন : 'আমার সেই বালিকা বন্ধুটি এখানে এসে জুটেচে, আমার দিন বেশ কাটচে।' মাসাধিককাল সেখানে থেকে রাণু পিতার কর্মস্থল কাশী রওনা হন ১০ জুলাই বুধবার (২৬ আষাঢ়) বিকালের ট্রেনে। সেই ভ্রমণের বিবরণ রাণুর প্রথম পত্রটিতে পাওয়া যাবে।

৫. বেণুকুঞ্জ — বর্তমান গৌরপ্রাঙ্গণের দক্ষিণ-পশ্চিমে বাঁশবনে ঘেরা একটি খড়ের আটচালা বাড়িতে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রমুখ অনেকেই বাস করেছিলেন। বাড়িটি অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে গেলে বর্তমানে পুরোনো বাড়ির আদলে পাকা বাড়ি তৈরি করা হয়।

৬. শান্তি অধিকারী(গঙ্গোপাধ্যায়), রাণুর মধ্যমা ভগিনী; ইংরেজিতে এম. এ., রেল-ইঞ্জিনিয়ার কেশবলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহ হয়।

৭. দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮২-১৯৩৫), রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র, তাঁর 'সকল গানের ভাণ্ডারী'।

৮. আশা অধিকারী (আর্যনায়কম) রাণুর জ্যেষ্ঠা ভগিনী; পরে বিশ্বভারতীর কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হন।

৯. ভক্তি অধিকারী (প্যাটেল), রাণুর কনিষ্ঠা ভগিনী; গুজরাতি ব্যবসীয় চিন্ময় প্যাটেলের সঙ্গে বিবাহ হয়।

১০. বাবজা— রাণুর পিতা কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ফণিভূষণ অধিকারী।

১১. পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী (১৮৯৩-১৯৬৯)।

১২. রাণুর মাতা সরযূবালা অধিকারী।

পত্র ২।।১. ৭ শ্রাবণ ১৩২৫ একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'তুমি ত পাঁচটার সময় উঠেই স্কুলে দৌড়ও কি খাও, কখন্ খাও, এবং কতটুকুই বা খাও? তবু আমার খাওয়া নিয়ে তুমি আমার সঙ্গে ঝগড়া কর? দেখ্‌চি তোমার ঝগড়াটে স্বভাব।'

২. দ্র রাণুর লেখা ২-সংখ্যক পত্র।

৩. রাণু একটি চিঠিতে লিখেছিলেন: 'আমি রোজ ইস্কুল থেকে এসে রঙ দিয়ে ছবি আঁকি। কিছুদিন পরে যখন আরো ভালো করে আঁকতে পারব তখন আপনার একটা রঙ দিয়ে ছবি এঁকে পাঠিয়ে দেব।

আপনার কাপড়ের রঙ আঁকব লাল আর চুল কর্ল করে দেব। তার বয়স হবে সাতাশ।' আর একটি চিঠিতে লেখেন : 'হ্যাঁ শুনুন্ কেউ বয়েস জিজ্ঞেস করলে বল্‌বেন্ সাতাশ।' রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে এই বয়স নিয়ে অনেক কৌতুক করা হয়েছে। 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' গ্রন্থে এ নিয়ে একটিপাদটীকাও আছে : 'ভানুসিংহের বয়স যে সাতাশ বছরে এসে চিরকালের মতো ঠেকে গেছে, বালিকার এই একটি স্বরচিত বয়ঃপঞ্জীর বিধান ছিল।'

৪. দ্র রাণুর লেখা ৩-সংখ্যক পত্র।

পত্র ৩।। ১. কিছুদিন থেকে রাণুর পিতা খুবই অসুস্থ ছিলেন, তাই বায়ুপরিবর্তনের উদ্দেশ্যে তিনি পরিবারের কয়েকজনকে নিয়ে আলমোড়া যাবেন, রাণুর চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ সেই খবর পেয়েছিলেন।

২. রবীন্দ্রনাথের 'অনুবাদ চর্চা' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ডের 'গ্রন্থপরিচয়'-মতে '১৯১৭ খৃষ্টাব্দে (১৩২৪ বঙ্গাব্দে)'। কিন্তু আমাদের ধারণা, গ্রন্থটি পরের বৎসরে প্রকাশিত হয়, অন্যতমা অনুবাদিকা, প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সীতা দেবী সেপ্টেম্বর ১৯১৮-এর বিবরণে লিখেছেন: 'এই সময়ে তিনি [রবীন্দ্রনাথ] ম্যাট্রিক ক্লাসের ছেলেদের জন্য একটি তর্জমার বই তৈয়ারি করিতে আরম্ভ করিলেন। নিজে নানা ইংরেজি মাসিক পত্র ও পুস্তক হইতে খানিকটা করিয়া জায়গা দাগ দিয়া দিতেন, আমাদের অনেকের উপর ভার ছিল সেগুলি সহজ বাংলায় রূপান্তরিত করা।' ('পুণ্যস্মৃতি', ১৩৭১, পৃ , ১৮৮) এই কাজের সূচনা আরও আগে ; ৫ শ্রাবণ ১৩২৫ (২১ জুলাই ১৯১৮) রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখেছিলেন: 'ছেলেপড়ানোর কাজে উঠে পড়ে লেগেছি, ... তার উপরে আমাকে ইংরেজি পড়াবার Textbook লিখতে হচ্চে'। এখানে এইসব তর্জ্জমা'র কথা বলা হয়েছে।

৩. এখনকার অষ্টম শ্রেণী।

৪. মোটামুটি এখনকার ষষ্ঠ শ্রেণী।

৫. রথীন্দ্রনাথ এই প্রথম সাক্ষাৎকারের কথা তাঁর ডায়ারিতে (১৫ মে ১৯১৮; ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫) লিখেছেন :" Ranu, the little girl of eleven, with whom father has had such an interesting correspondence, came this evening with her fam ily. She is such a bright girl. But she felt shy before such a com pany here. She asked father to go to see her tomorrow or the day after." কিন্তু লেডি রাণু মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণে এই সাক্ষাৎ হয় পরের দিন রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার মৃত্যুদিনের বিকেলে তাঁদের তৎকালীন বাসস্থান ৩৫ ল্যান্স্‌ডাউন রোডের বাড়িতে।

পত্র ৪।। ১. দ্র. রাণুর ৪-সংখ্যক পত্র।

২. এই বৎসর বিদ্যালয়ের পূজাবকাশ শুরু হয় মহালয়ার দিন ৪ অক্টোবর ১৯১৮ (১৭ আশ্বিন ১৩২৫) থেকে।

৩. পিঠাপুরমের রাজা ও অ্যানি বেসান্তের আমন্ত্রণ ছিল।

৪. ১০ অক্টোবর কলকাতায় গিয়ে সেখান থেকে ১২ অক্টোবর (শনিবার ২৫ আশ্বিন) রবীন্দ্রনাথ পিঠা-পুরমের উদ্দেশে রওনা হন।

৫. দ্র গীতবিতান প্রথম খণ্ড (১৩৮০), পৃ ১৬৮। ১৩১৪ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসবে প্রথম গীত হয়;শুদ্ধ পাঠ: বীনা বাজাও হে মম অন্তরে।

পত্র ৫।। ১. সম্ভবত *The Fugitive* (১৯২১) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত অনুবাদগুলি। আমেরিকা যাত্রা স্থগিত হয়ে

যাওয়ায় শান্তিনিকেতন থেকে গ্রন্থটির একটি বিশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে 'For private circulation'।

২. কয়েকদিন পরে রাণু স্বল্পকালের জন্য শান্তিনিকেতনে আসেন ।

পত্র৫।। ১. কলকাতার এম্পায়ার থিয়েটারে 'বিসর্জন' অভিনীত হয় ২৫, ২৭ ও ২৮ আগস্ট ১৯২৩ তারিখে — রবীন্দ্রনাথ জয়সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করেন, শেষের দুদিন রাণু অপর্ণার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই অভিনয়ের রিহার্সালের জন্য রাণুকে কিছুকাল জোড়াসাঁকোয় থাকতে হয়। তাঁর খোলামেলা, প্রাণোচ্ছল আচরণে আকৃষ্ট হয়ে কয়েকজন যুবক তাঁর পাণিপ্রার্থী হন। এ নিয়ে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়, রবীন্দ্রনাথ এখানে তার ইঙ্গিত করেছেন।

২. ডা. নীলরতন সরকার (১৮৬১ -১৯৪৩) রবীন্দ্রনাথের বন্ধু ও চিকিৎসক।

৩. ২১ মার্চ ১৯২৪ (৮ চৈত্র ১৩৩০) 'ইথিওপিয়া' জাহাজে রবীন্দ্রনাথ সদলবলে চীন অভিমুখে রওনা হন।

পত্র ৭।।১. পত্রটিতে '১০ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪' তারিখ দেওয়া থাকলেও অভ্যন্তরীণ প্রমাণে জানা যায়, পত্রটি সোমবার ১১ ফেব্রুয়ারি লেখা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে শ্রীনিকেতনে জাপানি দারুশিল্পী কিংতারা কাসাহারা-নির্মিত বৃক্ষাবাসে অবস্থান করছিলেন।

২. 'জীবনস্মৃতি' প্রবাসী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে (ভাদ্র ১৩১৮ -শ্রাবণ ১৩১৯) মুদ্রিত হয়ে ১৩১৯ সালে (২৫ জুলাই ১৯১২) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

৩. Leonard K. Elmhirst (১৮৯৩- ১৯৭৪), আমেরিকার কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিবিজ্ঞানে স্নাতক, ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের শেষে শান্তিনিকেতনে এসে শ্রীনিকেতনে ইনস্টিটিউট অব্ রুরাল রিকনস্ট্রাকশন গড়ে তোলেন।

৪. 'পূরবী' (১৩৩২) কাব্যের অন্তর্ভুক্ত 'ভাঙা মন্দির' ও 'আগমনী' কবিতা দুটি মাঘ ১৩৩০ কাল-চিহ্নিত।

পত্র ৮।।১. রবীন্দ্রনাথের উৎকল-দেশীয় ভৃত্য বনমালী, তিনি কৌতুক করে তাকে 'নীলমণি', 'লীলমণি' প্রভৃতি নামে ডাকতেন।

২. ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪ তারিখে কলকাতার অ্যালফ্রেড থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথ অ্যান্টি-ম্যালেরিয়া কোঅপারেটিভ সোসাইটির চতুর্থ বার্ষিক সভায় সভাপতি-রূপে যে বক্তৃতা দেন, সেটি জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১-সংখ্যা বঙ্গবাণী-তে প্রকাশিত হয়। দ্র 'ম্যালেরিয়া', পল্লীপ্রকৃতি, রবীন্দ্র-রচনাবলী সপ্তবিংশ খণ্ড।

৩. সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা মঞ্জুশ্রী।

৪. পাথুরিয়াঘাটার কুমার পূর্ণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পত্র ৯।।১. জাহাজ ছাড়ে ২১ মার্চ ১৯২৪ তারিখে।

২. দ্র য়ুরোপ-যাত্রীর পত্র, প্রথম পত্র: রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড।

৩. জাপান-যাত্রী, ৩ : রবীন্দ্র-রচনাবলী, ঊনবিংশ খণ্ড।

৪. ইথিওপিয়া' জাহাজ।

৫. দ্র জাপান-যাত্রী, ৮।

৬. রবীন্দ্রনাথ সিঙ্গাপুর থেকে জাপানি জাহাজ 'আটসাটা মারু'-তে চড়ে চীনযাত্রা করেন।

৭. 'পূরবী' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত 'উৎসবের দিন', 'গানের সাজি' ও 'লীলাসঙ্গিনী' কবিতা।

৮. ৯ মার্চ ১৯২৪ য়ুনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে অধ্যাপক ও কবি মনোমোহন ঘোষের (১৮৬৯-১৯২৪) স্মৃতিসভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন ও বক্তৃতা দেন।

৯. *Talks in China* (১৯২৪) গ্রন্থে সংকলিত।

পত্র ১০।। ১. ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র সুবীরেন্দ্রনাথ।

২ ১০ মার্চ ১৯২৪ মহর্ষিভবনে সুরেন্দ্রনাথের প্রথমা কন্যা মঞ্জুশ্রীর সঙ্গে ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়।

৩. গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৭- ১৯৩৮)।

৪. রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বাড়ি 'বিচিত্রা'।

৫. মালতী সেন (চৌধুরী)।

৬. শ্রীমতী হাতিসিং (ঠাকুর)।

৭. সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের ভগিনী পরে রেখা গুপ্ত।

৮. প্রতিমা দেবী।

৯. মীরা দেবী।

১০. রথীন্দ্রনাথের পালিতা কন্যা নন্দিনী।

পত্র ১১।। ১. পিকিঙ বিশ্ববিদ্যালয় ও 'লেকচার অ্যাসোসিয়েশন' রবীন্দ্রনাথকে চীনে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।

২. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ড. আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৪-১৯২৪)।

৩. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দু হাজার টাকার সাম্মানিক বৃত্তিতে রবীন্দ্রনাথকে 'রীডার'পদে নিয়োগপত্র আসে ২২ সেপ্টেম্বর ১৯২৩ তারিখে, শর্ত ছিল তাঁকে 'সাহিত্য' বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দিতে হবে।

৪. ১,২ ও ৩ মার্চ ১৯২৪ সেনেট হলে রবীন্দ্রনাথ তিনটি মৌখিক বক্তৃতা করেন, সেগুলির লিখিত রূপ 'সাহিত্য', 'তথ্য ও সত্য' এবং 'সৃষ্টি'। দ্র সাহিত্যের পথে, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োবিংশ খণ্ড।

পত্র ১২।। ১. রবীন্দ্রনাথের হিসাবখাতায় তাঁর কলকাতা যাওয়ার তারিখ বুধবার ১৯ মার্চ।

২. Miss Gretchen Green, এই আমেরিকান মহিলা শ্রীনিকেতনে পল্লীসংস্কার কার্যে এল্‌ম্‌হার্স্টের সহকারিণী ছিলেন।

৩. 'ভরা থাক্ স্মৃতি সুধায় বিদায়ের পাত্রখানি', রচনা : ৪ বৈশাখ ১৩৩০ দ্র গীতবিতান দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৩৬৬।

৪. দ্র. গীতবিতান, পৃ ৫৫৪; প্রবাহিণী (অগ্রহায়ণ ১৩৩২)-র অন্তর্গত গানটির রচনা যে বহু পূর্ববর্তী, এই পত্রের উল্লেখ তার অন্যতম প্রমাণ।

রাণু অধিকারীর পত্র :

পত্র ১।। ১. রাণুর পিতা ফণিভুষণ অধিকারী। শান্তিনিকেতন থেকে কাশী যাওয়ার সময়ে ট্রেনে লেখা।

পত্র ২।। ১. দ্র রবীন্দ্রনাথের ১-সংখ্যক পত্র।

২. ভক্তি অধিকারী।

পত্র ৩।। ১. জ্যেষ্ঠা ভগিনী আশা অধিকারী।

২. রবীন্দ্রনাথের ২-সংখ্যক পত্র।

৩. প্রতিমা দেবী।

৪. দ্র কল্পনা, রবীন্দ্র-রচনাবলী সপ্তম খণ্ড : '১৩০৫ সালের ৩০ শে চৈত্র ঝড়ের দিনে রচিত'।

পত্র ৪।। ১. ভানুসিংহের পত্রাবলী, ২০-সংখ্যক পত্র।

২. দ্র রবীন্দ্রনাথের ৪-সংখ্যক পত্র।

৩. দ্র ভানুসিংহের পত্রাবলী, ১৯-সংখ্যক পত্র।

টীকা: প্রশান্তকুমার পাল

মাদাম সিল্‌ভ্যাঁ-লেভির ডায়েরি

অনুবাদ : নন্দদুলাল দে

দেজিরে সিলভ্যাঁ-লেভির 'দাঁ ল্যাঁদ (দ্য স্যালাঁ ও নেপাল)' *Dans L'Inde (De Ceylan Au Népal)*—'ভারতভূমিতে (সিংহল থেকে নেপাল)'-নামের এই দিনলিপিটি নিছক দৈনন্দিন জীবনের হিসেবপত্রের শুকনো একটি বিবরণ মাত্র নয়। এটি তথ্যসমৃদ্ধ সাহিত্যধর্মী রচনা। এর মধ্যে অনেক তথ্য আছে যার মূল ভাণ্ডারী স্বয়ং আচার্য লেভি। নানা প্রসঙ্গে শ্রীমতী লেভি সে কথা বার বারই ব্যক্ত করেছেন, প্রায়ই বলেছেন—'এ কথা আমার স্বামীর মুখ থেকে শোনা।' সুতরাং দৃশ্যত মূল লেখিকা শ্রীমতী লেভি হলেও, নেপথ্যে প্রাচ্যবিদ আচার্য সিল্‌ভ্যাঁ লেভির উপস্থিতি প্রায়ই অনুভূত হয়। তত্ত্ব ও তথ্য -সমন্বিত এমন সুখপাঠ্য রচনা আমার খুব বেশি জানা নেই।

১৯২০ সালে ইয়োরোপ সফরকালে পারী নগরীতে প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ সিল্‌ভ্যাঁ লেভির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পরিচিত হন। তাঁর অসাধারণ বিদ্যাবত্তা কবিকে মুগ্ধ করে। ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে আমেরিকা ভ্রমণান্তে কবি আবার ফ্রান্সে আসেন। এই সময় স্ত্রাজ্‌বুর্‌ (Strasbourg) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যবিদ্যা পঠন-পাঠনের ব্যবস্থার জন্য অধ্যাপক লেভি স্ত্রাজ্‌বুর্‌ শহরে বাস করছিলেন। কবি সেখানেই তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। বিশ্বভারতীর পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার ইচ্ছা তখন তাঁর মধ্যে প্রবল। বিশ্বভারতীর পরিকল্পিত আদর্শের সঙ্গে অধ্যাপক লেভির সমমনস্কতা উপলব্ধি করে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বিশ্বভারতীর প্রথম অতিথি-অধ্যাপক পদ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। ইতিমধ্যে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবার জন্য আচার্য লেভি আমন্ত্রিত। কিন্তু কবির ডাকে সে আহ্বান তুচ্ছ হয়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আচার্য লেভি বিশ্বভারতীর প্রথম অতিথি-অধ্যাপকই শুধু নন, তিনি একজন প্রতিষ্ঠাতা-সদস্যও।

তা ছাড়া দিনলিপির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, কবির জীবদ্দশায় শান্তিনিকেতনের শান্ত মধুর পরিবেশের জীবন্ত চিত্র। এর সঙ্গে পাই শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রাত্যহিক জীবনচর্যার একটি উজ্জ্বল ও অতি মূল্যবান দলিল। স্বভাবত এই সূত্রে মনে পড়ে যায়, বিলাসবহুল পারী নগরীর অধিবাসী হয়েও লেভি-দম্পতি কীভাবে এই আশ্রম-জীবনের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন, কতটা একাত্ম হয়ে উঠেছিলেন। স্বামী ও স্ত্রী যতদিন আশ্রমে ছিলেন, ততদিন সচরাচর তাঁরা খাঁটি ভারতীয় বেশবাস— পাজামা, ধুতি ও শাড়ি— ব্যবহার করেছিলেন। একই সঙ্গে এ কথাও মনে পড়ে যায়, আশ্রমবাসীরাও তাঁদের এই বিশিষ্ট অভ্যাগত অতিথিদের কতটা আপন করে নিয়েছিলেন। সারা আশ্রমই আচার্য লেভিকে 'দাদামশাই' ও শ্রীমতী লেভিকে 'দিদিমা' বলে সম্বোধন করতেন। আর কবিও শ্রীমতী লেভিকে 'দিদিমা' বলে সম্বোধন করতেন বলে মনে হয়, লেভি-দম্পতিকে লেখা কবির চিঠিপত্রে এই সম্বোধনের উল্লেখ পাওয়া যায়। অধ্যাপক লেভিকে লেখা কবির চিঠিতে 'সুহৃত্তমেষু'— এই সম্বোধনটিরও উল্লেখ আছে। অন্যদিকে একই সূত্রে জানা যায়, আশ্রমগুরু তাঁদের কাছেও ছিলেন 'গুরুদেব'। দুষ্টজনের মিথ্যারটনায় কবি মর্মাহত হয়ে তার সত্যাসত্য জানার জন্য লেভি-দম্পতিকে যে চিঠি লেখেন (১৬ নভেম্বর ১৯২৭)*, তাতে তাঁরা যারপরনাই বিস্মিত ও ব্যথিত হয়ে এই নিন্দাবাদ যে কতটা অমূলক তা বোঝাতে আচার্য লেভি তাঁর চিঠির (টোকিও, ১৬ ডিসেম্বর ১৯২৭) এক জায়গায় কবিকে লেখেন : **'Shall I refer you to the book published by my wife, about which old friends use *(sic)* to tease her as being in love with you?'** চিঠিতে উল্লিখিত বইটিই এই ভ্রমণকাহিনী। আর শ্রীমতী লেভি স্বামীর চিঠির সঙ্গেই তাঁর বক্তব্যের মধ্যে যে গভীর অন্তরঙ্গতা বা অনুরাগের কথা ব্যক্ত করেছেন তা তাঁর নিজের ভাষাতেই জানাই, **'Mais je ne veux plus parler, ni penser a tout cela, je veux vous dire tout simplement que vous etes une des grandes affections de Mon coeur que si le mondle entier vous admire, moi, je vous aime, et laissons dire les méchants.'** অনুবাদ : 'এ সম্বন্ধে কোনো কথা আমি বলতেও চাই না, ভাবতেও চাই না, শুধু সহজভাবে এইটুকুই বলতে চাই যে যাঁরা আমার প্রাণের খুব কাছের মানুষ তাঁদের মধ্যে আপনি একজন, আর সারা পৃথিবী যদি আপনার

*রবীন্দ্রনাথের চিঠির তারিখের উল্লেখ পাওয়া যায় ১৯২৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর টোকিও থেকে কবিকে লেখা আচার্য লেভির চিঠিতে।

স্তুতিগান করে, আমি আপনাকে ভালোবাসি, দুষ্টলোকে যা বলে বলুক।'

সিল্‌ভ্যাঁ লেভি ভারতে প্রথম আসেন ১৮৯৭-৯৮ সালে, তখন নেপালের প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করে ফ্রান্সে ফিরে গিয়ে 'ল্য নেপাল' *(Le Népal)* শিরোনামে তিন খণ্ডে নেপালের ইতিহাস লেখেন। তার পর ১৯২১ সালে বিশ্বভারতীর প্রথম অতিথি-অধ্যাপকরূপে শান্তিনিকেতনে আসেন। শেষবার ১৯২৯-এ জাপান থেকে ফেরার পথে কিছুকাল এ দেশে থাকেন। ১৯৩৫ সালে ৬ নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

দ্বিতীয় বার ভারতে তাঁদের অবস্থানকাল— ৬ নভেম্বর ১৯২১ থেকে ১৩ অক্টোবর ১৯২২— এগারো মাস এক সপ্তাহ। তার মধ্যে অনেকটা সময় কাটে নেপাল ও ভারতবর্ষের নানা স্থান পরিভ্রমণে। এই দিনলিপির কালানুক্রমিক সূত্র ধরে শান্তিনিকেতন ও ভারতের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিতি ও পরিভ্রমণের সঠিক সময়সূচি নির্ণয় করা যায় না; কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে লেখা আচার্য লেভির চিঠিতে (টোকিও, ১৬ নভেম্বর ১৯২৭) উল্লেখ আছে যে আশ্রমে তাঁরা ছিলেন সবসুদ্ধ পাঁচ-মাস।

এখানে রইল দিনলিপির দ্বিতীয় আর তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ।

আম্রকুঞ্জে বিশ্ববিদ্যালয়

গতকাল বিকেলে [শান্তিনিকেতনে] এসে পৌঁছনোমাত্র রবীন্দ্রনাথ আমাকে অনুরোধ করলেন ফরাসি ভাষা সম্বন্ধে ছাত্রদের যেন কিছু উপদেশ দিই। আমাদের আগমনে একটি মনোজ্ঞ সংবর্ধনা সভার অনুষ্ঠান হয়। সেখানে ফরাসির অধ্যাপক বোম্বাইনিবাসী পার্সি মিঃ মরিস ছোটোখাটো একটি বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তৃতায় আমাদের [ফরাসি ভাষার] সম্বন্ধসূচক সব-কটি সর্বনামের ব্যবহার আমাকে সত্যি তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। আজ সকালে রবীন্দ্রনাথ যখন সিল্‌ভ্যাঁকে বাংলাভাষার প্রথম পাঠ দিচ্ছিলেন, ঠিক তখনই তিনি[১] আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আর আমিও তখনই ঠিক করলাম, যে-গাছতলাটি প্রথম ফাঁকা পাব সেখানেই এই প্রথম ছাত্রটিকে দুঘণ্টা পড়াব। গিয়ে দেখি, সেখানে তাঁর সঙ্গে রয়েছেন আরও চারজন ভদ্রলোক। মনে হল, তাঁরাও শিক্ষক। একেবারেই কোনো ভূমিকা না করে আমরা 'ল্য বুর্জোয়া জাঁতীঅম্' *(Le Bourgeois gentilhomme)*[২] পড়তে শুরু করলাম। আমাদের সঙ্গে আছেন রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র[৩]। কোঁকড়ানো চুলে ভরা তাঁর বিশাল মাথাটি কোনো এক কালিগুলা (Caligula)-র[৪] কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রাণখোলা তাঁর হাসি, শিশুর মতোই তিনি উচ্ছল আর সংবেদনশীল।

১১ নভেম্বর [১৯২১]— ধীরে ধীরে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে একটা ছন্দ এল : বাংলা পড়াশোনার ব্যাপারটা আগের চেয়ে নিয়মিত হল। আমরা একটি দৈনিক সংবাদপত্রের গ্রাহক হলাম। এইভাবে আমাদের ছোট্ট জগৎটিতে একটু গুছিয়ে বসলাম। এখানে দিনের মধ্যভাগ [সূর্যতাপে] জ্বলতে থাকে, লেশমাত্র ছায়া থাকে না খোয়াই অঞ্চলে। সূর্যাস্তের পর আমরা শারীরতত্ত্ববিদ [?] বসুর (যিনি উদ্ভিদের সংবেদনশীলতা সম্পর্কে গবেষণার জন্য বিখ্যাত) ভাগনের[৫] সঙ্গে বেড়াতে বেরোলাম। তাঁর হাঁটু থেকে পা পর্যন্ত অনাবৃত। পরনে মিহি মসলিনের পোশাক। তাঁকে এভাবে এ-বেশে দেখে কে বলবে যে আর মাত্র ছ সপ্তাহের মধ্যে তিনি জার্মানিতে (কানাঘুষো শোনা যায়, সেখানে তাঁর বাগ্‌দত্তা তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন) পাড়ি দেবেন, বিজ্ঞানবিষয়ক গবেষণার কাজ চালিয়ে যাবার জন্য।

কাছের গ্রাম গোয়ালপাড়া পর্যন্ত গেলাম আমরা। খড়ে-ছাওয়া মাটির বাড়িগুলি বড়ো বড়ো গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় ঢাকা। সেখানে গিজগিজ করছে উলঙ্গ শিশুর দল। মাদলের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। হাউই পুড়ছে। আমরা ঠিক দুর্গাপুজোর[৬] ভাসানের শোভাযাত্রার সময়ে এসে পড়েছি। ভয়ংকরী দেবীমাতার মূর্তিটি দুখানি শক্ত বাঁশের ওপর তোলা হয়েছে; ডাইনে তাঁর স্বামী শিবঠাকুর, বাঁয়ে দেবতাদের বার্তাবহ নারদমুনি, ইরিস্

(Iris)-এর[৭] মতো অতটা সুন্দর নয়। সবেতেই সোনালি রঙের পোঁচ; সব-কিছুই মামুলি ধরনের, তবে বোধকরি আমাদের স্যাঁ-স্যুল্‌পিস্রি (Saint-sulpiceries)[৮]-র মতো অতটা কুশ্রী বা ম্যাড়মেড়ে নয়। বসুর[৫] কাছে এই সাহেবটির পরিচয় পেয়ে ভিড়-করে-আসা ভক্তের দল আমাদের জন্য জায়গা ছেড়ে দিল আর দেবীর ভাসানে আমাদের আমন্ত্রণ জানাল। কেননা কাছেই এরই মধ্যে খানিকটা শুকিয়ে-ওঠা একটা নদীতে[৯] মা দুর্গাকে বিসর্জন দিতে চলেছে এরা। এর পর আমাদের মিষ্টিমুখ করানো হবে। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে গেছে, বাড়ি ফিরতে হবে। বাঁধভাঙা চাঁদের আলোয় সারা আকাশ এত বেশি উজ্জ্বল যে তারাগুলি ঢেকে গেছে। সেই আলোয় [বই] পড়া যায়।

রবিবার ১৩ নভেম্বর [১৯২১]— অন্যান্য দিনের মতো এও একটা কাজের দিন। বিশ্রামের দিন এখানে বুধবার। কারণ, শুনেছি, বুধবার দিনটি ঠাকুর পরিবার আর ব্রাহ্মসমাজের কোনো একটি স্মৃতির[১০] সঙ্গে জড়িত। ব্রাহ্মসমাজ একটি ধর্মসম্প্রদায়। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে রিফর্মেশন(ধর্মসংস্কার)-এর যে সম্পর্ক, ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজেরও সেই সম্পর্ক। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের, প্রধানত উপনিষদের যা সারাৎসার, তাকেই ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল ব্রাহ্মসমাজ।

১৪ নভেম্বর [১৯২১]— সন্ধ্যায় সুরম্য চারুকলাবিদ্যালয়, কলাভবন-এর ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা সভা। সভাটি হচ্ছে প্রদর্শশালায়। এখন সাড়ে ছটা। তিথিটা পূর্ণিমার কাছাকাছি। বাইরের বারান্দায় চাঁদের আলোয় সারিবদ্ধ মহিলারা। সবাই মেঝেতে পা মুড়ে বসলেন। প্রথামতো আমরাও কবির পাশে বসলাম পা মুড়ে। এখানকার রীতি অনুযায়ী আমাদের গলায় ফুলের মালা পরানো হল। সেইসব ফুলের মালার গন্ধ এত মিষ্টি আর ঝাঁঝালো যে আমাদের বেশ একটু অস্বস্তি লাগছিল। একজন ছাত্র আমাদের উদ্দেশে একটি সুন্দর ভাষণ পাঠ করল। কিন্তু সিল্‌ভ্যাঁর উত্তর আর কবির সংক্ষিপ্ত ও মনোজ্ঞ বক্তৃতার সময় আমি কেবল ভাবছি কখন উঠব। রাত্তিরে যখন বাড়ি ফিরলাম, তখন যেন জ্যোৎস্নার বন্যা বইছে। এই অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

পরদিন [১৫ নভেম্বর] পূর্ণিমা উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে অন্য এক ইয়োরোপীয়ের[১১] সঙ্গে দেখা হল আমাদের। এখানেই থাকেন তিনি। ঘটনাচক্রে ইনি একজন পোল্যাণ্ড দেশীয় ইহুদি,[১২] বরং বলা যেতে পারে লিথুয়ানিয়ান। রসায়নবিজ্ঞানী। জার্মানির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমাদের অ্যাঁস্‌তিত্যু পাস্‌ত্যর্‌ (Institut Pasteur)-এর[১৩] ছাত্র। আমেরিকা, ইয়োরোপ এবং পৃথিবীর নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। অবশেষে ভারত তাঁকে ধরে রেখেছে। ছমাস কাটিয়েছেন হিমালয়ে, যোগীর (সন্ন্যাসীর)[১৪] মতন। আর এখানে এসে ছেলেমেয়েদের রসায়ন পড়াচ্ছেন। ভারতীয়দের মতোই তিনি জীবনযাপন করেন। অতি সাদাসিধে তাঁর পোশাক-আশাক : পাজামার ওপর ঝোলানো একটা খাকি শার্ট যখন দেশে ফিরে যাবেন, সত্যিই যদি ফেরেন, তখন একটাকে আর-একটার মধ্যে গুঁজে নিয়ে ভিল্‌না (Vilna)-র[১৫] পথে যাত্রা করবেন।

রবীন্দ্রনাথ আজ আমাদের সঙ্গে নৈশভোজন করলেন। গল্পসল্প করলাম অনেকক্ষণ। তাঁর কথা শুনলাম। এখানকার দুজন ইংরেজ অধ্যাপকের[১৬] কথা বললেন। ভারত এঁদের জয় করে নিয়েছে : ভারত, না এই ভারতীয়টি?[১৭] এর পর তিনি আবার জাতীয়তার প্রশ্নে ফিরে এলেন; অমৃতসরের সেই ভয়ংকর ঘটনা[১৮] স্মরণ করিয়ে দিলেন— যার প্রতিক্রিয়ায় তিনি ভারত সরকারের কাছে তাঁর খেতাব ফেরত পাঠান। পথে এক ইংরেজ মহিলার লাঞ্ছনার ফলে যে-দমননীতি দেখা দেয়, সে কথাও বললেন। যেসব ঘটনার দায়িত্ব ইংল্যান্ড পুরোপুরি অস্বীকার করে, তার কথা মনে পড়ায় কবির কণ্ঠস্বর কাঁপছিল, চোখ জ্বলছিল।

১৬ তারিখে [নভেম্বর ১৯২১] শুধু আমার জন্য ছোটোখাটো একটা সংবর্ধনা সভার অনুষ্ঠান হল। মহিলারা একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছেন, নাম 'আলাপিনী'[১৯] (ঘরোয়া আলাপ-আলোচনা)। যুদ্ধের সময়

মেয়েদের কী ভূমিকা ছিল, সে-বিষয়ে তাঁরা আমাকে বলতে বলেছিলেন। মিনিট দশেক আমার ভাঙাভাঙা ইংরেজিতে তোতলামি করে কিছু বলবার চেষ্টা করলাম। আমাকে মালা পরানো হল। তার পর নেমে এল একটা গভীর স্তব্ধতা। এই মহিলারা এত মুখচোরা যে বিশ্বাস করা যায় না। অথচ যে-পর্দা বহু নারীকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখে দেয়, এঁদের কেউই কোনোদিন সেই ধরনের পর্দানশিন বা পর্দার আড়ালে ছিলেন না। যাঁরা অত্যন্ত বিদুষী তাঁদেরও দৃষ্টি নত, এক-আধটি শব্দ এবং একটুখানি হাসি ছাড়া আর কিছুই তাঁদের কাছ থেকে বার করা যায় না। তবে বিশেষ আশা, এঁদের আমি বশে আনতে পারব। আর এ-ব্যাপারে ফরাসি ভাষাটা আমাকে সাহায্য করবে, কেননা আমরা এখানে আসায় আর প্রাচ্যবন্ধু সমিতি (লেজ্‌আমি দ্য লরিআঁ les Amis de l'0rient)[২০] ফরাসি শিক্ষামন্ত্রক ও স্ত্রাজ্‌বুর্[২১] থেকে পাঠানো বাক্স বাক্স বই এসে পৌঁছনোয়,[২২] ফরাসি শেখার বেশ একটা হিড়িক পড়ে গেছে।

আরও একটি ছাত্র বাড়ল আমার। আর মরিস[১]-এর ক্লাসেও ছাত্রদের উপস্থিতি ক্রমশ বাড়তে লাগল। নম্র ভদ্র এই মরিস্-এর সঙ্গে প্রতিসন্ধ্যায় বসার সময় ঠিক করা আছে; এভাবেই আমরা মলিয়্যার্ (Moliée)[২] -এর সমগ্র রচনা পাঠ করব। ফাগ্যা (Faguet)[২৩] স্যাঁৎ-ব্যভ (Sainte-Beuve)[২৪]-এর সমালোচনা আর 'আনাল' (*Annales*) পত্রিকায়[২৫] যা-কিছু বেরোয় সবই তাঁর ভালো ভাবেই পড়া। সব-কিছুই একইভাবে সশ্রদ্ধ প্রশংসার সঙ্গে গ্রহণ করেন তিনি। কিন্তু মূল রচনার কিছুই তাঁর পড়া হয় নি। বেচারার কোনো বই নেই, আর ভুল ধারণারও সীমা-পরিসীমা নেই। এমন আশ্চর্য রকমের নীতিবাগীশ যে, কোনো বিশেষ বিশেষ শব্দ মনে পড়লেই তাঁর কর্ণমূল পর্যন্ত লাল হয়ে ওঠে। তা হলে স্গানার‍্যাল্ (*Sganarelle*)[২৬] পড়ব আমরা কেমন করে?

১৭ নভেম্বর [১৯২১] প্রিন্স অব্ ওয়েলস্[২৭] [ইংল্যাণ্ডের যুবরাজ] বোম্বাইয়ে এসে নামলেন। আর আমার যোসেফ রত্নটি বাজার থেকে ফিরে এল খালি হাতে। বয়কট (হরতাল) এমন সর্বাত্মকভাবে পালিত হয়েছে যে, ফল সবজি কিছুই পাব না। আর আগামীকালের আগে আমাদের কয়লাও আসবে না। গান্ধী যে-আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন তা সবাই শুনেছে; ভারতের দোকানপাট, অফিস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সব বন্ধ। এর পর আবার কোনো গোলমাল দেখা দেবে না তো? একসঙ্গে বত্রিশ কোটি মানুষকে শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনে[২৮] ধরে রাখা কি সম্ভব? কিন্তু আন্দোলনের এই কর্মসূচি পৃথিবীর সবচেয়ে নির্বিরোধ জাতির মানসিকতা ও স্বভাবেরই অনুকূল।

আমরা এখানে এসে পৌঁছলে পর, সারা শান্তিনিকেতন যে-জায়গায় আমাদের সংবর্ধনা জানিয়েছিল, ঠিক সেখানেই আমগাছের ছায়ায় সিল্‌ভ্যাঁ [আজ] বেলা সওয়া তিনটেয় তাঁর প্রথম ক্লাস নিচ্ছেন। ক্লাসে বিয়াল্লিশজন শ্রোতা শতরঞ্জির ওপর পা মুড়ে বসেছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন সিংহলের এক বৌদ্ধভিক্ষু[২৯]। তাঁর পরনে হলুদরঙা সুন্দর ঢিলেঢালা পোশাক, ডান কাঁধটি খোলা। (সাবধান! দিক নিয়ে যেন আমাদের ভুল না হয়! কারণ এই নিয়ে বর্মায় খুব জোর লড়াই হয়ে গেছে। সেখানে ধর্মীয় অনুশাসনের [ডগ্‌মা] স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ)। পিছন দিকে একপাশে একটু শোভন দূরত্বে একইভাবে [পা মুড়ে] বসেছেন চারজন মহিলা। রবীন্দ্রনাথ নিচু একটি বেদিতে[৩০] বসে নোট করে চলেছেন ; যে-পাঠ দেবার জন্য পারীর এই ভদ্রলোকের[৩১] বিশেষভাবে এখানে আসা, তার সারাংশ রবীন্দ্রনাথ এখনই বাংলায় বলবেন। [অধ্যাপক] মশাইয়ের[৩১] ইংরেজি খুব ভালোও নয়, সুন্দরও নয়, তবু তাঁর কথা সবাই মন দিয়ে শুনছেন। এমন দৃশ্য সত্যি কোনোদিন ভোলবার নয়। 'ভারতের সঙ্গে বিদেশের সম্পর্ক— এই বিষয়ে বক্তৃতামালার আজই শুরু। প্রতি রবিবার কলকাতা থেকে যেসব শ্রোতা[৩২] আসেন, তাঁদের জন্যে বৌদ্ধসাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ বক্তৃতামালার ব্যবস্থা আছে।

ইতিমধ্যে কিছু ছাত্র তাঁদের কাজ সম্পর্কে নির্দেশ নেবার জন্য সিল্‌ভ্যাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন।

১৮ [নভেম্বর ১৯২১]— দিন শুরু হয় শিশুবন্ধুদের সমাগমে। আমাদের ব্যক্তিগত আকর্ষণ আর সঙ্গে আনা লজেন্সের[৩৩] টানে— বাকি যেটুকু আছে, খুব বেশি নেইও আর— ওরা আমাদের কাছে আগেও এসেছে : এদের মধ্যে আছে কবির নাতি-নাতনি ছোটো নীতু[৩৪] আর তার বোন বুড়ি[৩৫] ('বৃদ্ধা') আর আছে দশ বছরের একটি কিশোর, সে শুধু বাংলাটাই জানে, সঙ্গে তার চার মাসের ছোটো ভাইটি। কী নাম শিশুটির? এখনো কোনো নাম রাখা হয় নি। অন্নপ্রাশনের সময় ওর একটা নামকরণ হবে।

ক্লাসের পর কাছেই ছোটো একটা সাঁওতালপল্লীতে গেলাম আমরা। এই সাঁওতাল অধিবাসীদের সম্পর্কে অনেক লেখালেখি হয়েছে। ভারতের প্রাচীন বাসিন্দাদের বংশধর এরা। নিজেদের স্বতন্ত্র ভাষা, ধর্ম, আচার-আচরণ, রীতিনীতি রক্ষা করে চলেছে। শ্রমিক হিসেবে চমৎকার, কিন্তু হিসেব বোঝে না। সারাদিনের কাজের পর সন্ধ্যায় মজুরি মিটিয়ে দিতে হয়, নইলে পরদিন আর আসে না; ভারি হাসিখুশি আর শিল্পপ্রিয়; দল বেঁধে যখন গ্রামে ফিরে যায়, তখন দেখি এরা একেবারে ছিমছাম ফিটফাট; এদের মধ্যে একজন নলখাগড়ার বাঁশি বাজায়। মনে হবে, আদি যুগেই বুঝি ফিরে এসেছি।

এখানে বেশিক্ষণ বেড়ানো যায় না। উঠতে-না-উঠতেই সূর্যদেব রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন। বিকেল চারটের আগে আমরা প্রায় বেরোই না। গাঢ় রাঙা মাটির পথ। মোষের গাড়ির চাকার দাগ কেটে বসেছে গভীরভাবে। এইসব মেঠো পথের সংখ্যা খুব বেশি নয়! যেতে যেতে পথ গেছে হারিয়ে। তারই রেখা ধরে আমরা শুকনো নদীর[৯] খাতে এসে দাঁড়াই। বর্ষাকালে এই খাত ভরে গিয়ে যথার্থ নদীর রূপ নেবে। চোরকাঁটার মধ্য দিয়ে চলার সময় ভীষণ ছুঁচলো সব কাঁটা জামা-কাপড়-মোজায় বিঁধে যায়। সেই কাঁটা ছাড়াতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে থামতে হয়। বাড়ি ফিরে দেখি সেখানে রয়েছেন আমার ছাত্র[১], সিলভ্যাঁ, সিংহলি বৌদ্ধভিক্ষু[১১] আর তাঁর সঙ্গে এক নবীন শ্রমণ। শ্রমণটির গায়ে হলুদরঙা সুন্দর ঢিলেঢালা বৌদ্ধভিক্ষুর পোশাক এখনো ওঠে নি। [আজ] আমাদের সঙ্গে নৈশভোজে বসে কবি গালিসিয়া[৩৭] থেকে এক ইহুদি তরুণীর[৩৮] আসন্ন আগমনবার্তা ঘোষণা করলেন। কবির সঙ্গে তাঁর দেখা হয় ইয়োরোপে। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী আর বিদুষী এই মহিলা। কবির কাছে আর্জি জানান, শিল্পকলার ইতিহাস শেখানোর জন্য তিনি শান্তিনিকেতনে আসতে চান। তিনি একাধারে দার্শনিক, লেখিকা ও নৃত্যশিল্পী। কবিকে নেচেও দেখিয়েছেন তাঁর নৃত্যপ্রতিভার নিদর্শন। আমরাও যাতে [কবির প্রত্যক্ষ করা] সেই নৃত্যকলার গুণাগুণ সম্যক উপলব্ধি করতে পারি, সে কথা ভেবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেহের ঊর্ধ্বাংশ ও বাহু সঞ্চালন করলেন [নাচের ভঙ্গিমায়], চোখ ঘোরালেন, মাথা দোলালেন। এই ভারতীয়টির রসবোধ আছে, আর আছে তা প্রকাশ করবার ক্ষমতাও।

কবিকে ঘিরে যে-জীবন

২২ নভেম্বর [১৯২১]— আজ সকাল সাতটায় কর্তার জন্য দর্জি এল। দর্জিটি পাজামার ধাঁচে যা পরেছে, খুব একটা মন্দ লাগছে না। আসলে সেটা পাজামা নয়— বেশ ময়লা এক ধরনের মোটা একটা কাপড়কে সুন্দরভাবে গুছিয়ে পরেছে; জুতোও নেই পায়ে। কালো মুখটার মধ্যে চোখগুলো জ্বলজ্বল করছে। এমনভাবে সে মাপজোক নিচ্ছে, মনে হবে নিউটন বুঝি এইভাবেই অঙ্ক কষতেন। এরপর নটার সময় এলেন একজন ছাত্র। তিনি আবার ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের শিক্ষকও[৩৭] বটে। বাংলা দেশের পুরনো ভূগোল নিয়ে মেতে আছেন। ক্লাসে যে-নোট নিয়েছিলেন, সিলভ্যাঁর কাছে তা নিয়ে এসেছেন। বাক্স বাক্স বই আসতে দেখে[৩৮], লোভে পড়ে তিনি ফরাসি শিখতে শুরু করেছেন। 'আমার কাছে পড়তে চান?' বলতেই অমনি আমার আর-একটি ছাত্র বাড়ল।

বিকেলের ক্লাসের পর[৩৯] এসে দেখি দুটি ছাত্র সিল্‌ভ্যাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। আর আমার জন্য বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে পরিপাটি করে শাড়ি-পরা ছোটোখাটো এক [নারী] মূর্তি। পায়ের পাতা সযত্নে আলতায় রাঙানো। এয়োতির চিহ্ন, লাল টকটকে [সিঁদুরের] উজ্জ্বল রেখা, সিঁথির মূল থেকে টানা। চাপা গায়ের রঙে সোনার আংটি আর হার ঝলমল করছে। ইনি এখানকারই এক অধ্যাপক মজুমদার মশাইয়ের[৪০] স্ত্রী। ভদ্রলোক তিন বছর আমেরিকায় পড়াশোনা করেছেন। ফিরে এলে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে একটা ভালো পদ দিতে চায়। কিন্তু শান্তিনিকেতন এবং কবির দুর্নিবার আকর্ষণ তাঁর কাছে ছিল অপ্রতিরোধ্য। কৃষিবিজ্ঞানী তিনি ; এখানে খুবই সেকেলে ধরনের গোশালা তৈরি করেছেন! স্কুলে দুধ সরবরাহ করেন— দুধের যা ছিরি— তার সঙ্গে ঘি, ননির মতো সাদা জমাট বাঁধা একটা বস্তু— যা নাকি দিশি মাখন। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের ইংরেজিও পড়ান তিনি। শান্ত ভদ্র ছোট্টখাট্ট শ্রীমতী মজুমদার শিশু দুটিকে[৪১] নিয়ে কলকাতায় মায়ের কাছে যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। এখন কিছুদিন থাকবেন সেখানে। ছোটো শিশুটির নামকরণের সময় হয় নি এখনো। সাতমাসে না পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তখন জ্যোতিষীকে ডাকা হবে। শিশুর জন্মলগ্ন অনুসারে তৈরি কোষ্ঠী দেখে, খুঁটিয়ে বিচার করে, অন্নপ্রাশনের 'শুভ' দিনক্ষণ স্থির করে দেবেন তিনি। জটিল অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অন্নের একটি কণা শিশুর জিভের ওপর রাখা হবে— এইভাবে প্রকৃতির সঙ্গে প্রথম সংযোগ ঘটবে শিশুর।

তার পর এলেন ক্ষিতিমোহন সেন[৪১]। আমাদের [আশ্রম জগতের অন্যতম খ্যাতনামা ব্যক্তি। তিনি ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করেছেন, আর সংগ্রহ করেছেন লোকসংগীত, পৌরাণিক কাহিনী, বিশাল লোককথার এক ভাণ্ডার। ক্ষিতিমোহন[৪২] জাতিতে বৈদ্য, চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী। রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁকে এখানে আসবার জন্য অনুরোধ করে লিখলেন, তখন তিনি প্রতিষ্ঠিত। তিনি উত্তর দিলেন, 'আপনার কাছে যাবার মতো বড়ো মাপের মানুষ আমি নই।' কবি আবার লিখলেন, 'আমি একজন ছোটো মাপের মানুষই চাইছি।' পরাভূত ক্ষিতিবাবু তখন পাকাপাকিভাবে আশ্রমে বসবাস করতে এলেন।

রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ, কাউকে বুঝিয়েসুঝিয়ে নিজের মতে আনার ক্ষমতা এবং মোহিনীশক্তি সত্যিই অবিশ্বাস্য। আশ্রমের এই মননশীল অপূর্ব সুন্দর জীবনের অনুভূতি, হাসিখুশি, করুণাঘন আনন্দময় পর্‌-রোয়াঈয়াল (   )[৪৩]-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। মনে পড়ে যায় কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা বন্ধুর কথা যাঁরা এই সরল অনাড়ম্বর জীবনের সঠিক মূল্য উপলব্ধি করতে পারবেন। বাইরের আড়ম্বরের জন্য অস্থিরতা, চাহিদার ভয়ংকর নিষ্পেষণ, আকাঙ্ক্ষার পীড়ন, প্রতিবেশীকে অনুকরণ বা তার সমকক্ষ হওয়ার লিপ্সা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এই জীবন। শান্তিময় এ-জীবন কতই-না উপভোগ করবেন তাঁরা।

আজ বুধবার, ২৩ নভেম্বর ১৯২১ — সকাল সাতটায় মন্দিরে উপাসনা। লোহা আর কাচের তৈরি বিকট এই মন্দিরটি।[৪৪] এর জন্য দায়ী করা হয়ে থাকে দূর সম্পর্কীয় এক আত্মীয়কে। মন্দিরের এই

অনুষ্ঠানটির মধ্যে কোনো জটিলতা নেই ; মন্দিরের ভেতরে কবিকে ঘিরে বসেছেন সমস্ত শিক্ষক ও উঁচুনিচু সব ক্লাসের ছাত্রছাত্রী ; বাইরে সিঁড়ির ওপর স্ত্রীলোকেরা আর ছোটো ছোটো মেয়েরা। উপনিষদ থেকে পাঠ, সঙ্গে বাংলায় ব্যাখ্যা— সব মিলিয়ে পৌনে এক ঘন্টার অনুষ্ঠান। তার পর শেষ।

বেশ একটা অস্বস্তির ভাব নিয়ে পরদিন ঘুম থেকে উঠলাম। বারান্দায় একটা আরামকেদারায় গিয়ে বসলাম। পশ্চিমদিকটা খোলা বলে সারা সকাল জায়গাটায় স্নিগ্ধ মধুর একটা আমেজ থাকে। দুপুর পর্যন্ত সেখানেই কাটালাম— ছাত্ররা এলে দেখা করলাম, পড়লাম, লিখলাম। কিন্তু সূর্য যতই ওপরে ওঠে, আকাশটাও ততই উজ্জ্বল হতে থাকে আর আমার অস্বস্তিটাও ততই যায় বেড়ে। এই আলোটাই যে আমার যত কষ্টের মূল সে-বিষয়ে আর কোনো সন্দেহই রইল না। অথচ সকালবেলা এই আলোটাই কত-না শুভ্র কোমল ও সুন্দর লাগে। তবে কি এই নিঃসীম আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখতে হবে? বিদঘুটে ধোঁয়াটে কাচগুলো কি তবে চোখে লাগাতেই হবে? যাই হোক, বিকেলে শখ করে যারা ফরাসি শিখতে আসেন, তাঁরা এলে স্বাগত জানালাম। পড়ুয়া ছ জন। কে কীভাবে বসলেন, একটু বর্ণনা দিই তার। আমাকে ঘিরে সবাই হাঁটু মুড়ে সুন্দর শতরঞ্জিটার ওপর বসলেন; কেবল মোটাসোটা হাসিখুশি দিনুবাবু বসলেন একটা নিচু টুলের ওপর। পুরো একঘন্টা মলিয়্যার-এর মনমাতানো কৌতুকরসে ভেসে চললাম আমরা। সন্ধ্যায় ভিক্ষু (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী), তাঁর নবীন শ্রমণ ভাই, একজন তরুণ সিংহলির সঙ্গে আমার খবর নিতে এলেন। কোনো ওষুধ খেয়েছি কি না, সবিনয়ে জানতে চাইলেন তাঁরা। ওষুধে আমার কোনো আস্থা নেই বলে জানালাম। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, প্রার্থনায় কোনো উপকার হতে পারে কি না। হ্যাঁ, তা অবশ্য হতে পারে। তখন আমার কাঠিম থেকে বেশ খানিকটা সুতো খুলে নিয়ে দড়ির মতন করে পাকালেন তাঁরা। ভিক্ষু ধরলেন তার একটি প্রান্ত, আমি অন্যটি । আর নবীন শ্রমণ ভাইটি ধরলেন তার মধ্যভাগ। (আমাকে না ছুঁয়ে যাতে সংযোগ স্থাপন হয়, তাই বোধ করি এই ব্যবস্থা।) তার পর পবিত্র কণ্ঠে প্রার্থনার সুরে দীর্ঘ বৌদ্ধ স্তোত্র ধ্বনিত হতে লাগল। প্রার্থনাশেষে স্বীকার করলাম ইতিমধ্যে অনেকটা সুস্থ বোধ করছি। সুতোটা গুটিয়ে নুটি পাকিয়ে নিয়ে আমাকে তাঁরা বললেন, রাত্তিরে বালিশের তলায় রেখে দিতে; পরদিন আবার এই অনুষ্ঠানটি করবেন। কিন্তু ফের যখন তাঁরা এলেন, তখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে আমার ভূগোলবিদের সঙ্গে পড়াশোনা করছি। এই চমকপ্রদ গল্পটি কলকাতায়[৪৫] বৌদ্ধ সম্মেলনে গিয়ে শুনিয়েছিলেন তারা।

পরদিন দুপুরে খেতে বসেছি, এমন সময় বাঁশি আর মাদলের আওয়াজ আমাদের বাইরে টেনে নিয়ে এল : দেখি, গোটা একটা সাঁওতালগ্রাম ঘরসংসার গুটিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। স্ত্রী-পুরুষের সারবন্দী বিরাট এক শোভাযাত্রা। সামনের দিকে বাদ্যি বাজছে। মাথায় তাদের গৃহস্থালির যাবতীয় জিনিসপত্র : ছোটো ছোটো জ্বালানি কাঠের আঁটি, ঝুড়ি-চুপড়ি, গুটিয়ে নেওয়া কয়েকটা কাপড়-চোপড়, আর আছে কাঁসার অপরিহার্য পাত্রটি, যা তাদের কাছে প্রায় ধর্মীয় বস্তুর শামিল, একেবারে যারা নিঃসম্বল তাদেরও এটি থাকে। অতি সামান্য কারণে এভাবেই এরা ঘর ছেড়ে চলে যায় একদিন— দূর থেকে হয়তো কোনো কাজের ডাক এসেছে, সরকার বা কোনো জমিদার খাজনা আদায়ের জন্য পীড়াপীড়ি করছে অথবা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তির কাছ থেকে রোগ সংক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। পতিতজমি পেলেই এরা ঘর বাঁধে সেখানে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই কুঁড়েঘর তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় মাটি, ছাউনির খড় জোগাড় করে ফেলে। দেখতে দেখতে আবার গড়ে ওঠে মোটা বাঁশে ঘেরা সুরক্ষিত গোটা একটা সাঁওতাল গ্রাম, যার অদ্ভুত পরিচ্ছন্নতা হিন্দুদেরও তাক লাগিয়ে দেয়।

এখানকার বিদ্যালয়টি এমন এক বিশেষ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যা সম্ভবত ভারতের পক্ষে একেবারে নতুন। কবি যখন তাঁর পিতার কাছে একান্তে বাস করতে এলেন,[৪৬] তখন কিছু ছেলেমেয়েকে তাঁর নিজের ইচ্ছা ও চিন্তাধারা অনুযায়ী গড়ে তুলতে চাইলেন। সংখ্যায় তারা অল্পই আসতে লাগল।[৪৭] অবাধ ধর্মীয় ও সামাজিক সহিষ্ণুতা হল এখানকার প্রথম ও প্রধান নিয়ম। শুরুতে কেউ কেউ অপেক্ষাকৃত নিচু জাতের

সহপাঠীদের সঙ্গে খেতে-বসতে বিতৃষ্ণা বোধ করত; নিজের নিজের ঐতিহ্য অনুযায়ী স্বাধীনভাবে চলাফেরা করায় তাদের কোনো বাধা ছিল না; হিন্দু ছাত্রদের মনের মধ্যে বদ্ধমূল এই সংস্কার একটু একটু করে দূর হল আর বর্তমানে তারা অধিকাংশই ভাইয়ের মতো একসঙ্গে বাস করে; শুধু কয়েকজন কট্টর গোঁড়া গুজরাতি ও মাদ্রাজি ছেলেমেয়ে এখনও আলাদাভাবে খাওয়াদাওয়া করে। রাঁধুনিরাও জাতিতে ব্রাহ্মণ বলে মনে হয় না; বস্তুত, ভৃত্যেরা কে কোন্ জাতের তা নিয়ে কবি বা তাঁর ছেলেমেয়েরা একটুও মাথা ঘামান না। খুব অল্পবয়সে, বারো বছরের আগে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করা হয়। এখানকার পড়াশোনা তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করে”[৪৫]। আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা আসন্ন, সেইজন্য এবার থেকে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি বিষয় পড়ার সুযোগ পাবে আশ্রমেই।

ভোর পাঁচটায় ঘন্টা বাজে। ছোটো বড়ো সবাই ঘুম থেকে উঠে পড়ে। গান, প্রার্থনা, ধ্যান দিয়ে শুরু হয় দিন, আবার শেষও তার গান দিয়ে। খাওয়াদাওয়া পুরোপুরি নিরামিষ। ডরমিটরি-ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব ছেলেমেয়েদের নিজেদেরই। তাদের বিছানা বলতে একটা তক্তাপোষ আর তার ওপর একখানা কম্বল। ঘরের কাজ করতে বেশি সময় লাগে না। পালা করে তারা এক-এক জনকে 'ক্যাপ্‌টেন' মনোনীত করে। তার ওপর একটা [ছাত্র] দলের তত্ত্বাবধানের ভার থাকে। আর দেখেশুনে মনে হয় সব-কিছু বেশ সুষ্ঠুভাবেই চলে।

এইসব ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা খালি পায়ে হাঁটে। অনেকসময় বড়োরাও এই নিয়মটি পালন করে থাকেন ; নইলে নানারকমের চটি-চপ্পল পরেন আর ঘরে ঢোকার আগে, দোরগোড়ায় সেগুলি গুছিয়ে খুলে রাখেন। কারণ মাটির ওপর শোয়া বসা করা হয় বলে এখানকার লোকের কাছে মেঝে, শতরঞ্জি ও মাদুরের ভারি কদর। এজন্যেই কি এখানে পোষা জীবজন্তু বড়ো একটা দেখা যায় না? গোটা শান্তিনিকেতনে আমি এ পর্যন্ত দুটো পোষা কুকুর দেখেছি ; বাকি সব প্রায় বেওয়ারিস। অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকের কাছে এদের বাস! কিন্তু তাদের কাছে এরা আবার যেন সমাজচ্যুত। খাবার সময় এরা বাড়ির চারধারে ঘুরঘুর করে; রোগা, গায়ের লোম উঠে গেছে, না পায় চোখে দেখতে, না আছে গলায় আওয়াজ— এমন আর কিছুই বাকি নেই যা দেখে মনে হতে পারে এরা মানুষের বন্ধু। আর এ-পর্যন্ত একটাও বেড়াল দেখি নি। অথচ সেদিন সন্ধ্যায় যোসেফ অত্যন্ত ভয় পেয়ে ছুটে এসে বলল : 'একটা বে-ড়াল— সত্যি ম-স্ত বড়ো— এই অ্যাত্তো বড়ো তার ল্যাজ, পিঠে অদ্ভুত সব দাগ, এইমাত্র রান্নাঘরটা এক লাফে পার হয়ে গেল।'[৪৬] এমনই তার ভয়বিহ্বল চেহারা যে আমি আর হাসি চেপে রাখতে পারলাম না।

২৬ নভেম্বর [১৯২১]— সকাল হতেই কবির দেখা পেলাম। অনুগ্রহ করে আমার খবরাখবর নিতে এসেছেন। অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হল। মহানন্দে শুনতে লাগলাম তাঁর কথা। তিনি ক্লান্ত। শহরের যত হট্টগোল আর ঝঞ্ঝাটের হাত থেকে পালিয়ে এখানে বাস করতে এসেছিলেন। অথচ দেখতে দেখতে তাঁর চার দিকে একটা শহর গজিয়ে উঠল। যেন এমন এক উজ্জ্বল প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্বের চার পাশে প্রত্যন্ত অঞ্চলের এই নির্জনতা জনাকীর্ণ হয়ে ওঠা বাঞ্ছনীয় নয়। সুরুলে, তাঁর নিজস্ব ভূখণ্ডে একটি কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন, এটি ক্রমবর্ধমান। আশ্রমের কিছু দূরে বিরাট এক বাগানের মধ্যে জমকালো একটা বাড়ি।[৪৭] বাগানটা এত বড়ো যে এখান থেকে তাকে ছোটোখাটো এক অরণ্য বলে মনে হয়। ভারতের জাতীয় কবি তাঁর রাজকীয় সব দানে দেশের যৌবনকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন।

এখন কৃষ্ণপক্ষ; সন্ধ্যায় কেউ লণ্ঠন হাতে, কেউ-বা একজন ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরোন ; এভাবেই আজ সন্ধ্যায়, উজ্জ্বল তারাভরা আকাশের তলায় রথী আর প্রতিমা বেড়াতে বেরিয়েছে ; দূরে কোনো গায়ক একটা হিন্দুস্থানি সংগীতের সুর ভাঁজছে। রাতের আকাশ আমাদের কাছে চিত্তবিনোদনের বস্তু হয়ে উঠেছে : সন্ধ্যা নামলেই আমরা মুগ্ধবিস্ময়ে বিশাল তারামণ্ডলের ঝলমলে মিছিলের ধীর ছন্দে জেগে-

ওঠা চেয়ে চেয়ে দেখি : কালপুরুষ তার অপূর্ব রেখাচিত্র এঁকে চলেছে, আলোকস্তম্ভের মতো ঝকমক করছে লুব্ধক, কিন্তু সপ্তর্ষিমণ্ডলের দেখা না পেলে এই ঝিকমিকে নভোমণ্ডল আমার কাছে কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকে।

২৭ নভেম্বর [১৯২১]— সিল্‌ভ্যাঁর বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ। আন্দাজ কুড়িজন শ্রোতা কলকাতা থেকে এসেছিলেন। পাঠশেষে তাঁদের মধ্যে তিনজন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন, অনেকক্ষণ রইলেন। লেখাপড়া, পরীক্ষা আর সবশেষে রাজনীতি নিয়ে কথাবার্তা হল। এই রাজনীতি এঁদের জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে কী ক্ষতিই না করছে। তাঁরা যেতে-না-যেতেই আর-একটি যুবক এসে উপস্থিত। পারীতে এঁর ভাইয়ের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়েছিল। তিনিই পাঠিয়েছেন এঁকে।[৭] আবার সেই একই বিষয়ের, প্রায় একই ভাষায় পুনরাবৃত্তি ঘটল। তিক্ততা আর ঘৃণা এই বিশাল দেশের দুটি মহান জাতির মধ্যে যে বিরোধের সৃষ্টি করেছে তা দেখে কষ্ট হয়। দিনের কাজ শেষ করে যখন আমরা শুতে যাবার কথা ভাবছি, তখন যোসেফ তার হিসেবনিকেশ নিয়ে হাজির। স্বভাবতই আগামী সপ্তাহে সে আমাদের সঙ্গে কলকাতায় যাবে, তার পর কিছুদিন পরে নেপালে। কিন্তু 'হুজুর আর মেমসাহেবের কাশ্মীরে যাওয়া উচিত হবে না, ওখানে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধবে।' এরপর শুরু হল রাজনীতির ব্যাখ্যান— এবার তারই পালা বটে— জার্মান, অস্ট্রিয়ানরা— (কখনও কখনও অস্ট্রিয়ানকে সে অস্ট্রেলিয়ান উচ্চারণ করে)— বলশেভিকদের সঙ্গে মিলে গোয়েন্দা উপন্যাসের খেলা খেলছে সেখানে। 'আর আফগানিস্তান, মানে ওই কাবুলিগুলো, যাদের সঙ্গে কাশ্মীরিদের এত আঁতাত, ওরাই কাশ্মীর দখল করে বসবে! সত্যি! বাজার থেকে কত খবরই না জানা যায়, সাহেবরা তার কিছুই জানেন না।' আলেকজান্ডার জীবিত থাকতেই তাঁর সাম্রাজ্য ভাগবাঁটোয়ারা চলছে।

পরদিন সন্ধ্যায়, রাতের খাওয়ার আগে, কলাভবনে সভা। আমরা পৌঁছে দেখি, সবাই এসে গেছেন। সেখানে প্রাচ্যের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শান্ত নিস্তরঙ্গ পরিবেশে সবাই মাটিতে পা মুড়ে বসেছেন। এঁরাই আবার চেঁচামেচি আর অঙ্গভঙ্গি করতে খুবই পটু। তরুণদের মধ্যে একজন কিছু বলছে। ভবন তার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে। এখানে একাধারে সে শিক্ষক ও ছাত্র। আঠারো বছর বয়স। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। ভারতে বসবাসকারী এক ফরাসি ভদ্রলোক ম্যসিয়ে পল্‌ রিশার[৮]-এর দত্তকপুত্র। সে 'দক্ষিণী হিন্দুদের রীতিনীতি'র বর্ণনা দিচ্ছে। তার বলা শেষ হলে সব চুপচাপ। এর পর ফরাসি অধ্যাপক[৯] এই সাধারণ আলোচনার পাশাপাশি নির্দিষ্ট ও সীমিত বিচার-বিশ্লেষণের প্রস্তাব করলেন; কোনো তরুণ তার পরিবারে ঠাকুরদার আমল থেকে নিজের আমল পর্যন্ত রীতিনীতির ঠিক যেমনটি পরিবর্তন লক্ষ করেছে, শুধু সেইটুকু বললেই যথেষ্ট কাজ হবে। একজন মারাঠি [বর্তমানে] সনাতন প্রথার শিথিলতার জন্য আক্ষেপ করলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাবসুলভ ঘরোয়া অভিজাত ভঙ্গিতে আলোচনাটিকে উঁচু পর্দায় তুলে বললেন, বিবর্তনের আবশ্যকতা আছে, নইলে জীবনের কোনো অস্তিত্বই থাকে না। রাত নটায় বাড়ি ফিরলাম লণ্ঠন হাতে। কিন্তু ভাঁড়ার থেকে কোনো অনুযোগ কানে এল না। আগামীকাল ফ্রান্সের কন্‌সাল[১০]-এর সংবর্ধনা। যাতে হুজুর আর মেমসাহেবের পক্ষে উপযুক্ত হয়, সেজন্য যোসেফ সৈন্যাধ্যক্ষের মতো নিবিষ্ট মনে হুকুম জারি করে চলেছে, রান্নার সরঞ্জাম ঠিকঠাক করে রাখছে। আমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, একান্ত যদি কিছু না পাওয়া যায়, তাহলে মাছ পাওয়া গেলে মাছ আর পায়রার মাংস রাতের খাবারের পক্ষে যথেষ্ট হবে। আমার কথায় কান না দিয়ে, সে উত্তর দিল, তিনটি পদ না হলেই নয়! শুধু যদি সোডা আর পাঁউরুটি পাওয়া যেত! জল তো তেমন ভালো নয়। আর সুরার ব্যাপারে আশ্রমের অন্যতম প্রধান নিয়মটি না ভাঙাই ভালো।

টীকা

১. অধ্যাপকের নাম হিড্‌জিভাই পেস্‌টনজি মরিস্‌। বোম্বাইয়ের অধিবাসী, পার্শি। বিশ্বভারতীর ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম অধ্যাপক। লেভি-দম্পতি এসে পৌঁছবার (৯ নভেম্বর ১৯২১) কয়েক মাস আগে ১৯২১ সালে 'এই সরল সজ্জন যুবা পণ্ডিতটি' বিশ্বভারতীর উত্তর বিভাগে (অধুনা বিদ্যাভবন) ফরাসি শেখাতে শুরু করেন। প্রমথনাথ বিশী তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' বইটিতে বলেছেন, তিনি ইংরেজিও পড়াতেন (১৯৬৫, পৃ. ১২৫)। তাঁর ফরাসি ক্লাসের প্রথম দিকের ছাত্র ছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলী, বিধুশেখর ভট্টাচার্য (শাস্ত্রী), ক্ষিতিমোহন সেন এবং আরো কয়েকজন অধ্যাপক। অনেকের পীড়াপীড়িতে তিনি এক সময়ে ডক্টরেট ডিগ্রিলাভের জন্য পারীর সর্‌বন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে যান। তখন তাঁর বয়স বত্রিশ। 'মরিস সর্বদাই ঈষৎ বিষণ্ণ বদন ধারণ করতেন— খুব সম্ভব এটাকেই বলে 'মেলানকলিয়া' প্যারিস থেকে ফেরার পথে তিনি জাহাজ থেকে অন্তর্ধান করেন। আমার মতো আর পাঁচজন তার কারণ জানি না। শুনেছি তিনি উইল করে তাঁর সর্বস্ব বিশ্বভারতীকে দিয়ে যান।' সূত্র: সৈয়দ মুজতবা আলী, 'গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন', ১৩৯৪, পৃ. ১১৭-২৩।

২. ফরাসি নাট্যকার মলিয়্যার্ (১৬২২-১৬৭৩)-এর লেখা পাঁচ অঙ্কের একটি কমেডির নাম—'ল্য বুর্জোয়া জাঁতীঅম' (*Le Bourgeois gentilhomme*)। 'হঠাৎ নবাব' শিরোনামে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫) এই নাটকটির অনুবাদ করেন— আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে কালিদাস চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, কলিকাতা বৈশাখ ১৮০৬ শক। এই ফরাসি নাটকের আর একটি অনুবাদ করেছেন কল্যাণকুমার দত্ত, নাম : 'জাতে ওঠার পাঁচালি'। দ্র. 'মেলিয়্যার- এর তিনটি নাটক', কলকাতা, ১৯৯২?।

৩. মূল শব্দটি neveu (ইং nephew)। সেইজন্য অনুবাদে 'ভ্রাতুষ্পুত্র' রেখেছি। কিন্তু দিনু ঠাকুর অর্থাৎ দ্বিপেন্দ্রনাথ-পুত্র দিনেন্দ্রনাথ (১৮৮২-১৯৩৫) রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র সুতরাং সম্পর্কে তিনি রবীন্দ্রনাথের নাতি, ভ্রাতুষ্পুত্র নন।

৪. কালিগুলা— এক আধপাগলা, স্বেচ্ছাচারী রোম-সম্রাটের ডাকনাম। তাঁর আসল নাম Gaius Caesar Augustus Germanicus (১২-৪১), রাজত্বকাল (৩৭-৪১)। গুপ্ত ঘাতকের হাতে মৃত্যু ঘটে ৪১ খ্রিস্টাব্দে।

সূত্র : ১. *Grand Larousse, Tome* II , Paris, 1960, p. 522,
২. *Petit Larousse,* Paris, 1963, p. 1238।

৫. অরবিন্দমোহন বসু (১৮৯৫-১৯৭৭) শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র। আনন্দমোহন বসুর পুত্র এবং আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর ভাগিনেয়। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ হলে তিনি জার্মানিতে পড়াশোনা করতে যান। তিনি ছিলেন পদার্থ-বিজ্ঞানী। রবীন্দ্রনাথের বহু গ্রন্থ ইংরেজিতে অনুবাদ করেন :: (বলাকা) *A Flight of Swans,* (মহুয়া) *Herald of Spring;* (প্রান্তিক, রোগশয্যায়, আরোগ্য, শেষ লেখা) *Wings of Death* ইত্যাদি।

৬. শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বর্ণিত দুর্গাপূজার সঙ্গে দিনলিপিতে উল্লিখিত দুর্গাপূজার বর্ণনার কোনো মিল নেই। এটি কোনো লৌকিক বা গ্রাম্য দেবীর পূজা বলেই মনে হয়।

৭. গ্রীক পুরাণে বর্ণিত দেবতাদের দূতী ও রামধনুর প্রতীক।

৮. 'স্যাঁ-স্যুলপিস্রি' ('saint-sulpiceries')। লেখিকা এখানে নতুন শব্দ তৈরি করেছেন বলে মনে হয়। প্রকৃত শব্দটি সম্ভবত 'ইমাজ্‌রি স্যুল্‌পিসিয়্যান' ('imagerie sulpicienne') যার অর্থ অদ্ভুত রঙচঙে নিম্ন মানের সব মূর্তি এবং যা কুরুচির পরিচায়ক। বস্তুত,পারী শহরের স্যাঁ-স্যুলপিস্ (saint-sulpice) গির্জাটির আশপাশে গড়ে ওঠা যেসব দোকানে ধর্মীয় শিল্পকর্ম বিক্রি হত, সেগুলি ছিল এই ধরনের।

৯. কোপাই নদী।

১০. 'রাজা রামমোহন রায় ২০ অগস্ট ১৮২৮, বুধবার ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা হত প্রতি শনিবার। পরে বুধবার নির্দিষ্ট হয় । মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করার পর ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠার দিনটিকে বিশেষভাবে স্মরণ করার জন্যই সম্ভবত মন্দিরে বিশেষ উপাসনার দিন ও শান্তিনিকেতনে সাপ্তাহিক ছুটির দিন হিসেবে পবিত্র বুধবার নির্দিষ্ট হয়।'
সূত্র : নৃপেন দাস, 'শান্তিনিকেতন নির্দেশিকা ও শান্তিনিকেতনে ইন্দিরার ছাত্রী জীবন', শান্তিনিকেতন, ২য় সং, ১৯৮৩, পৃ. ২৯।
এ ছাড়া দ্র. ১ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত', সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলিকাতা, ১৩৬০, পৃ. ১৭।
২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রামমোহন রায়', সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-১, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, পরিবর্ধিত ৪র্থ সং., আষাঢ় ১৩৫৩, পৃ. ৫৫।

১১. ড. বে (Bernard Bay) নামে একজন লিথুয়ানিয়ান রসায়ন-বিজ্ঞানী ১৯২১ সালে শান্তিনিকেতনে আসেন। এখানে তিনমাস থাকার পর তিনি হিমালয়ে যাত্রা করেন।
সূত্র : ১. সুপ্তি মিত্র, 'সাময়িকপত্রে রবীপ্রসঙ্গ : শান্তিনিকেতন' (বৈশাখ ১৩২৬-কার্তিক ১৩৩৩), টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ৪৯।
২ প্রবীরকুমার দেবনাথ, 'রবিতীর্থে বিদেশী', কলকাতা, ১৩৯০, পৃ. ১০১-১০২।

১২. প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে, ড. বে-র মতো লেভি-দম্পতিও ইহুদি।

১৩. লুই পাস্তার (Louis Pasteur, ১৮২২-১৮৯৫) স্বনামধন্য রসায়নবিদ ও জীববিজ্ঞানী। তাঁরই প্রবর্তিত পদ্ধতিতে জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসা এবং প্রাণরসায়নবিদ্যা (biochemistry)-র পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্য তাঁর নামে পারীতে ১৮৮৬ সালে আঁস্তিত্যু পাস্তার স্থাপিত হয়। ফ্রান্সে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রে এই প্রতিষ্ঠানটির অনেকগুলি শাখা আছে।

১৪. মূল পাঠ : ascc'te (ইং ascetic)।

১৫. ভিল্না (Vilna)— রাশিয়ার একটি প্রাচীন শহরের নাম। ১৯৪০ থেকে এটি লিথুয়ানিয়ার রাজধানী। বর্তমান নাম ভিলনিউস। ১৯২০ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত এটি পোল্যান্ডের অংশ ছিল। প্রসঙ্গত, লিথুয়ানিয়া এখন রুশ বাল্টিক প্রজাতন্ত্রগুলির অন্যতম স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। এখানে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষিত হয় ১১ মার্চ ১৯৯০।

১৬. ১. উলিয়ম উইনস্টান্‌লি পিয়র্সন (১৮৮১-১৯২৩)— ১৯০৭ সালে কলকাতার ভবানীপুরে লন্ডন মিশন সোসাইটির কলেজে উদ্ভিদ বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে প্রথম ভারতে আসেন। ১৯১২ সালের জুন মাসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় হয় ইংল্যান্ডে। এই বছরই ডিসেম্বর মাসে প্রথম শান্তিনিকেতনে আসেন, আর ১৯১৪ সালে (মার্চ-এপ্রিল) শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতার কাজে যোগদান করেন। অ্যান্ডরুজের মতো তিনিও আজীবন ছিলেন কবির ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও বন্ধু।
(দ্র. প্রণতি মুখোপাধ্যায়, 'উইলিয়ম উইনস্টানলি পিয়র্সন', টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলিকাতা, ১৯৮৪)।
২. চার্লস ফ্রিয়ার অ্যান্ডরুজ (১৮৭১-১৯৪০)— কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পেমব্রোক কলেজের ফেলো। ১৯০৪ থেকে দিল্লির সেন্ট স্টিফেন্স কলেজের অধ্যাপক এবং কেমব্রিজ ভ্রাতৃসংঘ (কেমব্রিজ ব্রাদারহুড) সম্প্রদায়ের দীক্ষিত পাদ্রি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ১৯১২ সালের ৭ জুলাইয়ের সন্ধ্যায় শিল্পী রোটেনস্টাইনের বাড়িতে ইংরেজি গীতাঞ্জলি পাঠের আসরে। ১৯১৩ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি তিনি প্রথম শান্তিনিকেতনে আসেন। ১৯১৪ সালের ১৫ এপ্রিল শান্তিনিকেতনে যোগদান করেন। আমৃত্যু নানা সূত্রে শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

১৭. মাদাম লেভি তাঁর দিনলিপিতে ফরাসি Hindou শব্দটি কখনো 'হিন্দুধর্মাবলম্বী', কখনো 'ভারতীয়' অর্থে ব্যবহার করেছেন। মূল রচনার সঙ্গে সংগতি রক্ষার জন্য আমি এখানে শব্দটিকে 'ভারতীয়' অর্থে ব্যবহার করলাম। এ ক্ষেত্রে Hindou শব্দটি রবীন্দ্রনাথকে নির্দেশ করেছে।

১৮. ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ওই সালের ৩১ মে 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন। প্রচলিত ধারণামতো ৩০ মে নয়।

১৯. ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্রবধূ হেমলতা ঠাকুর ('বড়মা') আশ্রমবধূ ও কন্যাদের নিয়ে একটি সাহিত্যসভার আয়োজন করেন। রবীন্দ্রনাথ সভাটির নামকরণ করেন 'সাধনা'। সেই সভা থেকে গড়ে ওঠে একটি মহিলাসমিতি। দ্বিজেন্দ্রনাথ সমিতিটির নাম রাখেন 'আলাপিনী'। 'আলাপিনী' সমিতি আজও সজীব। ১৯১৭ সাল থেকে 'আলাপিনী' সমিতির মহিলারা একটি পত্রিকাও প্রকাশ করতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ পত্রিকাটির নাম দেন 'শ্রেয়সী'। প্রথম দিকের কয়েকটি সংখ্যা বেরোয় হাতের লেখায়। হাতেলেখা এই পত্রিকাগুলি সম্পাদনা করেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শান্তা দেবী। যখন ছাপানো পত্রিকা শুরু হয়, তখন থেকে 'শ্রেয়সী'র সম্পাদিকা হন ক্ষিতিমোহন-পত্নী কিরণবালা সেন এবং পত্রিকাটি বহুকাল বন্ধ থাকার পর শ্রাবণ ১৩৯২ (জুলাই ১৯৮৫) থেকে আবার বেরোতে শুরু করেছে। নবপর্যায়ে প্রকাশিত 'শ্রেয়সী'র সম্পাদিকা ক্ষিতিমোহন-কন্যা অমিতা সেন।

শ্রীমতী অমিতা সেনের সৌজন্যে প্রাপ্ত তথ্য।

২০. দিনলিপিতে উল্লিখিত 'প্রাচ্যবন্ধু সমিতি (লেজামি দা লরিআঁ les Amis de l'Orient) পারী শহরের সুবিখ্যাত সংগ্রহশালা ম্যুজে গিম্যা (Musée Guimet)-এর অনতিদূরে অবস্থিত। প্রাচ্যবিদ পল প্যালিও Paul Pelliot (১৮৭৮-১৯৪৫), এমিল সেনার Emile Sénart (১৮৪৭-১৯২৮), জ.জেফ আর্কাঁ Joseph Aquin এবং সিল্‌ভাঁ লেভি Sylvain Lévi (১৮৬৩-১৯৩৫), ১৯২০ সালে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে চিত্রশিল্পী ও রবীন্দ্র-অনুরাগিণী আঁদ্রে কার্‌প্ল্যাস (Andrée Karpeleés)-এর সহোদরা স্যুজান কার্‌প্ল্যাস (Suzanne Karpeleés) এই সমিতির একনিষ্ঠ কর্মী ও সদস্যা (১৯৩৭-৩৮) ছিলেন। ১৯২০ সালে আচার্য সিল্‌ভাঁ লেভি প্রভৃতির উদ্যোগে এই প্রতিষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা জানানো হয়। ১৯২১ সালে প্রাচ্যবন্ধু সমিতির আমন্ত্রণে কবি Indian Folk Religion-এর ওপর একটি বক্তৃতা দেন। এই সময় উক্ত সমিতি 'বিশ্বভারতীর জন্য টাকা তুলে অতি দামী দামী দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পত্রিকাদি কিনলেন; এই কাজে শ্রীকালিদাস নাগ প্রচুর সহায়তা করেছিলেন। তখন তিনি সেখানে ডক্টর উপাধির জন্য তৈরি হচ্ছেন। বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারে উক্ত অমূল্য গ্রন্থরাজি আজও আছে।'

উদ্ধৃত অংশের সূত্র : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনকথা', কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৯২, পৃ. ১১৪।

ম্যুজে গিমা আর প্রাচ্যবন্ধু সমিতির ঠিকানা : 1. Musée Guimet, 19 Aveue d'le'na , 75016 Paris. 2. Les Amis de l'Orient, 12 Avenue d' le'na , 75016 Paris.

২১. স্ত্রাজবুর্ (Strasbourg)—'প্যারিস হইতে কবি সদলে চলিলেন স্ট্রাসবুর্গে (২৭ এপ্রিল ১৯২১)। স্ট্রাসবুর্গ আল্‌সেসের [Alsace] প্রধান নগর। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্স এই প্রদেশ ফিরিয়া পাইয়াছে। ফ্রাংকো- প্রুশিয়ান যুদ্ধে [১৯ জুলাই ১৮৭০] ফ্রান্স পরাভূত হইয়া এই প্রদেশ জারমেনিকে ছাড়িয়া দেয় [২৮ জানুয়ারি ১৮৭১]; প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পর জারমেনিকে পরাজিত করিয়া ফ্রান্স পুনরায় ঐ স্থানের মালিক হইয়াছে। ফরাসীরা এখন সমস্ত প্রদেশকে ফরাসীকরণে ব্যস্ত। স্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় এখন ফরাসী সংস্কৃতির কেন্দ্র। এইখানে সিলভাঁ লেভি অধ্যাপক হইয়া আসিয়াছেন। ইঁহারই উৎসাহে ও ব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি একদিন সভায় "The Message of the Forest" পাঠ করেন। ছাত্রদের নিকট রবীন্দ্রনাথকে পরিচিত করিতে উঠিয়া অধ্যাপক লেভি বলিলেন : "The university of Strassbourg do render homage not only to a poet of genius, and a genius marking the millenium of a great nation, the French University of Strassbourg entertains a sister University of India."

সূত্র : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক', তৃতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৯৭, পৃ. ৭৭।

২২. স্ত্রাজ্‌বুর্‌ এবং ফরাসি সরকারের তরফ থেকে বিশ্বভারতীতে 'বাক্স বাক্স বই' পাঠানোর ব্যাপারে অধ্যাপক লেভির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। এই উদ্দেশ্যে স্ত্রাজ্‌বুর্‌-এ তাঁরই উদ্যোগে 'কমিতে দ্য তাগর' (Comité de Tagore) নামে একটি সংস্থা গঠিত হয় এবং বিশ্বভারতীতে বই পাঠানোর জন্য ফরাসি সরকারকেও তিনি অনুরোধ করেন।
সূত্র : ফ্রান্স থেকে রবীন্দ্রনাথকে অধ্যাপক লেভির লেখা দুটি চিঠি। প্রথমটি লেখা স্ত্রাজ্‌বুর্‌ থেকে ১০ জুন ১৯২১ আর দ্বিতীয়টি পারী থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯২১। দুটি চিঠিই বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে রক্ষিত আছে।

২৩. এমিল ফাগ্যা (Emile Faguet,১৮৪৭-১৯১৬), ফরাসি সমালোচক। পেশায় অধ্যাপক।

২৪. শার্‌ল্‌-অগুস্‌ত্যাঁ সাঁত্‌-বাভ্‌ (Charles-Augustion Sainte-Beuve, ১৮০৪ ১৮৬৯), ফরাসি কবি, ঔপন্যাসিক ও সমালোচক।

২৫. এটি সম্ভবত ১৮৮২ সালে প্রকাশিত একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা যার পুরো নাম 'লেজানাল পলিতিক এ লিতেরাার' (*Les Annales politiques et litte raires*), প্রতিষ্ঠাতার নাম ফ্রাঁসোয়া সার্‌স্যা দ্য স্যাতিয়্যার ইনি ফ্রাঁসিস্‌ক সার্‌স্যা (১৮২৭-১৮৯৯) নামে বেশি পরিচিত।

২৬. মলিয়্যার্‌-এর পদ্যে লেখা এক অঙ্কের একটি কমেডির নাম 'স্গানার‍্যাল উ ল্য কক্যু ইমাজিন্যার' (*Sganarelle ou le Cocu imaginaire*)। স্গানার‍্যাল্‌ —এই চরিত্রনামটি মলিয়্যার্‌-এর অন্যান্য নাটকে বিভিন্ন ভূমিকায় দেখা যায়।

২৭. অষ্টম এডওয়ার্ড (১৮৯৪-১৯৭২)। পিতা পঞ্চম জর্জ (১৮৬৫-১৯৩৬)। ১৯১১ সাল থেকে অষ্টম এডওয়ার্ড ইংল্যান্ডের প্রিন্স অব্‌ ওয়েল্‌স বা যুবরাজ ছিলেন। এঁর রাজত্বকাল ১৯৩৬ সালের ২০ জানুয়ারি থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। দুবার বিবাহবিচ্ছিন্ন মার্কিন মহিলা ওয়ালিস্‌ ওয়ারফিল্ড স্পেন্‌সার সিম্পসন্‌-কে বিয়ে করার জন্য তিনি স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করেন।
প্রসঙ্গত, ১৯২১ সালে ভারত সফরকালে, ২৮ ডিসেম্বর কলকাতায় 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল'-এর উদ্বোধন করেন। সৌধটির নির্মাণকাজ শেষ হয় ১৯৩৪ সালে।

২৮. মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসের ডাকে ১৯২০ সালে গৃহীত প্রস্তাবক্রমে অভূতপূর্ব উদ্দীপনা-সহ অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা। ১৯২০-২২ সালের সর্বভারতীয় আন্দোলনের মূলে ছিল হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রয়াস। গান্ধীজির পরামর্শে কংগ্রেস খিলাফৎ আন্দোলন সমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়। সর্বস্তরে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। একদিকে সরকারি অনুষ্ঠান পরিহার, সরকারি বা সরকার-নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে পুত্রকন্যাদের নাম প্রত্যাহার, জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গঠন, আইন-আদালত ও আইনসভা বর্জন প্রভৃতি কর্মসূচির মাধ্যমে সরকারকে দুর্বল ও অচল করা, অপরদিকে হাতে সুতোকাটা ও বোনা, স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদন ও ক্রয়, অস্পৃশ্যতা পরিহার, হিন্দু-মুসলমান ঐক্যস্থাপন ও জাতীয় আন্দোলনের জন্য অর্থসংগ্রহ প্রভৃতি কর্মসূচির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার মধ্য দিয়ে আন্দোলন দুর্বার রূপ ধারণ করে। চরকা ও খাদি, নবজাগ্রত আত্মবিশ্বাস ও জাতীয়তাবোধের প্রতীক হয়ে ওঠে। চৌরিচৌরা ঘটনার পর গান্ধীজি-কর্তৃক আন্দোলন মাঝপথে স্থগিত হলে দেশে আশাভঙ্গের ছায়া নেমে এলেও, এই আন্দোলনের স্মৃতি অক্ষয় হয়ে আছে।

২৯. এই ভিক্ষুটি হলেন ধর্মাধার রাজগুরু মহাস্থবির। 'বিশ্বভারতী পরিষদ'-এর অন্যতম প্রথম সদস্য। ইনি বিশ্বভারতীর সূচনায় অভিধর্ম ও বৌদ্ধদর্শন পড়াবার জন্য আমন্ত্রিত হন। ১৯১৯ সালে ইনি শান্তিনিকেতনে আসেন। পালি সাহিত্য, বৌদ্ধদর্শন এবং মনোবিজ্ঞানেও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি সিংহলি ভাষাও শিক্ষা দিতেন। তাঁর শিক্ষাদানের মাধ্যম ছিল সরল হিন্দি ভাষা।
মূল পাঠ : banc (ইং bench)। বসবার এই আসনটি সিমেন্টের তৈরি।

শান্তিনিকেতনে 'বেদি' নামে পরিচিত বলেই শব্দটি ব্যবহার করা হল।

৩১. অধ্যাপক সিল্‌ভ্যাঁ লেভি।

৩২. বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী (১৮৯৮-১৯৫৬) এই ছাত্রদের অন্যতম।

৩৩. মূল পাঠ : *bonbons*।

৩৪. নীতু— নীতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১১- ১৯৩২)।
বুড়ি— নন্দিতা গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৭-১৯৬৭)। এঁরা মীরা দেবী (১৮৯৪-১৯৬৯) এবং নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৯-১৯৫৪)-এর পুত্রকন্যা। নীতীন্দ্রনাথ জার্মানিতে মারা যান। নন্দিতার বিয়ে হয় কৃষ্ণ কৃপালনী (১৯০৭-১৯৯২)-র সঙ্গে।

৩৫. গালিসিয়া (*Galicia*-- মূল পাঠ *Galicie*) পোল্যান্ডের অন্তর্গত একটি অঞ্চল, গত দুই মহাযুদ্ধের বহু সংঘর্ষ ঘটে এই জায়গাটিতে । ১৯৪৫ সালে অঞ্চলটি পোল্যান্ড ও ইউক্রেনের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়।

৩৬. স্টেলা ক্রামরিশ্ (Stella Kramrish ১৮৯৫ (?)-১৯৯৩)। এই অস্ট্রিয়ান মহিলা ১৯২১ সালে শান্তিনিকেতনে আসেন। তদানীন্তন ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় শিল্পকলা বিষয়ে কলাভবনে শিক্ষাদান করেন। এ ছাড়া বিশ্বভারতীতে জার্মান ভাষা ও ছোটো ছোটো মেয়েদের মিউজিক্যাল ড্রিলও শেখান। শিল্প-সমালোচক ও দক্ষ নৃত্যশিল্পী হিসেবেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। ১৯২৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে ভারত-শিল্পের অধ্যাপক (লেক্‌চারার) হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৪৪ সালে প্রফেসার পদে উন্নীত হন। সেখান থেকে ১৯৫০ সালে কর্মত্যাগের পর ফিলাডেল্‌ফিয়ায় পেন্‌সিল্‌ভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দক্ষিণ এশীয় শিল্পের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৬৪ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত নিউ ইয়র্ক-এর 'ইন্‌স্টিটিউট অব্ ফাইন আর্টস'-এ ভারত-শিল্পের অধ্যাপক হিসাবে যুক্ত ছিলেন। এ ছাড়া ১৯৫৪ সাল থেকে ফিলাডেল্‌ফিয়া শিল্পসংগ্রহশালায় ভারতীয় শিল্প বিভাগে দীর্ঘদিন কিউরেটর ছিলেন । ১৯৭৪ সালে বিশ্বভারতী 'দেশিকোত্তম' এবং ১৯৮২ সালে ভারত সরকার 'পদ্মভূষণ' খেতাব দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেন।

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে স্টেলা ক্রামরিশের সঙ্গে কবির প্রথম পরিচয় ঘটে ১৯২০ সালের জুন মাসে অক্সফোর্ডে এক বক্তৃতাসভায়। কবি তাঁর বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য শিল্পের ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য তাঁকে বিশ্বভারতীতে আমন্ত্রণ জানান এবং তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন ১৯২৩ সালে।

(দ্র. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক', তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৯৭, পৃ. ৫৩ ও ১৪৭)।

ভারতীয় চিত্রকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ওপর ডঃ ক্রামরিশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: *A Treatise on Indian Painting* (1924), *Indian Sculpture* (1933), *A Survey of Painting in the Deccan* (1937), *The Hindu Temple (two volumes,* 1946), *The Art of India : Traditions of Indian Sculpture Painting and Architecture* (1954), *Indian Sculpture in the Philadelphia Museum of Art* (1960), *Dravida and Kerala in the Art of Travancore* (1961) ; এ ছাড়া তাঁর *The Art of Nepal* (1964), *Manifestation of Siva* (1981) *The Presence of Siva* (1981), *Painted Delight* (1986) গ্রন্থগুলিও সমান সমাদৃত।

৩৭. রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৯২-১৯৮৫) শান্তিনিকেতনে আসেন ১৯০৯ সালে। আশ্রম বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ও গ্রন্থাগারের কাজে যোগ দেন ১৭ জুন ১৯১০ সালে (৩ আষাঢ় ১৩১৭)।

সূত্র : সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়, 'শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়', 'কথাসাহিত্য', কলকাতা,

শ্রাবণ ১৩৭৪, পৃ. ২০ ও ২২।

প্রভাতকুমারের ভূগোল পড়ানোর বিষয়ে তাঁর দুই ছাত্র: ১. কালীপদ রায় ও ২. ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মার উক্তি প্রণিধানযোগ্য: ১. "১৯১০ সাল থেকেই তাঁর কাছে আমার ভূগোল পড়া শুরু— অষ্টম বর্গ থেকে তৃতীয় বর্গ পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। মোট কথা, ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রভাতবাবু ছাড়া আর কারও কাছে ভূগোল পড়েছি বলে মনে পড়ে না। তিনি বিশ্বের প্রাকৃতিক ভূখণ্ডের সঙ্গে খুব ভাল করেই আমাদের পরিচয় ঘটিয়েছিলেন। আমাদের কখনও ভূগোলের কোন পাঠ্যপুস্তক ছিল না। প্রভাতবাবু মুখে মুখে ভূগোল পড়াতেন। ক্লাসে আমাদের নোট দিতেন; আমরা সেগুলো বাঁধানো 'ফেয়ার খাতা'য় লিখে প্রভাতবাবুকে দেখাতাম— তিনি সংশোধন করে দিতেন। শিশুছাত্রদের পর্যবেক্ষণ-শক্তি বিকশিত করাই ছিল তাঁর ভূগোল শিক্ষাদানের প্রধান উদ্দেশ্য।' ২. শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মার বর্ণনা '... শ্রদ্ধেয় প্রভাতবাবুর নিকটে আমরা ক্লাশ করতাম। তিনি লাইব্রেরীতে কাজ করতেন বলে সুবিধার জন্য তাঁর ক্লাশগুলি লাইব্রেরীর নিকটেই হত। প্রাক্-কুটীরের উত্তরের অপ্রশস্ত বারান্দার পশ্চিম প্রান্তে তিনি আমাদের ক্লাশটি নিতেন। নিকটেই ছিল ছায়াময় প্রাচীন একটি বিরাট সফেদা গাছ। ক্লাশটি আমাদের নিকটে খুবই আকর্ষণীয় ছিল। গল্পের ছলে তিনি নানা দেশের কথা বলে শোনাতেন। দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকার মাঝে পানামা খালে কি করে বড় বড় জাহাজগুলিকে একদিক থেকে অন্যদিকে পার করে দেয়, তার ছবি দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। বারান্দার উপরে ছাত্রদের দিয়ে মাটির একটি বড় আকারে ইটালী দেশের রিলিফ মানচিত্র তৈরি করিয়েছিলেন। পাহাড়ের উচ্চতা, নদী ইত্যাদি সবই দেখানো ছিল এই মানচিত্রটিতে ।

সূত্র : ১. কালীপদ রায়, 'শিক্ষক প্রভাতকুমার'; ২. ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা, 'অধ্যাপক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়'; 'রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার', দিলীপকুমার দত্ত ও প্রবীরকুমার দেবনাথ, বোলপুর ১৯৮৬, পৃ. ১১৪ ও ৪৯-৫০।

প্রসঙ্গত, প্রভাতকুমারের 'ভারতপরিচয়' ও 'বঙ্গ-পরিচয়' বই দুটিও উল্লেখযোগ্য।

৩৮. দ্র. ২০ ও ২২ সংখ্যক টীকা।

৩৯. শান্তিনিকেতনে বরাবরই দুবেলা ক্লাস হত। প্রাক্তন উপাচার্য ড. সুরজিৎ সিংহ (১৯৭৫-৮০)-এর ব্যবস্থাপনায় সম্ভবত ১৯৭৬ সালে দুবেলা ক্লাসের রীতি ভেঙে একবেলা পঠন-পাঠনের রীতি প্রবর্তিত হয়। সূত্র : বিশ্বভারতী বাংলা বিভাগের তৎকালীন অধ্যাপক ড. ভূদেব চৌধুরী মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত তথ্য।

৪০. রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সুহৃদ শ্রীশচন্দ্র মজুদার (১৮৬০-১৯০৮)-এর পুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৬-১৯২৬) ছিলেন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রথম যুগের ছাত্র। ১৯০৬ সালে রবীন্দ্রনাথ পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে আমেরিকা ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান কৃষি ও গোপালন বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যে। সন্তোষচন্দ্র দেশে ফিরে আসেন ১৯১০ সালের মাঝামাঝি। ১৯১১ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ইক্‌মিক্ কুকারের উদ্ভাবক ড. ইন্দুমাধব মল্লিক (১৮৬৯-১৯১৭)-এর কন্যা শৈলবালা দেবী (১৮৯৮-১৯৭৭)-র সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯১০ সাল থেকে আমৃত্যু তিনি বিশ্বভারতীর নানা কর্মধারার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শিক্ষকতা ছাড়াও তিনি এল্‌ম্‌হার্স্টের অন্যতম সহযোগীরূপে শ্রীনিকেতনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

৪১. সরিৎচন্দ্র মজুমদার (১৯১২-১৯৮৮) ও সুকৃৎচন্দ্র মজুমদার (১৯২১-)।

৪২. ক্ষিতিমোহন সেন (১৮৮০-১৯৬০) চাম্বা স্টেটের (হিমাচল প্রদেশ) শিক্ষা-অধিকর্তা ছিলেন। ১৯০৮ সালে শান্তিনিকেতনে আসেন।

৪৩. ফ্রান্সে সন্ন্যাসিনীদের একটি মঠের নাম। ১২০৪ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত এবং ১৭১২ সালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

৪৪. মূলপাঠ : 'temple hideue construction en fer et en verre.' 'hideuse' (ই. 'hideous') —বিশেষণটিকে অনুবাদে 'বিকট' করা হয়েছে।

মন্দিরপ্রসঙ্গে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে সংস্কৃতের অধ্যাপক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৭-১৯৫৯) বলেছেন : 'আশ্রমে মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন কার্য ১২৯৭ সালে এবং পর বৎসর ১২৯৮ সালের ৭ই পৌষ সোমবারে মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই মন্দির বর্‌ন কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে বিরচিত হইয়াছিল। ইহা লৌহময় অবয়ব সংযুক্ত রঞ্জিত কাচফলকে নির্মিত; ফলে ইহা যেমন সুদৃঢ় ও চিরস্থায়ী তেমনই বিচিত্র নয়নরঞ্জন।...'

সূত্র : হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কবির কথা', ১ম সং., কলকাতা, ১৩৬১, পৃ. ২।

৪৫. সম্ভবত মহাবোধি সোসাইটি (১৮৯২)।

৪৬. এই বক্তব্যের মধ্যে অসংগতি আছে : রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন ৭ পৌষ ১৩০৮ (২২ ডিসেম্বর ১৯০১)। আর মহর্ষি পৌষ ১২৯০ (ডিসেম্বর ১৮৮৩)-এর প্রথম সপ্তাহে শান্তিনিকেতনে যান, এইটিই তাঁর শেষ শান্তিনিকেতন বাস।

সূত্র : প্রশান্তকুমার পাল, 'রবিজীবনী', দ্বিতীয় খণ্ড, ২য় সং. কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ১৮৮।

৪৭. 'স্বাধ্যায়ের নিমিত্ত শান্তিনিকেতনে "ব্রহ্মবিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠিত করা মহর্ষির ইচ্ছা ছিল। গ্রন্থাগারের দক্ষিণ আলিসার মধ্যস্থলে চুন-বালির পঙ্কে "ব্রহ্মবিদ্যালয়" অঙ্কিত ছিল, ইহাই তাহার প্রমাণ। কিন্তু তৎপরিবর্তে কবি আশ্রমে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সূত্রপাত করিলেন। ইহার প্রাক্তন অধ্যাপকমণ্ডলী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, সিন্ধুদেশবাসী রেবাচাঁদ, জগদানন্দ রায় ও শিবধন বিদ্যার্ণব। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় পরে আশ্রমে যোগদান করেন। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গৌরগোবিন্দ গুপ্ত, প্রেমকুমার গুপ্ত, অশোককুমার গুপ্ত, সুধীরচন্দ্র রায় ইঁহারা প্রথম আশ্রম-বিদ্যার্থী। পর বৎসর [১৩০৯] অধ্যাপকরূপে আসিয়া অধ্যাপকবর্গে দেখিয়াছি মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদানন্দ রায়, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। লেখকও এই অধ্যাপকবর্গের অন্যতম। সন্তোষচন্দ্র মজুমদার এই বৎসরের প্রবেশিকাবর্গের ছাত্র— রথীন্দ্রনাথের সহপাঠী। এই বৎসরের ছাত্রসংখ্যা কিছু বাড়িয়া চৌদ্দটি হইয়াছিল, মনে হয়।

সূত্র : দ্র. ৮ সংখ্যক টীকা, উদ্ধৃত অংশের পৃ. ৬-৭।

৪৮. আশ্রম-বিদ্যালয়ের শেষ বা চূড়ান্ত পরীক্ষাগুলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গৃহীত হত। ১৯৫১ সালে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। সম্ভবত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শেষ পরীক্ষাটি গৃহীত হয় ১৯৫২ সালে। প্রসঙ্গত, 'আশ্রমের প্রবেশিকাবর্গের প্রথম ছাত্র রথীন্দ্রনাথ, সন্তোষচন্দ্র। ইহারা ১৩০৯ সালে প্রাইভেট ছাত্রভাবে প্রবেশিকা [এন্ট্রান্স] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।' উদ্ধৃত অংশের সূত্র : দ্র. ৮ সংখ্যাক টীকা, পৃ. ২৬।

৪৯. মূল পাঠে উদ্ধৃতিচিহ্ন নেই।

৫০. সুরুলের কুঠিবাড়ি : ১৯১২ সালে 'লণ্ডনে বাসকালে অক্টোবরের শেষ দিকে (২১ / ২২) আমেরিকা যাত্রার কয়েকদিন পূর্বে কবি হঠাৎ সুরুলের একটি ভাঙা কুঠিবাড়ি আট হাজার টাকায় ক্রয় করিয়া ফেলিলেন। ইহার মালিক ছিলেন কর্ণেল নরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ— সার্‌ (পরে লর্ড) সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের ভ্রাতা— বোলপুরের নিকটে একদা বর্ধিষ্ণু রায়পুর-নিবাসী। সুরুলের সেই কুঠিবাড়ি আজ বিশ্বভারতী পল্লী-উন্নয়ন-বিভাগের কেন্দ্র, শ্রীনিকেতন নামে ভারতের সর্বত্রই উহা প্রসিদ্ধ। এই বাড়িটি ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে নির্মাণকালে এতদঞ্চলের প্রধান ইঞ্জিনীয়ার মি. উইল্‌সন্‌-এর দ্বারা নির্মিত হয়।'

সূত্র : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক', দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় সং, কলিকাতা, ১৩৯৫, পৃ. ৪০৫।

প্রসঙ্গত, শ্রীনিকেতন নামে এই কেন্দ্র আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯২২।

৫১. সম্ভবত ঐতিহাসিক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও রবীন্দ্রানুরাগী ড. কালিদাস নাগ (১৮৯১-১৯৬৬)-এর মধ্যম ভ্রাতা প্রখ্যাত 'কল্লোল' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সহকারী সম্পাদক, সাহিত্যিক গোকুলচন্দ্র নাগ (১৮৯৪-১৯২৫)।

লেভি-দম্পতি শান্তিনিকেতনে আসেন ৯ নভেম্বর ১৯২১; তার আগে ও পরে ড. কালিদাস নাগ যে পারীতে ছিলেন তার একাধিক প্রমাণ পাওয়া যায় :

১. আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'জীবন-কথা'য় (১৯৭৯) প্যারিসে ছাত্রজীবন শীর্ষক অধ্যায়ের এক জায়গায় (পৃ. ১৬১) বলেছেন, 'যোলো নম্বর ব্র্য-দ্য-সোম্‌রার-এর বাড়িতে ১৯২১-১৯২২ সাল এই এক বছর ছিলুম, তখন ওখানেই আমার সঙ্গে থাকতেন— বন্ধুবর পরলোকগত অধ্যাপক সুবিখ্যাত কালিদাস নাগ...'

২. লেভি-দম্পতি ফ্রান্স থেকে শান্তিনিকেতনে রওনা হওয়ার আগে 'প্রাচ্যবন্ধু সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২০ সালে, যার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক লেভি আর ড. কালিদাস নাগ তার একজন একনিষ্ঠ সহযোগী। এই প্রতিষ্ঠানে একযোগে কাজ করার সময় তাঁদের পরিচয় হওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে হয়।

৩. আর-এক সূত্রে জানা যায়, 'আমাদের দেশের ড. কালিদাস নাগ, ড. ভি. পরাঞ্জপে, ড. পরশুরাম বৈদ্য, ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী (১৮৯৮-১৯৫৬), ড. মহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিতগণ লেভির অন্তেবাসী।'

উল্লিখিত কারণে প্রবাসী অগ্রজের গুরুর সঙ্গে স্বদেশে অনুজের দেখা করাটা স্বাভাবিক বলে অনুমান করা যেতে পারে।

৫২. দিনলিপিতে মাদাম লেভি পল্ রিশার্ (Paul Richard, ১৮৭৪-১৯৬৮) নামের আদ্যক্ষর P. R. ব্যবহার করেছেন। পল্ রিশার্ পণ্ডিচেরি অরবিন্দ আশ্রমের শ্রীমা-র [মারি (Maric) / মীরা (Mirra) রিশার্ — বিবাহের পূর্বপদবী আলফাসা (Alfassa), ১৮৭৮-১৯৭৩)] স্বামী। ব্যবহারজীবী, সাংবাদিক, কিছু দার্শনিক গ্রন্থের রচয়িতা। ১৯১০ সালে প্রথম পণ্ডিচেরিতে আসেন তিনি। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সেখানেই সাক্ষাৎ ও বন্ধুত্ব হয়। দ্বিতীয়বার সেখানে আসেন ১৯১৪ সালে সস্ত্রীক। তাঁদের যৌথ উদ্যোগে শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিনে (১৫ আগস্ট ১৯১৪) ইংরেজি-ফরাসি মাসিক পত্রিকা 'আর্য' প্রাকাশিত হয়। ফরাসি সংস্করণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন রিশার্-দম্পতি। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় (২২ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫) তাঁরা ফ্রান্সে ফিরে গেলে পত্রিকাটির ফরাসি সংস্করণ বন্ধ হয়ে যায়, অবশ্য জানুয়ারি ১৯২১ পর্যন্ত পত্রিকাটির ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হয় শ্রীঅরবিন্দের একক সম্পাদনায়। পল্ রিশার সস্ত্রীক আবার পণ্ডিচেরি আশ্রমে আসেন ১৯২০ সালে। তার আগে ১৯১৬ সালে রিশার্‌দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও পিয়র্সনের পরিচয় হয় জাপানে। পল্ রিশার্ শান্তিনিকেতনে আসেন ১৯২১ সালে; 'তিনি আমাদের মধ্যে পাঁচ সপ্তাহ ছিলেন। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার উন্নত সাধকজীবনের পরিচয় পাইয়া অনেকেই লাভবান হইয়াছেন। তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যায় নিয়মিতরূপে পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করিতেন। তিনি প্রত্যহ ফরাসি শ্রেণীতে পড়াইয়াছিলেন। সূত্র : 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা' দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩২৭, পৃ. ৬২৫।

তাঁর রচিত *To the Nation* গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। (সূত্র : 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা', দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৌষ ১৩২৭, পৃ. ২৪।

অন্যান্য সূত্র : 1. Romain Rolland, *Inde Journal 1915-1943*, nuvellîc édition, Albin Michel, 1960; 2. Nirodbaran, *Sri Aurobindo for All Ages, A Biography,* Pondicherry, 1990; 3. Satprem, *Mother or the Divine Materialism,* Institut De Recherches Evolutives, Paris, 1979; 4. *Hommage* a

Rabindranath Tagore, Extrait de France Asie No 170, (Nov.-Dec. 1961), Tokyo (Japan)— পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ, পিয়র্সন, পল্ রিশার্ ও মাদাম রিশারের ১৯১৬ সালে জাপানে এক-সঙ্গে তোলা আলোকচিত্রটি দ্রষ্টব্য; ছবিটি বিশ্বভারতী-রবীন্দ্রভবন প্রদর্শশালায়ও সংরক্ষিত আছে।

৫৩. অধ্যাপক সিল্‌ভ্যাঁ লেভি।

৫৪. ল্যুসীআঁা আ্যর্ন্যাস্ত (রজে) লারঁস Lucien Ernest (Roger) Laronce (১৮৬৯– ?) কলকাতার ফরাসি কন্‌সুলেটের দায়িত্ব নেন ১ অক্টোবর ১৯১৮ এবং কন্‌সাল্ জেনেরাল পদে আনুষ্ঠানিকভাবে নিযুক্ত হন ২৬ জানুয়ারি ১৯১৯। অবসরগ্রহণের আগে, ১০ জানুয়ারি ১৯২৩ পর্যন্ত এই পদে বহাল থাকেন।

কলকাতা কন্‌সুলেটের সৌজন্যে প্রাপ্ত তথ্য।

'রক্তকরবী' ও স্মৃতিলোক

তপোব্রত ঘোষ

'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থের উপসংহার 'মানবসত্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মানুষের তিনটি জন্মভূমির কল্পনা করেছিলেন। একজীবনে তিনবার জন্মায়, তাই সে 'ত্রিজ'। তার প্রথম জন্মভূমি, 'নিখিল পৃথিবী'। সমগ্র বসুন্ধরাকে সম্বোধন ক'রে রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, 'ওগো মা মৃন্ময়ী, তোমার মৃত্তিকা-মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই'— তখন কবিসত্তায় তিনি 'নিখিল পৃথিবী'র জাতক। মানুষের দ্বিতীয় জন্মভূমি, 'নিখিল ইতিহাস'। একেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'স্মৃতিলোক': 'মানুষের দ্বিতীয় বাসস্থান স্মৃতিলোক। অতীতকাল থেকে পূর্বপুরুষদের কাহিনী নিয়ে কালের নীড় সে তৈরি করেছে ; এই কালের নীড় স্মৃতির দ্বারা রচিত, গ্রথিত। এ শুধু একটা বিশেষ জাতির কথা নয়, সমস্ত মানুষ জাতির কথা। স্মৃতিলোকে সকল মানুষের মিলন'।— অর্থাৎ, এ কোনো জাতিক কিংবা দেশিক স্মৃতিলোক নয়; রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন, 'সমস্ত মানুষের স্মৃতিলোক'। মানুষের তৃতীয় আর শেষ জন্মভূমি, 'সর্বমানবচিত্তের মহাদেশ'। 'বসুন্ধরা'য় রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, 'সকলের ঘরে ঘরে / জন্মলাভ করে লই হেন ইচ্ছা করে' কিংবা 'ইচ্ছা করে মনে মনে / স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোকসনে/ দেশে দেশান্তরে'— তখন তিনি ঐ 'সর্বমানবচিত্তের মহাদেশ'-এই ভূমিষ্ঠ হন।

এখন আমাদের বিশেষভাবে দেখতে হবে মানুষের ঐ দ্বিতীয় জন্মভূমির দিকে— যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'স্মৃতিলোক', 'সমস্ত মানুষের স্মৃতিলোক', 'পূর্বপুরুষের কাহিনী নিয়ে' তৈরি-হয়ে-ওঠা 'কালের নীড়'।

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন একুশও পূর্ণ হয় নি— সেই কতদিন আগে তাঁর কল্পনায় এই 'স্মৃতিলোক' প্রথম ধরা দিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 'এমন শব্দ আছে যাহা আমাদের কাছে নিস্তব্ধতা, তেমনি এমন স্মৃতি আছে যাহা আমাদের কাছে বিস্মৃতি। আমরা যাহা একবার দেখিয়াছি, যাহা একবার শুনিয়াছি, তাহা আমাদের হৃদয়ে চিরকালের মতো চিহ্ন দিয়া গিয়াছে। কোনোটা বা স্পষ্ট, কোনোটা বা অস্পষ্ট, কোনোটা বা এত অস্পষ্ট যে আমাদের দর্শন-শ্রবণের অতীত। কিন্তু আছে।'[১]

'এমন স্মৃতি আছে যাহা আমাদের কাছে বিস্মৃতি'— এই কথাটা আরও একটু পরে, তাঁর তেইশ বছর বয়সে লেখা একটি রচনায় স্পষ্টতর হল। রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'আমাদের স্মরণশক্তি অতি ক্ষুদ্র, বিস্মৃতি অতিশয় বৃহৎ। কিন্তু বিস্মৃতি অর্থে তো বিনাশ বোঝায় না। স্মৃতি-বিস্মৃতি একই জাতি। একই স্থানে বাস করে। বিস্মৃতির বিকাশকেই বলে স্মৃতি, কিন্তু স্মৃতির অভাবকেই যে বিস্মৃতি বলে তাহা নহে। এই অতি বিপুল বিস্মৃতি আমাদের মনের মধ্যে বাস করিতেছে।...অবিশ্রাম কাজ করিতেছে এবং কোনো কোনোটা স্মৃতিরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে।'[২]

অর্থাৎ স্মৃতি হল বিস্মৃতির বিকাশ কিন্তু বিস্মৃতি মানে বিনাশ নয়। স্মৃতি যেখানে অ-পরিস্ফুট সেখানেই আমাদের অন্তর্গত বিস্মৃতির মহাবিশ্ব। এই 'অতি বিপুল বিস্মৃতি'কে কেন্দ্র ক'রেই ফ্রয়েড গড়ে তুলেছিলেন তাঁর পার্সোনাল আনকনশাস বা ব্যক্তিগত নির্জ্ঞানের সত্য আর তাকেও ব্যবচ্ছেদ ক'রে ইয়ুং আবিষ্কার করলেন কালেকটিভ আনকনশাস বা জাতিগত, সমষ্টিগত নির্জ্ঞানের সত্য। ইয়ুং-এর মতে ঐ সমষ্টিগত নির্জ্ঞানেই ব্যক্তিমানুষ নিজের মধ্যে বহন করে 'সমস্ত মানুষের স্মৃতিলোক'। সেই 'মহা-অতীত', ইয়েট্‌স্‌-এর সেই 'গ্রেট মেমরি'-কে সম্বোধন ক'রে রবীন্দ্রনাথ তাই বলেন, 'তব সঞ্চার শুনেছি আমার / মর্মের মাঝখানে, / কত দিবসের কত সঞ্চয় / রেখে যাও মোর প্রাণে! /...তুমি জীবনের পাতায় পাতায় / অদৃশ্য লিপি দিয়া / পিতামহদের কাহিনী লিখিছ / মজ্জায় মিশাইয়া।'

ইয়ুং-এর মতে, সুপ্রাচীনকাল থেকে পৃথিবীর নানা দেশের সাহিত্য-ভাণ্ডারে সঞ্চিত মিথগুলি ঐ সমষ্টিগত নির্জ্ঞানেরই সৃষ্টি। মিথের স্মৃতিলোকেই মানুষের আদিম বিশ্বাস আর বাসনার সূত্রগুলি অনুস্যূত হয়ে রয়েছে। বস্তুবাদের অহংকারে আধুনিক মানুষ প্রথমে এই মিথকে অতীতের যত অর্থহীন অলীক জল্পনা ব'লে পরিত্যাগ করতে চেয়েছিল; কিন্তু ক্রমশ তার এই উপলব্ধি হয়েছে যে বাইরে থেকে যতই নিজেকে পুরাণহারা ব'লে মনে হোক-না-কেন, তারও জীবনের পাতায় পাতায় অতীতের অদৃশ্য লিপিতে লেখা হয়ে আছে পিতামহদের কাহিনী। বলা বাহুল্য, মিথ বা পুরাণ সম্পর্কে আধুনিক মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তনের মূলে উনিশ শতকের সমাজবিজ্ঞান আর নৃতত্ত্বের নতুন গবেষণার প্রভাব কম নয়। আধুনিক মানুষের মনোলোকে মিথের এই প্রাণময় প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গে হার্বার্ট রীড ভারি সুন্দর করে একবার তাই বলেছিলেন যে, যেসব মিথ এতকাল মৃত ছিল তারা এখন আবার বেঁচে উঠেছে; এমনও হতে পারে, যেসব প্রাচীন দেবতা আর দেবকল্প পুরুষ ('heroes') কত সহস্র শতাব্দী আগে মানবচিত্তকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিলেন তাঁরা সবাই আবার শীঘ্র ফিরে আসছেন যিনি যাঁর নির্ধারিত ভূমিকায়।[৭]

১৯১২ সালে লেখা একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই মিথের ভাষাকেই বলেছিলেন, 'মানব-সাহিত্যে সকলের চেয়ে পুরাতন ভাষা'। 'অথচ' তিনি বলেছেন, 'আজও যখন কোনো কবি বিশ্বকে আপনার বেদনা দিয়া অনুভব করেন তখন তাঁহার ভাষার সঙ্গে মানুষের পুরাতন ভাষার মিল পাওয়া যায়। এই কারণে বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষের পৌরাণিক কাহিনী আর-কোনো কাজে লাগে না; কেবল কবির ব্যবহারের পক্ষে তাহা পুরাতন হইল না। মানুষের নবীন বিশ্বানুভূতি ঐ কাহিনীর পথ দিয়া আনাগোনা করিয়া ঐখানে আপন চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। অনুভূতির সেই নবীনতা যাহার চিত্তকে উদ্‌বোধিত করে সে ঐ পুরাতন পথটাকে স্বভাবতই ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়।'[৮]

মনে পড়ে যায়, পাশ্চাত্য আর্কেটাইপাল সাহিত্য-বিচারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা গিলবার্ট মারে এই মিথের মধ্যেই দেখেছিলেন এক 'ইটার্ন্যাল ডিউরেবিলিটি'।

২

রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' বিংশ শতকের একটি অত্যাধুনিক সমস্যার ভিত্তিতেই দাঁড়িয়ে আছে। অথচ নাটকের অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'আধুনিক সমস্যা বলে কোনো পদার্থ নেই, মানুষের সব গুরুতর সমস্যাই চিরকালের'। সদ্যতনকে সনাতনের সঙ্গে, সাম্প্রতিককে শাশ্বতের সঙ্গে অবিচ্ছেদে এক ক'রে দেখার জন্যই 'রক্তকরবী'র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঐ অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ বার বার মিথের ভাষায় কথা বলেন।

রবীন্দ্রসাহিত্য যাঁরা গভীরভাবে অনুশীলন করেন তাঁরা এই কথাটা ভেবে দেখবেন যে শুধু নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয়, তাঁর অন্যান্য সাহিত্যের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ যেখানেই নিজস্ব ভাষ্য রচনা করেছেন তার কোথাও রবীন্দ্রনাথ এত বেশি মিথের ভাষায় কথা বলেন নি। শুধু তাই নয়, 'রক্তকরবী'তে ধনতন্ত্রের স্বৈরাচারী স্পর্ধার ফলে উদ্ভূত সমস্যার মীমাংসায় যেটা সবচেয়ে রাবীন্দ্রিক চিন্তা— ধনতন্ত্রের অন্তর্গত দ্বৈধ, নিজেরই মৃত্যুকে নিজেরই মধ্যে লালন— সেটিকেও রবীন্দ্রনাথ আগাগোড়া মিথের বুনোটেই শিল্পিত করে তুলেছেন।

'রক্তকরবী'র এই আলোচনায় তাই আমরা দুটি ব্যাপারে লক্ষ রাখব : ক. আধুনিক ধনতন্ত্রের সমস্যা কী ক'রে মিথের ভাষায় রূপকল্পিত হয়ে যাচ্ছে। খ. আধুনিক ধনতন্ত্রের ওই অন্তর্বিরোধ কী ক'রে নাটকের আদ্যন্ত একই মিথের পরস্পর-বিরোধী তাৎপর্যে উপস্থাপিত হচ্ছে।

৩.

'রক্তকরবী'র ঘটনাস্থল 'যক্ষপুরী'। 'যক্ষপুরী' নামের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'পৌরাণিক

যক্ষপুরীতে ধনদেবতা কুবেরের স্বর্ণসিংহাসন।...যে-জায়গাটার কথা হচ্ছে সেখানে মাটির নিচে যক্ষের ধন পোঁতা আছে। তাই সন্ধান পেয়ে পাতালে সুড়ঙ্গ-খোদাই চলছে, এইজন্যই লোকে আদর ক'রে একে যক্ষপুরী নাম দিয়েছে।'

ভূগর্ভস্থ এই যক্ষপুরীর কল্পনা প্রথম পাওয়া যাবে 'রক্তকরবী'র বহুকাল আগে লেখা 'সম্পত্তি সমর্পণ' গল্পে। যজ্ঞনাথ কুণ্ডু মাটির নীচে যখ দিয়েছিল। 'যজ্ঞনাথ' ধ্বনি-অনুষঙ্গে 'যক্ষনাথ'কে মনে পড়িয়ে দেয়। যক্ষনাথ কুবের। স্কন্দপুরাণে যক্ষনাথ কুবেরের পুত্র 'কুণ্ড'। গল্পের উপসংহারে যজ্ঞনাথ ভূগর্ভ থেকে উপরে উঠবার মই খুঁজে না পেয়ে 'বায়ুহীন আলোকহীন মহাগহ্বরে' চিরকালের জন্য অধঃপতিত হয়েছে। 'রক্তকরবী'র বিশুপাগল বলেছে, 'যক্ষপুরীর কবলের মধ্যে ঢুকলে তার হাঁ বন্ধ হয়ে যায়।... আজ তার সেই আশাহীন আলোহীন জঠরের মধ্যে তলিয়ে গেছি।' যজ্ঞনাথ কুণ্ডু তার পৌত্র গোকুলকে যখ দিয়েছিল। 'রক্তকরবী'র বর্তমান পাঠে যক্ষানুচর এক সুড়ঙ্গ-খোদাইকরের চরিত্র আছে— যার নাম গোকুল। 'রক্তকরবী'র যে চারটি পাণ্ডুলিপি এখন মুদ্রিত অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে তার কোনোটিতেই এই চরিত্রটি নেই। গোকুল পরবর্তী সংযোজন।

যক্ষপুরীর কেন্দ্রবিন্দু কুবেরগড়। পুরাণে কুবের উত্তরদিকের অধিপতি। এই কল্পনার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে 'কুবের উত্তরদিকের অধিপতি, এই হিসেবে তাঁকে উত্তরদিকের সূর্য-রূপে গ্রহণ করা চলে। শীতকালে সূর্যের যখন উত্তরায়ণ শুরু হয়, সেই সময়ই ফসল ওঠার সময়। সুতরাং ধনাধিষ্ঠাতৃত্বের সঙ্গে সম্পর্ক আছে'।[৫] আমাদের মনে পড়ে যায় পৌষের নাটক 'রক্তকরবী'তে নিজের নিঃসঙ্গতা বোঝাতে গিয়ে যক্ষরাজ নন্দিনীকে বলেছিলেন, 'আমার সঙ্গী? মধ্যাহ্নসূর্যের কেউ সঙ্গী আছে?'

'মেঘদূত'-এ রামগিরিতে নির্বাসিত যক্ষ অলকার উদ্দেশে মেঘকে উত্তরাভিমুখে পাঠিয়েছিল। 'উত্তরমেঘ' -এ বলা হয়েছে, ধনপতি কুবেরের বাড়ির উত্তরেই যক্ষের বাড়ি। ধ্বজাপূজা উপলক্ষে যক্ষপুরীর বাগানবাড়িতে সর্দারদের ভোজের আয়োজন। সেই উৎসবে যোগ দিতে সর্দারের স্ত্রী আসছে যক্ষপুরীতে— মোড়লের পাড়ার কাছে ডাকবদল হবে। 'রক্তকরবী'র দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ পাণ্ডুলিপিতে সর্দার মেজোসর্দারকে বলছে, 'আমার স্ত্রীকে ভাবছি মন্দরপুর থেকে এগিয়ে নিয়ে আসব'। 'রক্তকরবী'র বর্তমান পাঠে অবশ্য এই সংলাপটি নেই। 'মেঘদূত'-এ যক্ষরাজ কুবেরের একটি উদ্যানের নাম 'বৈভ্রাজ'। পুরাণে কুবেরের অন্যান্য উদ্যানের মধ্যে একটি হল 'মন্দর'।

'রক্তকরবী'র মুদ্রিত চারটি পাণ্ডুলিপিতেই চন্দ্রা বলেছে, 'অঘ্রান শেষ হয়েছে'। অগ্রহায়ণ থেকেই সূর্যের উত্তরায়ণ শুরু ব'লে প্রাচীনকালে অগ্রহায়ণ থেকেই শুরু হত সৌর-বৎসর গণনা। অগ্রহায়ণ তাই মার্গশীর্ষ। 'রক্তকরবী'র বর্তমান পাঠে চন্দ্রা বলেছে, 'নবান্নের সময় এল ব'লে'। আসন্ন এই নবান্ন-উৎসবের সূত্রেই পৌষের আবাহন-সংগীতটি হয়েছে নাটকের প্রাণসংগীত। উত্তরাভিমুখে সূর্য-রূপী কুবেরের অয়ন-কাল ফসল-ওঠার সময়— তাই গাওয়া হয়েছে, 'ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে'।

উত্তরদিকের এই যক্ষপুরীর একটি আভাস মিলবে ১৮৯৮ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি গ্রন্থ-সমালোচনায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'উত্তর-আমেরিকার ক্লণ্ডাইক-নামক দুর্গম তুষারমরুর মধ্যে স্বর্ণখনির সংবাদ পাইয়া লোভোন্মত্ত নরনারীগণ দীপশিখালুব্ধ পতঙ্গের মতো কেমন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়াছে— পথের বাধা, প্রাণের ভয়, অন্নকষ্ট কিছুই তাহাদিগকে রোধ করিতে পারে নাই, সে বৃত্তান্ত সংবাদপত্রে সকলেই পাঠ করিয়াছেন।...ইহার উদ্দীপক দুর্দান্ত লোভ।'[৬]

সংবাদপত্রের একটি সাম্প্রতিক খবরকে সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক উপমায় উপমিত ক'রে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'দুর্যোধনপ্রমুখ কৌরবগণ যেমন লোভের প্ররোচনায় উত্তরের গোগৃহে ছুটিয়াছিল, ইহারাও তেমনি ধরণীর স্বর্ণরস দোহন করিয়া লইবার জন্য মৃত্যসংকল উত্তরমেরুর দিকে ধাবিত হইয়াছে।'[৭] 'উত্তরের গোগৃহ' বলতে

বিরাট রাজ্যের উত্তরদিকের গোষ্ঠভূমিকে বোঝানো হচ্ছে। আর 'গোগৃহ'র সূত্রেই এসেছে 'ধরণীর স্বর্ণরস দোহনের কল্পনা'। বলা বাহুল্য, 'গো' শব্দের একটি অর্থই হল 'ধরণী'। রবীন্দ্রনাথ বসুন্ধরাকে তাই বলেছিলেন,'শ্যাম কল্পধেনু'।

'রক্তকরবী'র যক্ষরাজও 'ধরণীর স্বর্ণরস' মৃত্যু-শোষণে আকর্ষণ ক'রে নেন— তাই মোড়লপাড়ায় গোরুর মড়ক লাগে। গোরুর সঙ্গে কর্ষণজীবী সভ্যতার কল্পনা ঘনিষ্ঠ হয়ে রয়েছে ; আর সেইসঙ্গে রয়েছে যারা কর্ষণ করে তারাও। যক্ষরাজ পালোয়ানের 'শুধু জোর নয়, একেবারে ভরসা পর্যন্ত শুষে নেয়'। 'রাজার এঁটো' যারা বেরিয়ে আসে রাজার মহলের খিড়কি-দরজা দিয়ে তাদের মধ্যে 'মাংসমজ্জা মনপ্রাণ আর কিছুই' অবশিষ্ট থাকে না। এই প্রসঙ্গে যক্ষের পৌরাণিক জন্মবর্ণনাটি মনে পড়ে। বিষ্ণুপুরাণ বলছেন, যক্ষ ক্ষুধার্ত ব্রহ্মার সৃষ্টি। পিতার এই ক্ষুধা পুত্রের মধ্যে দারুণতর হয়ে দেখা দেয় বলেই জন্মলাভের পর যক্ষ স্বয়ং ব্রহ্মাকেই ভক্ষণ করতে উদ্যত হয়। 'রক্তকরবী'র রাজা বলেন, 'পুরাণ ব'লে কিছু নেই। বর্তমান কালটাই কেবল বেড়ে বেড়ে চলেছে'। নাটকের প্রথম পাণ্ডুলিপিতে যক্ষরাজ নন্দিনীকে বলেন, 'শক্তি কেবল শক্তি খায়, আর বলে, আমি থাকব আমি থাকব।...ক্রমাগতই এই থাকার পেট ভরিয়ে চলা, এ কী বীভৎস থাকা।' যক্ষরাজের খাবারকে নাটকের দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিতে বলা হয়েছে,'জ্যান্ত খাবার'।

পুরাণে যক্ষরাজ কুবের দেখতে কুৎসিত। কুৎসিত 'বের' বা শরীর ব'লে তাঁর নাম কুবের। লক্ষ্মীর সম্পদে শ্রী আছে তাই লক্ষ্মী সুন্দরী; কিন্তু কুবের শুধু সঞ্চয় করে, সামঞ্জস্য করে না— তাই সে কুৎসিত। 'রক্তকরবী'র যক্ষপুরী যেমন সুন্দর নয়, যক্ষরাজও তেমনি সুন্দর নন। বিশু বলেছে,'যক্ষপুরীর হাওয়ায় সুন্দরের 'পরে অবজ্ঞা ঘটিয়ে দেয়, এইটেই সর্বনেশে।' নাটকের প্রথম পাণ্ডুলিপিতে নন্দিনী দেখতে পেয়েছিল যক্ষরাজের এই জরামলিন মূর্তি : 'মুখের চামড়া ঝুলে পড়েছে, চোখের পাতা তুলতে পারছে না'। দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিতে যক্ষরাজ 'প্রকাণ্ড রাশ-করা স্থবিরতা', তার 'হাত দুটো পড়ে আছে যেন শালগাছের ঝড়ে মুচড়ে পড়া ডাল'। 'প্রকাণ্ড রাশ-করা স্থবিরতা'র সূত্রেই মনে পড়ে যায় 'গুপ্তধন' গল্পে যক্ষপুরীর সুড়ঙ্গে নিদ্রিত স্তূপাকার ভেকগুলিকে। 'রক্তকরবী'তে বেঁচে থাকার বদলে ঐ স্থবিরের শুধু টিঁকে থাকার অস্বাভাবিকতাকে যখন পাথরের কোটরে তিন হাজার বছর ধরে টিঁকে থাকা ব্যাঙের সঙ্গে উপমিত করা হয় তখন ঐ টিঁকে থাকার একান্ত কুশ্রীতা যেন মূর্ত হয়ে ওঠে। আমাদের মনে পড়ে,'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধে সৌন্দর্যতত্ত্বের পক্ষে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ অ্যাপোলোর হাসি আর ব্যাঙের হাসিকে একাকার-ক'রে-ফেলা 'বৈজ্ঞানিক সাম্যতত্ত্ব'র প্রতিবাদ করেছিলেন।

উত্তরদিকের যক্ষপুরীর সঙ্গেই রবীন্দ্র-কল্পনায় মিশে গিয়েছে পশ্চিমদিকের যক্ষপুরী। স্বভাবতই এস্ট্যাব্লিশড মিথ -এর সঙ্গে এখানে সংযুক্ত হয়েছে ক্রিয়েটিভ মিথ। আসলে তাঁর সমকালীন ধনতান্ত্রিক পাশ্চাত্যকেই রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমা যক্ষপুরীর নব্য-পৌরাণিক রূপকল্পে নতুন ক'রে সৃষ্টি করেছেন। ১৮৯০ সালে দ্বিতীয়বার য়ুরোপযাত্রার সময় রবীন্দ্রনাথের পশ্চিমাভিমুখী জাহাজ যখন স্বদেশের উপকূল ত্যাগ করল, তখন তাঁর কবিচিত্ত শুনেছিল ভারতবর্ষের এই করুণ পিছু-ডাক : 'বৎস, কোথায় যাস! কোন্ দূর সমুদ্রের তীরে? কোন্ যক্ষগন্ধর্বদের স্বর্ণপুরীতে?'

'রক্তকরবী'তে বিশুর স্ত্রী ঘরের যে-জানালাটি দিয়ে দেখেছিল যক্ষপুরীর স্বর্ণচূড়া, সেই জানালাটিকে নাটকের প্রথম পাণ্ডুলিপিতে বিশেষিত করা হয় নি; কিন্তু নাটকের দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি থেকেই সেটি 'পশ্চিমের জানালা'।

৪.

'রক্তকরবী'র যক্ষরাজের একটি গোপন পরীক্ষাগার আছে। সেইখানে তাঁর স্বর্ণভাণ্ডার। এই সোনাকে বলা

হয়েছে, 'অনেক যুগের মরা ধন'। যক্ষরাজ তাঁর পরীক্ষাগারে 'সেই মরা ধনের শবসাধনা' করেন ; তার প্রেতকে বশ করতে চান। কারণ 'সোনার তালের তাল-বেতালকে বাঁধতে পারলে' পৃথিবীকে তিনি পাবেন মুঠোর মধ্যে। এই তালবেতালের শবসাধনায় তাঁর সহায়ক অধ্যাপক আর বস্তুবাগীশ। আবার বলা হয়েছে যে ওই সোনার তালগুলো হল মদ, যক্ষরাজের নিরেট মদ— সেই মদের নেশার শেষ নেই।

যক্ষরাজ জরাগ্রস্ত। তাই রঞ্জনের যৌবনে তাঁর ঈর্ষা। তিনি বলেন, 'সোনাকে জমিয়ে তুলে তো পরশমণি হয় না— শক্তি যতই বাড়াই যৌবনে পৌঁছল না'। অনায়ত্ত এই যৌবনকে আয়ত্ত ক'রে শারীরিক অমরত্বলাভের দুঃসাধ্য চেষ্টায় যক্ষরাজ যৌবনকে শোষণ করেন। তাঁর পরীক্ষাগার থেকে যৌবন-খোয়ানো প্রেতকল্প যুবারা বেরিয়ে আসে। তাদের যৌবনকে শুষে নিয়ে আগুনের শিখার মতো লক্‌লক্ ক'রে ওঠেন যক্ষরাজ : 'ছোটোগুলো হতে থাকে ছাই আর ওই বড়োটা জ্বলতে থাকে শিখা'।

এই সমস্ত অনুপুঙ্খগুলির তলে তলে প্রাচীন অ্যাল্‌কেমি-বিদ্যার স্মৃতি কাজ ক'রে যায়। আধুনিক কেমিস্ট্রির প্রত্ন-রূপ এই অ্যালকেমি। 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি'র ভূমিকায় ১৮৯০ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,'য়ুরোপের মধ্যযুগে...অ্যালকেমি-তত্ত্বান্বেষীরা গোপন গৃহে নিহিত থেকে বিবিধ অদ্ভুত যন্ত্রতন্ত্রযোগে চিরজীবনরস বা "Elixir of life" আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছিলেন'। অবশ্য মধ্যযুগের য়ুরোপে এই অ্যালকেমি-চর্চার অনেক আগেই প্রাচীন ভারতবর্ষ, চিন, আরব আর মিশরে অ্যালকেমি বা কিমিয়া-বিদ্যার চর্চা প্রচলিত ছিল। তাঁদের রহস্যময় আভিচারিক সাধনার মূল লক্ষ্য ছিল দুটি। প্রথম, সোনা তৈরি করা; দ্বিতীয়, 'চিরজীবনরস' বা 'ইলিক্সির অব লাইফ' আবিষ্কার ক'রে অমরত্ব পাওয়া। এই দুই পৃথক অভীষ্ট বস্তু আবার এক জায়গায় অভিন্ন। কারণ সোনাই অ্যালকেমিস্টদের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান ধাতু এবং অমরত্বের চেয়ে মূল্যবান আর কীই বা আছে! ঋগ্বেদে সোনার সঙ্গে দীর্ঘ আয়ুর সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। প্রাচীন আর মধ্যযুগের ভারতে অ্যালকেমি-চর্চা হত মূলত বৌদ্ধ আর হিন্দু তান্ত্রিক সম্প্রদায়ে। চিনা অ্যালকেমিস্টরা মনে করতেন যে সবচেয়ে ভালো ইলিক্সির বা অমৃতরস হচ্ছে গলানো সোনা দিয়ে তৈরি একরকম পানীয়।

অ্যালকেমিস্টদের এই দুই অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যই দরকারী ছিল পরশমণি, পরশপাথর। 'খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর' যেমন মনে পড়বে আমাদের, তেমনিই মনে পড়বে, 'একদিন নদীতটে কুড়ায়ে পেয়েছি বটে পরশমাণিক'। এই পরশপাথরকে বলা হত সোনা তৈরির রাসায়নিক পরীক্ষায় অত্যাবশ্যক অনুঘটক। পরশপাথর গুঁড়িয়ে কয়েকটি বিশেষ ধাতুর অজ্ঞাত সমবায়ের সঙ্গে মিশিয়ে উত্তপ্ত করতে থাকলে মিশ্রিত পদার্থের রঙ বদলাতে শুরু করে ; শেষ পর্যন্ত যখন লাল রঙ ধরে তখন বুঝতে হবে সোনা তৈরি হয়েছে। আবার এই পরশপাথর-চূর্ণ থেকেই তৈরি হত না কি 'প্যানাসিয়া' বা সর্বরোগহর যৌবনপ্রদায়ী ওষুধ। বলা বাহুল্য, অষ্টাদশ শতকে ল্যাভয়েশিয়র যখন আধুনিক কেমিস্ট্রির সূচনা করলেন তার অনেক আগেই ওই প্রাচীন অ্যালকেমি পরিত্যক্ত হয়েছে। বেন্ জনসনের 'অ্যালকেমিস্ট' উপহাসের পাত্র, ভণ্ড প্রতারক।

আমাদের মনে পড়বে ১৮৯২ সালে লেখা রবীন্দ্রনাথের গল্প 'স্বর্ণমৃগ'। দরিদ্র দম্পতির কাছে এক সন্ন্যাসী এসে বলেছে যে সে সোনা তৈরি করতে পারে। স্বভাবতই সেই সোনা-তৈরির পরীক্ষায় অর্থ জোগাতে গিয়ে দরিদ্র দম্পতি দরিদ্রতর হয়েছে। 'নিস্তব্ধভাবে অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে বসিয়া কটাহের দিকে চাহিয়া উভয়ের চোখে পল্লব নাই, মুখে কথা নাই। তৃষিত একাগ্র নেত্রে অবিশ্রাম অগ্নিশিখার প্রতিবিম্ব পড়িয়া চোখের মণি যেন স্পর্শমণির গুণ প্রাপ্ত হইল।...সন্ন্যাসী আশ্বাস দিল, কাল সোনার রঙ ধরিবে।'

'রক্তকরবী'র যক্ষরাজ শুধু সোনার তালের তাল-বেতালকেই বাঁধতে চান নি, তিনি অমরত্বও পেতে চেয়েছিলেন আর সেই চাওয়ার পরিণতিতে তাঁর সঙ্গে পরশপাথর-চাওয়া খ্যাপার বিশেষ পার্থক্য নেই : 'আমি যৌবনকে মেরেছি— এতদিন ধ'রে আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে কেবল যৌবনকে মেরেছি। মরা যৌবনের অভিশাপ আমাকে লেগেছে।'

৫.

যক্ষরাজের নাম দেওয়া হয়েছে 'মকর'। কেন এই নাম— তার ব্যাখ্যায় অধ্যাপক বলেছেন, 'মকরের মতো ওর চোখের উপর পর্দা নেই'। জৈনপুরাণমতে যক্ষের চোখে পলক পড়ে না। স্বভাবতই বাজপাখির শ্যেনচক্ষু আমাদের মনে পড়বে। নন্দিনীর ভাষায় যক্ষরাজের দৃষ্টি 'বর্শাফলার মতো'। বৌদ্ধতন্ত্রে কুবেরের হাতে থাকে নকুল বা বেঁজি। 'রক্তকরবী'র যক্ষরাজের বাঁ-হাতে বসেছিল একটা বাজপাখি। বাজ কপোতারি। নন্দিনীকে যক্ষরাজ বলেন, 'পালাও তুমি, পায়রা যেমন পালায় বাজপাখির ছায়া দেখে'। এখানে যক্ষরাজ নিজেই যেন বাজপাখি হয়ে উঠেছেন।

কুবের অষ্টদন্ত। বলা হয়েছে, এই আটটি দাঁত আটটি দিকের প্রতীক। দশদিকের বদলে আট দিক বলার কারণ যক্ষপুরী পৃথিবীর চূড়ান্ত অধোদেশে অবস্থিত; তাই তার অধঃ নেই, ঊর্ধ্বও নেই। কাজেই তার আট দিকই সবদিক। এই কারণেই 'রক্তকরবী'র মকররাজের নিষ্পলক তীক্ষ্ণাগ্র দৃষ্টি সর্বগ্রাসীও বটে। চশমা তাতে এনেছে যান্ত্রিক ত্রুটিহীনতা। সেই নজর এড়িয়ে কারোর কিছু করবার জো নেই। তাই বলা হয়েছে, ঝকঝকে 'মকরের দাঁত খাঁজে খাঁজে বড়ো পরিপাটি ক'রে কামড়ে ধরে'।

কী এই 'মকর'? নক্র বা হাঙরকেই কি বলা হবে মকর? না কি এ এমন এক পুরাণ-কল্পিত জীব যার অস্তিত্ব বাস্তবে নেই— আছে শুধু শিল্পীর প্রকাশে? 'রক্তকরবী'র দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিতে রাজা সম্পর্কে বিশু বলেছে,'বিশ্বকর্মার তৈরি বৃহদাকার একটা কলের খেলনা','কষে ওকে দম দিয়ে দিয়েছে— ক্রমাগতই ওর হাত চলছে, মুখ চলছে, ওর মধ্যে কোনোখানে কোনো সময়ে একটুও থামবার কোনো কারণ নেই'।

এ কি মেরি শেলি-র সেই মানুষের গড়া যন্ত্র-মানুষের পূর্বাভাস? তাই মকর? অতীতের মিথের নামে ভবিষ্যতের মিথের নামকরণ? খিদিরপুরের ঘাট থেকে আরম্ভ ক'রে হঙকঙের ঘাট পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যে যন্ত্রবাহন বাণিজ্য-দানবকে দেখেছিলেন তার চালচলনও অনেকটা 'রক্তকরবী'র ওই ক'ষে-দম-দেওয়া বৃহদাকার কলের খেলনার মতোই : 'লোহার হাত দিয়ে মুখে তুলছে, লোহার দাঁত দিয়ে চিবোচ্ছে, লোহার পাক-যন্ত্রে চিরপ্রদীপ্ত জঠরানলে হজম করছে এবং লোহার শিরা-উপশিরার ভিতর দিয়ে তার জগৎ-জোড়া কলেবরের সর্বত্র সোনার রক্তস্রোত চালান ক'রে দিচ্ছে।' একবার একে চিনাদের পুরাণ-কল্পিত ড্রাগনের সঙ্গে তুলনা করেও রবীন্দ্রনাথ ঠিক ভেবে পান নি এ কেমনতরো জানোয়ার! 'খানিকটা সরীসৃপের মতো, খানিকটা বাদুরের মতো, খানিকটা গণ্ডারের মতো'।[৯]

আসলে এই মকর হল কুবেরের পুরাণ-কথিত 'নবনিধি'র একটি নিধি। 'নবনিধি' কী কী? মহাপদ্ম,পদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ, নীল আর খর্ব। 'মেঘদূত'-এ যক্ষের বাড়ির দরজার দুই পাশে আঁকা ছিল পদ্ম আর শঙ্খ। যক্ষরাজের জন্য নন্দিনী এনেছে কুন্দফুলের মালা পদ্মপাতায় ঢেকে। আধুনিক নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে এই 'নবনিধি' কুবেরের ন'টি টোটেম ছাড়া আর কিছু নয়। জেমস্ ফ্রেজার তাঁর 'গোল্ডেন বাউ' (*Golden Bough*) গ্রন্থে বলেছেন, 'Totemism is an intimate relation which is supposed to exist between a group of people on the one side and a species of natural or artificial objects on the other side, which objects are called the totems of the human group.'[১০] ১৯১২ সালে লেখা 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'নৃতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় বর্বর জাতির অনেকেরই মধ্যে এক-একটি বিশেষ জন্তু পবিত্র বলিয়া পূজিত হয়। অনেক সময়ে তাহারা আপনাদিগকে সেই জন্তুর বংশধর বলিয়া গণ্য করে। সেই জন্তুর নামেই তাহারা আখ্যাত হইয়া থাকে'। এখানে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে অ্যানিম্যাল-টোটেম-এর কথাই বললেন। কুবেরের 'নবনিধি'র মধ্যে অবশ্য অ্যানিম্যাল-টোটেম আর আর্টিফিসিয়াল-টোটেম মিলেমিশে আছে। মকর আর কচ্ছপ অ্যানিম্যাল-টোটেম, বাকিগুলি আর্টিফিসিয়াল টোটেম।

যেমন মকর তেমনি কচ্ছপ বা কূর্মের উল্লেখও 'রক্তকরবী'তে দেখা যাবে। সমুদ্রমন্থনের সময়ে মন্দার পর্বত যখন ক্রমশ অতলে তলিয়ে যেতে লাগল- তখন কূর্মাবতার নিজের পিঠের উপর মন্দারকে রক্ষা করেছিলেন। যক্ষপুরীর খোদাইকরদের কেনারাম গোঁসাই বলেছে, 'এরা তো স্বয়ং কূর্ম-অবতার। বোঝার নিচে নিজেকে চাপা দিয়েছে বলেই সংসারটা টিঁকে আছে'। অন্যদিকে বিশু বলেছে, 'শাস্ত্রমতে অবতারের বদল হয়। কূর্ম হঠাৎ বরাহ হয়ে ওঠে, বর্মের বদলে বেরিয়ে পড়ে দন্ত, ধৈর্যের বদলে গোঁ।' পৃথিবী যখন রসাতলে তলিয়ে যাচ্ছিল তখন বরাহ-অবতার দাঁতের উপর পৃথিবীকে রক্ষা ক'রে তাকে তুলে আনেন উপরে। মকরের দাঁতের উল্‌টো মিথ হল এই বরাহের দাঁত। যারা নীচে পড়ে আছে তাদের হাতেই যক্ষপুরীর উদ্ধার।

৬.

'মেঘদূত'-এ কুবেরের অলকা মহাদেবের কৈলাসের সংলগ্ন। তাই 'হরশিরশ্চন্দ্রিকা'য় ধুয়ে গিয়েছে অলকার যত প্রাসাদ। 'রক্তকরবী'তেও যক্ষপুরীর বাইরেই আছে ঈশানী পাড়া। নন্দিনী সেই ঈশানী-পাড়ার মেয়ে। কৈলাসে প্রেমিক মহাদেবের মাথার চাঁদ স্বভাবতই আধোচাঁদ। কিন্তু 'গ্রহণ-লাগা' যক্ষপুরী নন্দিনীকে একটুও ছুঁতে পারে নি বলেই সে পূর্ণচাঁদ। তার অদৃশ্য আকর্ষণে বিশুর দুঃখসমুদ্রে জোয়ার লাগে চোখের জলের। নন্দিনীকে সম্বোধন ক'রে বিশু গায় : 'ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার দুখের পারাবারে'।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই যক্ষপুরী ধ্বনির সূক্ষ্ম স্বরান্তরে রক্ষ-পুরীও বটে। তা না হলে 'রক্তকরবী'র অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ যক্ষপুরী-প্রসঙ্গে পদে পদে রক্ষ-পুরী স্বর্ণলঙ্কা আর রক্ষোরাজ রাবণের প্রসঙ্গ আনতেন না। মিথের এই শিল্পিত বিপর্যাস অবশ্য রবীন্দ্রনাথ আগেও করেছেন তাঁর 'স্বর্ণমৃগ' গল্পে। স্ত্রী মোক্ষদাসুন্দরীর প্ররোচনায় স্বামী বৈদ্যনাথ যক্ষবিত্তের মিথ্যা ফাঁদে পড়েছেন এবং এর পরিসমাপ্তি ঘটেছে স্বামী-স্ত্রীর চিরবিচ্ছেদে। যক্ষের এই মায়াকে 'স্বর্ণমৃগ' বলায় যক্ষরক্ষ একাকার হয়ে গিয়েছে। যক্ষপুরীর সোনার চূড়ার মোহময় আকর্ষণে বিপর্যস্ত বিশুর দাম্পত্য-জীবনের ইতিবৃত্তে রক্ষোমায়া স্বর্ণমৃগ যক্ষপুরীর অঙ্গীভূত হয়েছে। যক্ষরাজকে রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, 'রাবণের বর্তমান প্রতিনিধি', 'সে একদেহেই রাবণ ও বিভীষণ'— তখন যক্ষরাজের অন্তর্দ্বন্দ্বকে রবীন্দ্রনাথ রাক্ষস-ভ্রাতৃযুগলের রূপকে প্রকাশ করেন। 'রক্তকরবী'র ভিতরেও এই ব্যাপারটি আগাগোড়া লক্ষ করা যায়। পৌরাণিক কুবের 'একচক্ষু'— তার অন্য চোখটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যক্ষবিত্ত-অপহরণকারীদের উদ্দেশে কুবেরের ক্রোধকে নন্দিনী বলছে, 'কানা রাক্ষসের অভিসম্পাত'। অন্যের প্রাণ-উৎসাদন-করা যক্ষরাজের 'বড়ো হবার তত্ত্ব'কে সে বলে, 'রাক্ষসের তত্ত্ব'।

আসলে 'রক্তকরবী'তে যক্ষপুরী-রক্ষ-পুরী একাকার ক'রে দেওয়ার একটি নিগূঢ় হেতু আছে। রাবণের সঙ্গে যক্ষরাজের সাদৃশ্যসূত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ত্রেতাযুগের বহুসংগ্রহী রাবণ বিদ্যুৎবজ্রধারী দেবতাদের আপন প্রাসাদদ্বারে শৃঙ্খলিত ক'রে তাদের দ্বারা কাজ আদায় করত'। এখানে গৌরবে বহুবচন হলেও 'বিদ্যুৎবজ্রধারী দেবতা' আসলে স্বর্গরাজ ইন্দ্র। 'রক্তকরবী'তে স্বর্গরাজ-রক্ষোরাজ সংগ্রামের এই ভাবসূত্রটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লক্ষ করা যায়।

১৯১৫ সালে লেখা 'কর্মযজ্ঞ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'কলিযুগের কলদৈত্য স্বর্গের দেবতাদের নির্বাসিত করে দিয়েছে, কিন্তু আবার তো স্বর্গকে ফিরে পেতে হবে!' স্বর্গকে ফিরে-পাওয়ার ব্যাপারটি 'রক্তকরবী'তে কিভাবে শিল্পিত হয়েছে তা পরের কথা, কিন্তু 'কলিযুগের কলদৈত্য' এখানে স্বর্গের দেবতাদের নির্বাসিত ক'রে দিতে পেরেছে ব'লেই স্বর্গরাজ ইন্দ্রের হস্তধৃত বজ্র হয়েছে রাক্ষসের হাতের উপমান। মকররাজের হাতকে নাটকের দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিতে বলা হয়েছে,'বজ্রকঠিন হাত'। কুবেরগড়ের পাশেই এখানে থাকে বজ্রগড়।

ইন্দ্রের জাল স্বয়ং ইন্দ্র স্বর্গদ্বেষী রাক্ষসদের বন্দী করবার জন্য ব্যবহার করতেন। কিন্তু রাক্ষস-অধিকৃত ইন্দ্রজালের তাৎপর্যই গেল উলটে— তা হয়ে দাঁড়াল মকরের মানুষ ছাঁকা-জাল। জাল ছেঁকে বেরিয়ে এল কয়েকটি সংখ্যা আর মানুষ গেল তলিয়ে। অবশ্য সেই জালের জানালার আবরণে স্বয়ং মকররাজের সত্তাও অস্পষ্ট হয়ে আসে— নন্দিনী তাই তাঁকে বলে, 'জালের কুয়াশায় ঢাকা' রাজা।

ইন্দ্রজালের শিল্পকৌশল মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর; তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন,'জানলাটি যে কিরকম তা সুস্পষ্ট ক'রে বর্ণনা করা অসম্ভব। যারা তার কারিকর তারাই তার কলাকৌশল বোঝে'। এই ইন্দ্রজাল অমানুষী বলেই নাটকের চতুর্থ পাণ্ডুলিপিতে মকররাজ বলেন, 'সে জাল আপনাকে আপনি বুনেই চলেছে, কোথাও তার শেষ দেখতে পাই নে'। প্রথম পাণ্ডুলিপিতে বলা হয়েছে, 'এখান থেকে আরম্ভ করে এদের বেড়াজাল কতদূর চলে গেছে, দেশবিদেশের কত ঘাটে যে তার খুঁটি বাঁধা তার ঠিকানা নেই।' সমস্ত বিশ্বকে বেঁধে-ফেলা কলিযুগের কলদৈত্যের এই ইন্দ্রজালকেই 'মুক্তধারা'র যন্ত্রবন্দনা-সংগীতে বলা হয়েছে, 'তব পঞ্চভূত-বন্ধনকর ইন্দ্রজালতন্ত্র'।

এই ইন্দ্রজাল আবার রাক্ষসের কুহকও বটে। মকররাজের সঙ্গে লড়াইয়ে ভিতর পর্যন্ত ফাঁকা হয়ে যাওয়া পালোয়ান এই ইন্দ্রজালকে বলেছে 'জাদু', বলেছে, 'এরা কোথাকার দানব, জাদু জানে'।

বৃহৎসংহিতায় দেখা যায়, অসুর-পীড়িত দেবতাদের জয় সুনিশ্চিত করবার জন্য ইন্দ্রধ্বজের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু 'রক্তকরবী'তে সেই ধ্বজও রাক্ষস-কবলিত। দেব ও মানব -বিদ্বেষী পাতালবাসী রাক্ষসের হাতে পড়েছে বলেই তা একই সঙ্গে স্বর্গ ও মর্ত্য -বিদারণকারী : 'যার অজেয় শল্যের একদিক পৃথিবীকে অন্যদিক স্বর্গকে বিদ্ধ করছে সেই আমাদের মহাপবিত্র ধ্বজদণ্ড'।

পৌরাণিক এই ধ্বজদণ্ডের পুরাণ-আচ্ছাদনটি সরিয়ে দিলেই এর সাম্প্রতিক চেহারাটি বেরিয়ে পড়বে। 'রক্তকরবী' প্রবাসীতে প্রকাশিত হওয়ার পরের মাসেই (কার্তিক, ১৩৩১) 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত 'সৃষ্টি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপের সেই 'বে-আব্রু' সভ্যতার কথা বললেন যে 'কারখানাঘরের চোঙাগুলোকে ধূমকেতুর ধ্বজদণ্ড বানিয়ে আলোকের আঙিনায় কালি' লেপে দেয়।

৭.

'রক্তকরবী'র অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মানবের মহিমা উজ্জ্বল ক'রে ধরবার জন্যেই চিত্রপটে দানবের পটভূমিকা'। সমস্ত 'রক্তকরবী' জুড়ে রক্ষ-বিজয়ী ইন্দ্রের পাশাপাশি দানব-বিজয়ী ইন্দ্রের ভাবকল্পনাটিও লক্ষ করা যায়।

ইন্দ্রকে কেউ কেউ বলেছেন আকাশ-দেবতা। সহস্রাক্ষ ইন্দ্র তারায় ভরা আকাশ। ১৯১২ সালে লেখা 'গীতিমাল্য'র একটি গানে ইন্দ্রের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি / তারায় তারায় খচিত, / স্বর্ণে রত্নে শোভন লোভন জানি /বর্ণে বর্ণে রচিত'।

ইন্দ্‌ ধাতু বর্ষণে তাই কেউ কেউ আবার বলেছেন যে ইন্দ্র বর্ষণকারী দেবতা আর বর্ষণহীনতাই বৃত্রাসুর। তাই ইন্দ্র বৃত্রবিজয়ী। 'নৈবেদ্য'র একটি সনেটে বৃত্রবিজয়ী বৃষ্টিদাতা এই ইন্দ্রকে সম্বোধন করেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,' দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি, অতি দীর্ঘকাল / হে ইন্দ্র হৃদয়ে মম'; বলেছেন, 'সংহরো সংহরো, প্রভো, নিস্তব্ধ প্রখর/এই রুদ্র, এই ব্যাপ্ত, এ নিঃশব্দ দাহ / নিঃসহ নৈরাশ্যতাপ'। 'রক্তকরবী'র মকররাজ 'প্রকাণ্ড মরুভূমি'— তপ্ত, রিক্ত, ক্লান্ত। 'তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে, তাতে মরুর পরিসরই বাড়ছে'। নাটকের প্রকাশিত সবগুলি পাণ্ডুলিপিতেই মকররাজ 'মরা নদীর পাঁক'-এর সঙ্গে নিজের তুলনা করেছেন। প্রথম পাণ্ডুলিপিতে চন্দ্রাকে বিশু বলেছে, 'এই যক্ষপুরীর মরু-হাওয়ায় তোমার ফুলের মালা শুকিয়ে গেছে।' এই মরুকে, এই মরা নদীকে বৃষ্টিধারায় স্নাত করেন বলে ইন্দ্রই রঞ্জন। 'রঞ্জন'

এখানে 'প্রতিকারক'। 'সোনার তরী'র 'বর্ষাযাপন'-এ যখন 'দিগন্তের চারিপাশে / আষাঢ় নামিয়া আসে, / বর্ষা আসে হইয়া ঘোরালো' তখন 'সমস্ত আকাশজোড়া / গরজে ইন্দ্রের ঘোড়া / চিক্‌মিকে বিদ্যুতের আলো'। 'বুনো ঘোড়ার কেশর ধরে' রঞ্জন নন্দিনীকে বনের ভিতর দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে যায়। প্রথম পাণ্ডুলিপিতে নন্দিনী বলেছে, 'আমাদের গ্রামের নাগাই নদীতে যখন প্রথম বর্ষা এসে পৌঁছয়, তখন রঞ্জন তার উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে সাঁতার কেটে স্রোতটাকে যেমন তোলপাড় ক'রে তোলে, আমাকে কাছে পেলে সে আমার ভিতর বাহির ঠিক তেমনি ক'রেই তোলপাড় ক'রে ঢেউ খেলিয়ে দিতে থাকে।' এখানে রঞ্জন আর নন্দিনী যেন বর্ষার সদ্য-সমাগমে প্রকৃতির দুরন্ত উল্লাসের সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছে। প্রথম পাণ্ডুলিপিতে 'ঈশানী পাড়া' ছিল 'নিশানী পাড়া'। 'নিশানী' বা নিশান যদি ইন্দ্রের ধ্বজ হয় তবে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী বলেই নন্দিনী 'নিশানী পাড়ার মেয়ে'।

কিন্তু 'নাগাই' কেন? বৃত্রাসুরকে কোথাও কোথাও বলা হয়েছে 'অহি'। যুদ্ধের সময়ে নাগরূপী বৃত্র ইন্দ্রকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছিল। স্বভাবতই অবৃষ্টিসংরম্ভ সর্পাকৃতি মেঘ নাগরূপী বৃত্র হতে পারে। কিন্তু 'রক্তকরবী'তে মেঘ নয়, নদীর নাম 'নাগাই'। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি বর্ষাসংগীত মনে পড়ে যায়: 'পূবসাগরের পার হতে কোন্ এল পরবাসী / শূন্যে বাজায় সন সন হাওয়ায় হাওয়ায় / সাপ খেলাবার বাঁশি'। পুরাণে ইন্দ্র পূর্বদিকের অধিপতি, উনপঞ্চাশ মরুৎ তাঁর সখা। তিনি মায়াবী, বিচিত্র রূপ-ধারণে সমর্থ। ঋগ্বেদে ইন্দ্র একবার নর্তকের রূপ ধরেছিলেন। আর এখানে তিনি সাপ খেলাবার বাঁশি বাজাতেই সেই আকাশ-সাপুড়ের জাদুতে 'কুলু কুলু কলস্রোতে' 'দিকে দিকে জলের ধারা ছুটেছে উল্লাসি'। বলা বাহুল্য, 'সাপ খেলাবার বাঁশি'র সূত্রে 'জলের ধারা' ব্যঞ্জনায় সাপের সঙ্গেই সাযুজ্য পেয়েছে। রঞ্জনও জাদু জানে, 'কথায় কথায় সাজ বদল ক'রে চেহারা বদল করে', 'ভাঙা সারেঙ্গি জোগাড় ক'রে গান গেয়ে যায় যক্ষপুরীর রাস্তায়'।

বৈদিক ইন্দ্র শম্বরাসুরকে যুদ্ধে পরাভূত ক'রে তার অনেক দুর্গ ধ্বংস করেছিলেন। অনেকে মনে করেন, এই শম্বরাসুর আসলে বৃত্রেরই নামান্তর। একজন পুরাণ-গবেষক বলেছেন, 'Śambara is an eclipse-demon of the type of Rahu and Indra's battle with him represents a slow clearance of the eclipse.' 'রক্তকরবী'র যক্ষপুরী 'গ্রহণ-লাগা পুরী', 'সোনার গর্তের রাহুতে ওকে খাবলে খেয়েছে'। গ্রহণ-মুক্তির জন্যই রঞ্জনের সংগ্রাম।

ইন্দ্রের একটি নাম 'গোত্রভিৎ'; 'গোত্র' অর্থে পর্বতও হয়, অসুরও হয়। পর্বতাকার মেঘই বৃত্রাসুর কিংবা বৃত্রাসুরকে ইন্দ্র পর্বে পর্বে ভেদ করেছিলেন ব'লে বৃত্রাসুরই পর্বত। ইন্দ্রের উদ্দেশে ঋগ্বেদে বলা হয়েছে, 'হে বজ্রী! তুমি সেই মহাবিস্তীর্ণ পর্বত বজ্রের দ্বারা পর্বে পর্বে ছিন্ন করেছ।' 'রক্তকরবী'র যক্ষরাজ বলেন, 'একদিন দূরদেশে আমারই মতো একটা ক্লান্ত পাহাড় দেখেছিলাম। বাইরে থেকে বুঝতেই পারি নি তার সমস্ত পাথর ভিতরে ভিতরে ব্যথিয়ে উঠেছে। একদিন গভীর রাতে ভীষণ শব্দ শুনলাম, যেন কোন্ দৈত্যের দুঃস্বপ্ন গুম্‌রে গুম্‌রে হঠাৎ ভেঙে গেল। সকালে দেখি পাহাড়টা ভূমিকম্পের টানে মাটির নিচে তলিয়ে গেছে।'

ইন্দ্র বন্দী জলকে গোষ্ঠমুক্ত গাভীগণের মতো মুক্ত করে দেন। এই বন্দী জলই বৃত্রাসুর। 'রক্তকরবী'র দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি থেকেই যক্ষরাজ নিজেকে বলেছেন, 'প্রকাণ্ড সরোবর'। নন্দিনীর প্রভাবে তাঁর 'সঞ্চয়-সরোবরের পাথরটাতে চাড় লেগেছে'। এই ব্যাপারটিকে উপমার সাহায্যে বিশদ করে অধ্যাপক পুরাণবাগীশকে বলেছেন, 'আমাদের ঐ পাহাড়তলা জুড়ে একটা সরোবর ছিল, শঙ্খিনী নদীর জল এসে তাতে জমা হত। একদিন তার বাঁ দিকের পাথরের স্তূপটা কাত হয়ে পড়ল, জমা জল পাগলের অট্টহাসির মতো খল্‌খল্ করে বেরিয়ে চলে গেল।' আমরা আগেই বলেছি যে শঙ্খ কুবেরের টোটেম। যক্ষ এখানে

অসুরের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে বলেই যে-নদীর জল সরোবরে বন্দী হয় তার নাম 'শঙ্খিনী'।

ইন্দ্র-বৃত্র সংগ্রামের এই-সব ভাবকল্পনার সবগুলিই— লক্ষ করার বিষয়— 'রক্তকরবী'তে সরাসরি আসে নি। নাগাই নদীতে প্রথম বর্ষার ধারাপতনের বর্ণনাটি বিশুর কাছে নন্দিনীর স্মৃতিচারণ। 'ক্লান্ত পাহাড়'টিকেও যক্ষরাজ 'একদিন দূরদেশে' দেখেছিলেন। 'পাহাড়তলা জুড়ে'-থাকা সরোবরের জল বেরিয়ে যাওয়ার গল্পটিও পুরাণবাগীশের কাছে বলা অধ্যাপকের অতীতকালের গল্প।

এর সহজ ও স্পষ্ট কারণ হল, ইন্দ্র-বৃত্রের সংগ্রাম মূলত আষাঢ় মাসের ব্যাপার। সূর্যের দক্ষিণায়ন-সূচনাতেই বৃত্রঘাতী বৃষ্টিধারা ইন্দ্রের আবির্ভাব। অন্য দিকে 'রক্তকরবী'তে সূর্যের উত্তরায়ণ শুরু হয়েছে, অঘ্রান পেরিয়ে পৌষের ডাক এসে পৌঁচেছে।

অবশ্য একজন জর্মন পুরাণবিৎ হিলেব্রান্‌ড্‌ট্ (Hillebrandt) ইন্দ্র-বৃত্র সংগ্রামের মিথকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে বৈদিক দেবতাদের কল্পনা করার সময়ে ইন্দো-ইরানীয়দের একটি শাখা মুখ্যত পশ্চিম ভারতেই বসতি করেছিল। ইরান আর পশ্চিমভারতে শীতকালেই নদীর জল তলানিতে গিয়ে ঠেকে । তাই বৃত্র প্রকৃতপক্ষে শীতের দানব আর ইন্দ্র বসন্তের উষ্ণ সূর্যকিরণ।[১১] বৃত্র নদীর জলধারাকে উৎসমুখে পর্বতচূড়ায় জমিয়ে বরফ করে দেয় আর ইন্দ্ররূপী বসন্ত সেই তুষারকঠিন জলকে গলিয়ে ফেলে নদীকে পুনশ্চ প্রাণিত করে তোলেন। মনে পড়ে 'ফাল্গুনী'? যখন 'জাদুকরের বাজল ভেরি' তখন 'হিমের বাহুবাঁধন টুটি পাগ্‌লাঝোরা পাবে ছুটি'।

'রক্তকরবী'র দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিতে যক্ষরাজ নিজেকে বলেন,'হিমালয়ের চূড়ার মতো, বরফে ঢাকা'। প্রত্যুত্তরে নন্দিনী বলে,'সেই চূড়ার বুকেও ঝর্না ঝরে'; 'তুমি যদি এই পৌষের সকালে রঞ্জনের সঙ্গে ধান কাটতে যাও, ঢেউ-খেলানো খেতের মাঝে প্রকাণ্ড শরীরটা সবুজ সাগরের তলা থেকে শাদা পাহাড়ের মতো জেগে ওঠে, তা হলে সে কী অপূর্ব হয়!'

আবার মনে পড়ে 'ফাল্গুনী' 'সাদা তোমার শ্যামল হবে ফিরব মোরা তাই যে হেরি'। রঞ্জন সেই শ্যামল বসন্তের প্রতীক। তাই তার খবর আসে 'যে-পথে বসন্ত আসবার খবর আসে সেই পথ দিয়ে।'

৮.

'রক্তকরবী'র প্রথম থেকে তৃতীয় পাণ্ডুলিপিতে যক্ষরাজ বলেছেন,'জ্ঞানের তপোবনে দয়ামায়া ভালোবাসা ঢুকলেই তপোভঙ্গ হয়।' 'রক্তকরবী'র সমকালীন 'সৃষ্টি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'ধর্মশাস্ত্রে বলে, ইন্দ্রদেব কঠোর সাধনার ফল নষ্ট করবার জন্যেই মধুরকে পাঠিয়ে দেন। আমি দেবতার এই ঈর্ষা, এই প্রবঞ্চনা বিশ্বাস করি নে। সিদ্ধির পরিপূর্ণ অখণ্ড মূর্তিটি যে কিরকম তাই দেখিয়ে দেবার জন্যেই ইন্দ্র মধুরকে পাঠিয়ে দেন।'

তপোভঙ্গের মিথ রবীন্দ্রনাথ আগেই ভেঙেছিলেন 'বলাকা'য়। 'শব্দময়ী অপ্সরা-রমণী' সেখানে 'স্তব্ধতার তপোভঙ্গ' করেছিল বলেই গতিস্পন্দিত বিশ্বভুবনের 'পরিপূর্ণ অখণ্ড মূর্তিটি' সেখানে অনাবৃত হয়েছিল। 'পূরবী'র 'তপোভঙ্গ'য় তা দ্বিতীয়বার ভাঙা হল। সেখানে স্বর্গের মহেন্দ্র তপোভঙ্গের যে-চক্রান্ত করেছিলেন তারই ফলে 'শ্মশানের বৈরাগ্যবিলাসী' মহাদেব লাভ করলেন 'সিদ্ধির পরিপূর্ণ অখণ্ড মূর্তি' উমাকে। 'রক্তকরবী'তে 'ইন্দ্রদেবের আগুন' নন্দিনীই সেই 'স্বর্গের চক্রান্ত'। যক্ষপুরীর যে-রক্ষরাজ সোনার তালের তালবেতালকে নিয়ে তিন হাজার বছরের মৃত্যু-তপস্যায় নিজেকে নিজের মধ্যে নিরুদ্ধ করেছিলেন— নন্দিনী তাঁর সেই মৃত্যু-তপস্যা চূর্ণ করে তাঁকে মুক্তি দিয়েছে প্রেমের অখণ্ড সিদ্ধিতে। খণ্ড নয়, নন্দিনী সিদ্ধির 'অখণ্ড' মূর্তি বলেই রাজার 'সবখানা বাদ দিয়ে' জালের জানালার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা শুধু একখানি হাতকে সে ধরতে চায় নি; ধরেছে সেই দিন যেদিন জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে এসে সম্পূর্ণ রাজা তাকে

বলতে পেরেছেন, 'আমারই হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক, সম্পূর্ণ মারুক— তাতেই আমার মুক্তি।'

'রক্তকরবী'তে বৃত্রবিজয়ী ইন্দ্রের যোদ্ধৃমূর্তি যেমন আছে, তেমনি পাশাপাশি আছে ইন্দ্রের সৌন্দর্যমূর্তি। 'ইন্দ্র' শব্দের ব্যুৎপত্তি-ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, ইন্দ্র 'ইরাং দারয়তে'; অর্থাৎ ইন্দ্র 'ইরা' বা অন্নকে বিদীর্ণ করেন; অস্যার্থ, অন্নোৎপাদনের জন্য হলকর্ষণের সময়ে মৃত্তিকা বিদীর্ণ করেন। ইন্দ্র ' ইরাং দদাতি'— 'ইরা' বা অন্ন দান করেন। ইন্দ্র 'ইরাং ধারয়তে'— 'ইরা' বা অন্নকে ধারণ করেন।

দেখা যাচ্ছে, ইন্দ্র যেমন বর্ষণের দেবতা তেমনি ফসল-ফলানোর দেবতাও বটে। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের একটি নাম 'উর্বরাপতি'। প্রাচীন ইন্দ্রোৎসবের সঙ্গে তাই শস্যক্ষেত্রের উর্বরতা-বৃদ্ধি আর ফসলের শ্রীবৃদ্ধির একটি সম্পর্ক ছিল। আশ্চর্যের বিষয়, সীতাকে কোথাও কোথাও বলা হয়েছে বৈদিক ইন্দ্রের স্ত্রী। ঋগ্বেদে আছে 'ইন্দ্র সীতাং নিগৃহ্ণাতু' ইন্দ্র সীতাকে গ্রহণ করুন। সীতা লাঙলের মৃত্তিকা-বিদারণকারী ফাল বলেই শস্যদেবতা ইন্দ্রের শক্তি। ১৯২৯ সালের- শ্রাবণে হলকর্ষণ উৎসব উপলক্ষে শ্রীনিকেতনে সীতাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই কৃষির সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গী হয়ে আছে ধেনু-র কল্পনা। নন্দিনী যেমন সীতার মতোই মাটির কন্যা তেমনি ধেনুও বটে। 'রঘুবংশ'র নন্দিনী কল্পধেনু ; 'পল্লব-রাগতাম্রা'— নবপল্লবের মতো শ্যামল তার গাত্রবর্ণ।

আমরা বলেছি সীতা বা নন্দিনী শস্যদেবতা ইন্দ্রের শক্তি। এই শক্তির যেমন একটি প্রায়োজনিক দিক আছে তেমনি একটি নান্দনিক দিকও আছে। ১৯৩৪ সালে লেখা 'পল্লীপ্রকৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন, 'পৃথিবী আমাদের যে-অন্ন দিয়ে থাকে সেটা শুধু পেট ভরাবার নয়; সেটাতে আমাদের চোখ জুড়োয়, আমাদের মন ভোলে। ...ধরণীর অন্নভাণ্ডারে কেবল যে আমাদের ক্ষুধানিবৃত্তির আশা তা নয়, সেখানে আছে সৌন্দর্যের অমৃত।' স্বর্গের দেবতা ইন্দ্রের সৌন্দর্য-চেতনা রূপ ধরেছে তাঁর নন্দনকাননে। কিন্তু যে-ইন্দ্র শস্যদেবতা, 'ভূতলের স্বর্গখণ্ড' এই শ্যামলা শস্যক্ষেত্রই তাঁর নন্দন। নন্দিনী সেই মর্ত্য-নন্দনের আনন্দ-রূপিণী। তাই 'পৌষের রোদ্দুর' যখন 'পাকা ধানের লাবণ্য' মেলে দেয় আকাশে তখন 'পৃথিবীর প্রাণভরা খুশিখানা নিজের সর্বাঙ্গে টেনে নিয়ে' দেখা দেয় ধানী রঙের কাপড় পরা নন্দিনী।

৯.

যক্ষপুরীর অভিশপ্ত মানুষদের না আছে অবকাশ না আছে আকাশ। তাই বারো ঘণ্টার সমস্ত হাসি গান সূর্যের আলো কড়া করে তারা চুঁইয়ে নেয় এক চুমুকের তরল আগুনে। এই মদকেই বিশু পাগল বলেছে 'মরণরস'। 'সে যে চিতার আগুন গালিয়ে ঢালা, সব জ্বলনের মেটায় জ্বালা, সব শূন্যকে সে অট্ট হেসে দেয় যে রঙিন ক'রে।'— শেষ পঙ্‌ক্তিটিতে খনিশ্রমিকদের নেশাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে 'শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল' রচনার ইঙ্গিত।

কিন্তু আমরা তো জানি যে বেদ-পুরাণের ইন্দ্রও সোমপায়ী। 'ইন্দু' হল সোমরস, তা পান করেন যিনি তিনিই ইন্দ্র। 'রক্তকরবী'তে ইন্দ্রের সোমরস-পানের মিথকে রবীন্দ্রনাথ অভিনব ব্যঞ্জনায় সম্প্রসারিত করলেন। তাঁর মতে এই আকাশ-পৃথিবীর অপূর্ব সৌন্দর্যই ইন্দ্রের সোমরস। বিশু একেই বলেছে, 'নীল চাঁদোয়ার নিচে খোলা মদের আড্ডা'। বলা বাহুল্য, সোমরসের এই অভিনব ব্যাখ্যা করার সময়ে 'সোম' বলতে বিশেষ কোনো রসক্ষরণকারী উদ্ভিদের কথা রবীন্দ্রনাথ ভাবেন নি। 'সোম' প্রথমত তাঁর কাছে 'অমৃত'— কোনো আধিদৈবিক ইলিক্সির নয়, বাস্তব এই পৃথিবীর সৌন্দর্যই অমৃত। দ্বিতীয়ত, 'সোম' তাঁর কাছে চন্দ্র। চাঁদের আলো অমৃতবর্ষণকারী— 'ঢালে ইন্দু অমৃতধার'— তাই চাঁদ 'সুধাকর'। ফাগুলাল মদ খেতে চাইলে বার বার তাকে বাধা দিয়ে ফেলে-আসা জীবনের সৌন্দর্যস্মৃতি যে মনে করিয়ে দেয় তার নাম 'চন্দ্রা'।

আমরা আগেই দেখেছি, নন্দিনীকে বিশু চাঁদের নামে সম্বোধন করেছে। কিন্তু চাঁদ এখানে শুক্ল আর কৃষ্ণ— দুই পক্ষকে মিলিয়ে আছে। রঞ্জনের পাওয়া আর বিশুর না-পাওয়া— দুইকে এক করেই নন্দিনীর মধ্যে সৌন্দর্যের অমৃত অখণ্ডতা পেয়েছে।

১০.

'রক্তকরবী'তে যেমন রাক্ষসের মানুষ-ছাঁকার যন্ত্র হিসেবে আর প্রমত্তের স্বপ্ন-মরীচিকা হিসেবে ঠিক তেমনি অপরূপ সৌন্দর্য -রূপে ইন্দ্রজালের উদ্‌ভাসন। নাটকের প্রথম পাণ্ডুলিপিতে নন্দিনী শুনিয়েছিল পৌষের সকালের এই গান 'বাদল এসে রচেছিল ছায়ার মায়াঘর, রোদ এসেছে সোনার জাদুকর। শ্যামে সোনায় মিলন হল এই যে মাঠের মাঝে, ভালোবাসার মাটি মোদের তাই তো এমন সাজে।' 'সোনার জাদুকর' সেই হিরণ্যবর্ণ বৈদিক ইন্দ্র। রৌদ্রছায়ার সংগমে, শ্যামে সোনায় মিলিয়ে মাঠের মধ্যে যে-ইন্দ্রজাল তিনি রচনা করেন তা শস্যক্ষেত্রকেই পরম রমণীয় করে তোলে।

পুরাণে ইন্দ্রজাল ধারণ করে থাকে দণ্ডরূপী দিক্‌সমূহ। 'রক্তকরবী'তে 'হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে দিগ্‌বধূরা ধানের ক্ষেতে'। 'মহুয়া'র 'নাম্নী' কবিতামালায় রবীন্দ্রনাথ 'নন্দিনী'র নামে যে স্তব রচনা করেছিলেন সেখানেও দিগ্‌বধূর মায়াবী অঙ্গুলি চঞ্চল চিত্তায় তার বুলায়েছে বর্ণ-আঁকা তুলি।' অর্থাৎ শুধু দেহেই নয়, তার মনে আর চৈতন্যেও সঞ্চারিত হয়ে যায় ইন্দ্রজালের বর্ণিকাভঙ্গ। সমস্ত সত্তায় নন্দিনী হয়ে ওঠে এই সীমাস্বর্গের ইন্দ্রাণী।

আমরা বলেছি 'রক্তকরবী'তে ইন্দ্রের যোদ্ধমূর্তির পাশেই আছে ইন্দ্রের সৌন্দর্যমূর্তি। তাই একদিকে যেমন রাক্ষস-কবলিত ইন্দ্রধ্বজকে ধ্বংস করেই দেবলোকের পুনরুদ্ধার তেমনি অন্যদিকে এই ইন্দ্রধ্বজ বা ইন্দ্রধনু নন্দিনীর সত্তায় হয়ে উঠেছে সৌন্দর্যধনু। এই ইমেজটির মধ্যে সূক্ষ্ম একটি কারুকার্য আছে। ইন্দ্রধনুতে যখন জ্যা পরানো হয় না— তখন তা সুদীর্ঘ ধ্বজদণ্ডের মতো। স্বভাবতই যক্ষরাজ যে-ইন্দ্রধনুর পূজা করে মারণচণ্ডীর কাছে উৎসর্গ করবেন তাতে জ্যা পরানোর প্রশ্ন ওঠে না। তা ইন্দ্রকেতু বা ইন্দ্রধ্বজই বটে! কিন্তু জ্যা পরানো হলেই ইন্দ্রধ্বজ ইন্দ্রধনুর পরিচিত মূর্তি ধারণ করে— তাতে সুদীর্ঘ ঋজুতার বদলে সৃষ্ট হয় আনত বক্রতা। 'জাপানযাত্রী'তে সেই ১৯১৬ সালেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'সোজা লাইনটা মানুষের হাতের কাজের। তার কারখানাঘরের চিমনিতে মানুষের জয়স্তম্ভ একেবারে সোজা খাড়া। বাঁকা রেখা জীবনের রেখা, মানুষ সহজে তাকে আয়ত্ত করতে পারে না।'

'নাম্নী'র 'নন্দিনী' যেন 'রক্তকরবী'র নন্দিনীরই ঘনীভূত ভাবপ্রতিমা। সেখানে সে 'বর্ষা-অন্তে ইন্দ্রধনু মর্ত্যে নিল তনু।' ইন্দ্রের সৌন্দর্যরূপিণী শক্তি বলেই আকাশ-দেবতা ইন্দ্রের মতোই নন্দিনী আকাশ জুড়ে থাকে। কিন্তু ইন্দ্রধনুর দুই প্রান্ত যেমন, নন্দিনীও তেমনি আকাশে বিস্তার পাওয়া সত্ত্বেও ছুঁয়ে থাকে মাটিকে। তাই সে দেবী নয়, মানবী। উপরন্তু বর্ষান্তের নয়, সে হেমন্তের ইন্দ্রধনু। তাই শস্যের স্বর্ণাভা আকাশের ইন্দ্রধনুর উপর প্রতিফলিত হয়ে তাকে শুধু সুন্দরতরই করে না, মাটির সঙ্গে আরও একটু নিবিড় করে তোলে।

১১.

কেন এই নাটকটির আগেকার নাম ছিল 'যক্ষপুরী' আর 'নন্দিনী'— আমরা এখন বুঝতে পারছি। এই দুটি নামই মিথের সংকেত-দীপ্তিতে ভাস্বর। কিন্তু তা হলে শেষ পর্যন্ত 'রক্তকরবী'? এর সঙ্গে তো হঠাৎ কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

নাটকের প্রথম পাণ্ডুলিপিতে নন্দিনীর পুষ্পভূষণ রক্তকরবীর উল্লেখমাত্র ছিল। দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপির প্রথমে

আর শেষে দু'বার মাত্র রক্তকরবীর মালার উল্লেখ রয়েছে। প্রথমে নন্দিনী রাজাকে বলেছে, 'আমি পরেছি রক্তকরবী' আর শেষে নিজের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আগে রাজা নন্দিনীকে বলেছে, 'তোমার ঐ রক্তকরবীর মালা দাও আমাকে পরিয়ে।' তৃতীয় আর চতুর্থ পাণ্ডুলিপিতেও রক্তকরবী এসেছে মাত্র এই দু'বার।

অথচ নাটকটির প্রচলিত পাঠে রক্তকরবী নন্দিনীর সর্বাঙ্গের ভূষণ, বহুবার ঘুরে ফিরে এর উল্লেখ। আরও একটি ব্যাপার লক্ষ করার মতো। নাটকের মুদ্রিত চারটি পাণ্ডুলিপির কোনোটিতেই কিশোর নেই। এই কিশোরই যক্ষপুরীতে দুষ্প্রাপ্য একটিমাত্র রক্তকরবী গাছের আবিষ্কর্তা। মনে হয় নাটকটির ঘষামাজার প্রায় অন্তিম পর্যায়ে, যখন নাট্যনাম 'রক্তকরবী'তেই স্থির হয়ে দাঁড়াল— তখনই এই কিশোর চরিত্রটি সংযোজিত হল নতুন করে। ওই রক্তকরবীর গাছটি কিশোরের 'একটিমাত্র গোপন কথার মতো', ঐ রক্তকরবী ফুল তারই 'নিজের ফুল'। রোজ সকালে তার হাত থেকেই নন্দিনী রক্তকরবী ফুল নেবে— কিশোর নন্দিনীকে সত্যবদ্ধ করিয়েছে। শুধু তাই নয়, শেষ পর্যন্ত এই কিশোরই দূত-রূপে নন্দিনীর পাঠানো রক্তকরবীর গুচ্ছ নিয়ে গিয়েছে রঞ্জনের কাছে।

এই কিশোর কি পৌরাণিক মদনের কিশোর-মূর্তি?

এই প্রসঙ্গে 'নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা' পর্যায়ের একটি গান আমাদের মনে পড়বে 'ওগো কিশোর আজি তোমার দ্বারে পরান মম জাগে'। ১৯২৭ সালে লেখা এই গানটিতে কিশোরের অভ্যর্থনার জন্য কবি বলেছেন, 'আনো গো আনো ভরিয়া ডালি করবীমালা লয়ে'। এই কিশোরের মধ্যে যেমন মাধুর্য রয়েছে, তেমনই রয়েছে অকুতোভয় বীর্য। তাই যক্ষপুরীর শাসনকর্তাদের সে ভয় করে না একটুও। নন্দিনীকে সে বলে, 'ওদের মারের মুখের উপর দিয়েই রোজ তোমাকে ফুল এনে দেব'। যক্ষরাজও বলেন, 'সে যে অদ্ভুত ছেলে। বালিকার মতো তার কচি মুখ, কিন্তু উদ্ধত তার বাক্য। সে স্পর্ধা ক'রে আমাকে আক্রমণ করতে এসেছিল।' মনে পড়ে যায়, 'চিরকুমারসভা'র কৌমার্যব্রতভঙ্গের উদ্দেশ্যে শৈলবালা যখন পুরুষের ছদ্মবেশ ধরল তখন তাকে দেখে রসিক বলেছে, 'যেন কিশোর কন্দর্প, যেন সাক্ষাৎ কুমার।' শৈলবালার এই দুটি উৎপ্রেক্ষায় কিশোর কন্দর্প আর কুমার কার্তিক একাকার হয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্র-কল্পনায় মদনের সঙ্গে দেবসেনাপতির এই সমীকরণের ফলেই তাঁর মদন শুধু ধীরললিত প্রেমিক নন, বীর্যবান যোদ্ধাও বটে। তাঁর ফুল রক্তকরবীর লালিমার মধ্যেও শুধু প্রেম নয়, বিপ্লবের রক্তরশ্মি বিচ্ছুরিত।

এই প্রসঙ্গে ১৯২৯ সালে প্রকাশিত 'তপতী' নাটকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'তপতী'তে রবীন্দ্রনাথ মদনের নতুন মিথ তৈরি ক'রে বললেন, 'মীনকেতু প্রলয়েরই দেবতা'; 'এ পর্যন্ত রতি নিজেরই বেশের অংশ দিয়ে কন্দর্পকে সাজিয়েছে। উনি রমণীর লালনে লালিত্যে আচ্ছন্ন আবিষ্ট, তাই তো বজ্রপাণি ইন্দ্রের সভায় উনি লজ্জিতভাবে চরের বৃত্তি করেন।'

'লালনে লালিত্যে আচ্ছন্ন' মদনের এই মূর্তিকে অস্বীকার করে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'মীনকেতুর পথ সহজ পথ নয়, সে নয় পুষ্পবিকীর্ণ ভোগের পথ, সে দেয় না আরামের তৃপ্তি।'

নিশ্চয়ই এ কথা মানতে হবে যে 'তপতী' নাটকে মদন সম্পর্কে এই সব বৈপ্লবিক কথা রবীন্দ্রনাথের নয়, বিক্রমদেবের। কিন্তু এ যে রবীন্দ্রনাথেরও কথা তার প্রমাণ— বিক্রমদেবের রচিত 'মীনকেতুর স্তব'কে আত্মসাৎ করেই রবীন্দ্রনাথ 'মহুয়া' শুরু করলেন 'ভস্ম-অপমানশয্যা ছাড়ো পুষ্পধনু হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু।'

১২

'রক্তকরবী'র উপসংহারে রক্তকরবীর লাল রঙে ঘনিয়ে আসা প্রলয়সন্ধ্যা। 'ভস্ম-অপমান শয্যা' ছেড়ে মৃত পুষ্পধনুর পুনর্জীবনপ্রাপ্তির মতোই যেন রঞ্জনের মৃত্যুর পর নতুন জীবনে জেগে ওঠেন রাজা। 'রাঙা

আলোর মশাল' নন্দিনী হয়ে ওঠে রাজার 'প্রলয়পথে দীপশিখা'। যুদ্ধ শুরু হয় সর্দারের সঙ্গে— তার বর্শার শিখরে কুন্দফুলের মালা। আগেই বলা হয়েছে যে 'কুন্দ' যক্ষরাজ কুবেরের অন্যতম টোটেম। কুন্দশীর্ষ বর্শাটি যেন কুবের-কবলিত ইন্দ্রধ্বজের শেষ চিহ্ন। নন্দিনী বলে যায়, 'ওই মালাকে আমার বুকের রক্তে রক্তকরবীর রঙ ক'রে দিয়ে যাব।'

বর্শাদণ্ডের শীর্ষে এই রক্তপুষ্প— এই কি তবে মদনদেবতার মকরকেতন? ইন্দ্রধ্বজের কেতন ছিঁড়ে ফেলে নন্দিনী কি শেষপর্যন্ত মকরধ্বজকেই রক্তকরবীর কেতনে সুন্দর ক'রে দিয়ে গেল?

একজন পুরাণ-বিশেষজ্ঞ জানাচ্ছেন, 'চৈত্র মাসের শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে একটি দীর্ঘ বংশদণ্ডে লাল শালু জড়িয়ে মদনের প্রতীক হিসাবে পূজা করা হয়— মদনের এই প্রতীক পূজা ইন্দ্রধ্বজপূজার সাদৃশ্যে কল্পিত।'[১১] মনে পড়ে যায় 'কল্পনা'র 'মদনভস্মের পূর্বে'। সেখানে যখন 'কুসুমরথে মকরকেতু উড়িত মধুপবনে' তখন 'ছড়াতো পথে আঁচল হতে অশোক চাঁপা করবী মিলিয়া যত তরুণ তরুণী'।

কিন্তু মীন আর মকর— দুইই মদনের ধ্বজচিহ্ন বা টোটেম হলেও রবীন্দ্রনাথ সাধারণত মদনকে 'মীনকেতু'ই বলেন। 'চিত্রাঙ্গদা' মনে পড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তা হলে এখানে মকরকেতু কেন? এর উত্তর মিলবে 'রক্তকরবী'র 'নাট্যপরিচয়'এ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'জেলেদের জালে দৈবাৎ মাঝে মাঝে অখাদ্য জাতের জলচর জীব আট্‌কা পড়ে। তাদের দ্বারা পেট-ভরা বা ট্যাঁক-ভরা কাজ তো হয়ই না, মাঝের থেকে তারা জাল ছিঁড়ে দিয়ে যায়। এই নাট্যের ঘটনাজালের মধ্যে নন্দিনী নামক একটি কন্যা তেমনিভাবে এসে পড়েছে।'

যক্ষরাজ মকর নন্দিনীকে গ্রাস করতে পারে নি বলেই সে 'অখাদ্য' জাতের জলচর জীব। আর অ-খাদ্য বলেই মীন নয়, মকরই তার যোগ্যতর উপমান। কী আশ্চর্য কৌশলে রবীন্দ্রনাথ কুবের আর মদনের একই টোটেমকে এখানে দুই পরস্পরবিরোধী শক্তির সংগ্রামে মুখোমুখি করিয়ে দিলেন। আর ধনতন্ত্রের অন্তর্বিরোধের ইঙ্গিত নিয়ে সমস্ত নাটক জুড়েই তো চলতে থাকে একজাতীয় মিথের দু'মুখো দ্বৈরথ একদিকে ইন্দ্রের জাদু অন্য দিকে যক্ষের জাদু ; একদিকে ইন্দ্রের সোমরস অন্য দিকে যক্ষের 'মরণরস'; একদিকে যক্ষের টোটেম কূর্ম অন্য দিকে বিষ্ণুর টোটেম কূর্ম; একদিকে ইন্দ্রের সৌন্দর্যজাল অন্যদিকে যক্ষের জানালার জাল ; একদিকে মকরের দাঁত অন্য দিকে বরাহের দাঁত।

শেষ পর্যন্ত 'রক্তকরবী' ফুলটিও একটি নতুন মিথ হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের নবসৃষ্ট বীর্যদীপ্ত প্রেমদেবতা মদনের মকরকেতুর পুষ্পভূষণ। এই মদন ইন্দ্রের সভায় লজ্জিতভাবে আর চরের বৃত্তি করেন না। প্রেমশক্তি রূপেই তিনি সৌন্দর্যময় জীবনীশক্তির প্রতিরূপ। তাই তাঁর শক্তিতেই নন্দিনী যক্ষপুরী ধ্বংস ক'রে দেবতার অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে যায়। এখানে রবীন্দ্রনাথের মদন ইন্দ্রের অভিন্নসত্ত্ব বন্ধু । 'রক্তকরবী' নাটক প্রকাশের বছর দুই পরে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি গান দিয়েই শেষ করা যাক 'তুমি উষার সোনার বিন্দু'। 'নন্দনেরই নন্দিনী'কে সম্বোধন ক'রে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'তুমি আকাশপারের ইন্দ্রধনু ধরার পারে নোওয়া নন্দনেরি নন্দিনী গো চন্দ্রলেখায় ছোঁওয়া'। 'চন্দ্রলেখা' মদনের ষোড়শ শক্তির অন্যতমা। সেই চন্দ্রলেখার স্পর্শে নন্দিনীর মধ্যে ইন্দ্রধনু আর পুষ্পধনু একাকার হয়ে যায়।

টীকা

১. 'বধিরতার সুখ', বিবিধপ্রসঙ্গ, ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৮
২. 'বিস্মৃতি', ধর্ম, ভারতী, চৈত্র ১২৯০
৩. Herbert Read, *Collected Essays in Literary Criticism*, London, 1938, p. 101.
৪. 'কবি য়েট্‌স্‌', পথের সঞ্চয়, প্রবাসী, কার্তিক ১৩১৯
৫. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, হিন্দুদের দেবদেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, তৃতীয় পর্ব, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ.৩৯৬
৬. ভারতী, শ্রাবণ ১৩০৫
৭. তদেব
৮. য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি, ২২ আগস্ট ১৮৯০
৯. জাপান-যাত্রী, ১১ সংখ্যক অধ্যায়
১০. Sir James George Frazer, *The Golden Bough,* abridged edition, London, 1983, p. 902.
১১. Alfred Hillebrandt, *Vedic Mythology,* tr. by S. Rajeswara Sarma, vol. II, Delhi, 1990, pp. 114-15
১২. দ্র. টীকা সংখ্যা ৫, পৃ. ৩৬৭।

গল্প ও তার গোরু

অরুণ নাগ

আবহমানকাল থেকে গল্প মানুষের বিনোদন, গল্প শোনা-বলা-পড়ার কৌতূহল তার কোনো দিন ফুরোয় না। কল্পনার অবাধ প্রসার গল্পে, পার্থিব জগতের পাথুরে প্রাচীর তার কাছে কোনো বাধাই নয়, তাই বাস্তব আর অবাস্তব দুই-ই সমমূল্যে সমাদৃত। এখানে বাস্তব বলতে, তথ্যপ্রমাণে ঢালাই, সন্দেহের কষ্টিপাথরে যাচাই করা যে 'বাস্তব'-কে আমরা জানি, মানি, মোটেই সে বাস্তবকে বোঝাচ্ছে না। যা ঘটে গেছে বা ঘটছে এর মধ্যে তা তো আছেই, যা ঘটতে পারে বা পারত, তাও এর অন্তর্ভুক্ত। একই সূত্র ধরে বলা যায় গল্পের 'অবাস্তব' হচ্ছে তাই, যা কোনো দিন ঘটে নি, ঘটছে না ও ঘটবে না। দুই ভাগের বিভাজকরেখার লাগোয়া খানিক জমি আছে : 'ঘটতে-পারে-নাও-পারে'দের এলাকা। অধিবাসীদের কেউ কায়েমিপ্রজা নয়, মানুষের জ্ঞান-বিশ্বাস সেখানকার জমিদার, কাউকে জমি দিয়ে বসত করায়, আবার কাউকে উদ্বাস্তু করে দেয় তুলে। আজকের কল্পবিজ্ঞানে যেমন অজানা গ্রহের অদ্ভুত প্রাণীদের গল্প লেখা হয়, মধ্যযুগে তেমনি এই গ্রহেরই অজানা ভূখণ্ডের গল্প বলত পর্যটক ও নাবিকরা, সোনা-খোঁড়া পিঁপড়েদের দেশ বা যে দেশে নিজের লম্বা কানের ওপর শুয়ে ঘুমোয় বামনের দল। অচেনা অজানাতেই রহস্য। মানুষ নিজের মস্তিষ্কের সম্যক কারিকুরি এখনো বোঝে নি, তাই লেখা হয় অতিপ্রাকৃত আর পরামনোবিদ্যার গল্প। আমাদের আলোচনা শুধুমাত্র অবাস্তব গল্প নিয়ে, যেসব গল্পকে পুরোপুরি অবাস্তব জেনেই মানুষ উপভোগ করে আসছে।

অবাস্তবের অনেক রকম, তাদের কঠোর কোনো শ্রেণীবিভাগের ছকে সাজানো মুশকিল, তবে আত্মীয়তাসূত্রে একটিকে আর-একটির পাশে বসানো যায় মানুষের চেতনার জগৎ গড়ে ওঠে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া, এক কথায় অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা দ্বারা। তার সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণে যে সৃজন, তার সম্ভারকে স্থান-কাল-পাত্র ছাড়া অন্য কোনো ছকে ধরা কঠিন কর্ম তো বটেই, সিদ্ধান্তও বিতর্কিত হতে বাধ্য। তবু বৈজ্ঞানিক জ্ঞানচর্চার অনুসরণে আমরা বার বার সংজ্ঞা নির্ধারণ, শ্রেণীবিভাগ করতে চাইব, মানবিকীবিদ্যার অধিকাংশ শাখায় সে প্রচেষ্টা অসফল বা আরো ঠিক ভাবে বলতে গেলে অসম্পূর্ণ। মূল কারণ, এই সব ক্ষেত্রে মৌলিক এককের অনুপস্থিতি বা প্রহেলিকাপ্রতিম উপস্থিতি, যার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যাকে মৌলিক একক বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তার যৌগিকত্ব একটু খুঁড়লেই বেরিয়ে পড়ে। সেইজন্য, এই সব ক্ষেত্রে সংজ্ঞা নির্ধারণের যে সহজ ও সম্ভবত একমাত্র পন্থা অনুসৃত হয়, তা হচ্ছে, যৌগের ভিন্ন ভিন্ন অংশীদারের প্রাথমিক সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি খুঁজে বার করা, যা প্রকৃতপক্ষে সামগ্রিক বিষয়ের প্রায়-উপেক্ষণীয় ক্ষুদ্রতম চরিত্র।

যার বেশির ভাগটাই মৌখিক পরম্পরার অন্তর্গত (ও আধুনিক কালে লিপিবদ্ধ) এবং স্বাভাবিকভাবে মূল সৃজনের পরে হাজার বার পরিবর্তিত ও রঞ্জিত, তাদের সংজ্ঞা তাৎপর্য শ্রেণীবিভাগ ও বিবর্তনের প্রক্রিয়া একটিমাত্র সংস্করণ থেকে নির্ণয়ের চেষ্টা চাঁদ ধরার শামিল। তথাপি সব মিলিয়ে প্রচেষ্টা আপাত-বিশ্বাসযোগ্য ও প্রয়োজনীয় হয় কারণ, পাশ্চাত্য তালিম অনুযায়ী আমরা ভাবি সংজ্ঞা, শ্রেণীবিভাগ ইত্যাদি দ্বারা ঐ বিষয়ে আমাদের কেন্দ্রিক জ্ঞান স্বচ্ছ ও সংবদ্ধ রূপ পাচ্ছে, প্রান্তিক ক্ষেত্রে যা হয়তো কিছুটা অস্পষ্ট। অথচ বাস্তব অবস্থা ঠিক উলটো। অর্থাৎ ঐ বিষয়ের প্রান্তিক রূপ অনেক বেশি স্পষ্ট, ধরাছোঁয়ার মধ্যে, কিন্তু কেন্দ্রের, মূলের দিকে যতই যাওয়া যায়, অনচ্ছতার কুয়াশা বাড়তে থাকে। অপ্রাসঙ্গিক একটি কথা জানিয়ে রাখা উচিত, অনেক সময় সেই বায়বীয় পর্দা আয়নার কাজ করে, অনুসন্ধিৎসুর নিজের মানসিকতার প্রতিফলন বিভ্রান্ত করে তাকে। অবাস্তব গল্পদের আমরা বর্ণনা করব 'বক্তব্য'

অনুযায়ী, কোনো কোনো ক্ষেত্রে উদারভাবে যাকে 'শিক্ষা'-ও বলা যেতে পারে। এই বক্তব্য বা শিক্ষা প্রত্যক্ষ হতে পারে, পরোক্ষও হতে পারে। 'পঞ্চতন্ত্র' সরাসরি নীতিশিক্ষা দেয়, রূপকথা পরোক্ষভাবে শেখায় ধর্মের জয় আর অধর্মের পরাজয়, বিক্রমাদিত্যের উপাখ্যান ইতিহাসের এক আবছা ধারণা জাগিয়ে তোলে মনে।

পশ্চিমী বিদ্যাচর্চা যখন এ দেশে অনাগত, মুদ্রণ-পুর্ববর্তী সেই বিশাল যুগবিস্তারে 'কথা' ছিল ঐতিহ্যগত জ্ঞানের এক বড়ো অংশ, নিরক্ষর-সাক্ষর নির্বিশেষে যা আত্মসাৎ করতে পারত। 'কথা' শব্দের এহেন অব্যাখ্যাত প্রয়োগ তর্কের সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষত যখন 'কথা' ও 'আখ্যায়িকা'-র চরিত্রলক্ষণ নিয়ে সংস্কৃত সাহিত্যবেত্তাদের মধ্যে প্রাচীন কাল থেকেই বিতর্ক চলে আসছে। সামগ্রিক বিতর্কটি (দ্র S. K. De, 'The Akhyāyikā and the Katha in Classical Sanskrit'. *Some Problems of Sanskrit Poetics* , Calcutta, 1959) অপ্রয়োজনীয়, কারণ যে 'কথা'-র কথা আমরা বলছি তা মূলত লৌকিক, যেখানে শাস্ত্রসম্মত চরিত্রলক্ষণ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় নি, যে-কোনো কাহিনীই 'কথা'। মার্গীয় কথা/আখ্যায়িকা লক্ষণ-বিতর্কের কেবলমাত্র কয়েকটি প্রস্তাব আমরা মনে রাখব, আলোচনার পরবর্তী অংশে স্মরণীয় হবে বলে। ভামহ বলেছেন, আখ্যায়িকায় নায়ক স্বয়ং বর্ণনা করবে তার সাধিত কর্ম (বৃত্তম্ আখ্যায়তে তস্যাং নায়কেন স্বচেষ্টিতম্), সমগ্র রচনাটি বিভক্ত হবে কয়েকটি 'উচ্ছ্বাস'-এ (অধ্যায়), শ্রুতিসুখকারক গদ্যে লিখিত হবে যদিও কিছু ছন্দোবদ্ধ অংশ থাকতে পারে। অপর দিকে, কথা— নায়ক ভিন্ন যে-কারো দ্বারা বর্ণিত। অখণ্ড গল্প, সংস্কৃত বা অপভ্রংশে রচিত হতে পারে, যার দ্বারা বোঝায় আখ্যায়িকা অবশ্যই সংস্কৃতে রচিত হবে। বাণভট্ট তাঁর রচিত 'হর্ষচরিত' ও 'কাদম্বরী'-কে বলেছেন যথাক্রমে আখ্যায়িকা ও কথা। অথচ ভামহ-প্রদত্ত সংজ্ঞার সঙ্গে তাদের অমিল আছে। বাণকে আদর্শ ধরে পরবর্তীকালে রুদ্রট কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত সংজ্ঞা স্থির করেন, আখ্যায়িকার বিষয় হবে বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক, বর্ণনাকারক স্বয়ং নায়ক না হলেও চলবে ও কয়েকটি উচ্ছ্বাসে বিভক্ত হবে। অন্য দিকে কথার বিষয়বস্তুর অধিকাংশ হবে রচনাকারের কল্পনাসম্ভূত, বাচক নায়ক ভিন্ন অন্য কেউ হবে তবে সে সময়বিশেষে নায়ক হতে পারে। অবিভক্ত, অখণ্ড গল্প, যার সাহিত্যপদবাচ্য ছন্দোবদ্ধ ভূমিকা থাকবে। দেখা যাচ্ছে, অপরিহার্য বিতর্কবিন্দুর কয়েকটি হচ্ছে, নায়কের উত্তমপুরুষে বর্ণনা অথবা নয়, বাস্তবিক বা কাল্পনিক, গল্পের অখণ্ডতা অথবা নয়, ও গদ্য বনাম ছন্দ, তাদের অতীতচেতনা, মূল্যবোধ আর কর্মপন্থার দিশা গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক। যুগ-যুগান্ত ধরে প্রবহমান এই ক্রিয়াস্রোতে, আধুনিক মানদণ্ডে আমরা যাকে অবাস্তব বলছি, সেই সব কাহিনীর ভূমিকা, খুঁটিয়ে দেখতে গেলে, কী?

প্রথমে বলা যাক 'নীতিগল্প'-এর কথা, উদাহরণ পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, ঈসপের ফেবলস ইত্যাদি। নীতিগল্পকে অবাস্তব বলার কারণ, পৃথিবীর সকল প্রাণী সেখানে কথা বলে এবং একই ভাষায়, নইলে তার নির্যাস খাঁটি বাস্তব। সব গল্প চরিত্রবৈশিষ্ট্যে একাধারে উপমা ও প্রমাণ, দ্বিবিধ উদ্দেশ্য-সাধক। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় নীতিবাক্যগুলিকে সহজে মনে রাখার জন্য ও চিত্তাকর্ষক করার জন্য গল্পগুলিকে উপমা-আঙ্গিকে আরোপণ করা হয়েছে। অপর দিকে তাদের সংক্ষিপ্ত আঁটোসাঁটো কাঠামো আর বহস-চরিত্র দেখায় যে তা একই সঙ্গে প্রমাণ রূপেও ব্যবহার করা যায়। বহস-চরিত্র (আর্গুমেন্টেশন), একটি বিশিষ্ট ধরণের মতপ্রকাশক্রিয়ার আবশিক অঙ্গ। সেটি হল প্রচার (প্রপাগান্ডা)। বিশ্বাসভিত্তিক মত-প্রচারী সাহিত্যে, যথা, রাজনৈতিক বা ধর্মীয়, এই বৈশিষ্ট্যের প্রায়ই সাক্ষাৎ মেলে। মৌখিক ধারাতেও তাই, প্রমাণ, খ্রিস্টান ক্যাটিকিস্ট (catechist)- পদীয় ধর্মপ্রচারক ও ক্যাটিকিজ্‌ম (catechism) বা প্রশ্নোত্তর প্রণালীতে ধর্মপ্রচার। নীতিগল্পের উদ্দেশ্য এক-একটি বিশেষ নীতিপ্রচার, বহস-আঙ্গিক সেই প্রয়োজন সিদ্ধি করছে। এই আঙ্গিকের উৎকৃষ্ট উদাহরণ 'পঞ্চতন্ত্র'-এর 'মিত্রভেদ' ভাগে প্রথম গল্পের সিংহরাজ পিঙ্গলকের দুই শৃগাল মন্ত্রী করটক ও দমনকের প্রশ্নোত্তর, বা পিঙ্গলকের সঙ্গে দুই মন্ত্রীর কথোপকথন ; 'মিত্রপ্রাপ্তি' ভাগে কপোত চিত্রগ্রীব, মূষিক হিরণ্যক ও কাক লঘুপথনকের কথোপকথন প্রভৃতি।[১]

একই মানদন্ডে রূপকথা নীতিগল্পের বেশ ঘনিষ্ঠ, সেখানেও বাস্তব চরিত্রেরা অবাস্তব আচরণ

করে, যেমন, পশুপাখি সর্বজনবোধ্য ভাষায় কথা বলে, তদুপরি থাকে অবাস্তব চরিত্র— পরী, ডাইনি, রাক্ষস, কত কী। কিন্তু এই মিলটুকু ছাড়া নীতিগল্পের সঙ্গে তার অমিলই বেশি।

রূপকথায় সকল গল্পের অন্তিম পর্বে জয় হয় ন্যায়ের, ধর্মের, আর নীতিগল্পে হয় বুদ্ধির। নীতিগল্প প্রখর বাস্তববাদী, রূপকথায় যেমন ধর্মের জয় অধর্মের পরাজয়ের মতোই অবধারিত, নীতিগল্পে তা আদপেই নয়। সরল বিশ্বাসীকে মরতে হয় প্রবঞ্চকের হাতে[২] বা শঠের সঙ্গে শঠতাই ব্যবহারের একমাত্র পন্থা[৩]। রূপকথায় গল্পের প্রথম দিকে অধর্ম জিততে পারে, সরলপ্রাণ, সত্যবাদী, দুর্বল হতে পারে অত্যাচারিত, অন্যায় চক্রান্তে দুয়োরানীকে ঘুঁটে কুড়োতে হয়, কিশোর রাজপুত্রকে যেতে হয় রাক্ষসরাজ্যে মরতে। কিন্তু শেষে মিথ্যাকে অন্যায়কে, অধর্মকে হারতেই হয়, যতই সে শক্তিশালী হোক। তার জন্য অপেক্ষা করে 'হেঁটে কাঁটা উপরে কাঁটা' দেওয়া কবর। নীতিগল্প বাস্তববাদী বলেই তাতে বিপদ আর তার উত্তরণ, দুই-ই বাস্তব, অথচ রূপকথায় বিপদ যেমন অলৌকিক, তা থেকে উদ্ধার পাওয়া ঘটে ততোধিক অবাস্তব উপায়ে।

নীতিগল্পের 'শিক্ষা' বোঝা শক্ত নয়, স্বার্থরক্ষাই সমাপক লক্ষ্য, উপায় বুদ্ধি। কিন্তু রূপকথা ধর্মানুসারী। ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী যার স্বার্থেই বুদ্ধি কাজে লাগানো হোক-না-কেন, তার কোনো নির্দিষ্ট নৈতিক-চরিত্র থাকা সম্ভব নয়, অপর দিকে ধর্ম একটি স্থায়ী, অপরিবর্তনীয় নিয়ম-সমষ্টি। বুদ্ধি আর ধর্মবোধের মধ্যে এই ফারাকই রূপকথা আর নীতিগল্পের মূল পার্থক্য। এই ধর্ম, বলা বাহুল্য, ঈশ্বরসন্ধানী ধর্ম নয়, কতকগুলো স্থিরীকৃত অনড় আদর্শ আর মূল্যবোধের সমাহার। সকল মানুষের জন্মকর্ম অনুযায়ী কর্তব্য স্থির করা আছে, তা পালনে পুণ্য, অবহেলায় পাপ। রাজার কর্তব্য প্রজাপালন চাণক্যশ্লোক, 'প্রজাসুখে সুখং রাজ্ঞঃ প্রজানাং চ হিতে হিতম্ / নাত্মপ্রিয়ং হিতং রাজ্ঞঃ প্রজানাং তু প্রিয়ং হিতম্',[৪] প্রজার সুখেই রাজার সুখ, প্রজার মঙ্গলেই রাজার মঙ্গল, নিজের মঙ্গল রাজার প্রিয় নয়, প্রজাদের মঙ্গলই রাজার প্রিয়, তাতে অবহেলা করলে রাজত্ব পাপে ঘেরে, রাজপুরী অন্ধকারে হয়, রাজত্ব ছারেখারে যায় রূপকথার ভাষায়, /'এক রাজা আর এক মন্ত্রী। একদিন রাজা মন্ত্রীকে বলিলেন — 'মন্ত্রি! রাজ্যের লোক সুখে আছে, কি, দুঃখে আছে, জানিলাম না।' মন্ত্রী বলিলেন,— 'মহারাজ ! ভয়ে বলি, কি, নির্ভয়ে বলি?' রাজা বলিলেন— 'নির্ভয়ে বল।' তখন মন্ত্রী বলিলেন,— ''মহারাজ, আগে- আগে রাজারা মৃগয়া করিতে যাইতেন,— দিনের বেলায় মৃগয়া করিতেন, রাত্রি হইলে ছদ্মবেশ ধরিয়া প্রজার সুখ-দুঃখ দেখিতেন। সে দিনও নাই, সে কালও নাই, প্রজার নানা অবস্থা।' শুনিয়া রাজা বলিলেন,—'এই কথা? কালই আমি মৃগয়ায় যাইব।'...রাজা মৃগয়ায় গেলেন। রাজার তো নামে মৃগয়া। দিনের বেলায় মৃগয়া করেন ...রাত হইলে রাজা ছদ্মবেশ ধরিয়া প্রজার সুখ-দুঃখ দেখেন'। তারপর রাজা অন্যায় কাজ করেন, তার ফলে '... মনের দুঃখে দিন যায়—রাজার রাজপুরী অন্ধকার। রাজা বলিলেন, — 'না। আমার রাজত্ব পাপে ঘিরিয়াছে। চল, আবার মৃগয়ায় যাইব।' [৫] লক্ষণীয়, রাজা অন্যায় করলে রাজত্ব পাপে ঘেরে। প্রজার সুখ-দুঃখের খোঁজ নেওয়া পুণ্যকর্ম, ঐ পাপের প্রতিকার। দরিদ্র বন্ধুকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার পাপে রাজার দেহ সূচে ছেয়ে যায়, দাসী চক্রান্ত করে হয় রানী আর রানী কাঞ্চনমালা হন দাসী। তিনি কাঁদেন,'কি বা পাপে সোণার রাজার রাজ্য গেল ছার /কি বা পাপে ভাঙ্গিল কপাল কাঞ্চনমালার'।[৬] পাপ করলে যে শুধু সোনার রাজ্য ছারখার হয় তাই নয়, পাপ-পুণ্যের হিসেব এতটাই পাকা যে রানী রাজার অর্ধাঙ্গিনী বলে পাপের ফল তাঁকেও অর্ধেক ভোগ করতে হয়। লক্ষ করার বিষয়, যে 'পাপ' শব্দ ব্যবহারে, তাৎপর্যে বার বার ঘুরে ফিরে আসছে রূপকথায়, নীতিগল্পে তার প্রায় অস্তিত্বই নেই। বুদ্ধির প্রয়োগ পুরস্কার এনে দেয় ইহলোকে, স্বার্থসিদ্ধিই তার পারিতোষিক; কিন্তু ধর্মসম্মত আচরণ পুণ্যবন্তকে অন্তিম ফললাভ করায় পরলোকে। রূপকথাতে পরলোক নেই, স্বর্গ-নরকও নেই। ধার্মিক

আচরণের ফলস্বরূপ ন্যায়বান এই মাটির পৃথিবীতেই রাজসিংহাসনে বসে, গলায় 'গজমোতির হার' দুলিয়ে 'নাতি-নাতকুড়' নিয়ে 'কোটি-কোটীশ্বর' হয়ে সুখে রাজত্ব করে যায়। আর কে না জানে ধর্মের জয় হয় গল্পে, বাস্তবে নয়। তাই, এই সব কাহিনী হয়ে থাকে রূপকথা।

নীতিগল্প বক্তব্যে এতদূর বাস্তব হয়ে কাঠামোয় কেন অবাস্তব? কেন পশুপাখিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রধান কুশীলব, কেন তারা সর্বজনবোধ্য ভাষায় কথা বলে? রচনাকালে নিঃসন্দেহে আজকের মতো পশুপাখিরা মানুষের জীবন থেকে নির্বাসিত হয় নি, তথাপি সেটা মূল কারণ নয়। এক-একটি বিশিষ্ট মনুষ্যচরিত্রের প্রতিরূপে (টাইপ) হাজির করা হয়েছে সমতুল পশুপক্ষীকে : ক্ষমতাবান অহংকারী সিংহ, ধূর্ত চাটুকার শৃগাল, নির্বোধ গর্দভ ইত্যাদি। মনুষ্যরূপে আঁকলে ব্যক্তিনাম দিতে হত, তখন বর্গীয় চরিত্র হারিয়ে তা হয়ে দাঁড়াত একক, হয়তো বা ব্যতিক্রমী। মানুষের দোষ-গুণ পশু-পাখিতে আরোপ করা বা ঠিক তার উলটো — তার রেওয়াজ বহু প্রাচীন। স্মরণীয় চাণক্যশ্লোক, 'সিংহাদেকং বকাদেকং ষট্ শুনস্ত্রীণি গর্দভাৎ/বায়সাৎ পঞ্চ শিক্ষেৎ চত্বারি কুক্কুটাদপি'[৭] সিংহ থেকে একটি গুণ, বক থেকে একটি গুণ, কুকুর থেকে ছয়টি গুণ, গাধা থেকে তিনটি গুণ, কাক থেকে পাঁচটি গুণ এবং মোরগ থেকে চারটি গুণ শিক্ষণীয়। প্রসঙ্গত, লোককাহিনীতে পশুচরিত্রের উপস্থিতি বিষয়ে বহু সম্ভব-অসম্ভব অনুমান আছে। যেমন স্টেন কনো (Sten Konow) সাঁওতালি লোককথার একটি সংগ্রহের ভূমিকায় বলেছেন, পঞ্চতন্ত্রের সৃষ্টি দাক্ষিণাত্যে এবং গুণাঢ্যের বৃহৎকথার বিন্ধ্য অঞ্চলে। প্রাচীন ভারতে এই দুটি অঞ্চলে অনার্যরা বাস করত এবং তাঁর ধারণা ভারতীয় উপাখ্যানমালার এক বড়ো অংশ সাঁওতালি পরম্পরার দান। তিনি ভারতীয় কাহিনীতে শৃগালের জনপ্রিয় ভূমিকার কথা বলেছেন, যার দুই প্রকার। এক প্রকারে, যারা নিজেদের ন্যায্য অধিকার পেতে অত্যাচারিত হচ্ছে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসছে শৃগাল; অপরটিতে সে ধূর্ত, প্রবঞ্চক, অন্তিমে যার পরাজয় ঘটছে। তাঁর ধারণা একটির উৎস অনার্য (Kolarian), অপরটির আর্য।[৮] নির্বোধ অনুমানের দৃষ্টান্ত, ভারতের লিঙ্গায়েৎ গোষ্ঠীর প্রচুর উপকথায় মানুষ নায়ক-নায়িকার সঙ্গে জীবজন্তুর বিবাহবৃত্তান্ত আছে, সে সম্পর্কে এক ফোক-লোর বিশেষজ্ঞের মন্তব্য, 'The jackal marrying a Brahmin's daughter in the story ... suggests the sexual relations between human beings and animals prevalent among the Lingayets. The best example of this human-animal relation is the story ... in which a girl is married to a fish'[৯]। প্রেক্ষাপট রাজতন্ত্র, কুশীলব মানুষেরই এক-একটি টাইপ চরিত্রের প্রতিনিধি পশুপাখি, নীতি (মর‍্যাল) বাস্তবিক ও প্রয়োজনীয়— স্বাভাবিকভাবেই এই গল্পগুলিকে এতখানি সাধারণ (ইউনিভার্সাল) চরিত্র দিয়েছে যে তারা অনায়াসে ভাষা, দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করতে পেরেছে। অথচ, রূপকথা কিন্তু ভাষার সীমা পেরোতে পেরেছে কদাচিৎ য়োহানেস হার্টেল (Johannes Hertel) দেখিয়েছেন পঞ্চাশটির অধিক ভাষায় পঞ্চতন্ত্রের দ্বিশতাধিক পাঠের সন্ধান পাওয়া যায়, এবং মোট ভাষা-সংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ বহির্ভারতীয়।[১০] কিন্তু উত্তর বিহারের জনপ্রিয় রূপকথা সুরঙ্গা-সদাবৃচের কাহিনী বাংলায় কেউ জানে না কিংবা বুদ্ধু-ভূতুমের গল্প উড়িষ্যায় কেউ শোনে নি।

নীতিগল্পে বুদ্ধির জয়জয়কার, তাই হাস্যরসাত্মক গল্পগুলিতে বোকারাই নায়ক, উপহাসের পাত্র। বাস্তব জগতের মতো নীতিগল্প নির্বোধদের প্রতি নিষ্ঠুর, দয়াহীন। গাধাকে তার নির্বুদ্ধিতার জন্য চরম লাঞ্ছনা পেতে হয়,[১১] ভিক্ষালব্ধ এক হাঁড়ি শস্যচূর্ণ পেয়ে যে বোকা ব্রাহ্মণ ধনেজনে পূর্ণ সুখী সংসারের দিবাস্বপ্ন দেখে, গল্পের শেষে হাঁড়ি ভেঙে তার ক্ষুন্নিবৃত্তির সেই যৎসামান্য উপায়টুকুও হাতছাড়া হয়।[১২] অপর দিকে রূপকথায় নির্বুদ্ধি ব্রাহ্মণ শুধুমাত্র অনুকূল ঘটনাচক্রের সহায়তায় রাজার সভাপণ্ডিত হয়, তাকে 'রাজা দেন পাদ্য অর্ঘ্য রাণী দেন পূজা', সে ত্রিতল প্রাসাদে 'সোনার খাটেতে র'ন করিয়া শয়ন'।[১৩] রূপকথা যোগ্যতমের বাঁচার নীতিতে বিশ্বাসী নয়, উদার মানবতাবাদী। কিংবা ক্ষমতাহীন নিষ্পেষিত বোকা মানুষদের কাল্পনিক ইচ্ছাপূরণের করুণ কাহিনী।

নীতিগল্প নীতি শিক্ষা দেয়, রূপকথা দেয় ধর্ম। কেবলমাত্র তা পরোক্ষ হওয়ার জন্যই কি রূপকথাকে ধর্মশিক্ষামূলক গল্প (রিলিজস প্যারাবল্স) বলা হবে না? কেন নয়, তার উত্তর পাওয়া যাবে নীতি আর ধর্ম, উভয় পালনের পুরস্কারের দিকে দেখলে। নীতিগল্প বলে স্বার্থসিদ্ধি, পার্থিব হিত, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুনরায় বাস্তবের মতো তাৎক্ষণিক, সাময়িক। কিন্তু রূপকথায় ধর্মীয় শিক্ষার মতো পুরস্কার সীমাহীন অথচ নীতিগল্পের মতো ইহলোকেই তার প্রাপ্তি। সাতরাজার ধন অতুল ঐশ্বর্য, পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্র সহযোগে দীর্ঘজীবন, অসীম ক্ষমতা ও প্রতাপ। মাটিতে স্বর্গের সুখ। অশেষ পার্থিব কামনার এই ছবি আর এক জায়গাতেও আমরা দেখি, ব্রতকথায়। 'গঙ্গা গঙ্গা ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ বাসুকী/তিন কুল ভরে দাও ধনে জনে সুখী'।[১৪] পার্থক্যের মধ্যে ব্রত -কথায় সমস্যার সমাধান, আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় কোনো বিশেষ দেবদেবীর দয়ায়, রূপকথায় যে উপাদানটি অনুপস্থিত। দ্বিতীয়ত ব্রতকথা আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি আর রূপকথা সেই আকাঙ্ক্ষা পূরিত হওয়ার। যা ঘটে না তাই তো রূপকথা।

অবাস্তবের আর এক প্রকার উদ্ভট, আজগুবি, ননসেন্স। আকারে বৃহৎ, তার বৈচিত্র্যও অনেক যদিও ননসেন্সের মধ্যে ধরা হয়, তবু এখানে আলোচনার সুবিধার্থে অশিক্ষিত লোক যে একটি বিশেষ শব্দ বলতে গিয়ে সম-ধ্বনিক অর্থহীন শব্দ (ম্যালাপ্রপিজ্‌ম্স) ব্যবহার করে, তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তার আর এক ঘনিষ্ঠ, আলোচনায় আসবে, পরে, প্রাথমিকভাবে যা যুক্তিগ্রাহ্য অর্থ বহন করে না—এমন একটি সাধারণ অবয়ব থেকে শুরু করা যায়।

ননসেন্সকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় : অর্থহীন ও অর্থবাহী। অর্থহীন শব্দ বা বাক্য নানাভাবে তৈরি হতে পারে, যেমন দুটি অর্থবাহী শব্দ সন্ধি দ্বারা উৎপন্ন অর্থহীন শব্দ: হাঁস + সজারু = হাঁসজারু বলা হয় জেমস জয়েস-এর উপন্যাসের নাম *Finne gans Wake* -এর প্রথম শব্দটি *Finish+Again,* এবং উপন্যাসটিতেও এমন প্রচুর শব্দ আছে ; একটি অর্থবাহী ও একটি অর্থহীন শব্দ জুড়ে, যেমন, কুম্‌ড়োপটাশ; অর্থবাহী শব্দ বা বাক্যের সম্পর্কহীন, অযৌক্তিক সাজানো: 'উকুনে বুড়ি পুড়ে মল / বক সাতদিন উপোস রইল / নদীর জল কে নিয়ে গেল / হাতির লেজ খসে পড়ল / গাছের পাতা ঝরে পড়ল / খুখুর চোখ কানা হল,'[১৫] অর্থহীন একাধিক শব্দের মধ্যে ক্রিয়া, অব্যয় ইত্যাদি বসিয়ে তৈরি করা অর্থহীন বাক্য, Jabberwocky-র সম্পূর্ণ পাঠটি স্মর্তব্য 'Twas brillig, and the slithy toves' ইত্যাদি।

অর্থহীন ননসেন্সের সবথেকে বড়ো সম্ভার ছন্দোবদ্ধ এবং ছন্দোবদ্ধ রূপে অর্থহীন শব্দের ব্যবহার সবথেকে বেশি। ছন্দের প্রয়োজনে তো বটেই, সেইসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে ননসেন্স বলেই শব্দের অর্থবহতার শর্ত উপেক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। শিশুদের ছড়া বা নার্সারি রাইম যেমন, 'ইচিং বিচিং জামাই বিচিং। মাকড়েরা নড়ে চড়ে, / সাত কুমড়া ডিম পাড়ে'[১৬] বা 'Hey,diddle, diddle, the cat and the fiddle,/The cow jumped over the moon./ The little dog laughed to see such a sport, / And the dish ran away with the spoon',[১৭] বা খেলার ছড়াগুলি যেমন,'চাপিলা চাপিলা ঘন ঘন কাশি / নলের হুকায় রামের বাঁশী / একা নল পঞ্চদল / কে রে যাবি কামারদল? কামারদলের ধুকধুকানি / খড়ের গাদায় হাঁটু পানি। আপ্পন ঝাপ্পন কান্দিও ভোর / হা-বু-ডু-বু জামাই চোর'.[১৮] বা 'Ring-a-ring-O-roses / A pocket full of posies / Atishoo-atishoo/ All fall down[১৯] তার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

অর্থহীন ননসেন্স প্রধানত কৌতুকরসবাহী কিন্তু তার ব্যতিক্রমও আছে। ঘুমপাড়ানি ছড়ায় প্রায়শ

ভয়-দেখানো উপাদান থাকে। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য, আর যাই হোক, অর্থহীন শব্দ জয়েস কৌতুকরস সৃষ্টির জন্য করেন নি।

অর্থহীন ননসেন্সের গদ্যরূপ চরিত্রে কিছু আলাদা। অর্থহীন শব্দ সেখানে প্রায় অনুপস্থিত, গল্প সামগ্রিক বা খণ্ড, দুই রূপেই অযৌক্তিক, যোগসূত্রটি পূর্বাপরতার। গল্পের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিটি বাক্যে, পর্বে নাকচ করা হচ্ছে, ফলে গল্প শেষ করেও কোথাও পৌঁছনো যাচ্ছে না উদাহরণ দেওয়ার আগে একটি কথা বলে নেওয়া উচিত, ইংরেজ সাহিত্যবেত্তাদের ধারণা ইচ্ছাকৃত (ইনটেনশনাল) ননসেন্স-শব্দযুক্ত রচনা 'has become a minor genre in literature, especially during the last ১৫০ years'[২০]। কারণ আমরা অনুমান করতে পারি, খ্যাতনামা রচয়িতাদের, যথা, স্যামুএল ফুট Samuel Foote (১৭২০-৭৭), এড্ওআর্ড লিঅর Edward Lear (১৮১২-৮৮), হোম লী Holme Lee (১৮২৮-১৯০০),লুইস ক্যারল Lewis Carroll (১৮৩২-৯৮), অনেকেরই সময়কাল তাই। কিন্তু ননসেন্স শব্দের ইচ্ছাকৃত ব্যবহার শ্রেণীভাগের পক্ষে একমাত্র শর্ত নয়, দ্বিতীয়ত এঁরা একটি পরম্পরার বাহক যার পূর্বসীমা অনেক পুরোনো। উপযুক্ত দৃষ্টান্ত, একটি উর্দু গল্প :'একটি কাঁটার ডগায় ছিল তিনটি পুকুর, তার দুটি শুকনো আর একটাতে জল নেই। সেইটাতে তিন কুমোর গিয়ে আড্ডা গাড়ল। কুমোরদের দুজনের হাত নেই, তৃতীয়জনের হাত ছিলই না। তৃতীয়জন তিনটি পাত্র বানাল যার দুটি ভাঙা আর তৃতীয়টির তলা নেই। তলাহীন পাত্রটিতে তারা তিন দানা চাল রান্না করল। দুটি দানা রয়ে গেল কাঁচা আর একটা সিদ্ধই হয়নি। সেই এক দানা চাল খেতে তারা তিন অতিথিকে নিমন্ত্রণ করল, যাদের দুজন গেল বেজায় রেগে, আর তৃতীয়জনকে শান্তই করা যাচ্ছিল না। তখন তাকে তিন জুতোর বাড়ি মারা হল, যার দুটো গেল ফসকে, আর একটা তার গায়ে লাগলই না। জুতো খাওয়ার ভয়ে অতিথি তো দৌড়ে পালাল, তাকে তাড়া করল যে নিমন্ত্রণ করেছিল, সে। তাকে আবার রাস্তাতে মারতে এল এক বুনো হাতি। এক ঘুষিতে হাতির অর্ধেকটা উড়িয়ে দিয়ে দুটো পাঁজর ভেঙে দিতে, হাতি ছুটে পালাল, সেও করল তাড়া। হাতি তাড়া খেয়ে এক গাছে উঠে, ডাল থেকে ডালে, পাতা থেকে পাতায় গুড়ি মেরে পালাতে থাকল'.[২১] ইত্যাদি, নিশ্চয় অনেক ভাষাতেই অনুরূপ গল্পের সন্ধান পাওয়া যাবে, একটি আর্মেনীয় গল্পের অংশবিশেষ:'আমরা চলছি তো চলছি, যতক্ষণ না এক জায়গায় পৌঁছে দেখি তিনটি গ্রাম। তার দুটিকে দেখাই যাচ্ছে না আর তৃতীয়টিতে কোনো বাড়ি নেই। এই প্রাণহীন গ্রামে একটা বাড়ি পেলাম যেখানে থাকে তিন বুড়ি। তাদের দুজন মৃত, একজনের নিঃশ্বাস পড়ছে না। আমরা বললাম, এই হাঁসটা ভাতের সঙ্গে রান্না করা যাক। যার নিঃশ্বাস পড়ছিল না সেই বুড়ি এদিক সেদিক অনেক খুঁজে একটি চালের দানার অর্ধেক আর তিনটি পাত্র পেল, তার দুটি ফুটো আর তৃতীয়টির তলাটাই নেই। তলাহীন পাত্র জলে ভরে আমরা সেই চাল আর হাঁস দিয়ে আগুন ছাড়াই রান্না করলাম। রান্না হচ্ছে তো হচ্ছেই, শেষকালে মাংস আর ভাত সিদ্ধ হয়ে শুধু জলটা পড়ে রইল। শিকার করে এসে বিষম খিদে পেয়েছিল, গোগ্রাসে খেতে লাগলাম, কিন্তু কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না, মুখেও কিছু ঢুকছিল না।' [২২] গল্প দুটির মধ্যে মিল এত বেশি যে একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত মনে হয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'পিঁপড়ে, হাতি আর বামুনের চাকর'[২৩] এই জাতীয় গল্পের একটি ভালো উদাহরণ।

যদি মেনে নিই ননসেন্সের লক্ষ্য বক্তব্যের বিশ্বাসযোগ্যতাকে শুধু অন্তিমে নয়, প্রতি পর্বে ধূলিসাৎ করা, এবং তা প্রচ্ছন্নভাবে নয়, রীতিমতো চোখে আঙুল দিয়ে, তা হলে স্বীকার করতে হয় এই গল্পগুলি আদর্শ ননসেন্স। অবশ্য এই চূড়ান্ত রূপের অনেকগুলি প্রাক্-স্তর আছে এবং বাস্তব থেকে ননসেন্সে উত্তীর্ণ হওয়ার ক্রমে প্রথম দিকেরগুলি বেশি বাস্তবঘেঁষা এবং স্বভাবত শেষের দিকের স্তরগুলি সেই তুলনায় অনেক বেশি ননসেন্স। স্তর-বিভাজনের নিয়ন্ত্রক হিসেবে উপাদানকে ধরা

যেতে পারে। ননসেন্সের উপাদান অবাস্তব চরিত্র, ঘটনা বা ক্রিয়া ও আবহ বা পটভূমি। পূর্বোক্ত ত্রিবিধ উপাদানের, একটি, দুটি বা তিনটি, যত বেশি-সংখ্যক অবাস্তব হচ্ছে ততই কাহিনী চূড়ান্ত, আদর্শ ননসেন্সে পরিণত হচ্ছে। একক উপাদান অবাস্তব হলে ননসেন্স গল্প কতখানি বাস্তবিক মনে হয় তার উদাহরণ তামিল ভাষার একটি কাহিনী, পাত্র-পাত্রী, ব্রাহ্মণ ও তার স্ত্রী ও এক রাখাল। তিনজনেই সম্পূর্ণ বধির এবং কেউ কারো প্রশ্ন-উত্তর শুনতে না পেয়ে কী উদ্ভট পরিস্থিতির সৃষ্টি হল, তাই গল্পের বিষয়।[২৩ক] বলা বাহুল্য, প্রশ্ন না শুনে উত্তর বা কাজ 'অবাস্তব', একটিমাত্র ননসেন্সীয় উপাদানকে (ক্রিয়া) কাজে লাগিয়ে গল্প।

অর্থবাহী ননসেন্সকে তেমত আখ্যা দেওয়া প্রবল প্রতিবাদযোগ্য প্রস্তাব, কারণ চালু মত 'Setting aside gibberish (for example : gibbernog floos tink manga-ha ore doog now less and fly high split in west), true or positive nonsense writing (it is usually in verse) is never intended to make sense'/[২৪] তবে এ কথা সত্য অর্থবাহী ননসেন্স প্রত্যক্ষ, কার্যকারণসম্মত অর্থবাহী নয়, হলে সে আর ননসেন্স থাকে না। বক্তব্যকে ছদ্মবেশ পরানো হয় এবং সে ছদ্মবেশ উপমা কিংবা প্রতীকের। গূঢ়ার্থ অনুধাবন করতে পারার ব্যাপারটি উপভোক্তার পূর্বজ্ঞান সাপেক্ষ, সে বুঝতে পারে, ভিন্ন অর্থ করতে পারে বা একেবারে নাও বুঝতে পারে উপভোক্তার পূর্বজ্ঞান ও অনুষঙ্গ কীভাবে একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন দ্যোতনা সৃষ্টি করতে পারে তার একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন হকবার্গ (Hochberg)'. an eyepatch can identify Moshe Dayan only in the context of politicians ; in childrens tales,the eyepatch might signify Old Pew; and in a company of pirates, it identifies no one',[২৫] 'পিঁপড়েরা হাতিকে টানতে টানতে নিয়ে চলল' নিঃসন্দেহে অবাস্তব, উদ্ভট কিন্তু দুর্বলের হাতে ক্ষমতাবানের পর্যুদস্ত হওয়ার উপমা ভাবলে তার অর্থহীনতা অন্তর্হিত হয়।

অর্থবাহী ননসেন্সকে যে ছদ্মবেশ পরানো হয়, তা স্বভাবত অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপমা। চরিত্র, আচরণ, আকারগত সাদৃশ্যকে উপমাস্বরূপ ব্যবহার অলংকারশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের উদ্ভাবন নয়, বাচনিক পরম্পরায় তা বহুপূর্ব কাল থেকেই রয়েছে। আপাত-ননসেন্স অর্থবাহী, এ বিশ্বাস যে লোকসাহিত্যে চিরকালীন, তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ ধাঁধা। এমন-কি, কোনো কোনো ননসেন্সের ধাঁধার সঙ্গে অসাধারণ কাঠামোগত মিল। সাহিত্যে উপমেয়কে তুলনা করা হয় উপমানের সঙ্গে, কিন্তু ধাঁধায় উপমেয়কে সম্পূর্ণ উহ্য রেখে শুধুমাত্র উপমানের সাদৃশ্যের অংশবিশেষ উল্লেখ করা হয়, বুঝহ রসিকজন যে জান সন্ধান। এই কূটকে জটিলতর করে কল্পনার উদ্দামতা, যেখানে উপমান বাস্তবানুরূপ না হলেও চলে বা খণ্ড-বাস্তব হলেও চলে মার্গ-সংস্কৃতিতে উপমাকে কাব্য-সাহিত্যিক অলংকারের একটি অঙ্গ মনে করা হয়। উপমার চরিত্র ও ব্যবহার অনুযায়ী তার বহু বিভাগ ও উপবিভাগ আছে। সে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক, শুধু উপমাদানের প্রাথমিক ভিত্তিটুকু ছাড়া। স্পষ্ট ব্যক্ত-অব্যক্ত যাই হোক, উপমালংকারের চারটি আবশ্যিক অঙ্গ: উপমেয়, সাধারণ ধর্ম (যার জন্য তুলনা করা সম্ভব হচ্ছে), তুলনাবাচক শব্দ ও উপমান। 'মুখখানি চাঁদের মতো সুন্দর'— 'মুখ' উপমেয়, 'সুন্দর' সাধারণ ধর্ম, 'মতো' তুলনাবাচক শব্দ ও 'চাঁদ' উপমান। এখন 'চাঁদের মতো সুন্দর, সে বস্তুটি কী' বললেই হয়ে গেল ধাঁধা। না বললেও চলে যে উপমেয়কে সম্পূর্ণ উহ্য রেখে এত 'সামান্য' সূত্রের ওপর নির্ভর করে ধাঁধার সমাধান সম্ভব নয়, তাই ধাঁধায় সূত্রের পরিমাণ আরও কিছু বাড়ানো হয় অর্থাৎ উপমানের সংখ্যা বাড়ে (যেমন, অলংকারশাস্ত্রে 'মালোপমা') বা কিঞ্চিৎ 'বিশেষ' করা হয়। অবশ্য মনে রাখা উচিত সকল ধাঁধা উপমামূলক নয়।

আপাত-ননসেন্স যে অর্থবাহী, লোকমানসে এই বিশ্বাস থাকার অপর কারণ ননসেন্সের সঙ্গে ধাঁধার চরিত্রগত মিল। অবাস্তব চরিত্র, অপ্রত্যাশিত ঘটনা, অর্থহীন শব্দ— ননসেন্সের সকল উপকরণই ধাঁধায় কিছু-না-কিছু থাকে। যেমন, বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার একটি ধাঁধা,' হঁহি হঁহি হঁহি/হঁহির মাঞ্জাখানটা মিহি /হঁহি যখন মনে করে/গোটা

গোটা মানুষকে টাইন্যা লিয়া যাইতে পারে'।[২৬]

অবাস্তব বা খণ্ড-বাস্তব উপমানের দৃষ্টান্ত মার্গীয় সাহিত্যের রূপক-অলংকারে প্রচুর। উপমার সৌন্দর্য কালিদাসকে অমরত্ব দান করেছে, হেঁয়ালির অনামা লৌকিক রচয়িতারা অনুরূপ খ্যাতির কিছু অংশ দাবি করতে পারেন, ফরিদপুরের ধাঁধা:'এক হাত গাছটা/ফল ধরে পাঁচটা/চাটে চুটে খায় না' [২৭] — উত্তর, হাত ও পাঁচ আঙুল। পুরুলিয়ার: 'গাছটি চলে গেল/পাতাটি পড়ে রইল'[২৮] — পদচিহ্ন; বা রাজশাহীর:'ওলি ওলি পৈখ্‌গালা [পাখিগুলো] / গলি গলি ব্যাড়ায়/কান্থরি কারুরব বাপের সাধ্যি নাই যে/ধৈর্‌র্যা ধৈর্‌র্যা খ্যালায়'[২৯] — রৌদ্র।

ধাঁধা বা হেঁয়ালির একটি ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় ধর্মীয়, বিশেষত মার্গীয় ধর্মের ঠিক পরের স্তর-গুলিতে। চর্যাপদ, মঙ্গলকাব্য, নাথ সাহিত্য, বাউল-দরবেশ-ফকিরি গান— সর্বত্র এর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। অনেক সময় প্রশ্নোত্তর ভঙ্গিমায় প্রহেলিকাগুলি বিবৃত, যেমন, নাথ সাহিত্যে 'গোপীচন্দ্রের গান'- এ গোপীচন্দ্র তাঁর জননী ময়নামতীকে প্রশ্ন করছেন, 'কে বা রান্ধি কে বা বারি, মা কে বা বসিয়া খাই/কারে লইয়া শুইয়া থাকি, মা কে বা নিদ্রা যাই। আকাশ নড়ে জমিন নড়ে নড়ে পবন পানি / সপ্ত হাজার আনল [?] নড়ে নিনড় [অনড়] কোন খানি। কোনঠে রইল গয়াগঙ্গা কোনঠে বারাণসী / কোনঠে রইল জপতপ আমার কোনখানে তুলসী'। ময়নামতীর উত্তর, 'মনের আনন্দ তনে [শরীরে] বাড়, আত্মমায় বসি খাও/ জীতা [?] লয়ে শুয়ে থাকি মহতী নিদ্রা যাও। আকাশ নড়ে জমিন নড়ে নড়ে পবন পানি / সপ্ত হাজার আনল নড়ে নিনড় কপালখানি। হিদ্দি [হৃদি] গয়া হিদ্দি গঙ্গা হিদ্দি বারাণসী/মুখে হলো তোর জপতপ মস্তকে তুলসী'।[৩০] উত্তরকে ভিত্তি করেই প্রশ্ন রচনা, ধাঁধায় যেমন হয়; পার্থক্যের মধ্যে ধাঁধার উত্তর সমস্যার সমাধান করে, এর উত্তরও উপমামূলক বলে হেঁয়ালি বিশেষ ঘোচে না।

ধর্মীয় সংস্কৃতিতে সব সময়েই উপমার বিশিষ্ট ভূমিকা এবং মূল সংস্থানের প্রতিসরণে তার চরিত্র বিবাদী কি না এমন ভাবনারও অবকাশ আছে, দ্র. Victor W. Turner, 'Metaphor or Anti-structure in Religious Culture', *Dramas, Fields and Metaphors : Symbolic Action in Human Society*, Cornell, 1974।

উপমা বিষয়ে একটি সংশয় কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলা যেতে পারে। উপমা নিঃসন্দেহে বক্তব্যকে বিস্তারিত করে, বোধগম্যতা বাড়ায়। কিন্তু সে কি বক্তব্যের বিশ্বস্ততাকে, যুক্তিগ্রাহ্যতাকেও বাড়ায়? অধিকতর গ্রহণযোগ্য করে তোলে? দু'ধরনের প্রয়োগ আমরা দেখি, উপমাটি যেখানে সুপরিচিত, সেখানে উপমার অনুরূপ এটুকু বলাই যথেষ্ট, বাড়তি কোনো যুক্তি বা বিস্তারের প্রয়োজন থাকে না। তার সাক্ষী অসংখ্য প্রবাদ-প্রবচনের প্রয়োগ, ন্যায়শাস্ত্রেও তার উদাহরণ ভূরি ভূরি, যেমন রজ্জুসর্পভ্রমবৎ, দণ্ডপূপিকান্যায় ইত্যাদি। দ্বিতীয় প্রয়োগ কিঞ্চিৎ কূট, ন্যায়শাস্ত্রের উপমা-তুলনা তর্ক বিদ্যাসম্মত, দ্বিতীয় প্রয়োগে একেবারেই নয়, তথাপি যুক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক, উড়িষ্যার পূর্বতন ডোমপাড়া করদ রাজ্যে ফকীরমোহন সেনাপতি দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। তার আগে রাজ্যে প্রজাবিদ্রোহ ঘটেছিল, 'পাঁচ বছর হোল রাজ্য থেকে খাজনা আদায় হয় নি। খাজনার জন্য তলব করলাম, মোড়লরা কেবল একবছরের খাজনা দিতে রাজি হল। আর আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করল, "আচ্ছা দেওয়ানবাবু তোমার একটি দুধেলা গাই আছে তাকে পাঁচদিন দোয়ানো হয় নি তারপর একদিন দুইতে যাবেন একদিনে পাঁচদিনের দুধ পাবেন কি?" বিভিন্ন সময় যখন যে মোড়লকে যে কোনো কথা জিজ্ঞেস করি সকলের সেই একই উত্তর।'[৩১] উত্তরদানের ধরন থেকে বোঝা যায় বকেয়া খাজনা না দেওয়ার যুক্তি হিসেবে তারা উপমাটি আবিষ্কার করেছে এবং সকল মোড়লের মনে হয়েছে তা প্রয়োগযোগ্য ও অকাট্য। গোরুর দুগ্ধদানপ্রক্রিয়া আর চাষীর খাজনাদানপ্রক্রিয়া যে এক নয়, তা শিশুতেও বোঝে, তর্কশাস্ত্রমতে এটি অসম তুলনা (ব্যাড অ্যানালজি)। অথচ উপমাটি গৃহীত ও ব্যবহৃত হচ্ছে একাধারে যুক্তি (বকেয়া খাজনা কেন দেবে না) ও হেতু (দেওয়া কেন অসম্ভব) রূপে। অযুক্তির এহেন উত্তরণ ঘটিয়েছে নিশ্চিতভাবে উপমা। কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব হল? লোকমানসে কি উপমার কোনো বিশেষ স্থান আছে, যেখানে যৌক্তিকতাকে উপমার অঙ্গাঙ্গি ভাবা হয়? উপমামাত্রেই কি পবিত্র বাতাবরণে মণ্ডিত, যেথা প্রবেশ করলে অযুক্তি যুক্তির শুচিতা লাভ করে? তা ব্যতীত এই 'উত্তরণ-প্রক্রিয়া' ব্যাখ্যা করা যায় না।

অর্থবাহী ননসেন্সের এক বড়ো অংশ হল আমলের রচনা। আরও আধুনিক হচ্ছে পুরোনো প্রচলিত ননসেন্সের গূঢ়ার্থ খুঁজে বার করার ঝোঁক। প্রচলিত ছড়া 'There was an Old Woman who lived in a shoe/She had so many children she didn't know what to do' ইত্যাদি সম্পর্কে ডেসমণ্ড মরিস

-এর বক্তব্য, 'The, shoe has frequently been employed as a symbol of the female genitals, and this is why the "Old Woman who lived in a shoe" (in other words, whose life was centred on her genitals) "had so many children she didn't know what to do."'[৩২] তার দুটি ধরণ, যেখানে উদ্ভট অবাস্তবকে বাস্তবের বিকৃত (ডিসটর্টেড) রূপ, উপমা, প্রতীক মনে করা হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, যাকে অবাস্তব, অযৌক্তিক মনে হয় আপাতদৃষ্টিতে, তার অন্তর্নিহিত যুক্তি (লজিক) বোঝা। প্রথমটি প্রায়শ ব্যঙ্গাত্মক রূপে দেখা দেয়, উত্তম দৃষ্টান্ত : 'দ্য শিপ অব ফুল্‌স' (বিশেষত অ্যালেকজান্ডার বার্কলে-কৃত ইংরেজি রূপারোপ (১৫০৯), আরও সাম্প্রতিক রূপারোপের জন্য দ্র. ক্যাথারিন অ্যান পোর্টার -কৃত সংস্করণ (১৯৬২)। দ্বিতীয়টির উদাহরণ : লুইস ক্যারল, 'দি অ্যানোটেটেড অ্যালিস', মার্টিন গার্ডনার- সম্পাদিত, ১৯৬৫।

ননসেন্সের প্রাসঙ্গিক আরও কিছু কথা আছে। তার আগে ননসেন্স বলতে আমরা কী বুঝি আর এক বার বলে নেওয়া দরকার। কারণ ইংরেজি সাহিত্যে একই গোষ্ঠীর বিভিন্ন ধারাগুলি (জঁর genre) চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে, যেমন, ফলি লিটারেচর, মক-এপিক, মক-হিরোইক, টল স্টোরি ইত্যাদি, যার জন্য তাদের গণ্ডি অনেক সংহত, অপর দিকে বর্তমান আলোচনায় ননসেন্সের চৌহদ্দি অনেক বেশি ব্যাপক বিস্তৃত, যাতে ভুল বোঝার অবকাশ আছে । অবাস্তবের আলোচনাসূত্রে এসেছে ননসেন্স, অসম্ভাব্যতা, অবাস্তবতাই কি তা হলে ননসেন্সের একমাত্র শনাক্তকারী শর্ত? বলা বাহুল্য যে তা নয়। অন্য 'অবাস্তব'দের থেকে ননসেন্সকে আলাদা করেছে একটি বৈশিষ্ট্য — অসম্ভাব্যতাকে, অবাস্তবতাকে ননসেন্স কখনোই বিশ্বাসযোগ্য করতে চায় না, উপরন্তু প্রতি পদে, গোপন না করে রীতিমতো জাহির করে উৎসাদন করে তার যৌক্তিকতাকে, বিশ্বাসযোগ্যতাকে। যেন যা- কিছু বাঁধাধরা, নিয়মানুসারী প্রোথিত, তাকে আমল না দিয়ে তুচ্ছ, নগণ্য, একটি বৃহৎ অশ্বডিম্ব প্রমাণ করাতেই তার বাঁচন। এই নঞর্থক চরিত্রের জন্য তাকে বার বার নাকচ, বাতিল করে দেওয়ার প্রবল অস্ত্র হিসেবে মনে হয় এবং একই কারণে ননসেন্সকে আক্রমণাত্মক, প্রতিবাদী বলে ভুল করা খুব সহজ। কিন্তু ভোলা উচিত হবে না, নঞর্থকতা বিদ্রোহের আংশিক চরিত্রমাত্র, তার মুখপাত, অপর দিকে ননসেন্সের সম্বল, কেন্দ্রই তা-ই।

নঞর্থকতাকে যেমন ননসেন্সের আবশ্যিক চরিত্র ধরা হয় সদর্থক ও নঞর্থক, পারস্পরিক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে বাঁধা, সেহেতু ননসেন্স সত্যেরই বিপরীতার্থক বা নঞর্থকভাবে 'সত্য'— এই সিদ্ধান্ত থেকে আর একটু এগিয়েছেন জি. কে. চেস্টরটন, 'Nonsense and faith (strange as the conjunction may seem) are the two supreme symbolic assertions of the truth'[৩৩]. তেমনি কৌতুককে (ফান) ননসেন্সের আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য ভাবা হয়ে থাকে।কৌতুক ননসেন্সের একটা বড়ো অংশ, সন্দেহ নেই, কিন্তু ষোলআনা নয়। এবং তাতেও, ইংরেজিতে যাকে বলে 'ডার্ক হিউমর', তা প্রচুর। বাকি অংশের চরিত্র মিশ্রিত, এমনকি বিতৃষ্ণাকর বা ভয়প্রদ হতে পারে। ননসেন্স ও কৌতুক, উভয় ক্ষেত্রেই অস্বাভাবিকতার ভূমিকা বিরাট এবং বলা বাহুল্য, অস্বাভাবিকতা সব সময় নির্দোষ, পরিচ্ছন্ন আনন্দের জন্মদাতা নয়। বোদলেয়র আরও গোঁড়া, তাঁর মতে 'essence of laughter' আদপেই স্বর্গীয়, পবিত্র, দিব্য কিছু নয় বরং শয়তানসুলভ। কৌতুককে দুভাগে ভাগ করেছেন, 'significative comic' ও 'absolute comic' এবং তাদের 'সংজ্ঞা' যথাক্রমে, 'an infinite grandeur and an infinite misery— the latter in relation to the absolute Being of whom man has an inkling, the former in relation to the beasts. It is from the perpetual collision of these two infinites that laughter is struck', এবং দ্বিতীয়টি 'has about it something profound,

primitive and axiomatic, which is much closer to the innocent life and to absolute joy than is the laughter caused by the comic in men's behavior'[৩৪] — যার উদাহরণ তাঁর মতে গ্রটেস্ক। শিল্পজগতে তাঁর পছন্দসই দৃষ্টান্ত হচ্ছেন : হগার্থ, ক্রুক-শ্যাঙ্ক (Cruik-shank), গোইয়া, ব্রুগেল প্রভৃতি। বোদলেয়র- এর সঙ্গে আমাদের মতের ঐক্য নেই, তবু তাঁর দেওয়া উদ্ভটের (গ্রটেস্ক) বিশেষণগুলি মনে রাখার মতো। উদ্ভট আর ননসেন্স খুব ঘনিষ্ঠ, ননসেন্সকে পৃথক করব উপাদান-বিচারে, যাতে পরে আসব। বোদলেয়র-কে আসরে আনার দ্বিতীয় কারণ সাহিত্য থেকে শিল্পজগতে প্রবেশের ছাড়পত্র পাওয়া। ননসেন্স যে কৌতুকসর্বস্ব নয়, ভয়-জুগুপ্সার উপাদান তাতে থাকে, সম্ভাব্য উৎসের বিচার করলে হয়তো তা আরও পরিষ্কার হবে। হিএরোনিমাস বশ্ (Hieronymus Bosch)-এর ছবির উদাহরণ দিতে পারি, বশ্ কোথা থেকে পেয়েছিলেন তাঁর পশু-পক্ষী-মৎস্য- পতঙ্গ-সরীসৃপ-মানুষের অনন্য যুগ্মরূপসমূহ? তাদের উদ্ভটতম ক্রিয়াকলাপ, বিচিত্র পটভূমি নিঃসন্দেহে অসম্ভব কল্পনাশক্তিশালী এক মনের পরিচয় দেয়। সৃজনচিন্তার প্রাথমিক সূত্র মুষ্টিমেয় উপাদান থেকে খুঁজে পাওয়া অসাধ্য, তবু দু-একটা অনুমান করা চলে। তাঁর দুটি স্কেচ-পৃষ্ঠার বিষয় 'বিকলাঙ্গ ও ভিক্ষুকরা' (pen and bister drawing, Print Room, Bibliotheque Royale, Brussels) এবং 'উন্মাদ মহিলারা' (মাধ্যম ঐ, The Louvre, Paris)। যে বিষয়বস্তু নিয়ে বশ্-এর কোনো জানিত ছবি নেই এই কারণে এবং তৎকালে জনপ্রিয় (জঁর/genre) চিত্রাবলীর সঙ্গে সাদৃশ্যে এমন ভুল করা সহজ যে এদের স্রষ্টা বশ্ নন। তেমন ভুল যে করা হয়েছিল তার প্রমাণ 'উন্মাদ মহিলারা' রেখাচিত্রটিতে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে ব্রুগেল(Brueghel) কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালের জঁর চিত্রাবলীর সবচেয়ে নামজাদা শিল্পী, অথচ তিনি এতগুলি স্টাডি করলেন কেন? বশ্-এর সবথেকে বেশি ড্রয়িং অবশ্য কল্পিত অদ্ভুত জীবগুলির, তাদের রূপ নিয়ে অজস্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তার মধ্যেই স্থান পেয়েছে 'বিকলাঙ্গ ভিক্ষুক বগলে ক্রাচ' ('Studies for Monsters', obverse of a bister and pen drawing, Ashmolean Museum, Oxford), উন্মাদিনীদের সরাসরি ছায়া আছে 'মৌচাক আর ডাইনিরা' (bister and pen drawing, Albertina, Vienna) বা ভিক্ষুকদের 'নরকে দৃশ্যাবলী'- তে (মাধ্যম ঐ, Kupferstichkabinett, Berlin)। শিল্পকলাবেত্তাদের কাছে বশ্-এর অধিকাংশ ছবি এক ধরণের ধাঁধা, যার সম্যক তাৎপর্য বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছনো যায় নি। ভিন্নমুখী ব্যাখ্যার জন্য দ্র. Carl Linfert, *Bosch*, London, 1972 ও Lotte Brand Philip, *Hieronymus Bosch*, New York । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, উৎস নিয়ে অনেক গবেষণা হলেও কেউই এই দৈহিক-মানসিক পঙ্গুদের স্টাডিগুলির কথা উল্লেখ করেন নি।

ননসেন্সের একটি প্রিয় মোটিফ বৈপরীত্য। আচরণের বৈপরীত্য, সম্বন্ধের বৈপরীত্য, ভাবার্থের বৈপরীত্য— বৈপরীত্যের এ হেন অজস্রতার কারণ বোধহয় ন্যূনতম সৃজনপ্রতিভা। কোনো চরিত্র, বস্তু সম্পর্কে অবাস্তব, দুনিয়াতে অমিল কিছু ভাবতে গেলে সহজেই মনে আসে ঠিক বিপরীত ব্যবহার, মানুষ পায়ে হাঁটে সুতরাং হাতে হাঁটলেই উদ্ভট। স্থলচর জীব, জলচর জীবের মতো আচরণ করলেও তাই। সম্বন্ধগুলি উলটোলেও তাই, খাদ্য-খাদক, বাহন-বাহিত ইত্যাদি। একবার প্যাটার্নটা স্থির হয়ে গেলে অনায়াসে বুনে যাওয়া চলে উলটো জগতের শেষহীন নকশা। লৌকিক ধর্মীয় সাহিত্যের পূর্বোক্ত প্রহেলিকায় এর ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষ করা যায় পঞ্চদশ শতকে সহদেব চক্রবর্তী-রচিত 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে, 'গুরুদেব নিবেদি তোমার রাঙা পায়/পুতকীর দুগ্ধে সিন্ধু উথলিল, পর্বত ভাসিয়া যায়। গুরু হে বুঝহে আপন মনে/শুষ্ক কাঠ ছিল, পল্লব মুঞ্জরিল, পাষাণ বিঁধিল ঘুণে। শিলা নোড়াতে কোন্দল বাঁধিল, সরিষা ধরাধরি

করে/চালের কুমড়া গড়ালে পড়িল, পুঁইশাক হাসিয়া মরে। এ বড় বচন অদ্ভুত। অকাট বুঝিয়া প্রসব করিল, ছেলে চায় পায়রার দুধ। অনেক যতনে নৌকা বাঁধিনু, কাঁকড়া ধরিল কাচি/ মশার লাথিতে পর্বত ভাঙ্গিল, ক্ষুদ্র পিপীলিকা হাঁচি।'[৩৫] সপ্তদশ শতকের 'অভয়ামঙ্গল' -এ, 'সখি হে একি মোর হইল জঞ্জাল/ময়ূরে অজগরে বঞ্চে দোঁহে এক ঘরে/কি রূপে বঞ্চিমু চিরকাল। গজে সিংহে করে খেলা মূষিকে মার্জারে মেলা/ছাগে বাঘ দে খেদাইয়া/দেখিয়া ছাগার কোপ ভগ্ন হইল তিন লোক/ভেকে সর্প গিলে পচ্ছে রইয়া। বসিয়া কূপের পারে অন্ধে আসি দীপ জ্বালে/আতুরে সর্বস্ব লই যায়/দ্বিজ রামদেবে ভণে হরি না ভজিলে কেনে/চৌর আসি সাধুরে জাগাএ'।[৩৬] নির্ভেজাল কৌতুকের দৃষ্টান্ত চট্টগ্রাম ও সন্নিহিত অঞ্চলে প্রচলিত এক প্রকার লোকসংগীত, যার নাম 'উল্টা বাবুলের [বাউলের] গীত'। গানগুলি গাওয়া হয় সম্মিলিত শ্রমের বা বেগার দানের কষ্ট লাঘব করতে, যেমন কুমিল্লা জেলার গান, ' হাইট্ [যাট] হাত পানির তলে/আমন ধানের নাড়া জ্বলে/ফেউচ্চুয়ায় [ফিঙে পাখিতে] ঠোক্‌রাইয়া খায় খই/বাঘে আর জঙ্গলা ভৈষে/আল্‌খানি জুড়িয়াছে/টৌলা পিঁপড়ায় [লাল পিঁপড়ে] টিপা ধরছে মই। একদিন যে গেছ্‌লামরে ভাই/মেঘনা গাঙের কূল। বিলাইয়ে আচ্‌লাইয়া [বিড়ালে আছড়াইয়া] ভাঙ্গে/ জাহাজের মাস্তুল।'[৩৭] বা চট্টগ্রামের 'মাইন্‌সর কাঁধৎ ঘোড়া চড়ি/ভরমে নানান্ দেশ। বদ্‌নার নালে হাতী ধাইতে/বাজী [আটকে] রৈল লেজরে ... ছাগল যাইয়া বাঘ ধরিয়া/গাছে টানি তোলে। দুধের পোলা ডরে ধাইছে/মারে লৈয়া কোলে'।[৩৮] আধুনিক শিশুপাঠ্য ছড়া, 'জিলিপি সে তেড়ে এসে কামড় দিতে চায় / কচুরি আর রসগোল্লা ছেলে ধরে খায়। পায়ে ছাতি দিয়ে লোকে হাতে হেঁটে চলে/ডাঙ্গায় ভাসে নৌকা-জাহাজ, গাড়ি ছোটে জলে।'[৩৯] মার্গীয় সাহিত্যে বিপরীত ভাবার্থের ব্যাপক আলংকারিক প্রয়োগ দেখা যায়, উদাহরণ, ব্যাজস্তুতি। কিন্তু লৌকিক উদাহরণও আছে, যেমন বাংলা আপাত-অশ্লীল ধাঁধা। সাধারণত বিবাহ-বাসরে এইগুলি বলা হয়, প্রত্যেকটি ধাঁধা আপাতদৃষ্টিতে যৌনসংগমের বর্ণনা, কিন্তু তাদের প্রকৃত অর্থ (উত্তর) অতিশয় নির্দোষ।[৪০] অবিকল আয়না-প্রতিচ্ছবিও দেখা যায়, যেখানে আপাত অর্থ শ্লীল ও প্রকৃতার্থ বিপরীত।[৪১] গোটা ব্যাপারটা যে বৈপরীত্য কেন্দ্রিক, সে কথা ধাঁধার লৌকিক রচয়িতা যে শুধু জানেন তা-ই নয়, অনেক সময় বলেও দেন[৪২]।

আধুনিক ননসেন্স কাহিনীর একটি বহুল প্রচলিত আঙ্গিক ঘুমিয়ে পড়া— ননসেন্স স্বপ্ন— জেগে বাস্তবে ফিরে আসা। যেমন, ক্যারলের অ্যালিস, 'হ-য-ব-র-ল' -র আমি বা ত্রৈলোক্যনাথের কঙ্কাবতী যে জ্বরবিকারে স্বপ্ন দেখে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লেখকরা শুরুর 'ঘুমিয়ে পড়া' অংশটি বিবরণে অস্পষ্ট রেখেছেন, স্বপ্নদৃষ্ট অলীক ঘটনাবলী যেন সত্য, এই বিভ্রম তৈরি করতে। 'জেগে ওঠা' সর্বত্র কিন্তু খুব স্পষ্ট, লেখক কোনো রকম সংশয় রাখতে চান না। ননসেন্স গল্প বানানোর জন্য কুণ্ঠিত লেখক যেন তার কার্যকারণ সম্বন্ধ, অজুহাত পাঠককে জানাতে চান। দ্বিতীয়ত, শুরুর যে বিভ্রম, ননসেন্স গল্পের যে অবাস্তব, তা যে সত্য নয়, বাস্তবই সত্য— 'বিভ্রান্ত' পাঠকের হাত ধরে সেখানে পৌঁছে না দেওয়া পর্যন্ত তাঁর স্বস্তি নেই, তিনি কাহিনী শেষ করতে পারেন না। সংকোচটি আধুনিক, মৌখিক পরম্পরায় এর সাক্ষাৎ মেলে না বরং উলটো দৃষ্টান্ত আছে। মৌখিক গল্পের একটি স্থায়ী অন্তিম অংশ বা ছড়া (টেলপিস)-র দেখা অনেক ভাষাতেই পাওয়া যায়, যা গল্প বা গল্পের আসরের শেষে বলা হয়, যেমন বাংলায়, 'আমার কথাটি ফুরোলো / নটে গাছটি মুড়োলো' ইত্যাদি। উড়িষ্যায় রূপকথা বলার শেষে কথক একটানে গল্পের চরিত্রদের ঘটমান বাস্তবে নিয়ে আসে, 'ফেরিআসি রজাঝিঅকু বিভা হেলা। দিঁহে যাক আনন্দরে ঘর দুয়ার কলে/মুঁ গলারু কথা কহিলে নাহিঁ।'[৪৩] আমি (কথক) গেলাম, তারা আমার সঙ্গে কথা বলল না-র বিস্তারিত সংস্করণও আছে, 'পুঅ বোহু নেই সহস্র বরষ রাইজ কলে। রাইজ লোককু খিরি, পিঠা, পাট, পীতাম্বরি শাঢ়ী বান্টিলে। মুঁ গলি যে মতে কটকঠউঁ পুরস্তম পর্যান্ত খণ্ডে লুগা দেইথিলে। মুঁ পিন্ধিনাযেলকু কান্ধকু পাইলা নাহিঁ।[৪৪] লক্ষণীয়, এই বাচনের মাধ্যমে কথক গল্পের চরিত্ররা যে বাস্তব এই কথা প্রতিষ্ঠা করেই তার (কথকের) সঙ্গে চরিত্রদের যে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল, সে কথা জানিয়ে দেয়, 'বিজ্ঞান' শিক্ষার প্রভাবে লেখক তখনও কেবলমাত্র বাস্তব কাহিনীই বলতে

পারবেন— এমন ধারণার জন্ম হয় নি, উদাসী স্বৈরকল্পনা বাস্তব-অবাস্তবকে টাকা-মাটি মাটি-টাকা করে খেলায়।

রূপকথা আর নীতিগল্পের প্রসঙ্গে আমরা বলেছিলাম তাদের 'শিক্ষা'র কথা। তার জের টানতেই কি বলতে হবে ননসেন্সের শিক্ষার কথা? অথচ 'শিক্ষা' যে আছে তার প্রমাণ ননসেন্সের প্রায়োগিক ব্যবহার আছে, মানুষ সজ্ঞানে বাস্তব নিয়মকানুনযুক্তি বিরোধী আচরণ করে, এককভাবে, যৌথভাবে। প্রথাসিদ্ধের পক্ষে, নিয়ম-ভাঙার বিপক্ষে মানুষের প্রতিবাদের কথা আমরা জানি; তেমন জানি প্রথাভঙ্গকে প্রতিবাদের হাতিয়ার করতে, পার্থিব সুখানুসন্ধানের দুনিয়ায় সে পথ ত্যাগ করে, গৃহস্থের জগতে গৃহহীন হয়ে, সবস্ত্রের দেশে বিবস্ত্র হয়ে বার বার প্রান্তিক গণ্ডি-ভাঙিয়েরা (লিমিনাল) একক দ্রোহিতার স্বাক্ষর রেখে যায়। যৌথ আচরণের পিছনে জাদু-বিশ্বাস থাকে, থাকে সামাজিক স্থিতি নড়ে যাওয়ার সংশয়াকুল অনিশ্চিতি, আবার ঐতিহ্য মেনে চলার মামুলিপনাও থাকে। প্রকাশ হাজার হলেও চৈতন্যের গভীরে বিশ্বাস একটাই, ননসেন্স অর্থ নৈরাজ্য, এতাবৎ মান্য স্বীকৃত সকল নিরিখের অবলুপ্তি, স্থিতির বিপরীত মেরু। ননসেন্স গল্প সেটাকেই ধরা-ছোঁয়া, মনে-রাখা যায় এমন এক রূপে এনে দেয়। পরিস্থিতি অনুযায়ী কেমনভাবে সেই 'শিক্ষা'কে মানুষ অনুবাদ করে নেয়, দেখিয়েছেন ঐতিহাসিক গৌতম ভদ্র, বিদ্রোহীদের তরফ থেকে '১৮৫৭ সনের অভ্যুত্থানের অগ্নি-মুহূর্তে জারি করা হয় নানা ফরমান ... বিদ্রোহীদের চোখে "কোম্পানী বাহাদুর" সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে না, থাকবন্দের স্বীকৃতি দেয় না, মানীর মান রাখে না, সব বরাবর করে দেয়। ... বিচারের এহেন মাপকাঠি আকাশ থেকে পড়েনি, লোক কাহিনীতে তার উৎস আছে। ১৮৫৭ সনের একদশক আগে ইলিয়ট সাহেব তাঁর প্রতিবেদনে হরবোংক নগরীর কথা বলেছেন, লক্ষ করেছেন উত্তরপ্রদেশে জনসাধারণের মধ্যে সেই নগর সম্পর্কিত গল্পের জনপ্রিয়তা। হরবোংক নগরীর রাজা বেআদিল কারণ তাঁর রাজত্বে গুণের কদর হয় না, মানীর মান থাকে না। "অনধেরা নগরী বেবুঝ রাজা/টকা সের ভাজী টকা সের খাজা"। ঠিক আমাদের শোনা রূপকথার রাজা যেখানে হবুচন্দ্র রাজা আর গবুচন্দ্র মন্ত্রী, যেখানে মুড়ি ও মিছরির একই দর। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৭ সনে যখন নবাব বিরজিস কাদের তাঁর ঘোষণাপত্রে বলেন যে ইংরাজ রাজত্বে ইমান নেই, কারণ সবাই বরাবর, বরং নীচু চামারদের আদেশে রইসরা লাঞ্ছিত হয়, তখন উচ্চকোটির ভাষা নিম্নকোটির কাছে আদৌ অপরিচিত লাগে না, তারা তাদের পুরানো ক্ষমতা বিন্যাসের ধারণায় বুঝতে পারে ফিরিঙ্গি রাজ্যপাট কেন বেহুদা।'[৮৫] প্রকাশের অনেক রূপ, নৃ-সমাজতাত্ত্বিক কলিন টার্নবুল তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন 'মাউন্টেন পীপল' (*Mountain People*) গ্রন্থে, আফ্রিকার এক পার্বত্য উপজাতি তাদের উদ্বাস্তু-স্থিতিতে কেবলমাত্র অসত্যই বলেছে। কব্‌ডেন-র‍্যামসে জানিয়েছেন, উড়িষ্যার পূর্বতন বামরা করদ রাজ্যে তসরগুটির চাষীরা চাষের সময় সকলে যৌথভাবে একটি আচার পালন করত, 'they are on no account permitted to tell the truth : they may not eat during daylight nor may they set their eyes upon their wives'।[৮৬] আর একটি প্রথার কথা জানিয়েছেন শ্রীঅনিরুদ্ধ লাহিড়ী। বর্তমান বাংলাদেশের রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার অন্তর্গত উদয়পুর-বাগদুয়ার নামে একটি গ্রাম আছে, যার বিশাল অঞ্চল জুড়ে রয়েছে প্রাচীন এক শহরের ধ্বংসাবশেষ।[৮৭] এর অপর নাম 'রাজা ভবচন্দ্রের পাট', কারণ 'উদয়পুর-বাগদুয়ারকে জনপ্রবাদ মতে রাজা ভবচন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। তাঁর আর এক নাম নাকি ছিল উদয়চন্দ্র। নাথ সাহিত্যের সুবিখ্যাত গাথা 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' কাহিনীর নায়ক রাজা গোপীচন্দ্রের পুত্র নাকি ছিলেন এই ভবচন্দ্র এবং তাঁর পুত্র নাকি ছিলেন হবচন্দ্র।'[৮৮] হবচন্দ্র পরে রাজা হন, তিনি নাকি ছিলেন অতি নির্বোধ এবং তাঁর মন্ত্রী ছিলেন গবচন্দ্র, ততোধিক বুদ্ধিহীন। রাজা-মন্ত্রীর অসংখ্য নির্বুদ্ধিতার কাহিনী দীর্ঘকাল ধরে

বাংলায় প্রচলিত। লাহিড়ী মহাশয় এই অঞ্চলের জমিদার বংশের সন্তান, তিনি জানিয়েছেন, হবচন্দ্র-গবচন্দ্রের দেশ, তাই তাঁদের জমিদারিতে কতকগুলি অদ্ভুত নিয়ম প্রচলিত ছিল, সব কয়টিই স্বাভাবিকের- ঠিক-বিপরীত। যেমন, জমিদারি কাছারি দিনের বেলা বন্ধ থাকত, কাজকর্ম শুরু হত রাত্রে, চাষীপ্রজারাও সেই সময়ে খাজনা দিতে আসত ইত্যাদি।

অবাস্তব গল্পের আর-এক প্রকার, অতিশয়োক্তিমূলক গল্প, উত্তরাপথে প্রচলিত লৌকিক নামটি আমরা নিতে পারি, 'বাত্তেল্লা'[৪৯] শব্দটির মূল সংস্কৃত 'বার্তালু' যার হিন্দী রূপান্তর 'বতোলা', বলিয়েকে বলা হয় 'বতোলিয়া'[৫০] ইংরেজিতে 'টল স্টোরি'। বাংলায় 'চালবাজি', 'বড়াই করা' কাছাকাছি শব্দ, একেবারে সমার্থক নয়। বাত্তেল্লার ধরাবাঁধা সংজ্ঞা নির্ধারণ কঠিন, সামগ্রিকভাবে নিশ্চয় অবাস্তব কিন্তু চরিত্রেরা সব সময় বাস্তব, এমন-কি অনেক ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক। বর্ণিত ঘটনাগুলিতে যথেষ্ট রঙ চড়ানো কিন্তু তাদের ক্রম বা সাজানোর ছক পুরোপুরি যৌক্তিক। বাত্তেল্লার বক্তব্য আছে, রীতিমতো মোটা দাগে দাগানো, কিন্তু তা কোনো নীতিকথা নয়। বাত্তেল্লা কল্পনারসেরই সৃষ্টি তবু নিতান্ত ছেলে-ভুলোনো নয় বরং তার উপভোক্তারা প্রাপ্তবয়স্ক বলেই চরিত্র আর ঘটনাক্রম আপাত-যৌক্তিকতার সীমা অতিক্রম করে না। যতই পুষ্পে-পল্লবে ভূষিত হোক, শাখা-প্রশাখায় বৃদ্ধি পাক, অধিকাংশ বাত্তেল্লার বীজটি বাস্তব। যে বৈশিষ্ট্য এ যাবৎ আলোচিত সকল অবাস্তব গল্প থেকে তাকে পৃথক করেছে।

অতিশয়োক্তি, তার রূপ সংক্ষিপ্ত (যেমন, একটিমাত্র শব্দ বা বাক্য) বা দীর্ঘ (যেমন, একটি গল্প বা গাথা) যাই হোক, প্রচলনের দিক থেকে যথেষ্ট প্রাচীন। প্রায় সকল মহাকাব্যেই, লিখিতরূপ পাওয়ার বহু পূর্বে যাদের সৃষ্টি, একাধিক অতিশয়োক্তিমূলক কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায় কাডন বলেছেন, 'The epic tradition, and especially the primary epic, contains a good many episodes which are classifiable as tall stories : e.g. the deeds of Odysseus, Beowulf 's swimming match with Breca, the feats of Marko Kraljevic' in the South Slav *nardone pesme* and the exploits of Skandarbeg in the Albanian epic cycles'.[৫১] নির্মাণ প্রক্রিয়া কিঞ্চিৎ বিস্তারিত করেছেন ডর্সন, 'all folk epics spring from the fluid state of society which Hector and Nora Chadwick call the Heroic Age ... Always some outstanding champion rockets to legendary fame ; to him alone are attributed the marvelous feats attached to lesser heroes, and in the course of centuries the bards and tale-tellers weave a mighty saga about the conqueror. Eventually a chronicler or poet sets down the cycle in writing, adds continuity and polish, and bequeaths to the world an *Iliad, an Odyssey, a Beowulf, a Mahabharata.* Sometimes the legends fail to reach epic perfection and remain in arrested literary forms ...' সকল কাহিনী যে বর্গে এক, তার অন্যতম প্রমাণ কতকগুলি প্রাথমিক 'সাধারণ' বৈশিষ্ট্য, "All these heroes exhibit strikingly similar developments. They grow from a basis of fact but assume extraordinary proportions. Each begins his career with precocious deeds of strength and in manhood slays dreaded warriors and monsters in gruesome single combats ... As befits their age, the heroes hunt, drink, play at rough sports, and make love with enormous gusto. Especially are they proud of possessing the fleetest steed, the surest weapon ... all of whom bear pet names and share in the hero's adventures. At some point the invincible champion wanders off to remote and exotic countries, to engage in new exploits and best more adversaries. The day comes when the hero, for he is mortal, must die, and since no single man or beast can kill him, he succumbs to overwhelming odds, or treachery, or witchcraft, sometimes in combination. Achilles and Siegfried[German], Beowulf and Cu Chulainn [Celtic],Grettir and Marko [Icelandic and Serbian], all follow this pattern.'[৫২] প্রাচীনত্বের দিক থেকে তো বটেই, সৃজনপ্রক্রিয়ার দিক

থেকেও যে তার লোক-ইতিহাসের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে, এটি তারই পরোক্ষ প্রমাণ।

ভারতীয় অতিশয়োক্তি, তৎমূলক কাহিনী বা গাথার স্পষ্ট দুটি ভাগ আছে : মার্গীয় ও সাধারণী, খুব সম্ভব অন্য সকল ভাষাতেও তাই। ভারতে বিষয়বস্তু হিসেবে না ধরলেও মার্গীয় অতিশয়োক্তি একক সংক্ষিপ্ত রূপেই শাস্ত্রীয় মহিমা লাভ করেছে (ক্যাননাইজড), সংস্কৃতে অলংকারশাস্ত্রের আবশ্যিক অঙ্গ রূপে পরিগণিত। রাজাদের প্রশস্তিবাচনে বীরত্ব, গুণ, রূপের বর্ণনায়, কাব্য-নাটকে নায়ক-নায়িকার রূপগুণ বর্ণনা থেকে বিবিধ ঘটনার রস কথনে অত্যুক্তির ছড়াছড়ি প্রাচীন লেখে অসংখ্য নমুনা, রাজারা কেউ 'পৃথিবী-বল্লভ', কেউ 'পৃথ্বী-পতি' কেউ 'সসাগরা-ত্রিভুবনাধিপতি', কারো 'কান্ত-মূর্তি' পরম লক্ষণাদিতে ভূষিত, কেউ সংগীতবিদ্যায় দেবগায়ক তুম্বুরু ও নারদকেও হার মানিয়েছিলেন। সাহিত্যের একটি উদাহরণ বোধ করি চূড়ান্ত ও সিদ্ধিদ, বাণভট্ট বর্ণনা করছেন তাঁর পোষ্টা হর্ষবর্ধনের চরণদ্বয়, 'অতি লোহিত চরণ। অপ্রণত লোকপালদের কোপরস দিয়ে যেন রাঙানো; সংবাহনতৎপরা লক্ষ্মীর যেন ফুল্লতামরসে- গড়া বাসভবনের কল্পনা;.... আহা, দুটি পদ্মের মতো দুখানি চরণ। সেই চরণ দুটিকে ঘিরে অবিরাম গুঞ্জন করছিল ভ্রমরের মণ্ডল, — সামন্তদের মুকুটে যে মালা ছিল তারই সৌরভভ্রান্ত ভ্রমরের মণ্ডল— ভ্রান্তি জাগিয়ে শত্রুর উত্তমাঙ্গের; এবং চরণতলের পদ্ম, শঙ্খ, মীন ও মকর-আঁকা চতুঃরেখা দিগ্‌বিদিকে বিঘোষিত করছিল মহারাজের চতুঃসমুদ্রের একাধিপত্য'[৫৩]।

মার্গীয় জগতে অলিখিত রূপে, অর্থাৎ মৌখিক যোগাযোগে অতিশয়োক্তির ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় বিনয়-বাচনে। প্রকৃতপক্ষে এটি সামগ্রিক আচরণ-বিধির একটি অঙ্গ, মূলের দুটি ভাগ, শারীরিক ও বাচনিক ভঙ্গিমা। দীর্ঘকালের চর্চায় পুষ্ট ও বিধিবদ্ধ (কোডিফায়েড) ধারা ভিন্ন সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে কিছুটা পালটায়, তবে তা প্রকাশভঙ্গিতে, মূল দর্শন অপরিবর্তিতই থাকে। গৃহীত আচরণ-বিধির ব্যতিক্রম অশিষ্টতা, অবাধ্যতা, সামাজিক থাকবন্দীর অমান্যতা অর্থে ধরা হয়। অবশ্য দীর্ঘ ব্যবহারের ফলে বিবর্ণ বাণীগুলি প্রায়ই তাদের বাচ্যার্থ হারিয়ে ফেলে, তখন সুরই ঠিক করে দেয় তারা কী বলছে। জোতদার বাবুসাহেবের কাছে বীজধান ঋণ দাবি করে দরিদ্র চাষী, 'হুজুরই মা-বাপ। হুজুরের জুতোর বোঝা মাথায় করে আমাদের দিন চলে। ধান আমাদের আজ চাই-ই ক্ষেতের জন্য। বাবুসাহেবের মতো লোকও হকচকিয়ে যান, বিল্টার গলার স্বরের দৃঢ়তা দেখে। তাতে প্রার্থনার লেশমাত্র নেই।'[৫৪] বিনয়-বাচন যে শিষ্টাচার-বিধির অন্তর্গত তা ব্যঞ্জনা দেয় সামন্ততন্ত্রের আর ঐতিহ্যের প্রাচীনত্বের। সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় আবদুল হলীম 'শরর্', এর 'গুযিশ্‌তা লখনউ'-এ, লেখকের ধারণা যেসব শহরে রাজ-অভিজাততন্ত্রের কেন্দ্র ছিল সেখানে শিষ্টাচার, বিনয়-বাচন ও সৌজন্যের একটা ঐতিহ্যও ছিল, যার নামগন্ধ বাণিজ্য-নগরীগুলিতে পাওয়া যায় না। লখনউ যে শিষ্টাচার শালীনতার আদর্শ কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল তার কারণ 'পুঁজিপতির দল যখন দিল্লীর সংস্কৃতিকে হত্যা করল, তখন সেই সংস্কৃতি আপন প্রাচীন জন্মভূমি থেকে পালিয়ে লখনউয়ের কনিষ্ঠ দরবারের শরণ নিল'। এই সৌজন্য কেমনভাবে প্রকাশ পেত লখনউয়ে? 'এখানে সমকক্ষ কেউ এলে উঠে দাঁড়িয়ে এরা তার অভ্যর্থনা করবে, তার জন্যে সবচেয়ে ভালো জায়গা খালি করে দেবে, এবং যতক্ষণ না সে বসবে, নিজে বসবে না ... তার সঙ্গে যদি যেতে হয়, পথে ওর পশ্চাতে থাকবে, তাকে আগে যেতে দেবে। শিষ্টাচারের নিয়মানুসারে সেও আগ্রহ করে বলবে : "পহলে আপ তশরীফ লে চলেঁ"। কিন্তু এ পক্ষ থেকে বার বার বলতে হবে : "জনাব আগে তশরীফ লে চলেঁ ; ম্যায়্ কিস কাবিল হুঁ।" যখন সে কিছুতেই মেনে নেবে না, এবং বাধ্য করবে, তখন "শুক্রিয়া" জ্ঞাপন করতে করতে ঝুঁকে সেলাম করবে এবং সামনে পা বাড়াবে— তাও এমন ভাবে, তার দিকে যেন পিঠ না থাকে। বাচনে সভ্যতার দাবি —"জবান", ভাষায়-কথায় যেন খারাপ ও অশ্লীল শব্দ না আসে। সম্বোধিত ব্যক্তির অপ্রিয়, এমন শব্দ ও ভাবনা যেন তার সামনে মুখ থেকে না উচ্চারিত হয়। যদি কখনও অপ্রিয় কথা বলার প্রয়োজন আসে, এমন শব্দ আর এমন ভঙ্গি দিয়ে বলা উচিত, সম্মুখবর্তী ব্যক্তির যেন খারাপ না লাগে। আর, নিতান্তই যদি খারাপ লাগে তো খারাপ লাগাটা যেন যথাসম্ভব কম হয়। তার মধ্যে থেকে কিছু রসও যেন সে পেতে পারে।' লখনউয়ের অভিজাত শ্রেণী শুধু বিনয়-বাচন নয়, জোর দিতেন আরবী-ফারসী সঠিক ও স্পষ্ট উচ্চারণের ওপর, 'বিদ্বানদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে ফারসী ও আরবী শব্দ বেশি

প্রযুক্ত হবে' যেমন 'হকীম' (চিকিৎসক)দের কথোপকথনে আরবীর চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় শব্দ প্রয়োগ করতে হবে, তবে 'সাধারণ লোক ও মূর্খ চাকরদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে আরবী শব্দ এড়িয়ে যেতে হবে। স্ত্রীলোকদের সঙ্গে বার্তালাপে তাদের বাগ্‌বিধি, বাগ্‌ধারা ও বোলচাল ব্যবহার করতে হবে। যখন ছোটোরা বড়োদের সঙ্গে, নীচের তলার লোক ওপরতলার লোকেদের সঙ্গে, অশিক্ষিত শিক্ষিতদের সঙ্গে কথা বলবে, তখন খেয়াল রাখতে হবে : প্রতিটি শব্দে ও বাক্যে আদর-সম্মান যেন ওতঃপ্রোত থাকে। শাব্দিক ধ্বনি হবে মৃদু ও নীচু ; তবে এতটা নীচু নয়, যাতে অস্পষ্ট হয়ে যায়... এই সমস্ত বিষয়ে খর দৃষ্টি এবং পূর্বোল্লিখিত আদরবাচক শব্দ ও সর্বনামের প্রয়োগ-নৈপুণ্যে লখনউবাসীদের ভাষা এমন শিষ্ট, প্রাঞ্জল প্রবাহময়ী হয়ে উঠেছে, যে, এখানকার সাধারণ লোকও অন্য শহরের অধিকাংশ কবি ও সাহিত্যিকদের চেয়ে অনেক ভালো উর্দূ বলতে পারে।'[৭৫] সামাজিক শিষ্টাচার তথা বাগ্‌বিধি যে কত সুনির্দিষ্ট আকারবদ্ধ হতে পারে এই বইয়ে তা তো দেখানো হচ্ছেই, তা ছাড়াও দেখানো হচ্ছে আচারবিধির কাছে ব্যক্তির একমাত্র শ্রেণীপ্রতিনিধি রূপই স্বীকৃত, যার ব্যত্যয় ঘটাতে পারে আত্মীয়তা বা ঘনিষ্ঠতা। অন্য যে কোনো ব্যতিক্রমের অর্থ শ্রেণীকাঠামোর প্রতি আঘাত। বাচনেও, ভাষা-ব্যবসায়ীর অনুরূপ প্রয়োগকে শিষ্টাচার সমতুল্য মনে করা হয়। যুগে যুগে প্রয়োগ, ব্যবহারের দ্যোতনা কীভাবে পালটায় তার দৃষ্টান্ত চিকিৎসকদের সঙ্গে কথোপকথনে চিকিৎসা-সম্বন্ধীয়-আরবী-শব্দ বেশি ব্যবহারকে সৌজন্যের অঙ্গ মনে করা হত, এখন বিষয়সংক্রান্ত শব্দাবলী •Jargon বক্তা ব্যবহার করেন সেই বিষয়ে তাঁর দখল বোঝাতে, আমরা দেখতে পাই, উচ্চকোটির দৈনন্দিন জীবনে শিষ্টাচার-বিধি (অতিশয়োক্তি যার অঙ্গ) কতদূর প্রোথিতমূল!

সাধারণী অতিশয়োক্তির চরিত্র অনেকটাই ভিন্ন, সাহিত্য-অলংকরণ বা নিজেদের মধ্যে কথোপকথনে বিনয় নম্রতার আতিশয্যের ধার দিয়েও সে যায় না, একক উক্তিরূপে তার দর্শন প্রায় অলভ্য। কাহিনীতেও তার প্রয়োগ অনেক স্থূল, মার্গীয় গল্পের বক্রোক্তি রূপান্তরিত হয় অমার্জিত ইঙ্গিতে বা সরাসরি গালিগালাজের সম্বন্ধে। মার্গীয় গল্পের আর একটি লক্ষণীয় চরিত্র, যদিও সংখ্যায় কম, বক্তা স্বয়ং কাহিনীর নায়ক—সাধারণীরূপে প্রায় অনুপস্থিত।

বাত্তেল্লা কার সম্বন্ধে, কী বিষয়ে? প্রথমটির উত্তর: পরিবার ও পূর্বপুরুষ, আত্মীয় ও স্বজাতি, পেশা, গ্রাম, একই ভাষাভাষী অঞ্চল, শাসক, দেশ— জনপ্রিয়তার একটি আন্দাজি হিসবে ক্রমটি সজানো। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরকে কোনো ক্রমে বা অনুপর্বে সাজানো শক্ত, অধিক প্রচলিতদের নাম করা যেতে পারে, যেমন, বীরত্ব, তার উপবিভাগ শারীরিক শক্তি, সাহস ও আত্মবিসর্জন। যেমন, ধনগৌরব। শুধুমাত্র ধনের পরিমাণ নয়, এর অন্তর্গত বিলাসিতা, অমূল্য দুষ্প্রাপ্য ইত্যাদির মালিকানা, অমিতব্যয়িতা, আতিথেয়তা ইত্যাদি। আরও আছে কুলমর্যাদা, ব্যক্তিগত দক্ষতা, অসাধ্যসাধন প্রভৃতি বাত্তেল্লার বিষয় ধরে বিচার করতে গেলে শ্রেণী-অঞ্চলের কতকগুলো আবছা সীমানা চোখে পড়ে। রাজস্থানের রাজপুত বা রোহিলখণ্ডের রোহিলা, যারা পুরুষানুক্রমে যোদ্ধা, তাদের মধ্যে বীরত্বসূচক বাত্তেল্লার অধিক প্রচলন। আবার লখনউ বা হায়দরাবাদের সামন্ত-অভিজাতদের বাত্তেল্লার অধিকাংশ ধনগৌরব ও নানাবিধ বিলাসিতা সংক্রান্ত। জীবনদর্শনের এই তফাৎ নিতান্ত সাধারণী রচনাতেও দেখা যায়, বিহারের একটি ঘুম-পাড়ানি ছড়ার শেষ দুই পঙ্‌ক্তি 'ডিল্লী গিয়া আল্লা কোশ / মার বাহাদুর পহলা চোট'।[৭৬] আঘাতের প্রথমটি হানা, আক্রমণ শুরু করা যে বাহাদুরি, 'নিরীহ' প্রদেশবাসীদের শিশুদের সে কথা শেখানো হয় না।

বাত্তেল্লার আর একটি প্রকার হচ্ছে: 'বিবিধ শ্রেষ্ঠ' বিষয়ক। বৃহত্তম ফল, ভোজনপটুত্ব, শৈত্যাধিক্য— যে কোনো বিষয়ের অসম্ভব, 'অতি' রূপের গল্প বলে বক্তা। বড়াই করা হচ্ছে তবে তা পরোক্ষ এবং উদ্দেশ্য তার জ্ঞান জাহির। বলা বাহুল্য, এর সঙ্গে যখন 'আমাদের গ্রামে' বা 'নির্দিষ্ট ব্যক্তি'-র পরিচিতি যোগ হচ্ছে তখন গল্পের শনাক্তকারক যাবে পালটে। 'বিবিধ'-তে বাত্তেল্লার মূল উপাদানগুলি থাকলেও তার বিনোদিনী চরিত্র এত বেশি রকমের স্পষ্ট যে অন্য ধরণের সকল বাত্তেল্লার কথা

ভুলে গিয়ে অনেকেই বাত্তেল্লা- শ্রেণীভুক্ত সকল গল্পকে উদ্দেশ্যহীন, প্রভাবহীন, নিতান্ত-সময়-কাটানো খোশগল্প ধরে নেন।

বাত্তেল্লার লক্ষ্য কী? যার সম্বন্ধে অথবা যে বিষয়ে বাত্তেল্লা তার গৌরব বাড়ানোই এর লক্ষ্য। সমতুল্যদের থেকে কারো মাথা উঁচু করার সেটা একটা উপায়। তেমনি আর একটা উপায় অন্যদের মাথা ছেঁটে দেওয়া। সেইজন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিন্দাসূচক বাত্তেল্লাও আছে তার বড়ো এক অংশ জাতভিত্তিক, অর্থাৎ এক জাত কর্তৃক অন্য জাতকে ছোটো করা। বহুশ্রুত দৃষ্টান্ত, মিথ্যা কথা বলার প্রতিযোগিতা, যেখানে জাঠ চাষী চতুর বানিয়াকে ঠকায়।[৫৭] রোহিলখণ্ডে স্বকর্ণে শ্রুত আর একটি এই জাতের বাত্তেল্লা শুনিয়েছেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, যেটি আসলে বীরত্ব ও জাতিনিন্দার সমন্বয়। বাদশাহ আকবরের সৈন্য ছিলেন এক রোহিলা সর্দার, বাহাদুর খাঁ। আফগানিস্তানের যুদ্ধে গিয়ে প্রথমে তাঁর মৃত্যুসংবাদ এল, মা শোক করলেন না। যোদ্ধাজাতে বীরপুত্রের এমন মৃত্যুই তো কাম্য। কিছুদিন পরে জানা গেল বাহাদুর খাঁ জীবিত, তবে আহত ও সেবাশুশ্রূষা চলছে। আরো জানা গেল, 'আহত সৈনিকদের ওপর দিয়ে যখন বিপক্ষ-পক্ষের লোকেরা তাদের কষ্ট লাঘবের জন্য হাতি চালাচ্ছিল— সেই সময় একটা হাতির পায়ের তলা থেকে একজন আহত ব্যক্তি হাত সরিয়ে নেওয়ায় দেখতে পাওয়া গেল যে, সে বাহাদুর খাঁ'। এই খবর শুনে তার মা কেঁদেই আকুল,'আমার ছেলের এমন দুর্বলতা হল যে, হাতির পায়ের তলা থেকে হাত সরিয়ে নিলে! পঞ্চাশটা হাতি তার গায়ের ওপর দিয়ে গেলে সে গ্রাহ্য করে না—ইত্যাদি।' কান্না শুনে অন্যান্য সর্দারদের বাড়ির মেয়েরা এলেন, তাঁরাও শুনে আফসোস করতে লাগলেন, ওঃ, রোহিলার ছেলের এমন দুর্বলতা! অনেক ভেবে বাহাদুরের মা বললেন, দুর্বলতার কারণ আমি বুঝতে পেরেছি। বাহাদুর যখন শিশু, তখন আমি একদিন নেমাজ পড়ছিলাম, এমন সময় ও কেঁদে উঠল। ভ্রূক্ষেপ না করে আমি নেমাজ পড়ে যেতে লাগলাম, অল্প পরেই ছেলের কান্না থেমে গেল। নেমাজ শেষ করে এসে দেখি আমাদের ধোপানী এসেছে, তার কোলে শুয়ে ও খেলা করছে। জিজ্ঞাসা করলাম, ও কান্না থামাল কেন? ধোপানী বললে,ওর মুখে দুধ দেওয়াতে একটুখানি খেয়ে চুপ করল। 'আমি তো শুনে আঁতকে উঠলুম। বললুম— কী সর্বনাশ! তুই ওকে দুধ দিতে গেলি কেন? তারপর ছেলের পেটে মাথা দিয়ে তাকে খুব ঘুরোলুম— সে বমি করতে লাগল। বমি করতে করতে হাত-পা যখন প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে তখন শুইয়ে দিলুম। সব দুধই উঠে গিয়েছিল— বোধ, হয় এক ফোঁটা পেটের কোথাও ছিল—তার ফলেই এই দুর্বলতা।'[৫৮]

বাত্তেল্লার আর একটি ব্যবহারের অভিপ্রায় অসামাজিক ঘটনা বা চরিত্রকে সামাজিক মর্যাদা দেওয়া বা তাকে সম্মানের আসনে বসানো প্রায় একই গল্প রাজস্থান ও সন্নিহিত অঞ্চলে নানা রাজার নামের সঙ্গে জড়িয়ে বলা হয়ে থাকে। মডেল গল্পটি এই রকম: বীরখ্যাতিমান রাজবংশজাত রাজা শিকারে গেছেন দলবলসহ। পথে গোপালক বা ঐ ধরণের নীচকুলজাত , যাদের বীরত্বের খ্যাতি নেই, একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখলেন মাথায় তিনটি জলের কলসি নিয়ে এক পাল বিশালাকৃতি মহিষ চরাতে যাচ্ছে। রাজার সঙ্গীরা মজা দেখার জন্য ঘোড়া ছুটিয়ে মহিষদের ভয় দেখানোতে মেয়েটি ধাবমান চঞ্চল মহিষটির শিং দু'হাতে ধরে থামাল অথচ তার কলসি থেকে এক ফোঁটা জলও পড়ল না। রাজা মেয়েটির দৈহিক শক্তি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। শিকারে গিয়ে একটি প্রকাণ্ড বুনো শুয়োরের পিছনে তিনি বর্শা হাতে তাড়া করলে সেটা এক জনার খেতে গিয়ে লুকোয়। রাজা খেতের ভিতর ঢুকে দেখলেন সেই মেয়েটি ইতিমধ্যেই জনারের ডাঁটি ভেঙে বর্শার মতো করে শুয়োরটিকে বধ করেছে। অমানুষিক শক্তি ও বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে রাজা তাকে রানী করে নিয়ে এলেন। গল্পের উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধা হয় না, নিম্নবর্ণের মেয়েকে রাজরানী করার কৈফিয়ৎ দিতে তার অবতারণা। বাত্তেল্লার উত্তরে কথিত বাত্তেল্লার সংখ্যা প্রচুর এবং লক্ষণীয়, তাদের একটি অংশ চরিত্রে প্রায় ননসেন্স। প্রথম কথকের গল্প মিথ্যা প্রমাণ করতে দ্বিতীয় কথক এমন এক গল্প বলছে যার আপাত-বিশ্বাসযোগ্য হওয়ার ভানটুকুও নেই এর প্রকৃত নাম হওয়া উচিত কাউন্টার-বাত্তেল্লা। দৃষ্টান্ত: প্রথম বক্তা বলছে তার দাদুর এমন গরম শাল ছিল যে মাঘ মাসের শীতে অল্পক্ষণের জন্য গায়ে দিলেও লোকে গরমে হাঁসফাঁস করত , ঘামে ভিজে যেত সারা শরীর। দ্বিতীয় বক্তা বলছে, ও আর এমন কী? আমার দাদুর এমন শাল ছিল, তার পশম চাট্টি ছিঁড়ে পুকুরের জলে ফেললে জল টগবগ করে ফুটে উঠত ।[৫৯]

আর একটি বিচিত্র মানসিকতার সন্ধান পাওয়া যায়। নিতান্ত অবিশ্বাস্য বাত্তেল্লাকেও সরাসরি মিথ্যা না বলে বলা হত, 'শোনা যায়' 'জনশ্রুতি'— কত্থক-নাচিয়ে বান্দাদীন সম্পর্কে বলা হচ্ছে 'নাচের সময় তাঁর পা খুব হাল্‌কা নরম হয়ে মেঝের ওপর পড়ত। প্রসিদ্ধি আছে কখনও কখনও তিনি তলোয়ারের ধারের ওপর নাচতেন; এবং তবু পদতল অনাহত...'[৬০] বরং কথক শপথ করে বলতেন তিনি যা বলছেন সব সত্য। মুর্শিদাবাদ নবাবের এক কর্মচারী দরবারে কথিত, তাঁর স্বকর্ণে শ্রুত এক বাওেল্লা শুনিয়েছেন : এক শিকারির পোষা কাঠবিড়ালী ছিল, যে উড়ন্ত পাখি শিকার করতে পারত। বক্তার পোষ্টা আমীর তার তামাশা দেখবার মানসে সপারিষদ শিকারিকে নিয়ে এক বিলের ধারে গেলেন। বিল পাখিতে ভর্তি, কাঠবিড়ালীকে ছেড়ে দিতেই সে লাফ দিয়ে একটা পাখির পিঠে চড়ে বসল। পাখি ভয় পেয়ে চিৎকার করে আকাশে উড়ল, সঙ্গে শত শত পাখি। কাঠবিড়ালী উড়ন্ত পাখির পিঠে বসে দাঁত দিয়ে তার ডানা কেটে তাকে মাটিতে ফেলে দিল ও পড়বার মুহূর্তে লাফ দিয়ে আর একটি উড়ন্ত পাখির পিঠে উঠে একই ভাবে তার ডানা কাটতে লাগল। এইভাবে দু'ঘন্টার মধ্যে সে প্রায় দু'তিনশো পাখি শিকার করে ফেলল। আমীর শিকারিকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দিলেন। 'বক্তা গল্পটি শেষ করিলে পর আমাদের নবাব সাহেব (মনসুর আলী খাঁ) তাহার বক্তৃতা ও কল্পনার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে, "খাঁ সাহেব আপ হাজার দাস্তাঁকে বুল্‌বুল্‌।" এই বাক্যটি ইংরেজিতে তরজমা করিলে হয়। "You are the nightingale of a thousand tales"..... কিন্তু খাঁ সাহেব কল্পনার কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হইয়া.... শপথ করিলেন..... "হুজুর ইয়ে ঝুট বাত নেহি, বান্দা আপনা চসমমে দেখা, কসম্‌ হুজুরকা, কসম্‌ হুজুরকা শিরকা, কসম্‌ খোদাকা, কসম্‌ কল্‌ম্মুল্লাকা"।'[৬১] বাত্তেল্লার জবাবে। 'আরেক বাত্তেল্লাকে সত্য বলে চালানোর চেষ্টায় এই কাউন্টার-বাত্তেল্লা একটা আকাট ননসেন্স গল্প পাড়ে তার প্রথমে খানকয়েক শপথ জুড়ে দিয়ে। ননসেন্স গল্প প্রসঙ্গে আমরা যে আর্মেনীয় গল্পটির উদাহরণ দিয়েছি, তা আরম্ভ হচ্ছে : 'I swear by my father's holy baptism and stety my mother's birth'[৬২] ইত্যাদি দিয়ে।

বাত্তেল্লা সমাজে গৃহীত হয় কেন, কেনই বা কথক মিথ্যা বলতে সংকোচ বোধ করে না? প্রশ্নের মধ্যেই তার আংশিক উত্তর রয়েছে। বাস্তব ঘটনার পুনর্বিবরণ ছাড়া সব গল্পই তো সেই অর্থে মিথ্যা, আলাদা করে অবাস্তব গল্পের প্রশ্নই ওঠে না। রূপকথার কথককে কে মিথ্যা বলার দায়ে অভিযুক্ত করবে? বাত্তেল্লার বেলা এ প্রশ্ন ওঠে কারণ তার আপাত-সত্যাতার একটা ভান থাকে। কিংবদন্তি আর অতিকথার সঙ্গে বাত্তেল্লার রক্তসম্পর্ক, তাদের অতিরঞ্জনের পরত একের পর এক ছাড়াতে পারলে যেমন কেন্দ্রে স্থিত বীজসত্যের সন্ধান পাওয়া যায়, অধিকাংশ বাত্তেল্লার ক্ষেত্রেও তাই। এত অতিঅঙ্কন সত্ত্বেও বাত্তেল্লা গ্রহণযোগ্য হয় বহুবিধ কারণে, যার কয়েকটি বলা যেতে পারে। যেমন, বাত্তেল্লার এক বৃহদংশ নিজবংশের বীরত্ব, অর্থকৌলীন্য, কুলপ্রাধান্য ইত্যাদি নিয়ে। এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে বংশমর্যাদা, খানদানের ইজ্জতের ধারণা। পূর্বপুরুষ সাধারণ, মামুলি লোক ছিলেন না, বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন, অভিজাতদের তালিকায় নিজ বংশের নাম অক্ষয় করে গেছেন যে সব কাজকর্মের দ্বারা, উত্তরপুরুষের উচিত সেইসব ক্রিয়াকর্ম পুনরায় সম্পাদন করে নিজেকে বংশের যোগ্য সুসন্তান প্রতিপন্ন করা, বংশের ঠাট, চাল বজায় রাখা, না পারলে মুখে সে অতীতগৌরব বলতে দোষ কী? বংশপরম্পরায় অতিরঞ্জিত হয়ে সেই কাহিনীই অলীক বাত্তেল্লায় রূপান্তরিত হয়। এখানে মনে রাখা দরকার যে বাত্তেল্লার ব্যাপক প্রচলন দেখা যায় সামন্ততান্ত্রিক এবং আরও বেশি করে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক সমাজে। পূর্বপুরুষের কৃতিত্ব বংশধরকে গৌরবান্বিত করে, এই ধারণার শিকার সবাই, সমাজের সকল স্তরের মানুষ। এর আর একটি বিচিত্র ব্যবহার দেখা যায় কথকের নিজেকে অযোগ্য বলায়। তার কারণ শুধু বিনয়বাচন নয়, কথক নিজেকে যতখানি অযোগ্য বলবে, তুলনা করে তার পূর্বপুরুষের গৌরব ততই বৃদ্ধি পাবে। তাই সামন্ততান্ত্রিক

সমাজে ঊর্ধ্বতনপুরুষ প্রসঙ্গে নিজেকে অযোগ্য, নালায়েক, নাতোয়ান বলাটাই বিধি, শিষ্টাচার; ধনতান্ত্রিক সমাজে যা ঠিক উলটো। সামাজিক মর্যাদাবান বক্তা গর্বের সঙ্গে নিজের অনভিজাত পূর্বপুরুষের কথা বলে, সোশ্যাল মবিলিটির উদাহরণ দেয় নিজের কৃতিত্বের তলায় মোটা করে দাগ দিতে।

ভিন্ন কারণও আছে। যেমন, সমাজের নিম্নস্তরের বাসিন্দা, বংশানুক্রমিক যুদ্ধব্যবসায়ী বহু জাতের মধ্যে পূর্বপুরুষের বীরত্বের, অসম সাহসের নানা বাত্তেল্লা প্রচলিত। যুগের পর যুগ ধরে যে সব মাহার, বাগদি, বেডর, খণ্ডায়েত দের যুদ্ধ করতে হচ্ছে রাজা-রাজড়ার খেয়াল চরিতার্থ করতে, জীবিত থেকে জয়ী হতে পারলে সামান্য লুঠের ভাগ ছাড়া কোনো পুরস্কার নেই, সেই সব জন্মনির্দিষ্ট গ্লাডিয়েটরদের এবং তাদের পরিবারের পক্ষে এই গল্পগুলিই সঞ্জীবনী, এই স্ব-অভিভাবনটুকু সকল আঘাত সামলাবার জোর দেয়।

ইতিহাস বলতে আমরা যা বুঝি আর লোক-ইতিহাস,বলা নিষ্প্রয়োজন, এক জিনিস নয়, উভয়ের নির্মিতির প্রক্রিয়াও এক নয়। ব্যাপক অর্থে লোক-ইতিহাস কিংবদন্তির সমাহার, যা বহুশ্রুতির মাধ্যমে গড়ে ওঠে এবং বেঁচে থাকে। রাজস্থানের চারণ, বাংলার ভাট ও কথক, উড়িষ্যার গল্পসাগর, মহারাষ্ট্রের লাবণীদের ইতিহাস-কথন অসংখ্য শ্রোতা শুনেছে, হয়তো এখনও শোনে, ক্ষুদ্র পরিধিতে শ্রোতাই হয় আবার বক্তা, গ্রহণ-বর্জনের এই অশেষ প্রক্রিয়ায় লোক-ইতিহাসের প্রাণপ্রতিষ্ঠা। কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক হলেও উল্লেখ্য যে একই প্রক্রিয়ার আতিশয্যে জন্ম নেয় বাত্তেল্লা, বিশেষত যাদের লক্ষ্য নিছক মজার আরও খানিক ওপারে।

সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে অতীত সম্পর্কে ধারণার পার্থক্য সব সময়েই ছিল। পার্থক্যটা দিগ্‌দর্শনের, সত্য-অসত্যের নয়। বংশলতিকা, হাজারো কিংবদন্তি আর উপাখ্যানের জট ছাড়িয়ে বাস্তবের মাপকাঠিতে অতীতকে বোঝবার চেষ্টার শুরু তো এই সেদিন। তার আগে? অতীত সম্পর্কে ধারণার অনচ্ছতা সম্ভব-অসম্ভবের সীমানা ঘুচিয়ে দেয়, হাজারো শ্রুতি আর ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে আহরিত জ্ঞান, নতুন করে ঢালাই হয় প্রয়োজন আর উপযুক্ত যুক্তির ছাঁচে। ইতিহাসের নতুন নামকরণ হয়, প্রতীতি। মার্গীয় জগৎ অবশ্যই আর একটু সতর্ক, তারা একে বাস্তব.প্রয়োগের অধিক মূল্য দিতে গররাজি। ইতিহাস-বৃত্তান্তের মূল্য তার প্রতি বিশ্বাসে, আস্থায়। অতীত যে বর্তমানেরই বিগত রূপ, বর্তমানের মতো অতীতেও যে অবাস্তব কিছুই ঘটতে পারে না, যৌক্তিক ইতিহাসের এই প্রাথমিক, বুনিয়াদি শিক্ষাকে নিম্নকোটি প্রথমেই বাতিল করে দেয়। হয়তো এই প্রত্যয় তার দরকার, সংখ্যাতীত সামাজিক বঞ্চনা-অন্যায়ের কাছে প্রশংসাহীন, প্রতিকারহীন আত্মসমর্পণের জীবন মেনে নিতে, ভাগ্য আর ধর্মবিশ্বাসের মতো তার এই ইতিহাস-বিশ্বাসেরও প্রয়োজন হয়। তাদের বাত্তেল্লা এই অলীক ইতিহাসেরই বিকলাঙ্গ সহোদর।

বাত্তেল্লার চরিত্র যেমনই হোক, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও অতীতমনস্কতা আমাদের চোখ এড়ায় না। লোক-ইতিহাসে ব্যক্তিনায়ক ও বীরপূজার একটা বিশেষ স্থান আছে। মার্গীয় জগতের উপলব্ধিতেও সমষ্টিনেতৃত্ব অপেক্ষা ব্যক্তিনেতৃত্বের প্রাধান্য গোপন নয়। গোষ্ঠী থেকে আপন যোগ্যতায় ব্যক্তিনায়ক নির্বাচিত হয়, নেতৃত্বের অধিকার সে জন্মগত হকের মাধ্যমে বংশধরের জন্য নিশ্চিত করে রেখে যেতে চায়। তবু তার প্রতিদ্বন্দ্বী আসে, সিংহাসন হস্তচ্যুত হয়—অতীতকথা বলতে এককালে মানুষ অধিকার নিয়ে এই লড়াইয়ের কাহিনীগুলিকেই জানত, তারাই বৃত্তান্তের সিংহভাগ। যুক্তিবিচার-

অনুত্তীর্ণ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিও বোধহয় একনায়কী, কারণ পাশব প্রবৃত্তি তো তাই। এই ধারণা সব দেশেই এক, কিন্তু অতীত স্বর্ণময়, এ বিশ্বাসের ভারতীয় বিশেষত্ব আছে। ভারতীয় মানসে বদ্ধমূল ধারণা : অতীত যত সুদূর হবে তার ঔজ্জ্বল্য যাবে ততই বেড়ে। ধনসম্পদ বিলাসিতার বিদ্যুদ্দীপ্তি নয়, নীতি-আদর্শ-সত্য-ন্যায়ের ভাতি, যেখানে অসত্যের স্থান নেই, অন্যায় অধর্ম শাস্তি পায়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর,কলি, চার যুগের শাস্ত্রোক্ত বর্ণনার সঙ্গে এই ধারণা অভিন্ন শুধু নয়, হয়তো তা থেকে উৎপন্নও।

সাধারণী অত্যুক্তির প্রসঙ্গে বলেছি, তার বিষয় : পূর্বপুরুষ, স্বজাত, পেশা, গ্রাম, একই ভাষাভাষী অঞ্চল, শাসক, পরিশেষে উপমহাদেশ। কেন আমরা রক্তসম্পর্ক, গোত্রসম্পর্কের সঙ্গে ভাষাগত ও ভৌগোলিক-রাজনৈতিক এককের কথা বলছি? অতীত সম্পর্কে সাধারণজনের জ্ঞানের ছকটাই তা-ই, মুদ্রাযন্ত্র-পূর্ববর্তী কালের ক্ষেত্রে যা আরও বেশি করে সত্য। তার জ্ঞান ভুল বা ঠিক যাই হোক, যত দূর অতীতের দিকে যেতে থাকে তত কমে ও একই সঙ্গে তার বিষয় পালটাতে থাকে। এই চলন যুগপৎ অনুভূমিক ও উল্লম্ব। অর্থাৎ নিকট-অতীত কালের জ্ঞান তার নিজের পরিবার-পূর্বপুরুষ সম্পর্কে সবথেকে বেশি, ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে 'দেশ' পর্যন্ত। আবার এই অতীত যত সুদূরতর হচ্ছে তার জ্ঞান পরিবার ইত্যাদি সম্বন্ধে হ্রাস পাচ্ছে, দূরতম অতীত সম্পর্কে সেই জ্ঞান 'শাসক', কদাচিৎ 'দেশ' বিষয়ে সীমাবদ্ধ। সাধারণী অত্যুক্তির সংস্থিতিও কিন্তু তা-ই।

মার্গীয় কিংবদন্তিই হোক বা সাধারণী বাতেল্লাই হোক, সামাজিক জীবনে তার বিক্রিয়া কি? সন্দেহ নেই, এই দুইয়েরই রূপান্তরিত রূপ অতিকথা (মিথ), লোকমানসে যার প্রভাব নিয়ে পণ্ডিতেরা বহু সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। তার একটিমাত্রকে নিয়ে আলোচনা। অতিকথার গুরুত্ব তার বিশ্বাসযোগ্যতায়। অতিকথার যথেষ্ট তরলীকৃত সংস্করণ বাতেল্লা, তবু তার সেই গুণ কিয়ৎপরিমাণে আছে। শ্রোতাদের কাছে নিঃসন্দেহে বাতেল্লার এক বড়ো অংশ গৃহীত হয় নিছক বিনোদন হিসেবে, তবু ইতিহাসজ্ঞানের স্বল্পতা, দূর-অতীত সম্পর্কে অতিপ্রাকৃত ধারণা, বারংবার পুনরাবৃত্তি কোথায় যেন, শ্রোতার কোনো অবচেতনে বিশ্বাসম্মন্যতার ছাপ রেখে যায়। সকল অসম্ভাব্যতা সত্ত্বেও সে তাকে প্রত্যাখ্যান করে না, অতিরঞ্জনের গভীরে সত্যতার অস্তিত্ব তার মনে এমনভাবে শিকড় গাড়ে, যে এক সময় তার কাছে বীজ আর ফলের প্রভেদ ঘুচে যায়।

একজন মানুষের যে অসম্ভব ক্ষমতা থাকতে পারে, সে অবাস্তব, অলৌকিক কিছু ঘটাতে পারে—এই জাতীয় বাতেল্লার সব থেকে বেশি দেখা পাওয়া যায় ধর্মীয় উপাখ্যানে, উপদেশে। গুরুস্থানীয়রা অর্থাৎ লঘিষ্ঠাংশ তাতে মধ্যে মধ্যে বিশ্বাস করে ফেলে, নিজে ওইসব কর্ম ঘটাতে যায়। তাদের নাম আমাদের কাছে এসে পৌঁছয়। কিন্তু ভক্তরা, যাদের অবচেতনে এই বিশ্বাসের ছাপ থাকে যে এমনটা হলেও হতে পারে, সেই সমষ্টি তো আমাদের কাছে ব্যক্তিপরিচয়হীন, অনামা। কিন্তু গুরুকে অবতার বানানোর প্রচেষ্টাতে তাদেরও ভূমিকা থাকে। দুঃখসমস্যায় জর্জরিত মানুষ অঘটন পটু ত্রাতা চরিত্রে আশ্বাস খুঁজে পায়। সেই কারণে ধর্মগুরুদের সম্পর্কে সকল অবাস্তব গল্পে সে শুধুই যে বিশ্বাস করে তা-ই নয়, পুনরাবৃত্তির সময় তাকে অতিরঞ্জিতও করে। গুরুর মহিমা যত বাড়বে তার তারণ হবে তত নিশ্চিত।

বিশ্বাস করার এই প্রয়োজন, কিংবদন্তির অতিমানবীয় কীর্তিকে সত্য বলে জানা আর এক অন্য

পথে ঠেলে দেয়। লঘিষ্ঠাংশ বেছে নেয় সেই পথ, সে নিজেই হতে চায় কিংবদন্তির নায়ক। তার রূপ বহুবিধ, কুলগৌরব বজায় রাখতে কেউ অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুকে বরণ করে, পরিবারের অমিতব্যয়িতার ঐতিহ্য স্মরণে রেখে কেউ সাধ্যাতীত ঋণ করে উৎসবে মাতে, কেউ ধর্মগুরু হয়, নিজেকে মনে করে ঈশ্বরের অবতার, কেউ ধর্মসংস্থাপকের ভূমিকা নিতে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয়। মূল নিয়ন্ত্রক সকলের ক্ষেত্রে এক হলেও, অতিকথায়, কিংবদন্তিতে, অতিশয়োক্তিতে বিশ্বাসের রূপ এক নয়, যে-যোদ্ধা স্বেচ্ছায় আত্মবিসর্জন দিচ্ছে, সে স্বজাতির অতিরঞ্জিত বীরত্বকাহিনীকে 'নিজধর্ম' বলে জেনেছে '*Swamdherma* and this' (putting his hand to his sword), said the aged chief, 'have hitherto preserved our rights...,but here money buys justice, and right yields to favour' চরম অমিতব্যয়ীর শিকড় রয়েছে অসংখ্য বাবু-সম্পর্কিত বাতেল্লায় 'একে একে অন্নসত্র রথ দোল বন্ধ হল, মহালের পর মহাল বাঁধা পড়তে লাগল..... অত সম্পত্তি একা মানুষ ক'বছরে ওড়াতে পারে না। কিসে সই দিচ্চেন, কেন দিচ্চেন, কাকে দিচ্চেন চেয়েও দেখতেন না। পাকা বাবুরা নকি তাই করে!' শাস্ত্রবাক্য যুগে যুগে অবতার হয়ে আসার অতিকথায় বিশ্বাস করে গুরু নিজেকে ভাবেন ঈশ্বরাবতার।

অতিমানবীয় কার্যকলাপ জন্ম দেয় অলৌকিকতার, তার থেকে জন্ম নেয় বিশ্বাস, অলৌকিকত্বই, ঘটাতে পারে সাধারণের সাধ্যাতীত ঘটনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান্ সেনাপতি রোমেলের অসাধারণ যুদ্ধকৌশল মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদের মনে ধারণা জাগিয়েছিল যে রোমেল অলৌকিক ক্ষমতাধর ব্রিটিশ সেনাপতি অচিনলেকের নিজপক্ষের সৈন্যদের প্রতি লিখিত্ আদেশ, 'There exists a real danger that our friend Rommel is becoming a kind of magician or bogey-man to our troops, who are talking far too much about him. He is by no means a superman, although he is undoubtedly very energetic and able. Even if he were a superman, it would still be highly undesirable that our men should credit him with supernatural powers' তাই নিম্নকোটির বিদ্রোহে নেতা-নেত্রীদের ওপর বার বার আরোপিত হয় অলৌকিকত্ব। যে রাষ্ট্রশক্তির অপরাজেয়ত্ব 'যাবার সময় বলন্টিয়র দুঃখ করে যায়—"শ্বশুররা" যে যুদ্ধে হারাতে জানে না', প্রচণ্ডতা তাকে হাড়ে হাড়ে টের পাওয়ানো হয়েছে, অলৌকিক শক্তিধর নেতা ছাড়া কেমন করে জেতা যাবে তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে? মানুষের যা অসাধ্য, সে-ই তো করতে পারবে। তাই পাগলপন্থী বিদ্রোহে নেতা টিপু পাগল ও তাঁর মাতা মা-সাহেবা হন নানা দৈবীক্ষমতার অধিকারী, ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে গান্ধির অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে নানা জনরব ছড়িয়ে পড়ে উত্তরপ্রদেশ, বিহারে।

অসম্ভব, অবাস্তবের গল্প শেষ হওয়ার নয়। তবু কোথাও-না-কোথাও ছেদ তো টানতেই হবে। গল্প যত অসম্ভব হোক, যত তার প্রসঙ্গ-ব্যাপ্তি থাক্ ত্রিকাল জুড়ে, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানে, শ্রোতা-পাঠক তার সমসময়ে তাকে ঠিক ফিরিয়ে নিয়ে আসবে, খুঁজে বার করবে প্রাসঙ্গিকতা, তার প্রাত্যহিক জগতের রূপককে। বাস্তব অবাস্তব সমমূল্য শুধু শিশুর কাছে।

আর ব্যাখ্যাতার ভূমিকাও পালটে যায়। বয়ান সে আর বিস্তৃত করে না, বরং অসম্ভবের কার্য-কারণ খুঁজে বার করে। নীট্‌শে-কথিত সেই আত্তীকৃত 'ভুলে-যাওয়া', অনুপুঙ্খ-বিশেষত্বহীন জ্ঞানের ঘন বুনোটে অবাস্তবের স্থান পাকা। সেই অখণ্ড প্রবাহ থেকে সে হয়তো আবার খণ্ডাংশ বেছে নেবে, বিদ্যাবুদ্ধি অনুযায়ী স্থির করবে তাদের অর্থ, মূল্য— তারপর ছক সাজিয়ে তাদের ঘুঁটি করে খেলে দেখবে নতুন খেলাটা জমে কি না, পুরোনো নিয়মের বদলে নতুন নিয়ম দাঁড়াচ্ছে কি না আদৌ।

টীকা

1. ১. Franklin Edgarton, *The Panchatantra Reconstructed*, Vol.II, American Oriental Society, 1924, pp. 276-80, 298-301, 331-35.
2. ২. পঞ্চতন্ত্রের গল্প 'হৃদয় ওকর্ণবিহীন গর্দভ (A.S.P. Ayyar tr. *Panchatantra and Hitopadesa Stories,* Bombay, 1931, pp. 162-64) ।
3. ৩. ঐ, 'যখন ইঁদুর লোহা খেয়েছিল' (তদেব pp. 104-105)।
4. ৪. রাধাগোবিন্দ বসাক - সম্পা., কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, কলিকাতা, ১৯৬৪,পৃ. ২৩।
5. ৫. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, ঠাকু'মার ঝুলি বাঙ্গালার রূপকথা, কলিকাতা, ১৩৭৬, পৃ. ১১১-১২, ১১৯।
6. ৬. তদেব পৃ. ৭৩।
7. ৭. জ্যোতিভূষণ চাকী - সম্পা, চাণক্যচিন্তামণি, কলিকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৫৪।
8. ৮. P.O. Bodding, *Santal Folk-Tales*, Vol. 1. Oslo, 1925.
9. ৯. Mazharul Islam, *A History of Folktale Collections in India, Bangladesh and Pakistan,* Calcutta, 1970, p. 141.
10. ১০. Johannes Hertel, *Das Pancatantra, seine Geschichte und seine Verbreitung*, Leipzig and Berlin, 1914, quote. Franklin Edgarton, পূর্বোল্লিখিত, p.3.
11. ১১. A.S.P. Ayyar, pp. 162-64.
12. ১২. তদেব, পৃ. ২০৫।
13. ১৩. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২৩৬-৪৯।
14. ১৪. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলার ব্রত, কলিকাতা, ১৯৭৬, পৃ. ২১।
15. ১৫. জসীমউদ্‌দীন, 'বাংলাদেশের ছড়া', কবি জসীমউদ্‌দীনের প্রবন্ধসমূহ, প্রথম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৯০. পৃ. ৬৬-৬৭।
16. ১৬. প্রভাত বসু, মহেন্দ্রনাথ দত্ত - সম্পা.,'ইচিং বিচিং', ছোটদের ছড়া সঞ্চয়ন, কলিকাতা, ১৯৯১, পৃ. ১৫।
17. ১৭. *Treasury of Nursery Rhymes,* Ahmedabad, 1986, p. 15.
18. ১৮. প্রভাত বসু, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩৮।
19. ১৯. *Treasury of Nursery Rhymes*, p. 19.
20. ২০. J.A. Cuddon, *A Dictionary of Literary Terms*, Delhi, 1980, p.426.
21. ২১. A. K. Ramanujan, ' A Tall Tale in Urdu', *Folktales from India*, Delhi, 1993, pp. 193-94.
22. ২২. Hovannes Toumanian, 'The Hunter that Lied', *Selected Works*, Moscow, pp. 148-149.
23. ২৩. উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, টুনটুনির বই, কলিকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ১১৯-২৮।

২৩ক. K.A. Seethalakshmi,'The Three Deaf Persons'. *Folk Tales of Tamil Nadu*, Delhi, 1969, pp. 80-82.

24. ২৪. J.A. Cuddon, পূর্বোল্লিখিত, p. 426.
25. ২৫. Julian Hochberg, 'The Representation of Things and People', *Art, Perception and Reality,* Baltimore, 1972, p. 91.
26. ২৬. শীলা বসাক, বাংলা ধাঁধার বিষয়বৈচিত্র্য ও সামাজিক পরিচয়, কলিকাতা,১৯৯০, পৃ.৪০০।

২৭. তদেব পৃ. ৩৩৮।

২৮. তদেব পৃ. ৪৪।

২৯. তদেব পৃ. ৪০০।

৩০. আশুতোষ ভট্টাচার্য - সম্পাদিত, গোপীচন্দ্রের গান, কলিকাতা, ১৯৬৫, পৃ. ৫৯-৬০।

৩১. ফকীরমোহন সেনাপতি, আত্মচরিত, মৈত্রী শুক্ল অনূদিত, দিল্লি, ১৯৭৭, পৃ. ১১৯।

৩২. Desmond Morris, *Bodywatching*, London, 1985, p. 244.

৩৩. G.K. Chesterton, 'A Defence of Nonsense', *The Defendant*, London, 1901.

৩৪. Charles Baudelaire, 'The Essence of Laughter', *The Painter of Modern Life and Other Essays*, London, 1964, pp. 154-56.

৩৫. আশরাফ সিদ্দিকী, লোকসাহিত্য, প্রথম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৬৩, পৃ. ১৭২।

৩৬. আশুতোষ দাস সম্পা., দ্বিজ রামদেব বিরচিত অভয়ামঙ্গল, কলিকাতা, ১৯৫৭,পৃ. ৫১।

৩৭. আশুতোষ চৌধুরী, ' উল্টা বাউলের গান', আশুতোষ চৌধুরীর রচনা ও সংগ্রহ-সম্ভার, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ.৩৯।

৩৮. তদেব, পৃ. ৪২।

৩৯. যোগীন্দ্রনাথ সরকার, 'মজার মুল্লুক', হাসিরাশি, কলিকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ৫।

৪০. দৃষ্টান্তের জন্য দ্র. শীলা বসাক, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২৪৫।

৪১. *Playboy's Party Jokes*, New York, 1963, p. 70.

৪২. দৃষ্টান্তের জন্য দ্র. শীলা বসাক, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২৪৪।

৪৩. উৎকল কাহানী, কটক, ১৯৪৬, পৃ. ৬০।

৪৪. তদেব, পৃ. ১৯।

৪৫. গৌতম ভদ্র, ইমান ও নিশান, কলিকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৩০৮।

৪৬. L. E. B. Cobden Ramsay, *Feudatory States of Orissa*, Calcutta, 1910, p. 41.

৪৭. W. K.Firminger ed, *Bengal District Records, Rangpur*, Vol. I, 1770-79.

৪৮. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ১৪১।

৪৯. বিংশ শতকের প্রথম দিকে রোহিলখণ্ড অঞ্চলে শ্রুত শব্দটি ব্যবহার করেছেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, মহাস্থবির জাতক, চতুর্থ পর্ব, কলিকাতা, ১৯৬৯, পৃ. ১৫৯।

৫০. রাজস্থান ও সন্নিহিত অঞ্চলে 'বতোলা' অধিকতর প্রচলিত শব্দ। হিন্দী শব্দ আগার, সপ্তম খণ্ড, নাগরী প্রচারিণী সভা, কাশী।

৫১. J. A. Cuddon, পূর্বোল্লিখিত, p. 684.

৫২. Richard M. Dorson, *American Folklore*, Chicago and London, 1959, pp. 209-10.

৫৩. বাণভট্ট, হর্ষচরিত, প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর - অনূ., কলিকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ৬৯।

৫৪. সতীনাথ ভাদুড়ী, ঢোঁড়াই চরিতমানস, সতীনাথ গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড কলিকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ১৭৬।

৫৫. আবদুল হলীম শরর্, পুরনো লখনউ, মুনীরা খাতুন ও গুরুদাস ভট্টাচার্য - অনূ., দিল্লি, ১৯৭৪.পৃ. ৩০৮-১০, ৩২১ ও ৩২৫-২৬।

৫৬. রাজেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারী উপকথা, কলিকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ৯।

৫৭. A.K. Ramanujan, পূর্বোল্লিখিত, pp. 299-305.

৫৮. প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৫৯-৬০।

৫৯. মৌখিক সূত্র, অধ্যাপক প্রদ্যোতকুমার মুখোপাধ্যায়-প্রদত্ত।
৬০. আবদুল হলীম 'শরব্', পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৯৭।
৬১. গিরিশচন্দ্র বসু, সেকালের দারোগার কাহিনী, কলিকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ২৩৫-৩৭।
৬২. Hovannes Toumanian, পূর্বোল্লিখিত, p. 148.
৬৩. James Tod. *The Annals and Antiquities of Rajasthan*. vol.II. Calcutta. 1899.p.1469.
৬৪. কল্যাণী দত্ত, 'বৈধব্য কাহিনী', এক্ষণ, শারদীয় ১৪০০, পৃ. ১০৪-১০৫।
৬৫. Desmond Young. *Rommel*. Glasgow. 1955. p. 23.
৬৬. সতীনাথ ভাদুড়ী, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২৩৪।
৬৭. গৌতম ভদ্র, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১০৪।
৬৮. Shahid Amin. 'Gandhi as Mahatma. *Selected Subaltern Studies*. New York and Oxford. 1988. pp. 288-348.
৬৯. নীট্শে (Nietzsche) -এর 'strength to *forget* the past' এবং লিওতার (Lyotard) -কৃত তার ভিন্ন রূপারো :পের জন্য দ্র (ফ্রেড্রিক জেমিসন -এর ভূমিকা, Jean-Francois Lyotard. *The Postmodern Condition : A Report on Knowledge*. Manchester. 1989.

কুবির কবিদারের জগৎ

সুধীর চক্রবর্তী

কবীর নানক দাদু রজ্জব নামদেবের মতো কত মধ্যযুগের সন্ত সাধকের জীবনকাহিনী ও গান আমরা শুনেছি। সারা দেশে তাঁদের নাম ও গানের প্রসার প্রসিদ্ধি মান্যতা। তাঁদের কথা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহন থেকে কত মান্যবান মহাশয়গণ। আমরা আজ অনুধাবন করব কবেকার গ্রাম বাংলার একজন গাহক গীতিকারকে। কজনই বা জানেন তাঁর নাম বা পরিচয়। আর তাঁর গান? সে তো আজ কতদিকে ধান্যকণার মতো ছড়িয়ে গেছে ইতি-উতি, কুড়োনো কঠিন। ১৭৮৭ সালে জন্ম এই মানুষটির নাম কুবের সরকার। সাকিন চুয়াডাঙা মহকুমার আলমডাঙার ঘোষবিলা গাঁ, জিলা নদীয়া। জাতে যুগী, পেশা তাঁত বোনা। খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে কিন্তু কাল হল তার কবিত্ব। বসনদারি ছেড়ে কুবের ধরলেন কবিদারি, শুরু হল তাঁর দেশপরিক্রমা। গ্রাম থেকে গ্রামে গান গেয়ে বেড়ান। যার আদি অহংকার ছিল :

> ভালো কাপড় বুনতে জানি—
> চিরুনকোটা শালের বোটা ঢাকাই জামদানি।

নতুন পেশায় এসে এবার নতুন অহংকারে বলেন :

> আমার নাম কুবির কবিদার
> এই দেশে দেশে বেড়াচ্ছি করে রোজগার।

কবিগানের প্রতিপক্ষ গোলামজাদাকে তুড়ে দিচ্ছেন এই বলে যে :

> আমি তোদের শত্রু নই—
> জাতে হিন্দুর ছেলে আল্লা বলে করি শমনজয়ী।

গর্বিত আত্মতুষ্টিতে গেয়ে ওঠেন :

> নাই মান অপমান আমার—
> মান রাখে যদি আল্লাহাদি পরোয়ার [তত্ত্বাবধায়ক]
> ওরে হক্ পথেতে ভয় কি যেতে
> হুকুম আছে হক্‌তালার।।

এখন অনায়াসে হক্-হকিকতের কথা বলছে যে মানুষ, আল্লার ওপর এত যার মতি, সেই মানুষটিকে কি আমরা অনুধাবন করব না? বুঝব না তার জীবনের গতিপথপরিক্রমার বৃত্ত? কুবের নামটা নাহয় নদে জেলার স্বাভাবিক স্বরসংগতির টানে হয়ে গেল কুবির, কিন্তু দেশে দেশে কবিদারি করে বেড়াতে বেড়াতে কুবিরের গানের ভাণ্ডার যে ভরে উঠল নানা ধরনে ও বিন্যাসে। উচ্চারণের অভিনবত্বে হিন্দুমুসলিম সমতাবোধ থেকে উৎসারিত হল 'পিতা আল্লা মাতা আহ্লাদিনী। মর্ম বোঝা হল ভার'। আরেক ধাপ এগিয়ে ফুটল আরেক মহৎ গীতবাণী : 'আল্লা আল্‌জিহ্বায় থাকেন। কৃষ্ণ থাকেন টাক্‌রাতে'। তা হলে কী চমকপ্রদ এমন উপলব্ধি কুবিরের হয়েছিল যে আমাদের সব শব্দবন্ধের উচ্চারণ স্পষ্ট হয়ে আসছে আল্‌জিহ্বা আর টাক্‌রার যৌথ প্রয়োগে, আল্লা ও কৃষ্ণকে একসঙ্গে মেনে?

ভাষ্য করতে গিয়ে সেই একটা পুরোনো বুলি হয়তো বলব আমরা: হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয় সাধনা। এ কথাটা বলা সোজা, বোঝা কঠিন। বুঝতে গেলে জানতে হবে কুবিরের দেশকাল ও সমাজ, অর্থাৎ নিম্নবর্গের সমাজ। কিন্তু তার আগে জানতে হবে একটা ভৌগোলিক পরিধি। ১৮৭১ সালে নদীয়া জেলার মোট ভূমিপরিমাণ ছিল ৩,৪১৪ বর্গমাইল (এখন মাত্র ১,৫১৪.৯ বর্গমাইল দেশভাগের ফলে)। তার মানে

নদীয়ার মধ্যে ছিল বর্ধমান, চব্বিশ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, হুগলি ও যশোহরের খানিক খানিক অংশ। একেই বলা যাবে লালন শাহ আর কুবিরের নদীয়া। নাম দুটি পাশাপাশি উঠে এল এইজন্য যে মানুষ দুজন সমকালীন এবং ধাম তাঁদের ভৌগোলিকভাবে খুব কাছাকাছি। কুষ্টিয়া আর চুয়াডাঙা, পাশাপাশি দুটি মহকুমা। ছেঁউরিয়া থেকে ঘোষবিলা হাঁটাপথে এক সূর্যাস্তে পৌঁছনো যায়। তখনকার কালের বাউল ফকির উদাসীন আর গাহকরা তো পরিযায়ী পাখির মতো ঢুঁড়তেন গাঁয়ের পর গাঁ, লালন নাকি ঘুরতেন ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে। পাগলা কানাই (১৮০৯-৮৯) লালন-কুবিরের সমকালীন মানুষ, ঘুরে বেড়াতেন 'ধুয়োজারি' গান গেয়ে নদে যশোরের গাঁয়ে গাঁয়ে। ওদিকে নদে-চব্বিশ পরগনার সীমানা ছোঁয়া গাঁ ছিল মুরৎপুর-ঘোষপাড়া। সেই ঘোষপাড়ার দুলালচাঁদ পাল (১৭৭৬-১৮৩৩) লালশশীর ভণিতায় ভাবের গীত লিখতেন গাইতেন। কুবিরের যাতায়াত বিল ঘোষপাড়ায়। লালশশীর কাছে। লালশশীর কর্তাভজা ঘর আর কুবিরের সাহেবধনী ঘরে ভাব ও ক্রিয়াকরণের অনেক মিল ছিল। লোকধর্মের এই দুটি ঘরই পত্তন দিয়েছিলেন আঠারো শতকে দুই মুসলিম উদাসীন। আউলেচাঁদ থেকে কর্তাভজা, সাহেবজানি থেকে নাকি সাহেবধনী। দুতরফেই নিরাকারের সাধনা, ফকিরি ধাঁচ আর দ্ব্যর্থবহুল গানের গড়ন। দু তরফেই আজও রয়েছে হিন্দু মুসলিম অভেদবাদ। হিন্দুর মুসলিম শিষ্য, মুসলমানের হিন্দু শিষ্য। জাঁতপাঁতের বিচার নেই, উপাস্য হল মানুষ। কোনো ধর্মীয় অঙ্গচিহ্ন বা পোশাক নেই। কুবির যে-সাহেবধনী ঘরের শিষ্য ছিলেন সেই ঘরের গুরু এখনও চৈত্র মাসের কৃষ্ণা একাদশীতে অগ্রদ্বীপের মেলায় বসেন মাথায় চাদরের ঘোমটা ঢেকে, হাতে থাকে ফকিরি দণ্ড অর্থাৎ খাঁটি সুফি ধরনধারণ। কর্তাভজা আর সাহেবধনীদের মিলমিশ আর ক্রিয়াকরণ· গুহ্য মন্ত্রের সাযুজ্য বুঝেই বোধ হয় কুবির বলেছিলেন

একটি বৃক্ষের দুটি শাখা বেদবিধিতে নাইকো লেখা
সাধকে পায় দেখা অন্তঃপুরী।
জঙ্গীপুর ঘোষপাড়া সত্য কুবির বলে সত্য সত্য
শ্রীচরণ ধরি।।

লালশশী আর কুবিরের লোকধর্ম অবৈদিক, সাধকের মনের অন্তঃপুরে গোপ্য হয়ে আছে দুই ধর্মের মর্মরস— তা হল সত্য বা হক্। সেই সত্য জানতে হবে মানুষ ধরে। সাহেবধনীদের উদ্‌ভব জঙ্গীপুরে, কর্তাভজাদের ঘোষপাড়ায়। দুটোই সত্য পথ এবং আসলে একই বৃক্ষের দুটি শাখা। কিন্তু কী সেই বৃক্ষ? কেমন তার স্বরূপ? কোথায় তার শিকড়? সেই কথাটা সাঠিকভাবে বুঝতে গেলে আমাদের আগে জেনে নিতে হবে বাংলার লোকায়ত নিম্নবর্গের উপধর্মের জাত ও প্রকৃতি।

ভারতবর্ষের তাবৎ উপাসক সম্প্রদায়কে দুভাগে ভাগ করে ফেলা যায়— অভিজাত আর লোকায়ত। অভিজাত বলতে হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান শিখ জৈন পারসীকদের মতো বড়ো বড়ো ধর্ম। যাঁদের উপাসনাগৃহ আছে, আছে উপাসনা পদ্ধতি ও গ্রন্থ, শাস্ত্র ও মন্ত্র। জন্ম থেকে জীবৎকালব্যাপী নানা ধর্মীয় অনুজ্ঞা ও শাসন, এমন-কি মৃত্যু উপলক্ষীয় রীতিপদ্ধতির স্বাতন্ত্র্য। উপাস্যের ধারণাটি স্পষ্ট এমন-কি অনেকক্ষেত্রে মূর্তিকৃত। জীবনের সৃষ্টি ও পরিণাম তাঁদের শাস্ত্রভুক্ত। কোনো কোনো ধর্ম মানে জন্মান্তরকেও। শাস্ত্র, শাস্ত্রী ও লোকাচার ঘিরে মস্ত পরিসরে গড়ে উঠেছে অভিজাত ধর্মগুলির বনিয়াদ, হয়ে উঠেছে প্রতিষ্ঠান। ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ ও আত্মশ্রেষ্ঠতার অহংকার এঁদের পরস্পরের মধ্যে এনেছে ঘনিষ্ঠ বিভাজন ও যুযুধান সম্পর্ক। চিরকালীন ভারত-ইতিহাসের বাস্তবতা এঁদের হানাহানি, অবিশ্বাস আর আশঙ্কায় বারেবারে কেঁপে উঠেছে। তবু এঁরাই আমাদের সমাজে ও সংস্কৃতিতে সংখ্যাগুরু, নিয়ন্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক গুরুত্বে সবচেয়ে গণনীয় শক্তি। এ-সবের পাশে লোকায়ত ধর্ম যেন গ্রামের পাশের জীবনদায়ী জলস্রোত। সমুদ্র বা নদীর মতো হয়তো স্পষ্ট বা পরিব্যাপ্ত নয়, কিন্তু বহতা। ক্ষীণ কিন্তু আত্মীয়বন্ধনে উদার।

লোকধর্মের সঙ্গে নিম্নবর্গের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। তার একটা কারণ আমাদের গ্রামীণ সমাজ-বিন্যাসে নিম্নবর্গ প্রায়ই অচ্ছুৎ অস্পৃশ্য দলিত, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'মানহারা' ও 'ব্রাত্য'। অভিজাত ধর্মের শক্তপোক্ত আচ্ছাদন নেই তাঁদের মাথায়, নেই উচ্চবর্গের মতো জীবনযাপনের ধর্মগত সংঘশক্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চিন্ততা। তাই তাঁরা নিজেরাই বানিয়ে নিয়েছেন নিজেদের জীবনবিশ্বাসের ছকে লোকধর্ম বা উপধর্ম। অভিজাত ধর্মীয়তার দৃষ্টিতে তাঁরা 'উপসম্প্রদায়' বা 'অপসম্প্রদায়'। কিন্তু কী করা যাবে? নদী যদি গ্রামবর্তী না থাকে তবে গ্রামবাসী বিল বাওড় দিঘি খাল আর সোঁতাতেই বানায় নদীর প্রতিমা। এভাবেই গড়ে ওঠে উপধর্ম। কর্তাভজা বা সাহেবধনী, লালনপন্থা কিংবা বলাহাড়ির মতবাদ, পাটুলিস্রোত কিংবা রূপকবিরাজী সহজিয়া। এভাবেই এককালে জেগেছে নাথপন্থ কিংবা বঙ্গীয় ফকিরি দরবেশি ধারা। সমাজস্তরে এসে গেছে জাতবৈষ্ণব এবং তন্ত্রবিশ্বাসী হঠযোগীরা। সবটাই দ্রোহ থেকে নয়, অনেকটাই অসহায় মানুষের পথসন্ধানের আর্তি যেন। ইতিহাসের খাতিরে এ কথাও কবুল করা উচিত যে, লোকধর্মের ধরতাই যে অন্যতর পথে অনেকসময় তাতে এসে যায় উচ্চধর্মের নকল। গুরুই তখন সেজে বসেন দেবতা। তাঁকে প্রণামী ও খাজনা দিতে হয়। গুরুপাট হয়ে ওঠে তীর্থ। গুরুবাক্য হয় মন্ত্রোপম, অমোঘ। নিরাকার উপাস্য ক্রমে বিগ্রহরূপ পান ত্রিশূল বা ফকিরিদণ্ডের বস্তুকাঠামোয়। তাতে তেলসিঁদুরের মার্জনা পড়ে। তৈরি হয় একটা পুরানো বিন্যাসের নতুন ছক : গুরু ও শিষ্য, মুর্শিদ ও মুরিদ। উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গ আরেক ধরনে। কিন্তু সে তো অনেক পরে। প্রথমে লোকধর্মের সূচনা ঘটে এক চমকপ্রদ সমতাবোধে, শ্রেণীজাতিহীন মিলনস্বপ্নের তাপে। একজন উর্ধ্ব চেতনার মানুষ প্রবর্তক রূপে এগিয়ে আসেন। যেন ত্রাতা বা দিশারী। দলিত শোষিত মন্ত্রবর্জিত একদল মানুষ পেয়ে যান মানবস্বীকৃতি ও বিশ্বাসের বিশ্ব। পাঁচশো বছর আগে চৈতন্যদেব ছিলেন এই রকম একজন প্রবল দিশারী। বাংলার সব-কটি গৌণ ধর্ম চৈতন্যকে আলাদা মর্যাদা দেয়। শাস্ত্রের বদলে তিনি স্থাপন করেছিলেন মানবতাকে। মন্ত্রের বদলে গান।

লোকধর্মের দুটি সম্বল— ইহলোক ও দেহধর্ম। তাই মানুষই তাদের জিজ্ঞাসা ও প্রাপ্তিবস্তুর সারাৎসার। কুবির গেয়েছেন :

এই মানুষে করো রে বিশ্বাস
এই মানুষ জেনো সত্য-নির্যাস

এ কথার সম্প্রসারণে তাঁর ভাষ্য :

মানুষ হয়ে মানুষ মানো
মানুষ হয়ে মানুষ জানো
মানুষ হয়ে মানুষ চেনো
মানুষ রতনধন।

মানুষের দিকে ঝোঁক দিলেই আর অলৌকিক ও পরলোক বিশ্বাস থাকে না। টেঁকে না জন্মান্তর তত্ত্ব। ইহসর্বস্ব বেদনাখিন্ন ব্যাধিবিপন্ন ক্ষুৎকাতর জীবনে বড়ো হয়ে ওঠে মানুষ, অর্থাৎ মানবিক প্রশ্ন। তখন শাস্ত্র দেবতা মন্দির- মসজিদ-বিগ্রহ-মন্ত্র ও পুরোহিত মৌলানার অস্তিত্ব নগণ্য হয়ে ওঠে। প্রধান হয় মানুষের করণ। সে করণ কেমন? কুবিরের মতে :

মানুষের করণ করো—
এবার সাধনবলে ভক্তির জোরে মানুষ ধরো।
হরিষষ্ঠী মনসা মাখাল
মিছে কাঠের ছবি মাটির ঢিবি সাক্ষীগোপাল
বস্তুহীন পাষাণে কেন মাথা কুটে মর?

মানুষে কোরো না ভেদাভেদ
মানুষ সত্যতত্ত্ব জেনে মানুষের উদ্দেশে ফেরো।

হরিষষ্ঠী মনসা বা মাখাল হল নানা বর্গের কুসংস্কারের উপদেবতা। কুবিরের সমসময়ে নিম্নবর্গের মানুষজন এসব উপদেবতায় আচ্ছন্ন ছিল। হরিষষ্ঠী পুজো হত কাঁচা ঘটে, মাখাল পুজো হত মাটির ঢিবি বানিয়ে। এরই নাম ঘটে পটে পুজো। কুবির এ সমস্তকেই নিন্দা করেছেন এবং বলেছেন দেবতা মুর্তি যেন বস্তুহীন পাষাণ। তা হলে বস্তু কী? বস্তু হল দেহ এবং মাটি। দেহের রজবীর্য সমন্বয় এবং মাটির শস্যবীজ সম্ভাবনা। এই দুই নিয়ে জীবন। সেই জীবনে প্রবাহিত জলে মাছ ও কুমিরের আনাগোনা, দেহ খাঁচায় প্রাণ পাখির যাতায়াত, দেহজমিনে বস্তুনিষেকের সত্য ধরা আছে। বৈরাগ্য নেই একেবারে। কল্পনার স্থান খুব কম। কারণ তাঁদের মতে 'যাহা দেখি নি নয়নে তাহা ভজিব কেমনে?' অনুমানের কষ্টকল্পনা (যেমন কৃষ্ণরাধা বৃন্দাবন ব্রজ স্বর্গ নরক নামাজ রোজা) ছেড়ে আচরণবাদের দেহগত স্পষ্টতায় বর্তমানের সাধনা লোকধর্মে সর্বদা সমাদৃত। তাই তাঁরা পরলোকের বদলে ইহলোক, বিদেহী দেবতার চেয়ে দেহযুক্ত মানুষ এবং অনুমানের সাধনার চেয়ে বর্তমানের সাধনায় মশগুল। এই সব বিশ্বাস তাঁরা ব্যক্ত করেন গানে।

উচ্চবর্গের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম সম্প্রদায় যেখানে রচে শাস্ত্র ও মন্ত্র, নিম্নবর্গের লোকধর্ম সেখানে সব-কিছু বোঝাতে চায় গানে গানে। গান কেন, সে কথা বোঝান রবীন্দ্রনাথ এইভাবে যে,

> শাস্ত্রের যে-ভগবান ধর্মকর্মের ব্যবহারে লাগেন, যিনি সনাতনপন্থী ধর্মের ভগবান, তাঁকে নিয়ে আনুষ্ঠানিক শ্লোক চলে; তাঁর জন্যে অনেক মন্ত্রতন্ত্র; আর যে-ভগবানকে নিজের আত্মার মধ্যে ভক্ত সত্য করে দেখেছেন, যিনি অহৈতুক আনন্দের ভগবান, তাঁকে নিয়েই গান গাওয়া যায়।

এইজন্যেই সন্তসাধকদের ধারায় আঠারো-উনিশ শতকে লালন বা কুবির গান লিখেছেন। সন্তসাধকদের সকলেই ছিলেন বৃত্তিজীবী— কবীর জোলা, নামদেব ছিপি (বস্ত্ররঞ্জক), দাদূ ধুনুরি, রজ্জব মদ্যবিক্রেতা, শুক্লহংস রজক। লালন বাস করতেন জোলা কারিকর পাড়া ছেউরিয়ায়, তাঁর গুরু সিরাজ সাঁই ছিলেন পাল্কি বেহারা। গগন ছিলেন ডাকহরকরা। কুবির ছিলেন ষোগী-তাঁতি। নিম্নজাতি বা অভিজাতদের চোখে হীনবৃত্তি ওসব দেহাত্মবাদী ভাবসাধকদের জীবনে কোনো প্রতিবন্ধ রচনা করে নি, বরং জগৎ ও প্রবাহিত সমাজ-বিন্যাসের সঙ্গে দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক এঁদের-করে তুলেছে বহুদর্শী ও বস্তুমুখী। শাস্ত্রবিরোধিতা, জাতিভেদবর্জন এবং হিন্দু-মুসলিম মিলনের সূত্র এঁদের যাপনে সত্য হয়ে উঠেছিল।

যারা বুদ্ধি ও পুঁথিপড়া বিদ্যা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে এবং যারা দেহচালনার মধ্যে দিয়ে জীবিকা ও জীবন ধারণ করে তাদের জীবনদর্শনে মনের ফারাক থাকে। দেহের শক্তিতে যে নৌকা টানে মাছ ধরে, শরীর দিয়ে যে চাষ করে শস্য ফলায়, দেহজ শ্রমে যে লোহার দ্রব্য গঠন করে আর হাতের টানে যে টানাপোড়েনের বস্ত্র বোনে তারা বিশ্বকে দেখে অনেক স্পষ্টতায় ও স্বচ্ছবোধে। সেইজন্যে লোকায়ত গানে ভাববিলাস কম, যাপনের তাপ বেশি। বস্তু বা উপাদান ব্যবহার এবং তার রূপান্তর স্বহস্তে সাধন করা একটা প্রত্যক্ষ সত্য। তুলো থেকে সুতো, সেই সুতো থেকে বস্ত্রবয়ন, তাকে রঙ করা যেন এক পরম্পরাময় নির্মিতি যার প্রতিটি স্তর পেরিয়ে তবে পূর্ণতা। লোকায়ত ধর্মসাধনাও তেমনই স্তরান্বিত প্রবর্তক-সাধক-সিদ্ধ। ভালো তাঁতি হতে গেলে ভালো ওস্তাদের কাছে হাতে কলমে শিখতে হয়, কায়াসাধনাতেও তেমনই গুরু বা মুর্শেদ লাগে। এত সব বিভাজন ও স্তর যে পার হয়ে আসে তার মনের পক্কতা হয় গাঢ় ও গুহ্য— তখন তার চেতনায় যেমন বস্তুর ভেদাভেদজ্ঞান লোপ পায় তেমনই মানুষ সম্পর্কে শ্রেণীবর্ণজাতি সংকীর্ণতা কেটে যায়। রক্ত বা রজবীর্যের আদি উপাদানে সব মানুষেরই গঠন এ কথা যারা বোঝে তারা কায়াবাদী সাধনায় এটাও বোঝে যে আদি উপাদানের কোনো জাতি নেই— তা হিন্দু ও মুসলমানে সমানভাবে বহমান। ধর্ম

ও জাতিবোধ তাদের কাছে বাহ্য, মুখ্য হল রজবীর্য এবং তাদের ধারক প্রকৃতি ও পুরুষ। জাতি বলতে লোকায়ত বর্গের মানুষরা হিন্দু বা মুসলিম বোঝে না। তাদের মতে বা বিশ্বাসে জাতি মোট দুটি—পুরুষ ও নারী। কুবির এ কথাটাই বলেছেন সহজভাবে—

হল যুগলেতে জন্ম সবার
মর্ম বোঝো মহাশয়।

পুরুষ ও নারীর সমন্বয়ে সব মানুষের জন্ম তাই সব মানুষ আসলে এক। এই বিশ্বাস অম্লান ছিল বলে কুবির লেখেন :

একের সৃষ্টি সব পারি না পাকড়াতে
আল্লা আলজিহ্বায় থাকে আপ্তসুখে
কৃষ্ণ থাকে টাকরাতে।
মুসলমানের আল্লাতালা
হিন্দুর ব্রহ্মাবিষ্ণু ভাবে বিভোলা
এক ঘরে খেলা করে পিঁজরাতে—
খানা দানা পানি একই জানি
বিরুদ্ধ হয় ফুকরাতে।

ফুকরানো বা উচ্চারণ ঘটিত তফাত ছাড়া আল্লা ও কৃষ্ণ এক। একে বলা হয় শব্দ ভেদে ঠেলাঠেলি, প্রকৃত ভেদ নয়। আরেক গানে কুবির অপধর্মগত আচরণকে নিন্দা করেছেন—

হিন্দু আর যবনের করণ বলব এখন কায়—
এরা আসল ছেড়ে নকল ভজে ঠিক পাগলের প্রায়।

আসল ছেড়ে নকলভজা কেমন? যথা, মুসলমানরা—

ত্যেজে আল্লা নবী কী আজগুবি
শাহ সুবির দর্গাতে যায়।
দেয় খোদার নামে লবডঙ্কা সালাম করে
গাধার পায়।

খোদ আল্লাকে ভজনসাধন না করে দর্গাতলায় হত্যে দেওয়া বা শীতলা পুজো করা হল নকলভজা। আর হিন্দু?

হিন্দুর অসংখ্য ঠাকুর যেন পাদাড়ে ভাসুর
নেংটা হয়ে ঘোমটা টানে লজ্জাতে প্রচুর।
এরা নিজপতি চেনেনাকো উপপতির গুণ গায়।

এই হিন্দুর হাবা পূজে দেবী আর দেবা
জন্মেছে যা হতে তারে বলে না বাবা।

মূল উপাস্য ছেড়ে উপদেবতা পুজোকে নিন্দা করেছেন কুবির। মানুষ 'যা হতে জন্মেছে' অর্থাৎ পিতৃবস্তু তাকেই তো দেহে কায়েম করার সাধনা কায়াবাদীদের। দেবদেবী মন্ত্রতন্ত্রের ভাঁকে সেই কথাটাই হারিয়ে যায়। কুবির হিন্দুর পৌত্তলিকতা এবং তাঁর সমসাময়িক ইসলামের লৌকিক অন্ধ কুসংস্কার সম্পর্কে সমান সরব ও নিন্দক তার কারণ যে-সাহেবধনী মতে তাঁর মতি ছিল সেই দলে হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ই সমান সমান ছিল। ভ্রান্তি ঘোচাতে তাই দুদলকেই সতর্ক করেন তিনি। তাঁর বহুদর্শী চোখে ধরা পড়ে কিছু

সার সত্য। সাধারণ মানুষের ধর্মপালনের কৃত্য সম্পর্কে বিদ্রূপ মিলিয়ে লেখেন :

মধ্যবিত্ত যবনেরা পান্ত ভাতে আপনি মরা
পেটের জন্যে খেটে সারা হয় পরিবারের তরে
বলে সেবার সময় আল্লা রসুল পেট ভরে ঘুম মারে।
ফরাজিরা রেখে দাড়ি ওজু করে ঘড়ি ঘড়ি
নামাজ পড়ার হুড়োহুড়ি যার যেমন ভাব অন্তরে
পড়ে আল্লা হামদা মাসুদ ভয়ে মাথা কুটে মরে।

খেটে খাওয়া সাধারণ মুসলমান আর মৌলবাদীদের ধর্মাচরণের দুমুখো ধরন এ-বর্ণনায় নিখুঁত। বোঝা যায় কুবির মানুষটি ছিলেন চোখ-কান-খোলা, প্রাজ্ঞ ও রসিক। সেইসঙ্গে সমসাময়িক দেশকালপাত্র এবং দেশের পরিবর্তমান সমাজকম্পন তাঁর মনের গহনে ঘা দিয়েছিল। নদে জেলায় তাঁর সময়ের নীলচাষের ভয়ংকরতা প্রত্যক্ষ করে তাঁর উপলব্ধি সুভাষণ অলংকারে সাজিয়ে বলেছেন :

এবার নীল এসে নীলকণ্ঠ বেশে ব্রহ্মাণ্ড বশ করে নিলে।
নীলের জ্বালায় যাব কোথায়
নীলে সব ভিটের ঘুঘু চরিয়ে দিলে।

একই মানুষ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে শনাক্ত করে বলেছিলেন : 'সাতসমুদ্র পার হয়ে বাংলায় রাক্ষস এল'। তাদের উদ্দেশ্য বিষয়ে কুবিরের মন্তব্য :

সবাই বিলাত হতে এই বাংলাতে
সাধু সওদাগিরি করতে এসেছে।

কিংবা,

বাংলার শুভ হয় যখন
বিলাতের কোম্পানি যেমন
হুকুম দেয় 'লুটে আন গা যা আছে ঘরে'

এ তো কুবির কবিদারের সরস পদ্য নয়, এ যে বেদনাবিহ্বত একজন পরাধীন জাতির সচেতন মানুষ। নীলচাষ আর ভূমিশোষণের নানা নিম্নবর্গীয় জীবনের নমুনা তাঁর ভ্রাম্যমাণ গ্রামপথপরিক্রমায় স্মৃতিবদ্ধ হয়েছিল। নিজের চঞ্চল মন সম্পর্কে কুবির লিখেছেন :

মন কভু করে জমিদারি
কভু করে পাটোয়ারি হালসানা চৌকিদারি।
কভু নীলকুঠির দেওয়ান হয়ে মাঠে মাঠে বেড়ায় ঘুরে।

এমন উপমা-সন্নিবেশ থেকে বোঝা যায় লালন-সমকালীন এই গ্রাম্য গীতিকার এখনও অনেকটা অবজ্ঞাত রয়ে গেছেন বৃহত্তর বাঙালি পাঠকসমাজে। এত সমৃদ্ধ তাঁর অভিজ্ঞতা, এত তির্যক আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি, এত যথাযথ সমাজপ্রেক্ষণ তাঁর সময়ের (১৭৮৭-১৮৭৯) আর কোন্ গ্রামীণ গীতিকারের আছে? নেই, এবং সেজন্যেই কুবির আমাদের মনোযোগ ও আলোচনা দাবি করেন বেশি করে।

কুবিরের ১২০৯ খানি গান লিখিতরূপে পাওয়া গেছে। সেই গানের খাতা ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা গানে চোখ আটকে গেল। গানের ধরতাই ভারি নিরীহ্ রকমের। যেমন :

পাকা রাস্তা রেলের উপর চলে যায় কলের গাড়ি—
হাবড়া আর হুগলি যেতে বেলা হয় না একঘড়ি।

পথে-হাঁটা ঘোষবিলা গাঁয়ের কুবির এবারে শামিল হয়েছেন নগর সংস্কৃতির কলে বলে। এটাও লক্ষ করার

জিনিস যে গ্রাম্য গানে নৌকা, ডিঙি, জমি, ঘানি, তাঁত, রথ, খাঁচা, মাছ ও পাখির চিরাচরিত রূপক ভেঙে ক্রমে এসে গেছে কল, রেলের গাড়ি, ধোঁয়া আর যন্ত্র- উৎপাদিত বস্তুর বিবরণ। কুবিরের কী অনুপুঙ্খভাবে দেখা আর দেখানো :

রেলের গাড়ি ডেঙায় চলে—
ধোঁয়ার জাহাজ চালায় জলে হায় রে
আসমানে ফনাস জ্বলে।
উপরে পতঙ্গ ঘুড়ি—
বাঙালি রেখে বশ করে কলে লুটে নিল ধন কড়ি।
তার টাঙানো বাংলা জুড়ে বসে খবর নিচ্ছে ঢুড়ে

ক্রমে ক্রমে কলের বহু রকমের ব্যবহার কুবিরের চোখে পড়ে যায়। যেমন :

কলের সুতোয় কাপড় বুনে—
কলেতে জল তুলছে টেনে হায় রে
কলেতে ধান্য ভানে গম পিষে কলে গুড়ি।
কলে টাকা পয়সা কাগজ তৈয়ার
কলেতে পাকায় দড়ি।
কলে করলে জব্দ জমি
নদনদী পুষ্করিণী ভূমি হায় রে
রাখলে না বেশি কমি
এমনি ইংরাজের খড়ি।

গানের শেষে চরম উপলব্ধি

চোদ্দ পোয়া ধরের মাঝে
বিচার করে বুঝে বুঝে হায় রে
কল করেছে ইংরাজে ঘুরতেছে বত্রিশ নাড়ি।

নিম্নবর্গজাত কুবিরের লোকায়ত চৈতন্য এবার একটা বড়ো ধরনের ঝাঁকি খেয়ে গেছে। মানুষটা আর নিজেকে কি বলতে পারবেন 'আমি সন্ন্যাসী উদাসীন'?

আমি কুবির দীনহীন, আমি কুবির কবিদার, আমি সন্ন্যাসী উদাসীন— এমন সব পরিচয় তিনি গেঁথে গেছেন গানে। সত্যিই তাঁর জীবনপরিচয় ভারি অন্যরকম। ঘোষবিলার যোগীতাঁতি জাতব্যবসায় ছেড়ে কবিদারি করতে করতে পৌঁছে গেছেন মেহেরপুর মহকুমা। সেখান থেকে ভৈরব নদী পেরিয়ে এসেছেন তেহট্ট— বেতাই গ্রামে। তখনকার কালের সম্পন্ন গ্রাম। পাশে প্রবাহিণী জলঙ্গী নদী। তেহট্টের মন্দিরে কৃষ্ণরায়ের বিগ্রহ, মন্দিরের গায়ে টেরাকোটা কাজ। বেতাই গ্রামে রয়েছে মস্ত নীলকুঠি, আজও। এইখান থেকে সম্ভবত জলঙ্গী নদীর জলপথে কুবির চলে আসেন লক্ষ্মীগাছা-বৃত্তিহুদা-তালুকহুদা। হঠাৎ এ অঞ্চলে কেন? কারণ মানুষটার মধ্যে তখন থিতু হবার বাসনা জেগেছে এবং পেয়েছেন একজন ভারসাধকের বার্তা। তাঁর নাম চরণ পাল(১৭৪০-১৮৫০)। চরণ পালের পিতৃপিতামহের বাস্তু ছিল জলঙ্গী নদীর পশ্চিমে দোগাছিয়া গ্রামে। তিনি নদী টপকে পুবের গ্রাম বৃত্তিহুদায় পাতলেন নতুন বাস্তু। চরণ ছিলেন গোপ জাতীয়। অঢেল জমি তাঁর । বিত্তবান। কিন্তু তাঁর মূল বিত্ত ছিল সাধনার জীবন। তিনি ছিলেন গৌণ লোকধর্ম সাহেবধনী ঘরের গুরু। সাহেবধনীদের উপাস্যের নাম দীনদয়াল বা দীনবন্ধু। চরণ পালের বৃত্তিহুদা গ্রামের বাস্তুবাড়িকে এখনও বলে সবাই পালবাড়ি, সসম্ভ্রমে। এই পালবাড়িতেই দীনদয়ালের ঘর। দীনদয়ালের

গুহ্যমন্ত্রে যাঁরা দীক্ষিত তাঁদের বলে সাহেবধনী। কবি এই দীনদয়ালের নাম শুনে চরণ পালের নানা ঐশী শক্তির টানে বৃত্তিহুদা চলে আসেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব নেন। চরণের আরও কজন নামকরা শিষ্যসেবক ছিল কিন্তু কুবির হলেন তাঁর সেরা শিষ্য, কারণ দীনদয়ালের ঘরের যা সার সত্য তাকে কুবির রূপ দিয়েছেন গানে গানে। তাঁর সব গানে ভণিতায় আছে গুরুচরণের নাম। এইভাবে চরণ চিরজীবী হয়ে গেছেন কুবিরের গানে, সিরাজ সাঁই যেমন লালনের গানে। আজ এই নব বঙ্গ শতাব্দীর সূচনায় বৃত্তিহুদা গাঁয়ে গেলে দেখা যাবে চরণ পালের মস্ত বড়ো বাস্তুবাড়ির ভগ্নদশা। শরিকে শরিকে বিবাদ বিসংবাদ। কিন্তু সাধারণ মানুষের দীনদয়ালের ওপর আস্থা ও বিশ্বাসের অবসান ঘটে নি। তেমনই বেঁচে আছে কুবিরের গান, সাধক বাউল ফকিরদের কণ্ঠে।

চরণ পালের চরণতলে কুবিরের ভ্রাম্যমাণ জীবনের অবসান ঘটেছিল। বাকি জীবন গুরুর আশ্রয়ে গান বেঁধে আর গান গেয়ে তিনি কাটিয়ে দিয়েছিলেন। গুরুপাটের কাছেই গড়েছিলেন তাঁর বাস্তুভিটা। সেখানে এখনও রয়েছে তাঁর উত্তরপুরুষ। ভিটেয় রয়েছে কুবিরের সমাধি এবং তাঁর স্ত্রী ভগবতী এবং সাধনসঙ্গিনী কৃষ্ণমোহিনীর সমাধি, গায়ে গায়ে। নির্ভরযোগ্য তথ্য অনুযায়ী এতটাও জানা যায় যে কুবিরের তিরোধান ঘটেছিল ১২৮৬ বঙ্গাব্দের ১১ আষাঢ় মঙ্গলবার রাত চারদণ্ডে শুক্লপক্ষে ষষ্ঠী তিথির মধ্যে। ভগবতীর মৃত্যু ঘটে ১২৯৭ বঙ্গাব্দের ২৯ শ্রাবণ বুধবার কৃষ্ণপক্ষ দ্বিতীয়ায়। কৃষ্ণমোহিনীর মৃত্যু ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ১৪ আষাঢ় বুধবার ত্রয়োদশীতে। মৃত্যু সংক্রান্ত এত অনুপুঙ্খ পাওয়া যায় বৃত্তিহুদাতেই লিখিত আকারে। কুবিরের প্রত্যক্ষদর্শী বৃত্তিহুদার অরুণ দাস তাঁর শতাব্দী-উত্তীর্ণ স্মৃতি থেকে আমাকে ১৯৬৮ সালে বলেছিলেন, 'গোঁসাইয়ের ছিল নাভি পর্যন্ত লম্বা দাড়ি, গম্‌গম্‌ করে গান গাইত'।

গোঁসাই কথাটা শুনে খটকা লেগেছিল। পরে দেখলাম এখানকার বৃত্তিহুদায় মানুষটার পরিচিতি কুবির গোঁসাই নামে। তাঁর শিষ্যের নাম যাদুবিন্দু গোঁসাই, নিবাস পাঁচলখি, বর্ধমান। আর-এক শিষ্য বৃত্তিহুদার রামলাল ঘোষ। এ খবর থেকে বোঝা গেল কুবির কিছু মানুষকে দীক্ষা দিয়ে শেষ বয়সে সেজেছিলেন গুরু গোঁসাই। চমৎকার! ভ্রাম্যমাণ কবিদারির অনিশ্চিত জীবিকা বৃত্তিহুদায় এসে সুনিশ্চিত বাস্তু ও জমি (পালেদের দেওয়া) পেয়ে শমিত হয়েছিল। এই থিতু জীবনেই তিনি নানারকমের গান লিখেছিলেন। তাঁর বহু দেখা শোনা জানা জীবনের নানা অনুভব ও বাস্তবতা চুঁইয়ে পড়েছে তাঁর গানে। তাঁর গানের মূল খাতাটা পাওয়া যায় নি। কিন্তু ১৩০০ বঙ্গাব্দে অনুলিখিত তাঁর শিষ্য রামলাল ঘোষের হাতে লেখা মোটা খাতায় ১২০৯ খানা গান এখনও অটুট। ষাটের দশকের শেষে সেই খাতা থেকে আমি বহু গান টুকে নিয়েছি। সেই সব গান পড়তে পড়তে কেবলই মনে হত এবং এখনও মনে হয় এমন একজন সুবেদি ও বহুমুখী দ্রষ্টা গ্রাম্য গীতিকার, দুর্ভাগ্য যে এখনও তাঁর সমাদর তো দূরের কথা, পরিচিতিই পান নি। তাঁর গানের বাণী, তার ভিতরকার সমাজসত্য ও সমন্বয়ী জীবনধারা এখনও আমরা অনুধাবন করি নি। ভাবলে অবাক লাগে কবে কতদিন আগে তাঁর মনে এমন খটকা লেগেছিল যে,

সৃষ্টিকর্তা এক নিরঞ্জন
হিন্দু যবন জাত নিরূপণ কীসের কারণ?

মধ্যযুগের মহাপ্রভুর জাতিবর্ণহীন ভাবসাধনা বিষয়ে কুবিরের নিজস্ব ভাষণ :

গৌর কি জাত বটে?
চাঁড়াল মালো বাগদী দুলে
পাটুনি আর তিয়র জেলে
কাদের ছেলে গৌর লম্পুটে?
কোন্‌ পরিবার বুঝতে নারি

কুবির কবিদারের জগৎ

সুধীর চক্রবর্তী

কবীর নানক দাদূ রজ্জব নামদেবের মতো কত মধ্যযুগের সন্ত সাধকের জীবনকাহিনী ও গান আমরা শুনেছি। সারা দেশে তাঁদের নাম ও গানের প্রসার প্রসিদ্ধি মান্যতা। তাঁদের কথা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহন থেকে কত মান্যবান মহাশয়গণ। আমরা আজ অনুধাবন করব কবেকার গ্রাম বাংলার একজন গাহক গীতিকারকে। কজনই বা জানেন তাঁর নাম বা পরিচয়। আর তাঁর গান? সে তো আজ কতদিকে ধান্যকণার মতো ছড়িয়ে গেছে ইতি-উতি, কুড়োনো কঠিন। ১৭৮৭ সালে জন্ম এই মানুষটির নাম কুবের সরকার। সাকিন চুয়াডাঙা মহকুমার আলমডাঙার ঘোষবিলা গাঁ, জিলা নদীয়া। জাতে যুগী, পেশা তাঁত বোনা। খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে কিন্তু কাল হল তার কবিত্ব। বসনদারি ছেড়ে কুবের ধরলেন কবিদারি, শুরু হল তাঁর দেশপরিক্রমা। গ্রাম থেকে গ্রামে গান গেয়ে বেড়ান। যার আদি অহংকার ছিল :

> ভালো কাপড় বুনতে জানি—
> চিরুনকোটা শালের বোটা ঢাকাই জামদানি।

নতুন পেশায় এসে এবার নতুন অহংকারে বলেন :

> আমার নাম কুবির কবিদার
> এই দেশে দেশে বেড়াচ্ছি করে রোজগার।

কবিগানের প্রতিপক্ষ গোলামজাদাকে তুড়ে দিচ্ছেন এই বলে যে :

> আমি তোদের শত্রু নই—
> জাতে হিন্দুর ছেলে আল্লা বলে করি শমনজয়ী।

গর্বিত আত্মতুষ্টিতে গেয়ে ওঠেন :

> নাই মান অপমান আমার—
> মান রাখে যদি আল্লাহাদি পরোয়ার [তত্ত্বাবধায়ক]
> ওরে হক্ পথেতে ভয় কি যেতে
> হুকুম আছে হক্‌তালার।।

এখন অনায়াসে হক্-হকিকতের কথা বলছে যে মানুষ, আল্লার ওপর এত যার মতি, সেই মানুষটিকে কি আমরা অনুধাবন করব না? বুঝব না তার জীবনের গতিপথপরিক্রমার বৃত্ত? কুবের নামটা নাহয় নদে জেলার স্বাভাবিক স্বরসংগতির টানে হয়ে গেল কুবির, কিন্তু দেশে দেশে কবিদারি করে বেড়াতে বেড়াতে কুবিরের গানের ভাণ্ডার যে ভরে উঠল নানা ধরনে ও বিন্যাসে। উচ্চারণের অভিনবত্বে হিন্দুমুসলিম সমতাবোধ থেকে উৎসারিত হল 'পিতা আল্লা মাতা আহ্লাদিনী। মর্ম বোঝা হল ভার'। আরেক ধাপ এগিয়ে ফুটল আরেক মহৎ গীতবাণী : 'আল্লা আল্‌জিহ্বায় থাকেন। কৃষ্ণ থাকেন টাক্‌রাতে'। তা হলে কী চমকপ্রদ এমন উপলব্ধি কুবিরের হয়েছিল যে আমাদের সব শব্দবন্ধের উচ্চারণ স্পষ্ট হয়ে আসছে আল্‌জিহ্বা আর টাক্‌রার যৌথ প্রয়োগে, আল্লা ও কৃষ্ণকে একসঙ্গে মেনে?

ভাষ্য করতে গিয়ে সেই একটা পুরোনো বুলি হয়তো বলব আমরা: হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয় সাধনা। এ কথাটা বলা সোজা, বোঝা কঠিন। বুঝতে গেলে জানতে হবে কুবিরের দেশকাল ও সমাজ, অর্থাৎ নিম্নবর্গের সমাজ। কিন্তু তার আগে জানতে হবে একটা ভৌগোলিক পরিধি। ১৮৭১ সালে নদীয়া জেলার মোট ভূমিপরিমাণ ছিল ৩,৪১৪ বর্গমাইল (এখন মাত্র ১,৫১৪.৯ বর্গমাইল দেশভাগের ফলে)। তার মানে

নদীয়ার মধ্যে ছিল বর্ধমান, চব্বিশ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, হুগলি ও যশোহরের খানিক খানিক অংশ। একেই বলা যাবে লালন শাহ আর কুবিরের নদীয়া। নাম দুটি পাশাপাশি উঠে এল এইজন্য যে মানুষ দুজন সমকালীন এবং ধাম তাঁদের ভৌগোলিকভাবে খুব কাছাকাছি। কুষ্টিয়া আর চুয়াডাঙা, পাশাপাশি দুটি মহকুমা। ছেঁউরিয়া থেকে ঘোষবিলা হাঁটাপথে এক সূর্যাস্তে পৌঁছনো যায়। তখনকার কালের বাউল ফকির উদাসীন আর গাহকরা তো পরিযায়ী পাখির মতো ঢুঁড়তেন গাঁয়ের পর গাঁ, লালন নাকি ঘুরতেন ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে। পাগলা কানাই (১৮০৯-৮৯) লালন-কুবিরের সমকালীন মানুষ, ঘুরে বেড়াতেন 'ধুয়োজারি' গান গেয়ে নদে যশোরের গাঁয়ে গাঁয়ে। ওদিকে নদে-চব্বিশ পরগনার সীমানা ছোঁয়া গাঁ ছিল মুরৎপুর-ঘোষপাড়া। সেই ঘোষপাড়ার দুলালচাঁদ পাল (১৭৭৬-১৮৩৩) লালশশীর ভণিতায় ভাবের গীত লিখতেন গাইতেন। কুবিরের যাতায়াত বিল ঘোষপাড়ায়। লালশশীর কাছে। লালশশীর কর্তাভজা ঘর আর কুবিরের সাহেবধনী ঘরে ভাব ও ক্রিয়াকরণের অনেক মিল ছিল। লোকধর্মের এই দুটি ঘরই পত্তন দিয়েছিলেন আঠারো শতকে দুই মুসলিম উদাসীন। আউলেচাঁদ থেকে কর্তাভজা, সাহেবজানি থেকে নাকি সাহেবধনী। দুতরফেই নিরাকারের সাধনা, ফকিরি ধাঁচ আর দ্ব্যর্থবহুল গানের গড়ন। দু তরফেই আজও রয়েছে হিন্দু মুসলিম অভেদবাদ। হিন্দুর মুসলিম শিষ্য, মুসলমানের হিন্দু শিষ্য। জাঁতপাঁতের বিচার নেই, উপাস্য হল মানুষ। কোনো ধর্মীয় অঙ্গচিহ্ন বা পোশাক নেই। কুবির যে-সাহেবধনী ঘরের শিষ্য ছিলেন সেই ঘরের গুরু এখনও চৈত্র মাসের কৃষ্ণা একাদশীতে অগ্রদ্বীপের মেলায় বসেন মাথায় চাদরের ঘোমটা ঢেকে, হাতে থাকে ফকিরি দণ্ড অর্থাৎ খাঁটি সূফি ধরনধারণ। কর্তাভজা আর সাহেবধনীদের মিলমিশ আর ক্রিয়াকরণ গুহ্য মন্ত্রের সাযুজ্য বুঝেই বোধ হয় কুবির বলেছিলেন

একটি বৃক্ষের দুটি শাখা বেদবিধিতে নাইকো লেখা
সাধকে পায় দেখা অন্তঃপুরী।
জঙ্গীপুর ঘোষপাড়া সত্য কুবির বলে সত্য সত্য
শ্রীচরণ ধরি।।

লালশশী আর কুবিরের লোকধর্ম অবৈদিক, সাধকের মনের অন্তঃপুরে গোপ্য হয়ে আছে দুই ধর্মের মর্মরস— তা হল সত্য বা হক্। সেই সত্য জানতে হবে মানুষ ধরে। সাহেবধনীদের উদ্ভব জঙ্গীপুরে, কর্তাভজাদের ঘোষপাড়ায়। দুটোই সত্য পথ এবং আসলে একই বৃক্ষের দুটি শাখা। কিন্তু কী সেই বৃক্ষ? কেমন তার স্বরূপ? কোথায় তার শিকড়? সেই কথাটা সাঠিকভাবে বুঝতে গেলে আমাদের আগে জেনে নিতে হবে বাংলার লোকায়ত নিম্নবর্গের উপধর্মের জাত ও প্রকৃতি।

ভারতবর্ষের তাবৎ উপাসক সম্প্রদায়কে দুভাগে ভাগ করে ফেলা যায়— অভিজাত আর লোকায়ত। অভিজাত বলতে হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান শিখ জৈন পারসীকদের মতো বড়ো বড়ো ধর্ম। যাঁদের উপাসনাগৃহ আছে, আছে উপাসনা পদ্ধতি ও গ্রন্থ, শাস্ত্র ও মন্ত্র। জন্ম থেকে জীবৎকালব্যাপী নানা ধর্মীয় অনুজ্ঞা ও শাসন, এমন-কি মৃত্যু উপলক্ষীয় রীতিপদ্ধতির স্বাতন্ত্র্য। উপাস্যের ধারণাটি স্পষ্ট এমন-কি অনেকক্ষেত্রে মূর্তিকৃত। জীবনের সৃষ্টি ও পরিণাম তাঁদের শাস্ত্রভুক্ত। কোনো কোনো ধর্ম মানে জন্মান্তরকেও। শাস্ত্র, শাস্ত্রী ও লোকাচার ঘিরে মস্ত পরিসরে গড়ে উঠেছে অভিজাত ধর্মগুলির বনিয়াদ, হয়ে উঠেছে প্রতিষ্ঠান। ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ ও আত্মশ্রেষ্ঠতার অহংকার এঁদের পরস্পরের মধ্যে এনেছে ঘনিষ্ঠ বিভাজন ও যুযুধান সম্পর্ক। চিরকালীন ভারত-ইতিহাসের বাস্তবতা এঁদের হানাহানি, অবিশ্বাস আর আশঙ্কায় বারেবারে কেঁপে উঠেছে। তবু এঁরাই আমাদের সমাজে ও সংস্কৃতিতে সংখ্যাগুরু, নিয়ন্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক গুরুত্বে সবচেয়ে গণনীয় শক্তি। এ-সবের পাশে লোকায়ত ধর্ম যেন গ্রামের পাশের জীবনদায়ী জলস্রোত। সমুদ্র বা নদীর মতো হয়তো স্পষ্ট বা পরিব্যাপ্ত নয়, কিন্তু বহতা। ক্ষীণ কিন্তু আত্মীয়বন্ধনে উদার।

লোকধর্মের সঙ্গে নিম্নবর্গের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। তার একটা কারণ আমাদের গ্রামীণ সমাজ-বিন্যাসে নিম্নবর্গ প্রায়ই অচ্ছুৎ অস্পৃশ্য দলিত, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'মানহারা' ও 'ব্রাত্য'। অভিজাত ধর্মের শক্তপোক্ত আচ্ছাদন নেই তাঁদের মাথায়, নেই উচ্চবর্গের মতো জীবনযাপনের ধর্মগত সংঘশক্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চিন্ততা। তাই তাঁরা নিজেরাই বানিয়ে নিয়েছেন নিজেদের জীবনবিশ্বাসের ছকে লোকধর্ম বা উপধর্ম। অভিজাত ধর্মীয়তার দৃষ্টিতে তাঁরা 'উপসম্প্রদায়' বা 'অপসম্প্রদায়'। কিন্তু কী করা যাবে? নদী যদি গ্রামবর্তী না থাকে তবে গ্রামবাসী বিল বাওড় দিঘি খাল আর সোঁতাতেই বানায় নদীর প্রতিমা। এভাবেই গড়ে ওঠে উপধর্ম। কর্তাভজা বা সাহেবধনী, লালনপন্থা কিংবা বলাহাড়ির মতবাদ, পাটুলিস্রোত কিংবা রূপকবিরাজী সহজিয়া। এভাবেই এককালে জেগেছে নাথপন্থ কিংবা বঙ্গীয় ফকিরি দরবেশি ধারা। সমাজস্তরে এসে গেছে জাতবৈষ্ণব এবং তন্ত্রবিশ্বাসী হঠযোগীরা। সবটাই দ্রোহ থেকে নয়, অনেকটাই অসহায় মানুষের পথসন্ধানের আর্তি যেন। ইতিহাসের খাতিরে এ কথাও কবুল করা উচিত যে, লোকধর্মের ধরতাই যে অন্যতর পথে অনেকসময় তাতে এসে যায় উচ্চধর্মের নকল। গুরুই তখন সেজে বসেন দেবতা। তাঁকে প্রণামী ও খাজনা দিতে হয়। গুরুপাট হয়ে ওঠে তীর্থ। গুরুবাক্য হয় মন্ত্রোপম, অমোঘ। নিরাকার উপাস্য ক্রমে বিগ্রহরূপ পান ত্রিশূল বা ফকিরিদণ্ডের বস্তুকাঠামোয়। তাতে তেলসিঁদুরের মার্জনা পড়ে। তৈরি হয় একটা পুরানো বিন্যাসের নতুন ছক : গুরু ও শিষ্য, মুর্শিদ ও মুরিদ। উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গ আরেক ধরনে। কিন্তু সে তো অনেক পরে। প্রথমে লোকধর্মের সূচনা ঘটে এক চমকপ্রদ সমতাবোধে, শ্রেণীজাতিহীন মিলনস্বপ্নের তাপে। একজন ঊর্ধ্ব চেতনার মানুষ প্রবর্তক রূপে এগিয়ে আসেন। যেন ত্রাতা বা দিশারী। দলিত শোষিত মন্ত্রবর্জিত একদল মানুষ পেয়ে যান মানবস্বীকৃতি ও বিশ্বাসের বিশ্ব। পাঁচশো বছর আগে চৈতন্যদেব ছিলেন এই রকম একজন প্রবল দিশারী। বাংলার সব-কটি গৌণ ধর্ম চৈতন্যকে আলাদা মর্যাদা দেয়। শাস্ত্রের বদলে তিনি স্থাপন করেছিলেন মানবতাকে। মন্ত্রের বদলে গান।

লোকধর্মের দুটি সম্বল— ইহলোক ও দেহধর্ম। তাই মানুষই তাদের জিজ্ঞাসা ও প্রাপ্তিবস্তুর সারাৎসার। কুবির গেয়েছেন :

এই মানুষে করো রে বিশ্বাস
এই মানুষ জেনো সত্য-নির্যাস

এ কথার সম্প্রসারণে তাঁর ভাষ্য :

মানুষ হয়ে মানুষ মানো
মানুষ হয়ে মানুষ জানো
মানুষ হয়ে মানুষ চেনো
মানুষ রতনধন।

মানুষের দিকে ঝোঁক দিলেই আর অলৌকিক ও পরলোক বিশ্বাস থাকে না। টেঁকে না জন্মান্তর তত্ত্ব। ইহসর্বস্ব বেদনাখিন্ন ব্যাধিবিপন্ন ক্ষুৎকাতর জীবনে বড়ো হয়ে ওঠে মানুষ, অর্থাৎ মানবিক প্রশ্ন। তখন শাস্ত্র দেবতা মন্দির- মসজিদ-বিগ্রহ-মন্ত্র ও পুরোহিত মৌলানার অস্তিত্ব নগণ্য হয়ে ওঠে। প্রধান হয় মানুষের করণ। সে করণ কেমন? কুবিরের মতে :

মানুষের করণ করো—
এবার সাধনবলে ভক্তির জোরে মানুষ ধরো।
হরিষষ্ঠী মনসা মাখাল
মিছে কাঠের ছবি মাটির ঢিবি সাক্ষীগোপাল
বস্তুহীন পাষাণে কেন মাথা কুটে মর?

মানুষে কোরো না ভেদাভেদ
মানুষ সত্যতত্ত্ব জেনে মানুষের উদ্দেশে ফেরো।

হরিষষ্ঠী মনসা বা মাখাল হল নানা বর্গের কুসংস্কারের উপদেবতা। কুবিরের সমসময়ে নিম্নবর্গের মানুষজন এসব উপদেবতায় আচ্ছন্ন ছিল। হরিষষ্ঠী পুজো হত কাঁচা ঘটে, মাখাল পুজো হত মাটির ঢিবি বানিয়ে। এরই নাম ঘটে পটে পুজো। কুবির এ সমস্তকেই নিন্দা করেছেন এবং বলেছেন দেবতা মূর্তি যেন বস্তুহীন পাষাণ। তা হলে বস্তু কী? বস্তু হল দেহ এবং মাটি। দেহের রজবীর্য সমন্বয় এবং মাটির শস্যবীজ সম্ভাবনা। এই দুই নিয়ে জীবন। সেই জীবনে প্রবাহিত জলে মাছ ও কুমিরের আনাগোনা, দেহ খাঁচায় প্রাণ পাখির যাতায়াত, দেহজমিনে বস্তুনিষেকের সত্য ধরা আছে। বৈরাগ্য নেই একেবারে। কল্পনার স্থান খুব কম। কারণ তাঁদের মতে 'যাহা দেখি নি নয়নে তাহা ভজিব কেমনে?' অনুমানের কষ্টকল্পনা (যেমন কৃষ্ণরাধা বৃন্দাবন ব্রজ স্বর্গ নরক নামাজ রোজা) ছেড়ে আচরণবাদের দেহগত স্পষ্টতায় বর্তমানের সাধনা লোকধর্মে সর্বদা সমাদৃত। তাই তাঁরা পরলোকের বদলে ইহলোক, বিদেহী দেবতার চেয়ে দেহযুক্ত মানুষ এবং অনুমানের সাধনার চেয়ে বর্তমানের সাধনায় মশগুল। এই সব বিশ্বাস তাঁরা ব্যক্ত করেন গানে।

উচ্চবর্গের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম সম্প্রদায় যেখানে রচে শাস্ত্র ও মন্ত্র, নিম্নবর্গের লোকধর্ম সেখানে সব-কিছু বোঝাতে চায় গানে গানে। গান কেন, সে কথা বোঝান রবীন্দ্রনাথ এইভাবে যে,

> শাস্ত্রের যে-ভগবান ধর্মকর্মের ব্যবহারে লাগেন, যিনি সনাতনপন্থী ধর্মের ভগবান, তাঁকে নিয়ে আনুষ্ঠানিক শ্লোক চলে; তাঁর জন্যে অনেক মন্ত্রতন্ত্র; আর যে-ভগবানকে নিজের আত্মার মধ্যে ভক্ত সত্য করে দেখেছেন, যিনি অহৈতুক আনন্দের ভগবান, তাঁকে নিয়েই গান গাওয়া যায়।

এইজন্যেই সন্তসাধকদের ধারায় আঠারো-উনিশ শতকে লালন বা কুবির গান লিখেছেন। সন্তসাধকদের সকলেই ছিলেন বৃত্তিজীবী— কবীর জোলা, নামদেব ছিপি (বস্ত্ররঞ্জক), দাদূ ধুনুরি, রজ্জব মদ্যবিক্রেতা, শুক্লহংস রজক। লালন বাস করতেন জোলা কারিকর পাড়া ছেউরিয়ায়, তাঁর গুরু সিরাজ সাঁই ছিলেন পাল্কি বেহারা। গগন ছিলেন ডাকহরকরা। কুবির ছিলেন যোগী-তাঁতি। নিম্নজাতি বা অভিজাতদের চোখে হীনবৃত্তি ওসব দেহাত্মবাদী ভাবসাধকদের জীবনে কোনো প্রতিবন্ধ রচনা করে নি, বরং জগৎ ও প্রবাহিত সমাজ-বিন্যাসের সঙ্গে দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক এঁদের করে তুলেছে বহুদর্শী ও বস্তুমুখী। শাস্ত্রবিরোধিতা, জাতিভেদবর্জন এবং হিন্দু-মুসলিম মিলনের সূত্র এঁদের যাপনে সত্য হয়ে উঠেছিল।

যারা বুদ্ধি ও পুঁথিপড়া বিদ্যা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে এবং যারা দেহচালনার মধ্যে দিয়ে জীবিকা ও জীবন ধারণ করে তাদের জীবনদর্শনে মনের ফারাক থাকে। দেহের শক্তিতে যে নৌকা টানে মাছ ধরে, শরীর দিয়ে যে চাষ করে শস্য ফলায়, দেহজ শ্রমে যে লোহার দ্রব্য গঠন করে আর হাতের টানে যে টানাপোড়েনের বস্ত্র বোনে তারা বিশ্বকে দেখে অনেক স্পষ্টতায় ও স্বচ্ছবোধে। সেইজন্যে লোকায়ত গানে ভাববিলাস কম, যাপনের তাপ বেশি। বস্তু বা উপাদান ব্যবহার এবং তার রূপান্তর স্বহস্তে সাধন করা একটা প্রত্যক্ষ সত্য। তুলো থেকে সুতো, সেই সুতো থেকে বস্ত্রবয়ন, তাকে রঙ করা যেন এক পরম্পরাময় নির্মিতি যার প্রতিটি স্তর পেরিয়ে তবে পূর্ণতা। লোকায়ত ধর্মসাধনাও তেমনই স্তরান্বিত প্রবর্তক-সাধক-সিদ্ধ। ভালো তাঁতি হতে গেলে ভালো ওস্তাদের কাছে হাতে কলমে শিখতে হয়, কায়াসাধনাতেও তেমনই গুরু বা মুর্শেদ লাগে। এত সব বিভাজন ও স্তর যে পার হয়ে আসে তার মনের পক্বতা হয় গাঢ় ও গুহ্য— তখন তার চেতনায় যেমন বস্তুর ভেদাভেদজ্ঞান লোপ পায় তেমনই মানুষ সম্পর্কে শ্রেণীবর্ণজাতি সংকীর্ণতা কেটে যায়। রক্ত বা রজবীর্যের আদি উপাদানে সব মানুষেরই গঠন এ কথা যারা বোঝে তারা কায়াবাদী সাধনায় এটাও বোঝে যে আদি উপাদানের কোনো জাতি নেই— তা হিন্দু ও মুসলমানে সমানভাবে বহমান। ধর্ম

ও জাতিবোধ তাদের কাছে বাহ্য, মুখ্য হল রজবীর্য এবং তাদের ধারক প্রকৃতি ও পুরুষ। জাতি বলতে লোকায়ত বর্গের মানুষরা হিন্দু বা মুসলিম বোঝে না। তাদের মতে বা বিশ্বাসে জাতি মোট দুটি—পুরুষ ও নারী। কুবির এ কথাটাই বলেছেন সহজভাবে—

হল যুগলেতে জন্ম সবার
মর্ম বোঝো মহাশয়।

পুরুষ ও নারীর সমন্বয়ে সব মানুষের জন্ম তাই সব মানুষ আসলে এক। এই বিশ্বাস অম্লান ছিল বলে কুবির লেখেন :

একের সৃষ্টি সব পারি না পাকড়াতে
আল্লা আলজিহ্বায় থাকে আপ্তসুখে
কৃষ্ণ থাকে টাকরাতে।
মুসলমানের আল্লাতালা
হিন্দুর ব্রহ্মাবিষ্ণু ভাবে বিভোলা
এক ঘরে খেলা করে পিঁজরাতে—
খানা দানা পানি একই জানি
বিরুদ্ধ হয় ফুকরাতে।

ফুকরানো বা উচ্চারণ ঘটিত তফাত ছাড়া আল্লা ও কৃষ্ণ এক। একে বলা হয় শব্দ ভেদে ঠেলাঠেলি, প্রকৃত ভেদ নয়। আরেক গানে কুবির অপধর্মগত আচরণকে নিন্দা করেছেন—

হিন্দু আর যবনের করণ বলব এখন কায়—
এরা আসল ছেড়ে নকল ভজে ঠিক পাগলের প্রায়।

আসল ছেড়ে নকলভজা কেমন? যথা, মুসলমানরা—

ত্যেজে আল্লা নবী কী আজগুবি
শাহ সুবির দর্গাতে যায়।
দেয় খোদার নামে লবডঙ্কা সালাম করে
গাধার পায়।

খোদ আল্লাকে ভজনসাধন না করে দর্গাতলায় হত্যে দেওয়া বা শীতলা পুজো করা হল নকলভজা। আর হিন্দু?

হিন্দুর অসংখ্য ঠাকুর যেন পাদাড়ে ভাসুর
নেংটা হয়ে ঘোমটা টানে লজ্জাতে প্রচুর।
এরা নিজপতি চেনেনাকো উপপতির গুণ গায়।

এই হিন্দুর হাবা পূজে দেবী আর দেবা
জন্মেছে যা হতে তারে বলে না বাবা।

মূল উপাস্য ছেড়ে উপদেবতা পুজোকে নিন্দা করেছেন কুবির। মানুষ 'যা হতে জন্মেছে' অর্থাৎ পিতৃবস্তু তাকেই তো দেহে কায়েম করার সাধনা কায়াবাদীদের। দেবদেবী মন্ত্রতন্ত্রের জাঁকে সেই কথাটাই হারিয়ে যায়। কুবির হিন্দুর পৌত্তলিকতা এবং তাঁর সমসাময়িক ইসলামের লৌকিক অন্ধ কুসংস্কার সম্পর্কে সমান সরব ও নিন্দক তার কারণ যে-সাহেবধনী মতে তাঁর মতি ছিল সেই দলে হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ই সমান সমান ছিল। ভ্রান্তি ঘোচাতে তাই দুদলকেই সতর্ক করেন তিনি। তাঁর বহুদর্শী চোখে ধরা পড়ে কিছু

সার সত্য। সাধারণ মানুষের ধর্মপালনের কৃত্য সম্পর্কে বিদ্রূপ মিলিয়ে লেখেন :

মধ্যবিত্ত যবনেরা পান্ত ভাতে আপনি মরা
পেটের জন্যে খেটে সারা হয় পরিবারের তরে
বলে সেবার সময় আল্লা রসুল পেট ভরে ঘুম মারে।
ফরাজিরা রেখে দাড়ি ওজু করে ঘড়ি ঘড়ি
নামাজ পড়ার হুড়োহুড়ি যার যেমন ভাব অন্তরে
পড়ে আল্লা হামদা মাসুদ ভয়ে মাথা কুটে মরে।

খেটে খাওয়া সাধারণ মুসলমান আর মৌলবাদীদের ধর্মাচরণের দুমুখো ধরন এ-বর্ণনায় নিখুঁত। বোঝা যায় কুবির মানুষটি ছিলেন চোখ-কান-খোলা, প্রাজ্ঞ ও রসিক। সেইসঙ্গে সমসাময়িক দেশকালপাত্র এবং দেশের পরিবর্তমান সমাজকম্পন তাঁর মনের গহনে ঘা দিয়েছিল। নদে জেলায় তাঁর সময়ের নীলচাষের ভয়ংকরতা প্রত্যক্ষ করে তাঁর উপলব্ধি সুভাষণ অলংকারে সাজিয়ে বলেছেন :

এবার নীল এসে নীলকণ্ঠ বেশে ব্রহ্মাণ্ড বশ করে নিলে।
নীলের জ্বালায় যাব কোথায়
নীলে সব ভিটের ঘুঘু চরিয়ে দিলে।

একই মানুষ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে শনাক্ত করে বলেছিলেন : 'সাতসমুদ্র পার হয়ে বাংলায় রাক্ষস এল'। তাদের উদ্দেশ্য বিষয়ে কুবিরের মন্তব্য :

সবাই বিলাত হতে এই বাংলাতে
সাধু সওদাগিরি করতে এসেছে।

কিংবা,

বাংলার শুভ হয় যখন
বিলাতের কোম্পানি যেমন
হুকুম দেয় 'লুটে আন গা যা আছে ঘরে'

এ তো কুবির কবিদারের সরস পদ্য নয়, এ যে বেদনাবিহত একজন পরাধীন জাতির সচেতন মানুষ। নীলচাষ আর ভূমিশোষণের নানা নিম্নবর্গীয় জীবনের নমুনা তাঁর ভ্রাম্যমাণ গ্রামপথপরিক্রমায় স্মৃতিবদ্ধ হয়েছিল। নিজের চঞ্চল মন সম্পর্কে কুবির লিখেছেন :

মন কভু করে জমিদারি
কভু করে পাটোয়ারি হালসানা চৌকিদারি।
কভু নীলকুঠির দেওয়ান হয়ে মাঠে মাঠে বেড়ায় ঘুরে।

এমন উপমা-সন্নিবেশ থেকে বোঝা যায় লালন-সমকালীন এই গ্রাম্য গীতিকার এখনও অনেকটা অবজ্ঞাত রয়ে গেছেন বৃহত্তর বাঙালি পাঠকসমাজে। এত সমৃদ্ধ তাঁর অভিজ্ঞতা, এত তির্যক আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি, এত যথাযথ সমাজপ্রেক্ষণ তাঁর সময়ের (১৭৮৭-১৮৭৯) আর কোন্ গ্রামীণ গীতিকারের আছে? নেই, এবং সেজন্যেই কুবির আমাদের মনোযোগ ও আলোচনা দাবি করেন বেশি করে।

কুবিরের ১২০৯ খানি গান লিখিতরূপে পাওয়া গেছে। সেই গানের খাতা ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা গানে চোখ আটকে গেল। গানের ধরতাই ভারি নিরীহ রকমের। যেমন :

পাকা রাস্তা রেলের উপর চলে যায় কলের গাড়ি—
হাবড়া আর হুগলি যেতে বেলা হয় না একঘড়ি।

পথে-হাঁটা ঘোষবিলা গাঁয়ের কুবির এবারে শামিল হয়েছেন নগর সংস্কৃতির কলে বলে। এটাও লক্ষ করার

জিনিস যে গ্রাম্য গানে নৌকা, ডিঙি, জমি, ঘানি, তাঁত, রথ, খাঁচা, মাছ ও পাখির চিরাচরিত রূপক ভেঙে ক্রমে এসে গেছে কল, রেলের গাড়ি, ধোঁয়া আর যন্ত্র- উৎপাদিত বস্তুর বিবরণ। কুবিরের কী অনুপুঙ্খভাবে দেখা আর দেখানো :

রেলের গাড়ি ডেঙায় চলে—
ধোঁয়ার জাহাজ চালায় জলে হায় রে
আসমানে ফনাস জ্বলে।
উপরে পতঙ্গ ঘুড়ি—
বাঙালি রেখে বশ করে কলে লুটে নিল ধন কড়ি।
তার টাঙানো বাংলা জুড়ে বসে খবর নিচ্ছে ঢুড়ে

ক্রমে ক্রমে কলের বহু রকমের ব্যবহার কুবিরের চোখে পড়ে যায়। যেমন :

কলের সুতোয় কাপড় বুনে—
কলেতে জল তুলছে টেনে হায় রে
কলেতে ধান্য ভানে গম পিষে কলে গুড়ি।
কলে টাকা পয়সা কাগজ তৈয়ার
কলেতে পাকায় দড়ি।
কলে করলে জব্দ জমি
নদনদী পুষ্করিণী ভূমি হায় রে
রাখলে না বেশি কমি
এমনি ইংরাজের খড়ি।

গানের শেষে চরম উপলব্ধি

চোদ্দ পোয়া ধরের মাঝে
বিচার করে বুঝে বুঝে হায় রে
কল করেছে ইংরাজে ঘুরতেছে বত্রিশ নাড়ি।

নিম্নবর্গজাত কুবিরের লোকায়ত চৈতন্য এবার একটা বড়ো ধরনের ঝাঁকি খেয়ে গেছে। মানুষটা আর নিজেকে কি বলতে পারবেন 'আমি সন্ন্যাসী উদাসীন'?

আমি কুবির দীনহীন, আমি কুবির কবিদার, আমি সন্ন্যাসী উদাসীন— এমন সব পরিচয় তিনি গেঁথে গেছেন গানে। সত্যিই তাঁর জীবনপরিচয় ভারি অন্যরকম। ঘোষবিলার যোগীতাঁতি জাতব্যবসায় ছেড়ে কবিদারি করতে করতে পৌঁছে গেছেন মেহেরপুর মহকুমা। সেখান থেকে ভৈরব নদী পেরিয়ে এসেছেন তেহট্ট— বেতাই গ্রামে। তখনকার কালের সম্পন্ন গ্রাম। পাশে প্রবাহিণী জলঙ্গী নদী। তেহট্টের মন্দিরে কৃষ্ণরায়ের বিগ্রহ, মন্দিরের গায়ে টেরাকোটা কাজ। বেতাই গ্রামে রয়েছে মস্ত নীলকুঠি, আজও। এইখান থেকে সম্ভবত জলঙ্গী নদীর জলপথে কুবির চলে আসেন লক্ষ্মীগাছা-বৃত্তিহুদা-তালুকহুদা। হঠাৎ এ অঞ্চলে কেন? কারণ মানুষটার মধ্যে তখন থিতু হবার বাসনা জেগেছে এবং পেয়েছেন একজন ভাবসাধকের বার্তা। তাঁর নাম চরণ পাল(১৭৪০-১৮৫০)। চরণ পালের পিতৃপিতামহের বাস্তু ছিল জলঙ্গী নদীর পশ্চিমে দোগাছিয়া গ্রামে। তিনি নদী টপকে পুবের গ্রাম বৃত্তিহুদায় পাতলেন নতুন বাস্তু। চরণ ছিলেন গোপ জাতীয়। অঢেল জমি তাঁর । বিত্তবান। কিন্তু তাঁর মূল বিত্ত ছিল সাধনার জীবন। তিনি ছিলেন গৌণ লোকধর্ম সাহেবধনী ঘরের গুরু। সাহেবধনীদের উপাস্যের নাম দীনদয়াল বা দীনবন্ধু। চরণ পালের বৃত্তিহুদা গ্রামের বাস্তুবাড়িকে এখনও বলে সবাই পালবাড়ি, সসম্ভ্রমে। এই পালবাড়িতেই দীনদয়ালের ঘর। দীনদয়ালের

গুহ্যমন্ত্রে যাঁরা দীক্ষিত তাঁদের বলে সাহেবধনী। কবি এই দীনদয়ালের নাম শুনে চরণ পালের নানা ঐশী শক্তির টানে বৃত্তিহুদা চলে আসেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব নেন। চরণের আরও কজন নামকরা শিষ্যসেবক ছিল কিন্তু কুবির হলেন তাঁর সেরা শিষ্য, কারণ দীনদয়ালের ঘরের যা সার সত্য তাকে কুবির রূপ দিয়েছেন গানে গানে। তাঁর সব গানে ভণিতায় আছে গুরুচরণের নাম। এইভাবে চরণ চিরজীবী হয়ে গেছেন কুবিরের গানে, সিরাজ সাঁই যেমন লালনের গানে। আজ এই নব বঙ্গ শতাব্দীর সূচনায় বৃত্তিহুদা গাঁয়ে গেলে দেখা যাবে চরণ পালের মস্ত বড়ো বাস্তুবাড়ির ভগ্নদশা। শরিকে শরিকে বিবাদ বিসংবাদ। কিন্তু সাধারণ মানুষের দীনদয়ালের ওপর আস্থা ও বিশ্বাসের অবসান ঘটে নি। তেমনই বেঁচে আছে কুবিরের গান, সাধক বাউল ফকিরদের কণ্ঠে।

চরণ পালের চরণতলে কুবিরের ভ্রাম্যমাণ জীবনের অবসান ঘটেছিল। বাকি জীবন গুরুর আশ্রয়ে গান বেঁধে আর গান গেয়ে তিনি কাটিয়ে দিয়েছিলেন। গুরুপাটের কাছেই গড়েছিলেন তাঁর বাস্তুভিটা। সেখানে এখনও রয়েছে তাঁর উত্তরপুরুষ। ভিটেয় রয়েছে কুবিরের সমাধি এবং তাঁর স্ত্রী ভগবতী এবং সাধনসঙ্গিনী কৃষ্ণমোহিনীর সমাধি, গায়ে গায়ে। নির্ভরযোগ্য তথ্য অনুযায়ী এতটাও জানা যায় যে কুবিরের তিরোধান ঘটেছিল ১২৮৬ বঙ্গাব্দের ১১ আষাঢ় মঙ্গলবার রাত চারদণ্ডে শুক্লপক্ষে ষষ্ঠী তিথির মধ্যে। ভগবতীর মৃত্যু ঘটে ১২৯৭ বঙ্গাব্দের ২৯ শ্রাবণ বুধবার কৃষ্ণপক্ষ দ্বিতীয়ায়। কৃষ্ণমোহিনীর মৃত্যু ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ১৪ আষাঢ় বুধবার ত্রয়োদশীতে। মৃত্যু সংক্রান্ত এত অনুপুঙ্খ পাওয়া যায় বৃত্তিহুদাতেই লিখিত আকারে। কুবিরের প্রত্যক্ষদর্শী বৃত্তিহুদার অরুণ দাস তাঁর শতাব্দী-উত্তীর্ণ স্মৃতি থেকে আমাকে ১৯৬৮ সালে বলেছিলেন, ‘গোঁসাইয়ের ছিল নাভি পর্যন্ত লম্বা দাড়ি, গম্‌গম্‌ করে গান গাইত’।

গোঁসাই কথাটা শুনে খটকা লেগেছিল। পরে দেখলাম এখানকার বৃত্তিহুদায় মানুষটার পরিচিতি কুবির গোঁসাই নামে। তাঁর শিষ্যের নাম যাদুবিন্দু গোঁসাই, নিবাস পাঁচলখি, বর্ধমান। আর-এক শিষ্য বৃত্তিহুদার রামলাল ঘোষ। এ খবর থেকে বোঝা গেল কুবির কিছু মানুষকে দীক্ষা দিয়ে শেষ বয়সে সেজেছিলেন গুরু গোঁসাই। চমৎকার! ভ্রাম্যমাণ কবিদারির অনিশ্চিত জীবিকা বৃত্তিহুদায় এসে সুনিশ্চিত বাস্তু ও জমি (পালেদের দেওয়া) পেয়ে শমিত হয়েছিল। এই থিতু জীবনেই তিনি নানারকমের গান লিখেছিলেন। তাঁর বহু দেখা শোনা জানা জীবনের নানা অনুভব ও বাস্তবতা চুঁইয়ে পড়েছে তাঁর গানে। তাঁর গানের মূল খাতাটা পাওয়া যায় নি। কিন্তু ১৩০০ বঙ্গাব্দে অনুলিখিত তাঁর শিষ্য রামলাল ঘোষের হাতে লেখা মোটা খাতায় ১২০৯ খানা গান এখনও অটুট। ষাটের দশকের শেষে সেই খাতা থেকে আমি বহু গান টুকে নিয়েছি। সেই সব গান পড়তে পড়তে কেবলই মনে হত এবং এখনও মনে হয় এমন একজন সুবেদি ও বহুমুখী দ্রষ্টা গ্রাম্য গীতিকার, দুর্ভাগ্য যে এখনও তাঁর সমাদর তো দূরের কথা, পরিচিতিই পান নি। তাঁর গানের বাণী, তার ভিতরকার সমাজসত্য ও সমন্বয়ী জীবনধারা এখনও আমরা অনুধাবন করি নি। ভাবলে অবাক লাগে কবে কতদিন আগে তাঁর মনে এমন খটকা লেগেছিল যে,

> সৃষ্টিকর্তা এক নিরঞ্জন
> হিন্দু যবন জাত নিরূপণ কীসের কারণ?

মধ্যযুগের মহাপ্রভুর জাতিবর্ণহীন ভাবসাধনা বিষয়ে কুবিরের নিজস্ব ভাষণ :

> গৌর কি জাত বটে?
> চাঁড়াল মালো বাগদী দুলে
> পাটুনি আর তিয়র জেলে
> কাদের ছেলে গৌর লম্পুটে?
> কোন্‌ পরিবার বুঝতে নারি

কোন্ গোত্র ধরে মন্ত্র পঠে?
হিন্দু মুসলমানের গুরু তিনি বাঞ্ছা কল্পতরু
নামেতে বিপত্তি যায় ছুটে।

শেষ বিংশ শতাব্দীতে বসে যখন কুবিরের গান পড়ি তখন মনে হয় উগ্র সাম্প্রদায়িকতার এই বর্তমান বাতাবরণে ভারতে তাঁর মতো একজন লোকগীতিকারের প্রয়োজন, যিনি যুযুধান দুই ধর্মাচারীকেই বোঝাবেন

রাম কি রহিম করিম কালুল্লা কালা
হরি হরি এক আত্মা জীবনদত্তা
এক চাঁদে জগৎ উজলা।

মৌলবাদী ভ্রান্তবুদ্ধিদের সমঝে দেবেন অনায়াসে :

লক্ষ্মী আর দুর্গাকালী
ফতেমা তারেই বলি
যার পুত্র হোসেন আলি মদিনায় করে খেলা।
আর কার্তিক গণেশ কোলে ক'রে
বসে আছে মা কমলা।
কেউ বলে কৃষ্ণরাধা কেউ বলে আল্লা খোদা
মনে ভেবে দেখো এক সকলে
পরো রে এক নামের মালা।

কুবিরের এই সমন্বয়বাণী তাঁর নিজস্ব অর্জন নয়। তাঁর সমকাল এই মন্ত্র তাঁকে শিখিয়েছিল। আঠারো শতকের শেষে আর উনিশ শতকের গোড়ায় নদীয়া যশোহর পাবনা অঞ্চলে একদিকে যেমন জমিদারের অত্যাচার এবং নীলকরদের অত্যাচার নিম্নবর্গকে ফৌত করে দিয়েছে তেমনই ব্রাহ্মণ্যশক্তি ও মোল্লাতন্ত্র বুনেছে সাধারণের মনে বিভেদের বীজ। সেই সংকটকালে লালন-পাঞ্জু শাহ-গোঁসাই গোপাল একই সমতল থেকে যেন এর প্রতিবাদ করেছেন তাঁদের গানে। লালন বলেছেন :

একই ঘাটে আসা যাওয়া
একই পাটনী দিচ্ছে খেয়া
কেউ খায় না কারও ছোঁয়া
ভিন্ন জল কে কোথা পান?
বেদ পুরাণে করল জারি
যবনের সাঁই হিন্দুর হরি
এসব আমি বুঝতে নারি
দুই রূপ দৃষ্টি কী প্রমাণ?

লালনের আপত্তি মৌল বেদপুরাণেরই বিরুদ্ধে, হিন্দু মুসলমান দুইরূপের স্বতন্ত্র সৃষ্টির কোনো বস্তুগ্রাহ্য প্রমাণ তিনি পান নি, তাই মানেন না সেই ভেদবাদ। ছুন্নৎ আর উপবীতের বাহ্যিক জাতিচিহ্নেরও তিনি বিরোধী। গোঁসাই গোপাল তুলেছেন আরেক প্রশ্ন :

আল্লা হরি কী জাত ছিল?
মরি মনোদুঃখে চর্মচক্ষে
তারে দর্শন না হল।

এইখানে গাঁথা আছে 'বর্তমান'-পন্থার সাধকের সংশয়। 'অনুমান'-পন্থায় তাঁদের বিশ্বাস নেই। চর্মচক্ষে যা

দেখা যায় না, লোকধর্ম তাকে মানে না। আল্লা আর হরির প্রকৃত কোনো জাতিভেদগত প্রমাণ যখন নেই তখন হিন্দু-মুসলিমের জাতিভেদ গোঁসাই গোপাল মানবেন কেন?

লালনের চেয়ে পাঞ্জু শাহ (১৮৫১-১৯১৪) বয়সে অনেক ছোটো ছিলেন। গোঁসাই গোপালের (১৮৬৯-১৯১২) মতোই তিনি বিংশ শতকের মুখ দেখেছিলেন। পাঞ্জুর মনে জাতিভেদ বিষয়ে একটা অন্য ধারার প্রশ্ন জেগেছে। তাঁর মতে :

এক জেতের বোঝা লয়ে
মিছে মলাম বয়ে
চিরকাল কাটালাম মানী মানুষ হয়ে—
মানের গৌরব কুলের গৌরব ধন্দবাজি সব দেখি।

এখানে জাতিভেদের সঙ্গে বর্ণভেদেরও প্রশ্ন উঠেছে। মান ও কুলের গৌরব আসলে যে ধন্দবাজি বা বাহ্য মর্যাদাবোধের দম্ভ তা বেশ বুঝেছেন পল্লীগীতিকার। তিনি সক্ষোভে জানাতে চেয়েছেন :

জেতে অন্ন নাহি দিবে
রোগ না সারিবে।
পাপ করিলে কোম্পানি জাত ধরে নিয়ে যাবে—
মৃত্যু হলে যাব চলে
জেতের উপায় হবে কী?

জাতিগত অহংকার ও আত্মাভিমান কত ঠুনকো পাঞ্জু তা বুঝিয়ে দিয়েছেন যুক্তি দিয়ে। এই যুক্তির দিকটা লোকধর্মে প্রাধান্য পায়। নিরন্ন ভেদবাদী রুগ্‌ণ জনসমাজকে পাঞ্জু ঠিক কথাটাই বোঝাতে চেয়েছেন। জাতপাঁত কাউকে খেতে দেয় না, রোগের উপশম ঘটায় না, মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারে না। এমন-কি, ইংরেজ কোম্পানি আইনে পাপ করলে জাতপাঁতকে মান্য করবে না, ধরে নিয়ে যাবে। বিশ শতকের পূর্ববঙ্গীয় লোকগীতিকার জালালুদ্দিন আরও স্পষ্ট করে বলেছেন :

ধর্ম কি জাত বিচারে?

রহিম করিম রাধা কালী এ বোল সে বোল যতই বলি
শব্দভেদে ঠেলাঠেলি এ সংসারে—
প্রেমের মূর্তি লয়ে একজন বিরাজ করে প্রতি ঘরে।
ক্ষিতি জল বায়ু বহ্নি আগুন মাটি হাওয়া পানি
এক ভিন্ন আর নাহি জানি যা-আছে সংসারে
করিম কিষন হরিহজরত লীলার ছলে ঘুরে ফিরে
ভাবে ডুবে খুঁজে দেখো ভেদাভেদ কিছু নাই রে—
খণ্ডে খণ্ডে অখণ্ড সাঁই লক্ষ আকার ধরে।
কোরো না দুদিনের বড়াই সঙ সেজে সংসারে।

ক্ষিতি জল বায়ু বহ্নি বা আগুন মাটি হাওয়া পানি বা আর আতশ খাক বাদ— আসলে পৃথিবীর মৌল চারটি উপাদান যা লোকধর্মের সকলে মানে। শব্দান্তরে এদের যে আপাত ভেদাভেদ রয়েছে কিন্তু প্রকৃত ভেদ নেই এ কথা যেমন সত্য জালালুদ্দিনের গান সেই যুক্তির ক্রম মেনে এ কথা বোঝায় যে করিম-কিষন হরি-হজরত ঠিক একই রকম শব্দভেদের তফাতে আছে, আসলে অদ্বৈত। অখণ্ড সাঁই যেমন খণ্ডে খণ্ডে বিভাসিত মানুষও তেমনই নানা মূর্তিতে মূর্তিমান। সেই অখণ্ড মূর্তিতে আমাদের স্বার্থবোধ থেকে জাতিভেদের

চিহ্ন আঁকা ঠিক নয়। হিন্দু মুসলমান বলে আলাদা জাতের বড়াই যেন সংসারে দুদিনের সঙ সাজার মতো পরিহাসময়।

লোকধর্মের এই যুক্তির পরম্পরা ও জাতি-ঐক্যের স্বপ্ন বাংলার লোকায়ত গানে বহুদিনের উত্তরাধিকার। একেবারে অতিসম্প্রতি বীরভূমে ফকিরদের কাছ থেকে যে গান পাওয়া গেছে তাতে হিন্দু মুসলিম পুরাণকে চমৎকার মেলানো হয়েছে। গানটি :

মরুতে এলেন মোহম্মদ
 মথুরাতে গেলেন শ্যাম
ইমান খেলা খেলেন রসুল
 লীলা খেলেন ঘনশ্যাম।
মা এইসা পাগল হলেন
 নবীর প্রেমের মদিনায়
বাঁশির সুরে পাগল হয়ে
 রাধা চলে যমুনায়।
একই মায়ের দুইটি সন্তান
 হিন্দু আর মুসলমান
একই কুলে জন্ম মোদের
 একই বুকে দুগ্ধপান।
দেখে আয় ভাই হিন্দু মুসলিম
 মদিনা আর মথুরায়
দুই রাখালে যুক্তি করে
 গোরু আর বকরি চরায়।

এত সহজ ভাষায় বাঁধা সমন্বয়বোধের গান আমাদের জাতিসম্পদ, যদিও প্রান্তবাদী মৌলধর্মীরা এমন স্বচ্ছ অনুভবের গানে কালি ছিটোতে পারেন এখন। কিন্তু কুবিরের সমকালে গ্রামবাংলার মিলন ময়দানে সমন্বয়বাদের বাণী ব্যর্থ হত না। সাহেবধনী সম্প্রদায় তাঁদের দীনদয়ালের উপাসনায় যে-মন্ত্র উচ্চারণ করত এবং এখনও করে তাতে উচ্চারিত হয় 'ক্লিং সাহেবধনী আল্লাধনী দীনদয়াল নাম সত্য। কাম সত্য। করণ সত্য। ঠাকুর সত্য। সেবা সত্য। বাক সত্য।' এই সাহেবধনীর ঘরের গীতিকার কুবির সমন্বয়বাদের গানই তো লিখবেন। সেটাই তাঁর গুরুদীক্ষা।

কুবিরের গানের অন্তঃপুরে উঁকি দিলে যে-সব ইসলামি অনুষঙ্গ খুঁজে পাওয়া যায় তার কোনো উৎস কি থাকতে পারে দীনদয়ালের মন্ত্রে? 'ক্লিং আল্লাধনী' উচ্চারণে যে-চমক তা খুব অভিনব সন্দেহ নেই। এই চিন্তা থেকে এবারে আমার সংগৃহীত দীনদয়ালের গুহ্য মন্ত্র একটু শোনাই পাঠকদের :

এসো হে ধেয়ানে বসো হে আসনে
আসন করিলাম দেহ ভুবনে
খাট পাট সিংহাসনে।
দীনদয়াল চামর ঢুলাই
বস্ত্রভরণে করিলাম তোমায়।
এসো হে লাসরি প্রভু আমার আসনে করো ভর।

লৌকিক ধাঁচে লেখা এ-মন্ত্রের শেষে 'লাসরি প্রভু' শব্দটি বিদ্যুৎপ্রভ হয়ে একটা দিক খুলে দেয় চেতনার।

লাসরি শব্দটি লাসরিকালা (সরিক নেই যার) শব্দের সংহত রূপ। যা আল্লার বিশেষণ। দীনদয়ালের ধারণায় তা হলে গূঢ় ইসলামি তত্ত্ব ঢুকে গেছে। এই কথা মনে রেখে কুবিরের একটা পদ পড়া যাক :

আপে বারি পয়দা করি সরিক মাইকো তার
কী সুবেদে মহম্মদের নূরে পয়দা এ সংসার।
ভেসেছিলেন বিম্বু ভরে
হয়েছেন কুদরতের জোরে নীরেতে সাকার।
আল্লা আলেকেতে আলোকলতা
আলেকে করেন বিহার।

এখানে সব-কিছু একাকার হয়ে গেছে। আপে বলতে আপগরজে, বারি বলতে খোদা বা আল্লা। সে-আল্লার কোনো সরিক নেই। নূর বলতে দিব্যজ্যোতি, কুদরত মানে শক্তি। এইসঙ্গে আলেক সাঁইয়ের গুহ্য ধারণা মিলে অত্যাশ্চর্য ভাবনার পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে। এবারে কুবির বলছেন :

লা ইলাহা ইল্লালাহ মহম্মদ রসুল্লাহ
রাম কালা কালুল্লা কর রে মন সার।
আল্লা মহম্মদ রাধাকৃষ্ণ একাঙ্গ একাত্মা সার
আধকার প্রকাশ্য দিন দীনমহম্মদ দীনের অধীন
যারে মেহেরাল্লা আলমিন্ দোস্ত সে খোদার—
আল্লার নামের উপর নামের জারি
কীর্তি ভারি চমৎকার।

বোঝা গেল সাহেবধনীদের উপাস্য দীনদয়ালের বিচিত্র নির্মাণে রয়েছে কৃষ্ণ ও আল্লার সমন্বয়বোধ। তিনি দীনমহম্মদ ও দীনবন্ধুর সমাহার।

কুবিরের গানে যে-ইসলামি অনুষঙ্গ এবং হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়বোধ কাজ করেছে তা যে প্রকৃত ইসলামবিশ্বাসে গ্রহণযোগ্য নয় সে কথা বলা দরকার। 'রাধাকৃষ্ণ মহম্মদ একাঙ্গ' এ কথা কোনো নিষ্ঠাবান মুসলমান মানবেন না, এ চিন্তা তাঁর ধর্মবিরোধী। কিন্তু এ দেশের লোকায়ত চিত্ততলে এই মিলনস্বপ্ন অত্যন্ত সত্য ও গ্রহণীয় হয়ে উঠেছিল নইলে কুবিরের গান টিকত না। এখনও এই সময়ে বৃত্তিহুদা এবং তার চার পাশের গ্রামপরিমণ্ডলে প্রচুর মুসলমান চরণ পালের উত্তরপুরুষ বর্তমান গুরু শিশির পালের কাছে দীনদয়ালের নামে দীক্ষিত হচ্ছেন। মৌলবাদ সেখানে বাধা দিতে পারছে না। এখন প্রতিবছর চৈত্র মাসে অগ্রদ্বীপের মেলায় সাহেবধনীদের সমাবেশে হিন্দু মুসলমান একত্র বসে রান্না করে একসঙ্গে খায়। দীনদয়ালের ধারণায় কোনো জাতিবোধের স্বাতন্ত্র্য নেই। তারা পরম বিশ্বাসে তাদের দারিদ্র্যলাঞ্ছিত জীবনে যাদুবিন্দুর গান গায় :

গোঁসাই যে ভাবেতে যখন রাখো সেই ভাবে থাকি
অধিক আর বলব কী।
কখনও দুগ্ধ চিনি ক্ষীর ছানা মাখন ননী
কখনও জোটে না ফেন আমানি—
কখনও আ-লবণে কচুর শাক ভখি।

যাদুবিন্দু ছিলেন কুবিরের শিষ্য। গানের গোড়ায় 'গোঁসাই শব্দটি গায়কের কণ্ঠে হয়ে যায় 'সাঁই'। গানের মধ্যে ধরা আছে দরিদ্র মানুষের উচ্চাবচ জীবনপ্রক্রিয়া। কখনও প্রাচুর্য কখনও অনাহার। এমন-কি, কোনোদিন হয়তো কচুর শাকে নুন জোটে না। এদের ভরসা দীনদয়াল। খুব বড়ো মাপের দেবদেবীকে এরা ডাকে না।

খুব আপনজনের মতো তাঁর উপরে বিশ্বাস রেখে ভক্ত গায় :

দুখ দিতেও তুমি সুখ দিতেও তুমি
মান অপমান তোমার হাতে সুনামী বদনামী।
তুমি হও রোগীর ব্যাধি তুমি বৈদ্যের ঔষধি
তুমি এই সকলকার বল-বুদ্ধি।

যাদুবিন্দু এবারে আরেক ধাপ এগিয়ে বলেন :

তুমি সর্বঘটে রত্ত তুমি সর্বরূপ হও
ভালো কথা মন্দ কথা সবই তুমি কও।
কহিছে বিন্দুযাদু তুমি চোর তুমি সাধু
তুমি এই মুসলমান এই হিন্দু।

ধারণার পূর্ণতাবোধ তারিফ করবার মতো। উপাস্যের সর্বস্পর্শিতার মতো, সর্বত্রগামিতার মতো সহজ, অনায়াস এই বিশ্বাস যে 'তুমি এই মুসলমান এই হিন্দু'। দীনদয়ালের উপাসকদের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম যুক্তচৈতন্য খুব নিবিড় ও অবাধ। সেটা তাদের বহুসাধনার মহৎ অর্জন।

কুবিরের গান শুধু তাঁর ব্যক্তি অনুভবের গান নয় সর্বদা। তিনি যে-দীনদয়ালের ঘরের দীক্ষিত শিষ্য সেই গুহ্য সাধনার কিছু কিছু গুপ্তমন্ত্রের সম্প্রসারণ খুঁজে পাই তাঁর কোনো কোনো গানে। ওই বিশেষ ঘরের মন্ত্র ও বিশ্বাসে আছে ইসলামের সংক্রাম। কাজেই পরোক্ষভাবে ওই দিক দিয়েও কুবিরের গানে এসে গেছে কিছুটা ইসলামি তত্ত্ব। যেমন একটি গুহ্যমন্ত্রে আছে—

ক্লিং শ্লিং দীনদয়াল আল্লাধনী সহেবধনী সহায়।
গুরু সত্য। কাম সত্য। চন্দ্রসূর্য সত্য। খাকি সত্য।

এখানে 'খাকি সত্য' কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। খাকি কথাটি এসেছে ফারসি শব্দ খাকী থেকে। যার অর্থ ধুলাসদৃশ। খাক কথাটিও ফারসি, অর্থ ধুলা, মাটি। এই খাকিতে সত্য বলে বিশ্বাসস্থাপন কুবিরের গুরুবংশের লক্ষণ। এ বিশ্বাস তাই তাঁরও। সেজন্যই লেখেন :

নাই এমন আর—
এই মাটিতে খাঁটি করো মন আমার।
মাটি ব্রহ্মাণ্ড মূলাধার।
এই মাটিতে একে একে দীননাথ হয়েছেন দশ অবতার।

পৃথিবীর ধুলাসদৃশ এই খাকি বা মাটির তাৎপর্য বহুতর। ব্রহ্মাণ্ডের মূলাধার এবং দশাবতারের লীলাস্থল এই ভূমিত্রী। এ তো সহজ নয়। এই মাটিতেই মনকে লগ্ন করতে হবে। কেননা সৃষ্টির একেবারে সূচনায় :

আগে ছিল জলময়
পানির উপর খাকি রয়
খাকির উপর ঘরবারি সকল রে।

হিন্দুদের মুক্তি গঙ্গালাভে, মুসলিমের অভীষ্ট মাটিতে কবর। আসলে তবে কি দুটোই এক? কুবির বলেন,

ভাই রে যে আল্লা সেই কালা সেই ব্রহ্মাবিষ্টু
ও সেই বিষ্ণুর পদে হল গঙ্গার সৃষ্টি রে।

তা হলে যুক্তিক্রমে বোঝা গেল বিষ্ণু থেকে জলধারার সৃষ্টি এবং যেহেতু যিনি বিষ্ণু তিনিই আল্লা, তাই আল্লা থেকেও জলধারার সৃষ্টি। এর পরের ভাষ্য :

পানি আছেন কুদরতে
খাকি আছেন পানিতে।

এখানে কুদরত মানে দৈবশক্তি। অর্থাৎ দৈবসম্ভব পানি এবং সেই পানিতেই খাকি। খাকির অস্তিত্ব এই কারণে খুব মূল্যবান যে খাকিতেই দশাবতার লীলা, খাকিতেই মানবজীবন। তাই 'খাকি সত্য', পার্থিব জীবন সত্য। বলা হয়েছে 'স্বর্গ সত্য এ মাটিতে' আর সবচেয়ে বড়ো কথা 'চাষ আবাদ হয় এই মাটিতে / ফলে তায় নানা শস্য জীবাহার'। কুবিরের দৃষ্টি অনেক উদার, মানবিক ও জীবনঋদ্ধ। মাটি-মাখা জীবনের আলেখ্য ও আখ্যান তাঁর গানে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক। তিনি ভাববাদী নন।

এই অর্জন কোনো একক কুবির বা যাদুবিন্দুর নয়, এ এমন এক বোধ ও চেতনাপরিব্যাপ্ত যা এই দেশের বহু শতকের যাপনের অঙ্গ। বলা বাহুল্য, তা লোকায়ত যাপন। অসহায়, ব্রাত্য, অবজ্ঞাত যে-মানুষগুলি আশ্রয় নিয়েছে দীনদয়ালের নামের ছত্রতলে তাদেরই বিশ্বাস ও স্বপ্নের বাণীকার কুবির বা যাদুবিন্দু। তাঁরাও সেইজন্য কোনো বিচ্ছিন্ন একক গীতিকার নন। তাঁরাও সম্প্রদায়ী। ব্যক্তিগত অনুভব এবং লোকবিশ্বাসের গাঢ় তাপ তাঁদের কলমে বাণী জুগিয়েছে।

এবারে তবে কুবিরকে খুব একটা দীনহীন মনে হচ্ছে না, বরং সমৃদ্ধ। তাঁর পরিপ্রেক্ষিত খুব বড়ো, তাঁর মধ্যে যে-ঐতিহ্যের বিস্তার তা আজকের নয়, বহুদিনের ভাবনায় গড়ে ওঠা। নিজেকে সেই সমুন্নত ঐতিহ্যের ধারাবাহী হবার জন্য কুবির পড়েছিলেন ইসলামি শাস্ত্র। সে ব্যাপারে তাঁর অহংকার ছিল। বিনয় করে অবশ্য বলেছেন :

আমি নই কিছু এলেমদার—
সেই কেতাব কোরান জানিনেকো সন্ধি তার।
শুনে সাধুর মুখে প্রেমের কথা হক্‌নাম করেছি সার
হল তাতে মুগ্ধ মুলুক শুদ্ধ।

মুলুকশুদ্ধ মানুষ কুবিরের হকনামীতে মুগ্ধ ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কোরান কেতাব তাঁর ভালো করে অধিগত ছিল এবং এসব ইসলাম সংসর্গের জন্য তাঁরা হিন্দু সমাজে বদনাম হয়। সেই দুঃখে লেখেন :

মরি হায় রে আমি বুদ্ধিবিদ্যেহীন
তাই ভেবে মরি রাত্রিদিন—
এই মুসলমানের শাস্ত্র জেনে
আমি শূদ্র হইলাম কী কারণে?

এই খেদমূলক মন্তব্য থেকে বুঝে নেওয়া যায়, কুবির ইসলাম শাস্ত্র ভালোরকম জানতেন এবং নিজ সমাজে তার জন্যে 'শূদ্র' বলে চিহ্নিত হন। বাউল-ফকির-দরবেশদের ভাগ্য আমাদের দেশে সর্বদাই সংশয়িত ও নিন্দিত। যশোহরের পাগলা কানাই অসাম্প্রদায়িক ধুয়োজারি গান করে বেড়াতেন। তাঁর মৃত্যুর পর মোল্লারা জানাজা পড়তে রাজি হন নি। কুবির জীবিতকালেই বিতর্কিত ছিলেন।

সাহেবধনী সম্প্রদায় যেখানে গড়ে উঠেছিল সেই বৃত্তিহুদা-তালুকহুদা অঞ্চল এখনও মুসলমান-প্রধান। এটি নদীয়ার চাপড়া ব্লকের অন্তর্গত। চাপড়ায় জনবিন্যাসে দরিদ্র নিম্নবর্গের সংখ্যাধিক্য লক্ষণীয়। এঁদেরই বড়ো একটা অংশ ইসলাম ধর্ম নিয়েছিল এককালে এবং উনিশশতক থেকে এই জনপদে বিদেশী পাদ্রীরা নিম্নবর্গের বহু হিন্দুকে খ্রিস্টধর্মে-ধর্মান্তরিত করেন। ১৮৩৮ সালে এ অঞ্চলে প্রথম চার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪০ সালে চাপড়ার খ্রিস্টমণ্ডলী গড়ে ওঠে। এইজন্য কুবির তাঁর অন্ত্যবয়সের (মৃত্যু ১৮৭৯) অভিজ্ঞতা থেকে দশআজ্ঞা পালন বিষয়ে গান লিখেছেন। তাঁর অনেক গানে যীশুখ্রিস্টের উল্লেখ থেকে বোঝা যায় মানুষটি ছিলেন গ্রহিষ্ণু ও সমন্বয়বাদী। লক্ষণীয় যে কুবিরের গ্রামীণ পরিমণ্ডল ছিল ইসলাম-অধ্যুষিত এবং সেই মুসলমানরা

প্রধানত 'আত্‌রফ্' বা মধ্যবর্গের অকুলীন এক 'অর্‌জল্' বা নিম্নবর্গের শ্রমজীবী। এখনও বৃত্তিহুদা গ্রামে জোলা মুসলমানদের প্রচুর পরিমাণে বসবাস। তাঁরা অন্ত্যজ, অন্তত কুলীন আশরফদের খানদানে। যোগী-তাঁতি কুবির আর বৃত্তিহুদার জোলা মুসলিমদের বৃত্তিগত ভ্রাতৃত্ব বেশ কল্পনা করা যায়। তাঁত বিষয়ে তাঁর গান আছে এবং সুতোর বাজার আক্রা হলে সে প্রসঙ্গ তাঁর গানে এসে গেছে। এখানে মনে রাখা দরকার একটি দ্যোতক সমাপতন। লোকসমাজে যাঁরা গড়নদার সম্প্রদায় (অর্থাৎ চাষ বা মাছ ধরা যাদের জীবিকা নয়) সেই কামার-কুমোর-তাঁতি-জোলা-স্যাকরাদের জীবনচেতনায় উচ্চবর্গের ধর্মের প্রভাব কম। তাঁদের ভরসা তাঁদের দেহ, বাহুবল ও জাতিগত দক্ষতা। এঁরা অনেকাংশে তাই দেহবাদী এবং দেহতত্ত্বের গানে উৎসাহী। হিন্দুই হোক বা মুসলমানই হোক, কারিগর শ্রেণীর নিজস্ব বৃত্তিগত একরকমের সৌভ্রাত্র থাকে এবং তাঁদের উপাস্য 'বিশকরম' বা বিশ্বকর্মা। শাস্ত্রীয় ধর্মের চেয়ে লোকাচারের দিকে এঁদের ঝোঁক বেশি। এই গড়নদারির কাজ এঁদের গুহ্য বিষয়ের রহস্যময়তার দিকে ঠেলে দেয়। হাতের কাজের ফাঁকে ফাঁকে এঁদের গলায় গান বেজে ওঠে সাবলীলভাবে। মুসলমান বৃত্তিজীবীদের মধ্যে শ্রমকিশাঙ্ক জীবনের ত্বরা ও অনবসর, নামাজ-রোজা-হজ-জাকাত-জাতীয় সময়সাপেক্ষ বাহ্য আচরণের বাইরে রাখে। এঁদের অবলম্বন হয়ে ওঠে অশাস্ত্রীয় ফকিরি গান। ধড়ের বিচার বা দেহের তত্ত্ব বিশ্লেষ এঁদের খুব রোচক বিষয়। কুবির যেন এঁদের জিজ্ঞাস্য আর কৌতূহল পূরণের জন্য লিখেছেন :

এই ধড়ের বিচার করো রে মন ভাই
চোদ্দ পোয়ার মাঝে কোথা কোন্‌খানেতে বিরাজে সাঁই।
ধড়ের মাঝে হিন্দু যবন কোন্‌খানে কোন্ জগৎ নিরূপণ
কোন্‌খানে ব্রহ্মার আসন সেই কথা তোমারে শুধাই।

ধড়ের মাঝখানে হিন্দু-মুসলমানদের বিশ্বাসের জগৎকে দেখতে চাওয়া, এমন-কি, তাদের পুরাণপ্রসিদ্ধিকেও বুঝতে চাওয়া খুব অভিনব সন্দেহ নেই। অভিনব কিন্তু অস্বাভাবিক নয় এই জানা যে,

কোথা দোজক ভেস্তখানা ধড়ের কোন্‌খানে মদিনা
কোন্‌খানে কাফের বেদিনা কোন্‌খানে কারবালা কসাই।
ধড়ের কোন্‌খানে শহীদ হলেন হাসান হোসেন দুটি ভাই
কোন্‌খানে বৈকুণ্ঠপুরী গোলকনাথ গোলকবিহারী
ধড়ে বৃন্দাবন রয়েছে কোথা বিরাজ করেন কানাই বলাই।

হাসান-হোসেনের হত্যাক্ষেত্র এবং কানাই-বলাইয়ের লীলাক্ষেত্র দেখতে চাওয়া ধড়ের মাঝে যেন কত স্বাভাবিক। তাতে কোনো দ্বন্দ্বের বিন্যাস নেই। শরীরের মধ্যে বেহস্ত ও দোজখ দেখতে চাওয়া এবং বৈকুণ্ঠপুরীকে প্রত্যক্ষ করা যেন একই প্রয়াসের অন্তর্গত। কিন্তু এ তো দেখতে চাওয়া নয়, বুঝতে চাওয়া। লোকায়ত জীবনে বোঝার ভূমিকা বেশ বড়ো । তাঁদের বিশ্বাস সব-কিছুই এই নরদেহে লভ্য অথবা সবই নিজ দেহে কায়েম করতে হবে। দেহভাণ্ডই ব্রহ্মাণ্ডের অনুকল্প বা উলটে বললে ব্রহ্মাণ্ডই দেহে প্রতিফলিত। ইসলাম ধর্ম দেহকে খুব বড়ো স্থান দেয়। নামাজে শারীরিক ভূমিকা যথেষ্ট, রোজা আসলে দেহসংযম। ফকিরি বিশ্বাসে দেহে রূহ বা আত্মার অবস্থাননির্ণয় খুব জরুরি কাজ, লা-মাকান খুব পবিত্র স্থান। দেহে ছয় লতিফা বাস করেন এটা তাঁদের বিশ্বাস। ফকিররা তো কেতাব কোরানের চেয়ে দেল-কেতাবের মূল্য বেশি দেন। তাই কুবির গানের শেষ পর্বে বলেন, দেহের :

স্বর্গ মর্ত্য পাতাল আদি কোন্‌খানে পুলছেরত নদী
কোন্‌খানে আল্লাহাদি হবেন সেই আখেরি কাজাই।

দেহের মধ্যে স্বর্গমর্ত্য, কল্পনা, আখেরি দিনের বিচার ও পুলসিরাৎ নদী পার হবার কঠিন প্রতিমা কুবিরের

কবিপ্রতিভার চমৎকার স্বাক্ষর। তাঁর কল্পনায় ফকিরিতন্ত্র, ইসলাম, সুফিবাদ ও বাঙালি মুসলমান জীবনের লৌকিক ধারণা (যা সর্বক্ষেত্রে শাস্ত্রানুমোদিত নয়) মিলেমিশে গেছে। এমন মিশ্রণ থেকেই শ্রমজীবী ভাবুক গীতিকাররা ঈশ্বরকে বলতে পারেন গড়নদার বা কারিগর বা সূত্রধর। মানবদেহ তাঁদেরই গড়া। আড়ে দীঘে মাপা, তাতে নাই ছিদ্র, চোদ্দ পোয়া পরিমিত, ভেতরে অলক্ষে আছেন আলেক। আখ্যানটি সুন্দর, চলছে, লোকলৌকিকের স্রোতের টানে কত শত বছর ধরে এই বাংলায়। অপরূপ।

২.

সাহেবধনীদের উৎপত্তি নাকি জঙ্গীপুরে। মুর্শিদাবাদে। সেই আদি ভূমি এখন নাকি গঙ্গাগর্ভে— পালবাড়ির গুরুবংশ বলেন। হতে পারে। তবে এটা ঠিক যে সাহেবধনীদের গান আর দীন দয়ালের ঘরানা মুর্শিদাবাদ জেলায় ব্যাপক, বীরভূমেও। উত্তর রাঢ় অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে 'সাহেবধনীদের মাতৃবন্দনার গান' তা যেমন অদ্ভুত তেমনই অন্যরকম। বিষয়টি এই রকম :

মায়ের সেবা করো রে ভাই যাইবে তরি
মার দোয়াতে ভবপারে যাইবে তরি।
রসুলের ঐ জামানতে [সময়ে] একজনা একলিম নামেতে
সে জন কুল বেমারিতে [ব্যাধি] যাইল মরি।
রসুল্লাহ পয়গম্বরে পুছিলেন আকলিমের গোরে [কবরে]
দেখেন নবী সেই কব্বরে আজাব [কষ্ট] হয় ভারি।
আকলিমের মাতাকে এনে পুছিলেন তখুনই
কী গুনাহ [দোষ] করেছে বলো বেটা তোমারই।
রসুলের ও কথা শুনে তবে তো আকলিমের মাতা
আল্লার দরবারে বিধি করলেন জারি।
দেখো সে মায়ের দোয়াতে খালাস পাইল আজানতে
কইছে মুস্তাজ সভা হতে মার দরজা ভারি।।

একজন সম্পূর্ণ নতুন গীতিকারের নাম পাওয়া গেল : মুস্তাজ। সাহেবধনীদের মাতৃবন্দনার সার কথা যা জানা গেল তা 'সভা হতে মার দরজা ভারি' অর্থাৎ সবচাইতে মাতৃভূমিকা বড়ো। এ কথা দীনদয়ালের ঘরে খুব নতুন নয়। তাঁদের গানে 'রমণী দেখিয়ে ভাবে জননীর মতো' কথাটা চালু আছে। আসলে সাহেবধনী বলে নয়, লোকায়ত সকল ধর্মে মাতৃকাশক্তির প্রাধান্য আছে। 'পিতা বীজ মা ক্ষেত্র'। 'পিতা শুধু বীর্যদাতা/ ধারণ পালন কর্ত্রী মাতা' কথাটি খুব প্রচলিত। সেদিক থেকে মাতৃবন্দনা সঠিক, তবে যেটা আলাদাভাবে দেখবার তা হল মুস্তাজের রচনায় প্রবল ইসলামি অনুষঙ্গ ও আরবি শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ। মুস্তাজের পক্ষে সেটা স্বাভাবিক কেননা তিনি মুসলমান। কিন্তু কবিরের গানে প্রগাঢ় ইসলামি অন্তর্জগৎ ও শব্দসম্ভার বিস্ময়কর। একটি নমুনা :

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

এই আদি পাপে তাদের লজ্জা এল, জিবরাইল তাদের [illegible] হল লজ্জাবস্ত্র।

তখন :

সেথা চাষ আবাদ করে খায়
ওগো সিনাতে এক দাগ পড়ল মিছে নয়।
তখন হাত তুলে সেই আদম সফি খোদার দরগায়
মোনাজাত করেছিল।
আল্লাজি তার মেহের হল
উপরে তাকায়ে ছিল কথা মিছে নয়।
ওগো তখন আরশ দেখতে পায়
সে যে লায় এলাহা কলমা লেখা তাহার গায়—
সেহি নামের সাথে মহাম্মদা রসুল্ল রয়
দেখে আদম সেই নামেরে খেদে খেদে কয় কাতরে
এ যে নামের তাহিরে কেদে তৌবা করেছিল তাই
তাতে আদম সফি গুনা হতে মুক্তি পায়।
তখন খুশিতে ভূমিষ্ঠ হয়ে আল্লাজির গুণ গায়।।

গানের শেষে কুবির শ্রোতাদের জানাচ্ছেন :

ঘর বাড়ি কর ভাই বেরাদার কেউ কারও নয় আপনার।
নিদান কালে আল্লা বলে ডাকলে নি একবার।
আল্লার রসুল বল মুখে এহি দিন ভাই যাবে সুখে
এ কথা কোরানে লিখে—
আমি ভাবছি অধম গোনাগার
আমাকে দয়া করে তরাবে ঐ পরোয়ার।
আমি কলমা কালাম জানিনাকো কী হবে আমার
পড়ে এহি মায়ার ঘরে ঘুরে বেড়াই এ সংসারে
কুবির বলে চরণ ধরে অধম গোনাগার।।

এ গানের মূল লক্ষ্য তো মুসলিম শ্রোতা। দীর্ঘ এই গানটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হয় নি কিন্তু পড়তে পড়তে চমকাতে হয় ইসলামি আখ্যানে ও বাচনে কুবিরের দক্ষতা ও সিদ্ধিতে।

কেবল আরবি বুলি কিংবা ইসলামি অনুষঙ্গই কুবিরের রচনার পরাকাষ্ঠা নয়, তাঁরা মধ্যে খুব মৌলিক কল্পনাশক্তি রয়েছে, যা ইসলাম-আশ্রিত কিন্তু লোকায়ত। উচ্চবর্গের ধর্মশাস্ত্রের লোকায়ন অহরহ ঘটেছে এ দেশে, কুবিরের কিছু গান তাতে নতুন মাত্রা আনে। যেমন মসজিদ নিয়ে গান, মসজিদ নয়, বলা উচিত দেহ-মসজিদ। কত অপরূপ তার নির্মিতি :

মরি হায় রে সাত মসজিদের কথা শোন্
তোরা একে একে বসে গোন।
লিঙ্গ গুহ্য নাভিপদ্ম হৃদপথ আর নাভিপদ্ম
আরও পদ্ম আছে নিরূপণ।
আহা মসজিদের কী সুগঠন
তাতে নামাজ পড়ে যতজন
সেই হয় লতিফা হয়ে শুদ্ধ সেই পূর্ব মুখে হয়ে বদ্ধ

সেজদা দেয় শির লুটাইয়া মূলাধারে আছে মন।

এসবই আসলে দেহতত্ত্বের গুহ্য গান। কিন্তু দুর্বোধ্য নয়। যেমন :

মরি হায় রে শোন্ ধড় বিচারি ভাই
আমি তোমারে কিছু শোনাই—
তুমি কোন্ দিনেতে পয়দা হলে
আর কোন্ দিনেতে যাবে চলে
কোন্ দিনেতে গর্ভে ছিলে
কোন্ দিনেতে প্রসব হলে।।

ধড় বা দেহবিচারে জন্ম মরণ ছাড়া আরও জানবার আছে। শরীরের অন্তর্গত মাংস, মজ্জা ইত্যাদি সব-কিছুর হিসাব চাই, এমন-কি তার দৈর্ঘ্য প্রস্থ পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক। প্রাসঙ্গিক আরও অনেক অদৃশ্য কাল্পনিক বিষয়। শোনা থাক সেসব :

আমি ধড়ের হিসাব শুনতে চাই
কত গোস্ত পেলে বলো ভাই।
তোমার ওজুদে হাড় হাড্ডি তুলে
আজ ক্রমে ক্রমে যাও-না বলে
ওজন কত সুমার কত দেখে তুমি বলো ভাই।
তোমার ধড়ে আসমান কোথা সবে মেহেরাজ কোথা
আর খোয়াজ খিজির আছে কোথা
হজের হাট আছে কোথা
এই কথা কুবির শুধায় চরণ ভেবে কও হেথা।।

ইসলামি কল্পনা ও বিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি যেন এই গান। আসমান, সবে মেহেরাজ, জলদেব খোয়াজ খিজির এমন-কি, হজের হাট পর্যন্ত উল্লিখিত দেখে কুবির সম্পর্কে সম্ভ্রম জাগে। তাঁর সৃজনের জগৎ কত প্রসারিত। গান পড়তে পড়তে মনে হয় গীতিকার মুসলমান এবং শ্রোতাও মুসলিম সম্প্রদায়। কিন্তু আসলে তো গীতিকার হিন্দু এবং শ্রোতারা ছিলেন হিন্দু মুসলমান দুজনেই। কোথায় গেল সেই গানের সম্প্রীতি? কোথায় গেল সেই ঐশ্বর্যময় সমাজ যেখান থেকে যুক্তচৈতন্যের ফসল উঠত? আমরা বেশ অনুমান করতে পারি, হিন্দু শ্রেতারা যেমন কুবিরের ইসলামি গান উপভোগ করতেন তেমনই মুসলিম শ্রোতারা উপভোগ করতেন তাঁর বৈষ্ণব অনুষঙ্গের গান। তাঁরা সত্যিই বিশ্বাস করতেন দীনমহম্মদ আর দীনবন্ধু এক। সেই বিশ্বাসের দৃঢ় সমতল থেকে কুবিরের গান জেগে উঠেছে। সেখানে আল্লারসুল রাধাকৃষ্ণ এক উচ্চারণে মিলে যায়। তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী যুগলমন্ত্র আল্লা রসুল, যেমন রাধাকৃষ্ণ। এসব উচ্চারণ মৌলবাদীদের কাছে প্রচণ্ড আপত্তিকর কিন্তু লোকায়ত বিশ্বাসের নিজস্ব পরিমণ্ডলে মোল্লা ও ব্রাহ্মণ একেবারে অচ্ছুৎ, অনাকাঙিক্ষত। তাই অনায়াসে কুবিরের গান চলেছে। বিরোধ বাধে নি।

কুবিরের গানে লৌকিক ইসলামের একটা বড়ো ভূমিকা আছে, যা সর্বক্ষেত্রে শরিয়ৎ-অনুগত নয়। এ দেশের গ্রামীণ মুসলমান সমাজ বারব্রত করে। ভাইদ্বিতীয়া, নবান্ন, গোমাতার সেবা, পীরের থানে মানত ও সত্যনারায়ণের সিন্নি হিন্দুর মতোই মানে। হিন্দুর মতো ঘটলক্ষ্মীকে পুজো না করলেও ধান্যলক্ষ্মীকে তার মান্যতা দেয়। এ দেশের নিসর্গ তার শস্যসম্ভার আর পরিব্যাপ্তি নিয়ে গ্রাম্য জীবনে একটা আলাদা রহস্য গড়ে তোলে। জমি আর বীজ, জল আর মীন, তরঙ্গ আর নৌকা, ফুল আর ফল, সুতো আর তাঁত, লোহা আর ফাল জীবনকে নানা যুগ্মতার প্রতিমায় দেখায়। পুরুষ আর প্রকৃতি সেই প্রতিমার আদিকল্প, যার

ভেতরে আছে শুক্র ও শোণিত, বীর্য ও রক্ত। যা সৃষ্টির মূলীভূত সমন্বয়। এই উদার তত্ত্ব থেকে কুবির বলেন :

শনি শুক্কুল [শোণিত শুক্র] বীজরূপে এক
আব আতশ থাক বাদ চারে এক
চারের মধ্যে এক।
মনে বুঝে দেখো সৃষ্টির বিষয়—
আল্লার আত্মা রূপে সব শরীরে বিরাজ করে সর্বম
খোদায় তালায় সৃষ্টি করে
হাওয়া রূপে সব শরীর মধ্যে বিহরে—
দেখ রাম রহিম এক বস্তু বটে চরণ ভেবে কুবির কয়।।

এটাই সাহেবধনী ঘরের সত্য তত্ত্ব। তারই প্রাঞ্জল স্পষ্ট ভাষ্য রচনা করেছেন কুবির। মূল উপাদান দেহ, তাতে শুক্র-শোণিতের সমন্বয়ে জন্ম। আগুন হাওয়া মাটি জল এই চার উপাদান একত্র হয়ে রয়েছে পরিমণ্ডলে, তাতেই শস্য ও জীবন। আর সবশরীরে আল্লা আত্মারূপে আছেন কিন্তু তিনি হাওয়ার মতো অদৃশ্য এবং জীবনদায়ী। এসব কথা বুঝলে এটাও বোঝা সহজ যে রামরহিমও এক॰ তা হলে আর জাতের গোলমাল কেন? আল্লাকে কায়েম করো দেহের মধ্যে কিংবা উপাস্য হোক শ্রী গৌরাঙ্গ, যাঁর মধ্যে দিয়ে কলিকালে সম্প্রীতির বাণী এসেছে। কী তিনি করেছেন? কুবিরের মতে :

সৃষ্টিকর্তা যে হোক বটে
নবদ্বীপে গৌররূপে সকল জাত ছেঁটে
করলেন একচেটে।
সে এক মানলাম না-
তিনি হিন্দু মুসলমানের গুরু
জেনেও বিশ্বাস করলাম না।

কুবিরের দুঃখ এখানেও, আমাদের অবিশ্বাসের স্খলন নিয়ে। তাঁর দুঃখ অঢ়ার আজকের মুক্তবুদ্ধি ভারতবাসী অনেকের দুঃখ এক হয়ে গেছে। সংকটের দিনে ঘোলাজলের স্রোতাবর্তে কুবিরকে চাই আমাদের। জাগাতে চাই তাঁর গানের সত্য।

কুবিরের লেখা ইসলামি গান

কুবির গোঁসাইয়ের লেখা দু-তিনশো ইসলামি গান আছে। বেশিরভাগ গান সুদীর্ঘ। এখানে একটা নমুনা দেওয়া গেল।

ও আল্লা করলে গঠন কত যোজন এই চৌদ্দ ভুবন
ও তার দীঘে কত আড়ে কত ঊর্ধ্বে নিরূপণ।
সপ্তদ্বীপের মাঝে সপ্তসাগর হতেছে তুফান
আরও সপ্ত স্বর্গমর্ত্য সপ্ত পাতাল সে কেমন।
ও আল্লা কোন্ দ্বীপে কোন্ বেহস্ত কেমন করেছে সৃজন
ও তার লম্বা কত চওড়া কত কেমন তার গঠন।
আছে তার মাঝারে কী কী দ্রব্য অমূল্যরতন।

আরও কোন্ বেহস্ত কেমন জায়গায় নেকি নেকজাত যে কখন।।

আছে কোন্ দ্বীপেতে দোজক ভাই রে কর তার তদারক।
আছে বদি বান্দা কোন্ দুনিয়াতে কত নেক
যখন সে সব বান্দা তফাত হবে ধড় যাবে কি জাহান যাবে
দোজকে আজাব হবে কিছু সাপে দংশিবে হাহাকার করবে সদাক্ষণ।
দোজকের আগুনে রাত্রদিনে হবে রে খাক তন।
হবে রোজ কেয়ামত কোন্ দ্বীপেতে কী হবে ভাই মমিনগণ।।

ও আছে সপ্তদ্বীপে সপ্তসাগর দুনিয়ার বিচে
ও তার কোন্ কোন্ দ্বীপে আউলে ওলি পয়গম্বর আছে।
ও তার কোন্ দ্বীপেতে হাওয়া আদম সৃষ্টি করেছে—
বল কোন্ দ্বীপে শয়তানের খেলা ঘোলা পাকিয়ে বসেছে।।

ও আছে কোন্ বেহস্ত তুবা দিরাক উজলা করে
ফুটে দিবসে দশ লক্ষ ফুল এক ডালের ম্যাঝারে
ও তার ফুল বিংশতি ভ্রমণ [ভ্রমর] মধুপান করে
ও ভাই কত ফুলে কত ভ্রমরা হয় বল এক বছরে।।

ও তার কোন্ ফুলে কোন্ কলমা আছে হুকুমের জোরে
আবার কোন্ ফুলেতে কেমন লেখা আরবি অক্ষরে।
ও তার কত আয়েত ক নুক্তা নিচে ওপরে
হল কোন্ যুলেতে নবীর পয়দা আবদুল্লাকারির ঘরে।।

সেই ফুলের লেখা কর ভাই ও তার তুল্য দিতে কিছুই নাই
আছে নেকবান তার কতজনা কোন্ কোন্ ঠাঁই।
আছে কত ডালে কত ফ্যাকা ফুল ফোটে তাই থোকা থোকা
কর ভাই সেই ফুলের লেখা আলেক তন হবে সখা।
বেহেস্তের দরজা আঁটা ও তার মাঝখানেতে দেরাজ আছে রূপের কী ছটা
আছে আসমান জমিন আলো করে মণিময় মসজিদ কোঠা।

ও সপ্তদ্বীপের কোন্ দ্বীপেতে মক্কা মদিনা
আবার কোন্ দ্বীপেতে আছে সেই কাপতুল্লা আলখানা
আবার কোন্ দ্বীপে কারবালা আছে উড়ছে নিশানা
আবার কোন্ দ্বীপেতে শহিদ হল এমাম হোসেন বলো-না।।

ও আছে কোন্ দ্বীপেতে কোন্ রূপেতে আলি সাদানা
আছে কোন দ্বীপেতে আমির হামজা বিষম মর্দানা।
আবার চোদ্দ দিনের গত হতে ওজুদের ঠিকানা
চলে সাট্টা হাতি ওপর নিচে পৃথিবী নড়ে হয় ফানা।।

আছে এমন মর্দ কতজন তোমরা জানো সকল বিবরণ
আছে পাহাড় পর্বত দিরাক নদী অগণন।
আছে কোন্ দ্বীপে কোন্ সাধুর খেলা কে জপে কোন্ নামের মালা
ঠিক হল না কোন্ বেলা বেলা গেল না জানা।
পশুপক্ষী জানোয়ার আছে কোন্ দ্বীপেতে হস্তি ঘোড়া কোন্ দ্বীপে গণ্ডার
আছে কোন্ দ্বীপেতে সিংহ ডাকে ভুমিকম্প হয় জার।।

ও বারি চোদ্দ ভুবন চোদ্দ পোয়া সৃষ্টি করেছে
শুনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এহি ভাণ্ডে রেখেছে।
যে জন যে জন ধড় জানে ধড়বিচার জানে সেই তো বুঝেছে।
সাধুর সঙ্গে দীনহীনে কুবির কেন্দে মরেছে।।

ঔপনিবেশিক পূর্ব ভারতের আদিবাসী সমাজ : সাম্প্রতিক কয়েকটি ধারণার বিচার

বিনয় চৌধুরী

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ছয় দশককে ভারতের আদিবাসী উপজাতি সম্পর্কে গবেষণার 'সুবর্ণযুগ' বলা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে উদ্যোগ প্রধানত নৃতত্ত্ববিদ্‌দের। ষাটের দশকের পর থেকে আদিবাসী সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা কমতে থাকে। গত কয়েক বছরে এ বিষয়ে আবার নূতন উৎসাহ জেগেছে। ঐতিহাসিকদের গবেষণাও এ আলোচনায় যোগ করেছে নূতন মাত্রা।

আমাদের বর্তমান আলোচনা সম্প্রতি-প্রকাশিত একটা বইকে কেন্দ্র করে।[১] এ বইয়ের নির্বাচন একটা বিশেষ কারণে। দক্ষিণ বিহারের বিশাল আদিবাসী অঞ্চল ঝাড়খণ্ডকে নিয়ে এই বই লেখা হলেও ভারতের আদিবাসী সমাজ সম্পর্কে অনেক নূতন প্রশ্ন এতে তোলা হয়েছে। তা ছাড়া, পৃথিবীর নানা অঞ্চলের আদিবাসী সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির চরিত্র সম্পর্কে সাম্প্রতিক কালে নানা বিতর্ক উঠেছে; লেখিকা দেভাইয়ে (Devalle)-র বিশ্লেষণে এর প্রভাব সুস্পষ্ট।

এই প্রেক্ষাপটে ভারতের আদিবাসী সমাজকে বোঝার নানা বিকল্প পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ আছে।

১.

লেখিকা কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর উত্তরগুলিতেও যথেষ্ট অভিনবত্ব আছে। তাঁর মূল প্রশ্ন হল:

ক. ব্রিটিশ শাসককুল ঝাড়খণ্ডের আদিবাসীদের 'ট্রাইব' বলে অভিহিত করেছে। এ নামকরণ কি যথার্থ?

খ. আদিবাসীদের বর্ণনায় এই 'ট্রাইব' শব্দের ব্যবহার কি কোনো বিশিষ্ট অর্থময় শব্দের অসতর্ক প্রয়োগ? নাকি এর আড়ালে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের কোনো সচেতন মানসিকতা সক্রিয় ছিল? এতে রাষ্ট্রের কোনো বিশেষ স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায় ছিল কি?

গ. ঔপনিবেশিক আমলে বিচ্ছিন্ন আদিবাসীগোষ্ঠীগুলির মধ্যে আস্তে আস্তে ঐক্যের চেতনা প্রসার লাভ করে। তারা ভাবতে থাকে, তারা এক অখণ্ড 'জাতিসত্তা'র অংশ। এই নূতন বোধের উৎস কী? এর সৃষ্টিতে বহিরাগত শত্রুদের ('দিখু') বিরুদ্ধে নিরন্তর যৌথ প্রতিরোধের ভূমিকা কী ছিল?

ঘ. বিংশ শতাব্দীতে আদিবাসীদের নূতন ঝাড়খণ্ড আন্দোলন কি আগেকার প্রতিবাদী আন্দোলনের সমধর্মী? নাকি সংগঠন, ভাবাদর্শ ও নেতৃত্বের দিক থেকে ভিন্ন প্রকৃতির?

এ নিবন্ধের প্রথম ভাগ লেখিকার আলোচনার সংক্ষিপ্তসার। তাঁর আলোচনার কোনো কোনো অংশ স্পষ্ট করার জন্য আমাদের কিছু কিছু সংযোজনও আছে। দ্বিতীয় ভাগ তাঁর বিশ্লেষণের বিচার। উপরের প্রশ্নমালার ক্রমটাই আমরা অনুসরণ করব।

২.

লেখিকার একটা প্রধান সিদ্ধান্ত: ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী-সমাজকে বোঝানোর জন্য ট্রাইবের ধারণা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সৃষ্ট একটা মনগড়া তত্ত্ব মাত্র ('মিথ', 'কলোনিয়াল কনস্ট্রাকশন')। এর কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। এ ধারণার প্রভাব স্বাধীনতালাভের পরেও কাটে নি। আদিবাসী সম্পর্কে স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি অভিন্ন থেকে গেছে।

তিনি মনে করেন, আদিবাসীদের ক্ষেত্রে ট্রাইব অভিধা অসংগত। কারণ, ট্রাইব বলতে নৃতত্ত্ববিদ্‌রা এক বিশিষ্ট জনগোষ্ঠী বোঝান। (উনি অবশ্য পরিষ্কার করে বলেন নি, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রও ঐ একই অর্থে এই অভিধা ব্যবহার করত কিনা।) এ জনগোষ্ঠীর কয়েকটা চারিত্রিক লক্ষণ নৃতত্ত্ববিদ্‌রা নির্দেশ করেছেন। যেমন—এই সমাজ-সংগঠনের ভিত্তি সমতা (ইগালিটেরিয়ানিজম্) । তার অর্থ এই নয় যে জোতজমার পরিমাণ সবারই সমান। এর অর্থ, এই জোতজমার পরিমাণে পার্থক্য থাকলেও তার ফলে এমন কোনো গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে নি, যে অন্যদের উপর প্রভুত্ব কায়েম করতে পারত। আর-একটা লক্ষণ: অর্থনীতির স্বয়ম্ভরতা, স্বয়ংসম্পূর্ণতা। বাইরের জগতের সঙ্গে যোগ প্রায় নেই বললেই চলে। থাকলেও, অর্থনৈতিক লেনদেন একান্তই সীমিত। অর্থাৎ ট্রাইব গোষ্ঠী প্রতিবেশীদের জটিল অর্থনীতি ও সমাজ-বিকাশের মূলধারা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

লেখিকার মতে, এসব বৈশিষ্ট্যের কোনোটাই দক্ষিণ বিহারের আদিবাসী সমাজে দেখা যায় না। ব্রিটিশ আমলের অনেক আগেই এখানে অসাম্যের নানা লক্ষণ প্রকট হতে থাকে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা কোনো এক সময়ে হয়তো ছিল; কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের সূচনার অনেক আগে থেকেই তা ভেঙে পড়ছিল। মুণ্ডা ওরাওঁ অঞ্চলে তো বটেই। সেখানে রাজতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস দীর্ঘকালব্যাপী। নাগবংশী রাজ-পরিবারের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাষ্ট্রের উদ্ভবের (স্টেট ফরমেশন) ফলে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য নানা প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাবও অনিবার্য হল; যেমন—সৈন্য আর পুলিশবাহিনী, আদালত; বিভিন্ন স্তরের আমলা ইত্যাদি। এদের অনেকেই আদিবাসী জগতের বাইরে থেকে এসেছিল। ব্রিটিশ আমলে পুরোনো সমাজের আদলটাই গেল পালটে।

ট্রাইবের রূপলক্ষণগুলি আদিবাসী জগতে দেখা যায় নি। শুধু তাই নয়। এখানে অর্থনীতিতে, সমাজে বিকাশ ও পরিবর্তনের ধারা বহু জায়গায় আলাদা। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ট্রাইব নামক কৃত্রিম সংজ্ঞা বানিয়ে এই ভিন্নতা ও স্বাতন্ত্র্যকে উপেক্ষা করেছে।

প্রশ্ন থেকে যায়, যদি আদিবাসী সমাজকে ট্রাইব না বলা যায়, তাহলে তার যথার্থ পরিচয় কী হবে? তার গ্রামীণ অর্থনীতি ও সমাজ-সংগঠনের চরিত্র কী? অন্যান্য অঞ্চলের এই সংগঠনের সঙ্গে এর কোনো পার্থক্য কি কোথাও লক্ষ করা যায়? এইসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে লেখিকা পরিষ্কার করে কিছু বলেননি। আমরা পরে আবার এ প্রশ্নে ফিরে আসব।

২.১

লেখিকা মনে করেন, ট্রাইব নামক মনগড়া সংজ্ঞা বানানোর পেছনে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু আসলে তা কী, সেটা তাঁর আলোচনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় না।

একটা কথা তিনি বার বার বলেছেন—শুধুমাত্র বলপ্রয়োগে, ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম করা যায় না; উপনিবেশের মানুষের কাছে তাকে অন্যভাবেও গ্রহণীয় করতে হয়। গোড়ায় যার ভিত্তি শুধুমাত্র বলপ্রয়োগ,

প্রজাকুলের কাছে তাকে 'বৈধ' করে তোলার (লেজিটিমাইজেশন) জন্য কোনো ভাবাদর্শ (ইডিওলজি) প্রয়োজন। ট্রাইব এই ধরণের এক ভাবাদর্শ ('লেজিটিমাইজিং ইডিওলজি')।

যদি ধরেও নেওয়া যায় ট্রাইব আসলে একটা অবাস্তব, অনৈতিহাসিক সংজ্ঞামাত্র, তাতে এই বৈধীকরণের কাজ সহজ হয় কী করে? এর স্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যা লেখিকা দেন নি।

শাসনের সুবিধের জন্য এই সংজ্ঞার অন্য উপযোগিতার কথাও উনি বলেছেন। নানা জাতি, ধর্ম, বর্ণের লোক এ শাসনের আওতায় এসেছে। তাদের অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা, গ্রাম-সংগঠন ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে আলাদা। বিদেশী সরকার এ সম্পর্কিত সঠিক তথ্য না জানতে পারলে শাসনের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলে না। এই জানার উপর নির্ভর করছে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব নিরঙ্কুশ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় নানা কৌশল। এই জ্ঞান তো তথ্যের বিশৃঙ্খল কোনো সমাহার মাত্র নয়। এতে শৃঙ্খলা আনার একটা উপায় : প্রজাকুলের বিভিন্ন অংশকে আলাদা আলাদা বর্গে ভাগ করা। এর জন্য দরকার বিভাজনের নানা পদ্ধতি। এর একটা হল নানা জনগোষ্ঠীকে এক-একটা নামে চিহ্নিত করা। ট্রাইব আসলে এ ধরণের একটা চিহ্ন ('ট্যাক্সোনমিক ডিভাইস'। ভারতের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য এই চিহ্ন ছিল জাতি (কাস্ট)। জাতিপ্রথা অবশ্যই আগে থেকে ছিল; কিন্তু বিদেশী শাসক তাকে এমন ভাবে দেখাতে চেষ্টা করল, যেন ভারতীয় সমাজবিকাশের ধারা সম্পূর্ণভাবে এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; আর যেন তা অপরিবর্তনীয়, অচল, অনড়। লেখিকার মতে, ভারতীয়দের মধ্যে যাদের জাতি নামে চিহ্নিত করা গেল না, তাদের ফেলা হল ট্রাইবের দলে। ট্রাইব, জাতি—দুটোই কৃত্রিম চিহ্ন; জটিল জিনিসকে অতিসরলভাবে দেখানো।

তাঁর মতে, ট্রাইবের ধারণা বানানোর পেছনে সরকারের মাথায় অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির ভাবনাও ছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল, আদিবাসীদের আলাদা করে রাখতে পারলে রাষ্ট্রের নানা সুবিধে। দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি রাজমহল পাহাড়ের বিস্তীর্ণ ডামিন অঞ্চলে সরকারের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ আইনসিদ্ধ করে নেওয়ার কথা বলেছেন। এতে সমূহ লাভ সরকারের এবং তার উপর নির্ভরশীল বিদেশী পুঁজিপতির। পাহাড়ি অঞ্চলের জমি আর নানা অরণ্যসম্পদে সরকারের একচেটিয়া অধিকার কায়েম হল। পুঁজিপতিদের—বিশেষ করে বাংলা ও আসামের চা-বাগানের মালিকদের— লাভ হল অন্যভাবে। চা-বাগানের কাছাকাছি অঞ্চল থেকে কুলি পাওয়া দুষ্কর ছিল। তাই মালিকদের প্রধান নির্ভর ছিল বাইরে থেকে আসা কুলি। কুলির একটা বড়ো জোগান যেত ডামিন অঞ্চল থেকে, কারণ সরকারের একচেটিয়া কর্তৃত্বের ফলে সেখানকার আদিবাসীরা জমির উপর তাদের পুরোনো স্থায়ী অধিকার হারাল। রুজি-রোজগারের জন্য বহু সাঁওতাল তাই চা-বাগানে কুলির কাজ নিয়ে চলে গেল। ডামিনকে সরকার-নিয়ন্ত্রিত একটা বিচ্ছিন্ন (প্রিজার্ভড) আদিবাসী এলাকা হিসেবে ঘোষণা না করলে এ ধরণের 'সুফল' আসত না।

ট্রাইবের মনগড়া ধারণার প্রভাব ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পরেও কাটেনি। বরং এর ভিত্তি আরো মজবুত হয়েছে। বিশেষ করে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে; যেমন, আদিবাসীদের 'অপরিবর্তনীয় মানসিকতা', 'সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ'-সম্পর্কিত ধারণায়। বিদেশী শাসকের মতো স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রও ধরে নিল: আদিবাসীসমাজের অনগ্রসরতার একটা প্রধান কারণ, এই মূল্যবোধ, এই অনড় ঐতিহ্যপরায়ণতা। ভারতীয় রাষ্ট্রের নীতি-নিয়ন্তাদের মধ্যে কারো কারোর বিশ্বাস ছিল, আদিবাসী অঞ্চলে নূতন নূতন শিল্প গড়ে ওঠার ফলে কর্মসংস্থানের অনেক সুযোগ সৃষ্টি হলেও, আদিবাসীরা তাদের অভ্যস্ত 'জীবন-ধারা'র জন্য এর খানিকটা মাত্র গ্রহণ করতে পেরেছে। অথচ এর ফলে শিল্পায়নের গতি ব্যাহত হয়েছে, কারণ আদিবাসী অঞ্চল থেকে শ্রমের জোগান পর্যাপ্ত ছিল না।

লেখিকার মতে, আসল চিত্র এর বিপরীত। নূতন শিল্পমালিকের স্বার্থের জন্যই আদিবাসী অঞ্চলের

অনগ্রসরতা বজায় রাখার প্রয়োজন ছিল। বস্তুত শিল্পের প্রসার এবং এই অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ যোগ ছিল।[২]

২.২

ঔপনিবেশিক আমলে আদিবাসী জগতে আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটছিল। দিখুদের সঙ্গে আদিবাসীদের বিরোধ ক্রমেই তীব্র এবং ব্যাপক হয়ে ওঠে। এর একটা প্রকাশ যৌথ প্রতিরোধ-আন্দোলনের উদ্ভব ও বিস্তার। লেখিকা মনে করেন, প্রধানত এর ফলেই আদিবাসীদের মধ্যে এক নূতন চেতনার উন্মেষ ও প্রসার ঘটে ('এথ্‌নিক কনশাসনেস' নাম দেওয়া হয়েছে একে)। তারা ভাবতে শিখল, দিখুদের থেকে তারা স্বতন্ত্রই শুধু নয়, আদিবাসী হিসেবে তারা এক; এতকাল তারা নানা অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল; প্রতিরোধ আন্দোলনের ফলে তারা কাছাকাছি আসতে পেরেছে। আর তাদের মধ্যে বেড়েছে ঐক্য ও সংহতির চেতনা।

আদিবাসী হিসেবে স্বাতন্ত্র্যবোধ ও ঐক্যচেতনার প্রসারের সঙ্গে তাদের আন্দোলনের এক বিশিষ্ট প্রবণতার যোগ আছে বলে লেখিকা বলেছেন। তা হল, যেখানেই শুরু হোক, যে-কোনো বড়ো আন্দোলন একটা নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকত না; গোটা ঝাড়খণ্ডে তা ছড়িয়ে পড়ত। এই বৃহত্তর সংহতি-বোধ আদিবাসী হিসেবে তাদের স্বাতন্ত্র্যের চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছে।

আদিবাসী আন্দোলনের আরো একটা বৈশিষ্ট্যের কথা লেখিকা বলেছেন— তাদের ব্যাপক সামাজিক ভিত্তি। এ আন্দোলন শুধুমাত্র আদিবাসীদের আন্দোলন ছিল না; অনেক বাইরের লোকও এতে যোগ দিয়েছে, নানাভাবে সাহায্য করেছে। আদিবাসী গ্রামে তারা দীর্ঘ দিন ধরে বাস করেছে; আদিবাসী অর্থনীতিতে তাদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেউ কেউ কৃষিতে। অনেকে কৃষি এবং আদিবাসী অর্থনীতির অন্যদিকের সঙ্গে সম্পৃক্ত নানা কাজে, যেমন কামারের বৃত্তিতে। আদিবাসীদের কেউ কেউ নিজেরাই কামারের কাজ করত। কিন্তু বাইরের কামারের উপর আদিবাসী গ্রামের নির্ভরতা ক্রমেই বেড়েছে।[৩]

বাইরের লোক হলেও এখানকার অর্থনীতিতে তাদের ভূমিকা অপরিহার্য ছিল বলে আদিবাসীরা তাদের কিন্তু দিখু বলত না। আদিবাসীদের গ্রাম-সংগঠনে এদের সরাসরি কোনো যোগ না থাকলেও, এরা গ্রামীণ সমাজের অঙ্গ হিসেবে গণ্য হত। স্বভাবতই, আদিবাসীদের আন্দোলনে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া মিলেছে।

২.৩

আলোচ্য-বইয়ের একটা বড়ো অংশের বিষয়বস্তু বিংশ শতাব্দীর ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের ইতিহাস, বিশেষ করে আগেকার আন্দোলনের সঙ্গে তার নানা পার্থক্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রধান প্রধান আন্দোলনের সঙ্গে এর পার্থক্য মৌলিক। মূল লক্ষ্য, ভাবাদর্শ, সংগঠন, নেতৃত্ব— এইসব বিষয়ে ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের প্রকৃতি ভিন্ন।

আগেকার অনেক আন্দোলনের মূল লক্ষ্য প্রধানত রাজনৈতিক ক্ষমতার আমূল পুনর্বিন্যাস—দিখু গোষ্ঠীর ক্ষমতা ও আধিপত্যের বদলে আদিবাসীদের অধিকার ও কর্তৃত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। একেবারে গোড়া থেকেই যে এই লক্ষ্য তাদের সব আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করেছে, তা নয়। আন্দোলনের সব পর্যায়ে এই উদ্দেশ্যের কোনো পরিবর্তন হয় নি তাও নয়। কিন্তু দিখুদের সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের আমূল

পরিবর্তনের অপরিহার্যতা সম্পর্কে তারা ক্রমেই নিঃসংশয় হয়ে উঠছিল; বিশেষ করে, সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে তাদের পুরোনো আস্থা ভেঙে যাবার পর। দিখুদের ক্ষমতা খর্ব করার আন্তরিক কোনো চেষ্টাই সরকার করে নি; বরং, আদিবাসীদের আন্দোলন সরকার তার বিপুল সৈন্য ও পুলিশবাহিনী দিয়ে নানাভাবে দমন করতে চেষ্টা করেছে। এর অনিবার্য ফল, দিখুদের অপ্রতিহত ক্ষমতা বৃদ্ধি। আদিবাসী নেতৃত্বের নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মাল, বর্তমান রাষ্ট্রশক্তির চৌহদ্দির মধ্যে তাদের পরিত্রাণের কোনো সম্ভাবনা নেই। দিখুদের উচ্ছেদ ছাড়া তাই বিকল্প কোনো পথ নেই।

প্রতিবাদী আন্দোলনের এই বিশিষ্ট রূপ বিংশ শতাব্দীতে আস্তে আস্তে ম্লান হয়ে আসে। মাঝে মাঝে তা যে আবার ফিরে আসে নি তা নয়। ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের সময়েও তা দেখা গেছে। কিন্তু আগেকার মতো সমাজ-ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনে বিশ্বাসের জোর তখন অবসিতপ্রায়।

ঝাড়খণ্ড আন্দোলন এই নূতন পর্যায়ের আন্দোলন। এর মেজাজ প্রধানত সংস্কারপন্থী। অন্তত কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কর্মসূচিতে এটা স্পষ্ট। অবশ্য, এই কর্মসূচি আন্দোলনের প্রতিটি স্তরে সর্বতোভাবে কার্যকর হতে পারে নি। কারণ যে-কোনো বড়ো আন্দোলনে মূলস্রোতের আশেপাশে নানা স্বতন্ত্র প্রবাহ এসে মেশে। মূল স্রোতের তীব্রতায় অনেক সময় তারা হারিয়ে যায়।

কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ধরে নিয়েছিল, সরকারি আইনকানুনের মাধ্যমে দিখুদের ক্ষমতা খানিকটা খর্ব হয়তো করা যাবে, কিন্তু তাদের অস্তিত্ব, তাদের প্রতাপকে স্বীকার করে নিতেই হবে। তা ছাড়া, শুধুমাত্র সরকারের সদাশয়তার উপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না; নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্য আদিবাসীদের নিজেদেরই সচেষ্ট হতে হবে। এই ধরণের মনোভাবে, সেখানকার খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রচারের প্রভাব সুস্পষ্ট। আদিবাসীদের তারা বেশ-কিছুদিন ধরে বোঝাতে চেষ্টা করেছে, তাদের আন্দোলনের মূল লক্ষ্য যদি হয় দিখু-কর্তৃত্বের সম্পূর্ণ বিলোপ, তা হলে তা কখনো সিদ্ধ হবে না। বরং এই আন্দোলনে অনিবার্য হিংসার প্রয়োগ আদিবাসীদের ক্ষতিই করবে। কারণ সরকার এটা বরদাস্ত করবে না। তাই তাদের আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হতে হবে, যাতে দিখুদের শোষণের ক্ষেত্র আপনা থেকেই সংকুচিত হয়ে আসে। যেমন, শিক্ষার বিস্তারের ফলে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে তাদের সচেতনতা বাড়বে; আইন-আদালতে তাদের পক্ষে সওয়াল জোরালো হবে। আদিবাসীরা যদি নিজেরাই সমবায়নীতির ভিত্তিতে সঞ্চয় প্রকল্প গড়ে তুলতে পারে, তা হলে মহাজনদের উপর তাদের আগেকার নির্ভরশীলতা কমে যাবে।

আন্দোলনের নেতৃত্বেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদের আন্দোলনের নেতাদের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। আর্থিক অবস্থার দিক থেকে অন্যান্য গ্রামবাসীদের সঙ্গে তাদের বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না। ওরাওঁ আন্দোলনের কয়েকজন নেতা তো দিনমজুর বা ধাঙ্গড় (এ আন্দোলন প্রধানত বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে হয়েছিল; তবুও এটা আগেকার আন্দোলনের সমধর্মী)। অধিকতর আর্থিক সংগতি থাকলেও নেতা হিসেবে তাদের স্বীকৃতিতে এর বিশেষ কোনো তাৎপর্য ছিল না। তাদের প্রভাবের মূল উৎস প্রধানত নৈতিক। আদিবাসীরা তাদের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে, কারণ শোষণ-মুক্ত এক নূতন যুগ আসন্নপ্রায়, নেতাদের এই ঘোষণা আদিবাসীদের উদ্বুদ্ধ করেছে।

বিংশ শতাব্দীর নূতন ধরণের আন্দোলনের যারা নেতা, অনেক ক্ষেত্রে তাদের সামাজিক ভিত্তিই আলাদা। প্রায় ক্ষেত্রে তারা গ্রামের সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় লালিত মানুষ নয়। তাদের শিকড় শহরে। তাদের প্রধান যে বৈশিষ্ট্য—স্কুল-কলেজের কেতাবি শিক্ষার সঙ্গে পরিচয়—তা শহরের সঙ্গে যোগ ছাড়া সম্ভব ছিল না। অনেক নেতা মিশনারিদের স্কুলে শিক্ষালাভ করেছে। ধরেই নেওয়া যায়, এরা এসেছিল অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন ঘর থেকে।

শহরের আবহাওয়ায় এদের শিক্ষাদীক্ষা— শুধু এজন্যই তাদের নেতৃত্বে সংস্কারপন্থী ঝোঁক আসে নি। বরং

শিক্ষার প্রভাবে নেতা হিসেবে তাদের ভূমিকা সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী হতে পারত। আদিবাসী সমাজের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অনেক সুসংবদ্ধভাবে এই নেতারা উপস্থাপিত করতে পারত। দিখুদের আধিপত্য-প্রতিষ্ঠার সহায়ক নানা ধ্যান-ধারণার বিকল্প এক সুসংহত ভাবাদর্শ তারা প্রচার করতে পারত। অর্থাৎ গ্রাম্‌শির ভাষায়, এরা 'অরগ্যানিক ইনটেলেকটুয়্যাল'-এর— বাংলায় যার তরজমা করা যায় 'অঙ্গাঙ্গি বুদ্ধিজীবী'— ভূমিকা নিতে পারত।

সংস্কার-পন্থায় তাদের নিশ্চিত বিশ্বাসের মূল কারণ : তারা ধরেই নিয়েছিল, আগেকার আন্দোলনের কায়দায় আদিবাসী সমাজের মঙ্গল আসবে না। তা ছাড়া, দিখুদের তারা এই সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছিল। তাই ভবিষ্যতের আদিবাসী সমাজের অপরিহার্য ভিত্তি হবে আদিবাসী ও দিখুদের সহাবস্থান।

এই ধারণা থেকে ঝাড়খণ্ড আন্দোলনে সম্পূর্ণ নূতন একটা প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঝাড়খণ্ড এলাকার আদিবাসী এবং অন্যান্য নানা সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মধ্যে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক পার্থক্য ও ব্যবধান নেতাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হল না। তারা ভেবে নিল, গোটা এলাকাটারই একটা বিশিষ্ট সত্তা গড়ে উঠেছে— নানা ভিন্নতা সত্ত্বেও তা এক এবং অখণ্ড। আগেকার আন্দোলনে যে সংহতি, স্বাতন্ত্র্য ও ঐক্যচেতনার কথা বলেছি, তা সম্পূর্ণভাবে এককেন্দ্রিক— যার কেন্দ্র শুধুমাত্র আদিবাসী জগৎ। আদিবাসীরা যাদের দিখু বলে মন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, তাদের উপস্থিতি ছিল একান্ত অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশ, উপদ্রব; তাই বর্জনীয় বাহুল্য মাত্র। ঝাড়খণ্ড আন্দোলন তাই আদিবাসীদের স্বাতন্ত্র্য-চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আঞ্চলিকতা সম্পর্কে ধারণাই এর ভিত্তি। এর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল এই অঞ্চলটুকু জুড়ে এক রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ধারণা; ঝাড়খণ্ড অঞ্চল হবে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ কর্তৃত্বের সীমানা। পরে 'ঝাড়খণ্ড রাষ্ট্র'-এর কথাও বলেছে নেতারা।

আন্দোলনের নেতা বা প্রবক্তাদের এই আঞ্চলিক অখণ্ডতা সম্পর্কে তাই ক্রমাগত প্রচার করতে হয়েছে। প্রচারের মূল কথা হল : এই অঞ্চলের নানা অধিবাসীদের অনেক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ঐতিহাসিক কারণে সমগ্র অঞ্চলটাই একটা 'কমিউনিটি' হিসেবে গড়ে উঠেছে। যেখানে আদিবাসী ও দিখুদের বিরোধ, আর সংঘর্ষই অনবরত ঘটেছে, সেখানে এই কমিউনিটি মানসিকতা কী ভাবে গড়ে উঠতে পারে? 'ঝাড়খণ্ড রাষ্ট্রে'র সৃষ্টিই বা কী করে এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাবে? নেতারা এর সঠিক কোনো উত্তর দেয় নি। শুধুমাত্র তাদের এই নিশ্চিত বিশ্বাসের কথা বলেছে : নূতন রাষ্ট্রের সৃষ্টিতে দীর্ঘদিনের বিরোধ ও অবিশ্বাসের সম্পর্ক আপনা থেকে দূর হয়ে যাবে। আদিবাসীরা এই প্রচারে বিভ্রান্ত হয় নি, তা নয়।

২.৪

লেখিকার প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিচারের আগে তার মূল বক্তব্যগুলি আবার সংক্ষেপে বলে নিতে চাই। (আমরা আগেই বলেছি, তাঁর বিশ্লেষণের কোনো কোনো অংশ আরো স্পষ্ট করার জন্য আমরা বেশ-কিছু সংযোজনও করেছি।)

ক. আদিবাসী সমাজের চরিত্র বোঝানোর জন্য ট্রাইব শব্দের প্রচলন মূলত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সৃষ্টি।

খ. ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের আদিবাসীদের সম্পর্কে এই ধারণা যথার্থ নয়। ট্রাইব বলতে নৃতত্ত্ববিদ্‌রা একটা

বিশেষ ধরণের সমাজ ও অর্থনীতি বোঝান। সেই বৈশিষ্ট্যগুলি এখানে দেখা যায় না। ঐতিহাসিক কারণে এই সমাজ ও অর্থনীতির বিকাশের ধারা সব অঞ্চলে সমানও নয়।

গ. আদিবাসীদের বর্ণনায় ট্রাইব শব্দের ব্যবহার মোটেই অসতর্কতার ফল নয়। সচেতনভাবেই এটা ব্যবহার করা হয়েছে। এই নামকরণ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের নানা স্বার্থসিদ্ধির সহায়ক হয়েছে।

ঘ ট্রাইব নামক মনগড়া ধারণার প্রভাব স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রশাসনও কাটিয়ে উঠতে পারে নি। 'আদিবাসী মানসিকতা' বলে স্বতন্ত্র, অপরিবর্তনীয় কিছু একটা আছে— প্রশাসনিক নীতি-নিয়ন্তাদের অনেকেরই এটা বিশ্বাস ছিল।

ঙ. ঔপনিবেশিক আমলের আগে ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কৃতিক বা অন্য কোনো যোগসূত্র ছিল কিনা, লেখিকা পরিষ্কার করে বলেন নি। তবে ব্রিটিশ আমলে এই ঐক্য ও সংহতি চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ সন্দেহাতীত। এর প্রধান কারণ, নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য দিখুদের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের সম্মিলিত প্রতিরোধ-আন্দোলনের বিস্তার।

চ. বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ ছাড়া এই বিশিষ্ট ধরণের আন্দোলন পরে ক্রমশ বিরল হয়ে যায়। নূতন ধরণের আন্দোলন, প্রধানত ঝাড়খণ্ড আন্দোলন, মূলত সংস্কারমুখী। এর লক্ষ্য, নেতৃত্ব, সংগঠন, ভাবাদর্শ ও অনুগামীদের সামাজিক ভিত্তি আলাদা ধরণের। কোনো কোনো সময় এই আন্দোলনও আগেকার আন্দোলনের মানসিকতা তৈরি করতে সাহায্য করেছে; কিন্তু ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের মূল ঝোঁক তাতে প্রভাবিত হয় নি।

৩.

লেখিকার বক্তব্যের সবচাইতে মৌলিক অংশ হল: ট্রাইব আসলে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের তৈরি ঐতিহাসিক-ভিত্তিহীন এক মনগড়া ধারণা মাত্র; রাষ্ট্রের বিশেষ স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসেবেই এই বানানো কথার আশ্রয়। তাঁর বিশ্লেষণের অন্যান্য বেশ-কিছু অংশও এর সঙ্গেই সম্পৃক্ত। তাঁর বক্তব্যের এ অংশ মৌলিক এই অর্থে যে ভারতবর্ষের আদিবাসী সম্পর্কে পূর্ববর্তী নৃতত্ত্ববিদ্দের আলোচনায় এর তুলনীয় কিছু বা এর আদল দেখা যায় না। তাঁদের লেখাতেও ট্রাইব শব্দের ব্যবহার অপর্যাপ্ত। এই শব্দের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া হয় নি, কিন্তু কোথাও তাঁরা বলেন নি ট্রাইব এই নামকরণে আদিবাসীদের সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি বিকৃত হয়েছে।

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের আমলা-গোষ্ঠীর নানা রচনাকে আমরা প্রথমে দৃষ্টান্ত হিসেবে নিতে পারি[৪]। আদিবাসী সমাজের আলোচনায় তাঁদের অবদান স্বীকৃত। সম্প্রতি কেউ কেউ[৫] বলেছেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় নৃতত্ত্ববিদ্দের সরলীকৃত নানা ধারণা এই আমলাদের চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে। যেমন— আদিবাসীরা বাইরের জগৎ থেকে বিযুক্ত; নিষ্কলুষ, অপাপবিদ্ধ, সরল তাদের জীবনযাত্রা; 'সভ্য' সমাজের জটিলতার কোনো ছোঁয়া তাতে নেই ইত্যাদি।

আমলাদের রচনায় কিন্তু এই 'প্রভাবে'র কোনো চিহ্ন দেখি না। ব্যতিক্রম যে ছিল না তা নয়[৬]। তবে বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্কহীন— এই ধারণার সামান্যতম আভাসও মেলে না। এটাই স্বাভাবিক। আদিবাসীদের সম্পর্কে তাঁদের জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধিৎসা মোটেই শখের ব্যাপার ছিল না। এর প্রেরণা মূলত অপরিহার্য প্রশাসনিক প্রয়োজন। আদিবাসী জগৎ সম্পর্কে তাঁদের প্রথম খেয়াল হল, সেখানকার নানা ধরণের সংগঠিত বিক্ষোভে। গোড়ার দিকে তাঁরা ভেবেছিলেন, এই বিক্ষোভের যুক্তিসংগত, দীর্ঘমেয়াদী কোনো কারণ নেই। তাঁদের ভুল

ভাঙল অচিরে। খোঁজ করে তাঁরা জানলেন, বাইরের নানা লোক নানাভাবে আদিবাসীদের উত্যক্ত করে তুলেছে; এমন-কি সরকারি নানা বিধিব্যবস্থাকেও দিখুরা প্রশ্রয় হিসেবে নিয়েছে।

আদিবাসীদের সম্পর্কে আমলাদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র ক্রমেই বিস্তৃত হল। শুধুমাত্র দিখুদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নয়; তাদের সমাজ-সংগঠন, ধর্ম-বিশ্বাস, রীতিনীতি, আচার— এসবও তাঁরা বুঝতে চাইলেন। তাঁদের বিশ্লেষণে অসম্পূর্ণতা অবশ্যই ছিল। সেটা স্বাভাবিক। আদিবাসী সমাজের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বোঝার জন্য তার সঙ্গে যে অন্তরঙ্গ পরিচয় দরকার, সেটা তাঁদের ছিল না। কিন্তু সাংস্কৃতিক দিক থেকেও যে আদিবাসীসমাজ বিচ্ছিন্ন নয়, সেটা তাঁরা পরিষ্কার বলেছেন। বিশেষ করে, হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাবের নানা দিক তাঁরা আলোচনা করেছেন[৭]।

আর-একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা পেশাদারি নৃতত্ত্ববিদ্‌দের[৮] লেখা নিতে পারি। আদিবাসীদের সম্পর্কে গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে। তাঁরাও ট্রাইব কথাটার অর্থ পরিষ্কার করে বোঝান নি। কিন্তু কখনো তাঁরা বলেন নি, আদিবাসীরা একান্ত স্বয়ন্তর, বৃহত্তর ভারতীয় সভ্যতার মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো জনগোষ্ঠী। বরং তাঁদের গবেষণার সময়কালে আদিবাসীদের জীবন-চর্যায় অন্য সংস্কৃতির, বিশেষত হিন্দু সংস্কৃতির, প্রভাব আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। তাকে অস্বীকার করা তাই সম্ভব ছিল না।

তাঁদের নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্য অবশ্যই ছিল। তা কিন্তু হিন্দু ও আদিবাসী সমাজের মধ্যে সম্পর্কের অস্তিত্ব নিয়ে নয়; তা এই দুই সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের উৎস, চরিত্র ও তাৎপর্য নিয়ে।

যেমন, নির্মলকুমার বসু বলেন, হিন্দু সমাজ তার একান্ত নিজস্ব কায়দায় আদিবাসী সমাজকে আস্তে আস্তে নিজের মধ্যে মিশিয়ে নিচ্ছে ('হিন্দু মেথড অব ট্রাইব্যাল অ্যাবসর্পশন')।[৯] তাঁর মতে এই দুই সমাজের যোগ প্রথমে সংস্কৃতিগত ছিল না। ছিল প্রধানত অর্থনৈতিক। হিন্দু সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে আদিবাসীরা ক্রমেই জড়িয়ে পড়ে। পরে সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই সংযোগ অনিবার্য হয়ে ওঠে। হিন্দু সংস্কৃতির নানা দিক আস্তে আস্তে তারা গ্রহণ করে। কিন্তু হিন্দু সমাজ জোর করে তার কোনো বিশ্বাস, মূল্যবোধ চাপাতে চায় নি। আদিবাসীদের নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস, ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে স্বাধীনতাতেও হিন্দু সমাজ কোনো হস্তক্ষেপ করে নি। হিন্দু সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে যোগের ফলে তাদের আগেকার অনিশ্চিত জীবিকাতেও খানিকটা নিশ্চয়তা এল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনিবার্য অসাম্যের ফলে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু তা কখনো তীব্র হয়ে ওঠে নি; এবং বিশেষ উপলক্ষ ছাড়া প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের রূপও নেয় নি। সহযোগিতার পরিবেশে এই বিরোধের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়নি।

আবার কেউ কেউ[১০] যেমন কুমার সুরেশ সিং মনে করেন, 'হিন্দু' কথাটার উপর এই ধরণের জোর দেওয়া অনাবশ্যক ও অযৌক্তিক । তাঁর মতে, হিন্দু-আদিবাসী সম্পর্কের ভিত্তি মূলত অর্থনৈতিক। সাংস্কৃতিক যোগাযোগ মোটেই অনিবার্য ছিল না। এই দুই গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যেই বিরোধের বীজ ছিল। সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ফলে সেই বিরোধের কারণ দূর হয় নি। হিন্দু-সংস্কৃতির প্রভাবের ফলে এই বিরোধের বদলে সহিষ্ণুতার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে, এ ধারণাও আংশিক সত্য মাত্র।

সুরেশ সিং আরো বলেন, কৃষি-উৎপাদনের প্রকরণ ও কৌশল -গত কোনো কোনো দিক আদিবাসীরা প্রতিবেশী সমাজ থেকে শিখেছে বটে, কিন্তু প্রতিবেশীরা প্রধানত ব্রাহ্মণ-গোষ্ঠী, এবং নূতন নূতন গ্রাম পত্তনের উদ্যোগ শুধুমাত্র তাদের—এই ধারণা সবক্ষেত্রে সত্য নয়। অব্রাহ্মণ অনেক কৃষকগোষ্ঠী বা কৃষিকাজের সঙ্গে সম্পর্কহীন নানা কারিগর-সম্প্রদায়ের (আর্টিজান্) থেকেও আদিবাসীরা এই কৌশল শিখেছে। বরং এদের

সঙ্গে আদিবাসীদের যোগ ঘনিষ্ঠতর। হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব অনেক সময় এদের মাধ্যমেই আদিবাসী গ্রামে ছড়িয়েছে।

নৃতত্ত্ববিদ্দের কেউ কেউ যেমন, আঁদ্রে বেতেই (Andre Beteille), 'আদিবাসী' আর 'কৃষক'—এই দ্বৈত অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।[১১] তাঁরা বলেন, 'কৃষক' বলতে সমাজতত্ত্ববিদ্রা যা বোঝান, তা বহুলাংশে ভারতের আদিবাসীদের সম্পর্কেও প্রযোজ্য। কিন্তু তাঁরাও কখনো বলেন নি, ট্রাইব ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সৃষ্ট কৃত্রিম ও অবাস্তব একটা ধারণা।

৪.

আমরা বলতে চেয়েছি ভারতের আদিবাসী সমাজ সম্পর্কে পূর্ববর্তী নৃতত্ত্ববিদ্দের রচনায় এমন কোনো নিদর্শন মেলে না যে ট্রাইব একটা বানানো ধারণা (কনস্ট্রাকশন) এবং এ নামকরণ বিদেশী শাসককুলের নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির একটা অপকৌশল মাত্র। সাম্প্রতিক কালে কেউ কেউ অবশ্য এ রকম কথা বলছেন। যেমন, জগন্নাথ পথী।[১২] তাঁর রচনার উল্লেখ লেখিকা বার বার করেছেন। পথীর অনেক বক্তব্যও মোটামুটি এক।

আসলে লেখিকা আর পথী (এবং আরো কেউ কেউ) সাম্প্রতিক কালে পৃথিবীর অন্যান্য জায়গার আদিবাসী জগৎ, বিশেষ করে ঔপনিবেশিক আমলে আফ্রিকার সমাজ সম্পর্কে নূতন চিন্তা-ভাবনার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। এই নূতন বিতর্কের একটা সংক্ষিপ্তসার তাই এখানে প্রাসঙ্গিক।[১৩]

আফ্রিকার নৃতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিকেরা (ইবাদান স্কুল অব হিস্টরি) তাঁদের সমাজ ও ইতিহাস সম্পর্কে বিদেশী পণ্ডিতদের, বিশেষ করে ব্রিটিশ নৃতত্ত্ববিদ্দের, অনুসন্ধান পদ্ধতি, চিন্তাভাবনা, আর অনেক সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করেন না। তাঁরা বলেন, গোড়া থেকে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রয়োজনেই আফ্রিকার সমাজ-সম্পর্কিত ব্রিটিশ নৃতত্ত্ববিদ্যা গড়ে উঠেছে। তাঁদের সমাজকে বোঝার জন্য বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধিৎসা থেকে এই বিদ্যার সূচনা হয় নি। শুরু থেকেই এক বিশেষ ধরণের মানসিকতা এই বিদ্যাচর্চার মূলধারাগুলিকে প্রভাবিত করেছে। এই মানসিকতা কীভাবে গড়ে উঠল, আমরা তা প্রথম দেখব।

ঔপনিবেশিক শাসনের স্থায়িত্বের কথা মনে রেখে শাসকগোষ্ঠীকে নূতন এক প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করতে হল। কারণ উপনিবেশের সামাজিক রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তাদের সম্পূর্ণ অজানা। তাই শাসকেরা প্রত্যক্ষ শাসন ('ডাইরেক্ট রুল')-এর পন্থা গ্রহণ করে নি। তারা চেয়েছিল, আফ্রিকার সমাজের প্রতিপত্তিশালী গোষ্ঠীকে এই শাসনের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত করতে। এতে সুবিধে অনেক। একেবারে সরাসরি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অনেক বেশি ব্যয়বহুল। স্থানীয় গোষ্ঠীর উপর নির্ভরতায় খরচ কমে। তা ছাড়া ঔপনিবেশিক শাসনের নিরাপত্তার দিক থেকেও এটা একটা আদর্শ বিকল্প। সম্পূর্ণভাবে বাইরের লোক দিয়ে শাসন চালানোর চেষ্টাতে শাসক ও শাসিতের মধ্যে ব্যবধান পরিণামে ক্রমেই দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে পড়ে। বিজাতীয় শাসককুল সম্পর্কে বিদ্বেষ অলক্ষ্যে বাড়তে থাকে; এর ফলে সংঘর্ষের পরিধি প্রশস্ত হতে থাকে। সৈন্য-সামন্ত দিয়ে শাসিতের প্রতিরোধ হয়তো ভাঙা যায়, কিন্তু শাসিতের বঞ্চনাবোধ ও পুঞ্জীভূত অসন্তোষ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে প্রবল অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে। তাই অপ্রত্যক্ষ শাসন এই রাষ্ট্রের পছন্দ।

প্রশ্ন হল: এর ভিত্তি হিসেবে সমাজের কোন্ গোষ্ঠী বা অংশের উপর বিদেশী শাসক নির্ভর করবে? ব্রিটিশ নৃতত্ত্ববিদ্দের মূল অনুসন্ধান এই প্রশ্নকে ঘিরে। এই নির্ভরযোগ্যতার উৎস সন্ধানের ফলে গড়ে উঠল

এক বিপুল গবেষণা, যার বিষয় : আফ্রিকার সমাজে জ্ঞাতিসম্পর্কের (কিনশিপ) বিন্যাস, জ্ঞাতিদের বিভিন্ন অংশের মধ্যেকার সম্পর্ক, সেখানকার রাষ্ট্রিক ক্ষমতার বণ্টনে এই সম্পর্কের ভূমিকা। এই ব্যবস্থার মূল শিকড় কত দূর ছড়ানো, তা বোঝার জন্য জানতে হল, এই জ্ঞাতিবর্গের আদিপুরুষ কে ছিল? নৃতত্ত্ববিদ্‌রা জানলেন, এই আদিপুরুষ সর্বত্র এক নয়, একাধিক এবং বহু। এভাবে গড়ে ওঠা বিভিন্ন সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সংগঠন পরস্পরের থেকে ভিন্ন, স্বতন্ত্র। একটা কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তি বহুক্ষেত্রে গড়ে ওঠে নি। রাষ্ট্র-ব্যবস্থার এই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এবং বহুত্বকে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র নানাভাবে ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছে। কারণ এই বহুত্বের মধ্যে ব্যবধান ও বিভেদের বীজ লুকিয়ে ছিল।

আফ্রিকার সমাজের মূল বৈশিষ্ট্য বোঝাতে বিদেশী পণ্ডিতেরা ট্রাইব কথাটাই প্রধানত ব্যবহার করেছেন। দীর্ঘদিন ট্রাইব বলতে তাঁরা কী বোঝান, তা পরিষ্কার করে বলেন নি। ধরতে গেলে, তাঁদের ঔপনিবেশিক শাসন-ঘেঁষা বিশ্লেষণের মূল প্রবণতা সম্পর্কে আফ্রিকার পণ্ডিতমহলের ক্রমবর্ধমান প্রতিবাদের পৃষ্ঠপটেই তাঁরা উনিশশো পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে সর্বপ্রথম ট্রাইবের সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করেন। আফ্রিকার নানা অঞ্চলের ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে ততদিনে তাঁদের পুরোনো অনেক ধারণা পালটে গেছে। এই বৈচিত্র্যের জন্য তাঁদের কেউ কেউ বললেন, ট্রাইব কথাটার সংজ্ঞা নির্দেশ প্রায় অসাধ্য; ট্রাইব-এর বদলে 'ট্রাইব্যাল সমাজ' (ট্রাইব্যাল সোসাইটি) কথাটার ব্যবহার অনেক বেশি যুক্তিসংগত। কিন্তু এরও সংজ্ঞা অসম্পূর্ণ থাকল। এই সমাজের কয়েকটা মাত্র চরিত্রলক্ষণের কথা বলা হল। যেমন : এর অর্থনীতি সম্পূর্ণ স্বয়ম্ভর, কিন্তু জীবন-ধারণের জন্য যতটুকু উৎপাদন দরকার, এই অর্থনীতিতে শুধু ততটুকু উৎপাদনই সম্ভব; উদ্‌বৃত্তের পরিমাণ স্বভাবতই নগণ্য; কেননা উৎপাদনের কলা-কৌশল একেবারে অনুন্নত। এখানে লিখিত ভাষা বলতে কিছু নেই; তাই নেই কোনো সাহিত্য, নেই উল্লেখযোগ্য সংস্কৃতি। কোনো একাত্মবোধ, সংহতিবোধ নেই, এ সমাজের মানুষের মধ্যে। ধর্ম সমাজজীবনের সঙ্গে এমন ভাবে জড়িয়ে আছে যে তাদের আলাদা করা যায় না, ইত্যাদি।

পরে অবশ্য কোনো কোনো পণ্ডিত বলেছেন, ট্রাইব একেবারে বিচ্ছিন্ন, সংহতিবোধহীন, ক্ষুদ্র ও সীমিত জনগোষ্ঠী নয়। একটা 'রক্তের সম্পর্ক' এদের মধ্যে খানিকটা ঐক্যের বন্ধন সৃষ্টি করেছে। এরা কোনো এক আদিপুরুষের বংশধর বলে নিজেদের ভাবল। ক্রমে বিস্তৃত হয়েছে এই বংশের গণ্ডি; তবুও তারা নানাভাবে নিজেদের এই বিশাল বংশের অঙ্গ বলে মনে করল।

আফ্রিকার পণ্ডিত আর ভাবুকরা তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিদেশী নৃতত্ত্ববিদ্যার বিষয় ও সীমানা ঔপনিবেশিক শাসনের আশু প্রয়োজনের কথা মনে রেখেই ঠিক হয়েছে, অন্তত গোড়ার দিকে। আফ্রিকার সংস্কৃতির বৈচিত্র্য আর ব্যাপ্তি শুধুমাত্র 'কিনশিপ'/ 'ট্রাইব্যাল' ব্যবস্থা-সংক্রান্ত গবেষণায় ধরা পড়তে পারে না।

৪.১

আফ্রিকা-সম্পর্কিত ব্রিটিশ নৃতত্ত্ববিদ্যা সাম্রাজ্যবাদের ঘনিষ্ঠ দোসর—এটাই ছিল আফ্রিকার পণ্ডিতদের মূল সমালোচনা।

তাঁরা বিদেশী নৃতত্ত্ববিদ্যার আরো একটা পক্ষপাত-দুষ্ট ঝোঁককে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করলেন। বিদেশীরা বোঝাতে চাইলেন, প্রাক্-ঔপনিবেশিক আফ্রিকার 'অন্ধকারাচ্ছন্নতা'র একটা প্রধান দিক, এই ভূখণ্ডের কোনো

ইতিহাস নেই। অন্তত যে-পদ্ধতি অনুসরণ করে ইয়োরোপে ইতিহাস-গবেষণার বিকাশ হয়েছে, আফ্রিকার ক্ষেত্রে তার জন্য পর্যাপ্ত উপকরণ নেই। তাঁরা আরো বললেন, বিক্ষিপ্ত উপকরণ থাকলেও এই ইতিহাস জানার চেষ্টা অর্থহীন। যদি প্রাক্-ঔপনিবেশিক আফ্রিকার কোনো অর্থময় ইতিহাস না থাকে, তা হলে তার সত্যিকারের ইতিহাস কবে থেকে শুরু হল? তাঁদের দ্বিধাহীন উত্তর: ঔপনিবেশিক আমলের শুরু থেকে। তাঁরা এক অনিবার্য সিদ্ধান্তে এলেন— অনগ্রসর আফ্রিকার সমাজে পরিবর্তনের প্রেরণা এবং গতিবেগ তার ভেতর থেকে আসবে না; আসবে 'উন্নত', 'আধুনিক' পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে। (কালচার কনট্যাক্ট -এর তত্ত্ব এইভাবে সৃষ্টি হল।) আফ্রিকার আদি ইতিহাস সম্পর্কে তাঁদের এই অনীহা প্রায় দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠল আরো একটা কারণে। নৃতত্ত্ববিদ্‌দের একটা প্রধান গোষ্ঠী (স্ট্রাকচারাল ফাংশনালিস্টস) বললেন, ইতিহাসচর্চা তাঁদের অনুসন্ধানের এক্তিয়ারে পড়ে না।[১৪]

আফ্রিকার পণ্ডিতসমাজ ব্রিটিশ নৃতত্ত্ববিদ্‌দের এইসব সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বর্জন করলেন। তাঁরা বললেন, তাঁদের ইতিহাস সম্পর্কে বিদেশীদের ধারণা শুধু ভ্রান্ত নয়, আফ্রিকাবাসীর পক্ষে চরম অবমাননাকরও। ভ্রান্ত এই কারণে যে বিদেশীরা ধরে নিয়েছেন, ইতিহাস-রচনার উপকরণ সব ক্ষেত্রে একই রকমের হবে; তাঁরা শুধুমাত্র লিখিত উপকরণকেই নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন। অন্য ধরণের সম্ভাব্য ব্যবহারযোগ্য উপকরণ সম্পর্কে ভাবেনই নি। যেমন, মানুষের মুখে মুখে চলে-আসা অতীত ইতিহাসের অব্যাহত স্মৃতি (ওর‍্যাল ট্র্যাডিশন)। এই স্মৃতিকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে আফ্রিকার সমাজে নানা কল্পকাহিনী, পুরাণ। বর্তমান অস্তিত্বের সঙ্গে তা নানাভাবে মিশে আছে; তাই তো তা আরো বেশি সজীব। আফ্রিকার ঐতিহাসিকেরা (এ বিষয়ে অগ্রগামী ভূমিকা ছিল ইবাদান স্কুল অব হিস্টরি-র) বললেন, এই নূতন ধরণের উপকরণের ভিত্তিতে তাদের অনুপূর্ব ইতিহাস সম্পূর্ণ নূতন করে লিখতে হবে। তাতেই ধরা পড়বে তাদের সমাজ-বিকাশের বহুমুখিতা, বৈচিত্র্য এবং ঐশ্বর্য। আফ্রিকার ইতিহাস নেই— বিদেশী পণ্ডিতদের এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার অপ্রমাণ না করলে আফ্রিকাবাসীরা তাদের লুপ্ত আত্মমর্যাদাবোধ ফিরে পাবে না। এই ইতিহাস-সচেতনতা তাদের স্বাধিকার লাভের প্রয়াস ও সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করবে। বিদেশী পণ্ডিতদের সচেতন ইতিহাস-বিমুখিতার পরিবর্জন আফ্রিকায় নৃতত্ত্ববিদ্যাচর্চার বিকাশের পথে এক অপরিহার্য পদক্ষেপ।

গ্রন্থকারের বিশ্লেষণে ব্রিটিশ নৃতত্ত্ববিদ্যা সম্পর্কে আফ্রিকার পণ্ডিত সমাজের এই বিরূপ সমালোচনার প্রভাব সুস্পষ্ট। আরো একটা প্রভাব সম্ভবত আছে, যদিও এরকম প্রত্যক্ষ হয়তো নয়। ভারতের আদিবাসী সম্পর্কে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ধারণার কথা বলতে গিয়ে তিনি বার বার বলেছেন, ইয়োরোপ প্রাচ্যকে যেভাবে বুঝেছে, বর্ণনা করেছে, উপস্থাপিত করেছে এই ধারণা তার অংশবিশেষ।[১৫] বোঝার এই বিশিষ্ট রীতি ও চরিত্র 'ওরিয়েন্ট্যালিস্ট ডিসকোর্স' নামে পরিচিত। এডওআর্ড সইদ (Edward Said) -এর বিখ্যাত বই 'ওরিয়েন্টালিজম্' (১৯৭৯) প্রকাশিত হবার পর এই মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা ও বিতর্ক নানা মহলে শুরু হয়েছে। লেখিকা নিজেই এই বইয়ের সবিশেষ উল্লেখ করেছেন।

এই বক্তব্যের মূল কথা[১৬]: প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা নিছক কৌতূহল থেকে শুরু হয় নি; এটা কোনো আশু প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কহীন, 'বিশুদ্ধ', 'নিরপেক্ষ জ্ঞানচর্চা' 'নিউট্রাল সায়েন্স' নয়। এখানে অনুসন্ধিৎসা প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের এক বিশেষ সম্পর্ককে ঘিরে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রাচ্য ভূখণ্ডের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে। তা হল: ক্ষমতা আর পদমর্যাদায় প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য আলাদা। প্রতীচ্য প্রবলতর শক্তি; এই শক্তি তার রাজনৈতিক প্রভুত্বের অঙ্গ; আর প্রাচ্য বিজিত, হীনবল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে গড়ে-ওঠা ধারণা থেকে ক্রমে সৃষ্টি হল এক সুসংবদ্ধ ভাবাদর্শের (ইডওলজি), যা আবার প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মধ্যে ক্ষমতার সম্পর্কে যে-অসমতার ভিত্তি, তাকে সুদৃঢ় করতে সাহায্য করেছে। এই ভাবাদর্শের একটা ফল দাঁড়াল, রাজনৈতিক দিক থেকে অধীন প্রাচ্য নামক এক ভৌগোলিক অস্তিত্বের উপর মনগড়া 'প্রাচ্যত্ব' আরোপ ('ওরিয়েন্টালাইজিং

দি ওরিয়েন্ট')। যার অর্থ : প্রাচ্য ভূখণ্ডের যেন এক অপরিবর্তনীয় সত্তা আছে— যা প্রতীচ্য থেকে একে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। লেখিকা অবশ্য কোথাও পরিষ্কার করে বোঝান নি, ভারতের আদিবাসী সম্পর্কে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ধারণা কী অর্থে এই ওরিয়েন্ট্যালিস্ট ডিসকোর্স-এর অংশবিশেষ (যাকে উনি বলেছেন, 'ইয়োরোপিয়ান কনস্ট্রাকশন অব পার্ট অব ইণ্ডিয়ান রিয়ালিটি')।

৫.

গ্রন্থকারের বিশ্লেষণের উপর দুটি সাম্প্রতিক বিতর্কের সম্ভাব্য প্রভাবের কথা আমরা আগে আলোচনা করেছি। এবার তাঁর মূল বক্তব্যের বিচারের জন্য আমরা দুটো প্রশ্ন আলোচনা করব: ক. ট্রাইব কথাটাকে গ্রন্থকার যে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের আমলারাও কি তাই করেছেন? খ. ট্রাইব নামকরণের আড়ালে এই রাষ্ট্রের যে বিশেষ স্বার্থসিদ্ধির সচেতন প্রয়াসের কথা তিনি বলেছেন, তা সত্যিই ছিল কি?

গ্রন্থকারের আলোচনা থেকে মনে হয়, তিনি ধরে নিয়েছেন, এই রাষ্ট্রের আমলারা দীর্ঘ ঔপনিবেশিক আমলে ট্রাইব নামক একটা নির্দিষ্ট সুসংবদ্ধ ধারণা মাথায় রেখে শাসনে নেমেছিলেন। এটা সত্যি বলে মনে হয় না। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, এই শতাব্দীর পঞ্চাশ বা ষাটের দশকের আগে ব্রিটিশ নৃতত্ত্ববিদ্‌রাই ট্রাইব কথাটার পরিষ্কার কোনো সংজ্ঞা দেন নি। আফ্রিকার সমাজ সম্পর্কে তাঁদের আগের যে-ধারণা, তা আসলে প্রাথমিক একটা অনুমান মাত্র; এই সমাজের সামগ্রিক রূপকে বোঝার জন্য একটা প্রকল্প মাত্র (হিউরিস্টিক ডিভাইস)। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হবার কোনো কারণ ছিল না। আদিবাসী সমাজ সম্পর্কে এখানকার আমলাদের ধারণা ক্রমেই পরিষ্কার হয়েছে; কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমূল পালটেও গেছে।

ব্রিটিশ শাসককুলের ট্রাইব শব্দের প্রয়োগ যে সুশৃঙ্খল কোনো যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না, তার একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি। কোনো কোনো অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়কে তারা 'অপরাধপ্রবণ' ট্রাইব (ক্রিমিনাল ট্রাইবস্) বলে চিহ্নিত করে। অনিশ্চিত জীবিকার জন্য এসব সম্প্রদায়ের লোকেরা এমন সব কাজকর্ম করতে বাধ্য হত, যাকে আইনের ভাষায় বলা হল, 'অপরাধ'(ক্রাইম)। শুধু তা-ই নয়, এই 'অপরাধপ্রবণতা'কে বলা হল অপরিবর্তনীয় এক মানসিকতার ফল; 'অপরাধ' করা যেন তাদের 'ধর্ম'। ঐতিহ্যসম্মত এক ধরণের আচরণবিধি। রাজমহল পাহাড়ের অধিবাসী 'পাহাড়িয়া'দের এইভাবেই বলা হল 'লুটেরা আদিবাসী'।

এখানে একটা জিনিস বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই 'অপরাধপ্রবণ' সম্প্রদায়গুলি বিশেষ অর্থে আদিবাসীই নয়। বহুক্ষেত্রে তারা হিন্দু সমাজের অন্তর্গত, অন্ত্যজ, নিম্নবর্ণের লোক। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমনকি মুসলমান তাঁতিদেরও এইভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তাদের বাসও আদিবাসী এলাকায় নয়। তাই এখানে ট্রাইবের সম্ভাব্য অর্থ—ছোটো ছোটো গোষ্ঠী।

এটা উল্লেখযোগ্য যে আলাদা আইন বানিয়ে (ক্রিমিনাল ট্রাইব্স অ্যাক্ট, ১৮৭১, যদিও এর প্রথম প্রয়োগ শুরু হয় ১৯১৪/১৬ সালে) সরকার এইসব সম্প্রদায়ের লোকেদের 'অপরাধপ্রবণ জাতি' হিসেবে ঘোষণা করল। আসলে এই আইনের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। এদের 'অপরাধ' দমনের কাজ সহজ ছিল না; তাই এই আইনের মাধ্যমে সরকার চেয়েছিল, সহজ কোনো উপায় বাতলানো। দেওয়ানি মামলার জন্য নির্দিষ্ট নিয়মকানুন মেনে চললে 'অপরাধীদের' শনাক্ত করা ও শাস্তি দেওয়া কঠিন ছিল; কারণ এই মামলা বিচারের একটা অপরিহার্য অঙ্গ ছিল নিখুঁত সাক্ষীসাবুদ সংগ্রহ। এই ধরণের 'অপরাধীদের' কাজের রীতি বা গতিবিধি যে-

রকম ছিল, তাতে এসব জোগাড় করা সহজ ছিল না। তাদের কাজকে গোড়া থেকে 'অপরাধ' আখ্যা দিলে আইনের চুলচেরা প্রয়োগ সম্পর্কে সরকারের কোনো দায় থাকে না। তা হলে ম্যাজিস্ট্রেট বা অন্যান্যরা নিজেদের বুদ্ধিমতো এই 'অপরাধ' দমনের উপায় ঠিক করতে পারে। এই আইন বানানোর সময় আমলারা পরিষ্কার বলল, কঠোর শাস্তি ছাড়া ঐ 'অপরাধীদের' শায়েস্তা করা অসম্ভব। অনেকে নির্দ্বিধায় বলেছে, ওদের নিজেদের এলাকা থেকে না তাড়িয়ে দিলে 'অপরাধ' নিবারণ দুঃসাধ্য।

যেসব সত্যিকারের আদিবাসী সম্পর্কে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ট্রাইবের ধারণা বানিয়েছিল বলে গ্রন্থকারের বিশ্বাস, তাদের দৃষ্টান্তও নেওয়া যেতে পারে। যেমন : সাঁওতাল। সরকারি নথিপত্র থেকে দেখা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকের কাছাকাছি সময় থেকে এদের গতিবিধি ও কার্যকলাপ ঔপনিবেশিক প্রশাসনের নজরে আসে। এটা বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো যে, তাদের সম্পর্কে প্রশাসনের ধারণা মোটেই নিজের তৈরি নয়। প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের ধারণার আদলেই এটা গড়ে উঠেছে। চাষবাসের কাজের জন্য সাঁওতালদের ভূমিকা ওখানে বহুক্ষেত্রে অপরিহার্য ছিল, কারণ কৃষির উপর ছিয়াত্তরের মন্বন্তরকালীন বিপুল লোকক্ষয়ের প্রভাব তখনো কাটে নি। সাঁওতালদের মতো নিপুণ আর পরিশ্রমী চাষীর সাহায্য ছাড়া নষ্টজমির উদ্ধার সম্ভব ছিল না। অথচ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এদের সম্পর্কে ছিল হিন্দুসমাজের প্রচণ্ড অবজ্ঞা। হিন্দুরা মনে করত, ওরা 'নিকৃষ্ট' এক জনগোষ্ঠী; সভ্য জগতের সীমানার বাইরে; অন্ত্যজ, 'ব্রাত্য, মন্ত্রহীন'। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বুকানন হ্যামিলটন ভাগলপুরে গ্রাম-পরিক্রমার সময় হিন্দুদের এই মনোভাবের কথা জানতে পারেন। গ্রামের যে-অংশে বর্ণহিন্দুদের বাস, সাঁওতালদের সেখানে বাড়িঘর বানানোর কোনো অধিকার ছিল না। তারা থাকত গ্রামের নির্দিষ্ট সীমানার বাইরে। হিন্দুদের গোরুর দুধ দোয়া এদের পক্ষে ছিল নিষিদ্ধ, মনে করা হত, তাদের 'অশুচিতায়' গোরু বা দুধের পবিত্রতা নষ্ট হবে। এর কোনো ব্যত্যয় ঘটলে সারা গ্রাম এই 'অনাচারের' প্রতিবাদ জানাত। আদিবাসীদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের আমলাদেরও এক দীর্ঘস্থায়ী অবজ্ঞার ভাব সম্ভবত বর্ণহিন্দুসমাজের এই উন্নাসিকতার আর প্রাধান্যপ্রবণ ভাবাদর্শের (হেগিমনিক ইডিওলজি) পরিমণ্ডলে গড়ে উঠেছিল।

আদিবাসীদের সম্পর্কে আমলাদের ধারণাও যে ক্রমে ক্রমে পালটে গেছে, তারও দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে। গোড়ায় আদিবাসীদের সংঘবদ্ধ বিক্ষোভের ঘটনায় উদ্‌বিগ্ন আমলারা হামেশাই বলেছে, এটা লুটেরাদের কাজ; এদের স্বভাবই লুট-তরাজ করা; কড়া হাতে এদের দমন না করলে নূতন রাষ্ট্রের সমূহ বিপত্তি। স্বভাব-দোষে এরা 'লুটেরা', 'দাঙ্গাবাজ' বনে গেছে— এই ধারণা পরে আর থাকল না। বিক্ষোভের কারণ খোঁজার ফলে দেখা গেল, আসল ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিক্ষোভের সংগত কারণ ছিল দিখুদের 'উপদ্রব'; সরকারও ঐ দিখুগোষ্ঠীর অন্তর্গত। এই প্রসঙ্গ আগেই উল্লেখ করেছি।

আমলাদের আরো একটা আদি ধারণায় পরিবর্তন এল। আগেই বলেছি, বর্ণহিন্দুসমাজের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবে তারাও এককালে বিশ্বাস করত, আদিবাসীদের 'সভ্যতা' হিন্দুদের তুলনায় অনেক 'নিকৃষ্ট'। এমনও তারা বলেছে, এই নিকৃষ্টতা দূর করা দুঃসাধ্য, কারণ এটা আদিবাসীদের 'অপরিবর্তনীয়' চরিত্রের ফল। এইসব বিশ্বাসও ক্রমে বদলে গেল। আদিবাসীদের সমাজ-সংগঠন, ধর্মবিশ্বাস, আচার, নীতিবোধ ইত্যাদি আমলারা আস্তে আস্তে অনেক ভালো বুঝতে পারল।

অন্য ধারণা যাই থাকুক, আদিবাসীরা স্বয়ম্ভর, বিচ্ছিন্ন এক জনগোষ্ঠী— এই ধারণা আমলাদের কোনো কালেই ছিল না। কারণ তারা গোড়া থেকে দেখেছে, আদিবাসীরা নানাভাবে এক বৃহত্তর রাষ্ট্রব্যবস্থা ও অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত।

সরকার আদিবাসীদের মাঝে মাঝে আলাদা আইনকানুনের ভিত্তিতে শাসন করতে চেষ্টা করেছে। এর

কারণ এই নয় যে সরকার তাদের বিচ্ছিন্ন কোনো সম্প্রদায় বলে মনে করত। সরকারের বিশ্বাস ছিল, অন্যত্র প্রযোজ্য আইন, বিধিবিধান মেনে শাসন চালালে দিখুদের ক্ষমতা খর্ব করা কঠিন হবে; স্থানীয় প্রশাসন আদিবাসীদের বিশেষ প্রয়োজনমতো ব্যবস্থাদি নিলে তাদের মঙ্গল হবে। সরকার কখনো বলে নি, দিখুদের থেকে তাদের সম্পূর্ণ আলাদা করে রাখা সম্ভব। তারা মনে করেছে, সরকারি কোর্ট-কাছারির নিয়মকানুনের বেড়াজাল থেকে আদিবাসীদের বার করে না আনলে বিত্তবান, চতুর দিখুদের সঙ্গে তারা পাল্লা দিতে পারবে না। অবশ্য সরকারের এই চেষ্টা সফল হয় নি। তার একটা প্রধান কারণ, দিখুদের দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত অধিকার ও ক্ষমতায় তারা হস্তক্ষেপ করতে চায় নি। তারা শুধু চেয়েছিল ওদের ক্ষমতা আর যাতে সহজে না বাড়ে।

৫.১

ট্রাইব যদি বিদেশী শাসকের বানানো নূতন কোনো ধারণা না হয়, তা হলে এই ধারণা-সৃষ্টি বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য প্রণোদিত, গ্রন্থকারের এই যুক্তি বাহুল্য মাত্র। তবুও আমরা দেখব, এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত যথার্থ কিনা।

এ বিষয়ে তাঁর দেওয়া একটা দৃষ্টান্ত আগে উল্লেখ করেছি[১১]। সেটা বিচার করতে পারি। রাজমহলের বিশাল অরণ্য-অঞ্চল ডামিন-ই-কো-তে নিরঙ্কুশ সরকারি নিয়ন্ত্রণের ঘোষণা সরকারের স্বার্থসিদ্ধির একটা কৌশল বলে তিনি মনে করেন।

ডামিন অঞ্চলকে খাস সরকারি এলাকা বানানো, আর এখানকার আদিবাসীদের জমি-হারানোর পরবর্তী জটিল ইতিহাস— এই দুই ঘটনার মধ্যে কোনো যোগসূত্র নেই। গোড়ায় এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিবাসী ছিল 'পাহাড়িয়ারা'। হাল দিয়ে চাষ করার কৌশল তাদের জানা ছিল না; এক ধরণের 'জুম' পদ্ধতিতে তারা চাষ করত। তাদের এই ব্যবস্থায় বা তাদের 'অধিকারে' সরকার কোনো হস্তক্ষেপ করে নি। বরং সম্প্রতি-আসা, হালচাষের প্রকরণে কুশলী সাঁওতাল চাষীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় না পেরে ওঠার জন্য পাহাড়িয়ারা যখন পাহাড়ি অঞ্চলের দুর্গমতর এলাকায় চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল, সরকার নানাভাবে চেষ্টা করেছে, যাতে তাদের অভ্যস্ত জীবনযাত্রায় এই ধরণের বিপর্যয় না ঘটে। সরকার সাঁওতালদের এখানে গ্রামপত্তনের চেষ্টায় বাধা দিতে চেয়েছে। কিন্তু নূতন জমি পাওয়ার জন্য বেপরোয়া সাঁওতালদের দুর্বার গতি রোধ করা সম্ভব হয় নি। সাঁওতালদের ঠেকাতে না পেরে পাহাড়িয়ারা জমি হারাল, সরকারের কোনো ভূমিকা ছিল না এতে।

সাঁওতালদের জমি সরকার আত্মসাৎ করেছে, এই ধারণাও সমান ভ্রান্ত। এতে সরকারের ক্ষতি বৈ লাভ ছিল না। ডামিন অঞ্চলে আবাদ বাড়লে সরকারের ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ বাড়বে। সাঁওতালদের জমি কেড়ে নেওয়া সরকারের পক্ষে আত্মঘাতী পরিকল্পনা হত। কারণ অন্য কাউকে দিয়ে এখানকার পতিত জমি চাষ করার সুযোগ ছিল না। তাই এই অঞ্চলে সরকারের একচেটিয়া অধিকার শুধুমাত্র ভূমিরাজস্বের ক্ষেত্রে; এ অধিকারের অর্থ : জমিদার বা অন্য কোনো মধ্যবর্তী গোষ্ঠী যাতে রাজস্বে ভাগ বসাতে না পারে। জমিতে 'অধিকার' সমতলে সাঁওতালদের; আর পাহাড়ি অঞ্চলের উপরের দিকে পাহাড়িয়াদের। কীভাবে এখানে চাষবাস হবে, কেই বা চাষ করবে, তাতে সরকারের কোনো ভূমিকা ছিল না। যেখানে স্থায়ী কৃষিকাজের জন্য শ্রমের জোগান ছিল অপ্রতুল, সেখানে ওখানকার আদিবাসীদের জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করার প্রশ্নই ওঠে না। সাঁওতালেরা জমি হারিয়েছিল পরে, অন্যভাবে— বাইরের মহাজনের হাতে। ডামিনের উপর সরকারি আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

ট্রাইবের ধারণা সৃষ্টিতে নূতন রাষ্ট্রের আরো একটা স্বার্থের কথা গ্রন্থকার বলেছেন। আগে এর উল্লেখও আমরা করেছি। অর্থাৎ, উপনিবেশের মানুষকে সুনির্দিষ্ট উপায়ে বিভিন্ন বর্গে ভাগ করা গেলে শাসনের সুবিধে হয়; বর্গ-বিভাগের একটা প্রধান কাজ জাতিপ্রথার মাধ্যমে করা হল; যেখানে এই বর্গ চলে না, সেখানে নূতন বর্গ— ট্রাইবের অবতারণা।

কিন্তু আদিবাসীদের মধ্যে বিভাগ? ট্রাইবের ধারণার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক আছে কি? ঝাড়খণ্ডের আদিবাসীদের প্রচলিত নামগুলি—যেমন, সাঁওতাল, 'কোল', মুণ্ডা, ওরাওঁ, ভূমিজ, 'চুয়াড়', হো ইত্যাদি— মোটেই বিদেশী শাসকের দেওয়া নাম নয়। আগে থেকে এগুলি ছিল। নূতন শাসক তাদের ব্যবহার করেছে, এই মাত্র।

আসলে এ নামগুলির কোনো কোনোটাতে আদিবাসীদের সম্পর্কে প্রতিবেশী বর্ণহিন্দুসমাজের সচেতন তাচ্ছিল্য প্রকট। যেমন 'কোল' ও 'চুয়াড়'। ডাল্টন-এর (Dalton) মতে, বর্ণহিন্দুরা মুণ্ডা, ওরাওঁ হো ইত্যাদি নানা গোষ্ঠীর সংস্কৃতিগত ভিন্নতার কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে; সবাইকে তারা অবজ্ঞাসূচক 'কোল' আখ্যা দিয়েছিল। ডাল্টন জেনেছিলেন, হিন্দুরা বলত, এরা সব 'পতিত জাত', ('ডিগ্রেডেড রেস'); হিন্দুদের নানা ফরমায়েশ খাটার জন্য ভগবান তাদের সৃষ্টি করেছেন।[১৮] 'চুয়াড়' কথাটাও হিন্দুদের দেওয়া। বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের বিশাল 'জঙ্গল মহলে' নানা আদিবাসীর বাস—যেমন, একটা বড়ো গোষ্ঠী ভূমিজ। এখানে হিন্দুরা এই আদিবাসীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের দিকে কোনো নজর দেয় নি। সবাইকে এক নামে বলেছে 'চুয়াড়'—যার অর্থ, 'বন্য', 'অমার্জিত', 'দুর্বিনীত', 'হিংস্র', 'উদ্ধত' ইত্যাদি। সম্ভবত হিন্দুদের সঙ্গে নানা কারণে বিবাদ-বিসংবাদের জন্য আদিবাসীদের সম্পর্কে তাদের আক্রোশ এই বিরূপ আখ্যার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের গোড়ার দিকে (প্রায় ১৮৩২ সাল পর্যন্ত) চুয়াড়দের নানা 'উৎপাত' লেগেই ছিল। ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশপ্রভুদের হেনস্তাও করেছে তারা। তাই নূতন শাসকেরাও তাদের প্রীতির চোখে দেখে নি। ব্রিটিশ নথিপত্রে এরা 'চুয়াড়' নামে অভিহিত। নির্মমভাবে এদের বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ দমন করা হয়েছে। এই দমনের কাজে যুক্ত ব্রিটিশ সৈন্য ও পুলিশবাহিনীর কেউ কেউ বড়াই করে বলত, নির্বিচারে মারা চুয়াড়দের কাটা মুণ্ডুতে তাদের কত কত ঝুড়ি ভরে গেছে।

এটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, আদিবাসীরা নিজেদের যে নামে উল্লেখ করত, তাদের সকলেরই অর্থ : 'মানবগোষ্ঠী'। যেমন, হো, হড়, খেরওয়ার ইত্যাদি।

আদিবাসী সমাজকে ট্রাইব বলা যদি সংগত না হয়, তা হলে তার যথার্থ বর্ণনা কী হবে? এই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের যথোপযুক্ত আলোচনা গ্রন্থকার করেন নি। ট্রাইবের চরিত্রলক্ষণ এই সমাজে দেখা যায় না— এ কথা বোঝানোর জন্য তিনি কয়েকটা বিক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছেন মাত্র। যেমন, আদিবাসী সমাজ ক্রমে বৃহত্তর রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছিল; এই সমাজ তাই আর বিচ্ছিন্ন থাকল না; বিশেষ করে ঔপনিবেশিক আমলে এই প্রবণতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠছিল; আদিবাসী গ্রামে অর্থনৈতিক অসাম্য বেড়ে যাচ্ছিল ইত্যাদি। তিনি আরো বলেছেন, ঐতিহাসিক কারণে বিভিন্ন আদিবাসীসমাজে বিকাশের ধারা একই রকম ছিল না।

এই সমাজের রূপ বিশ্লেষণের জন্য এই মন্তব্য যথেষ্ট নয়। অন্য সমাজের সঙ্গে তুলনায় আদিবাসী সমাজ কী ছিল না, এ সম্পর্কে কিছু ধারণা হয় মাত্র। কিন্তু আসলে তা কী ছিল, তা বোঝা দরকার। এটা অপরিহার্য; কারণ আদিবাসীদের প্রতিরোধ-আন্দোলনের উন্মেষ, বিকাশ ও বিস্তার গ্রন্থকারের অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু।

আমরা পরে দেখব, এই আন্দোলনের পটভূমিকায় আদিবাসীজগতে স্বাতন্ত্র্যবোধের ('এথনিক কনশাসনেস') উদ্ভব ও প্রসারের যে-কথা গ্রন্থকার বলেছেন, তার বিশিষ্টতা শুধু এই আন্দোলনকে দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। স্বাতন্ত্র্যবোধ আর তার প্রকাশ সমার্থক নয়; তারা দুটি ভিন্ন ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। আদিবাসীদের সমাজ ও সংস্কৃতি, তাদের গ্রামীণ সমাজ-সংগঠন, তাদের বিশ্বাসের জগৎ— সব-কিছু— এই প্রকাশের রূপ-বৈচিত্র্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

বর্তমান নিবন্ধের সীমিত পরিসরে আদিবাসী সমাজের বিস্তারিত বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। অন্যত্র এর কিছু কিছু দিক আলোচনা করেছি, বিশেষ করে প্রতিরোধ-আন্দোলনের সংগঠনে আদিবাসী সমাজ-ব্যবস্থার ভূমিকা, ও তার সীমাবদ্ধতা[১৯]। এখানে এই সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে শুধু সাম্প্রতিক গবেষণার কয়েকটি দিকের উল্লেখ করব।

এর চরিত্র সম্পর্কে একটা ব্যাপার বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। এক বিশেষ ঐতিহাসিক পরিবেশে আদিবাসী সমাজ গড়ে উঠেছিল বলে দীর্ঘদিন এখানে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। কিন্তু আদিবাসী সমাজ বলেই এই বৈশিষ্ট্য— এ ধারণা ভুল। এই ধরণের কথা যাঁরা বলেন, তাঁরা যেন ধরেই নেন, গঠন ও বিন্যাসের দিক থেকে আদিবাসী সমাজ অনিবার্যভাবে স্বতন্ত্র; যেন আদিবাসী সমাজ একটা আলাদা 'স্ট্রাকচারাল টাইপ'। কিন্তু বৈশিষ্ট্য যদি কোথাও থাকে, নৃতত্ত্ববিদ্ বা ঐতিহাসিককে তা বুঝতে হবে।

এর দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা মুণ্ডা, ওরাওঁ, হো গোষ্ঠীদের নিতে পারি। প্রাক্-ঔপনিবেশিক আমলের প্রায় শেষ পর্যন্ত এই বৈশিষ্ট্যগুলি বহু জায়গায় টিঁকে ছিল। এই সময়কালে বিকৃতি যে কোথাও ঘটে নি তা নয়; কিন্তু যে-দ্রুতগতিতে তা ঔপনিবেশিক যুগে ঘটছিল, তার নজির আগে সচরাচর মেলে না। অবশ্য অঞ্চল বিশেষে পার্থক্য তো ছিলই। যেমন, হো-অধ্যুষিত এলাকায় পুরোনো ব্যবস্থা ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত প্রায় অক্ষত ছিল। কেননা কেন্দ্রীভূত কোনো রাষ্ট্রিক কর্তৃত্ব এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় নি, যেটা মুণ্ডা-ওরাওঁ অঞ্চলে সম্ভব হয়েছিল।

সমাজ-ব্যবস্থা ও সংগঠনের দুটো প্রধান দিক লক্ষ করা যায়। মূল সংগঠনের ভিত্তি গ্রাম; এই গ্রামকে কেন্দ্র করেই প্রধানত আদিবাসী সমাজ আবর্তিত হয়েছে। বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে সম্পর্ক আর একটা দিক। এই সম্পর্কের স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক দিক সব ক্ষেত্রে ছিল না। কিন্তু আদিবাসীরা এই সম্পর্কের বিষয়ে সচেতন ছিল; সংস্কৃতিগত সাদৃশ্যের ফলে এক ধরণের সংহতি-চেতনাও ছিল। সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ-আন্দোলনের সময় এই চেতনা না থাকলে অত দ্রুতগতিতে এই আন্দোলন ছড়াতে পারত না।

গ্রামসমাজের সংগঠনের রূপ ও বিবর্তনের ধারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হয়েছে। কয়েকটা প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন— গ্রামীণ সম্পদের উপর অধিকার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা; যৌথ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, এবং গ্রামের শৃঙ্খলা (অর্ডার) বজায় রাখার জন্য নানা বিধি-বিধান।

গ্রামের কৃষি এবং অরণ্য-সম্পদের উপর অধিকার নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত জরুরি একটা বিষয় ছিল— কারণ এই সম্পদ সীমিত; সম্পদ-সৃষ্টির প্রক্রিয়াও দুরূহ, শ্রমসাধ্য এবং ব্যয়বহুল। পরে আমরা দেখব, গ্রামের সব মানুষের অধিকার সমান নয়; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে গ্রামীণ সংগঠন মূলত অসাম্যের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে।

গ্রামীণ সমাজে দীর্ঘকালের একটা স্বীকৃত প্রথা হল : গ্রামপত্তনকারী পরিবারের সঙ্গে যুক্ত লোকদের অধিকার ছিল অগ্রগণ্য। অবশ্য পিতৃকুলের সঙ্গে সম্পর্কিত যারা, শুধু তাদের। (মুণ্ডা-ওরাওঁ-হো অঞ্চলে এদের নানা নাম— খুৎকাঠিদার, ভুঁইহার ইত্যাদি)। তা ছাড়া এসব পরিবার থেকেই আসত গ্রামীণ সমাজের দুই প্রধান নিয়ন্তা— গ্রামপ্রধান (মুণ্ডা অঞ্চলে যার নাম 'মুণ্ডা', সাঁওতাল সমাজে 'মাঝি') আর 'পুরোহিত' (মুণ্ডা,

হো অঞ্চলে যার নাম 'পাহান', আর সাঁওতাল গ্রামে 'নায়েক')।

এইসব পরিবারের সঙ্গে যুক্ত লোকেরা সত্যিকার অর্থে আদিবাসী, অর্থাৎ এরা প্রথম থেকেই গ্রামে বাস করছে। মাঝে মাঝে বাইরের লোকেরাও আসত। কৃষি ও অন্যান্য কাজে দরকার হলে গ্রামীণ সমাজই তাদের ডেকে আনত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এরা নিজের গরজেও আসত। এদের অনেকেই আসলে আদিবাসী, তবে অন্য গ্রামের; এদের একটা বড়ো অংশ মাতৃকুলের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু গ্রামীণ সমাজের অনুমতি ছাড়া এরা গ্রামের জমি চাষ করতে পারত না। গ্রামের নিজের প্রয়োজনে যারা অন্য গ্রাম থেকে এসেছে, তাদের জন্য অনুমতি স্বভাবতই অতি সহজে মিলত। তবুও গ্রামের আদিবাসী এবং এই আগন্তুক বাইরের লোকদের মধ্যে মনের দিক থেকে একটা দূরত্ব থেকেই গিয়েছিল। বাইরের লোকদের আদিবাসীরা ডাকত, 'অন্য গ্রামের লোক' (মুণ্ডারি ভাষায়, এতা হাতুরাংকো, eta haturanko); নিজেদের বলত, 'নিজগাঁয়ের লোক', (মুণ্ডারিতে, হাতু হড়কো, hatu horoko; হাতুর অর্থ 'গ্রাম', আর হড়কো মানে 'মানুষ') সম্ভবত হিন্দু সমাজের প্রভাবে বাইরের লোকদের অন্য একটা অর্থপূর্ণ নামও দেওয়া হত— পরজা (প্রজা) হড়কো, parja horoko; 'প্রজা' গোষ্ঠী; অর্থাৎ গ্রামের উপর নির্ভরশীল, গ্রামের 'অধীন'।

দীর্ঘদিন এক গ্রামে বাস করার ফলে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মানসিক ব্যবধান আস্তে আস্তে দূর হয়ে যেত। কিন্তু শুধুমাত্র দীর্ঘবাসের ফলেই বাইরের লোকেরা সমান অধিকার ও সামাজিক মর্যাদা পেতে পারত না। এটা সম্ভব হত বিশেষ ধরণের এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে; এর অর্থ, বাইরের লোকের আনুগত্যের শপথ, আদিবাসী সমাজসম্মত কতকগুলি প্রতীকের গ্রহণের ফলেই মান্য হবে; তখন তারা 'হাতু হড়কো' বলে স্বীকৃত হত।

বিশেষ অর্থে 'আদিবাসী' নয়, এমন লোকও গ্রামে বসবাস করার জন্য আসত। মুণ্ডা জগতে রাজতন্ত্রের আবির্ভাবের ফলে প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত বাইরের নানা গোষ্ঠীও গ্রামে এল। সম্ভবত এর ফলেই অন্য অঞ্চলের চাষীরাও এভাবে আসতে থাকল। তবে ঔপনিবেশিক যুগেই এদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। আমরা পরে দেখব, এদের সঙ্গে আদিবাসীদের সম্পর্ক ক্রমেই তিক্ত হয়ে উঠেছে।

তা ছাড়া, অন্য এক বিশেষ সম্প্রদায়ও আদিবাসী গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে বাস করেছে। এদের কথাও আমরা পরে বলছি। গ্রামের অর্থনীতিতে অপরিহার্য এদের ভূমিকা, যদিও সরাসরি কৃষিতে নয়। এরা বিভিন্ন ধরণের কারিগর: কামার, তাঁতি ইত্যাদি। প্রাক্-ঔপনিবেশিক আমলে কৃষিকাজের সঙ্গে এদের যোগ সম্ভবত ছিল না; থাকলেও খুব কম। তাই গ্রামের কৃষি-সম্পদে এদের অধিকারের প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু সামাজিক মর্যাদার প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক। আদিবাসী গ্রাম এদের 'উপদ্রবকারী' দিখুদের গোত্রভুক্ত করে নি কখনো। কিন্তু গ্রামীণ সমাজের যে বিশিষ্ট সংগঠন, সেখানে তাদের স্থান ছিল না। যেমন গ্রামের পূজা-পার্বণ, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদি কী ধরণের হবে, বা কীভাবে হবে এ সম্পর্কে তাদের মত দেবার কোনো অধিকার ছিল না।

গ্রাম-সম্পদের উপর অধিকার-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা সমাজ-সংগঠনের একটা দিক মাত্র, যদিও গুরুত্বপূর্ণ দিক। কিন্তু এ সংগঠনের চরিত্র শুধুমাত্র এই নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা দিয়ে বোঝানো যাবে না। এই সংগঠনের উপর এক বিশিষ্ট প্রভাব আদিবাসী সমাজের ধর্মীয় বিশ্বাসের এবং তার সঙ্গে যুক্ত নানা আচার-অনুষ্ঠানের। তিনটি প্রধান কারণে ধর্মীয় বিশ্বাস ইত্যাদি গ্রামসমাজের সংগঠনকে প্রভাবিত করতে পেরেছিল :

১. ওরা বিশ্বাস করত অতিপ্রাকৃতে; এবং সে বিশ্বাসের উৎস জীবন-ধারণের কঠোর বাস্তবতা, প্রকৃতির সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম, যা অনিবার্যভাবে যৌথ।

২. অধিকাংশ অনুষ্ঠান একান্তভাবে গোটা গ্রামের বা গ্রাম-সমষ্টির যৌথ অনুষ্ঠান; আলাদা আলাদা পরিবারের নয়। পারিবারিক অনুষ্ঠানও কিছু কিছু ছিল, যেমন: পূর্বপুরুষদের স্মরণে অনুষ্ঠান। এসব কিন্তু যৌথ অনুষ্ঠানের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন মোটেই নয়। বহু ক্ষেত্রে দুটোর সময়ও ছিল এক। আদিবাসী গ্রামে বাইরের নানা লোক

আসার ফলে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সংখ্যাও বাড়ল, বৈচিত্র্যও বাড়ল; এর আরো একটা কারণ, আদিবাসীরাও কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্যদের, বিশেষ করে প্রতিবেশী হিন্দুদের, আচার রীতিনীতি অনুকরণ করল। কিন্তু এটা উল্লেখযোগ্য যে, আদিবাসী গ্রাম নানাভাবে তার যৌথ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নিজস্বতা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে চেয়েছে। যেমন, এ ধরণের যৌথ আচারের একটা অপরিহার্য অঙ্গ গ্রাম-পুরোহিতের (পাহান বা নায়েক) ভূমিকা। পাহানদের অনুপস্থিতিতে এই ধরণের কোনো অনুষ্ঠানই সম্ভব ছিল্ না। এরাই আদিবাসী দেবতাদের স্মরণ করত; সব পূজা, অর্চনা এদের মন্ত্রপূত। কিন্তু যেসব অনুষ্ঠান আদিবাসীদের ধর্ম-বিশ্বাস বা ঐতিহ্য-সম্মত নয়, সেখানে পাহানরা যেতই না। তাই পাহানদের উপস্থিত থাকা-না-থাকা থেকে বোঝা যেত, কোন্ অনুষ্ঠানে গ্রাম-সমাজের অনুমোদন আছে বা নেই। এর অর্থ এই নয় যে পাহানদের অননুমোদিত কোনো অনুষ্ঠানে আদিবাসী যোগ দিতে পারত না। এ সম্পর্কে গ্রাম-সমাজের কোনো আনুষ্ঠানিক বিধিনিষেধ ছিল না।

৩. গ্রামীণ সম্পদের একটা নির্দিষ্ট অংশ ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদির জন্য বরাদ্দ ছিল। গ্রামের যে বিশেষ জায়গায় গ্রামবাসীদের গুরুত্বপূর্ণ সব বারোয়ারি পুজো হত, তা ছিল তাদের কাছে পবিত্রতম 'কুঞ্জ'। গাছপালা ঘেরা সেই প্রশস্ত জায়গার শুচিতা বাঁচিয়ে রাখা গ্রামসমাজের একটা প্রধান দায়িত্ব বলে মনে করা হত। দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি চরম দুর্দশার দিনেও সেখানে ফসল ফলানোর কথা কেউ ভাবতেও পারত না। শালকুঞ্জ ছিল এই ধরণের এক পবিত্র জায়গা। এখানেও গাছ বা গাছের ডালপালা কাটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে পাহানরা অবশ্য অনুমতি দিত। তা-ও এক সম্মিলিত ধর্মীয় আচারের পর। তা ছাড়া 'ভূতখেত' বলে জমি আলাদা করে রাখা ছিল। এর উদ্দেশ্য : এই জমির ফসল অমঙ্গলময় নানা শক্তির (যেমন ভূত) পুজোয় খরচ করা হবে। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস ছিল, এইসব শক্তি গ্রামে নানা উপদ্রব ডেকে আনে—যেমন, অজন্মা মহামারী। কোনো অবস্থাতেই এই জমির হস্তান্তর গ্রাম-সমাজ হতে দিত না। ভয় ছিল, অন্য কারোর হাতে গেলে ভূতের পুজো ঠিকভাবে হবে না। গ্রাম-প্রধান আর গ্রাম-পুরোহিতের জন্য বরাদ্দ ছিল উৎকৃষ্টমানের জমি, কারণ গ্রামের সব ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কোনো-না-কোনো ভাবে এদের ভূমিকা ছিল অপরিহার্য। সাঁওতাল গ্রামের 'পবিত্র কুঞ্জ' ('মাঝিস্তান') ছিল গ্রাম-প্রধানের বাড়ির সংলগ্ন কোনো জায়গায়।

গ্রাম-সমাজের সামগ্রিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্বও গ্রাম-সংগঠনের রূপকে প্রভাবিত করেছে। এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ গ্রামবাসীদের এক বিশিষ্ট সমষ্টিচেতনা এই ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিফলিত। এই চেতনার ভিত্তি শুধুমাত্র একটা গ্রাম নয়; এক বৃহত্তর গ্রাম-সমষ্টি— যার সঙ্গে এক বিশেষ গোষ্ঠীর আদিবাসী একাত্ম বোধ করত। শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাতন্ত্রের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হল বিবাহ-প্রথা-সম্পর্কিত বিধিব্যবস্থা। এই বৃহত্তর গ্রাম-সমষ্টির বাইরে আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। (নৃতত্ত্ববিদ্রা এর নাম দিয়েছেন ট্রাইব্যাল এনডোগ্যামি।) আবার আদিবাসীদের বিশ্বাস ছিল এই বৃহত্তর সম্প্রদায়ের কয়েকটা অংশও আছে। মুণ্ডা / ওরাওঁ / হো অঞ্চলে এই আলাদা অংশগুলির নাম ছিল 'কিলি'। (একে নৃতত্ত্ববিদ্রা ক্ল্যান বলেন।) বৃহত্তর সম্প্রদায়ের যেমন দেবতা আছে, তেমনি এই কিলিদেরও আলাদা আলাদা দেবতা আছে। এক কিলির অন্তর্গত আদিবাসীদের নিজেদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। (নৃতত্ত্ববিদ্রা এই প্রথাকে বলেন ক্ল্যান এক্সোগ্যামি।)

আদিবাসী সমাজ মনে করত, এসব নিষেধ ভাঙার তাৎপর্য শুধুমাত্র ব্যক্তিবিশেষের নৈতিকতাবোধের মাপকাঠিতে বিচার করলে চলবে না। এ 'অপরাধ' গোটা সমাজের শৃঙ্খলা ও স্থিতিকে নষ্ট করে, সামগ্রিক 'বিপর্যয়' ডেকে আনে; তাই এর জন্য গুরু শাস্তির বিধান একান্তই সংগত। জরিমানা ইত্যাদি ছাড়া একটা শাস্তি ছিল অপরাধীকে 'একঘরে' করে রাখা। সাঁওতাল গ্রামে গুরু অপরাধের জন্য একটা শাস্তি ছিল ভয়াবহ ধরণের[২০] (বিটলাহা, bitlaha)। গ্রামবাসীরা সবাই মিলে মিছিল করে বিকট আওয়াজ করতে করতে অপরাধীর

বাড়ি চড়াও হত— সাক্ষাতে নানান ধরণের গালি-গালাজ করত। দৈহিক নির্যাতনও হত। ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেবার ঘটনা অবশ্য বিরল। যৌথ গ্রাম-জীবনে এই একঘরে হয়ে থাকাটা অপরাধীর পক্ষে দুর্বিষহ এক মানসিক যন্ত্রণা। অনুতপ্ত অপরাধী সমাজে ফিরে আসার নানা চেষ্টা করত। বাইরের লোককে গ্রাম-সমাজে নেওয়ার যা রীতি ছিল, সেই রীতিতেই তার শাস্তির বিধান তুলে নেওয়া হত।

এই বিশেষ ধরণের সমাজ-সংগঠনের ফলে এবং আরো নানাভাবে গ্রামের আদিবাসীদের মধ্যে এক সংহতি-চেতনা গড়ে ওঠে। সংক্ষেপে এর প্রধান কারণগুলির কয়েকটা আবার উল্লেখ করছি। গ্রামপত্তনকারী কোনো আদি পরিবার বা বংশ -সম্ভূত বলে এরা নিজেদের মনে করত (ডিসেন্ট অ্যান্ড কিনশিপ টাইজ)। দ্বিতীয়ত আর্থিক দিক থেকে এক ধরণের সমতা থাকায় এই চেতনা আরো দৃঢ় হয়। আগেই বলেছি, সবার জোতজমার পরিমাণ সমান না হলেও গ্রামে এমন কোনো আদিবাসী পরিবার বা ব্যক্তি ছিল না, যারা জমি বা অন্য কোনো সম্পদের দৌলতে অন্যান্যদের উপর কর্তৃত্ব কায়েম করতে পারত। গ্রাম-সংগঠনের এমন কোনো বিধিবিধান ছিল না, যা এই ধরণের কর্তৃত্বকে অনুমোদন করত। বাইরের কোনো কোনো লোক সম্পর্কে সমতার এই বিধান অবশ্য খাটত না। তৃতীয়ত, নানান যৌথ সামাজিক আর ধর্মীয় অনুষ্ঠানও এই সংহতি-চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছে।

স্বভাবতই, গ্রামের সংঘবদ্ধ জীবনের বাইরে আদিবাসীরা সার্থক কোনো অস্তিত্বই কল্পনা করতে পারত না। একটা দীর্ঘকালের প্রথাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে নেওয়া যায়। আদিবাসীদের মৃত্যু যেখানেই হোক, বা তাদের মৃতদেহ যেখানেই পোড়ানো হোক-না-কেন, তাদের আত্মীয়রা শ্মশান থেকে হাড় তুলে নিজের গ্রামে নিয়ে এসে গ্রামের নির্দিষ্ট শ্মশানে আবার পুঁতে দিত। এটাও কোনো পরিবারের আলাদা অনুষ্ঠান নয়। গোটা গ্রামের লোক এখানে উপস্থিত থাকত— সব ধর্মীয় আচার নিষ্ঠার সঙ্গে মানা হত। গ্রামের সমষ্টিজীবনের সঙ্গে মৃতব্যক্তির একাত্মতা এভাবে আবার প্রতিষ্ঠিত হত।

একটু আগে আমরা বলেছি, গ্রামকে ঘিরেই এই স্বাতন্ত্র্য-চেতনা প্রধানত গড়ে উঠলেও একটা বৃহত্তর গ্রাম-সমষ্টির অস্তিত্ব সম্পর্কেও আদিবাসীদের এই বোধ ছিল। দুটোতে পার্থক্য অবশ্যই আছে। একটা নির্দিষ্ট গ্রামের অধিবাসী বলে গ্রামের নানা অনুষ্ঠানে বা সাংস্কৃতিক জীবনে তারা যেরকম প্রত্যক্ষ ব্যাপক ও অনিবার্যভাবে অংশ নিতে পারত, গ্রাম-সমষ্টির ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব ছিল না। কিন্তু সেখানে গ্রামের যৌথ জীবনের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি না থাকলেও যে বৃহত্তর অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো চেতনা থাকবে না, তা মোটেই নয়।[১১] সমসাময়িকদের মধ্যে অনেকেই এই চেতনার কথা বলেছেন। কারণ হিসেবে তাঁরা বলেছেন জীবিকার উপায় ও উপকরণ বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও একই আদিবাসী সম্প্রদায় (যেমন সাঁওতাল, বা মুণ্ডা বা ওরাওঁ)-অধ্যুষিত গ্রামগুলির মধ্যে গভীর সংস্কৃতিগত সাদৃশ্য ছিল। এই চেতনার অস্তিত্ব আরো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যে, কারণ কয়েকটা উপলক্ষ ছাড়া এই বিশাল অঞ্চলের গ্রামগুলির মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্র প্রশস্ত ছিল না।

এই চেতনার একটা দৃষ্টান্ত আগে উল্লেখ করেছি—বিবাহ প্রথা (ট্রাইব্যাল এনডোগ্যামি)। এই সম্পর্কিত অনুশাসন না মানার ফলস্বরূপ আদিবাসী জগতে যে গুরুতর বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়ের আশঙ্কা, এবং যে-কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা, তা এই সমষ্টি-চেতনা ছাড়া বোঝাই যাবে না। এই চেতনার উৎস তাই মূলত সংস্কৃতিগত— এক বিশেষ ধরণের বিশ্বাস। আদিবাসীদের নানা ধর্মীয় আর সামাজিক অনুষ্ঠানের ধর্মীয় ভিত্তিও এই বোধকে দৃঢ় করেছে। যেমন, এসব অনুষ্ঠানের অনেকগুলিতেই আদিবাসীরা শুধুমাত্র তাদের নিজের নিজের গ্রামের দেব-দেবীর পুজো করত তা-ই নয়; তাদের 'পরম পিতা', স্রষ্টা ভগবানকেও (যেমন: মুণ্ডাদের সিং বোংগা) এরা স্মরণ-পূজন করত; তাদের পুরাণ, সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনীও সেখানে পাহানরা বলত। এর মধ্য দিয়ে আদিবাসীরা তাদের বৃহত্তর সংস্কৃতিগত ঐক্যের সম্পর্কে সচেতন হত। সাঁওতাল সমাজে বিশিষ্ট কয়েক ব্যক্তির ভূমিকাও এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তাদের-'গুরু' বলে সাঁওতালরা মানত। লিখিত ইতিহাস সাঁওতালদের

ছিল না; বিশ্বসৃষ্টি-তত্ত্ব, মানবজাতির সৃষ্টি, সাঁওতালদের আবির্ভাব ইত্যাদি বিষয়ে নানা কল্প-পুরাণ, ইত্যাদি গুরু পরম্পরায় চলে আসত। স্মৃতিবাহিত এইসব তত্ত্ব আর জ্ঞান পুরুষানুক্রমে সাঁওতালদের কাছে পৌঁছে দেওয়া ছিল ঐ গুরুদের কাজ, ভূমিকা। ঊনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে গুরুদের কেউ কেউ গ্রামে ঘুরে ঘুরে 'সাঁওতাল জাতি'কে ঐক্যবদ্ধ করার কথা বলতেন। সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় সাঁওতাল-জাতি হিসেবে যে-চেতনার নজির আমরা দেখি, তাতে এই ধরণের প্রচারের অবদান সম্ভব ছিল। দিখুদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-আন্দোলন এই চেতনায় আনে নূতন মাত্রা।

৭

দক্ষিণ বিহারের আদিবাসীদের প্রতিরোধ-আন্দোলন বিষয়ে গ্রন্থকারের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করব।

ক. এই আন্দোলনের দ্রুত প্রসার সন্দেহাতীত; কিন্তু এটা কি বলা যায়, এর শুরু যেখান থেকেই হোক-না-কেন, তার ঢেউ অচিরে গোটা ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে পৌঁছে যেত?

খ. আদিবাসীদের আন্দোলন শুধু মাত্র তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, অন্যান্য বহিরাগতরা, যারা নানা-ভাবে আদিবাসী গ্রামের অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল— যেমন, চাষী এবং কারিগর শ্রেণী— তাদেরও আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা ছিল—এই সিদ্ধান্ত কি সর্বতোভাবে গ্রহণীয়?

গ. আদিবাসীদের স্বাতন্ত্র্য-চেতনার বিকাশ ও বিস্তার কি শুধুমাত্র দিখু-বিরোধী যৌথ প্রতিরোধ আন্দোলনকে দিয়ে বোঝা যায়?

ঘ. ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের নানান আন্দোলনে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনার যে-মানসিকতা সুস্পষ্টভাবে দেখা গিয়েছিল, পরে তা অত সক্রিয় থাকল না কেন? বিংশ শতাব্দীর ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের সংস্কারমুখিতার সঙ্গে কি এর কার্যকারণগত কোনো যোগ আছে? নাকি, মৌলিক পরিবর্তনের স্বপ্নে অনুপ্রাণিত কোনো ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা আর সম্ভব হল না বলেই ঝাড়খণ্ড আন্দোলনে সংস্কারপন্থী প্রবণতা ক্রমে জোরালো হয়ে ওঠে?

৭.১

আদিবাসী আন্দোলনে ব্যাপ্তির প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে, ট্রাইব একটা বানানো তত্ত্ব—এই ধারণার বিচারের জন্য এ প্রশ্নের আলোচনা প্রাসঙ্গিক।

কয়েকটা ক্ষেত্রে দেখা গেছে, এক অঞ্চলের আন্দোলন সঙ্গে সঙ্গে অন্য অঞ্চলেও সাড়া জাগিয়েছে। তবে এর দৃষ্টান্ত বেশি নয়। আদিবাসী আন্দোলনের সামগ্রিক ইতিহাসে এদের ব্যতিক্রম বলা যায়। একটা প্রবণতা অবশ্য ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। বিভিন্ন অঞ্চলের আন্দোলন একসঙ্গে না ঘটলেও এক অঞ্চলের আন্দোলনের কর্মসূচি, ভাবাদর্শ ইত্যাদি পরে অন্য অঞ্চলকেও প্রভাবিত করেছে।

এক অঞ্চলের যৌথ প্রতিরোধ যুগপৎ অন্য জায়গার আদিবাসীকে অনুপ্রাণিত করেছে; এর দুটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হল—'কোল' (মুণ্ডা) বিদ্রোহ (১৮৩১-৩২), আর ভূমিজ বিদ্রোহ (১৮৩২-৩৩)। তবে এরা ব্যতিক্রম।

মুণ্ডা বিদ্রোহ শুরু হয় ছোটোনাগপুরের শোনপুরে; তবে অল্প সময়ের মধ্যে ছোটোনাগপুরের অন্যান্য অনেক জায়গা, এবং পালামৌ, সিংভূম ও মানভূমে ছড়িয়ে পড়ে। ভূমিজদের বিদ্রোহের সূচনা দুটি জঙ্গল মহল এলাকায়—বরাভূম ও ধলভূমে। কিন্তু জঙ্গল মহলের প্রায় সব 'জমিদারি'তে তা বিস্তৃত হয়।

'কোল' বিদ্রোহের ক্ষেত্রে দুটি ব্যাপার লক্ষণীয়। সিংভূম ছাড়া অন্য অঞ্চলের আদিবাসীদের সঙ্গে বিদ্রোহী মুণ্ডাদের কোনো যোগের প্রমাণ নেই। সিংভূমের ক্ষেত্রেও কয়েকটা বিশেষ কারণে এই যোগ গড়ে উঠেছিল।

বস্তুত, গোড়ার দিকে এই বিদ্রোহে সিংভূমের 'লড়কা কোল'দের এক বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। এজন্য বিব্রত ব্রিটিশ সরকার স্থানীয় প্রশাসনকে কড়া নির্দেশ পাঠিয়েছিল, যাতে লড়কারা সিংভূমের সীমানা পেরিয়ে ছোটোনাগপুরের বিক্ষুব্ধ এলাকায় না ঢুকে পড়তে পারে।

এ ঘনিষ্ঠ যোগের তিনটি প্রধান কারণ। এই বিদ্রোহে 'মানকি'-গোষ্ঠীর ('মানকি' হল গ্রাম-সমষ্টির প্রধান; শুধু একটা গ্রামের প্রধানকে বলা হত 'মুণ্ডা') কারো কারোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। পারিবারিক সূত্রে সিংভূমের মানকির সঙ্গে এদের আগে থেকেই যোগ ছিল। যোগসূত্রের আর-একটি দিক সংস্কৃতিগত। আসলে লড়কা-গোষ্ঠী মূল মুণ্ডা-গোষ্ঠীর অংশ। নানা কারণে লড়কারা সিংভূমের দিকে চলে যায় এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকে। ভৌগোলিক ব্যবধান থাকলেও সাংস্কৃতিক বন্ধন অটুট ছিল; সংস্কৃতির দিক থেকে তারা প্রায় অভিন্ন গোষ্ঠী। তা ছাড়া প্রায় এক দশক ধরে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে লড়কাদের বিদ্বেষ ও আক্রোশ বাড়ছিল। এর প্রধান কারণ : সিংভূমের 'রাজনীতি'তে ব্রিটিশ হস্তক্ষেপ। এটা ওখানকার 'রাজা'দের চক্রান্তের ফল। 'স্বাধীনচেতা' লড়কারা রাজাদের রাজস্ব ইত্যাদি ব্যাপারে নানা দাবিদাওয়া দীর্ঘদিন হেলায় উপেক্ষা করে এসেছে; 'অবাধ্য' প্রজাদের বশে আনার মতো ক্ষমতা রাজাদের ছিল না। তাদের শেষ ভরসা ছিল, ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সাহায্য। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে রাজাদের চুক্তি হল, তারা ব্রিটিশ প্রভুত্ব মেনে নেবে; তার বদলে ব্রিটিশ সেনা লড়কাদের দমন করবে। লড়কারা প্রতিশোধ নেবার সুযোগ খুঁজছিল। মুণ্ডা-বিদ্রোহের ফলে তা এল।

ভূমিজ বিদ্রোহের চরিত্র আলাদা। গোড়ায় অন্তত আদিবাসীদের কোনো ভূমিকাই ছিল না এতে। বরাভূম আর ধলভূমে বিদ্রোহের শুরু, সেখানকার 'জমিদার' 'রাজ'-পরিবারের অভ্যন্তরীণ কোন্দল থেকে। ব্রিটিশ সরকার নিরপেক্ষ ছিল না বলে বিবদমান গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হল। ব্রিটিশ সরকারের নানা আইন-কানুন, নীতির ফলে আদিবাসীদের মধ্যেও অসন্তোষ ক্রমেই বাড়ছিল। কিন্তু 'রাজ-পরিবারে'র লোকদের উদ্যোগ ছাড়া এই বিদ্রোহ হয়তো হত না। হলেও, এতটা ব্যাপক হত না। জঙ্গলমহলের অন্যান্য 'জমিদারি'তে এই বিদ্রোহের প্রসারেও প্রধান ভূমিকা ছিল জমিদারদের। নানাভাবে বাইরের শ্রেষ্ঠী, মহাজনদের কাছে দেনায় জমিদাররা প্রায় সর্বস্বান্ত হতে বসেছিল। বরাভূমের 'গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামা'য় যোগদানকে তারা মহাজন-উচ্ছেদের একটা সম্ভাব্য উপায় বলে ভাবল। ভূমিজ বিদ্রোহের বিস্তারকে তাই আদিবাসীদের সংহতি-চেতনার দৃষ্টান্ত হিসেবে নেওয়া যায় না।

পরবর্তী আন্দোলনগুলিতে এই ধরণের বিস্তার ঘটে নি। এদের মধ্যে সাঁওতাল বিদ্রোহের (১৮৫৫-৫৬) ব্যাপ্তি সব চাইতে বেশি। কিন্তু তা প্রধানত সাঁওতালদের উদ্যোগে ঘটেছে। বিদ্রোহের নেতারা অন্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের কাছে সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছে। বিশেষ সাড়া মেলে নি। পাহাড়িয়ারা তো সরাসরি বিরোধিতাই করেছে। বিদ্রোহী সাঁওতালদের গতিবিধি সম্পর্কে নানা খবর পুলিশের কাছে তারাই পাচার করত—নেতারা এরকম সন্দেহের কথা বলেছে। শেষ পর্যন্ত নেতারা বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে 'সাঁওতাল জাতি'র মুক্তি এবং শোষণ-মুক্ত ভবিষ্যতের কথা বলেছে।

পরবর্তীকালে আদিবাসীদের সম্মিলিত আন্দোলনের প্রধান দৃষ্টান্ত : দিখু-বিরোধী মুণ্ডা-ওরাওঁ আন্দোলন।

এই ঐক্যের ঐতিহ্য একেবারে গোড়া থেকে দেখা গেছে। এর প্রধান কারণ, তাদের দুর্দশার সৃষ্টি একই ভাবে— একই রাজতন্ত্র, একই দিখুগোষ্ঠীর উৎপীড়ন, একই আইনকানুন, বিধিবিধান। সেই ঐক্যে প্রথম ফাটল দেখা গেল, বীরসা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৮৯৯-১৯০০)। সাঁওতাল নেতাদের মতো বীরসাও শুধুমাত্র মুণ্ডাদের অতীত 'গৌরব' এবং ভবিষ্যতের সম্পূর্ণ নূতনভাবে গড়া সমাজ ও রাষ্ট্র -ব্যবস্থার কথা বলেছে। বীরসা আন্দোলনের পরাজয় ও সরকারি দমননীতি এই দুই গোষ্ঠীর ব্যবধান আরো প্রশস্ত করে। ওরাওঁরা এমন-ও বলল, মুণ্ডা নেতাদের হঠকারিতার জন্যই তাদের এই বিপর্যয়। তাদের চিন্তা-ধারণাতে অন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনও এল। তারা বলল, তাদের আদিধর্মের 'বিশুদ্ধতা' নষ্ট হয়েছে মুণ্ডাদের সংস্পর্শে এসে। তাদের পুরোনো সত্য ধর্ম (কুরুখ ধরম্) ফিরে না এলে তাদের মুক্তি আসবে না— তাদের নূতন আন্দোলনের (১৯১২-২২) নেতারা বার বার এই কথাই বলেছে।

আগেই বলেছি, একই সময়ে না ঘটলেও, এক অঞ্চলের আন্দোলনের কর্মপন্থা, ভাবাদর্শ অন্য অঞ্চলের, অন্য আদিবাসী গোষ্ঠীর আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। যেমন: মুণ্ডাদের আন্দোলনে (১৮৯৪-১৯০০) পূর্ববর্তী সাঁওতাল আন্দোলনের (১৮৭০-১৮৮২) প্রেরণা লক্ষণীয়। বিশেষ করে একটা দিকে। সাঁওতাল নেতারাই প্রথম বলেছে, দিখু-বিরোধী সংগ্রামে সফলতার জন্য অপরিহার্য প্রয়োজন : 'আত্মশুদ্ধি'; অনেক পুরোনো ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার, নৈতিক ধারণার আমূল বর্জন (রিলিজস রিভাইটালাইজেশন)।

এই ধরণের পারস্পরিক প্রভাবের ক্ষেত্র যে প্রশস্ত হতে পেরেছিল, তার প্রধান কারণ, আদিবাসীজগতের পুরোনো বিচ্ছিন্নতা নানাভাবে শিথিল হয়ে আসছিল; তাই কাছাকাছি অঞ্চলের ঘটনা প্রতিবেশীদের কাছে অজানা থাকল না। আদিবাসী গোষ্ঠীদের ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক সীমানা ঔপনিবেশিক আমলের আগে থেকেই মোটামুটি নির্দিষ্ট ছিল। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের কোনো বানানো ধারণায় তার হেরফের হয় নি।

৭.২

আদিবাসী আন্দোলনে অন্যান্য বহিরাগতদের— যেমন চাষী আর কারিগর শ্রেণীর— ভূমিকা-সম্পর্কিত সঠিক তথ্য সহজে মেলে না; বিশেষ করে চাষীদের বিষয়ে তথ্য। অথচ এ তথ্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। ঐ দুই শ্রেণীর মধ্যে চাষীদের সংখ্যা স্বভাবতই বেশি। গুটিকয়েক কামার পরিবার, তিন বা চারটি, একটা বড়ো আদিবাসী গ্রামের প্রয়োজন মেটাতে পারত। কিন্তু চাষের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের পরিমাণ অনেক বেশি। কারণ চাষবাস অপেক্ষাকৃত বেশি শ্রমসাধ্য। আমরা আগেও বলেছি[১১], প্রাক্-ব্রিটিশ আমলে বাইরের এই চাষীদের একটা বড়ো অংশ ছিল আদিবাসী। অন্য সম্প্রদায়ের চাষীদের সংখ্যা সম্ভবত কম ছিল। এটা বিলক্ষণ বেড়েছে ব্রিটিশ আমলে। আদিবাসী গ্রামে এদের আসার ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগ ছিল জমিদার, ইজারাদার গোষ্ঠীর লোকেদের। তার একটা কারণ, এই দিখুদের বিশ্বাস ছিল, আদিবাসীদের তুলনায় বহিরাগত চাষীরা— বিশেষ করে কোনো কোনো চাষী-সম্প্রদায়, যেমন, কুর্মিরা— অনেক বেশি দক্ষ। অবশ্য জঙ্গল কাটা ইত্যাদি কৃষির প্রাথমিক কাজে আদিবাসীদের কদর ছিল বেশি, কারণ এ কাজে তাদের অভিজ্ঞতা দীর্ঘ দিনের। বাইরের চাষীদের আসার ব্যাপারে জমিদারদের উৎসাহের অন্য একটা কারণও ছিল : খাজনা-বাড়ানোর সময়ে এদের উপস্থিতি জমিদারদের কাজে লাগত। আদিবাসীদের মধ্যে কৌম-বন্ধন সুদৃঢ়; আলাদাভাবে আদিবাসী পরিবারের খাজনা বাড়ানো সহজসাধ্য ছিল না, যদি না আদিবাসীদের কেউ জমিদারের আজ্ঞাবাহী গ্রাম-প্রধান হিসেবে থাকত। বাইরের চাষীরা প্রজা হলে এই অন্তরায় আর থাকত না।

আদিবাসীদের আন্দোলন সম্পর্কে বাইরের এই আগন্তুক চাষীদের মনোভাব ঠিক কী ছিল তা জানা কঠিন।

কুমার সুরেশ সিং মনে করেন, 'কোল' বিদ্রোহের (১৮৩১-৩২) সময় আদিবাসীদের দিখু-বিদ্বেষ সম্ভবত এই চাষীদের প্রতিও তাদের আচরণকে প্রভাবিত করেছে।[২৩] প্রমাণের অভাবে এই বিষয়ে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। তবে সেই সময়ে যদি এ বিদ্বেষ মোটেই থেকে থাকে, তা হলে পরে তা নিঃসন্দেহে অনেক বেশি তীব্র হয়েছে। কারণ পরে বহিরাগত চাষীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে এবং আদিবাসীদের হারানো জমির বেশ-কিছু অংশ তাদের ভাগে গেছে। প্রতিরোধ-আন্দোলনের সময় তাদের সহযোগিতা আদিবাসীঁদের পক্ষে সম্ভবত প্রত্যাশিত ছিল না।

তবে কারিগর শ্রেণীর লোকেরা যে এই আন্দোলনকে সাহায্য করেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আগেই বলেছি, আদিবাসী অর্থনীতিতে তাদের ভূমিকা ছিল অপরিহার্য। যেমন, কৃষি এবং শিকারে ব্যবহার্য নানান হাতিয়ার—লাঙল, তীরধনুক ইত্যাদি—বানানো আর মেরামতের জন্য কামারদের (মুণ্ডা-ওরাওঁ অঞ্চলে এদের নাম : লোহার) উপর নির্ভর করতেই হত। বিদ্রোহের সময় এই নির্ভরতা অনিবার্যভাবে বেড়েছে। উন্নত অস্ত্রশস্ত্রের অধিকারী ব্রিটিশ পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের প্রধান হাতিয়ার ছিল তীরধনুক, বর্শা ইত্যাদি। কামারদের সাহায্য ছাড়া এই হাতিয়ারের নিরবচ্ছিন্ন জোগান সম্ভব ছিল না।

৭.৩

প্রতিরোধ-আন্দোলনের পরিমণ্ডলে আদিবাসীদের স্বাতন্ত্র্য-চেতনার (এথনিক কনশাসনেস) বিকাশ ঘটেছিল সত্যিই; কিন্তু শুধুমাত্র এই আন্দোলন দিয়ে এ চেতনার রূপ-বৈচিত্র্য ও চেতনায় নূতন গুণের উন্মেষ বোঝানো যায় না। আমরা আগে[২৪] বলেছি, স্বাতন্ত্র্য-বোধ এবং তার প্রকাশ ভিন্ন প্রক্রিয়া; এবং আদিবাসীদের সমাজ ও সংস্কৃতি, বিশ্বাসের জগৎ, গ্রামীণ সমাজ-সংগঠন বাদ দিলে এই রূপ ও গুণ -বৈচিত্র্য ধরা পড়বে না।

স্বাতন্ত্র্য-চেতনার উন্মেষের ক্ষেত্রে প্রতিরোধ-আন্দোলনের বিশিষ্ট তাৎপর্য এই যে শত্রু দিখু গোষ্ঠীকে চেনার মধ্য দিয়ে আদিবাসীরা নিজেদের আলাদা অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হল (গ্রামশি এই প্রক্রিয়াকে বলেছেন: 'নিগেশন' বা নেতি। রণজিৎ গুহ প্রধানত এই দৃষ্টিকোণ থেকে এ প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করেছেন[২৫])।

কিন্তু এখানে নিজেকে চিনতে পারার প্রধান অর্থ শত্রুর সঙ্গে সম্পর্কে নিজেদের বিশেষ অবস্থান বুঝতে পারা। যেমন, দিখুরা নানাভাবে আদিবাসী গ্রামে ঢুকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেছে কর্তৃত্ব। গোড়ায় হয়তো বিচ্ছিন্নভাবে আদিবাসীরা এর প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করেছে। সেই চেষ্টায় ব্যর্থ হবার পর তারা যৌথ প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে দিখুদের অনুপ্রবেশ প্রতিহত করার চেষ্টা করে। তখন তারা যে শুধু দিখুদের বিপুল ক্ষমতাকেই বুঝল তা নয়; সামগ্রিকভাবে তাদের নিজেদের আদি অধিকার এবং কীভাবে সে অধিকার গোটা গ্রাম বা গ্রাম-সমষ্টি জুড়ে খর্ব হচ্ছে, তাও বুঝতে পারল । আদিবাসীদের এক নূতন চেতনার উন্মেষ হল: বোধে জাগল 'আমরা' ও 'তারা' (দিখুরা), এই দ্বৈতের অনিবার্যতা। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য-চেতনার সম্পূর্ণ রূপ শুধুমাত্র এই দ্বৈত-চেতনাকে ঘিরে গড়ে ওঠে নি। অর্থাৎ শত্রুর সঙ্গে সম্পর্কে তাদের যে অবস্থান, সেটা এ চেতনা বিকাশের প্রাথমিক পর্যায় মাত্র। নিজেদের মধ্যে যে-সংহতিবোধ, তার উৎসও তারা আগের থেকে অনেক পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারল। কারণ, আন্দোলনের সংগঠনে এই ঐক্য ও সংহতিবোধের উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে।

তা ছাড়া, আদিবাসী আন্দোলনের এক বিশেষ পর্যায়ে (যাকে বলা হয়েছে রিলিজস্ রিভাইটালাইজেশন) তাদের নিজেদের সমাজ ও সংস্কৃতিকে জানা দিখু-বিরোধী সংগ্রামের একটা প্রধান হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াল।

'কৃষক'-অধ্যুষিত অঞ্চলে অনেক আন্দোলনের চরিত্র এই দিক থেকে আলাদা। এখানে যে-বিশিষ্ট উপায়ে আন্দোলনকে সংগঠিত করা হত, তার প্রধান লক্ষ্য: কীভাবে শত্রুর আক্রমণ বা প্রতি-আক্রমণ প্রতিহত করা যাবে। আন্দোলনের আশু উদ্দেশ্যের (যেমন, পরিকল্পিত খাজনা-বৃদ্ধি বন্ধ করা) সাফল্যের পর কৃষকসমাজের সার্বিক সংগঠনে তার কোনো ছাপই থাকল না। কিন্তু বিশেষ ধরণের আদিবাসী আন্দোলনে দেখা গেছে, সংগঠনের এই প্রস্তুতি অনেক বেশি ব্যাপক এবং, এক অর্থে, সর্বাত্মক। আদিবাসীদের বিশ্বাস ছিল : নিজেদের নানাভাবে 'সংস্কৃত', 'শুদ্ধ' করে তুলতে হবে; এর জন্য দীর্ঘদিনের বহু পুরোনো বিশ্বাস, আচার, সামাজিক অনুষ্ঠান, নৈতিকতার ধারণা আমূল বর্জন করতে হবে (এই বর্জনের পরিধি যে কতদূর বিস্তৃত হতে পারে, তার দৃষ্টান্ত : ওরাওঁদের 'টানা ভগৎ' আন্দোলন [১৯১২-২২])। এর জন্য তাদের জানতে হয়েছে কী সেই বিশ্বাস, আচার, রীতিনীতি, যেগুলি আছে বলে তাদের বর্তমান দুর্দশা থেকে মুক্তি ঘটছে না। এই জানার মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের ইতিহাসকে একটা বিশাল প্রেক্ষাপটে বুঝতে পারল। আর জানল, নানা বিশ্বাস ও আচারের দিক থেকে এক বিস্তৃত অঞ্চলের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। তাতে সমৃদ্ধ হয়েছে তাদের ঐক্য-চেতনা। অবশ্য সব ধরণের আন্দোলনে এই বিশেষ ধরণের চেতনার প্রভাব দেখা যায় না। কায়েমি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ আন্দোলনেই এই প্রভাব সুস্পষ্ট হয়েছে (যেমন: প্রথম সাঁওতাল বিদ্রোহ [১৮৫৫-৫৬]; সাঁওতালদের দীর্ঘকালস্থায়ী খেরওয়ার আন্দোলন [১৮৭০-১৮৮২]; মুণ্ডা অঞ্চলে বীরসা-পরিচালিত আন্দোলনের দুটি পর্যায় [১৮৯৫-১৯০০]; ওরাওঁদের টানা ভগৎ আন্দোলন [১৯১২-১৯২২] ইত্যাদি)। অন্যদিকে, মুণ্ডাদের প্রথম বড়ো আন্দোলন ('কোল' বিদ্রোহ [১৮৩১-৩২], ভুঁইহারি অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য 'নিয়মতান্ত্রিক' আন্দোলন (১৮৬৯-১৮৮২)— এইগুলি ছিল প্রধানত সীমিত লক্ষ্যের আন্দোলন। সম্পূর্ণ নূতন বিকল্প, স্বতন্ত্র এক রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা তাদের লক্ষ্যের মধ্যে ছিল না।

৭.৪

আমূল পরিবর্তন-প্রয়াসী আন্দোলনগুলি বিংশ শতাব্দীতে কেন বিরল হয়ে এল (টানা ভগৎ আন্দোলন ছাড়া), তার তিনটি প্রধান ব্যাখ্যা আছে : ১. সংস্কারপন্থী ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের প্রসার; ২. সরকারি দমন-নীতি এবং ৩. আদিবাসীদের নানা অভিযোগের প্রতিকারের জন্য নূতন নূতন আইনের প্রণয়ন।

এই ব্যাখ্যাগুলি সম্পূর্ণ গ্রহণীয় নয়। ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের প্রভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর 'র‍্যাডিক্যাল' আন্দোলন আবার ফিরে আসতে পারল না, এই যুক্তি টেঁকে না। বরং বলা চলে, আগেকার ধরণের আন্দোলন আর ব্যাপকভাবে সংগঠিত করা সম্ভব হচ্ছিল না বলেই ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের ক্রমবিস্তার ঘটেছে।

সরকারি দমন-নীতি নিঃসন্দেহে আগেকার আন্দোলনগুলির ব্যর্থতার একটা কারণ। কিন্তু দমননীতি সত্ত্বেও টানা ভগৎ আন্দোলন বিশাল অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পেরেছিল।

নতুন নতুন আইনের প্রণয়ন কীভাবে কায়েমি ব্যবস্থার আমূল বদল-ঘটানোর সংকল্পকে নিবৃত্ত করে, তার উদাহরণ হিসেবে বিশেষত মুণ্ডা আন্দোলনের উল্লেখ করা হয়। বীরসা-আন্দোলনের ব্যাপ্তি সরকারকে নানাভাবে আশঙ্কিত করেছিল। এই আন্দোলনের ব্যর্থতার পর সরকার তাই নূতন আইন করে মুণ্ডাদের কোনো কোনো অভিযোগের প্রতিকার করতে চেষ্টা করে। ১৯০৮ সালের 'ছোটোনাগপুর প্রজাস্বত্ব আইন', তার দৃষ্টান্ত।

এইসব নূতন আইনের সুফল অবশ্যই ছিল। কিন্তু বীরসা-আন্দোলনের সঙ্গে তুলনীয় কোনো আন্দোলন কেন আর গড়ে উঠতে পারল না, আইনের সুফল দিয়ে তার পুরো ব্যাখ্যা মেলে না। আসলে এই সুফলের কথা অনেক বাড়িয়ে বলা হয়েছে। এই আইনের ফলে মুণ্ডারা তাদের কোনো হারানো অধিকার তো ফিরে

পায় নি। যেমন: তাদের গ্রাম-পত্তনের আদি ভিত্তি— খুৎকাঠি স্বত্ব—বহু গ্রাম থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। সরকার তার পুনঃপ্রতিষ্ঠার কোনো চেষ্টাই করে নি। সরকারের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সেই চেষ্টা করলে, মুণ্ডা জগতে আবার 'বিশৃঙ্খলা', 'অশান্তি' বাড়বে। সরকার ভেবেছিল, মুণ্ডাদের যা ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেছে, তার প্রতিবিধানের চেষ্টা অর্থহীন; তাদের ভূমিস্বত্বের যা এখনো অক্ষত আছে, তাতে যেন দিখু-আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হয়, সরকার শুধু তা-ই দেখবে। সরকারি আইন কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সুস্পষ্ট প্রবণতাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল মাত্র— যেমন, বেট-বেগারি প্রথার ক্ষেত্রে। জমিদারেরা এমনিতেই আগের মতো জোর জুলুম করে বেগারি প্রথা চালাতে পারছিল না। তাই তারা একটা রফা করতে বাধ্য হয়েছিল। বেগারির বদলে তারা কিছু নগদ পাওনা চাইল। মুণ্ডারা তাতে রাজি ছিল। নূতন আইন এ বিষয়ে নূতন কিছু করে নি; আঞ্চলিক এইসব নানা আপসকে স্বীকার করে নিয়েছিল, এই মাত্র; তার বেশি আর কিছু নয়।

পুরোনো ধরণের আন্দোলন যে ক্রমেই বিরল হয়ে এল, তার কারণ অন্য জায়গায় খুঁজতে হবে। একটা সম্ভাব্য কারণ: এই বিশিষ্ট ধরণের আন্দোলনের সংগঠন। এসব আন্দোলনের একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়— তারা দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে; আর অতি অল্প সময়ে তাদের ভাঙনও ঘটেছে। এদের দ্রুত প্রসারলাভের একটা প্রধান কারণ হল, এক ধরণের নেতৃত্বের আবির্ভাব: এক সম্মোহনী ক্ষমতার অধিকারী নেতৃত্ব (ক্যারিজম্যাটিক লীডারশিপ)। এই সম্মোহনের প্রধান উৎস, তারা এক নূতন বার্তা বহন করে এনেছে। তা হল: আদিবাসীরা অচিরে তাদের হৃত গৌরব ফিরে পাবে, সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে দিখুদের প্রতাপ; এক উজ্জ্বল শোষণ-মুক্ত জগতের আবির্ভাব আসন্নপ্রায়; এ শুধু নেতার ইচ্ছা নয়, এটা বিধাতার নির্দেশ ও অভিপ্রায়; নেতার আগমন ঐ নির্দেশ কার্যকর করার জন্য; যৌথ প্রতিরোধ-আন্দোলনের মধ্য দিয়েই শোষকগোষ্ঠীকে নির্মূল করতে হবে; এ প্রতিরোধ সফল হবেই, কারণ নেতার অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রভাবে তার অনুগামীদের দৈহিক কোনো ক্ষয়ক্ষতি হবে না; ইত্যাদি। আন্দোলনের যে-মূল সংগঠন তার প্রধান লক্ষ্য এই নূতন বাণী, এই প্রতিশ্রুতির অর্থ যাতে বহুজনের কাছে পৌঁছানো যায়। অন্যসব কর্মপন্থাও এই নেতার ব্যক্তিত্ব ঘিরেই নির্দিষ্ট হয়েছে।

এর ফলে অন্য কোনো বিকল্প নেতৃত্বের উত্থান সহজ ছিল না। অথচ নেতার দেওয়া নানা প্রতিশ্রুতি বা আশ্বাস কোনোটাই যখন সত্য হল না, তখন অনুগামীদের নৈতিক বল হঠাৎ নিঃশেষ হয়ে গেল। এই মোহ-ভঙ্গের ভয়াবহ পরিণাম সাঁওতাল আন্দোলনের সময় দেখা গেছে।

একান্ত ব্যক্তিনির্ভর এই আন্দোলনে তাই তার আদি প্রেরণা অতি দ্রুত হারিয়ে যায়। অথচ নূতন নেতৃত্ব তৈরি করার কোনো প্রস্তুতি ছিল না। যে 'আত্মশুদ্ধি' আন্দোলনের (রিলিজস্‌ রিভাইটালাইজেশন) কথা আগে বলেছি, সেখানে অনুগামীদের ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্র অবশ্যই প্রশস্ত ছিল। কারণ এই নূতন বিশ্বাস অনুযায়ী শুধুমাত্র নেতার অতিপ্রাকৃত শক্তির জোরে শত্রুর পরাভব ঘটবে না।

তবে এতেও নূতন সংগঠনের বনিয়াদ তৈরি হতে পারল না। কারণ এই 'আত্মশুদ্ধি' ছিল এক দুরূহ প্রক্রিয়া। বিশেষ করে শুদ্ধির নানা উপায়ের অর্থনৈতিক তাৎপর্য আদিবাসীদের একটা বড়ো অংশকে আন্দোলন সম্পর্কে নিরুৎসাহ করেছিল। যেমন, শুদ্ধি আন্দোলনের কর্মসূচিতে ছিল: শুয়োর, মুরগি ইত্যাদি প্রাণী 'অশুচি'; তাই তাদের পালন নিষিদ্ধ। অথচ আদিবাসী অর্থনীতিতে এর ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারো কারোর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যতই আশু ক্ষয়ক্ষতি হোক-না-কেন, এ কর্মসূচি তাদের মানতেই হবে।

এর ফলে আন্দোলনের পুরোনো ঐক্য শিথিল হয়ে এল। যেমন, সাঁওতাল সমাজ দুটো আলাদা গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে গেল: যারা শুদ্ধ (সাফা) আর যারা শুদ্ধ নয়। এদের মধ্যে ব্যবধানকে কেউ কেউ হিন্দু জাতিপ্রথার উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের মধ্যে দূরত্ব আর বিরোধের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ব্যবধান অবশ্যই বাড়ছিল, তবে 'শুদ্ধ'

সাঁওতালরা 'উচ্চবর্ণে'র সমগোত্রীয় ছিল না। যে-প্রতীকের মধ্য দিয়ে উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের পারস্পরিক অবস্থান সূচিত হত, সাঁওতাল সমাজে তা মোটেই প্রযোজ্য ছিল না।

৮.

ট্রাইব একটা মনগড়া ঐতিহাসিকভিত্তিহীন ধারণা—আমরা এই তত্ত্বের সারবত্তা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। দক্ষিণ বিহারের আদিবাসী সমাজকে বোঝার জন্য এটা গ্রহণীয় পদ্ধতি নয়। বরং এতে এই সমাজে নানা পরিবর্তনের মূলধারা ও প্রকৃতি সম্পর্কে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এখানকার অনেক ঘটনা যেমনভাবে এবং যে-কারণে ঘটেছিল বলে গ্রন্থকার মনে করেন আসলে তা সেভাবে এবং সে কারণে ঘটে নি। আমরা বলার চেষ্টা করেছি, আফ্রিকার সমাজ-সম্পর্কিত ব্রিটিশ নৃতত্ত্ববিদ্যাচর্চার কোনো কোনো প্রবণতা সম্পর্কে আফ্রিকার পণ্ডিতসমাজের (এবং পরে আরো অনেকের) বিরূপ সমালোচনা তাঁর বিশ্লেষণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। অথচ এই আদিবাসী সমাজ যদি বিশিষ্ট অর্থে ট্রাইব না হয়, তা হলে তার স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা একান্তই জরুরি। এর অর্থ এই নয় যে, আদিবাসী সমাজের কোনো অপরিবর্তনীয়, নির্দিষ্ট লক্ষণকে খুঁজতে হবে। বিশেষ ঐতিহাসিক পরিবেশে এই আদিবাসীসমাজ ও অর্থনীতি গড়ে উঠেছে। তাই সেটা কোনো স্ট্রাকচারাল টাইপ নয়। তবুও বিশেষ পরিবেশের জন্য কতকগুলি বৈশিষ্ট্য এখানে দেখা যায়; যা মোটেই 'আদিবাসিত্ব'র জন্য নয়। এমন নয় যে আলাদা আলাদাভাবে এর বৈশিষ্ট্যগুলির কোনোটাই অন্য অঞ্চলে দেখা যায় না। তবে এইসব বৈশিষ্ট্যের সমন্বিত সমাহার এবং এইসব বৈশিষ্ট্যের মূল প্রেক্ষাপট সর্বতোভাবে তখনকার অন্য সমাজে দেখা যায় না।

আমরা বিশেষভাবে বলতে চেষ্টা করেছি : আদিবাসী সংস্কৃতি, বিশ্বাসের জগৎ, সমাজ-সংগঠন মনে না রাখলে এই অঞ্চলের অনেক পরিবর্তন বোঝা যাবে না— বিশেষ করে বোঝা যাবে না কীভাবে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে স্বতন্ত্র্য-চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে। সম্মোহনী শক্তির অধিকারী নেতার নেতৃত্বকে ঘিরে যে-বিশেষ ধরণের আমূল পরিবর্তনপ্রয়াসী আন্দোলনের কথা আমরা বলেছি, তাও আদিবাসীদের বিশিষ্ট বিশ্বাসের জগতের বাইরে এত ব্যাপকভাবে ঘটতে পারত না। এই নেতাদের উপর মিশনারি-প্রচারিত খ্রিস্টের বাণীর প্রভাবের কথা কেউ কেউ বলেছেন। এই ব্যাখ্যা বড়ো জোর অংশত সত্য। খ্রিস্টের বাণী আদিবাসী বিশ্বাসের আদলে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল।

টীকা

১. Susana B. C. Devalle, *Discourses of Ethnicity: Culture and Protest in Jharkhand,* Sage Publications, New Delhi, 1992.

২. তদেব; pp. 78-79। বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য A. G. Frank, *Development of Under-development,* New York, 1966.

৩. মুণ্ডা গ্রামে বাইরের কামারদের নাম ছিল 'লোহার'; আদিবাসী কামারদের একটি প্রচলিত নাম 'অসুর মুণ্ডাকো' (asur mundako)।

৪. কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা : ক. E. G. Man, *Sonthalia and the Santhals,* Calcutta,

1867; খ. W.W. Hunter, *The Annals of Rural Bengal*, Calcutta, 1868 : গ. E.T. Dalton, *Descriptive Ethnology of Bengal*, Calcutta, 1872; Reprint Calcutta, 1960; ঘ. H. Risley, *The Tribes and Castes of Bengal*, Calcutta, 1891 ইত্যাদি।

৫. Kumar Suresh Singh, *Tribal Society in India*, New Delhi, 1985. 'The conceptual model developed by the British administrators-turned-ethnographers and by anthropologists was inspired by the then prevailing model in anthropology'. pp.104-105.

৬. কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য: J. P. Mills, G. H. Hutton এবং Verrier Elwin।

৭. H. Risley, *(The Tribes and Castes of Bengal* etc.*)* বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন কীভাবে হিন্দুধর্মের প্রভাবে কোনো কোনো আদিবাসী-গোষ্ঠী নিজেদের ধর্মবিশ্বাস, আচার ইত্যাদিঅনেকাংশে বর্জন করছিল। দ্র : 'The Introduction', pp. xv-xviii। E.T. Dalton তাদের 'Hinduizedtribes' আখ্যা দিয়েছেন।

৮. পূর্ব ভারতের আদিবাসী সমাজ সম্পর্কে গবেষণার ক্ষেত্রে ভারতীয়দের মধ্যে কয়েকটা বিশিষ্ট নাম: শরৎচন্দ্র রায়, ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার, নির্মলকুমার বসু, সুরজিৎ সিংহ, কুমার সুরেশ সিং, আঁদ্রে বেতেই, ললিতপ্রসাদ বিদ্যার্থী ইত্যাদি।

৯. Nirmal Kumar Bose, *Culture and Society in India*, Bombay, 1967; chapter 12 The Hindu Method of TAbsorption এইআলোচনারজন্যতাঁর'হিন্দুসমাজেরগড়ন'(লোকশিক্ষাগ্রন্থমালা, কলকাতা, ১৩৫৬)- এর ১-৩ অধ্যায়ও দ্রষ্টব্য।

১০. Kumar Suresh Singh, *Tribal Society in India*, chapter 3: Technology and Accul turation। নির্মলকুমার বসুর বক্তব্যের সমালোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : Surendra Munshi, 'Tribal Absorption and Sanskritization in Hindu Society', *Contributions to Indian Sociogy*, 1979, vol.13, No 2.

১১. André Beteillé, *Six Essays in Comparative Sociology*, Delhi,1974, chapter 4 : 'Tribe and Peasantry'

১২. Jagannath Pathy, *Anthropology of Development: Demystifications and Relevance* New Delhi, 1987; 'Imperialism, Anthropology and the Third World'*Economic and Political Weekly*, April 4, 1981.

১৩. এ বিষয়ের উপর কয়েকটা মাত্র প্রবন্ধের উল্লেখ করছি:

ক. Peter P. Ekeh, 'Social Anthropology and Two Contrasting Uses of Tribalism in Africa', *Comparative Studies in Society and History*, 1990, pp. 660-700.

খ. Gerrit Huizer & B. Mannheim (eds), *The Politics of Anthropology : From Colo nialism and Sexism toward a View from Below*, The Hague, 1979. এই প্রবন্ধ সংকলনের দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ :

Gerrit Huizer, 'Anthropology and Politics : From Naivete toward Liberation'. Omafume F. Onoge, 'The Counter-Revolutionary Tradition in African Studies'.

১৪. এই গোষ্ঠীর মতে, 'The main task of cultural anthropology is to describe the recur

rent functions of customs and institutions, rather than to explain the origins of cultural differences and similarities.... the attempt to discover the origins of cultural elements was doomed to be speculative and unscientific because of the absence of written records.' Marvin Harris, *Cultural Anthropology,* New York, 1983, p. 323.

১৫. Susana B. C. Devalle, *Discourses of Ethnicity,* p. 73.

১৬. Edward W. Said, *Orientalism*, New York, 1979, 'Introduction' দ্রষ্টব্য। ভারতবর্ষের ইতিহাস-রচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই মতবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে: Gyan Prakash, 'Writing Post-Orientalist Histories in the Third World : Perspectives from Indian Historiography', *Comparative Studies in Society and History*, 1990, pp. 383-408.

১৭. পরিচ্ছেদ (সেকশন) ২.১

১৮. Dalton, *Descriptive Ecnology....*(আগে উদ্ধৃত), p. 205.

১৯. ক. B. B. Chaudhuri, 'Tribal Village Organization and Mobilization in the Tribal Protest Movements in Eastern India, 1820-1922', in B.B. Chaudhuri ed., *Social Dimensions of Religious Movements in India* (In preparation, Indian Institute of Advanced Study, Shimla).

খ. 'Tribal Society in Transition: Eastern India, 1757-1920' in M. Hasan & N. Gupta (eds), *India's Colonial Encounter*, New Delhi, 1993.

২০ W. G. Archer, *Tribal Law and Justice: A Report on the Santal*, New Delhi:, 1984 (এ রিপোর্ট লেখা হয়েছিল ১৯৪৬ সালে), pp 548-49.

২১. Robert Parkin, *The Munda of Central India: An Account of Their Social Organization,* New Delhi, 1992, chapter 1-5. পার্কিন এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন।

২২. পরিচ্ছেদ ৬

২৩. K. S. Singh, 'Agrarian Issues in Chotanagpur' in K. S. Singh ed. *Tribal; Situation in India,* Indian Institute of Advanced Study, Shimla, 1972, pp. 377-78.

২৪. পরিচ্ছেদ ৬

২৫. *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India,* New Delhi, 1983, chapter 2: 'Negation'.

বইপত্র

ইতিহাসে স্মৃতি, স্মৃতিতে ইতিহাস

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের সাহিত্যসভা। বক্তা : দীনেশচন্দ্র সেন। তাঁর ভাষণে তিনি বার বার 'সেক্ষপীর', 'সেক্ষপীর' উচ্চারণ করছিলেন। শ্রোতারা মুচকি হাসছিলেন, ছাত্ররা গজরাচ্ছিল রাগে বিরক্তিতে। বক্তৃতার শেষে দীনেশচন্দ্র সেন মন্তব্য করলেন যে তাঁর মুখে শেক্সপিয়র-এর উচ্চারণ 'সেক্ষপীর' শুনে শ্রোতারা হাসছিলেন। অথচ 'সাহেবরা যখন আমাদের গঙ্গাদেবীকে গ্যাঞ্জেস্ বলে উচ্চারণ করে অথবা আমাদের দেবভাষা সংস্কৃতকে স্যাংস্কৃট বলে উচ্চারণ করে, তখন ত কোন মিঞার মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠতে দেখি না।'[১]

বিশ্বপতি চৌধুরীর স্মৃতিচারণে দীনেশচন্দ্র সেনের চরিত্রের একটি দিক ধরা পড়েছে: আত্মাভিমান, প্রতিস্পর্ধিতা জাহির করা; হীনম্মন্যতা থেকে মুক্ত হবার ইচ্ছা। এই অভিপ্রায় যতটা না প্রচলিত অর্থে 'রাজনৈতিক', তার চেয়ে অনেক বেশি সত্তা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। এহেন মানসিকতার ফসল 'বৃহৎ বঙ্গ'। দীর্ঘ ভূমিকাতে কোনোরকম গোপনতা না করে দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর প্রকল্পের কথা খোলাখুলি বলেছেন। শুরুর উদ্যোগ ছিল সরকারের। কাজটা যৌথ। ছোটোলাটের প্রাসাদের সভায় ১৯১৬ সাল নাগাদ নির্বাচিত লেখকসংঘ দ্বারা 'বাঙ্গলা দেশের একখানি সংক্ষিপ্ত ও বিশুদ্ধ ইতিহাস' লেখার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ছক-ও তৈরি করা হয়; শুরু হয় কাজও; আবার যথারীতি পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়; লেখকরা মারা যান। সেই লেখকসংঘের শেষ জীবিত প্রতিনিধি হিসেবে ২০ বছর বাদে দীনেশচন্দ্র সেন অসমাপ্ত কাজ শেষ করেন, 'বৃহৎ বঙ্গ' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুকূল্যে প্রকাশিত হয়।

এর মধ্যে আদি ছকটি পালটে গেছে। পুরোনো ছক ছিল শাসন ও অধিকারের। 'পাল ও সেন রাজত্ব' 'দিল্লীর শাসনাধীন বাঙ্গলা', 'মোগলাধীন বাঙ্গলা', 'ইংরেজ—জমিদার-রূপে', 'ইংরেজ—দেওয়ান-রূপে' ইত্যাদি পর্বে ইতিহাস লেখা হত। ছকটা ছিল বাঙলার ইতিহাসের। যোড়শ বা শেষ অধ্যায় লেখার ভার ছিল দীনেশবাবুর, বিষয় : বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ। এই অধ্যায়টি আদি ছকটিকে পালটে দিয়ে অন্য অভিমুখে ধাবিত হল— 'বহু শতাব্দী হইতে বাঙ্গালী জাতি যেভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে' তার ইতিবৃত্তে পরিণতি পেল (ভূমিকা, পৃ. [৯])।

দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে যেমন সচেতন ছিলেন তেমনি চার পাশের তদানীন্তন সারস্বতচর্চা ও জ্ঞানাঙ্গনের পরিধিতে তাঁর রচনাকে বিধৃত করতে চেয়েছেন। ভূমিকাতে আছে বিশাল তালিকা, কৃতবিদ্য অধ্যাপকদের রচনা, প্রাদেশিক ইতিহাসের বই, কুলজি গ্রন্থ, সর্বোপরি নিজের চিত্রসংগ্রহ আর অভিজ্ঞতা। তাঁর বক্তব্য পরিষ্কার,

> এমন দেবতার নৈবেদ্য নাই, যাহাতে চঞ্চুর আঘাত না করিয়াছি।... আমি যে সকল বিষয় লইয়া আজীবন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে নূতন কিছু তথ্য পাঠকগণ সম্ভবতঃ পাইবেন।... ঐতিহাসিক কিংবদন্তী বা উপগল্প, তাহার যে মূল্যই থাকুক না কেন, তাহা আমি বাদ দিই নাই।... কারণ জাতীয় ইতিহাস-গঠনের প্রাক্কালে সামান্য খড়কুটোরও কিছু মূল্য আছে,— কিছুই উপেক্ষার বিষয় নহে;— (ভূমিকা, পৃ. [৩১])

সব কিছু নিয়ে তো একটি জাতি তৈরি হয় : রান্না বান্না, শীতলপাটি, বাড়ি, ঘর, কাঁথা-সেলাই থেকে গল্প- বলা বা কথা- রচা। পাতায় পাতায় ছবি দিয়ে, নানা গল্প ও কথার নজির হাজির করে দীনেশচন্দ্র সেন

তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন, হয়তো বেশি মাত্রাতেই করেছেন, সস্ত্রীক রামপ্রসাদ -এর প্রতিকৃতিও আমরা দেখতে পাই। তাগিদ ছিল জাতীয় ইতিহাস রচনার; কিন্তু জাতীয় ইতিহাসেরও রকমফের আছে, সব জাতীয় ঐতিহাস এক নয়। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ সেন, সবাই, নিজের মতো করে জাতীয় ইতিহাস লিখছেন। আবার দুর্গাচন্দ্র সান্যাল, নগেন্দ্রনাথ বসু আর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও জাতীয় ইতিহাস লিখছেন। রচনার তার আলাদা, ঝোঁক আলাদা। দীনেশচন্দ্র সেনের সহমর্মিতা দ্বিতীয় কুলের প্রতি। অথচ তাঁর স্বকীয়তা আছে। বৈষ্ণবজনোচিত বিনয়ে তিনি তাঁর বৈশিষ্ট্য বলেছেন, 'আমি বঙ্গভাষা ও সাহিত্য লইয়া জীবন কাটাইয়াছি, ইতিহাসক্ষেত্রে আমি অপরিচিত।'

ফলে সাহিত্যের কল্পনা ও রসে, সমূহের বোধে তাঁর রচনা অনুবিদ্ধ। ইতিহাসের মূল্য তাঁর কাছে স্মৃতিচারণায়, রসসৃষ্টিতে। ভাষা স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখে, ইতিহাসে ভাষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুরাতন নামের উচ্চারণ ও বানান বজায় রাখতে গিয়ে তিনি লেখেন,

> জাতীয় ভাষার ছন্দ রক্ষা করিয়া প্রাচীনেরা যেরূপ উচ্চারণ করিতেন, তাহার ঘন ঘন পরিবর্ত্তন করিলে সাধারণের পক্ষে তাহা আয়ত্ত করা কঠিন হয়, বিশেষ, কোন ভাষার স্বভাবানুগ ছন্দ হারাইয়া ফেলিলে নাম-শব্দগুলি সেই দেশবাসীর স্মৃতির অনুকূল হয় না। (ভূমিকা, পৃ. [১১])।

স্মৃতি অবহেলার বস্তু নয়, স্মৃতি সবকিছুতে আছে: নাম থেকে গল্পে, পটের রেখা থেকে পল্লীগানে, ছড়ায়, এইসব ক্ষেত্রে ঝাড়াই, বাছাই, যুক্তি বা বিজ্ঞানের দোহাই সমস্ত পরিকল্পনাকে বাতিল করবে। ঐতিহাসিক নির্লিপ্তি আর খুঁতখুঁতানির বিরুদ্ধে দীনেশচন্দ্র সেন কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছেন, কল্পনাকে রচনায় প্রশ্রয় দিতে দ্বিধা করেন নি। তাঁর মত প্রণিধানযোগ্য।

> এই পুস্তকের ভাষা হয়ত ঠিক বিজ্ঞান-সঙ্গত ওজন করা, নির্লিপ্ত ঐতিহাসিকের ভাষা হয় নাই। আজ বঙ্গের শ্মশানের উপর দাঁড়াইয়া বাঙ্গালী লেখক যদি মাঝে মাঝে অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া থাকেন, কিংবা কিছু বিচলিত হইয়া উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া থাকেন—তবে আশা করি তিনি ঐতিহাসিকগণের ক্ষমা হইতে বঞ্চিত হইবেন না। বিশেষ এই পুস্তক শুধু ঐতিহাসিকগণের জন্য লিখিত হয় নাই, বঙ্গের জনসাধারণের মনে স্বদেশ-প্রীতি জাগ্রৎ করা আমার অন্যতম লক্ষ্য।.... এজন্য যদি রস-সঞ্চারের অভিপ্রায়ে ভাষায় মাঝে মাঝে কিছু রং ফলাইতে চেষ্টা করিয়া থাকি, তাহাতে আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। (ভূমিকা, পৃ. [৩১])।

বাঙালি পাঠকের রুচি এই ভাষাগত উচ্ছ্বাসের একমাত্র কারণ নয়। এর পরে তিনি বৈজ্ঞানিক ভাষার সঙ্গে সমূহের বিশ্বাসের, বোধের সংঘাতের কথা তুলেছেন, প্রশ্ন তুলেছেন শিক্ষিতের বুদ্ধির সঙ্গে জনগণের বোধের ফারাক নিয়ে। তিক্ততার ছিটে লক্ষ করি,

> আমাদের ঐতিহাসিক বিষয়গুলির অধিকাংশ ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সহিত জড়িত, সেই বিশ্বাসে হানা দিতে তাঁহাদিগের একটুও বাধে না,— এই জন্য আমাদের ইতিহাসের আলোচনা-কালে তাঁহারা [য়ুরোপের লেখকগণ] অতিরিক্ত মাত্রায় বৈজ্ঞানিক হইয়া বসেন। হুইলার সাহেব যখন লিখিলেন, কৌশল্যা নিশ্চয়ই দশরথকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছিলেন, তখন তৎকৃত ইতিহাসখানি বাঙ্গলার স্কুলে স্কুলে পাঠ্য করিতে কাহারও আপত্তি হইল না— ইহাই বিজ্ঞান-সঙ্গত আলোচনা। আমাদের মূক জনসাধারণের একটা প্রখর অনুভূতি আছে— এই ভাবের গবেষণা তাহাদের মর্ম্মান্তিক হয়; কিন্তু তুলসীতলা হইতে হাতের নোয়া পর্যন্ত হিন্দুজাতি যে চক্ষে দেখিয়া থাকেন, গবেষণার সময়ে হিন্দু লেখকের তাহা একটু মনে রাখিলে ভাল হয়— তাহা না হইলে জনসাধারণের সঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যোগ-সূত্র ছিন্ন হইবে।.... এ সম্বন্ধে আমার এই বক্তব্য যে বাঙ্গলার লেখকবর্গ এ দেশের ইতিহাস লিখিতে গিয়া একটু শ্রদ্ধার সহিত লিখিলে ভালো হয়, এই পুস্তকের ১৩৭-১৩৮ পৃষ্ঠায় সাহেবদের রামায়ণ ও

মহাভারতাদি সম্বন্ধে যে মতামত উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অসার ও অতিরিক্ত মাত্রায় বৈজ্ঞানিক মতগুলির তাঁহারা যেন প্রশ্রয় না দেন। মুসলমানদের জাতীয়তা অনেক বেশী, তাঁহাদের বিশ্বাসসম্বন্ধে কেহ কিছু লিখিতে সাহসী হন না। ইংরেজ রাজার জাতি— তাঁহাদের ইতিহাস লইয়া কেহ যথেচ্ছাচার করিতে পারে না। একমাত্র হিন্দুসমাজই এই সকল বিষয়ে অতিরিক্ত মাত্রায় গবেষণাশীল লেখকদের যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দিতেছেন। (ভূমিকা, পৃ. [৩২])

নানা স্তরে বক্তব্য দানা বেঁধেছে। ইতিহাসচর্চা স্মৃতিকে উশকে দেয়, আবেগ আসা স্বাভাবিক। এ স্মৃতিকে জনগ্রাহ্য করতে হবে, রসস্নিগ্ধ করতে হবে, পাঠক তবে পড়বে। অতএব রঙ ফলানো দরকার। বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে সামূহিক বিশ্বাসকে অবজ্ঞা করা হয়। অথচ ঐ সব ধারণার মধ্যে তো অতীত বেঁচে থাকে, সমূহ নিজেকে ধরে রাখে। সেই বিশ্বাসকে অস্বীকার করার অর্থ সামূহিক সত্তাকে নাকচ করা। প্রেক্ষিত বুঝে তার নামও দেওয়া হয়েছে : মুসলমান, ইংরেজ ও হিন্দু। 'বৃহৎ বঙ্গ' হিন্দুদের স্মৃতিচারণা, আলোচনায় মুসলমান বা ইংরেজদের প্রবেশ প্রসঙ্গক্রমে। জাতীয় ইতিহাস রচনার কেন্দ্রে যুক্তি বা বিজ্ঞানের চাইতে প্রাধান্য পাবে বিশ্বাস; আবেগ, অনুভূতি, শ্রদ্ধা ও কল্পনা মিলেমিশে যাবে; জন্ম হবে রসের;— এই অন্তর্লীন সূত্র 'বৃহৎ বঙ্গ'-এর পাতায় পাতায় আছে। ইংরেজের কাছে সব ঋণ স্বীকার করেও বা মুসলমান-শাসনের দান মেনে নিয়েও দেশজ ইতিহাস-গঠনের ক্ষেত্রে কল্পনা আর রসের ভূমিকার স্বীকৃতির তাৎপর্য কতটা, 'বৃহৎ বঙ্গ' বিশ্লেষণে আমরা তা বুঝতে পারব। 'বৃহৎ বঙ্গ' অবশ্য এই পাঠের অভিজ্ঞতায় একক নয়। বাঙলার ইতিহাসবেত্তারা অনেকে সেই অভিজ্ঞতার অংশীদার।

সঙ্কোচন ও প্রসারণ 'বৃহৎ বঙ্গ'-এর অবয়বকে নির্ধারিত করেছে। বঙ্গের প্রসারে সবাই ধরা পড়েছে: আসমুদ্র হিমাচল, সিংহল, তামিল কেউ বাদ নেই, সবাই বৃহৎ বঙ্গের ফল। অন্যপক্ষে, ইতিহাস একান্ত বাংলার, বাঙালি জাতির। 'আমি বিশ্ব-প্রেমিক নহি, আমি একান্ত ভাবে প্রাদেশিক; তাহাতে কেহ যদি মনে করেন, আমি যুগোপযোগী নহি,— আমি ক্রম-বর্দ্ধিষ্ণু অগ্রগতিশীল সভ্যতার পশ্চাৎ-ভাগে কূপমণ্ডুক [-মণ্ডূক] হইয়া পড়িয়া আছি,— তবে সেই অভিযোগের আমি প্রতিবাদ করিব না, আমি তাহাই', (ভূমিকা, পৃ. [৩৩]) প্রদেশ ও দেশ, বঙ্গ ও ভারত, নানা স্তরে একটা অপরটার পরিবর্ত : বৃহৎ বঙ্গ হয়ে উঠেছে ভারত, আবার ভারত হল বাংলার যে কোনো পল্লী।

স্মৃতিমেদুর ইতিহাসে রসসৃষ্টি এবং অবয়বের সঙ্কোচন ও প্রসারণ 'বৃহৎ বঙ্গ'কে জাতীয় ইতিহাস রচনার এক বিশেষ ধারায় আবদ্ধ রেখেছে। খণ্ডকে, অংশকে জাতির মহিমায় ভূষিত করতে হবে, সাধারণকে দৈনন্দিনকে করতে হবে অসাধারণ। দীনেশচন্দ্র সেন এই কাজে আশ্রয় নিয়েছেন কল্পনার, সাধারণের বোধকে খুঁজেছেন পরিবারের গণ্ডিতে। 'বৃহৎ বঙ্গ'-এ যদি কোনো রসবোধ তৈরি করার চেষ্টা থাকে, তা হল: গার্হস্থ্য রস। উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য, কল্পনার রঙ সবই এই গৃহস্থ বাঙালিকে রূপায়িত করেছে। জাতি ধরা পড়েছে পল্লীতে, নাগরিক হয়েছে গৃহস্থ। এক ধরণের জাতীয় ইতিহাস দেখায় : ক্ষুদ্র কীভাবে বৃহৎ হচ্ছে; দীনেশবাবু দেখাচ্ছেন : বৃহৎ কীভাবে ক্ষুদ্রতে ধরা পড়েছে। ক্ষুদ্র ও বৃহতের এই ছেদ-প্রতিচ্ছেদ আঁকার চেষ্টাতে আসছে কল্পনা আর রঙ। এবং এই বিপরীতমুখী যাত্রা করতে গিয়ে তিনি ইংরেজিনবীসদের ইতিহাসরচনার কায়দার বিপক্ষে দাঁড়াচ্ছেন, যদিও জাতীয় ইতিহাস লেখার বোধটা যে ইংরেজদের দান সেই কথা স্বীকার করতে দীনেশ সেনের কুণ্ঠা নেই। 'ইংরেজেরা আমাদের একটা জিনিষ দিয়াছেন, যাহা অমূল্য—তাহা চোখের দৃষ্টি' (ভূমিকা, পৃ. [৩৩])।

এই দৃষ্টি নিয়ে ইতিহাস-রচনার ক্ষেত্রকে কীভাবে সংঘাতের ক্ষেত্র করা যায়, কীভাবে গুরুমারা চেলা হওয়া যায়, 'বৃহৎ বঙ্গ' তারই একটা প্রয়াস।

ইতিহাস-সাধনা ও ঘরের কথা

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শেষ পাদ থেকে বিংশ শতকের তৃতীয় পাদ পর্যন্ত বাংলাভাষায় ইতিহাস-সাধনার অন্যতম বিতর্ক ছিল কুলজি বিচার। শুধু আদিশূর-এর প্রামাণিকতা বা কৌলীন্যপ্রথা নয়, নানা কাহিনী, গল্প, বংশ, গোত্রকে ঘিরে অঞ্চল, জাতি বা ব্যক্তির পরম্পরাকে বাঙালির সামাজিক ইতিহাস মনে করা হত। উনিশ শতকীয় জাত-পাঁত, দলাদলি, কেচ্ছা, ইত্যাদি এই জাতীয় কুলজি ও গোষ্ঠী ইতিহাস- সংক্রান্ত বিতর্কে মদত দিয়েছে। বাংলার কৃতবিদ্য ঐতিহাসিকরা কুলজি কাহিনীর প্রামাণিকতা বিচারে নেমে পড়েছিলেন, তরুণ দীনেশচন্দ্র সরকারও বাদ যান নি। এই বিতর্কে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্বেষ সেদিন তুঙ্গে উঠেছিল[১] এই বিতর্কের চরিত্রবিচার আজও হয় নি। দীনেশচন্দ্র সেনের 'বৃহৎ বঙ্গ'-এ এই বিতর্কের ছাপ স্পষ্ট। নিজে তিনি এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন।[২] তাছাড়া তাঁর প্রকল্পকে সার্থক করতে গেলে দুর্গাচন্দ্র সান্যাল বা নগেন্দ্রনাথ বসুদের রীতির মুখোমুখি হওয়া অপরিহার্য ছিল। সেই রীতিটা কী?

কুলজি গ্রন্থের সাক্ষ্যকে জাতীয় ইতিহাসের সঙ্গে দুর্গাচন্দ্র সান্যাল মিলিয়েছেন পরম্পরা-সূত্রে।

> যেমন ভূমিতে বীজ বপন করিলে অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষ উৎপাদন করে, আবার সেই বৃক্ষ হইতে বহুসংখ্যক ফল ও বীজ উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ মনুষ্যের ঐহিক কর্ম্ম সমস্ত কর্ম্মবীজ এবং পৃথিবী কর্ম্মক্ষেত্র। দেশে কোন লোক যেরূপ কার্য্য করিয়া ধনী অথবা যশস্বী হয়, পরবর্ত্তী বংশধরেরা সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে থাকে; অতএব তাহাতেই জাতীয় চরিত্র গঠিত হয়।

কর্মফল, বংশপরম্পরার ছকে জাতীয় চরিত্র গঠিত হবে। সান্যাল মহাশয় ১৮ বৎসর পরিশ্রম করে কারিকা, ইতিহাস, কিংবদন্তি জোগাড় করেছেন; সব কিছুকে কাজে লাগিয়েছেন 'বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস' রচনায়। বাদবিচারে সান্যাল মহাশয়ের আগ্রহ কম। ' যেখানে প্রকৃত ও কাল্পনিক অংশ পৃথক্ করিতে পারি নাই, সেখানে কোন পরিবর্ত্তন না করিয়া, যেমন পাইয়াছি, ঠিক তাহাই গ্রহণ করিয়াছি।' তাতে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, কারণ সান্যাল মহাশয় ওয়াল্টার রেলীর অনুগামী। 'তিনব্যক্তির কথায়...সামঞ্জস্য' থাকে না, ফলে 'চেষ্টা করিয়া ঠিক সত্য ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করা যাইতে পারে না। এই জন্য পৃথিবীর সকল দেশের সকল ইতিহাসই অলীকতা দোষে কলঙ্কিত'। যে কাজ অসম্ভব সে কাজে চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। ইতিহাসে অলীকতা থাকবে, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসও এর ব্যতিক্রম নয়। ফলে বিচারের প্রশ্ন অবান্তর। কোনো সূত্র নির্দেশেরও প্রয়োজন নেই।[৪]

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর যুক্তিবিন্যাস কিছুটা পৃথক। নগেন্দ্রনাথ বসু রাজনৈতিক ইতিহাস ও সামাজিক ইতিহাসে পার্থক্য টেনেছেন এবং দেশজ সমাজের ইতিহাসচর্চা যে সমাজবিধিতে আবদ্ধ আছে, তাই মনে করেছেন।[৫] এই 'সমাজ' পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের 'সোসাইটি' নয়, 'সিভিল সোসাইটি' তো দূর অস্ত। এই সমাজ হচ্ছে কুল, গোত্র ও বংশের সমবায়। এই সমূহের ভিত্তি হল বংশের দোষ ও গুণ। এই সমূহের ধারক ও বাহক ছিলেন কুলজ্ঞ ও ঘটকরা। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব লেখেন,

> বঙ্গদেশের প্রকৃত রাজনৈতিক ইতিহাস অতিবিরল হইলেও, সামাজিক ইতিহাস দুষ্প্রাপ্য নহে। বাঙ্গালার প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক শ্রেণী, প্রতি পরিবার, এমন কি প্রত্যেক প্রধান ব্যক্তির সামাজিক ইতিহাস পাওয়া যাইতে পারে। কি গৌরব ও সম্মানের সমুচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ সমাজ, কি অবনত ঘৃণিত চণ্ডাল-সমাজ, সকল সমাজেরই কুলক্রমানুসারী সামাজিক পদমর্য্যাদার ইতিহাস লক্ষিত হয়।

বঙ্গের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য হল এই রকম সমাজের ইতিবৃত্ত, এই দাবি করা হয়েছে।

> যাহা পাশ্চাত্য জগতের কোন দেশে নাই, এই দীনহীন বঙ্গবাসীর তাহা আছে; বঙ্গের প্রতি জাতি, প্রতি শ্রেণী ও প্রতি সম্প্রদায়ের পরিচয় দিবার অমূল্য ধন লুক্কায়িত আছে।[৬]

এই সব কুলজি গ্রন্থ উদ্ধার ও তার ভিত্তিতে জাতীয় ইতিহাস লেখা যে এক ধরণের স্মৃতিচারণা তা নগেন্দ্রনাথ মেনে নিয়েছেন। 'অতীত সামাজিক ইতিহাসের স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করি।'[৭]

এই জাতীয় ইতিহাস খোপে কাটা, থাকে থাকে বিন্যস্ত। এই কাহিনী নানা বৃত্তের : এক বৃত্ত ভেঙে অপর বৃত্তের জন্ম হচ্ছে, প্রতিনিয়ত ভগ্নাংশের জন্ম হচ্ছে, দোষ বা অবসাদের নিরিখে তাদের নিজস্ব সমাজমর্যাদা গঠিত হচ্ছে। পটি, কাপ, মেল, থাক, সিদ্ধ, সাধ্য, পালটি — ভাগের আর শেষ নেই। অঞ্চলে অঞ্চলে জাত অনুযায়ী ভাগের রকমফের আছে, নামও বদলে যায়। এই ভাঙনের ইতিহাস, এক ক্ষুদ্র বৃত্ত ভেঙে আরেক ক্ষুদ্রতর বৃত্তের ইতিবৃত্ত, কুলজিতে ধরা পড়েছে। শেষ পর্যন্ত নগেন্দ্রনাথও লিখেছেন,

> 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস', এই স্পর্দ্ধাজনক নাম ব্যবহার করিয়াও আমি ভাল করি নাই। 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের সূচীপত্র' এই নাম দিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইত। কারণ প্রত্যেক সমাজের বিস্তারিত বিবরণ লিখিতে হইলে এরূপ বহু খণ্ড পুস্তক লিখিতে হয়। আমি যত সংক্ষেপে পারিয়াছি, প্রত্যেক সমাজের বিষয় লিখিয়াছি।[৮]

এবং বাংলা ভূমিকাতে 'জাতিমালা' ও কুলপঞ্জি নিয়ে নগেন্দ্রনাথ বসু বাঙালির ইতিহাসচর্চার পক্ষে যতই সওয়াল করুন না কেন, আখ্যাপত্রে ইংরেজিতে লেখেন, ' The Castes and Sects of Bengal' । আর সান্যাল মহাশয়ের সামাজিক ইতিহাসও পর্যবসিত হয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের ইতিবৃত্তে, একটি জেলার গল্পে এবং শেষ পর্যন্ত একটি মাত্র জমিদার বাড়ির কাহিনীতে ।

এই জাতীয় বিভাজন— বার বার ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতরে যাবার প্রমাণ-পঞ্জি দীনেশচন্দ্র সেনের পরিকল্পনার সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খায় না। রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের মধ্যে যে বাঙালি জাতিগঠনের পরিচয় লভ্য নয়, এই বিষয়ে তিনি একমত (ভূমিকা, পৃ. [৯])। সব কল্পনার মধ্যে সত্য থাকে, তাই কোনো কিছু বাদ দেওয়া ঠিক নয় (পৃ. ২৬২-৬৩)— এই কথা তিনিও মনে করেন। কৌলীন্যপ্রথার গল্পগুলি সরাসরি সান্যাল মহাশয়ের রচনা থেকেই নেওয়া (পৃ. ৪৮৪-৮৯)। তবুও সেইগুলি ভগ্নাংশের প্রতীক, কীভাবে ভগ্নাংশগুলো জোড় খাবে তৈরি হবে বৃহৎ বঙ্গ?

ঘরের কথা, দেশের কথা

ভগ্নাংশের মধ্যে একীকরণ করতে হবে, বৃত্তগুলিকে স্বীকার করে নানা স্পর্শক ও প্রতিচ্ছেদের সন্ধান করা আবশ্যক। ফলে, বৃহতের সবকিছুর সঙ্গে ক্ষুদ্রের নানা স্পর্শক খোঁজা হয়েছে। বিজয়ের লঙ্কাবিজয় কিংবদন্তির দ্বারা শুধু সমর্থিত হয় নি। বরং সিংহলী শব্দের সঙ্গে বাংলা শব্দের তুলনামূলক তালিকা দিয়ে যোগাযোগ নিষ্পন্ন করা হয়েছে (পৃ. ৬৫-৬৮)। মৌর্য ও গুপ্ত যুগের আলোচনার পরে জানা গেল, রাখালদাস মহেঞ্জোদড়ো আবিষ্কার করেছেন। ফলে সঙ্গে সঙ্গে বোঝা গেল 'আশ্চর্য্যের বিষয় বাঙ্গলা দেশের আলিপনা ও কাঁথার পদ্মের সঙ্গে মহেঞ্জোদারোর পদ্মগুলির বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এই স্থানের একটি লোকের আকৃতি পর পৃষ্ঠায় দিতেছি, আমরা বীরভূমির কাছে ক্ষোদিত প্রাচীন একটি মূর্ত্তি দেখিয়াছি, তাহা অনেকটা এইরকমের' (পৃ. ২৪১)। ভাবময় সাদৃশ্য, 'অনেকটা' আদল; সদ্য জানা একটি ঐতিহ্যের মধ্যে বৃহৎ বঙ্গকে প্রোথিত করা হল। এই রীতি বার বার দীনেশচন্দ্র অনুসরণ করেছেন। বৃহৎ বঙ্গের আলোচনায় সবাই এসেছেন : বুদ্ধ, অশোক, চন্দ্রগুপ্ত; যেন দ্বিজুবাবুর গান। ভূমিকার বিশাল অংশ জুড়ে তিনি আর্যসভ্যতার নানা ধারাকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, 'বঙ্গপল্লীতে আর্য্যসভ্যতার শেষ রেণু-কণা আমরা যে পরিমাণে কুড়াইয়া পাইয়াছি, আর্য্যাবর্ত্তের অন্যত্র তাহা সুলভ নহে' (ভূমিকা, পৃ.[১৩])। কাঁথা আর মেঠাই, মাদুর বা পাটি, বিছানা

বাঁধবার দড়ি, পুঁতির লাঠিতে এর ছাপ আছে, দেখার চোখ থাকলে, কল্পনার দৌড় থাকলে চেনা যাবে, জোর দিয়ে বলা যাবে 'বাঙ্গলাদেশই মগধের প্রধান চিত্রশালা ছিল।'

কিন্তু আধার কী? জড় বস্তু নয় বরং বাঙালির মনের গড়ন। 'বহৎ বঙ্গ'-এ বাঙালির মনের গড়নের পরিচয় সূত্রে রসসঞ্চার হয়েছে; সেইসব ক্ষেত্রে দীনেশবাবুর অবলম্বন পল্লী কাহিনী ও গীত, সাধারণ ঘর ও গৃহস্থালির কথা। জাত, কুল, গোষ্ঠীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিন্যাসকে ছাপিয়ে পল্লীকথা, ঘর ও গৃহস্থালির উপকরণই প্রাধান্য পায় 'বৃহৎ বঙ্গ'-এর বিন্যাসে। ফলে জাতি, দেশ ও ঘর মেলবার চেষ্টা করেছে এক বিন্দুতে। দীনেশচন্দ্র সেনের মুন্সিয়ানা এখানে। আর্যাবর্ত ধরা পড়ে বাংলার পল্লীতে, তার অজস্র সম্ভারে।

দীনেশচন্দ্র এর মধ্যে খুঁজে বার করেন বাঙালি চরিত্রকে; মিশেল হয় কল্পনার, অভিজ্ঞতার, কিংবদন্তির। জয়দেব প্রসঙ্গে দীনেশবাবু বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সেখানে জানিয়েছেন, 'যে লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় জয়দেব একজন সভাকবি ছিলেন আমার পক্ষে সেই লক্ষ্মণসেনের সিংহাসন অপেক্ষাও বড় সিংহাসনের দাবী—সেই নিভৃত কেন্দুলি পল্লীর জয়দেবের' (পৃ. ৪৯৯) এই বলে তিনি 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' পদটির প্রচলিত কাহিনী ব্যবহার করেছেন; বলেছেন, এই কাহিনীর মধ্যে 'বঙ্গীয় ধর্ম্ম-প্রতিভার বৈশিষ্ট্যের'(পৃ. ৫০২) একটা মস্ত বড়ো ইঙ্গিত আছে। ঈশ্বর বাঙালির কাছে আসেন সখা রূপে, প্রণয়ী রূপে; তিনি হয়ে ওঠেন বাঙালির পরিবারের, তার হৃদয়ের, আপনজন। এই প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র পেশ করেন তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার বিবরণ : 'এমন সকল বাড়ী জানি যেখানে পরম বৈষ্ণব গৃহ-কর্ত্তার মৃত্যু হইলে সেই গৃহের দেবতাকে কাছা পরিয়া সন্তানের মত পিণ্ড দিতে হয়, যেহেতু মৃত গৃহ-স্বামীর উপাস্য ছিলেন বাল-গোপাল।' তারপর এই অনুচ্ছেদে ভাষার লাবণ্য আমাদের নজর কাড়ে :

> বঙ্গের মাতার নিকট দেবতা শিশু, তাঁহার পৃষ্ঠে বঙ্গ-জননীর কোমলচড়ের দাগ এবং তাঁহার হাতে বঙ্গ-জননীর দড়ি-বাঁধার চিহ্ন। বঙ্গের সখা দেবতার কাঁধে চড়েন, ফলটি খাইয়া যখন দেখেন উহা সুস্বাদু, তখন সেই উচ্ছিষ্ট ফলটি দেবতার মুখে তুলিয়া দেন।.... বাঙ্গালী তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইবে না, কুঞ্জতরুমূলে বসাইয়া বনফুলের মালা গলায় দিয়া নয়নজলে অভিষিক্ত না করিলে সে দেবতা যে পাথর ও মাটির বিগ্রহ হইয়া থাকিবে। বাঙ্গলার ঠাকুর বাঙ্গালীর জোড় হাতের প্রণাম চান না, তাহার হৃদয়ের উপর ঠাকুরের লুব্ধ দৃষ্টি (পৃ. ৫০২)।

কিংবদন্তি ও নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে ফাঁক আছে, সমস্তরে তারা স্থিত নয়। অথচ বাংলার জাতীয় ইতিহাসের দুই বিন্দুর মধ্যে রেখা টানতে গিয়ে আবেগময় ভাষা দিয়ে সেই ফাঁক বুজিয়ে দেওয়া হয়। ফলে যে-ছবি ফুটে ওঠে তাতে জয়দেবের মতো সভাকবিও হয়ে ওঠেন কেন্দুলির পল্লীকবি; আর দেবতা ধরা দেন ঘরোয়া সম্বন্ধবন্ধনে।

'বৃহৎ বঙ্গ'-এর পাতায় পাতায় পল্লীগ্রাম অভিনন্দিত। 'পল্লী স্বীয় ভাব বজায় রাখিয়াছে' (পৃ. ৬৬৬)। 'এই পল্লীলক্ষ্মী বিদ্যা-ধর্ম্ম-জ্ঞান-প্রদায়িনী; এখানে চৈতন্য জন্মিয়াছিলেন এবং এই পাঠান আমলেই কত ভক্ত, কত তান্ত্রিক, কত নৈয়ায়িক, কত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত জন্মিয়াছিলেন' (পৃ. ৬৬৭)। যেখানে সেখানে এইরকম উক্তির ছড়াছড়ি। 'বৃহৎ বঙ্গ'-এর লেখক বাঙালি সভ্যতা ও বাঙলা ভাষার আদি রূপ খুঁজে পান এই পল্লীর উপকথায় আর গাথায়; প্রেমের বলিষ্ঠতার নিদর্শন দেখেন পল্লীগীতিতে। তাঁর চোখে ধরা পড়ে আদি ও দেশজ শিল্পরূপ সহজ সুষমায় অভিব্যক্ত হয়েছে বাঙলার নকশি কাঁথায়, গয়নাবড়িতে, নানান ধরণের নৌকার কারুকৃতিতে। যা আদি, যা অকৃত্রিম, তার মূলাধার হচ্ছে পল্লীসমাজ—এই যে প্রত্যয়, এ তো জাতীয়তাবাদেরই বিশিষ্ট লক্ষণ। এই আদি-অকৃত্রিমকে কেন চাই? উৎসের খোঁজের জন্যে। সেই উৎসকে চিনলে, টের পাব : আমরা কত দূরে সরে এসেছি। বুঝব : কোথায় ফিরতে হবে। দৃষ্টির কেন্দ্রে পল্লীকে স্থাপন করলে আমাদের বোধে আসবে যে মুসলিম শাসন বা ইংরেজ শাসন শুধুই উপরিতলের হেরফের; গভীরতর স্তরে মূল বা

শিকড় অক্ষত আছে, কেবল খুঁজে বার করবার অপেক্ষা। 'বৃহৎ বঙ্গ'-এর সর্বত্র এই অন্বেষণের আহ্বান, এই সন্ধানের প্রচেষ্টা আছে। এই পথ ধরেই এসেছে হাজারো নিম্নকোটির মানুষ, কারিগর ও শিল্পী, কালুডোম ও কাঞ্চনমালা। 'ইহারা আমাদের জাতির নিজস্ব ভাব বজায় রাখিয়াছে'(পৃ.৮৯৫)। আবার একালের ও সেকালের বগলা দেবী, নগেন্দ্রবালাদেবী আর সেনহাটির কমলার মাও উপচার সাজাতে বাদ পড়েন নি। বঙ্গপল্লী প্রসারিত হলে হয় বৃহৎ বঙ্গ বা হিন্দু ভারতবর্ষ। পল্লীর রূপান্তর হয় নানাভাবে, নানা ধরণের গ্রামসমাজে। জাতীয়তাবাদী ধারণায় পল্লীর অবস্থিতি যতটা ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক ঠিক ততটা মানসিক বা তাত্ত্বিক।

জাতীয় ইতিহাস, স্মৃতি বা অনুভূতি পল্লীকে ঘিরে কীভাবে আবর্তিত হয়, তার নানা বিশ্লেষণ রয়েছে। কিন্তু বার বার জাতির কথা এসেছে ঘরের কাহিনীতে, গৃহস্থালীর বর্ণনায়। দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, শ্রেষ্ঠ বাঙালি শ্রীচৈতন্য। তাঁর 'মহাভাব'কে তিনি নানা রসের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, সেগুলো মানবিক সম্পর্ক, 'পার্থিব মোড়কে আঁটা স্বর্গের চিঠি।' এই পার্থিব মোড়ক কী? মানুষের পারিবারিক সম্বন্ধ। 'বৈষ্ণব সন্ন্যাসী গৃহী না হইয়াও গৃহী, কারণ গার্হস্থ্য জীবনের শিক্ষা দিয়া তিনি তাঁহার উদ্দিষ্ট দেবতার পূজোপকরণ প্রস্তুত করিয়াছেন' (পৃ. ৬৯০)। শৈব ধর্ম সম্পর্কেও এক কথা। 'রামায়ণ এই গার্হস্থ্য ধর্মের বীজ বপন করিয়াছিল, কিন্তু শৈব-ধর্ম্ম সেই বীজ অঙ্কুরিত ও অধ্যাত্মমহিমমণ্ডিত করিয়া দেখাইল' (পৃ. ৫৭৫)। গাথার আলোচনায় লেখেন 'এই সকল চিত্র বাঙ্গালী ঘরের অন্তঃপুরের বাঙ্গালী হৃদয়ের চিত্র' (পৃ. ৫৭৫)। শিল্প ও স্থাপত্যের বিবরণে লেখেন 'আমার এই পুস্তকে আমি হিন্দুর আমলে গৃহস্থের বাড়ীঘরের কথা লিখিলাম' (পৃ. ৫৬৭)। তারপরে অবধারিত উক্তি,

> বাঙ্গালী গৃহিণীর হাতে রান্নার সে উন্নতি হইয়াছিল তাহাও অতীব প্রশংসনীয়, রন্ধনবিদ্যায় ইঁহাদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কৃতিত্ব ছিল। আমরা সন্দেশের কথা বলিয়াছি। এই সমস্ত গৃহস্থালীর মধ্যে বাঙ্গালী মেয়েদের স্নেহ, প্রেম ও ভক্তির অন্তর্নিহিত প্রবাহ টের পাওয়া যায়। .... এই সকল রান্না দস্তুরমত কলা-বিদ্যার অন্তর্গত ছিল, গৃহলক্ষ্মীদের ভালবাসার গুণে তাঁহাদের করপদ্ম হইতে ইহাদের উদ্ভব

রসনার সংস্কৃতির সঙ্গে ঘর-গেরস্থালীর সঙ্গে জাতীয় ভাব জড়িত,

> দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের সহরগুলির অলিগলিতে সাহেবদের দেখাদেখি আমরা রেস্তোরাঁ খুলিতেছি, তাহাদের একটির মধ্যেও দেশী রান্নার কিছুই পাওয়া যায় না। ... এমনকি কলিকাতা সহরে বাঙ্গালীর বড় বড় রেস্তোরাঁতে একখানি ভীমনাগের সন্দেশ বা একটি ডাব পর্য্যন্ত রাখিবার ব্যবস্থা নাই (প্রাগুক্ত)।

দেশ, মৌলিকত্ব, অকৃত্রিমতা—সব— রক্ষিত হয়েছে পল্লীতে, ঘরের মধ্যে, রমণীর দ্বারা। এই সূত্র 'বৃহৎ বঙ্গ'কে ধরে রেখেছে। যুগ যুগ ধরে একেই ঘিরে আবর্তিত হয়েছে সংস্কৃতি। এখানে জয় প্রকৃত জয়; এখানে হার মর্ম্মস্পর্শী।

উদাহরণ ও উপমা বাড়িয়ে আর লাভ নেই। কিন্তু বার বার কেন আসছে ঘরের কথা? জাতির চরিত্র ও সংস্কৃতি, ধর্ম- আন্দোলন কেন বোঝা হচ্ছে গৃহস্থালীর অনুষঙ্গে, আত্মীয় সম্পর্কের সূত্রে, জ্ঞাতি বা প্রতিবেশীর উপমায়, এমনকি রান্নাঘরের পরিধিতে? দীনেশবাবুর মতে বাঙালির এই পরিধি স্বভাবজ, অণুর মধ্যে অসীমকে প্রত্যক্ষণ (ভূমিকা, পৃ. | ১৭ |)। কিন্তু রচনার বাঁধুনিতে বোঝা যায় যে বয়ানে এই রকম বিন্যাস বিশেষ অর্থে সিদ্ধ; এই বিন্যাস বহসকে কতকগুলি বিশেষ দিকে মোড় দিয়েছে। প্রথমত, এই গৃহস্থালীর ধারণার মধ্য দিয়ে কতকগুলি বিরোধকে প্রশমিত করা যায়, অন্তত তার চেষ্টা করা যেতে পারে; হয়তো বা সেইভাবে নানা সময় ও নানা বিভাজনের সাযুজ্য আনা সম্ভব। দীনেশবাবু দ্বন্দ্ব ও বিরোধ সম্পর্কে সচেতন। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ, শাক্ত ও বৈষ্ণব-এর বিরোধ এবং সবাইকে ছাপিয়ে নব ব্রাহ্মণ্য কীভাবে নিম্নকোটির সংস্কৃতিকে দাবিয়ে রাখল (পৃ. ৩৮৫-৮৬), এই সবকিছুর বিশদ বিবরণ দীনেশবাবু লিখেছেন।[৯] ত্রিশের দশকে জাতির ইতিহাস, জাতীয়

ঐক্য কতদূর সফল হবে, অতীতের দায় বর্তমান রাজনীতিতে কীভাবে সক্রিয়, এইরকম সন্দেহ থেকে দীনেশবাবু মুক্ত নন। তিনি সাবধানী গৃহস্থ আবার তদানীন্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রক গোষ্ঠীর সদস্য। সেই 'রাজনৈতিক ঘনঘটা'র যুগে 'সত্য কথা এখন নিরাপদ নহে', এই বিষয়ে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। পলাশির যুদ্ধ (১৭৫৭) অবধি তাঁর আখ্যানের সময়সীমা। অথচ লেখার ফাঁকে ফাঁকে বর্তমান ঢুকে পড়ে, যেমন: 'রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে বলসেভিক্ এবং অধ্যাত্মজগতে সহজিয়া— ইঁহারা প্রাচীন সংস্কার সমস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন' (পৃ. ৭৭৮)। আবার আক্ষেপ করেছেন 'আজ যদি হিন্দুর প্রাণে বিন্দুমাত্র ন্যায়-অন্যায় বোধ থাকিত, কৃতজ্ঞতার লেশ থাকিত, তবে কি পূর্ব্ববঙ্গে শত সহস্র লোক মুসলমান হইয়া এদেশের সাম্প্রদায়িক প্রশ্নকে এত জটিল করিয়া ফেলিতে পারিত' (পৃ. ৫২২)? হাজারো চেষ্টা সত্ত্বেও বাঙালির জাতীয়তাবোধ জাগানো সম্পর্কে তাঁর সন্দেহ ঘোচবার নয়।

> দেখা যাইতেছে বাঙ্গালী তখনও একজাতি হইয়া গড়িয়া উঠে নাই,— এখনও বোধ হয় তাহা হয় নাই। আমাদের কবিরা সাতকোটি লোককে বৃথাই 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক' বলিয়া আহ্বান করিতেছেন, উহা শুধু একটা কবিত্বের উচ্ছ্বাস মাত্র। (পৃ. ১৫)

ফলত, এই ভেদ, বিভাজনগুলি বোঝা যাবে যদি আমরা সাম্প্রদায়িকতা বা প্রাদেশিকতাকে জ্ঞাতিবিরোধ বলি, ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতিকে একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করি; কারণ উৎস তো এক। জ্ঞাতিবিরোধ ও ভ্রাতৃবিরোধ পরিবারের শক্তি ক্ষয় করে, সেইরকমই 'আপনার লোকদিগকে পর করিয়া দিয়া জাতীয় শক্তির কতটা হানি করিতেছি, তাহা বুঝিবার সময় আসিয়াছে' (ভূমিকা, পৃ. | ৪৮ |)। পারিবারিক সত্তা ও তদ্‌জনিত সমস্যার উপমায় জাতীয় সমস্যার মর্ম বোঝাবার চেষ্টা করলে মানসিক দিক দিয়ে বোঝাপড়া সহজ হয়ে ওঠে; দৈনন্দিনতার মাত্রায় বিরোধ ধরা পড়ে, নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে তার সমাধান লভ্য বলে মনে হয়।

তবে পরিবার ও গৃহস্থের উপস্থাপনার প্রকৃত জোর অন্যত্র। তা হল: রাষ্ট্রিক ইতিহাসের প্রতিসরণ। জাতীয় ইতিহাসের একটি ছক রাষ্ট্রভিত্তিক হতে পারে, রাষ্ট্রকে ঘিরে জাতীয় সত্তার উচ্চতম প্রকাশ হয়। নেহরুর ভারত-আবিষ্কারে বা হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর ও যদুনাথ সরকারের অসাধারণ গবেষণায় এই চেতনা পরিস্ফুট। তাঁদের আলোচনায় বার বার ইয়োরোপের উপমা আসে: সমুদ্রগুপ্ত হয়ে ওঠেন 'ভারতের নেপোলিয়ন'। দীনেশবাবু এই ইতিহাসের আওতার বাইরে এক পা বাড়াতে আগ্রহী। রাষ্ট্রীয় ইতিহাস তাঁর কাছে একেবারে মূল্যহীন নয়। কিন্তু জাতীয় মানস-গঠনের মূলসূত্র তিনি রাষ্ট্রগঠনের মধ্যে খোঁজেন নি; তাঁর মতে, ইতিবৃত্তের মূল্যায়নে, বিশেষত বাঙালি জাতির ইতিকথার বিচারে, রাজবৃত্তের স্থান অপেক্ষাকৃত পেছনের সারিতে। যেমন,

> সামাজিক, নৈতিক, শিল্প ও ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ক্রম-বিকশিত সভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে রাজনৈতিক ইতিহাসের একটা সম্বন্ধ আছে, কিন্তু সেই সম্বন্ধ সকল সময়েই খুব গুরুতর হয় না। (ভূমিকা পৃ.৯)...
> পদ্মার ভাঙ্গুনী পাড়ের মত, এ দেশের রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রের কোনই নিশ্চয়তা নাই।' (পৃ. ১৬)
> ....আমার এই ইতিহাস শুধু রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নহে। আমার নিকট মগধের মৌর্য্য অশোক যেমন, তদপেক্ষা বড় নবদ্বীপের চৈতন্য; সিংহলবিজয়ী বঙ্গের বিজয় আমার নিকট যেরূপ, অর্দ্ধ এশিয়াবিজয়ী দীপঙ্কর তেমনি বা তদধিক বড় (পৃ ৪৯৯)।

রাষ্ট্রিক কাঠামোয় বিন্যস্ত জাতীয় ইতিহাস যাঁর বেপসন্দ, তাঁর এইরকম অবস্থায় অন্য কোনো ভরকেন্দ্র তো দরকার। ঠিক সেই জায়গা জুড়ে বসছে পল্লী, পরিবার, গৃহস্থ। বাঙালির মানসগঠনে একদিকে ভক্তির বন্যা, অন্যদিকে যুক্তির বাগুরা— চৈতন্য বনাম রঘুনাথ শিরোমণি। 'এ যেন ঘড়ির পেণ্ডুলম্ দুলিতেছে' (পৃ.৭৮১)। পেণ্ডুলামের দোলন পরিবারে সমতা লাভ করে। গৃহকর্তা দাতা কর্ণ হয়ে অতিথির উৎকট দাবি মেনে নেন, গৃহকর্ত্রী পুত্রের মাংস রান্না করেন, তা না হলে গৃহস্থের ধর্ম পালিত হবে না। 'বৃহৎ বঙ্গ'- এ বার বার দাতা কর্ণের পালা বাঙালি জাতির চরিত্র-নির্দেশক হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে, সব অবাস্তবতা,

উৎকটতা অতিথির প্রতি গৃহস্থের কর্তব্যের গণ্ডিতে বিধৃত হয়েছে (ভূমিকা, পৃ [১৫] ,৭৮০)।

অথচ যে কোনো পরিচয়ের বৃত্ত থাকে সীমা থাকে। পরিবারের সীমাবদ্ধতা নিয়ে দীনেশবাবু যে একেবারে অচেতন ছিলেন, তা নয়। হাজার পৃষ্ঠার লেখার মধ্যে তিনি নিদেনপক্ষে একবার মন্তব্য করেছেন,

> কিন্তু আমাদের ঘরোয়া বিবাদ, বাঙ্গলার সীমা পার হওয়ার কথায় আতঙ্ক, এবং জগৎটাকে বাদ দিয়া অঋণী, অপ্রবাসী হইয়া গৃহসুখ আস্বাদনের হেয় লিপ্সা জাতীয় দুর্গতির কারণ হইয়াছিল (পৃ.৪৬৯)।

জাতি ও ভগ্নাংশের বিরোধ একটি স্তরে স্পষ্টত মেনে নেওয়া হয়েছে।

এতৎসত্ত্বেও রাষ্ট্রকে একক হিসেবে বেছে নেবার অসুবিধা বিস্তর। রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট কাঠামো চাই, সীমাবদ্ধ এলাকা চাই, রাজবৃত্তের ধারাবাহিকতা চাই। মুসলমান অধিকারের সময় থেকে এইসব একেবারে ওলট পালট হয়ে গেছে।

অন্যদিকে, পরিবার বিকেন্দ্রিত; লতায় পাতায় সম্পর্ক করা যায়; সই, কুটুম্বিতে বা প্রতিবেশীর বন্ধনে আনা যায় কত বিচিত্র মানুষকে, কত ভিন্ন লোককে। আবার পরিবারের মূল বন্ধন আঁটোসাটো; কুলীন, বামুন ও স্মার্ত পণ্ডিতরা সেই গণ্ডি পাহারা দিচ্ছে। পাঠানরা এইসব সূত্রে 'বঙ্গবীর' হয়েছে; ইশা খাঁর সঙ্গে কেদার রায়ের মেয়ের পরিণয় মস্ত বড় ঘটনা; ফুলজানির রূপে তো নবাব পাগল। এই ধরণের নানা গল্প দীনেশবাবু বলেছেন, 'যবন দোষে' সমাজ ও পরিবার যেরকম ব্যতিব্যস্ত ঠিক তেমনি প্রেম, পরিণয় ও আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে পাঠান বীররা বাংলার সমাজে জায়গা করে নিচ্ছে, ঘরের জামাই হচ্ছে। পরিবারের স্থিতিস্থাপকতা, আবার মূলনিষ্ঠ থাকার প্রবণতা— জাতীয় ইতিহাসের সূত্র হিসেবে কাজ করেছে। জাতি ও ধর্ম বিরোধ ঢাকা পড়েছে কল্পনা, আবেগ ও উচ্ছ্বাসে। যা ভগ্নাংশ, যা প্রাদেশিক, যা খণ্ড, তা-ই হয়ে উঠেছে বৃহৎ, জাতীয় আর পূর্ণ। স্থান ও কাল বুঝে হয়েছে সঙ্কোচন ও প্রসারণ; স্বদেশপ্রেমের ভিত্তি প্রোথিত হয়েছে গার্হস্থ্য ধর্মে— অবশ্যই হিন্দুমতে। মধ্যযুগের অবসানে 'বৃহৎ বঙ্গ' শেষ হয়েছে, 'আধুনিক যুগে' দীনেশবাবু আর ঢোকেন নি। যে-ইতিহাস নাগরিক তৈরি করে, সেই ইতিহাস 'বৃহৎ বঙ্গ'-এর উপজীব্য নয়; সেই ইতিহাসকে, সময় বুঝলে, এড়িয়ে যাওয়া; সুযোগ বুঝলে, নড়বড়ে করা; থামিয়ে দেওয়া, খোঁচা লাগান, এর সব কিছু দীনেশচন্দ্র তাঁর গ্রন্থে করেছেন। এখানেই দীনেশবাবুর স্বদেশিয়ানা, আর 'বৃহৎ বঙ্গ' বইটির মৌলিকত্ব।

টীকা

1. বিশ্বপতি চৌধুরী,'কাছের মানুষ দীনেশচন্দ্র', সুবর্ণলেখা, আশুতোষ ভট্টাচার্য ও অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪, পৃ. ৩৩০।
2. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বঙ্গীয় কুলশাস্ত্র, কলকাতা, ১৯৮৯।
3. দীনেশচন্দ্র সেন, ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য, ১৩২৯, জিজ্ঞাসা সংস্করণ, ১৯৬৯, পৃ. ১৮৮-১৯০।
4. দুর্গাচন্দ্র সান্যাল- সংগৃহীত, বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস, কলকাতা, ১৩১৫। বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।
5. নবম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন, যশোর ইতিহাস শাখার সভাপতি, নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্বোধন, ৮ বৈশাখ ১৩২৩।
6. নগেন্দ্রনাথ বসু, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, প্রথম ভাগ, (ব্রাহ্মণ কাণ্ড), প্রথমাংশ, [দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩১৮ বঙ্গাব্দ], ভূমিকা, পৃ. [২], [৩]।
7. নগেন্দ্রনাথ বসু, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-বিবরণ), ব্রাহ্মণ-কাণ্ডের দ্বিতীয়াংশ, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ ভূমিকা, পৃ.৩।

৮. নগেন্দ্রনাথ বসু, পূর্বোল্লিখিত, প্রথম ভাগ, (ব্রাহ্মণ কাণ্ড), প্রথমাংশ, ভূমিকা, পৃ. ৪।

৯. জনসভায় দীনেশবাবুর হেনস্তার বিবরণ, দ্রষ্টবা, জনার্দন চক্রবর্তী, স্মৃতিভারে, কলকাতা, ১৩৭১, পৃ. ১০৫-১০৬।

'বৃহৎবঙ্গ' থেকে উদ্ধৃত অংশগুলির নির্দেশাঙ্ক বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হয়েছে।

দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ [সুপ্রাচীন কাল হইতে পলাশীর যুদ্ধ পর্যান্ত], প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ১৩৪১, পুনর্মুদ্রণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মাঘ ১৩৯৯। মূল্য ৪০০ টাকা (দুখণ্ড একত্র)।

গৌতম ভদ্র

পত্রিকায় রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ

১৯২২-এর ১৩ মার্চ আনন্দবাজার পত্রিকার প্রকাশ। তখন থেকে আজ পর্যন্ত এই বাহাত্তর বছর এর প্রকাশ অব্যাহত ভাবে চলে এসেছে। তার মধ্যে ৭ আগস্ট ১৯৪১-এ রবীন্দ্রনাথের দেহান্তর। ১৯২২ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত এই উনিশ বছরে রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীর সংবাদ আনন্দবাজারে বেশ অনেকখানি জুড়ে আছে। কোনো সংকলন-গ্রন্থে সেই সংবাদগুলি একত্র সংগ্রহ করে প্রকাশ করতে পারলে রবীন্দ্রানুসন্ধিৎসু পাঠককে সেসব সংবাদ বা তথ্যের প্রয়োজনে পুরোনো কাগজ তন্ন তন্ন করে পড়বার ক্লেশ স্বীকার করতে হয় না। এতে পাঠকদের, বিশেষত গবেষকদের, যে কতখানি সাহায্য হয়, তা বলে বোঝাবার দরকার নেই। সম্প্রতি সে-রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের সম্পাদনা করেছেন চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশিত হয়েছে এর প্রথম খণ্ডটি। আশা করা যায় ২১ মার্চ ১৯৩২-এর খবরে এই খণ্ড সম্পূর্ণ হবার পর রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ পর্যন্ত আনন্দবাজারে প্রকাশিত সব সংবাদ নিয়ে পরবর্তী খণ্ড অচিরেই প্রকাশিত হবে।

পাঠকদের বিশেষ সুবিধা হয়েছে সংকলিত সংবাদগুলির শ্রেণীবিভাগে। সম্পাদক এদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন— জন্মোৎসব; বিশ্বভারতী; সংগীত, অভিনয় ও চলচ্চিত্র [সূচিপত্রে এ-টি লুপ্ত]; চিত্রকলা; ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব; দেশ সমাজ সরকার; সভা-সমিতি; শ্রদ্ধাঞ্জলি; গ্রন্থপরিচিতি; ভ্রমণ-দেশে; ভ্রমণ-বিদেশে; এবং বিবিধ প্রসঙ্গ।

এই কয়েকটি ভাগের সংকলিত সংবাদের টীকা বর্জাইস অক্ষরে মুদ্রিত ৬১ পৃষ্ঠা, তার সংখ্যা ৭২৬।

এই ভাগ এবং টীকা থেকে পাঠক রবীন্দ্র-জীবনের ব্যাপ্তি, বৈচিত্র্য এবং সমাজে ও সভ্যতায় তার প্রভাব সম্পর্কেও একটা ধারণা করতে পারবেন। এই ব্যাপ্তি বৈচিত্র্য মানুষের ইতিহাসে কজনের ক্ষেত্রে আমরা দেখি?

রবীন্দ্রজীবন নিয়ে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁরা জানেন কবির জীবনের প্রথম দিকে তথ্য কত বিরল ছিল। নানা স্মৃতিকথাই ছিল মুখ্য অবলম্বন। ভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন বাংলার অগ্রণী এক ধনী পরিবারে, যাকে কেন্দ্র করে বাংলার সংস্কৃতির নবজাগরণ সম্পূর্ণ হয়েছে। তার ফলে স্মৃতিকথা ছাড়াও নানা দলিল ও ইতিহাসগ্রন্থে এই বংশের বিবরণ পাওয়া যায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র বলে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ মেলে নানা সূত্রে। সংবাদপত্রে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় *Indian Daily News* নামে দৈনিক পত্রিকায় (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫)। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রথম সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ বলে বাক্যটি উদ্ধৃত করছি—

Baboo Robindra Nath Tagore, the youngest son of Baboo Debendra Nath Tagore, a handsome lad of some 15, had composed a Bengali poem on Bharat (India) which he delivered from memory : the suavity of his tone much pleased his audience.

একই খবর একই ভাষায় বেরিয়েছিল 'দি বেঙ্গলি' পত্রিকায় ২০ ফেব্রুয়ারি। তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথ সংবাদপত্রে খবর হিসাবে দেখা দিচ্ছেন। গবেষকরা নানা পত্রিকায়, নানা কার্যবিবরণীতে, নানা লোকের স্মৃতিকথায়, ঠাকুরবাড়ির জমিদারি দলিলে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ বিক্ষিপ্ত ভাবে উপকরণ হিসাবে পেয়েছেন। তার পর যুক্তিসংগত ভাবে তার ব্যবহার করে জীবনচিত্র রচনা করেছেন। তাতে রবীন্দ্রনাথের জীবন সম্বন্ধে মোটামুটি একটা পরিষ্কার ধারণা তৈরি হয়ে উঠেছে। কিন্তু আকর হিসাবে এ সবই অস্পষ্ট এবং অতৃপ্তিকর। রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি যতই বৃদ্ধি পেতে লাগল, তাঁর সম্বন্ধে সংবাদসূত্রও তৈরি হয়ে উঠল। বস্তুত উনিশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি মাসিক সাময়িক পত্রের সীমাতেই বদ্ধ ছিল। আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হিসাবেও তাঁর একটা পরিচিতি সমাজের মুখপত্রে ছিল। ওই দশকে তিনি গল্প লিখেও

অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই রবীন্দ্রনাথের আর-একটা মূর্তি আমাদের মধ্যে মুদ্রিত হয়ে গেল। প্রাদেশিক সম্মেলন, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ইত্যাদি সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় তাঁর সংবাদও কাগজে প্রকাশ পেতে থাকে। কিন্তু কাগজে প্রকাশিত এরকম সংবাদ তখনও অপ্রচুর। দ্বিতীয়ত তখনও এসব সংবাদ যে রক্ষা করে রাখা দরকার সে কথা মনে হয় নি। তখন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপিত হয়েছে সত্য কিন্তু তার কোনো মুখপত্র ছিল না। দৈনিক পত্রে রবীন্দ্রনাথের সংবাদ তেমন জাতীয় গুরুত্ব পায় নি। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেঙ্গলি'র রাজনৈতিক সংবাদ প্রকাশের সূত্রে কখনও কখনও রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ এসেছে। শুধু রবীন্দ্রনাথের সংবাদের জন্যই কোনো সংবাদ পরিবেশন করে নি।

রবীন্দ্রনাথ সংবাদপত্রে গুরুত্ব পেতে থাকেন নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর। বিদেশে যখন গিয়েছেন তখন তাঁর সংবাদ কিছু কিছু বের হতে থাকে । এ দেশের কাগজেও তাঁর সংবাদ প্রকাশ পেতে লাগল। ১৯১৩র পর থেকে এসব সংবাদ তাঁর জীবনীর উপকরণ হিসাবে যথাসম্ভব রক্ষা করা হয়েছে। বিদেশের কাগজের বেশ-কিছু কর্তিকা শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালায় আছে। সব ভাষার সংবাদই যে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তা নয়।

কবিতার জন্য নোবেল পুরস্কার পেলেও রবীন্দ্রনাথের পরিচিতি প্রতিষ্ঠিত হল দার্শনিক এবং বিশ্বভাবুক হিসাবে। তিনি বিভিন্ন দেশে যেসব বক্তৃতা দিয়েছেন সেগুলি সব সময় সাহিত্য-বিষয়ক নয়— মানবমৈত্রী, শান্তি, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সভ্যতার মর্ম ইত্যাদি বিষয়ে। এসব বিষয় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত ও প্রচারিত হয়েছে। আমাদের দেশেও রবীন্দ্রনাথের কবিপরিচয় মুখ্য হলেও রবীন্দ্রনাথকে দেশের লোক ত্রিকালদর্শী ঋষি বলেই জেনেছে। দেশের রাজনৈতিক সামাজিক সাহিত্যিক এবং নানা দিকের জাতীয় সমস্যায় রবীন্দ্রনাথের বাণী ও বক্তব্য বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য হয়ে উঠেছে। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর তিনি অনেকবার বিদেশে গেছেন—প্রতিবারই তাঁর যাত্রা নেহাত ব্যক্তিগত ঘটনা হয়ে থাকে নি। তাঁর যাত্রা একটা মহত্তর মানবিক তাৎপর্য মণ্ডিত হয়েছে। এ কথা তিনি এণ্ডরুজকেও লিখেছিলেন— তিনি মনে করছেন তাঁর একটা 'মিশন' আছে। এভাবে রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয়ে তাঁর সম্পর্কিত সংবাদ পরিবেশনে অভিনবত্ব এসেছে। আমাদের দেশে জনমানসে তাঁর এই উজ্জ্বল মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সংবাদ পরিবেশন প্রণালীতেও তার প্রতিফলন হয়েছে। বিশেষণমণ্ডিত শিরোনাম, সম্ভ্রমসূচক শব্দ দিয়ে রচিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের সংবাদ।

রবীন্দ্রজীবনের এই মধ্যাহ্নকালেই আনন্দবাজার পত্রিকার প্রকাশ। এই পত্রিকা প্রকাশের কয়েক মাস আগেই বিশ্বভারতী সরকারি ভাবে স্থাপিত হয়েছে। ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও বিশ্বভারতীর জন্য কবির মমতার সীমা ছিল না— এই স্কুল স্থাপনের মূলে যে প্রেরণা ও আদর্শ ছিল বিদেশভ্রমণকালে তিনি তার ব্যাখ্যা করেছেন। ইস্কুলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন এবং বিশ্বভারতীকে বিশ্বসংস্কৃতির কেন্দ্র করে তুলবার জন্য বিদেশী পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছেন। অতএব রবীন্দ্রনাথের সংবাদ বলতে শুধু ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথ নয়, বিশ্বভারতী ব্রহ্মচর্যাশ্রম শ্রীনিকেতন এবং তৎসংশ্লিষ্ট নানা উৎসব অনুষ্ঠান— তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসবও আছে— রবীন্দ্রনাটকের অভিনয় ইত্যাদি অনেক ব্যাপক কর্মক্রিয়া বোঝায়। আবার রবীন্দ্রনাথ শুধু তাঁর বিশ্বভারতী ব্রহ্মচর্যাশ্রম নিয়েই রবীন্দ্রনাথ নন, স্বদেশে যেসব রাজনৈতিক সামাজিক ঘটনা ঘটছে তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না থাকলেও সেসব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও মতামতের মূল্য অপরিসীম। সে-সম্বন্ধে অবহিত থাকাও রবীন্দ্রানুসন্ধানীদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। রবীন্দ্রব্যক্তিত্বের এই বর্ণোজ্জ্বল বিচিত্র আবির্ভাবের সঙ্গেই আনন্দবাজারের যাত্রা শুরু। 'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ আনন্দবাজার পত্রিকা' বইতে রবীন্দ্রনাথের 'সমাগতো রাজবৎ' প্রকাশের বহু সংবাদ সংকলিত হয়েছে।

আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক নিয়ে সম্পাদক চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সবশেষে একটি

নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন। তার থেকে পাঠকমাত্রই অনুভব করবেন 'প্রবাসী' 'বিচিত্রা' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকার মতো এই দৈনিক পত্রিকার সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ ছিল। এই পত্রিকার উল্লেখ তাঁর কবিতায় আছে। পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ এবং তৎসংশ্লিষ্ট সংবাদ সর্বদাই বিস্তৃত ভাবে থাকত। রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত সংবাদ, তাঁর আদর্শ ও নীতি প্রচারে 'প্রবাসী' যেমন সহায়তা করেছে, সাপ্তাহিক দেশ এবং আনন্দবাজার পত্রিকা তাতে কম সাহায্য করে নি। জনসাধারণকে কোনো কিছু জানাবার থাকলে রবীন্দ্রনাথ আনন্দবাজারে চিঠি দিয়েছেন। একবার 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের 'নির্ঝরিণী' কবিতাটির ('ঝরনা, তোমার স্ফটিক জলের স্বচ্ছ ধারা,') অর্থনিরূপণে সংশয় দেখা দেয়। কবিতাটি পাঠ্যগ্রন্থে সংকলিত ছিল। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে অনেকে পত্র দেন; তখন তিনি আনন্দবাজার পত্রিকাতেই কবিতার অর্থ ব্যাখ্যা করে চিঠি দেন।—

> আনন্দবাজার পত্রিকা সম্পাদক সমীপে।
>
> সবিনয় নিবেদন,
>
> বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা বাংলা পাঠ্যগ্রন্থে আমার 'নির্ঝরিণী' কবিতাটি সংকলিত হয়েছে। ছাত্রেরা অনেকে জানাচ্ছেন মানে বোঝা গেল না। প্রত্যেককে স্বতন্ত্র পত্রে বোঝাতে গেলে অপরাধের চেয়ে শাস্তি বড়ো হয়ে ওঠে— অর্ডিন্যান্সের কয়েদীর মতো শেষ মেয়াদ সম্বন্ধেও অনিশ্চিত থাকতে হয়। এজন্য আনন্দবাজার পত্রিকায় বক্তব্যটি পাঠানো গেল। অনুগ্রহপূর্বক প্রকাশ করে আমার দায় লাঘব করবেন। ইতি ৩ভাদ্র ১৩৪৩।

সম্ভবত এই পত্রটি বর্তমান সম্পাদকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। আনন্দবাজারের মর্যাদা অবশ্যই এই পত্র প্রকাশে বর্ধিত হয়েছিল। পাঠক লক্ষ করবেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় এই চিঠিটি লিখেছেন, সেটা সাংবাদিকধর্মী ভাষা নয়।

আনন্দবাজারের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রীতির কারণ অবশ্যই প্রফুল্লকুমার সরকার -সম্পাদিত এই পত্রিকার উঁচু মান, তার সাহিত্যিক শ্রী, তার জাতীয়তাবাদী অথচ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি— যে গুণগুলি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় -পরিচালিত 'প্রবাসী' পত্রের উৎকর্ষের কারণ। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কারণ মনে হয় রবীন্দ্রনাথের আদর্শে এর অনুরাগ। আমাদের আলোচ্য বই থেকেই পাঠক দেখতে পাবেন রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত যাবতীয় সংবাদ কত যত্নের সঙ্গে এতে পরিবেশন করা হয়েছে। তখন আনন্দবাজারের ভাষা তো 'সাধু' ভাষা ছিলই, ভাষা ছিল গাম্ভীর্যপূর্ণ ও নৈর্ব্যক্তিক। শুধু ক্রিয়াপদে সাধু নয়, চালটাও ছিল সাধু এবং ঋজু। সব মিলিয়ে ভাষায় একধরনের আভিজাত্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত সংবাদ পরিবেশনে গাম্ভীর্য এবং সম্ভ্রমের অভাব কখনোই হয় নি। ১৯২২ থেকে ১৯৩২— এই দশ বছরে রবীন্দ্রনাথের জীবনে এবং দেশে অনেকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে। গান্ধী-আন্দোলন তো ছিলই, চট্টগ্রামের আন্দোলন, হিন্দু-মুসলিম নিয়ে রাজনৈতিক সমস্যা, হিজলীর হত্যাকাণ্ড এসবও হয়েছে। এসব নিয়ে দেশবাসীর মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে, তাদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে ভাবনা বক্তব্য বা ভূমিকা ছিল আনন্দবাজারের বিবরণে তার প্রায় প্রতিদিনের বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে। রবীন্দ্রজীবনী পড়লে তার সামগ্রিক রূপটা পাওয়া যায় বটে, সংবাদপত্রের এই দৈনিক বিবরণ থেকে পাওয়া যাবে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য। তা ছাড়া জীবনীকারের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে এমন কিছু বিশেষ ধরনের সংবাদ অনুসন্ধিৎসু পাঠক পাবেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীর যে বিখ্যাত বিতর্ক হয়েছিল তার সমস্ত তথ্য ও সংবাদ আছে এখানেই। যতদূর মনে হয় সংকলনে সম্পাদক সামান্য খুঁটিনাটি বিষয়সম্পৃক্ত খবর অন্তর্ভুক্ত করতে ভুল করেন নি। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পড়ে তাঁর বক্তব্য আমরা জানি, অপর পক্ষের কী বলবার আছে তার সমগ্র যুক্তি সহ বক্তব্যকে এতে উদ্ধৃত দেখতে পাই, তার ফলে কালের দূরত্বে থেকে ভবিষ্যৎ পাঠকের জানা সম্পূর্ণ হবে সন্দেহ নেই। বলা যেতে পারে যে একটি মাত্র ক্ষেত্রে আনন্দবাজারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের

মতৈক্য ছিল না, সেটা চরকা। কিন্তু গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যথিত চিত্তে আনন্দবাজার তার মতভেদ প্রকাশ করেছে যদিও সব পক্ষের বক্তব্যকেই সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই সংকলনের 'দেশ সমাজ সরকার' অংশটি দুটি ঘটনার সংবাদে পূর্ণ— একটি গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের চরকা নিয়ে মতবিনিময়, অপরটি হিজলী হত্যাকাণ্ড।

'সভা-সমিতি' নামে অংশটিতে নানা ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের কৌতূহল ও ভূমিকার বর্ণনা। তার মধ্যে বাংলা-সাহিত্য-পাঠকদের কাছে চিত্তাকর্ষক মনে হবে ১৯২৮-এর ১৩ এপ্রিলের আনন্দবাজারে বিচিত্রা সভার বিবরণ। আনন্দবাজারের সম্পাদক জানিয়েছেন বিবরণটি সম্পূর্ণই 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'যথার্থ বিবরণে'র সংকলন। আনন্দবাজারের নিজস্ব প্রতিবেদক না থাকলেও রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ বলেই 'প্রবাসী' থেকে এই পত্রিকায় এর বিবরণ সংকলন করে দেওয়া হয়েছে— এটা অবশ্যই লক্ষ করবার বিষয়। ২৭এ জানুয়ারি ১৯২৯-এ কলকাতায় যে বিশ্বধর্মসভা হয়েছিল যাতে 'জগতের বিভিন্ন স্থানের প্রতিনিধিদের সমাগম' হয়েছিল, তাতে রবীন্দ্রনাথ অভিভাষণ দিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসের শতবর্ষে কলকাতায় যে ধর্মসভা বসেছিল, তারও আগে অনুষ্ঠিত এই ধর্মসভার কথা হয়তো আমাদের অনেকেরই জানা নেই। এতে রবীন্দ্রনাথের ভাষণের মর্ম স্বভাবতই রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীতে দেওয়া ভাষণের সঙ্গে তুলনায় আমাদের কৌতূহল জাগায়। ১৯২৫-এ রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার সারমর্মটিও উদ্ধৃত হয়েছে কয়েক পৃষ্ঠায়। তা ছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতাও প্রতিবেদকের ভাষায় দেওয়া আছে, মূল প্রবন্ধ আছে রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের পথে' বইতে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রয়াণে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হয়েছে আনন্দবাজারে, তা ছাড়া আছে তাঁর শোকসভায় রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতির বেদনার্ত বর্ণনা। এমনি বহু কৌতূহলোদ্দীপক ছোটো বড়ো নানা রকমের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে এই অধ্যায়ে।

'দেশ সমাজ সরকার' এবং 'সভা-সমিতি' বিভাগ দুটির মতো আর দুটি বিভাগের গুরুত্বও খুব বেশি— একটা বিশ্বভারতী, অপরটি ভ্রমণ— দেশে বিদেশে। আনন্দবাজার প্রকাশের এক বছর আগে বিশ্বভারতীর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সুতরাং সে-সংবাদ এই পত্রিকায় নেই। কিন্তু ১৯২৪-এ বিশ্বভারতী কলেজ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে বিশেষ ধরনের মর্যাদা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হল এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় হলেন তার প্রথম অধ্যক্ষ— এ সংবাদটি আনন্দবাজারে নেই দেখা যাচ্ছে। অথচ শ্রীনিকেতনের শিক্ষাশিবির কেন্দ্র খোলা, আশ্রমে অতিথিদের আগমন-সংবাদ ইত্যাদি অনেক খবরই দেওয়া হচ্ছে। ১৯৩১-এর সংবাদে শান্তিনিকেতন কলেজে ছাত্রভর্তির জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে। শান্তিনিকেতনে উৎসব অনুষ্ঠানের, গান্ধীদিবস পালন, বিশ্বভারতী ব্রতীবালক সম্মিলনী, পল্লীসংগঠন, বন্যার্তের সেবা, বীরভূমের দুর্ভিক্ষে বিশ্বভারতীর ত্রাণকার্য, নানা অনুষ্ঠান ইত্যাদির সংবাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেওয়া ভাষণের সারমর্ম— এসব দিয়ে আনন্দবাজার নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীকে বাইরের জগতে প্রচারের যথেষ্ট সাহায্য করেছে। আশ্রমে মাঝে মাঝে সেকালের লাটসাহেবরা আসতেন, বিদেশী পণ্ডিত অধ্যাপক শিক্ষকরা আসতেন— সেই সংবাদও যথোচিত গুরুত্ব সহকারে পরিবেশন করা হয়েছে।

আনন্দবাজারের ওই দশ বছরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বাংলার এবং ভারতের বাইরে ভ্রমণে গিয়েছিলেন বহুবার। দেশের ভিতরে গুজরাত আসাম বরোদা এবং বিদেশভ্রমণের মধ্যে আছে চীন আর্জেন্টিনা ইতালি জার্মানি ইংলণ্ড কানাডা জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাভা এবং বালী ইত্যাদির মতো দেশ। এর প্রত্যেক প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনা, তাঁর ভাষণ, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ইত্যাদির যে প্রতিবেদন এতে আছে, তার সারমর্ম নিয়ে রচিত হয়েছিল রবীন্দ্রজীবনী। কবির ইতালি-ভ্রমণের সময় মুসোলিনি রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ নিয়ে যে-বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল, সে সম্পর্কেও তৎসাময়িক কিছু প্রত্যক্ষ সংবাদ পাওয়া যায়

এখানে। ১৯২৯-এ কানাডার শিক্ষাসম্মিলনীতে যোগ দিয়ে আমেরিকায় যাওয়ার পথে পাসপোর্ট নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে যে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গে আনন্দবাজারের মন্তব্যটি লক্ষ করবার মতো—

'রবীন্দ্রনাথ স্বাদেশিকতা অপেক্ষা বিশ্বমানবতাকেই উপরে স্থান দিয়াছেন এবং গত কয়েক বৎসর হইতে তিনি এই আদর্শই প্রচার করিতেছেন। কিন্তু এবার তাঁহার প্রতি আমেরিকার এই আচরণে তিনি বোধ হয় বুঝিতে পারিবেন, বিশ্বমানবতা বড় জিনিস হইতে পারে, কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। পরাধীন জাতির পক্ষে ইহা জীবনমরণ সমস্যা।'

এসব ভ্রমণে অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে তাঁর অভ্যন্তরীণ দিনযাত্রার বিবরণ পাওয়া যাবে না। যেমন আর্জেন্টিনায় কবির অসুস্থতার সংবাদ আছে কিন্তু ওকাম্পোর আতিথ্য দেওয়ার কথা নেই। আবার বিদেশে দেওয়া কোনো কোনো বক্তৃতার বিষয় বেশ বিস্তৃতভাবেই দেওয়া আছে।

'জন্মোৎসব' নামে যে বিভাগটি করা হয়েছে তাতে প্রতিবৎসর অনুষ্ঠানের বিবরণ থাকলেও স্বভাবতই সত্তর বৎসরের বিখ্যাত জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের বিবরণ পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করবেই। শুধু কলকাতায় নয়, বাংলার বাইরে বিশেষত পাটনায় রবীন্দ্রজন্মোৎসবের বিশদ প্রতিবেদন পাওয়া যাচ্ছে। সম্পাদক এই গ্রন্থে 'জন্মোৎসব' নামে যে বিভাগটি আলাদা করে দিয়েছেন তার উপযুক্ততা সম্বন্ধে প্রশ্ন চলে না। জন্মোৎসব পালন করবার যে রীতি বাঙালিদের মধ্যে এখন সুলভ, বোধ হয় তার প্রবর্তনা রবীন্দ্রজন্মোৎসব পালন দিয়েই। আজ রবীন্দ্রজন্মোৎসব আমাদের সংস্কৃতির একটি প্রধান অনুষ্ঠান।

'সংগীত অভিনয় ও চলচ্চিত্র' এবং 'ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব' এই দুটি বিভাগের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বলার দরকার নেই।

'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ আনন্দবাজার' বইটির বিশেষত্ব নিঃসন্দেহে এর টীকা। কী বিপুল ধৈর্য পরিশ্রম ও পড়াশুনার পরিচয় এতে আছে, পাঠক পাতা ওলটালেই বুঝতে পারবেন। এত যে সংবাদ এই বইতে সংগৃহীত হয়েছে সম্পাদক তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্য জানিয়েছেন তাঁর টীকায়। এই টীকা লিখতে সম্পাদককে নানা ধরনের বহু বই ঘাঁটতে হয়েছে, তথ্য যাচাই করতে হয়েছে, বহু প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি সংগ্রহ করতে হয়েছে। এই টীকা রচনার বিশেষত্ব কোথায় বোঝা দরকার। কোনো এক ধরনের বই থেকে তথ্য নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলে চলে নি। সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি প্রভৃতি বিবিধ ধরনের সংবাদ তাঁকে রাখতে হয়েছে। শুধু বাংলা বা ভারতবর্ষ নয়, বিশ্বের নানা দিকের প্রয়োজনীয় সংবাদও তাঁকে আহরণ করতে হয়েছে। মূল বইয়ের পাঠে সংখ্যা দিয়ে বইয়ের শেষে সংখ্যানুক্রমে যে তথ্যের সমাহার তিনি করে দিয়েছেন সেগুলি আলাদা ভাবে পড়ারই আনন্দ আছে। এই টীকায় তিনি যথাসাধ্য তথ্য মাত্র দিয়েই ক্ষান্ত থেকেছেন, প্রয়োজনে ভুলও সংশোধন করেছেন কিন্তু আলাদা করে বিচারে প্রবৃত্ত হন নি। যথাসম্ভব আত্মনিরপেক্ষ হয়েই তিনি টীকা রচনা করেছেন— এজন্য পাঠক হিসাবে আমরা তৃপ্ত। অনেক তথ্য আমরা জানতাম না। এই টীকার জন্যই 'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ আনন্দবাজার পত্রিকা' বইটির স্বতন্ত্র মূল্য থাকবে। রবীন্দ্রনাথের জীবনী পড়ে আমরা প্রধান ঘটনাগুলি জানতে পারি, কিন্তু আনুষঙ্গিক আরো অনেক সংবাদ আমরা এ-বইটিতে পাই।

কিছু মুদ্রণপ্রমাদ অবশ্য আছে। যেমন প্রথম দিকেই চোখে পড়ে 'কবির ৫৮তম (১৯২৯) জন্মদিন পালিত হয়' ইত্যাদি (পৃ. ৩)। ভিতরে এক জায়গায় দেখলাম যদুনাথ সরকারের মৃত্যুবৎসর দেওয়া হয়েছে ১৯৮৫ (পৃ. ৬৪১)। সব তো মিলিয়ে দেখা সম্ভব নয়। অভিজ্ঞ সম্পাদকের লেখা বলেই পাঠকদের এককথায় মেনে নেবার প্রবণতা থাকবে।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩ মার্চ ১৯২২ - ২১ মার্চ ১৯৩২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৩। মূল্য ১২৫ টাকা।

ভবতোষ দত্ত

ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস

আমার আলোচ্য গ্রন্থ শিশিরকুমার দাশ বিরচিত 'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস, অষ্টম খণ্ড, ১৮০০-১৯১০ — পাশ্চাত্য অভিঘাত : ভারতীয় প্রতিক্রিয়া। গ্রন্থটির প্রকাশক সাহিত্য অকাদেমি; ভারতীয় সাহিত্যসমূহের এক সামগ্রিক ও সমন্বিত ইতিহাস রচনার যে-প্রকল্প তাঁরা সম্প্রতি গ্রহণ করেছেন তারই এটা প্রথম ফসল। পৃষ্ঠাসংখ্যা দিয়ে গ্রন্থবিচার চলে না, তবু গ্রন্থের বহর বিষয়ে একটা ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। এই গ্রন্থের বহর বিপুল, বড়ো মাপের আটশোরও অধিক পৃষ্ঠার এই পাঠ আমাদের বিশেষ অভিনিবেশ দাবি করে। লেখা ইংরেজিতে ইংরেজি যে এখনো শিক্ষিত ভারতীয়ের অন্যতম যোগসূত্র তাতে অভিমান না করে আমাদের জটিল ইতিহাসের অঙ্গ হিসেবে দেখাই বোধকরি ভালো— আলোচ্য গ্রন্থে আরো অনেক কিছুর সঙ্গে সেই ইতিহাসেরও বিবরণ আছে। আমাদের কর্তব্য এই গ্রন্থটির বিবিধ ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ, তাতে যেমন একদিকে ইংরেজির এই প্রভুত্বপ্রবণতা খর্ব হয় তেমনি কী করে ইংরেজি এই প্রভুত্ব পেয়েছিল সেই কাহিনীও সকলের গোচর হবে। এবং এও বোঝা যাবে কেন এখনো এ দেশে, ইংরেজি সংবাদপত্রে, বৈকম মুহম্মদ বশীরের মতো মহৎ ভারতীয় লেখকের মৃত্যুসংবাদ এত সংক্ষিপ্ত হয়।

গ্রন্থটির দুটি ভাগ। প্রথম ভাগে আখ্যান, দ্বিতীয় ভাগে তথ্যপঞ্জি। তথ্যপঞ্জি কালানুক্রমিক, ১৮০০ থেকে শুরু করে বর্ষ ধরে-ধরে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ব্যাপ্ত। প্রতি বর্ষে প্রত্যেক ভাষায় যা উল্লেখযোগ্য তা সন্নিবিষ্ট হয়েছে, যথা লেখকের জন্মমৃত্যু, রচনাপ্রণয়ন, রচনাপ্রকাশ, পত্রপত্রিকা প্রকাশ, সাহিত্য আন্দোলন; সেইসঙ্গে সব রকমের সাহিত্যসম্পৃক্ত ও সুদূরপ্রসারী সামাজিক ঘটনাও, যেমন ছাপাখানা স্থাপন, প্রকাশন নির্বন্ধ, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, গ্রন্থাগার ও পুস্তকসমিতি গঠন, ধর্ম ও অন্যান্য সংস্কার, আইন প্রণয়ন— প্রথম বছরের প্রথম দুটি উল্লেখই এই দ্বিতীয় মাত্রার, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠা। আর প্রত্যেক ভাষা বলতে সাহিত্য অকাদেমি-স্বীকৃত বাইশ (অর্থাৎ অসমীয়া, ইংরেজি, উর্দু, ওড়িয়া, কঙ্কোনী, কন্নড়, কাশ্মীরী, গুজরাতী, ডোগরী, নেপালী, তামিল, তেলুগু, পাঞ্জাবী, মণিপুরী, মলয়ালম, মারাঠী, মৈথিলী, রাজস্থানী, বাংলা, সংস্কৃত, সিন্ধী ও হিন্দী) ও তদতিরিক্ত ফার্সি— এই তেইশটির প্রত্যেকে। কোন্ তথ্য উল্লেখযোগ্য আর কোন্‌টি নয় তার বিচার সম্পাদন হয়েছে একাধিক পদ্ধতিতে। যেমন একদিকে ছিলেন একদল তথ্যসংগ্রাহক ও তথ্যবিশ্লেষক—প্রতি ভাষার জন্যে অন্তত একজন— তেমনি আকর হিসেবে কাজ করেছে ভিন্ন-ভিন্ন ভাষায় অদ্যাবধি প্রকাশিত সাহিত্য-ইতিহাসসমূহ। তার উপর নানা ভাষার নানান ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের ও সুধী পাঠকদেরও পরামর্শ নেওয়া হয়েছে এক প্রশ্নমালার সাহায্যে। আর এই সমাহার হয়েছে সম্পাদনার আতসকাচে পরীক্ষিত যাতে একে অন্যের প্রতিস্পর্ধী না হতে পারে তথ্যাবলি। তথ্যের নিরঞ্জনতা দাবি আজ বাতুলতা, তবু তথ্যকে অনেকটা মোহমুক্ত ও অবিশেষ করে তোলা বোধকরি আজও সম্ভব— সেই প্রয়াসই এখানে সম্পাদক করেছেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উপকার-অপকার থেকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠাকে যদি অস্থায়ীভাবেও বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া যায়— গুরুতর উদাহরণ মেকলের শিক্ষাবিধি— তাহলে তথ্যসংস্থাপন অপেক্ষাকৃত সার্থক হতে পারে। উপকার-অপকার নিয়ে কথা বলবার পরিসর আছে আখ্যানপর্বে। কিন্তু তথ্যপঞ্জির সঙ্গে আখ্যানের কেবল বিয়োগ নয় একটা প্রত্যক্ষ যোগও থাকা চাই, নইলে তথ্যপঞ্জি হয়ে দাঁড়াবে পরিশিষ্টমাত্র। তথ্যপঞ্জি আদৌ পরিশিষ্ট নয়, নিজেই ইতিহাস। চাইলে তথ্যপঞ্জিক প্রথম ভাগে রেখে আখ্যানকে দ্বিতীয় ভাগে দেওয়া যেত এবং তা অধিকতর ব্যাকরণসম্মতও হত; তবে সম্ভবত আমাদের পাঠের অভ্যেস ও প্রচলিত মুদ্রণরীতির কথা মনে রেখে তা করা হয় নি। যাই হোক, এই তথ্যপঞ্জি, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রতিধ্বনি করে বলছি, প্রথম দফায় অবশ্যপাঠ্য, দ্বিতীয় দফায় অবশ্যপাঠ্য, তৃতীয় দফায় অবশ্যপাঠ্য।

তথ্যপঞ্জির এ-গ্রন্থে দুটি কাজ। সে যেমন নিজে ইতিহাস তেমনি লেখকের ইতিহাস-আখ্যানের আকর। অর্থাৎ প্রথম ভাগ রচিত হয়েছে দ্বিতীয় ভাগের ভিত্তিতেই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে দ্বিতীয় ভাগের ভিত্তিতে আর কোনো আখ্যান রচিত হতে পারে না। পারে, অতি অবশ্যই পারে, এবং সেখানেই আজকের ইতিহাসচর্চার বৈশিষ্ট্য। ইতিহাস যেমন তথ্যপঞ্জি তেমনি তথ্যপঞ্জি-নির্ভর আখ্যানও; এবং আখ্যানমাত্রেরই যেহেতু এক লেখক আছেন তাই লেখকভেদে আখ্যানেরও ভেদ হতে পারে— তবে সবটাই তথ্যপঞ্জি-সাপেক্ষ। তথ্যপঞ্জিকে বাদ দিয়ে বা তথ্যপঞ্জিকে বিকৃত করে কোনো আখ্যানরচনা সম্ভব নয়। সেইদিক থেকে এক অভিনব ইতিহাসরচনা আমাদের এই গ্রন্থটি। লেখক কেবল তাঁর লেখ্যই লেখেন নি, সেই লেখ্যে তিনি কীভাবে পৌঁচেছেন তাও লিখেছেন। ইতিহাস বলতে একসময়ে যে নির্বিকল্প গুরুভার আয়োজন বোঝাত তার সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই। কোনো প্রশ্নাতীত পরিবেশন এ নয়, বরং নানান প্রশ্নের এক আমন্ত্রণ। তথ্যপঞ্জি সমাবেশ সম্পন্ন করে লেখক নিজে সেই তথ্যপঞ্জির কী বিশ্লেষণ করছেন তা-ই নিবেদন করেছেন, সুতরাং প্রশ্নের অভাব কোথায়? যদি মতৈক্যই হত লেখকের উদ্দেশ্য তা হলে তো তিনি এত মন দিয়ে তথ্যপঞ্জি সাজাতেন না; বরং তাঁকে আক্রমণ করবার সকল অস্ত্রই লেখক পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছেন। এমন ইতিহাস প্রস্তাবের জন্যে লেখককে সাধুবাদ।

'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস' কথাটিতে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলবেন। যাঁরা ইতিহাস-বিষয়ক পুরাতন চিন্তায় অভ্যস্ত তাঁরা বলতে পারেন, ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস লিখতে হলে তো তার একটা পূর্বনির্দিষ্ট রূপ থাকা উচিত। কী সেই রূপ? ভারতীয় সাহিত্য এক না অনেক? সাহিত্য অকাদেমি বলেন, এক যদিও অনেক ভাষায় লিখিত। আর সাহিত্য অকাদেমি -সম্মানিত এক লেখক মাঝে-মাঝে বলেন, হ্যাঁ, এক কিন্তু 'যদিও অনেক' ইত্যাদি নয়; এক, যেহেতু অনেক ভাষায় লিখিত। 'যদিও' বললে 'যেহেতু' বলবার একটা প্রবণতা অস্বাভাবিক নয়, অন্তত গঠনবাদীরা মানবেন, 'যদিও'-র ফলে এক 'যেহেতু' জন্ম নিচ্ছে। কিন্তু এতে করেও কি এক-অনেকের সমস্যা মেটে? বোধকরি বলা উচিত, ভারতীয় সাহিত্য যুগপৎ এক ও অনেক কিংবা অনেক ও এক। মানে, অনেক থেকে একে উত্তরণ নয় কিংবা এক থেকে অনেকে বিকিরণও নয়। আসলে প্রশ্নটা হল ভারতীয় সাহিত্য কথাটা কি বস্তুবাচক? সাহিত্যের একমাত্র পরিচয় হয় যদি ভাষা, তা হলে বস্তুবাচকতা স্বাভাবিক, যেহেতু ভাষার বচন আছে। কিন্তু সাহিত্য যদি হয় রচয়িতা-গ্রহীতার এক ভাষাভিত্তিক সম্পর্ক, তা হলে রচয়িতা-গ্রহীতার পরিচয়েও সাহিত্যের পরিচয় হতে পারে। এমন কি বলা যায় না যে ভারতীয় সাহিত্য ভারতীয় রচয়িতা ভারতীয় গ্রহীতার সম্পর্ক তা যে-যে ভাষার ভিত্তিতেই হোক-না-কেন? অর্থাৎ ভারতীয় সাহিত্য এক অবস্থান যেখানে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার 'সাহিত্যে'র অস্তিত্ব সম্পূর্ণ স্বীকৃত। এক যোগ দুই যোগ তিন যেমন ভারতীয় সাহিত্য নয়, তেমনি তিন বিয়োগ দুই বিয়োগ একও নয় ভারতীয় সাহিত্য—যোগ-বিয়োগের প্রশ্ন নিতান্ত অবান্তর। এমন-কি, রবীন্দ্রনাথের 'গ্রাম্য'-'বিশ্বে'র সমান্তর টেনে এ কথা বলবারও প্রয়োজন নেই যে কোনো-কোনো বাংলা বা মারাঠী বা তামিল রচনা নিতান্ত বাংলা বা মারাঠী বা তামিল, আবার অন্য কোনো-কোনো বাংলা বা মারাঠী বা তামিল রচনা ভারতীয়। ক্ষুদ্র বস্তুতান্ত্রিকতার হাত থেকে যদি খানিক মুক্তি পাওয়া যায় তাহলে বোধকরি ভারতীয় সাহিত্য নিয়ে আর সমস্যা থাকে না, যদিও তাতে এক অন্য বস্তুতান্ত্রিকতার দিকে আমাদের পা বাড়াতে হচ্ছে। কিন্তু সে-বস্তুতান্ত্রিকতা বৃহৎ এবং তার সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে আমাদের সকলের অস্তিত্ব। ভারতে যে-সাহিত্য আমরা রচনা করেছি, রচনা করছি; যে সাহিত্য আমরা আস্বাদন করেছি, আস্বাদন করছি, তা-ই ভারতীয় সাহিত্য।

কিন্তু এতটা 'নৈরাজ্য' বোধহয় লেখকের ভাবনায় নেই। ভিন্নতার তিনি জয়গান করেছেন, কিন্তু ভিন্নতাই যে ভারতীয় সাহিত্যের একান্ত স্বরূপ তা বলেন নি। ঐক্যের খবরদারিতে যেমন ভিন্নতার ক্ষতি তেমনি ভিন্নতার খবরদারিতে ঐক্যেরও ক্ষতি— দ্বন্দ্বের এই সহজ কথাটা বোধহয় মানতে বাধা নেই। কিন্তু ভিন্নতা-

ঐক্যের কী সম্পর্ক লেখক প্রস্তাব করছেন? লেখক কি ধরেই নিয়েছেন যে ঐক্য যখন লক্ষ্য তখন ভিন্নতা নিতান্ত অনুপুঙ্খ, নাকি ভিন্নতার নৌকো বেয়ে-বেয়েই লেখক ঐক্যে পৌঁচচ্ছেন? এই কথাটা খুব ভালো করে বুঝে নিতে হবে আমাদের। নইলে আমরা দু-তরফ থেকেই লেখককে আক্রমণ করে বসতে পারি—ঐক্যবাদীরা বলে ফেলতে পারি তিনি খালি ভিন্নতাই দেখিয়েছেন, আর ভিন্নতাবাদীরা বলতে পারি, ভিন্নতা কোথায়, সবই তো সেই ঐক্য! আসলে ভারতীয় সাহিত্যের এই ঐক্য-অনৈক্যের বিতর্ক যবে থেকে শুরু হয়েছে তদবধি দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে আছি আমরা। উনিশ শতকের ভারততাত্ত্বিকদের খুব সুবিধে ছিল, ভারতীয় সাহিত্য বলতে তাঁরা মূলত সংস্কৃত সাহিত্য বুঝতেন, খুব বেশি হলে পালি-প্রাকৃত। ফলে তাঁরা যাঁরা, বিশ শতকের প্রথমার্ধেও, ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছেন তাঁরা ঐক্য-অনৈক্যের দ্বন্দ্বে পড়েন নি। গত কয়েক দশকের প্রতীচ্য ভারতবিদ্যার্থীরাও দ্বন্দ্বে পড়েননি যদিও তাঁরা সংস্কৃত বা সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃতকেই একমাত্র ভারতীয় সাহিত্য বলে মানেন নি। তাঁদের কেউ কেউ অন্যান্য ভারতীয় ভাষার সাহিত্যের ইতিহাসও লিখেছেন— যিনি বাংলার লিখেছেন তাঁকে আলাদা করে অসমীয়ার কথা ভাবতে হয় নি, যিনি অসমীয়ার লিখেছেন তাঁকেও আলাদা করে বাংলার কথা ভাবতে হয়নি। (আর উনিশ শতক থেকে শুরু করে আমরা যারা নিজের-নিজের ভাষায় সাহিত্য-ইতিহাস লিখে আসছি তাদেরও এই অতিরিক্ত ভাবনার অবকাশ নেই।) ইতিপূর্বে সাহিত্য অকাদেমিও ইতিহাসচর্চা করেছেন, তাঁদের স্বীকৃত বেশির ভাগ ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসই তাঁরা প্রকাশ করেছেন। তাঁদের প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য সব কটি সাহিত্যের ইতিহাসকে দুই মলাটের মধ্যে বেঁধে দিলে যে ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস হয় না, সেটা যেমন সত্য তেমনি সত্য কেরল সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত দুই খণ্ডের 'তুলনামূলক ভারতীয় সাহিত্য'ও ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস নয়— সেখানেও শেষ পর্যন্ত যৌগিকতার পদ্ধতি নেওয়া হয়েছে, যদিও সার্বিক বিষয়ভাগ করে নিয়েই তবে যৌগিকতায় আসা হয়েছে। ধরা যাক ভারতীয় কবিতার প্রাথমিক পরিচয় পেতে চাই, অসমীয়া থেকে হিন্দী পর্যন্ত পনেরোটি ভাষার কবিতার আখ্যান এই গ্রন্থে উপস্থিত— তুলনাটা করে দেওয়া হয় নি, তা করে নিতে হবে আমাকেই। ঐক্য-অনৈক্যের দ্বন্দ্ব আসলে এখানে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে— চেহারা অনৈক্যের যদিও শিরোনামে ঐক্য। দ্বন্দ্ব যাঁরা এড়ান নি তাঁরা কেউ কেউ ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস-রচনার সমস্যা নিয়ে কথা বলেছেন। তাঁদের সমস্যাবিশ্লেষণ বিচার করলে হয়তো দেখা যাবে যে দ্বন্দ্বের প্রশ্নে বৃত হলেও তাঁদের অনেকেই বেশি মান্য করেছেন ঐক্যকেই, এমনও হয়তো দেখা যাবে যে দু-একজনের চোখে অনৈক্যটাই সমস্যা (সেইসব ক্ষেত্রে সেই কিঞ্চিৎ আপাতলঘু উক্তিই আওড়াতে হয়তো ইচ্ছে হবে— ভারতীয় সাহিত্য এক যেহেতু অনেক ভাষায় রচিত)। কিন্তু ঐক্য অনৈক্য যেটাই সমস্যা বলে চিহ্নিত হোক-না-কেন, কিংবা যুগপৎ ঐক্য-অনৈক্য, সমাধান এর আগে হয় নি। এই প্রথম প্রয়াস করলেন শিশিরকুমার দাশ, তাঁকে সাধুবাদ।

প্রয়াসটা যে বিপুল তা বলা বাহুল্য। ইউরোপীয় ভাষার সাহিত্যসমূহের একটি সার্বিক ইতিহাস রচনার প্রয়াস চলেছে দু-দশক ধরে, উদ্যোক্তা এক আন্তর্জাতিক বিদ্বৎসভা। এখন পর্যন্ত যা বেরিয়েছে তা কয়েকটি আলাদা-আলাদা খণ্ডমাত্র, আন্দোলন বা যুগ বা অন্য কোনো তৃতীয় অনুক্রমে। প্রতিটি খণ্ডের মূল্যই অপরিসীম, আকর হিসেবে অবশ্যপাঠ্য, কিন্তু ইতিহাসে কি এতে করে আমরা পৌঁচচ্ছি? তত্ত্ব ও তথ্যের যে টানাপোড়েন এই শতকের পাশ্চাত্য সাহিত্যবীক্ষা জোড়া উপস্থিত তার ছায়া বোধকরি এই প্রকল্পের উপরেও পড়েছে; নইলে কেন আমরা পূর্বনির্ধারিত কতক ভাবনার—তা আন্দোলন বা যুগ বা অন্য যে-কোনো বিষয়সম্পৃক্তই হোক-না-কেন— ইতিহাস মাত্র লিখব, কেন কালানুক্রমিকতার কোনো চেষ্টাই করব না? ইতিহাস কথাটার আর যে-মানেই থাক, একটা মানে তো তা-ই : ক-এর ঘরে খ, খ-এর ঘরে গ ইত্যাদি। নাকি আমরা রক্তকরবীর রাজার মতো বলছি, পুরাণ বলে কিছু নেই, মহাকাল কেবল নিজেকে সামনে রেখেই এগিয়ে চলেছে? অথবা ক্ষণবাদী? উনিশ শতক ইউরোপে ছিল ইতিহাস-[illegible] আদল তখন

তৈরি হয়েছিল বিশ শতক তার অনেকটাই বর্জন করেছে কিন্তু বিকল্প কোনো আদল এখনো দেয়নি, হয়তো দেবার কথাও নয়। বিশ শতক দিয়েছে গ্রামশিক, দিয়েছে ফুকোকে যাঁদের ইতিহাসবোধ হয়তো উনিশ শতকী মনীষীদের চাইতে কম নয়। রূপের ধ্যান ইউরোপীয় বিশ শতকের এতটা মজ্জাগত হয়ে গেছে যে রূপের অসম্ভাব্যতার কথাও বলতে হয় কালজাত নয়, রূপজাত ভাষায়। আর সাহিত্য-ইতিহাসের যে-প্রস্তাব করেছিলেন গাডামার-শিষ্য হান্স রবার্ট যাউস তাঁর ১৯৬৭-র উচ্চকিত বক্তৃতায়, যা এখন গ্রহণ-আস্বাদন তত্ত্বের পাঠক্রমভুক্ত, তাতে কালক্রম কিছুতেই মুখ্য হয়ে উঠতে পারে নি। তা ছাড়া বোধকরি পাশ্চাত্য প্রজ্ঞায় যে-আত্মজিজ্ঞাসা ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে এবং যার ফলে ক্রমেই প্রশ্নসঙ্কুল, এমন-কি স্ববিরোধী, হয়ে উঠছে ভাষাব্যবহার, তা সাবেকি অর্থে ইতিহাসের পরিপন্থী।

কিন্তু সাবেকি ইতিহাসই কি কেবল শিশিরকুমার দাশ লিখছেন? অর্থাৎ তথ্য ও সত্যের সেতুবন্ধন করে চলেছেন একের পর এক, শুধু 'পশ্য পশ্য, উহা যেহেতু তথ্য তাই ইহাই সত্য'? কোনো দ্বিধা কোনো প্রশ্ন নেই, পুরোপুরি তাদাত্ম্য অর্থাৎ আত্মনির্বাসন? তা হলে কেন তথ্যপঞ্জি-আখ্যানে ভেদ রাখলেন তিনি, তেইন গের্ভিনিয়ুসের আদলে তো দিব্যি বলে যেতে পারতেন একাদিক্রমে, একদা এক শ্বেতাঙ্গস্বার্থবাহী কলেজ স্থাপিত হয়েছিল ডিহি কলকাতায়, তার নাম,.... এক ছাপাখানা বসেছিল শ্রীরামপুরবাসী খ্রিস্টধর্ম প্রচারকদের উদ্যোগে, তার নাম ..., ইত্যাদি ইত্যাদি? তা না করে তিনি একদিকে সাজিয়ে দিলেন তথ্যপঞ্জি, মন্তব্যবিহীন, তদাত্ম আর অন্যদিকে পেশ করলেন এক আখ্যান যার আদল বোধকরি ঈষৎ 'আনাল'-অভিমুখী। এই কালক্রমিক কাহিনীকে তিনি অনেকটাই ব্যাপক করে দেখেছেন। আরো ব্যাপক হয়তো করা যেত, কিন্তু সে অন্য কথা — ভাবী আখ্যাতাদের দরজায় কেন হাতি বাঁধা থাকবে? তথ্যপঞ্জি তো রইল, তাঁরা তাঁদের মতো করে আখ্যান রচনা করবেন— একই কালক্রমের একাধিক আখ্যানে বাধা কিসের। ধরা যাক যে-পর্ববিভাগ এখানে আছে— ১৮০০-১৮৩৫, ১৮৩৫-১৮৫৭, ১৮৫৭-১৮৮৫, ১৮৮৫-১৯১০— তা স্বচ্ছন্দে পাল্টানো যায়, কারণ ১৮৩৫ বা ১৮৫৭ বা ১৮৮৫ তো সত্যি-সত্যি কোনো বিভাজন নয়। মেকলের শিক্ষাবিধির সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজি অভিঘাত স্থায়ী হয়ে গেল বা প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ত্রয় স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই এক নতুন পাঠকসমাজের জন্ম হয়ে গেল কি প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গেই পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল স্বাদেশিকতা বা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গেই জাতীয়তা হয়ে উঠল মুখ্য উপাদান— এমন দাবি কেউ করবে না। কেউ বলবে না যে ১৮৩৪ আর ১৮৩৬-এর বা ১৮৫৬ আর ১৮৫৮-র বা ১৮৮৪ আর ১৮৮৬-এর মধ্যে মস্ত বদল ঘটে গিয়েছিল ভারতীয় ভাষার সাহিত্যসমূহে। অতএব যদি কেউ ১৮২৩ (আমহার্স্টের কাছে রামমোহনের চিঠি), ১৮৫৬ (বিধবাবিবাহ বিষয়ক আইন প্রণয়ন) ও ১৮৭৬ (নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন)-এ বিভাজন করেন, খুব ক্ষতি হবে? পর্ববিভাগ নিয়ে একসময়ে অনেক কথা হয়েছে— কেউ-কেউ বলেছেন সাহিত্যের ইতিহাসের পর্ববিভাগ হবে সাহিত্য-অতিরিক্ত কোনো ইতিহাস, যেমন রাজনৈতিক ইতিহাস, অনুযায়ী, তাতে তা অন্তত সর্বজনগ্রাহ্য হতে পারে। আমাদের পরিচিত অনেক একক সাহিত্যের ইতিহাসেই এই পর্ববিভাগ আছে— কেবল জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রমাত্রেই এলিজাবেথীয় কি ভিক্টোরীয় যুগের বৈশিষ্ট্যনির্ণয়ে অভ্যস্ত। আবার কারোর-কারোর মতে সাহিত্যের ইতিহাসের পর্ববিভাগ হবে তার নিজের নিয়মে। সেই নিয়ম কী, তার কোনো সরল বা জটিল অঙ্ক আছে কিনা তা নিয়েও কেউ-কেউ একসময়ে ভেবেছেন। উপরন্তু পর্বের হ্রস্বতা-দৈর্ঘ্য নিয়েও ভাবনা হয়েছে, যদিও হ্রস্বতা-দৈর্ঘ্য যে অনেকটাই দূরত্বের উপর নির্ভর করে তা কে অস্বীকার করবে? উনিশ শতকের বাংলা নিয়ে তো আমরা দশকের হিসেবে ভাবি না, যদিও এই শতকের তিনের দশক থেকে তা-ই আমাদের মাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে (গোড়ায় বোধকরি এতে খানিক ইংরেজির প্রভাব ছিল, থার্টিজ ফোর্টিজ শুনতে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম)। যাই হোক, এখন সবাই হয়তো মানবেন যে সাহিত্যের একটি লক্ষণ যেহেতু প্রবহমানতা, তার ইতিহাসের পর্ববিভাগ তাই কৃত্রিম,

অর্থাৎ সুবিধেমাফিক। মাত্রার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আরিস্ততল বলেছিলেন তা-ই মাত্রা যা অতিবৃহৎ বা অতি ক্ষুদ্র নয়, যা একযোগে অবলোকন করা যায় আর যা দৃষ্টির সূচীমুখে গলে যায় না। কিন্তু আরিস্ততলের সঙ্গে আজ আমরা একমত নই যে অবলোকন কেবল অবলোকিতসাপেক্ষ, তাতে অবলোকনকারীর কোনো ভূমিকা নেই। সুতরাং ১৮০০ থেকে ১৯১০ (১৯১০ও তো রীতিমতো অভিনব যদিও আদৌ যুক্তি বহির্ভূত নয়, কারণ শেষ প্রধান ভারতীয় ভাষা কাশ্মীরীতে মুদ্রণ প্রবর্তনের তারিখ তা-ই) পর্যন্ত ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসের পর্ববিভাগ পূর্বনির্দিষ্ট হতে পারে না। আর তা যদি আমরা মান্য করি তা হলে শিশিরকুমার দাশের পর্ববিভাগ নিয়ে আমাদের কোনো আপত্তি থাকবার কথা নয়। আমরা নিজেরা যখন আখ্যাতা হব তখন আমাদের পর্ববিভাগ হয়তো হবে আলাদা, এবং শিশিরকুমার দাশের আখ্যান পড়ে আমি যা বুঝেছি তাতে বলতে পারি যে অন্যতর পর্ববিভাগে তাঁর কোনো আপত্তি থাকবে না। পর্ববিভাগ বাহ্য। অপর্ব ইতিহাসই আমাদের পাঠ।

সেই পাঠে যা প্রথমেই চোখে পড়ে তা এক বহুমুখী জটিলতা। সংখ্যা তো আছেই, তবে সে তেমন শতগ্রীব নয় এখানে— সেই শতসাহস্রীর শ্লোকায়ন হয়েছে তথ্যপঞ্জিতে— এখানে আমাদর বিবেচ্য তার অন্তবর্তী রূপ ও প্রবাহ; এবং জটিলতা বা বহবতা সেখানেই। নবীন-প্রবীণের যে-দ্বন্দ্বের কথা আমরা শুনে এসেছি এতকাল, ঐতিহ্য বনাম আধুনিকতা— বঙ্কিমের বাংলা সাহিত্য বিষয়ক ইংরেজি প্রবন্ধে একদা উচ্চারিত— তার চেহারা যে আদৌ নিপাট নয়; সংস্কৃত তো বটেই এমনকি ফার্সিও যে বহুদূর পর্যন্ত তার শেকড় শক্ত রেখে রেখে চলেছিল; মাইকেল যা-ই বলে থাকুন-না-কেন তার সেই "অ্যাংলোস্যাক্সন ও হিন্দু" নাম্নী নিবন্ধে, কোনো সোনার কাঠির রুপোর কাঠির গল্প ছিল না যে এ; 'এলাম দেখলাম জয় করলাম'-এর রূপক যে টমাস বেবিংটনের ত্রৈলোক্যনাথ-সম্মত প্রেতাত্মাও দাবি করতে পারেন না বইয়ের তাক বিষয়ে যে-বাহ্বাস্ফোটই তিনি করে থাকুন না কেন—ইত্যাদি ইত্যাদি যত দ্বিপ্রাহরিক দীপক হয়ে ওঠে প্রতিভাত। আর সেই সঙ্গে এক প্রবাহের ছবিও হয়ে ওঠে স্পষ্ট, প্রত্যয় হয় যে কিছুই থেমে ছিল না, পাল্টাতে পাল্টাতে এগোচ্ছিল। না, পরিবর্তনের কোনো পূর্বপরিজ্ঞাত বীজগণিত ছিল না, ফলে প্রবাহ ছিল কখনো মন্দ কখনো উত্তাল, যদিও মন্দ-উত্তালের একাদিক্রম পরম্পরাও নয়। কিন্তু পরিবর্তন যে সব ভারতীয় সাহিত্যে একসঙ্গে হচ্ছিল না, কোথাও আগে কোথাও পরে, এই প্রতীতিও আখ্যানপাঠে ঘটে। শিশিরকুমার দাশ এই অগ্রবর্তিতা-পরবর্তিতার এক অঙ্ক আবিষ্কার করেছেন: একটিকে তিনি বলেছেন 'প্রো-ফানেস' অর্থাৎ পূর্ব আবির্ভাব, অন্যটিকে 'মেটা-ফানেস' অর্থাৎ উত্তর-আবির্ভাব। অর্থাৎ কোনো-কোনো লক্ষণ, কোনো-কোনো ঘটনা উনিশশতকে এক ভারতীয় সাহিত্যে আগে দেখা গেছে, আগে ঘটেছে, অন্য ভারতীয় সাহিত্যে পরে— যেমন গদ্যসাহিত্য, যেমন সাময়িকী সাহিত্য, উপন্যাস, আধুনিক মঞ্চায়নযোগ্য নাটক ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং যেমন কোনো-কোনো রূপকল্পের ক্ষেত্রে তেমনি কোনো-কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রেও এই পূর্ব-উত্তর বিন্যাস লক্ষণীয়। পূর্ব এবং উত্তরের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক, প্রভাব বা অভিঘাত যা-ই বলি-না কেন, সর্বদা নিরূপণ করা যায় কিনা সন্দেহ, অন্তত শিশিরকুমার দাশ সে-প্রস্তাব করেন-নি। কিছু যোগাযোগ তো ঘটেছিল— তথ্যপঞ্জি তার সাক্ষ্য— কিন্তু তাকেই কার্যকারণ বলা দুষ্কর। প্রভাব কথাটির মধ্যে ঈষৎ প্রভুত্বের আভাস আছে, তা বোধহয় ভোলা উচিত নয়, এবং সেই প্রভুত্ব নিশ্চয়ই ব্যাপক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক আয়োজনসাপেক্ষ। ভারতীয় সাহিত্যে ইংরেজি প্রভাবের কথা যখন আমরা বলি তা সেই অর্থেই, এক মধুসূদন মিল্টন পড়েছিলেন কিনা বা এক চান্দু মেনন বেঞ্জামিন ডিজরেলি বা এক রবীন্দ্রনাথ শেলি-কীটস, নিতান্ত সে-অর্থে নয়। এক ভারতীয় সাহিত্যের সঙ্গে অন্য ভারতীয় সাহিত্যের এই প্রভুত্বের যোগ নিশ্চয়ই ছিল না যদিও একে-অন্যে পরিগ্রহণ ঘটেছে, একের দ্বারা অন্য অনুপ্রাণিত হয়েছে। বঙ্কিম নিয়ে একটি গবেষণার উল্লেখ করেছেন গ্রন্থকার যেখানে ভারতীয় ভাষাসমূহের ব্যবধান ও সম্পর্কের আলোচনা করা হয়েছে বঙ্কিম পরিগ্রহণ বিচার করে। এমনও শুনেছি যে কন্নড়ে কিছুকাল কেউ-কেউ বঙ্কিমকে প্রায় কন্নড় ঔপন্যাসিক বলেই জানতেন (বিশ শতকে

শরৎচন্দ্র বিষয়ে তুলনীয় ধারণা শুনেছি একাধিক ভাষাতেই ছিল)। কিন্তু এই উদাহরণ মাথায় রেখে যদি আমরা বাংলাভাষীরা বাংলাকে দাতা ও কন্নড়কে গ্রহীতা বলি তা হলে অনৈতিহাসিক অহমিকা তথা নির্বুদ্ধিতার সীমা থাকবে না। বঙ্কিমকে হয়তো খানিক সুধীন্দ্রনাথীয় অর্থে 'ঘটক' বলা যায়, তার বেশি নয় (ভূদেব মুখোপাধ্যায় তিরস্কৃত রাজেন্দ্রলাল মিত্রদের ওড়িয়া-বিষয়ক আজব প্রস্তাবের কথা আমরা নিশ্চয়ই ভুলে যাই নি)। যাই হোক, শিশিরকুমার দাশ ঘটক-তত্ত্বের অবতারণা করেননি, কেবল পূর্ব ও উত্তর আবির্ভাবের কথা বলেছেন। একাধিক সাহিত্যের সমন্বিত ইতিহাস এর পরে যাঁরাই লিখবেন তাঁদের এই 'প্রো'-'মেটা' তত্ত্ব উদ্‌বুদ্ধ করবে; সাহিত্য-ইতিহাসচর্চা এর জন্য শিশিরকুমার দাশের কাছে ঋণী হয়ে থাকবে।

পূর্ব-আবির্ভাব উত্তর-আবির্ভাবের এই আবির্ভাব ব্যাপারটির, নৃতাত্ত্বিক-সমাজতাত্ত্বিক মহলে যাকে কেউ-কেউ জীবতত্ত্ব-প্রস্তাবিত 'বহুজায়ন' বলে থাকেন তার সঙ্গে খানিক মিল আছে। এই 'বহুজায়ন' অনুযায়ী এক মনোভঙ্গির স্বতন্ত্র প্রকাশ অনেক ক্ষেত্রেই ঘটতে পারে, তার জন্যে কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগের প্রয়োজন নেই। এর মধ্যে একটা পরিণামবাদী গন্ধ থাকতে পারে, যদিও ঝোঁকটা স্বাতন্ত্র্যের উপর। সাহিত্য-ইতিহাসে এই ধরনের একটি কথা বলা হয়েছিল উনিশ শতকে যার অন্যতম প্রধান প্রবক্তা ছিলেন সেন্ট পিটার্সবার্গের আলেকসান্দর ভেসেলোভস্কি। তাঁর বিখ্যাত স্তর-তত্ত্বের ভিত্তিতে গত কয়েক দশকে পূর্ব ইউরোপে বেশ-কিছুটা সাহিত্যচিন্তাও হয়েছে। কিন্তু শিশিরকুমার দাশ 'বহুজায়ন' বা স্তর-তত্ত্বকে তাঁর আদল হিসেবে নেন নি। প্রকৃতপক্ষে তিনি কোনো তত্ত্বকেই, পরিণামবাদী কি অপরিণামবাদী, আগে থেকে ধরে নিয়ে তথ্যবিচারে বসেন নি। তাঁর বাহাদুরি আমি বলব সেখানেই। এক ঘরানার নিবন্ধসাহিত্যের সঙ্গে আমরা পরিচিত, হয়তো একটু অধিকই পরিচিত, যেখানে তত্ত্ব ঘোষণা হয় শুরুতেই, তথ্য আসে তার প্রমাণ বা উদাহরণ হিসেবে। কিন্তু তত্ত্বের মাপে-মাপে সন্নিবিষ্ট হতে গিয়ে তথ্যের কিছু কাটছাঁটও হয়। অনেক সময় আমরা এমন তত্ত্বমগ্ন থাকি যে কাটছাঁট আদৌ খেয়ালই করি না, এমন-কি নিজেদের কাঁচিতে হলেও না। ফলে, ঈষৎ অতিশয়োক্তি শোনালেও, তথ্য হয়ে পড়ে তত্ত্বের দাস। হতে পারে এই উপক্রমণিক তত্ত্বের পেছনে অনেক অতীত তথ্যবিচার রয়েছে, কিন্তু এখন যখন সকল নিবন্ধকেই আমরা আখ্যান বলতে প্রয়াস পাচ্ছি তখন তথ্য-তত্ত্বের পারস্পরিকতা অগোপন থাকাই বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ তত্ত্বের প্রভুত্ব থেকে তথ্যের মুক্তি একান্ত কাম্য। তথ্য মানে নিতান্ত রাশি নয়, তথ্য অভিজ্ঞতা। আর সে ক্ষেত্রে যদি আমরা কোনো কারচুপি না করি, কোনো ভেজাল না দিই বা কর্তন-ছেদনে প্রবৃত্ত না হই, তা হলে তথ্যই তো আমাদের তত্ত্বে পৌঁছে দিতে পারে। আমি যা বলছি তা বর্ণপরিচয় বা ধারাপাতের মতো শোনাতে পারে, কিন্তু এবিষয়ে বোধকরি সন্দেহ নেই যে কিঞ্চিৎ আপেক্ষিক আর অস্থায়ী হলেও সত্যই আমাদের লক্ষ্য। অপরিণামবাদী আর হয়তো আমরা নই, কিন্তু বিশুদ্ধ ক্ষণবাদীও তো নই; অতএব ক্ষণ আর পরিণামের দ্বন্দ্ব ভিন্ন আমাদের গতি নেই। 'অনুমানে শুরু সমাধা অনিশ্চয়ে'-র উপলব্ধির নয়, আপ্ততার বিরুদ্ধেই আমাদের অবস্থান। আর এই অবস্থানকেই আমি আরেক অর্থে বলি ইতিহাস।

শিশিরকুমার দাশ আমার বন্ধু এবং এই কৃতির আমি আগাগোড়া সাক্ষী। আমি জানি কী বিপুল পরিশ্রম তিনি করেছেন। সেইসঙ্গে এও জানি কী দ্রুত এই কর্ম তিনি সম্পাদন করেছেন। কিন্তু সেই পরিশ্রমের, সেই দ্রুততার দোহাই পাড়ছি না— বন্ধুতার কথা তো ওঠেই না। 'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস'-এর এই খণ্ডে তিনি যা করেছেন তা প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলা। এতে আখ্যানের পরিশিষ্টরূপে ভারতীয় সাহিত্যের সমন্বিত ইতিহাসের একটি খশড়া প্রস্তাব সংযুক্ত হয়েছে। প্রস্তাবটি রচিত হয়েছিল এই খণ্ডের কাজ শুরু করবার আগে— তাতে সম্পাদনকর্ম কীভাবে সাধিত হবে তার একটি বিবরণও আছে। মনে হয় না প্রস্তাবিত পদ্ধতি থেকে এ খণ্ডে কোনো বিচ্যুতি ঘটেছে, বরং ঘটেছে তার প্রসারই। প্রস্তাবে আরো নটি খণ্ডের কথা বলা হয়েছে। সব মিলিয়ে যা বিন্যাস দাঁড়াবে তা এইরকম: খ্রিস্টপূর্ব? ১৫০০/ ১২০০ থেকে ৪৭৭ (মৌখিক ঐতিহ্য: স্থিতি ও চঞ্চলতা), খ্রিস্টপূর্ব ৪৭৭ থেকে ৫৮ খ্রিস্টাব্দ (মৌখিক থেকে লিখিত

ঐতিহ্য) ৫৮ থেকে ৪৫০ খ্রিস্টাব্দ (ধ্রুপদী যুগ: কণিষ্ক থেকে কুমারগুপ্ত), ৪৫০ থেকে ৮৫০ খ্রিস্টাব্দ (রাজসভা ও মন্দির), ৮৫০ থেকে ১২৫০ খ্রিস্টাব্দ (নানাভাষার সম্মিলন), ১২৫০ থেকে ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দ (বৃহৎ ঐতিহ্য: ও ক্ষুদ্র ঐতিহ্য দ্বন্দ্ব এবং সমন্বয়), ১৬৪০ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ (প্রবাহ ও পরিবর্তন), ১৮০০ থেকে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ (পাশ্চাত্য) অভিঘাত : ভারতীয় প্রতিক্রিয়া) ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে অদ্যাবধি একটি খণ্ড এবং একটি স্বতন্ত্র, দশম খণ্ড লোকসাহিত্যের উপর। দশখণ্ড সংবলিত ভারতীয় সাহিত্যের সমন্বিত ইতিহাসের এই প্রস্তাব গ্রহণ করে সাহিত্য অকাদেমি আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এতদিন সাহিত্য অকাদেমির কাছ থেকে আমরা কেবল শুনেই এসেছি, নানাভাষায় রচিত হলেও ভারতীয় সাহিত্য এক, এবার তার প্রমাসাধন শুরু হল। এবং যিনি শুরু করলেন তিনি সমন্বিত ইতিহাসের প্রস্তাবক স্বয়ং— এর চাইতে ভালো সূচনা আর কী হতে পারত। তাই এই দায়িত্ব অর্পণের জন্যেও সাহিত্য অকাদেমিকে সাধুবাদ। শুনেছি এর পরবর্তী, অর্থাৎ নবম, খণ্ডেরও কর্মসম্পাদন করছেন শিশিরকুমার দাশ। আমাদের কাছের এই সময়ের ইতিহাস কী রূপ পরিগ্রহ করে আর তার কী আখ্যান রচনা করেন লেখক তা জানবার কৌতূহল আমাদের অপার। কারোর কারোর আমাদের একটি আখ্যান মনে-মনে আছেও, তাই কৌতূহল আরো অপার। বর্তমান তথ্যপঞ্জির বিস্তার ও সার্বিকতা স্মরণ করে এবং বর্তমান আখ্যানের স্বাদ মনে রেখে, আসুন, নিবন্ধপাঠক, আমরা শিশিরকুমার দাশকে অগ্রিম সাধুবাদ জানিয়ে রাখি।

Sisir Kumar Das, *A History of Indian Literature, Vol. VIII : 1800-1910--Western Impact : Indian Response,* New Delhi, 1991. Rs.400.00

অমিয় দেব

খেলার সাথি, বিদায়দ্বার খোলো—
এবার বিদায় দাও।
গেল যে খেলার বেলা।।
ডাকিল পথিকে দিকে বিদিকে,
ভাঙিল রে সুখমেলা।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি : শ্রীসুভাষ চৌধুরী

সা সা -রা -া সরা -গমা মা -া -া -া -া মা -াঃ -ধপঃ পা -া মা -গা -াঃ -মঃ
খে লা র্ ০ সা০ ০০ থি ০ ০ ০ ০ বি ০ ০০ দা য়্ দ্বা ০ ০ র্

রগা -রমা -া[গ] [র]সা সনা্ -া[প] ন্সা রা -া -া ন্সা -রগা -মমগা -ঃ [র]গঃ [র]সা না্ সা -া -া
খো০ ০০ ০ ০ লো০ ০ গেল যে ০ ০ খে০ ০০ ০০০ ০ ০ লার্ বে লা ০ ০

[র]জ্ঞা জ্ঞা -া জ্ঞা -া রজ্ঞমমজ্ঞা -রজ্ঞরসা[ন] সসা রা রা -পপপমা -ঃ [র]গঃ রসা সনা্ সা -া -া
খে লা র্ সা ০ থি০০০০ ০০০০ গেল যে খে ০০০০ ০ ০ লার্ বে০ লা ০ ০

মা মা মগা [র]গা সা সা -রা সরা -গমা মা -া -া মা -াঃ -ধপঃ পা -া -া[ম] মা -গাঃ -মঃ
বি দায়্ দা০ ও খে লা র্ সা০ ০০ থি ০ ০ বি ০ ০০ দা ০ য়্ দ্বা ০ র্

রগা -রমা -া[গ] [র]সা সনা্ -া[প] ন্সা রা -া ন্সরগা -মমগা -ঃ[র]গঃ [র]সা না্ সা -া -া [গ]রা -া মা মা
খো০ ০০ ০ ০ লো০ ০ গেল যে ০ খে০০০ ০০০ ০০ লার্ বে লা ০ ০ ডা ০ কি ল

মা পা -া -া মপা -া -া -া -া[র] রা -া রা মা পা মপা -ধধপা-মগা -রগা -রমা -া -মগরসা -ন্সা
প থি ০ ০ কে০ ০ ০ ০ ০ দি ০ কে বি দি কে০ ০০০ ০০ ০০ ০০ ০ ০০০০ ০০

[গ]রা -া মা মা পা মপধণা ধা -পা-া -া[র] রা -া রা মা পা মপা-ধধপা -মগা -রগা -রমা -া -গরা -সা
ডা ০ কি ল প থি০০০ কে ০ ০ ০ দি ০ কে বি দি কে০০০০ ০০ ০০ ০০ ০ ০০ ০

[রাঃ-গঃ]

{ সজ্ঞা -া জ্ঞা রা জ্ঞা -া রা জ্ঞা রজ্ঞা -মমজ্ঞা[র] রসা -া সা সা রা -া
ভাং ০ ঙি ল রে ০ সু খ মে০ ০০০ লা০ ০ গে ল যে ০

[গ]রা -া -পপমা -ঃ[র]গঃ রসা না্ সা -া -া } মা মা মগা[র]গা সা রা -া
খে ০ ০০০ ০ ০ লার্ বে লা ০ ০ বি দায়্ দা০ ও খে লা র্

সরা -গমা মা -া -া -া মা -াঃ -ধপঃ পা -াঃ -ধপঃ মগা -ঃমঃ রগা -রমা -া[গ-র]সা -সনা্ -া[প]
সা০ ০০ থি ০ ০ ০ বি ০ ০০ দা ০ ০য়্ দ্বা০ ০র্ খো০ ০০ ০ ০ লো ০

ন্‌া সা রা -া   সরা -গমা -মমগা ^র^গা রসা ন্‌া সা -া -া   ^র^জ্ঞা জ্ঞা -া জ্ঞা -া রজ্ঞমমা -জ্ঞঃ-রজ্ঞঃ
গে ল যে ০   খে০ ০০ ০০০ ০ লার্‌ বে লা ০ ০   খে লা র্‌ সা ০ থি০০০ ০ ০০

সসা রা   রা -পপপমা -ঃ^র^গঃ রসা সন্‌া সা -া -া   মা মা মাঃ -গঃ ^র^গা   সরা রা -া
গেল যে   খে ০০০০ ০ ০ লার্‌ বে০ লা ০ ০   বি দায়্‌ দা ০ ও   খে০ লা র্‌

সরা -গমা মা -া -া   মা -াঃ -ধপঃ পাঃ -ধঃ মা -গাঃ -মঃ   রগা -রমা -া^গ-র^সা সন্‌া -া -া^প^
সা০ ০০ থি ০ ০   বি ০ ০০ দা য়্‌ দ্বা ০ র্‌   খো০ ০০ ০ ০ লো ০ ০

ন্‌সা রা -া   ন্‌সরগা -মমগাঃ -ঃ^র^গঃ ^র^সা   ন্‌া সা -া -া II II
গেল যে ০   খে০০০ ০০০ ০ ০ লার্‌   বে লা ০ ০

'খেলার সাথি বিদায়দ্বার খোলো' গানটি সাহানাদেবীর কণ্ঠে ধৃত গ্রামোফোন রেকর্ড স্বরলিপি-প্রণয়নে আদর্শরূপে গৃহীত হয়েছে। ১৯৭৯ সালে এইচ. এম. ভি. রেকর্ড কোম্পানি অন্যান্য তিনটি রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে এই গানটি প্রচার করেন। রেকর্ড নম্বর ছিল 7 EPE 1084 । পরবর্তীকালে উক্ত গানটি PMLP1581-82 (ডবল অ্যালবাম) রেকর্ডে এবং STHV 24053-54 টুইন প্যাক ক্যাসেটে পুনঃপ্রচারিত।

১৯২৩ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতার ম্যাডান থিয়েটারে বসন্ত উৎসব মঞ্চস্থ হয়। ঐ অনুষ্ঠানে সংগীতাংশে অংশগ্রহণ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ সাহানাদেবীকে আহ্বান জানান। সাহানাদেবী একক কণ্ঠে 'ও আমার চাঁদের আলো' 'যদি তারে নাই চিনি গো' 'শুকনো পাতা কে যে ছড়ায়' 'খেলার সাথি বিদায়দ্বার খোলো' এবং 'যাওয়া-আসারই এই কি খেলা' গানগুলি গেয়েছিলেন। সাহানাদেবীর স্মৃতিতে : আমার মুখে নানা কাজওয়ালা হিন্দী গান শুনতে কবি খুব ভালোবাসতেন। আমিও প্রায়ই ওঁর কাছে গেলে এটা ওটা সেটা যা জানতাম গেয়ে শোনাতাম। অমনিতর দুটি হিন্দী গান সে সময় আমি গাই কবির কাছে বসে। শুনেই কবি বললেন, 'রোস, রোস, আমি বাংলাতে কথা বসিয়ে দিচ্ছি।' আমি গাইতে লাগলাম আর সঙ্গে সঙ্গে কবি কথা বসিয়ে যেতে লাগলেন। 'মহারাজা কেওয়ারিয়া খোল' (গানটি শিখি অতুলপ্রসাদের কাছে) ভেঙে করে দিলেন 'খেলার সাথী, বিদায়দ্বার খোল'... কি দ্রুত যে কবি এই কথা বসানো শেষ করলেন! শেষ হতেই আমাকে বললেন, 'এই দুটি গানও তোমাকে বসন্ত-উৎসবে গাইতে হবে, কেমন রাজী তো?' আমি খুশী হয়েই সম্মত হলাম।'

সাহানাদেবী মূল গানটির সন্ধান পান কনক দাস-এর কাছে। সাহানাদেবী অন্যত্র জানিয়েছিলেন 'গানটি আমি প্রথম শুনি কনকের (কনক দাস) কাছে। কনক শিখেছিল অতুলদার [অতুলপ্রসাদ সেন] কাছে। পরে আমিও অতুলদার কাছে শিখি। অতুলদার কাছে শিখে দেখি কনকের সঙ্গে হুবহু মিল আছে।' (দ্র. 'দেশ' ৯ মে ১৯৮৭) মূল গানটির যে পাঠ সাহানাদেবীর কণ্ঠে পাওয়া যায় :

মহারাজ, কেওয়ারিয়া খোলো
রসকী বুঁদ পড়ে।
বাদল গরজে, মেঘা বরষে
ছাই ঘটা ঘন ঘোর।।

গানটির অন্য একটি পাঠের সন্ধান মেলে শ্রীমতী গিরিজাদেবীর কণ্ঠে

মহারাজা, কেওয়াড়িয়া খোলো
রসকী বুঁদ পড়ি।
বাদর গরজে বিজয়ী তর্‌জে
ছাই ঘটা ঘন ঘোর।।

আর-একটি প্রচলিত পাঠে দেখতে পাই :

মহারাজা, কেওয়ারিয়া খোল
রসকী বুঁদ পড়ে।
বাদল গরজে, মেহা বরষে,
ছাই ঘনঘটা ঘোর।।

সুভাষ চৌধুরী

নিবেদন

শান্তিনিকেতনে বাইশে শ্রাবণে জীবনের জয়ঘোষণা উদ্‌গত হয় বৃক্ষরোপণ উৎসবে। এই দিনেই বিশ্বভারতী পত্রিকার পুনরুজ্জীবন আমাদের উদ্দিষ্ট। অর্ধশতাব্দী পূর্বে ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের বাইশে শ্রাবণেই এই পত্রিকার জন্ম রবীন্দ্রোত্তর সাময়িক পত্রসাহিত্যে 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' যে-ভূমিকা নিয়েছিল তার অবসান ঘটে প্রায় এক দশক আগে। কারণ নানা প্রতিবন্ধকতা। এই পত্রিকা পুন:প্রকাশের জন্য অনেকদিনের পরিকল্পনার পর প্রয়োজনীয় সম্পাদকীয় ও আর্থিক ব্যবস্থা এখন করা গেছে। প্রকাশনালয় গ্রন্থনবিভাগে এজন্য যা ব্যয় হবে তার দায়িত্ব বিশ্বভারতীর, সম্পাদকীয় নীতি স্বাধীনভাবে সম্পাদকীয় উপদেষ্টামণ্ডলী ও সম্পাদক নির্ধারণ করবেন।

নবপর্যায়ে এই পত্রিকা আমাদের কী দেবে, আর আমরা তাকে কী দিতে পারব? এই পত্রিকার জন্মলগ্নে প্রথম সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী আশা করেছিলেন : 'শান্তিনিকেতনে বিদ্যার নানা ক্ষেত্রে যাঁরা গবেষণা করছেন এবং শিল্পসৃষ্টির কার্যে যাঁরা নিযুক্ত আছেন, শান্তিনিকেতনের বাহিরে ও বিভিন্ন স্থানে যেসকল জ্ঞানব্রতী সেই একই লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁদের সকলেরই শ্রেষ্ঠ রচনা এই পত্রে একত্র সমাহৃত হবে।' এই মহৎ অভিপ্রায় যেমন অতীতে পরিপূরিত হয়েছিল, আশা করি, তেমনই ঘটবে বিশ্বভারতী পত্রিকার নবপর্যায়ে।

৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০১

সব্যসাচী ভট্টাচার্য
উপাচার্য

সম্পাদকীয়

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর প্রত্যয়কে যদি এ যুগের দার্শনিক পরিভাষায় 'প্রকল্প' বলি, তা হলে সেই প্রকল্পের কেন্দ্রবিন্দু থেকে এই সময়কে প্রদক্ষিণের একটি কর্মসূচি নিয়েছে এই পত্রিকা। নিয়েছে নম্রভাবে। কারণ সে জানে, তার সাধ্য কতটুকু!

রাণু অধিকারীকে রবীন্দ্রনাথ যেসব চিঠিপত্র লেখেন, তার সংকলন 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' তো পাঠকমহলে সুপরিচিত। তাঁদের দুজনের অপ্রকাশিত চিঠির আর-একটি সংকলন বিশ্বভারতীর গ্রন্থনবিভাগ প্রকাশ করবেন।- সেই পত্রগুচ্ছ থেকে কয়েকটি বেছে নিয়ে এই সংখ্যায় ছাপা হল। 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'র সঙ্গে এই পত্রগুচ্ছের একটি বড়ো মিল এইখানে যে এই পত্রধারাতেও বয়ে চলেছে, 'শান্তিনিকেতনের জীবনযাত্রার চলচ্ছবি'।

নন্দদুলাল দে ছিলেন বিশ্বভারতীর ফরাসি ভাষার বিদগ্ধ অধ্যাপক। মাদাম সিল্‌ভ্যাঁ-লেভির ডায়েরি তিনি বাঙলায় তরজমা করেছেন দীর্ঘকালীন নিষ্ঠায়। তাঁর সেই তরজমা থেকে দুটি অধ্যায় আমরা বেছে নিলাম। পাঠক এই দিনপঞ্জিতে পেয়ে যাবেন বিশ্বভারতীর সূচনাপর্বের একটি দলিলছবি, সেই দীপ্ত দিনগুলির আবহাওয়া।

তপোব্রত ঘোষ 'রক্তকরবী'র অন্তর্লোকে প্রবেশের একটি নতুন চাবির খোঁজ করেছেন : পুরাণ আর আর্কেটাইপের চাবি। কাকে বলে এই আর্কেটাইপ? প্রত্যেক মানুষের অচেতন মনের যেটা বহিস্তল, সেটা হল : ব্যক্তিগত নির্জ্ঞান। আর এই ব্যক্তিক অচেতনের গাঢ়তম পাতালে যে আদিম গূঢ় প্রবল সক্রিয় স্তর তারই নাম মনোবিজ্ঞানী য়ুং দিয়েছেন যৌথ নির্জ্ঞান (কলেকটিভ আনকনশাস)। বিস্মৃত বা অবদমিত বাসনার নিছক ব্যক্তিগত ভাঁড়ার নয় এই যৌথ নির্জ্ঞান। য়ুং-এর মতে. অচেতনের এই স্তর সর্বজনীন সনাতন ধারাবাহিক। আর, সমস্ত আর্কেটাইপ হচ্ছে যৌথ নির্জ্ঞানের এই 'বিরতিহীন প্রবাহে বা মহাসাগরে' ভাসমান মৌল মূর্তি। অর্থাৎ, যে-স্মৃতিলোক তপোব্রতর পরিক্রমার লক্ষ্য, তা ব্যক্তিগত নয়; সমষ্টিগত।

এক বিশাল— হয়তো দুঃসাহসিক— পরিধি নিয়ে অরুণ নাগের প্রবন্ধ : নীতিগল্প রূপকথা ননসেন্স বা নিরর্থকাহিনী থেকে বাত্তেল্লা পর্যন্ত সমস্ত ধরণের অবাস্তব গল্প।

আলোচনার সূত্রে আখ্যায়িকা, ধাঁধা, উপমা-উৎপ্রেক্ষা এসেছে; এসে পড়েছে গ্রটেস্ক বা কিমাকার। এই অবাস্তব গল্পের অর্থে, কোনো কোনো আলংকারিকের মতন, অরুণও 'কথা' এই অভিধাটি ব্যবহার করেছেন। তবে, জানিয়ে দিয়েছেন : 'যে "কথা"-র কথা আমরা বলছি, তা মূলত লৌকিক।' তিনি খুঁজেছেন এই লৌকিক 'কথা'র নিহিত যুক্তিস্তর ; খুঁজেছেন তার সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক শিকড় এবং তাৎপর্য। আশা করছি, এই প্রবন্ধটি আমাদের পাঠকদের মনে উশকে দেবে নানান নতুন ভাবনা।

অরুণ নাগের আলোচ্য বিষয় লৌকিক ঐতিহ্যের একটি বিশেষ ধারা। আর সুধীর চক্রবর্তী সমীক্ষণ করছেন লৌকিক ধর্মের একটি বিশেষ জগৎ; যে-জগৎ গড়ে ওঠে কুবির গোঁসাই নামে এক অসামান্য কবির গানের উপাদান দিয়ে।

বিশ্বভারতী-প্রকল্পের একটি দিক যেমন আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির প্রাণবীজের প্রকর্ষণ ; অন্যদিক তেমন দেশজ ঐতিহ্যের সৃষ্টিশীল চর্চা। কিন্তু দেশের ঐতিহ্য তো একটি নয় ; অনেক। সুতরাং দেশের এই নানান ঐতিহ্যের বিচার আর বাছাইয়ের দরকার আছে। এখানে 'বিচার' কথাটা ইংরেজি 'ক্রিটিক' (*critique)* অর্থে ব্যবহার করছি। এই সময়ের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নতুন পরিপ্রেক্ষিত খোঁজার গরজে ওই বিচার খুবই জরুরি হয়ে উঠল আজ।

নৃতত্ত্বের দৃষ্টিতে ধর্মকে যদি সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে দেখি, তা হলে দেশের এই বহুতর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে দুটি প্রধান ধারায় ভাগ করে নিতে পারি : এক. শাস্ত্রীয় ধর্ম / সংস্কৃতির ধারা। দুই. অশাস্ত্রীয় ধর্ম / সংস্কৃতির ধারা। প্রথমটিকে উঁচুতলার আর দ্বিতীয়টিকে নিচুতলার ধর্ম / সংস্কৃতি বলতে পারি। সুধীর চক্রবর্তীর লেখায় আমরা পেয়ে যাচ্ছি : এক. অশাস্ত্রীয় ধর্ম / সংস্কৃতির আলোয় শাস্ত্রীয় ধর্ম / সংস্কৃতির বিচার। এইটে নিশ্চয় কুবিরেরই গুণপনা যে সেই বিচারের প্রক্রিয়ায় তর্ক হয়ে উঠছে গান।

আবার শাস্ত্রীয় ধর্মের চৌহদ্দির মধ্যে থেকেই তার আরেক ধরনের বিচারও সম্ভব। যেমন বিচার করেছিলেন মওলানা আবুল কালাম আজ়াদ তাঁর কোরানের ভাষ্যে। আমাদের খুবই ইচ্ছে ছিল, এই সংখ্যাতেই কুবিরের বিচারের পাশাপাশি আজাদের সেই বিচারধারাও পাঠকের সামনে পেশ করার। পারি নি। আশা করি, আজ়াদের 'তরজমানুল কোরান'-এর ধারাবাহিক অনুবাদ হয়তো আগামী কোনো সংখ্যা থেকে এই ত্রৈমাসিকের পাতায় পরিবেশন করতে পারব।

যে-জাতিসত্তার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে এই সময়ের সংকট বিস্ফোরণের মূর্তি নিল, ঝাড়খণ্ড আন্দোলন তারই এক বিশেষ রূপ। এই আন্দোলনের মূলে আছে আদিবাসী সমাজের সমস্যা। সেই সমস্যাকে বিনয় চৌধুরী দেখছেন ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে। ফলে, তাঁর আলোচনা হয়ে ওঠে, একদিকে, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সংলাপ; অন্যদিকে, ইতিহাস আর নৃতত্ত্বের সংযোগবিন্দু।

'ভারতের আদিবাসী সমাজকে বোঝার... পদ্ধতি সম্পর্কে', তাঁর এই বিচারবিশ্লেষণ ধাপে ধাপে এগিয়েছে যুক্তিতথ্যের স্পষ্ট পথ ধরে। তবে, এই বিশ্লেষণের কেন্দ্রগত । প্রশ্নটি হয়তো এই : সাঁওতাল ওরাওঁ মুণ্ডা হো ইত্যাদি জনগোষ্ঠীকে 'ট্রাইব' হিসেবে দেখা কি সংগত? প্রশ্নটি আদতে তুলেছেন নৃতত্ত্ববিদ্ দেভাইয়ে। তিনি মনে করেন, ট্রাইব হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের নিজের গরজে বানানো একটা মনগড়া ধারণা, যার জের এখনো টেনে চলেছে স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রের প্রশাসন। বস্তুত, দেভাইয়ের বইকে ঘিরেই ক্রমপ্রসারিত হয়েছে বিনয়ের আলোচনা।

আসলে দেভাইয়ে-প্রমুখ সাম্প্রতিক নৃতত্ত্ববিদের ভাবনার পিছনে একটি বড়ো পটভূমি আছে : একালে আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞানে এক মন্থনের পটভূমি। এই আলোড়নের একটি তীক্ষ্ণ রূপ দেখতে পাই আফ্রিকার ইবাদান স্কুল অব হিস্টরি-র বিচারধারায়। তাঁদের বিশ্বাস, পশ্চিমী সমাজবিজ্ঞানের পরিভাষা পদ্ধতি আর বয়ান আফ্রিকার ক্ষেত্রে অবান্তর। এই সমাজবিজ্ঞানকে তাঁরা প্রত্যাখ্যান করছেন, সাম্রাজ্যশক্তির প্রভুত্ববিস্তারের স্বার্থে গজিয়ে-ওঠা মেকি-বিজ্ঞান হিসেবে।

কথাটা তো এক হিসেবে সত্যি যে পশ্চিমের ছকে আমাদের সমাজ আর সংস্কৃতিকে ঠিক বোঝা যায় না। এদিক দিয়ে নতুন ভাবনার বীজ আমরা তো পেয়ে যাচ্ছি রবীন্দ্রনাথেরই লেখায়। পশ্চিমের ইতিহাসের প্রতিতুলনায় কত আগে তিনি লেখেন : 'ভারতবর্ষের ইতিহাস ঠিক রাষ্ট্রীয় ইতিহাস

নহে।' ইবাদান স্কুল অব হিস্টরি বলছেন : প্রাক্-ঔপনিবেশিক আফ্রিকার ইতিহাস নেই, এ কথা অমূলক। যা নেই, তা হল ইয়োরোপের আদলের ইতিহাস। ইংরেজ সমাজবিজ্ঞানীরা 'শুধুমাত্র লিখিত উপকরণকেই নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন। অন্য ধরণের সম্ভাব্য ব্যবহারযোগ্য উপকরণ সম্পর্কে [তাঁরা] ভাবেনই নি। যেমন, মানুষের মুখে মুখে চলে-আসা অতীত ইতিহাসের অব্যাহত স্মৃতি।' অনেকটা এই ধরণের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেন ১৯০৫ সালে : '... যে ইতিহাস আমাদের দেশের জনপ্রবাহকে অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে, যাহার নানা লক্ষণ নানা স্মৃতি আমাদের ঘরে বাহিরে নানা স্থানে প্রত্যক্ষ হইয়া আছে, তাহা আমরা আলোচনা করি না বলিয়া ইতিহাস যে কী জিনিস তাহার উজ্জ্বল ধারণা আমাদের হইতেই পারে না।' যাঁরা রবীন্দ্রনাথের এই ইতিহাসভাবনার শরিক ছিলেন, দীনেশচন্দ্র সেন তাঁদের একজন। ইংরেজ ঐতিহাসিকদের রাজবৃত্তের মডেল খারিজ করে দিয়ে তিনি লিখলেন অন্য ধরণের ইতিহাস। সে বইয়ের নাম : 'বৃহৎ বঙ্গ'।

বিনয় চৌধুরী যে-প্রতিপাদ্য পেশ করলেন তা খুবই গুরুত্বময়। এই নিয়ে আরো আলোচনা হওয়া জরুরি। বিশ্বভারতী পত্রিকায় এই বিচার-বিশ্লেষণে যোগ দিতে সমাজবিজ্ঞানীদের সনির্বন্ধ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমরা।

শুধু বিনয় চৌধুরীর প্রবন্ধ নিয়েই নয়, তপোব্রত ঘোষ, অরুণ নাগ, সুধীর চক্রবর্তী, গৌতম ভদ্র, ভবতোষ দত্ত, অমিয় দেবের মূল্যবান বক্তব্য নিয়েও আমরা পাঠকসমাজের মতামত, প্রতিক্রিয়া, বিশেষভাবে প্রার্থনা করছি।

আমরা চাই : বিশ্বভারতী পত্রিকায় লেখক পাঠক আর সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের মধ্যে এই কথাবার্তা শুরু হোক। এই উদ্দেশ্যে 'সংলাপ' নামে একটি নতুন বিভাগ খোলা হচ্ছে দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে।

বিশ্বভারতী পত্রিকা।। ত্রৈমাসিক

নিয়মাবলী

* শ্রাবণ থেকে বর্ষ আরম্ভ হয়
* প্রতি সংখ্যার মূল্য ২০.০০টাকা
বার্ষিক চাঁদা সডাক ৮০.০০ টাকা
যে-কোনো সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়
টাকাকড়ি ইত্যাদি মনি অর্ডার অথবা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট-এ পাঠানো যায়। Publishing Department :
Visva-Bharati University নামে পাঠাতে হবে, ঠিকানা :
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭

।। বিশ্বভারতী পত্রিকা।।

ত্রৈমাসিক পত্রিকা।। শ্রাবণ থেকে বর্ষ আরম্ভ।। বৎসরে চারটি সংখ্যা।। ৩১ বর্ষ থেকে মূল্য ২০.০০টাকা

পুরাতন সংখ্যা			প্রতিটির মূল্য
২৪	বর্ষ	১/২/৩	১.০০
২৫	বর্ষ	১/২	১.৫০
২৬	বর্ষ	২/৪	১.৫০
২৭	বর্ষ	১/২/৪	১.৫০
২৮	বর্ষ	১/২/৩/৪	১.৫০
২৯	বর্ষ	১/৪	৩.০০
৩০	বর্ষ	১/২	৫.০০
,,	,,	(৩-৪ একত্রে)	১০.০০
,,	,,	বিশেষ সংখ্যা (মাঘ-আষাঢ় ১৩৯২-৯৩)	১০.০০

বিশ্বভারতী পত্রিকা

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১. প্রকাশ স্থান : ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা ১৭

২. প্রকাশের সময়—ব্যবধান : ত্রৈমাসিক

৩. মুদ্রক : শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায় (ভারতীয়) ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭

৪. প্রকাশক : শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায় (ভারতীয়) ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭

৫. সম্পাদক : শ্রীপ্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য (ভারতীয়) ২এফ হাজরাবাগান লেন। কলিকাতা ১৫

৬. স্বত্বাধিকারী :

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

পোঃ শান্তিনিকেতন বীরভূম

পশ্চিমবঙ্গ

আমি শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায় এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উল্লিখিত তথ্য আমার বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য।

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাঠান্তর সংবলিত সংস্করণ

সম্পাদনা : শ্রীপ্রণয়কুমার কুণ্ডু

যোগাযোগ

নাটক

সংকলন ও সম্পাদনা : শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক

রবীন্দ্র-রচনাবলী ॥ অষ্টাবিংশ খণ্ড

●

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রজীবনী ॥ চতুর্থ খণ্ড। নূতন সংস্করণ

মুকুল দে

আমার কথা

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭

নবপর্যায় ২
কার্তিক-পৌষ ১৪০১
বিশ্বভারতী পত্রিকা
সম্পাদক
প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য

বিশ্বভারতী পত্রিকা

নবপর্যায় ২

কার্তিক-পৌষ ১৪০১

বিশ্বভারতী পত্রিকা নবপর্যায় ২ : কার্তিক-পৌষ ১৪০১

সম্পাদক প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য ০ সহকারী সম্পাদক সুবিমল লাহিড়ী

সূচিপত্র

চিত্রসূচি : স্কেচ

[দুই নারী]

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

[ক্লাসঘর]

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

বিশ্বভারতী পত্রিকা

নবপর্যায় ২ । কার্তিক-পৌষ ১৪০১

পুরোনো দিনের স্মৃতি

আলেক্স আরন্‌সন

১৯৪৭ সালে যখন জেরুজালেমের মতো সেকালের এক আঞ্চলিক শহর থেকে সমতলের মহানগরী তেল আবিবে এসে পৌঁছলাম, নিশ্চয় তখন বেশ পুরোনো ধাঁচেরই মাস্টারমশাই ছিলাম আমি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় নি তখনো। ইস্কুলে পড়াতে হবে, এই ভাবনাটাই একটা ব্যর্থতা আর অপূর্ণতার বোধে তখন ভরে রেখেছিল আমাকে। ক্লাসঘরের সসম্ভ্রম নীরবতায় অভ্যস্ত ছিলাম, তাই কচিকাচাদের হৈ-হট্টগোলের মুখোমুখি হতে হবে ভেবে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম বেশ।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতেই হাইস্কুলের এক শিক্ষকপদের জন্য দরখাস্ত পাঠিয়েছিলাম। কম্পিউটার বা দূরদর্শনের সাহায্য নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু হবার অনেক আগেকার দিনের কথা এসব। নিজের পদ্ধতি আমার নিজেকেই গড়ে নিতে হয়েছিল সেদিন। নিজের ইস্কুল-জীবনের স্মৃতি, তার সঙ্গে ব্যাকরণ-অন্বয়ের বাঁধাধরা পড়াশোনা বিষয়ে আমার বিতৃষ্ণা আর এই বিশ্বাস যে সাহিত্যপাঠের মধ্য দিয়েই স্বতঃস্ফূর্তভাবে আয়ত্ত হতে পারে ভাষার উপরে কারও দখল, এরই উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল আমার পদ্ধতি।

ক্লাস-পড়ানোর মধ্যে আমার এই আদর্শ কল্পনাকে বাস্তবিক রূপ দেওয়া, সে যেন নির্মম দর্শকদের সামনে চোখবাঁধা অবস্থায় দড়ির উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার মতো। কবিতার শুধুমাত্র ধ্বনিমাধুর্যের উপর ভর করে বিদেশী ভাষায় কোনো কবিতা পড়ানো এক পণ্ডশ্রম। আবার, সেকালের রাজনৈতিক ডামাডোলটাও ছিল আমার একেবারে প্রতিপক্ষ।

সামনে ছিল The Second Coming কবিতাটি। ১৯১৯ সালে লিখেছিলেন ইয়েটস : 'The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere / The ceremony of innocence is drowned'। ১৯৪৭ সালে, এই 'innocence'-এর সমস্ত সম্ভাব্য পথই শেষ হয়ে গিয়েছে। ওই পুনরাবির্ভাবের আগেকার যে 'passionate intensity', টিঁকে থাকবার পক্ষে একমাত্র পথ বাকি ছিল সেইটে। ভয়ংকর সন্ত্রাস যখন দোষী-নির্দোষ নির্বিশেষে সবাইকে একইভাবে হত্যা করে চলেছে, কোনো কবিতাই কারও কাছে তখন বোধগম্য হতে পারে না আর, যত প্রগাঢ়ই তা হোক-না কেন।

পুরোনো ইতিহাস বা সমকালীন ইতিহাস, দুইই ছিল কবিতার প্রতি বিমুখ। ব্রিটিশরা তখনও দখল করে আছে দেশ, আর আরবরা সেজে উঠছে যুদ্ধসাজে। যেন কোনো বিশেষ সমাজ বা সময়ের সঙ্গে বাঁধা নয় কবিতা, এমন একটা রাজনৈতিক শূন্যতার মধ্যে পড়াতে হবে ইংরেজি কবিতা। একটা সামাজিক নাস্তিত্বের মধ্যে যেন ব্যাখ্যা করতে হবে তার। মুদ্রিত লেখার উপর ছায়া ফেলে যাচ্ছে অবলীয়মান সাম্রাজ্যবাদ। ইতিহাস থেকে কোনো ত্রাণ নেই, তবু কবিতাগুলির পটভূমি বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উঠলে তো উত্তর দিতে হবে তার। ক্রমেই আমি তাই জড়িয়ে পড়ছিলাম— অন্য কোনো যোগ্য শব্দের অভাবে বলা যাক— সাহিত্যের এক রাজনীতিকরণে। সাহিত্যিক উৎকর্ষ আর রাজনৈতিক হট্টগোলের মধ্যে অর্থবহ কোনো স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করা বাস্তবিকই খুব শক্ত হয়ে উঠছিল।

কলেজের মাস্টারমশাই হিসেবে ঠিক একইরকমের সমস্যা আমার হয়েছিল ভারতে থাকবার সময়ে।

সমাধানের জন্য সাহিত্যিক বা রাজনৈতিক কোনো পদ্ধতিরই আশ্রয় নিই নি তখন। সাহিত্যিক বা রাজনৈতিক মানদণ্ডের চেয়ে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে অনেক বেশি গুরুত্বময় ছিল মানবিক বোধ। কবিতা যদি মানবিক দিক থেকেই পড়ানো যায়, আর যদি এমন হয় যে শিক্ষক তাকে আয়ত্ত করেছেন একেবারে নিজের মতো করে, রাজনৈতিক সংস্কার বা সাহিত্যিক সমালোচনার চেয়ে অনেক গভীরতর তাৎপর্য তাতে সঞ্চারিত হতে পারে।

এটা অবশ্য সে-সময়েই বেশ পুরোনো ধরন বলে গণ্য হচ্ছে। তাৎপর্য-বিশ্লেষণের বা মানবিচারের যেসব নতুন নতুন পথ তৈরি হচ্ছিল তখন, কোনো রচনার শব্দার্থগত নির্ণয়, ফর্মালিজম বা স্ট্রাকচারালিজম, লিটারেরি ডাইনামিক্স হিসেবে শিগগিরই পরিচয় হবে যেসব সাহিত্যতত্ত্বের, সেসব ব্যাপারে দিব্যি অজ্ঞ ছিলাম আমি।

তেল আবিবের উপর মিশরদেশের প্রথম বোমাটা যখন পড়ছে, আমি তখন ওয়ার্ডসওয়ার্থের Tintern Abbey-র ঠিক মাঝখানে। 'The still sad music of humanity'-র বিষয়ে তাঁর গভীর ভাবনার কোনো মানেই হল না আমার ছাত্রদের কাছে, তারা তখন বিমান-আক্রমণের বিপদসংকেত শুনে নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে ছুটছে, ভুলে থাকবার জন্য চড়া গলায় জনপ্রিয় গানগুলি গাইছে, মাথার উপরকার যুদ্ধশব্দ ডুবে যাচ্ছে তাদের চিৎকারে।

বোমাবর্ষণ শেষ হল যখন, ছতলার ক্লাসঘরে আমরা উঠে গেলাম আবার। বিপদমুক্তির ঘোষণা হচ্ছে সাইরেনে, আর সেই বেখাপ্পা পরিবেশে আমার ছাত্ররা পরম অবিশ্বাসভরে পড়ছে ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'tranquil restoration'-এর কথা। পৃথিবী আবার বোধগম্য হয়ে এল, মীমাংসা হয়ে গেছে সব রহস্যের, মত্ত উল্লাস বা শান্ত অনুধ্যান কোনোটারই সুযোগ দেয় নি বোমাবর্ষণের যে 'heavy and the weary weight', স্বভাবতই তাতে সাড়া দিতে পারে নি আমার ছাত্ররা। ওই-দুই বিপরীত প্রান্তের মধ্যে, রাজনৈতিক ধূর্ততা আর মূর্খতায় বা আক্রমণ-প্রতিআক্রমণের মত্ততায় তৈরি হয়ে উঠেছে এক মানসিক শূন্যতা।

অতীতে যেটুকু বা প্রত্যয় ছিল, তার জায়গায় এখন আমার ছাত্রদের মনে তৈরি হল এক নিষ্ঠুর অবিশ্বাস। যে-কোনো জিনিসের যে-কোনো মানুষের ব্যাপারে তাদের এমন এক কেজো দৃষ্টিভঙ্গি এল যে সহানুভূতি জাগাবার সমস্ত চেষ্টাই হয়ে গেল নাকচ। কথাটা তাদের শিক্ষকদের বিষয়েও প্রযোজ্য, যদিও সমস্ত প্রতিরোধের মুখেও তাঁরা কবিতাপাঠের মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েদের কাছে পৌঁছে দিতে চাইছিলেন এক 'ceremony of innocence'। নিজেদের নৈতিক কোনো সমর্থন না থাকলেও সংঘর্ষরত দু-পক্ষের নানারকম হিংস্রতার মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হচ্ছিল ছাত্রদের। এই 'passionate intensity'-র পাল্টা পথ হিসেবে দরকার ছিল 'ceremony of innocence'-এর। টিঁকে থাকাটাই তখন একমাত্র কথা।

আমার ছাত্রদের অনেকেরই জন্ম হয়েছে এই তাণ্ডবের মধ্যে, তাদের বোধের অতীত এক অর্থহীন ইতিহাসের বলি তারা। কীভাবে তাদের সাহায্য করব এই ভয়ংকরের মোকাবিলা করতে, আমি নিজেই যখন পেরে উঠছি না তা ? জন্ম তাদের এই দেশেই, তারা ভাবছিল প্রকৃতির দান হিসেবেই তারা পেয়ে যাবে মুক্ত আর স্বাধীন এক জীবন, আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার আর আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে অর্জিত তাদের নিজেদের দেশের ভাবী কাজের জন্য তৈরি করে তুলবে নিজেদের। ইজরায়েলের এইসব অল্পবয়সীদের মাঝখানে আমাকে নিশ্চয় মনে হত কোনো ভিন্নজাগতিক প্রেত।

কখনো কখনো তারা আমাকে আমার ভারতবাসের গল্প শোনাতে বলত। বাঁদর আর সাপের গল্প বলবার, হিমালয়ের গুহায় সাধুসন্ন্যাসী বা কলকাতা শহরে বস্তির গল্প বলবার এই ছিল এক স্বর্ণসুযোগ। বিমান-আক্রমণ আর অন্যান্য রাজনৈতিক বিদ্বেষের চাপ খুলে দিয়ে খানিকটা হালকা আবহাওয়া তৈরি করতে পারত ওইসব গল্প। ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'still sad music of humanity' যেন শোনা যেত আবার, যদিও, খুব আশ্চর্যের নয় যে ভারতেও তখন নানারকমের বিপর্যয় দেখা দিচ্ছে, এখানকার মতোই দোষী-নির্দোষ নির্বিশেষে সবাইকে তীব্রভাবে লড়তে হচ্ছে ওখানেও।

ভারতীয় জীবনযাপন বিষয়ে আমার ওই আবছা কথাবার্তা কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত মনে রেখেছিল আমার

কৃতজ্ঞ শ্রোতারা। বহুদিন পরে যখন পুরোনো ছাত্রদের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত পথে, তাদের কেউ কেউ চোখে স্মিত এক অতীতমায়া নিয়ে সেসব ভারতীয় গল্পের কথা মনে করিয়ে দিত আমাকে। ইস্কুলের মাস্টারমশাই হিসেবে এই পাওয়াটাই ছিল ওয়ার্ডসওয়ার্থের সেই বিশ্বাসের সবচেয়ে কাছাকাছি যে 'all which we behold / Is full of blessings'।

তা হলেও, কখনো কখনো আমার মনে পড়ত গ্রিক পুরাণের প্রমিথিউসের কথা, অগ্নি-অপহারক আর আলোক-বাহক হিসেবে অবোধ মানুষদের মধ্যে তার অভিযানের কথা। আজ বুঝতে পারি, এ ছিল শুধু দম্ভ মাত্র, শিক্ষক হিসেবে সাফল্যের কোনো ভরসা না থাকবার এক অচেতন প্রতিক্রিয়া। এখন অবশ্য, এতদিনে, যেসব বই আমি পড়াই তা বুঝবার মতো আলো আর আগুন বিলোতে বিলোতে জ্ঞান আর প্রেরণা সঞ্চার করবার কাজটা নিছক মানুষেরই মতো করতে পারি আমি।

পৌরাণিক প্রমিথিউসকে নতুন করে গড়ে তুলেছিলাম আমার মানসচোখে। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে সে, শাস্তি পাচ্ছে সেই বিদ্রোহের ; অর্ধেক মানুষ আর অর্ধেক দেবতা, প্রতি রাত্রে নতুন করে বিক্ষত হয় সে : নিজের দুর্বলতায় সে ভোগ করে আবদ্ধতার যন্ত্রণা ; একইসঙ্গে সে নষ্টকারী আর মুক্তিদায়ী, অজ্ঞান মানুষকে সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে পাপ করতে শিখিয়েছে সে।

কেননা, পুরাণ বলছে, কুটিল ভাবনার এক সত্তা হল প্রমিথিউস। আর তাই, তার তস্করতায় ক্রুদ্ধ জিউস বানিয়ে তুললেন প্যান্ডোরা নামের এক সুন্দরী, প্রমিথিউসের কাছে ভেট পাঠালেন তাকে। আর প্রমিথিউস তাকে গড়ে তুলল আদিতমা নারীর আদল হিসেব। পুরাণকথা অনুসারে, এ নারী এক অপ্রতিরোধ্য প্রলোভন। বাসনা জাগিয়ে তোলাই তার একমাত্র কাজ। এই মোহময়ীর হাতে বিশাল এক পাত্র (চমৎকার ফ্রয়েডীয় প্রতীক), তার ঢাকনা খুলে ভিতরকার সব নশ্বর অমঙ্গলকে মুক্ত করে দেয় সে, মারী জরা রোগ শ্রম পাপ বাসনা। পাত্রটিতে অবরুদ্ধ থাকে শুধু আশা। পুরাণ বলছে, মানুষের যত অদম্য লালসা, সভ্যতার অনুকূল সমস্ত নীতিকে টপকে যাবার জন্য তার তীব্র যত আবেগ, আর শেষ পর্যন্ত তার অতৃপ্তি আর যন্ত্রণা, সব-কিছুরই উৎস হচ্ছে ওই।

এই পুরাণকথা হয়ে রইল আত্মপ্রবঞ্চনার বিষয়ে অজ্ঞানতার অন্ধকারে একটা অবচেতন অভিক্ষেপ। আমার দিক থেকে দেখতে গেলে, এ হল আমার কবিতা-পড়ানোর ব্যাপারে অজানা কিন্তু প্রার্থনীয় এক অনুপ্রবেশ। কেননা পুরাণ অনুযায়ী, বাসনার আগুনে পুড়ে যায় সমস্ত আকাঙ্ক্ষা। অবশিষ্ট ছাইগুলি ফিরে আসে মাটিতে আর প্রমিথিউস আরও একবার প্রতিপন্ন করে তার দুর্বলতা। আমার প্রমিথীয় সাজে আমি লক্ষ করলাম যে শুশ্রূষা পেয়ে পেয়ে সাধারণ বনে-যাবার চেয়ে বার বার আহত হওয়াই বরং ভালো। প্যান্ডোরাকে স্বাগত জানালাম আমি, ভাগ্যের খেলায় সঁপে দিলাম আমার আবেগের সমস্ত শক্তি, আমার দাম্ভিক মূর্খতাকে বুঝে নেবার যন্ত্রণায় যে-ভাগ্যের কাছে শেষ পর্যন্ত হারতেও পারতাম আমি। এসব লিখছি আজ পঞ্চাশ বছর পরে, আগেকার চেয়ে যখন জ্ঞান একটু বেড়েছে আমার, আগেকার চেয়ে একটু কম আত্মপ্রশ্রয়ী যখন।

কাজে লেগেছিল শেক্সপীয়রের সনেটগুলি। ওর মধ্যে কয়েকটা সনেট নিয়ে আলোচনা করব বলে ছাত্রদের ডেকেছিলাম আমার ঘরে। সজাগ যাদের চেতনা, তারা এল ; কিছুটা তাদের কৌতূহল ছিল তাদের মাস্টারমশাইকে আরেকটু যাচাই করে নেওয়া, আর ইচ্ছে ছিল শেক্সপীয়রের মনের উভবলিতাকে বুঝে নেওয়া। সন্ধ্যায় তারা এল, ঘিরে বসল আমাকে, কথাবার্তা শুনল, জিজ্ঞাসাবাদ করল, ভাববার চেষ্টা করল কী মানে করা যায় কুড়ি নম্বর এই সনেটের যে 'A woman's face with Nature's own hand painted/Hast thou the master-mistress of my passion ...'? উনত্রিশ নম্বর সনেটটি থেকেই-বা কবির কোন্ জীবনকথা আবিস্কার করা যায়, যেখানে শেক্সপীয়র 'beweeps [his] outcast state', যেখানে তিনি অর্জন করতে চাইছেন 'this man's art, and that man's scope'? অন্য যে-কোনো কবির চেয়ে ভালোভাবে যিনি বুঝেছিলেন যে 'Lilies that fester smell far worse than weeds', তাঁকে যে দ্ব্যর্থহীনভাবেই আচ্ছন্ন করেছিল শারীরিক এক প্রলোভন : কী-বা তার মানে ?

তা হলে, এইখানে এসে আমি দাঁড়িয়েছি আমার মুক্ত প্রমিথিউসের ভূমিকা নিয়ে। আমাদের চলতি শিক্ষাবিধিতে দেবদূতেরাও যেখানে যেতে ভয় পান, আমি চাইছি সেই বোধের দুয়ার খুলে দিতে, চেতনার আবরণ মুক্ত করে দিতে। শেক্সপীয়রের সনেট পড়াবার কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে আমার তরুণ ছাত্রদের মনে, সে-বিষয়ে কখনোই ঠিক নিশ্চিত ছিলাম না আমি। রাজনৈতিক ঘটনাবর্তে তাদের অনেকেরই হৃদয়মন কঠোর হয়ে গিয়েছিল। সেসব সংশয়ী মনের কাছে আত্মসর্বস্ব বলে প্রতিভাত হতে পারে শেক্সপীয়রের সনেট। প্রশ্ন তুলল তারা, ওর মধ্যে কোনো ইচ্ছাকৃত দ্ব্যর্থকতা আছে কি না, আর সে-প্রশ্নের ঠিক-ঠিক মীমাংসা হল না কোনো। অনেক তরুণ মনে কল্পনা তখনও পরিণতির দৃঢ় সোপান বেয়ে ওঠে নি। শিল্পের বিমল শুদ্ধতার দিকে কবিতার উড়াল দেখে কিংবা লেলিহান ওই যন্ত্রণার ছবি দেখে একেবারে হতভম্ব হয়ে রইল তারা।

মানবসম্পর্কের ভিতরকার নিহিত গহ্বরগুলিকে এত ভালো যিনি জানেন, আর জেনেও যিনি তার একটা সুপরিণামের আশায় ছুটতে ছুটতে এমন হতাশায় ডুবে যান, কেমন লোক তিনি তবে? যাঁকে লক্ষ করে তাঁর এই সনেটগুলি, তিনি নিজে তো থেকে যান 'unmoved, cold and to temptation slow'। সফল হল না বলে যে প্রেম রয়ে গেল অমূর্ত, কবিতালেখা ব্যাপারটা সেই প্রেমের যেন এক বিকল্প মাত্র।

অনেক রাতে ফিরে যায় আমার বিশ্বস্ত ছাত্ররা। পথ থেকে তাদের উৎফুল্ল কথাবার্তা আর হাসির রোল শুনতে পাই ঘরে বসে, সামনে তখনও সনেটের খোলা বইখানি, ততক্ষণে ফুরিয়ে এসেছে ভিতরকার আগুন, শেক্সপীয়রের চূড়ান্তরকম দ্ব্যর্থক লেখাগুলির উপর যতটুকু আলো ফেলা সম্ভব তা সাঙ্গ হয়ে গেছে। প্যান্ডোরাও মিলিয়ে গেছে অন্ধকারে, এমন-কি শেক্সপীয়রের সনেটগুলির সান্নিধ্যেও যে রহস্যময় পাত্রটি সে এনেছিল, তার শেষ আশার শিখাটিও সে নিয়ে গেছে সঙ্গে।

ক্লাসে *Macbeth* পড়ানোটা দরকারি এক ভারসাম্য তৈরি করল। প্রতি রাত্রে ম্যাকবেথকে কাঁপিয়ে দিয়ে যেত যে 'affliction of these terrible dreams', আশ্চর্যের নয় যে সে-বিষয়ে বেশ ভালোরকমের বোধ নিয়ে সাড়া দিতে পারল ছাত্ররা। ঠিক একইরকম সাড়া পাওয়া গেল ম্যাকবেথের 'torture of the mind' বা তার 'restless ecstasy'র বিষয়ে। 'The tender eye of pitiful day'-কে ঢেকে দেয় যে অন্ধকার, তার প্রবল প্রতিমাগুলিকে ভালোভাবেই মনে রাখত তারা, ক্লাসের পরে আমার সঙ্গে দেখা হলে তারা আওড়াত 'the good things of day' কীভাবে এগিয়ে যাচ্ছে 'to droop and drowse'; আওড়াত অশান্ত চেতনার অস্থির কল্পনার উদ্‌ভ্রান্ত মনের যাবতীয় প্রতিমা। ম্যাকবেথের ক্ষমতাপ্রীতি, তার নীতিহীনতা, ধূসর মৃত্যুর অভিমুখে তার শেষ ধাবমানতা— এ নিয়ে কোনো দ্ব্যর্থতার জায়গা ছিল না। আসল কথা, তাদের স্মৃতির মধ্যে তো জ্বলজ্বল করছিল ধ্বংসলীলা। 'brief candle'-তুল্য জীবনের উপলব্ধি থেকে ম্যাকবেথ যে তার নিজের জীবনকে একটা 'walking shadow' বলে বুঝেছিল, তার সঙ্গে 'শেষ সমাধান'-এর বীভৎস ভয়ংকরকে মিলিয়ে দেখা আমার ছাত্রদের পক্ষে নিশ্চয় সহজ হয়েছিল। যে-ছেলেমেয়েরা বেড়ে উঠেছে অবর্ণনীয় হিংস্রতার ছায়ায়, কবিতার কোনো প্রশান্ত মুহূর্ত ছিল না যাদের কাছে, অল্পবয়সেই তারা যে কতটা পরিণত হয়ে উঠেছিল, *Macbeth* পড়াতে পড়াতে আমার গোটা শিক্ষকজীবন জুড়ে চূড়ান্তভাবে তা টের পেয়েছি আমি।

২.

ইস্কুলের শিক্ষকতা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে যাওয়ার বদলটা খুব সহজে ঘটে নি, কেননা তেল আবিবে বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠার পিছনে কোনো ঐতিহাসিক প্রয়োজন কাজ করে নি, সে ছিল একটা কল্পনাপ্রয়োগের ফল। ঠিকমতো জায়গা পাওয়া যায় নি বলে জাফা আর তেল আবিবের মধ্যবর্তী পরিত্যক্ত এক আরবীয় গ্রামের একেবারে নির্জনে প্রাচীন এক বুশ গির্জের কাছে পুরোনো ব্রিটিশ সেনানিবাসে প্রথম প্রতিষ্ঠা হল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের। সেনানিবাসের একদিকটায় ছিল একটা বোটানিক্যাল গার্ডেন, অন্যধারে ছোটো একটা

চিড়িয়াখানা, মাঝখানকার ব্যারাকগুলি হত ক্লাসঘর।

চিড়িয়াখানায় জন্তুগুলিকে খাওয়ানোর সময় ছিল সন্ধে ছটা, ঘোড়া শুয়োর ভেড়ার প্রচুর চ্যাঁচামেচি শোনা যেত তখন। এসব শব্দ যেন ক্লাস-পড়ানোর একটা সাংগীতিক কাউন্টারপয়েন্ট তৈরি করে তুলত, অধ্যাপকেরা আর ছাত্রেরা ভালোভাবেই টের পেত কী অদম্য প্রাণশক্তি কাজ করে চলেছে জগতে। নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে জন্তুগুলিকে খাওয়ানো হত বলে দূরের কোণ থেকে ভেসে আসা জান্তব শব্দের তালে তালে আমি সাজিয়ে নিয়েছিলাম আমার বক্তৃতার সূচনাশেষগুলি। এর থেকে আমার এই একটা শিক্ষাও হয়েছিল : নির্দিষ্ট সময় পরপর প্রকৃতির যে নিয়ন্ত্রণ আর পরিপোষণ দরকার, ভাষাসাহিত্যের অধ্যাপনা সে-জ্ঞানের উপরেও কম নির্ভর করে না। এ-ব্যাপারটা আমার বক্তৃতার বিষয়বস্তুকেও অনিবার্যভাবেই প্রভাবিত করেছিল।

ব্যাপারটা যে আমার মনে রয়ে গেছে, এটাই যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। আমার প্রথম আমলের ছাত্রদের অনেকেরই নাম বা চেহারা তো ভুলে গেছি আমি, আমার পড়ানোর টুকিটাকি পুরোনো নোটগুলিরও কোনো গুরুত্ব নেই আজ, অথচ ঠিক নির্ধারিত সময়ে নানাধরনের জীবজন্তু তাদের খিদের আর্জি জানাচ্ছে, সেসব যেন চিরকালের জন্য গাঁথা হয়ে আছে এক শব্দযন্ত্রে। হঠাৎ কোনো অজ্ঞাত কারণে যখন কোনো বক্তৃতার মাঝখানে ভ্যা ভ্যা ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ শুরু হয়ে যেত, কথা থামিয়ে দিতাম আমি, থেমে যাবার জন্য ওদের সময় দিতাম একটু। থেমে গেলে, ক্লাসঘর আর ওদের খাঁচার মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গাটায় তাকিয়ে, একটু নম্র অভিবাদন জানিয়ে, আবার শুরু করতাম আমার আলোচনা। এই বিরতিগুলি আমার ছাত্রদের কাছে বেশ হাসির খোরাক হয়ে উঠত। ক্ষুধা আর যৌন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মতো এমন মৌলিক বৃত্তি দিয়েই শিল্প আর প্রকৃতির নিকট-সম্পর্কটাকেও বুঝতে পারত ওরা।

পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে জীবজন্তুকে খাওয়ানোর এই দ্ব্যর্থক সম্পর্কটাকে অন্য অধ্যাপকেরাও এতটা বুঝতে পারতেন কি না কে জানে। এটা বোঝা যায়, অন্তত জীববিদ্যার অধ্যাপকদের এই সাদৃশ্য নিয়ে বিচলিত হবার কারণ ছিল না। আসলে তাঁরা যা পড়ান তার সঙ্গে তো আত্মিকতার কোনো সম্পর্ক নেই, পরিপোষণ আর নিস্কাশন, বীজীকরণ আর প্রসবন, মিলন আর পালন— এইসব প্রাকৃতিক কাণ্ডই তো তার অবলম্বন। কবির কাছ থেকে তাঁর স্বরের জাদু কীভাবে এসে পৌঁছবে পাঠকদের কাছে, প্রকৃতিবিজ্ঞানের অধ্যাপককে এ নিয়ে ভাবতে হয় না। বিশিষ্ট নারীপুরুষের জীবনমৃত্যুর নাটকীয় দিকটাকে কীভাবে রূপায়িত করা যায়, এ নিয়েও সমস্যা নেই তাঁর। সাধারণ লোকের কাছে পশুজীবন সরস লাগতে পারে, করুণ লাগতে পারে, কিন্তু পশুদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে কোনো কমেডি নেই, ট্র্যাজেডি নেই, করুণা বা ভয়ের কোনো ক্যাথারসিস নেই! জীবজন্তুদের আচার-আচরণকে জীববিজ্ঞানী বিচার করেন কেবল জৈব প্রবৃত্তি দিয়ে, কোনো চেতনা দিয়ে তো নয়। তাঁর বিজ্ঞানে কল্পনার কোনো ভূমিকা নেই, আর সাহিত্য হল সবটাই শুধু কল্পনা।

শেক্সপীয়রের মন থেকে গড়ে তোলা এক বিশুদ্ধ কল্পনা যেমন *The Tempest* নাটকের ক্যালিবান। অর্ধেক মানুষ আর অর্ধেক পশু, সে যেন দুই ভিন্ন আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, শিল্পের জন্য আর প্রকৃতির জন্য আকাঙ্ক্ষা। চিড়িয়াখানায় ঘোড়া শুয়োর ভেড়াদের চিৎকারের পটভূমিতে এই নাটকটি পড়ানোর ফলে ক্যালিবানের চরিত্রটি তিনদিক থেকে গুরুত্ব পেয়ে যেত— ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের দিক থেকে, কাল্পনিক সৃষ্টির দিক থেকে, নৈসর্গিক বস্তুর দিক থেকে। গোধূলির আসন্ন অন্ধকারে জান্তব চিৎকারের একটা শৈল্পিক উপযোগ ছিল, ধ্বনিগত কাউন্টারপয়েন্ট তৈরি করবার ব্যাপারেও এর তাৎপর্য কিছু কম ছিল না।

প্রথম দিকে বিশ্ববিদ্যালয়টি যেখানে ছিল, জীবজন্তুদের কথা ছেড়ে দিলেও, সেখানে ছিল ক্ষয়াটে এক নাগরিক চেহারা। আমরা অধ্যাপকেরা ছিলাম উচ্চশিক্ষার পথিকৃৎ। পুরোনো আরবীয় গ্রামটির নাম ছিল আবু কাবির, নগরকেন্দ্র থেকে সেখানে এসে পৌঁছল বাসভর্তি উত্তর-আফ্রিকাগত নতুন অভিবাসীরা। নবাগত এই অভিবাসীদের খুব অল্প কয়েকজনই আমার ক্লাসে ভর্তি হল। ইংরেজি কবিতা পড়বার চেয়ে তাদের বরং দরকার ছিল কিছু ঐহিক সাহায্যের। ১৯৫৫ সালে যখন ওখানে পড়াতে শুরু করি আমি, চলাচলের পথে পড়ত না জায়গাটা, তাই সবাই ওটাকে এড়িয়েই চলত। দুশো ছাত্রের সেই সূচনাকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় যতই বেড়ে চলল,

ততই নতুন নতুন ব্যারাক তৈরি হল, পুরোনোগুলির সংস্কার হল, বাড়ানো হল বোটানিক্যাল গার্ডেন, জীবজন্তুরও বাড়ল সংখ্যা।

১৯৬২ সালে বিশ্ববিদ্যালয় যখন তেল আবিবের আরেকটা দিকে তার এখনকার নতুন জায়গাটায় এল, ততদিনে তা পুরোমাপের এক উচ্চশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে, অনেক তার বিভাগ, জ্ঞানের অনেক শাখা, বিদ্যাবত্তার জন্য দরকারি-সব জিনিসপত্রে ভরপুর অনেক তার নৈর্ব্যক্তিক বাড়িঘর। এ যেন ট্রপিকের জঙ্গল থেকে এসে পৌঁছনো গেল মার্কিনি ধাঁচে গড়ে-ওঠা এক মহানগরীতে। একসময়ে যা ছিল খুব মানবিক আর সেইজন্যে সবসময়ে হয়তো তেমন করিৎকর্মা নয়, এখন তা হয়ে উঠল কম্পিউটারে-চালিত অমানবিক দক্ষতায় ভরাট, যদিও ষাটের দশকের গোড়ার দিকে মানবমস্তিষ্কের ততখানি প্রতিযোগী হয়ে ওঠে নি ব্যক্তিগত কম্পিউটার আর তার ডাটাবেস।

ইংরেজি বিভাগের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হলেন একজন, তৈরি হল পাঠ্যসূচি। নতুন একটা ঝোঁক এসে পড়ল মার্কিনি সাহিত্যের ওপর। বস্তুত আমার বেশির ভাগ সহকর্মীই ছিলেন আমেরিকান, আমেরিকার শিক্ষাপরিবেশেই তৈরি হয়ে উঠেছেন তাঁরা। আমেরিকায় মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাসোসিয়েশনের বাৎসরিক সভায় যে বিদ্যাবাজার বসত, আমাদের বিভাগীয় প্রধান সেখানে যেতেন, যোগ্য প্রার্থী বাছাই করবার জন্য ইন্টারভিউ নিতেন সেখানে, আর নতুন নতুন নিয়োগ ঘটত আমাদের বিভাগে। প্রতিটি শিক্ষাবর্ষের সূচনায় এভাবে নিয়মিত দেখা যেত নতুন মুখের আবির্ভাব, রহস্যময়ভাবে অন্তর্ধান ঘটত পুরোনো মুখগুলির। বিভাগীয় প্রধানের দুর্বোধ্য সব সিদ্ধান্তে নিয়ন্ত্রিত হত এইসব অবিরাম আসাযাওয়া। কে যাচ্ছে আর কে আসছে, কে উঠছে কে নামছে, কে ছেপে যাচ্ছে কে ধ্বসে যাচ্ছে, অনেকটাই তার উপর নির্ভর করত বিভাগের সংহতি। অভাগা তরুণ অধ্যাপকেরা টিঁকে থাকতেন হয়তো দু-এক বছরের জন্য। সময় এলেই বরখাস্তের একখানা চিঠি ধরিয়ে দিয়ে তাদের ফেরত পাঠানো হত আমেরিকায়, কিন্তু কারণটা থাকত যেমন রহস্যময়, তেমনি আকস্মিক।

ছাত্ররা ভর্তি হত নানারকম কারণে। ইংরেজি সাহিত্য পড়াটাই কেন তারা পছন্দ করছে, এটা কখনোই তাদের জিজ্ঞেস করা হত না। আমি যখন তাদের বলতাম যে ইকনমিক্স কেমিস্ট্রি বা কম্পিউটার সায়েন্সের মতো এর চেয়ে অনেক ভরসা-জাগানো বিষয় তো আছে, একটু সলজ্জভাবেই তারা জানাত যে ইংরেজিটা তারা 'ভালোবাসে', আর ইংরেজি ভাষায় দক্ষতাটা তারা একটু বাড়িয়ে নিতে চায়। খুব কমই এমন উত্তর শুনেছি যে সাহিত্যে তারা উৎসাহী কিংবা এই উত্তর যে তারা ইংরেজির শিক্ষক হতে চায়।

বিভাগে আবেদন যারা করত তাদের বেশির ভাগই মেয়ে, অল্প বয়সের, বেশি বয়সের। ক্বচিৎ কখনো ছেলেরাও বিভাগে যুক্ত হবার সাহস দেখাত, তবে তারা হত প্রায়ই একটু দীক্ষিত-গোছের ভিন্ন চেহারার, কবিতা-পড়ার ব্যাপারে যাদের আকর্ষণটা একেবারে স্নায়বিক স্তরের, আর অনেকসময়ে নিজেরাই তারা কবিতা লেখে আমার একেবারে অজানা নানা ভাষায়।

কখনো কখনো আরবীয় ছাত্রদের উপস্থিতি আমাদের সাহিত্যালোচনাকে সজীব করে তুলত। এই ছাত্ররা বেশির ভাগ ছিল খুবই উচ্চাকাঙ্ক্ষাময়, কিন্তু পশ্চিমি সংস্কৃতির ইয়োরোপীয় পট বিষয়ে প্রাথমিক কোনো ধারণাও ছিল না বলে ইংরেজি সাহিত্য-ইতিহাসের জটিলতায় প্রায়ই হাবুডুবু খেত ওরা। দোষ দিতে পারি না ওদের। ওদের জীবনদৃষ্টি, ওদের মাতৃভাষা, ওদের সংস্কৃতিপট, সবই ছিল আরবীয়। ওদের কাছে কী মানে হতে পারে জন ডানের বা উইলিয়ম ব্লেকের ? তবে, কঠোর পরিশ্রমী ছিল তারা, নিষ্ঠাময়, পড়াশোনায় একান্তভাবে সমর্পিত, রসবোধবর্জিত, চূড়ান্ত ভদ্র— এককথায় বলতে গেলে, শিক্ষকছাত্র উভয়পক্ষেই উত্তরণযোগ্য অনেক বাস্তবিক বাধা থাকা সত্ত্বেও, পড়াতে যাদের ভালো লাগে।

একটি ছাত্রের কথা আমার মনে পড়ে, নিদারুণ উচ্চাশায় ভরা এক তরুণ বেদুইন, সে বিশেষভাবে পড়াশোনা করছিল *Troilus and Cressida* নিয়ে, ওই নাটকটি নিয়ে এম. এ. পরীক্ষার থিসিস লিখেছিল সে, বার্মিংহামে পিএইচ. ডি. করবার জন্য ব্রিটিশ কাউন্সিলের একটা স্কলারশিপ পেয়েছিল, ইংলন্ডে দুবছর কাটিয়ে *Troilus*

and Cressida বিষয়ে আরও একটা থিসিস লিখে, অক্সফোর্ডের এম. লিট. নিয়ে ফিরেছিল সে। রীতিমতো ভালো তার এই শিক্ষাগত যোগ্যতায় তৃপ্ত না থেকে সে ঝট করে একটা বিয়ে করে বসল, আমার সঙ্গে তার দয়িতার আলাপ করিয়ে দিল আর গবেষক বা শিক্ষক হিসেবে যোগ্যতার বিবরণ দিয়ে তার জন্য বেশ কয়েকটি সার্টিফিকেট লিখে দিতে বলল। অনুরোধ মেনেও নিলাম আমি। তার গ্রামের সে-ই হচ্ছে প্রথম বেদুইন (সেইরকমই সে বলেছিল আমাকে) প্রিয় বিষয় হিসেবে যে ইংরেজি সাহিত্যকে বেছে নিয়েছে, সেই সাহিত্যেরই জন্য জীবনের বাকি অংশটা সঁপে দেবে সে— এমন একজনকে উৎসাহ দেবার জন্য তৈরিই ছিলাম আমি। ব্রীড়াময়ী আর সুন্দরী দয়িতা তার। আমাকে বোঝানোর শেষ চেষ্টা হিসেবে একদিন সে সঙ্গে নিয়ে এল তার কাকাকে, তিনি ছিলেন ইজরায়েলি সেনাদলের একজন কর্তাব্যক্তি, পুরো ধড়াচুড়ো পরে তিনি এসে একদিন স্বচ্ছন্দ হিব্রুতে কথাবার্তা বললেন আমার সঙ্গে। যথাযথ অভিভূত হলাম আমি, আমার তরুণ ছাত্রটি যা চায় তা-ই দিয়ে দিলাম তাকে। শেক্সপীয়রের আরও কয়েকখানি নাটক পড়ে সে-বিষয়ে তার জ্ঞান বাড়ানোও যে সম্ভব, ইচ্ছে করেই এ-রকম কোনো প্রস্তাব তাকে দিই নি আর।

ইংরেজি সাহিত্যে কোনো ডিগ্রি পেতে গেলে এখন না কি চাই বিশেষীকরণের চর্চা। সমস্ত লেখাপড়ার এই হচ্ছে আজ রূপ, এই হচ্ছে লক্ষ্য। পাঠ্যবিষয় পছন্দ করে নেওয়াটা হল আচমকা কোনো ব্যাপার। কোনো একটা বিষয় ঠিক করে নিয়ে ভাবতে হবে তার কোন্ কোন্ পাঠটুকু নেওয়া যায়। নির্বাচিত বিশেষ অংশের জন্য যদি কোনো দরকার না থাকে তো ইংরেজি সাহিত্য-ইতিহাসের যে-কোনো শাখা যে-কোনো ধারা যে-কোনো লেখক বিষয়ে পড়াশোনা করে নিশ্চয় কেউ সময় নষ্ট করবে না এখন ?

বৃথাই আমি আশা করেছিলাম যে তাদের বিশেষ পাঠ্যের বাইরেও সাহিত্যবিষয়ে একটা ন্যূনতম জ্ঞান তাদের থাকবে। নির্ধারিত পাঠ্যসূচির বাইরের কোনো বই পড়বে, খুব কম ছাত্রই এমন বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দেয়। সূচিতে বলা নেই, যখনই এমন কোনো ইংরেজ বা অন্য বিদেশী লেখকদের নাম বলতাম আমি, অবিশ্বাসভরা বিস্ময়ের দৃষ্টি দেখতাম চোখের সামনে। বাস্তবিক, কে রোম্যাঁ রলাঁ, কে-বা টমাস মান আর রিল্‌কে ? কেই-বা কর্নেই আর রাসিন, ভলতেয়ার আর দিদেরো ? ওসব নাম তারা শোনে নি কোনোদিন, তাঁদের কোনো বইপত্র দেখে নি তারা। যেসব বই তাদের পড়বার কথা, সেই প্রসঙ্গের আলোচনাতেও এর তুল্য ঘটনা ঘটেছে অনেক সময়ে। কে রাস্কিন আর ওয়াল্টার পেটার, উইলিয়ম মরিস আর ম্যাথু আর্নল্ড ? আমার ছাত্রদের কাছে একটা সেমিনারে ইয়েটসের কবিতার বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে আরও একবার এ-রকম অবিশ্বাস আর অজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলাম। ওঁদের বিষয়ে কিছুই শোনে নি তারা, কাজেই পাঠ্যতালিকায় তারা ওঁদের একপাশে ঠেলে রেখেছে। কিন্তু সশ্রদ্ধ আর মনোযোগী ছাত্রদের বিশাল সমাবেশের সামনে স্টেইনবেক আর হেমিংওয়ে প্রসঙ্গে বক্তৃতা করবার জন্য আমন্ত্রিত হন মার্কিনি ফুলব্রাইট স্কলারেরা ! এইসব কাণ্ডকারখানা দেখে বেশ দমেই যাচ্ছিলাম আমি। যদিও, আমার সহকর্মীরা আমাকে অভিনন্দন জানাতেন এই বলে যে আমি কেবল বোদলেয়র-সম্পর্কিত এলিয়টের প্রবন্ধটিই পড়ি নি, আমি এমন-কি কবিতাও পড়তে পারি বোদলেয়রের, তাও আবার ফরাসিতে !

সাহিত্য-সমালোচনা ছিল পড়বার জন্য একটা আবশ্যিক বিষয়, আর বিশেষ মার্জিত ছাত্রদের কাছে এটা হয়ে উঠছিল উত্তরোত্তর প্রিয়। অচিরেই তারা— তেমন-কিছু না বুঝেই— পড়তে শুরু করল লাকাঁ আর দেরিদা, নিজেদের বলতে শুরু করল পোস্টস্ট্রাকচারালিস্ট, পোস্টমডার্নিস্ট আর ডিকনস্ট্রাকশনিস্ট। একঝোঁকা কতগুলি সূত্র দিয়ে, না-বোঝা কতগুলি বুকনি দিয়ে, তারা ভরে তুলতে লাগল তাদের রচনা, তার সবটা বুঝতেও পারতাম না আমি, ফলে অসহায়ভাবে আমি পড়ে থাকতাম রচনাগত তাৎপর্য-বিচারের পুরোনো পদ্ধতি নিয়ে। অবশ্য, এটা বিশেষ করেই বলতে হবে, এসব হল প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। এতদিনে আমি অনেকটা নম্র হতে শিখেছি, কমিয়ে আনতে পেরেছি আমার দাবিদাওয়া। আর, তাঁর প্রৌঢ় বয়সের একটি কবিতায় ইয়েটস যেমন বলেছিলেন— 'Bodily decrepitude is wisdom : young / We loved each other and were ignorant'।

সারা কির্শ্‌-এর কবিতা

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

ওক্টাভিও পাজ্‌-এর সাম্প্রত কিছু উক্তি থেকে আমরা এমন একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা বিষয়ে অবহিত হই যা ইয়োরোপ-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকায় (এশিয়াতেও নয় কি ?) এক নতুন কাব্যভাষা খুঁজে চলেছে। ইয়োরোকেন্দ্রিক ঔপনিবেশিক প্রবণতার বিরুদ্ধে নিজেকে বিন্যস্ত করাই এই ভাষার প্রবর্তনা। পাজ্‌-এর এই উপপাদ্য নিয়ে সম্প্রতি ট্যুবিঙ্গেনে অনুষ্ঠিত একটি সভায় আমার যোগ দেবার সুযোগ হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন প্রায় প্রত্যেকেই নারীর নিজস্ব নন্দনতত্ত্ব (Weibliche Aesthetik) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। এঁদের বক্তব্যের নির্যাস হল এই যে, এতকাল কবিতার ভাষা পুরুষ-প্রশাসিত থেকে গিয়েছে এবং নারীকে সেই ঔপনিবেশিকতার কবল থেকে তাকে অচিরেই মুক্ত করতে হবে।

এরকম ধ্যানধারণা কিছু একপেশে শোনাতেই পারে। কিন্তু দ্বিতীয় চিন্তায় তার যাথার্থ্য অনেকটাই সমর্থন করতে হয়। অবশ্যই, অন্তত ইয়োরোপের প্রেক্ষণীতে এই কৌণিক প্রস্থানভূমি এমন-কিছু বৈপ্লবিক নয় এখন। যাকে আমরা দ্বিতীয় ফরাসি বিপ্লব (১৯৬৮) বলি সেই পর্ব থেকেই এ নিয়ে বিস্তর ভাবনা-চিন্তা সংঘটিত হয়েছে। দার্শনিক লাকঁ-র কয়েকজন ভাবশিষ্যা, যেমন এলেন সিসু লুস ইরিগারি জুলিয়া ক্রিস্তেফা, ভাষাবীক্ষার ব্যাপারে তাবৎ প্রতিষ্ঠানের প্রতিভূ পুরুষসমাজের দাম্ভিকতা বিতর্কের অব্যর্থ প্রয়োগে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন। তাঁদের উদ্যোগে অচিরেই একটি ধারাবাহিক আন্দোলনও গড়ে ওঠে যার লক্ষ্যমাত্রা অত্যন্ত স্পষ্ট :

১. নারীরা তাদের আত্মগত বোধ থেকেই তাদের জীবনকে রূপ দেবার একটি কেন্দ্রীয়তা খুঁজে নিক।
২. এই আত্মগত উপলব্ধির প্রতিষ্ঠা থেকেই নতুন একটি সমাজ তৈরি হবে।
৩. পুরুষব্যবহৃত চিন্তাধারার পাশাপাশি নারীকে তার নিজের বাগ্‌বিধি ও চিত্রকল্পের আদল দিতে হবে। প্রথম প্রথম সেই প্রয়াস হয়তো ঈষৎ প্রোটোকলধর্মী ও প্রোগ্রামসর্বস্ব বলে মনে হতে পারে, কিন্তু ক্রমশই তার প্রাসঙ্গিকতা সমাজের হর্তাকর্তা পুরুষেরা আর পরিহার করতে পারবে না।

অনুমান করা যায়, আন্দোলনের শুরুর দিকে এরকম উচ্চারিত কার্যক্রমের আড়ালে প্রবল অভিমানের উপসর্গ ছিল অনিবার্য। সাহিত্যে গ্যোয়েটের মতো মহারথীও যখন মেয়েদের সাহিত্যচর্চাকে বড়ো জোর একটা ডিলেটান্ট ব্যাপার বলে উড়িয়ে দেন, শিল্পরচয়িত্রীকে তাঁর অস্তিত্বের জন্য একটি ব্যূহবদ্ধতা নির্মাণ করতেই হয়। 'মহিলা কবি'র অদরকারি, লাঞ্ছনাসংকুল অভিধার সংক্রাম থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য তাঁকে তখন এক অর্থে লবি রচনা না করলেও চলে না। একজন শিলারের সমানুভূতি সত্ত্বেও তবু গ্যোয়েটের মতো একজন দোর্দণ্ডপ্রতাপ অভিভাবকের পাল্লায় পড়ে সেই সংগ্রাম দীর্ঘকাল জুড়ে বারংবার প্রতিহত হতে থাকে।

তবু ট্যুবিঙ্গেনের তিনদিনব্যাপী সম্মেলনের সংস্পর্শে আমার মনে হয়েছে, দ্বিতীয় ফরাসি বিপ্লবের প্রণোদনা এরই মধ্যে মঞ্জরিত হয়ে উঠেছে। প্রতীকপন্থা থেকে শুরু করে পরাপ্রাকৃতবাদ হয়ে দাদাইজ্‌ম পর্যন্ত যত উপক্রম দেখা দিয়েছে, তাদের পুরাঘটিত হিসেবে চিহ্নিত করতে না চাইলেও সত্যের সৌজন্যে মেনে নিতেই হবে সেসমস্ত পৌরুষব্যঞ্জক গোষ্ঠীচর্যা সত্তরের দশকেই নাস্তি-র নাভিশ্বাসে অবসিত হয়ে এসেছে। এই পর্বাঙ্গ থেকেই নারীর রচনা বিস্ময়কর নবত্বে অভিষিক্ত হতে পেরেছে। এই রচনা যাপিত, অর্থাৎ বেঁচে-থাকা ও বাঁচতে-চাওয়ার মধ্য থেকে উৎসারিত। একাধারে জীবনসংরক্ত এবং অঙ্গীকারবদ্ধ, ব্যক্তিগত ও যৌথ তার ভাষা। তার অন্যতম ভর

বয়ানের অন্তর্বয়ন (inter-textuality)। সারা কির্শ্‌-এর একটি শ্লোকসম্মিত পঙ্‌ক্তিকে ঘিরেই যখন শ্রীমতী ক্রিস্টা হ্বোল্‌ফ্‌, এ সময়ে জার্মানির প্রধানতম কথাশিল্পী, একটি উপন্যাস দাঁড় করান, না মেনে উপায় থাকে না, এই পারস্পরিকতা আজকের জীবনবিন্যাস ও সাহিত্যে একটি স্বপ্রতিষ্ঠ অহংকার।

মনে রাখতে হবে, নারীর জাগৃতি ও শান্তি আন্দোলন সমসময়েরই দুই অভিক্ষেপ এবং এ দুয়ের জন্মসূত্রে একটি অচ্ছেদ্যতা রয়ে গেছে। ক্রান্তিসঞ্চারী এই উভয় অভ্যুত্থানের পিছনেই ক্ষমতান্ধ উত্তম পুরুষের বিরোধিতা ও প্রকৃতির ব্যক্তিত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখবার উদ্যোগ আসল কথা। বলা বাহুল্য, এরই বিভাবে ঐতিহাসিক একটি তৃতীয় বলয় ঠিকরে বেরিয়ে আসে যার বর্ণিমা সবুজ, ইকলজিকেন্দ্রিক রাজনীতি। যে-প্রকৃতিকে পুরুষজাতি এযাবৎ স্বার্থিক চাহিদায় নিংড়ে নিয়েছে, এই সদর্থক রাজনীতি তার বিরুদ্ধে সূচিত এবং এই মুহূর্ত পর্যন্ত অব্যাহত। এই অন্বেষার শরিকেরা, সবুজ সংগঠন থেকে আরম্ভ করে গ্রিন পিস্‌-এর প্রত্যেকেই, আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন গ্রিক 'ঐকোস' (বাড়ি) এবং 'লোগোস্‌' (বাণী)-এর অন্বয়েই 'ইকলজি' শব্দের সঞ্চার। আমাদের এই অনুবাদ-সংকলনের নামকরণ ('এই শীতে আমার একটা বাড়ি চাই') এই অর্থেই কবির 'মস্ত একটা বাড়ি' (Weites Haus) থেকে উঠে এসেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, এই বাড়িটা কারো একার বাড়ি নয়, ধরিত্রীর প্রতিটি প্রাণীর আশ্রয়। এই কবিতার 'আমি' একক মনের বালাই বরবাদ করে না দিয়েও নিখিল বহুবচনের উপযোগী এবং সম্পূরক হয়ে ওঠে। শুধুমাত্র এই নাম-কবিতার অণুবিশ্বটি ধরতে পারলেই আমরা আঁচ করে নিতে পারব, মূল্যবোধ নিয়ে নারীর লড়াই সারা কির্শ্‌-এ কীরকম আত্মস্থতা অর্জন করেছে।

কতটা তদ্‌গত তা হলে এই মহিলা, আর কতটাই বা স্বগত ? এখানে অপরিহার্যতই রোম্যান্টিক কবিদের নিসর্গপ্রত্যয়ের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। উঠে আসে জার্মান রোম্যান্টিকদের পূর্বাচার্য লুডহ্বিগ টিক-এর সেই কূট প্রশ্ন ('প্রকৃতি যেমন, ঠিক সেভাবেই কি তাকে আমরা ফুটিয়ে তুলতে পারি ?') এবং অটুট নিরসন ('প্রকৃতিকে হৃদয়ের সামঞ্জস্যেই দেখতে হবে')। জার্মানির অনেক সমালোচক এই প্রশ্নোত্তরের পরম্পরা থেকে সারা কির্শ্‌-এর কবিতাকে শনাক্ত করতে চেয়েও শেষ পর্যন্ত নির্ণয় করেছেন, প্রকৃতি এবং হৃদয়ের এই সাবলীল সমীকরণ সত্ত্বেও আদৌ তাঁকে কিন্তু 'রোম্যান্টিক' ব'লে অভিযুক্ত করা যাচ্ছে না। বস্তুত অধিকাংশ সমালোচকই তাঁকে কোনোরকম বর্গেরই অন্তর্ভুক্ত করতে পারছেন না। 'তা হলে কি তাঁর কবিতা পৃথিবীর সর্বশেষ প্রকৃতিবিষয়ক কবিতামালা ?' 'এরা কোনোক্রমেই প্রকৃতির কবিতা নয়।' 'কোথায়, এসব কবিতা তেমন তো পুরুষ-অসহিষ্ণু নয় !' 'এই কবিতাগুলি নিঃসন্দেহে মূলত রাজনৈতিক, প্রকৃতি এখানে শুধু একটি কারসাজি।' প্রভৃত বিশ্লেষকের একই কিংবা একাধিক সন্দর্ভে এরকম পরস্পরবিরোধী প্রস্বর শুনতে পাওয়া গিয়েছে।

যাঁকে নিয়ে এত প্রতর্ক সেই নারী এবং কবি সারা কির্শ্‌ (জ. ১৯৩৫) কিন্তু তাবৎ মূল্যাঙ্কনের অতিশায়ী হয়ে থাকতে চান। তাঁর কবিতায় নিসর্গের নিরীক্ষণ বা প্রতিদিনের মিনিয়েচার কিংবা প্রেমের মেটাফর কোথায় কীভাবে আছে এসমস্ত পর্যালোচনা তাঁকে অবসন্ন করে। তুখোড় সাংবাদিকদের কাছ থেকে তাঁর আত্মজীবনী লুকিয়ে রাখাও তাঁর মনঃপূত একটি অভিপ্রায়। তা সত্ত্বেও অনুবাদকের সুবিনীত স্পর্ধায় অনুমান করি, না-জানলেই-নয় এমন তিনটি তথ্য এখানে জ্ঞাপন করলে অসংগত হবে না। জার্মান গণতন্ত্রী প্রজাতন্ত্রের (জি. ডি. আর.) তৃতীয় প্রজন্মের এই কবি একদা সরকারপুষ্ট পার্টির লেখক সমবায়ের সঙ্গে অন্বিত ছিলেন। চারণ কবি হ্বোল্‌ফ্‌ বিয়ারমানকে পুব জার্মানির নাগরিকতা থেকে বিচ্যুত করা হলে ১৯৭৬-এ সরকারের কাছে খোলা চিঠিতে যাঁরা প্রতিবাদ পেশ করেন তাঁদের ভিতরে থাকার দরুন তাঁকে রাজরোষের কবলে পড়তে হয়। এবং ফলত এর পরের বছরেই পশ্চিমে তাঁর বসবাসের সূচনা।

অস্কার ওয়াইল্ড-এর 'একই ভাষার মতন বিভাজিকা আর কিছুই হতে পারে না' কথাটা এখনো তার তাৎপর্য খোয়ায় নি। ঝটিতি সংযুক্তীকরণের বেশ-কিছুকাল পরেও পুব ও পশ্চিম জার্মানির মাতৃভাষার অভিন্নতা দুই শিবিরসত্তার মৈত্রী এমন-কিছু পাকাপোক্ত করে তুলতে পারে নি। তবুও এই মুহূর্তে কি-পুবে কি-পশ্চিমে সারা কির্শের কবিতার অভিঘাত কেন এত অবিভাজ্য এবং অমোঘ, সেটা ভেবে দেখা দরকার। আজ তিনি বেস্ট-

সেলার লিরিক কবি, কালকে হয়তো-বা সাময়িকভাবে তলিয়ে গিয়ে পরশু আবারও প্রিয় পাঠিকা এবং পাঠকদের কাছে তিনি সদর্পে ফিরে আসবেন। যদি তিনি জনপ্রিয়তার কাছে ফিরতে না-ও চান, চিরায়তে তাঁর জায়গাটা কেউ বোধ হয় অস্বীকার করতে পারবে না। তার কারণ, চিরদিনের কবিতার ঘরানা তাঁর রক্তে ও মজ্জায়। কে কোথায় কবে একটি কবিতা লিখেছেন, সেই এষণা তাঁর উত্তরাধিকার। এমন-কি, তাঁর কবিতায় যখন 'ভবিষ্যতের স্মৃতিচর্যাও' একটি প্রতীতি হয় বেজে ওঠে, ধরে নিতে হবে, তিনি সমীপসময়ের কাছে দায়বদ্ধতা এবং কবিতার প্রমূল্যকে ঘুলিয়ে ফেলতে রাজি নন। তাঁর কাব্যাদর্শের পরিপন্থী সমালোচকেরাও স্বীকার করেছেন, এখানেই তাঁর পদাবলির বৈধতা। এই সূত্রেই জার্মান ভাষায় তাঁর প্রসঙ্গে একটি পরিভাষার প্রচলন হয়েছে : 'সারা-সাউন্ড'। এই সংজ্ঞায়ন এতই স্বচ্ছ যে তার বিশদীকরণ অবান্তর। সারা কির্শের কবিতায় রণিত হতে পেরেছে সেই সংকেত যাকে আমরা 'ধ্বনি' হিসেবে আখ্যায়িত করতে চাই। ভাষান্তরে ওই ধ্বনিসৌকর্য প্রহৃত হতে বাধ্য। বর্তমান অনুবাদকও সে-বিষয়ে অবহিত। তা সত্ত্বেও, অথবা সেজন্যেই, মূল পাঠের সামীপ্য যাতে যথাসম্ভব বজায় রাখা যায়, সেদিকে তাঁর অনবধান ছিল না। ওই প্রক্রিয়ায় কবির স্বকীয় স্বরায়ণ পুরোপুরি বজায় না থাকলেও হয়তো ততটা লোকসান নেই, কিন্তু এখুনি, এই ইতিহাসমুহূর্তেই, তাঁর কবিতা বাংলাভাষায় সঞ্চারিত করতে না চাইলে অনৈতিহাসিকতার অপরাধে দায়বিদ্ধ হতে হবে।

এই শীতে আমার একটা বাড়ি চাই

দু-লাইন

চেস্টনাটের ডালগুলো ওই শার্সিতে মাথা নাড়ে
যাদের সামনে দ্বিধাদুবুদুবু রক্তাপ্লুত আকাশ।
(Zwei Zeilen)

গাঁয়ে একান্তে চুল ধুয়ে-নেওয়া

লাল তোয়ালে নিয়ে আমার এই রোদ্দুরে বেরিয়ে-আসা
উষ্ণ মেঘের ছায়া পাথরে পাথরে আর
অ্যাকেশিয়ার পাতায় পাতায়।

চিরুনির ভিতর দিয়ে দেখছি আলো—
সমস্তটাই অন্তরঙ্গ।
(Haarewaschen auf dem Land)

সময়টা

কালো উত্তুরে বাতাসে এসেছি আর
কুয়াশায় ভেসে আমার বেরিয়ে-পড়া—
জলের বেসিনে আছিল বিছানো কাঁকড়া-বিছেরা আর
ঢোঁড়াসাপে পা ডুবিয়ে
দাঁড়কাক! দাঁড়কাক!
(Eine Zeit)

আর্শিগুলো

বাড়ির মধ্যে শূন্য আর্শিগুলো।
কারো মুখ নয় সুন্দর। যত মেঘ
ঘনায় সেখানে। নরম ধূসর আর
বিদ্যুৎ লেগে চিড় খেয়ে গেছে। তবে
যুদ্ধে গিয়েছে সে কি।
(Die Spiegel)

ঢের

এর পর বাকি আর কী রইল?
দু-দুটো চোখ, বড়ো জোর তিন :
তার চোয়াল আমার মুখে। পান্থশালা
তুলে নাও ছাত, পপলারগুলো
পত্রপল্লব, পাহাড়গুলি
ঘাস
(Viel)

কক্ষনো আর-কোথাও যাই নি

আমার ভাইয়ের
আলুথালু চুল, আমরা
বনগিরিদেশের গহনে
তিরিশবছরব্যাপী যুদ্ধের আগে আমাদের মুখে
চালাকচতুর কথার খই ঝরছে
(Niemals Verzogen)

প্লাবন

অসিত মুকুর এবং যুগ্ম নিসর্গে ওই তাসের দেশের শোভা
মেঘ জানাচ্ছে যমজ বোনকে বিনতি, আকাশ একটি বলয় আজ।
গুঁড়ি একটা-ই, প্রতিটি গাছের দু-দুটো মুকুট তবু

তোমার শরীর আমি, হেসে ওঠো নিজের সকাশে তুমি।
(Die Ueberschwemmung)

তুষারনৃপতির কাচঘরে

তুষারনৃপতির কাচমহলে পাখিগুলোর সংলাপ বেশ যুক্তিযুক্ত। আমরা তাদের অতিথি, শুধু সন্ধের দিকেই তিনি তাদের দর্শন দেন : উলের কম্বল বিছিয়ে দেন তিনি, এক লরি অঙ্গার আগুনে। আমরা করি যা আমাদের মতি। পাঁচিলের পিছনেই আমাদের জন্যে তিনি খরগোশের পর্যাপ্ত মাংস রেখে যান, এবং আমরা ততটা সংখ্যাল্পও নই। আমরা ঘুমোতে চাইলেই পাখিদের তিনি নৈঃশব্দের দিকে টেনে নিয়ে আসেন। রাত হলে তিনি শ-খানেক চিতাবাঘ নিয়ে কাচমহল ঘুরে ঘুরে যান।
(Im Glashaus des Schneekoenigs)

হাসি

এক মুঠো হাসি পুরে হো-হো করে হেসে উঠছে সে
কাছে দূরে নেই কোনো গাছ তার উপরেই বসে আছি আমি
প্যাঁচা
(Lachen)

কালো

পর্বত জুড়ে কালো-কালো প্রজাপতি
বিষাদের আংরাখা
চন্দ্র যখন স্বভুক্তভোগী হবে
কে জানে হয়তো আমি তার পিছু নেব
(Schwarz)

কুল

মেপ্‌ল্‌-রঙানো চুল সেপ্টেম্বরে
কুল পেড়ে নিই মিঠেল ব্ল্যাক বেরিও
ঝোপ থেকে তার মুখের জন্য, আর
চামড়ার নীচে কাঁটা রগড়াই আমি
(Schlehen)

সতত

সতত চেয়েছে তোমায় আমার চোখ
তোমার দিকেই ওড়ে তো আমার চুল
পায়ের তলায় প্রায়শ আমার ছায়া
তোমার সঙ্গে মিশে যায় ; নোনা বীজ
বছরখানেক ছড়াই তোমার দিকে
(Immer)

থাকো

জিপ্‌সিকে আমি খুশি করে বলি : যেয়ো না
হাতখানি দাও এগিয়ে : জানি তোমার
কুহকবিদ্যা আঙুলে তোমার দেহ
আমার শরীরে গূঢ়ার্থ সে আমায়
টানে পুরোপুরি মাটিতে মৃগয়া-চোখে
আমার হৃদয় উপড়িয়ে আনো জিভে।
(Bleib)

ফুসমন্তর

কুয়াশা বৃষ্টি কাদা ছড়িয়ে দিই তোমার দু-পায়ে হে
পেলবশরীরী, বরফ গুঁজে দিই তোমার পায়ের নখরাবলির ফাঁকে-ফাঁকে যেখানে
একদা আমার আঙুল জড়িয়ে নিতাম, তুমি ঢুকতে দাও নি
টেবিলের তলায় তাদের
তোমার সমস্ত রোমকূপ
অবরুদ্ধ আর মজে-ধ্বসে-যাওয়া : তারা
সবচেয়ে সাদামাঠা জিনিসগুলোও ধরতে পারে না
(Fluchformel)

আস্থা

পড়ে-পড়ে সে ওই ঘুমোয়।
আমি তাকে জাগাতে পারি না।
সমস্ত কিনার থেকে শুধু
চারিয়েছে শৈবাল শৈবাল।
বর্ধিষ্ণু আমার কেশদামে।
আমি তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধি।

কী হবে কে জানে ? ওর পিঠে
কম কিছু পড়ে নি পাথর।
আমি তো পারি না নুয়ে যেতে।
থাকতেও পারি না। শিস্ দিই।
কান থেকে গজায় তার গুল্ম আর টের পেয়ে যাই :
যদি দেখতে চাই তার সুরম্য নয়ন
আমাকে এখান থেকে কিছুদিন সরে যেতে হবে।
প্রথমে সে জানতে পারবে না।
আমার অভাব টের পেয়ে
পরে সে ঝাঁকিয়ে উঠবে ঠিকই
তার জামা থেকে ঝরে গিয়ে
গান জুড়ে দেবে পাখিগুলো
চুল আঁচড়ে নিয়ে ততক্ষণে
তড়িঘড়ি ভাঙবে পাহাড়
অচিরে আমার দেখা পাবে
অবিকল জামিরতলায়।
(Zuversicht)

নরওয়েতে যা আমি শিখেছি

জগতের সমস্ত মার্জার
অধুনা-দুর্ভেদ্য ফার-কোট
পরিধান করে খুব তৃপ্ত আছে। সদ্যই দেখলাম
ঘোড়াগুলি নিরাপত্তাময়—
কম্বলে সংবৃত কিছু মানুষ রয়েছে
অতিরিক্ত রোমাকীর্ণ, যত কিনা উত্তরাভিমুখী
হতে হয় তদনুপাতেই
অস্তিত্বের ফার-কোট বেড়ে যায়। তবু কিনা আমি
নরওয়ের এক গণ্ডগ্রামে
সদ্যই বিচিত্র এক ভালুকের সাথে
ডিনার সারলাম, ভেবে দেখো
সে-মুহূর্তে আমি
রীতিমতো নগ্নিকা ছিলাম।
(Was ich in Norwegen lernte)

পার্বত্য

কুঁড়েঘর আর টুপি ছড়ানো
মোচাকৃতি পাহাড়। ওই নীচের হ্রদটায়
থাকে সেই ড্র্যাগন।

বরফের উপর দিয়ে হাঁটছে একজন বুড়ো
খালি-পা-খড়ম অথচ
সাতজোড়া দস্তানা— ওহ্‌ আমার

হাতের মুঠি জমে যাচ্ছে এমনিভাবেই
বজ্রের ভিতর থেকে সে আমায় ডাকছে
ছোটো ছোটো হিমানীসম্প্রপাতে।
(Alversund)

পলাতক

আমি নিজের কাছ থেকে
থেকে-থেকেই পালিয়ে গিয়ে
নিজেকে বলেছি : ভুলে
যাও ! আর নিজেকে করো
কঠিন। তা হলেই
ধরিত্রী বিষয়ে বলতে পারবে।
অবর্ণনীয়
গাছগুলোকে গ্রীষ্মের
আরম্ভে।
(Fluechtig)

খড় ও ঘাসের ভিতরে

প্রথমেই চাই
অভিপ্রায় বাকিটা হল
প্রকরণ খড় আর
ঘাসের ভিতরে আমি বুট-বাসেই পাড়ি দিলাম
বাতাসের হা-হুতাশে লাগল
কানে তালা আমি ঘুরে যাই
জলাভূমি ধরে জল থৈ-থৈ
মাঠের মধ্যে মধ্যে তুষার অ্যানিমোনি
গুঁড়ি মারল আমার ফার-কোটে

বাদামি কালো খাঁ-খাঁ জমিন
আইসল্যান্ডের সান্ধ্য কফি
গোল গোল হ্রদ তাদের মধ্যিখানে
প্রথম লাজুক ভুখ-লাগা
ভেড়াগুলো আর অথবা স্বপ্নে-দেখা
শরীরী গ্রেশিয়ার
(Zwischen Heu und Gras)

পরে কখনো

মোমগুলো দপদপ করছে মালঞ্চে
অতিথিঅভ্যাগতদের আস্তেসুস্থে বিদায় নেওয়ার
মুহূর্তে। আমি যাই
চাষির পোশাক এঁটে
বেড়ার আড়ালে। এ এক প্রস্তুতি
আদৌ যা ঘটবে না তার সপক্ষে।
(Spaeter)

দীর্ঘায়িত শীত

এল যেন
বেথেলহেমের তারা।
টেলিগ্রাফের খুঁটি জ্বেলে
আমরা তাপ নিচ্ছিলাম। আহ্
ফ্যালফ্যাল-করে তাকিয়ে-থাকা
চালকুমড়োগুলোর শিউরে-ওঠা

প্রুশিয়ার ফাইলপত্তর
শমন করল আমার ইনকাম-
ট্যাক্সের কাগজপত্রের
কপি।

তা সত্ত্বেও সমস্তই
যেমনটা কোনো-এক
গিরগিটির বিবাহ উৎসবে
দিব্যি অতিবাহিত হয়েছে।
(Langer Winter)

আরেক পৃথিবী

আমি সেই ষাঁড় সাত লড়াইয়ের শামিল
আমার দেশের লাঞ্ছিত পরগনায়।
শৌর্যে ছিলাম বরাহ্ এখন আমি
নরম নদীর মর্মর আর স্বাধীন।
(Die andere Welt)

ভাইবেরাদর...

নেকড়ে বাঘের দেশের যতেক ভাইবেরাদর আমরা চেয়েছি
আমাদের দৃক্ জ্বেলে ধরে কিছু কোনো-একটায় আস্থা রাখতে
(Freundbruder...)

পাখিগুলি

আকাশে বিন্যস্ত হয় পাখিগুলি
রাত্রে নক্ষত্রেরা।
রাখাল যখন তার পশুদের ঘরে নিয়ে যায়
মোটরসাইকেলখানি ঘুরে যায় বালুর গভীরে।
একটানা তার সে-আওয়াজ
যেরকম বাড়ি ঘিরে ছাগলের দুধ দোয় যারা।
(Voegel)

শেয়ালরাঙা খেত

শেয়ালরাঙা খেতের আলো
সাঁঝের তারার।
ঘড়ির হৃদয় ধুকধুকিয়ে এগিয়ে যায়।
নানারঙের টবের যত জিরেনিয়াম
আলো ছড়ায় কাঠের মেঘের আস্তরণে,
আঁধার পাখি উড়ল বাড়ির উপর ঘেঁষে।
(Die fuchsroten Felder)

চাষি

পা ঘষ্টাতে ঘষ্টাতে এক চাষি
কফি খেতের উপর দুলিয়ে দিল টুপি
যেন খুশিই।
(Ein Bauer)

একা

রাঙা হর্টেনসিয়া আর এবড়োখেবড়ো গাছগুলোর সামনে
বুড়িরা এনে দিল আমায় চা।
ট্রে বয়ে নিয়ে গিয়ে আভিজাত্যভরে দাঁড়িয়ে পড়ল
যে যার শ্রবণ এবং নিরীক্ষণের খুঁটিতে
কারুকাজকরা পর্দাগুলোর আড়ালে
(Allein)

আত্মহনন

সত্যি বলতে ব্যাপারটা ওর বংশে মজ্জাগত
আগে ছিল ওরা সমুদ্রসৈকতে
থেকে-থেকে দিদা মূর্ছো যেতেন আর
দেয়ালের ছবি পড়ে যেত নির্ঘাত
আরেকটা ছেলে যুদ্ধে শায়িত হলে
(Selbstmord)

ভঙ্গুর জর্জীয় সংঘারামে

এ ওর-পিছু-হাঁসের চালে পীতধূসর পরমহংসেরা
চলেছে, ওরা বেজায় বুড়ো, শুধু ওদের স্বরধ্বনিগুলি
শিল্পময় হয়ে রয়েছে সারিবদ্ধ একটি রেকর্ডারে
গুঞ্জরিত স্তোত্রায়ত, স্তব্ধ আবার বোতাম টিপলেই।

ওই রয়েছে প্রতীক্ষায়, নিথর যত উত্থিত চরণে,
যতক্ষণে কৃষাণ দেয় ওদের মুখে গানের অনুমতি,
প্রত্যেকেই দু-দুটো হাত গুটিয়ে নিয়ে আস্তিন অবধি
পেরিয়ে যায় ছাড়িয়ে ওরা সোয়ালোদের অষ্টম কুলায়

যতক্ষণে সন্ধ্যা হয়, এগিয়ে আসে ওয়াইনের প্রহর,
অতঃপর ঘুমিয়ে পড়ে ভরাট স্পুলের ভিতরটাতে ওরা,
মস্ত একটা চেয়ারে বসে তখন কিনা মোহান্ত বাবাজি
কোপেক গোনে প্রস্তরের ভিতরে ফাঁপা একটি পরিসরে।
(Klosterruine Dshwari)

হ্বিপার্সডর্ফ. ১

এখানে শুধু ছন্দখানি এলিজিময়
এখানে শুধু পুরাঘটিত কালের বোধ
মনোহরণ পাঙাশে এক রাঙা বিষাদ
কেয়ারি-করা বেড়ার ভিতর তন্তুবায়ী
(Wiepersdorf I)

পুরুষস্ট্যাচু পার্কে

হা অভাগী মেয়েরা ক্রমেই
দুর্বোধ এখন। ওরা কোন্‌টা পেরে ওঠে না এবং
কিংবা কিসে অপছন্দ ! জীবনে অন্তত তিনবার
এর কিংবা ওর থেকে ছিন্ন হয়ে টেনে হিঁচড়ে নেয়
যা নাকি জরুরি ওই শিশুদের, প্রত্যহের কাজ—
ভাবলেই শিউরে উঠি !
(Maennliches Steinbild im Park)

কেউ আমাকে ছেড়ে যায় নি

কেউ আমাকে ছেড়ে যায় নি বটে
দেখায় নি তো আস্তানা একবারও
কেউ তোলে নি পাথর আমার দিকে
মারবে বলেও চড়াও হয় নি তো
সবাই আমায় আশাভরসাই জোগায়
(Keiner hat nich verlassen)

পরখ

বেশ তো, বলে উঠলেন পরিপাটি ভাঁজ-করা-ভুরু সেই বুড়ো
তোমাদের মধ্যে যার হাতজোড়া অনার্দ্র
সে-ই ওকে পাবে ! বলেই আমাদের হাত ডুবিয়ে দিলেন
দর্পণপ্রাঞ্জল নদীতে, একাধারে। সে-ও মেলে ধরল
তারগুলি সূর্যের দিকে, আর তারা আমার চেয়েও ছোটো।
আমি চিৎকার করে উঠলাম : ওকে আমি চাই নে ! চিৎকার করে আমার হাত
নীচ থেকে উপর দিকে গড়িয়ে তুলতেই কব্জি কড়মড় করে উঠল
জলের ফোঁটাগুলো মিলিয়ে যেতেই আঙুলগুলি গরম হয়ে উঠল।
তিনি তখন নুয়ে যেতে থাকলেন
অট্টহাস্যে
(Probe)

এলিজি. ১

আমি তো ছায়া হয়ে গিয়েছি এই গ্রীষ্মে।
মানুষজনের স্বাস্থ্যওজনের নিক্তি
আমাকে দেখায় না আর। অরফিউস
গায়িকা মারিয়া কালাসের সঙ্গে চলেছেন।
(Elegie I)

এলিজি. ২

আমি বুঝি সেই মোহন ফিনিক্স পাখি
আমায় ঝাঁকাও সকলের দিকে, বলো
কানাকড়ি করি পরোয়া! পাবে তখুনি
আমার আত্মা যা নাকি ডেইজি-ধবল
আমি
সে-অনবদ্য ফিনিক্স পাখি তবুও
সেই কারণেই বুঝি
উড়ি না পুনর্বার
(Elegie II)

বিচ্ছেদ

প্রত্যেকে তার হুইস্কি খেয়ে নিজেই নিজের প্রদেশ
'থ্রি সোয়ালোস্' সে/আর আমি আমার 'ফোর রোসেস্'
(Trennung)

রূপান্তর

নরওয়ের শীতের কাছে টুপি খুলে
কুর্নিশ জানাই, বরফ-ছাওয়া অথচ নগ্ন শিখরগুলিকে।
ঝাউগাছেদের সবুজ সবুজ চুলে পাউডারের পাফ লাগানো।
হিমতুষারে শৃঙ্খলে পরিণত জল
ঝলমলানো ভূতে-পাওয়া সৈকত। আমি
যদ্দিন এখানে আছি বলতে পারব না
যে আমি গ্রীষ্মকালের অপেক্ষায় আছি।
(Veraenderung)

হিমবাহদুধ

আমার চোখে নিশ্চয়ই
দেবদারুদাবাগ্নি
যেই তাকিয়ে দেখি
মেঘমৌসুমি
নরওয়ের উর্ধ্বাঞ্চলে
তক্ষুনি কিনা চশ্‌মাটা
আমার পড়ল গিয়ে
পায়ের কাছে ঘোড়াগুলো
দাঁড়িয়েছিল আমগ্ন
গর্দান পর্যন্ত তুষারে
(Gletschermilch)

স্বরপুঞ্জ

এখন উঠে পড়ি আর যাই যাই
গার্ড্‌সকাগি পর্যন্ত মধ্যরাত্রে
এখন যেখানে আলোয় আলো আর শুনতে পাই
সমুদ্র আছ্‌ড়ে পড়ছে সৈকতে।
তোমরা ভাঙা গলায় কেনই-বা
হরিণপোশাক এঁটে ঘোরাঘুরি করছ কে বা কী
তোমরা কোনো মৃত্যুকেই জানো না?
(Stimmen)

আকর্ষণ

কুয়াশা ঘনিয়ে এল, পাল্‌টে যাচ্ছে আবহাওয়া। চন্দ্র
মেঘমেঘালিকে জড়ো করে আনছে মণ্ডলে। হ্রদের উপর
বরফে চিড় খেয়ে ঘষ্‌টানি দিচ্ছে। হ্রদের উপর দিয়েই তুমি
এসো।
(Anziehung)

চৈতি বাংলা

হাঁস উড়ে গেল বাড়িয়ে লম্ব গলা
আকাশের দিকে লাল ওয়াইনের বোতল
উত্থিত যেই সূর্য বিদায় নিল

পড়ন্ত দিন দীঘল তাতিয়ে-ওঠা
পান করি আর কাটি গোলাপের ডাঁটা
(Sommerhaus)

হাইকু-র এলাকা থেকে

নতুন বছর : বাতাসটা
পুরোনো সময়ের
উশ্‌কে দেয় আমার দাঁতের ব্যথা।

*

নতুন বছরের
আকাশের তলায় হেঁটে যায়
পুরোনো লোকজন।

*

তুষার যেমন, তেমনি সে-ও
দিব্যায়িত— আমার স্বদেশকে
হতচ্ছাড়া দেখাচ্ছে

*

হাভেল নদীর উপরে চাঁদ
মস্তানটা ঠিক
ফেলে রেখে গেছে।

*

ঘেউ ঘেউ কর্, আমি হুকুম করছি! কুকুরটা
বছরটাকে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে
আমায় মদত দিচ্ছে

*

নর্ম্যান সরণি : আমি দেখছি
লোকজন যারা
কাপড় কাচছে নববর্ষের জন্য।

*

বছরটা শেষ হতে চলল
এখনো আমি
পর্যটনের পোশাক বয়ে চলেছি।
(Erlkoenigs Tochter)

পৌষপ্রান্তর

তুষারঝঞ্ঝা মেঘবিদারণ
অজস্র বর্ষণ এখন
পুরুষ নেকড়েগুলো আমার
শতচ্ছিদ্র ঘুম খাক করে দিয়ে ডুবিয়ে দিচ্ছে সবশেষের
আঁকড়ে-ধরা বর্ণালি আর
ফাৎরাফাই করে দিচ্ছে আমার আদেখিলা হৃদয়ের
সৈকতভূমি ! বুয়ে দিয়েছি আমি।

উষ্মা আমার যথাযথ চারু চিকণ বীজবুনুনিতে
আগেভাগেই পশমভেড়ার
রেতঃপাতে দাগানো দুর্গ্রহদের
প্রভাবপ্রতিপত্তির বিরুদ্ধে
বিগলিত দয়া দেখানোর পথে ততটা তৈরি নই
যেমন আমি এই
ঊষর প্রান্তরেই
(Winterfeld)

তুষারগীতি

গিরিচূড়ান্ত ঘিরে ঘুরে ঘিরে
ওড়ে সাত দাঁড়কাক
ওরা নির্ঘাত আমার সোদর
বদ্‌লে গেছে বেবাক

এতই পেটুক ওইসব ছেলেপুলে
গেছে নিজেদের ছোটো বোনটাকে ভুলে
হিরণ্য ধেনু জবাই করার আশে
উড়ে গিয়েছিল বিকট অট্টহাসে

সূর্যের কাছে পৌঁছে যাবার আগে
দৃষ্টিশক্তি খোয়াল দুর্বিপাকে

আমার ঘরের বাতিগুলো একে-একে
বুজিয়ে দিয়েছি ঘুমোতে যাবার আগে
কালো-কালো যত পালক দেখতে পাই
সফেদ জমাট তুষারেই গিয়ে ঠেকে
(Schneelied)

চোখের পালক

আহ্ ওদের জানলাগুলোয় বিদ্যুৎ ঝলসে গিয়ে ক্রমসংখ্যাগুলি
ডানায় ডানায় সঞ্চারিত হয়ে গেল, পামগাছের সংগোপনে
ঝরে পড়বার আগে...

(Augenblick)

ভড্‌কা ওড়ানো

পিঙ্গল পাখি পিঙ্গল পত্রালি
নরম রজন-নদী হয়ে আছে, প্রতি
স্বয়ংতন্ত্র সুঠাম গাছের ছালে
যাদের শিখর তারায় অলংকৃত

বুড়ো মর্মর মানুষেরা পা ছড়িয়ে
বুরুজের দিকে গড়ল কী-অভিরাম
ফুটফুটে সাদা ঝর্না-পরীর কোলে
শালিখগুলির মসৃণ আশ্রয়

ভিতরে মস্ত চেয়ারগুলোয় গোঁজা
সিংহমুণ্ডু হেলানোর পরিসরে
ভড্‌কা ওড়াই আমরা যেখানে বসে
গলার কাছটা শূন্য তেপান্তর :

রাঙা আঙুরের মঞ্জরী যায় ঝরে
রজতশুভ্র নদীটির আস্তরে
আর বাঁকাচোরা কুটিল কাঁকড়াগুলো
চাঁদের আলোয় ডাঙায় ফোকর গড়ে

যতক্ষণ না টাগরা শুকিয়ে কাঠ
যতক্ষণ না সমূহ দ্রব্যগুণ
আমাদের গূঢ় গভীরে চারিয়ে যায়
এবং আমরা সিরিয়াস হয়ে উঠি

অন্যেরা যবে জুড়ে দেয় চিৎকার
এবং এ ওর বাহুতে শয্যাশায়ী
পরস্পরকে সখ্যের কথা বলে
কালকে যদিও মনে থাকবে না কিছু

এসো গো আমরা ঠাণ্ডার দিকে যাই
চন্দ্রের চাপা অন্ধকারের দিকে
চলে যাই যত ছিমছাম পথে যারা
ঘুরে বাঁক নেয় পাহাড়গুলোকে ঘিরে
(Wodka trinken)

গ্রীষ্মে

জনবিরল পল্লীপ্রদেশ
প্রকাণ্ড প্রান্তর আর যন্ত্রপাতি সত্ত্বেও
গ্রামগুলি ঘুমন্ত রয়েছে
চিরহরিৎ গাছগাছালির নিকুঞ্জে— পাথর ছুঁড়লেও
বেড়ালগুলোর গায়ে লাগে না
অগস্টে ঝরে পড়ে নক্ষত্র
সেপ্টেম্বরে শিকারিরা বাজাতে শুরু করে দেয়।
এখনো ধূসরহংসী উড়ে যায়
অবিযাক্ত মাঠে
হেঁটে চলে সারস।
আহ্, মেঘপুঞ্জ
গিরিরাজি অরণ্যের উপর দিয়ে
উড়তে থাকে।
এখানে যতক্ষণ না খবরের কাগজ এসে পৌঁছোয়
বিশ্বজগতের শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ থেকে যায়
প্লাম মারমেলেড তৈরির কড়াইতে ভাসতে থাকে
মনোরম্য নিজের মুখ এবং
অগ্নিসংকাশে দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে প্রান্তর
(Im Sommer)

বাতাসে তুষারগন্ধ

বাতাসে তুষারের গন্ধ লেগে আছে
আমার দয়িত এখন রেখেছে লম্বা চুল,
আহ্ এই শীত, এই শীত
এই এবং
ঘনসংবদ্ধ ছুঁয়ে দেয় দাঁড়ায়
দোরগোড়ায় আগে
হাওয়াকুকুরের সঙ্গে টানটান বাঁধা।
বরফ কুসুম

বিলিয়ে দেয় আমাদের জানালায়,
কয়লা দপদপ করে উনুনে
এবং
হে রম্যকান্তি তুষারশুভ্র আমার
স্থাপন করো তোমার শিরোদেশ আমার
কোলে
আমি বলি এটা হল স্লেজগাড়ি
যা আর কখনো দাঁড়ায় না, তুষার ঝরে
এবং
হেমন্তের মাঝখানে, আঙারছাইয়ের গামলায়
সে জ্বলে ওঠে
অঙ্গনে দয়িত ব'লে ফিসফিসায় একটি শ্যামাপাখি।
(Dic Luft riecht schon nach Schnee)

মস্ত বড়ো একটা বাড়ি

এই শীতে আমার একটা বাড়ি চাই
যার মধ্যে আমি থাকব। স্বল্পভাষী
অনেকরকম ঘর যাদের বিচিত্র জানালা। একটি জানালার ডানা
উত্তরের দিকে, সেখানে দেখি
তুষারখচিত ডালে পাখিদের নাচ।
স্লেজগাড়িতে বাজছে ল্যাপল্যান্ডের কুকুরগুলোর ঘণ্টা।
আর তক্ষুনি গলে যায় তুষার, আমি মুখ ধুয়ে নিই,
জমে-যাওয়া চিঠিগুলি গলতে থাকে
শিকারিদের চলনে জেগে ওঠে নিসর্গ, তাদের বন্দুক থেকে ওড়ে ধোঁয়া
রুক-স্যাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ঝাউফল
আগুনের আহুতি।
অন্যান্য জানালাগুলো
আমার শহরের গির্জেগুলো দেখায়, তাদের চুড়ো
উঠে যায় পাণ্ডুর কালো আকাশে,
বাজারে ঘোরে নাগরদোলা, গির্জায় ক্রিসমাসের অর্গ্যান
শুধুই বাড়িয়ে দেয় বিষাদ

দরজা খুলে দেখি একটা ঘর সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত
হাজার বছর জুড়ে সেই আয়োজন, যাকে নষ্ট না করলে আমরা ভালোভাবে বাঁচতে পারতাম।

বিছানায় বসে জুতোজোড়া খুলে ফেলে ভাবতে বসি সেসমস্ত জাহাজের কথা
যাদের ডানা আছে, যাদের পাখিগুলো কেবিন থেকে তীরের দিকে ওড়ে

আমি পাইলটকে বলি
গতিবদল করো
ম্যানিলা ঘুরে চলো সাইবেরিয়ায়।
তার চোখের পাতা বৃষ্টিশেষের ঘাসের মতোই গজিয়ে উঠছে,
এই পাইলটের মাথার ভিতরটায় যদি থাকতে পারতাম কী ভালোই না হত!
(Weites Haus)

মন্ত্র

লাল মেঘ চূর্ণ করে দিচ্ছেন জিউস্
আমি আমার ছড়ানো চুল নিয়ে তাঁর ভিতরে সাঁতার কাটি
এমন করে আঁকড়ে ধরি যে তিনি বলতে পারেন না
আজ সোম না মঙ্গল নাকি শুক্কুরবার
কোন্ শতক এখন তিনি আর আদৌ ওভিদ পড়ে উঠেছেন কিনা
আমি তাঁর চাম্চা না স্ত্রী নাকি
নিছক মেঘ দিয়ে তৈরি একটি প্রাণী
আকাশ ছেয়ে
(Rufformel)

বনাঞ্চল

উত্তুরে হাওয়া টুকরো-টুকরো করে দেয় মেঘ
ওরা চলে যায় আকাশ ছাপিয়ে নেকড়ে বাঘের
তুন্দ্রা অবধি সূর্য তখন উঠছে মেঘেরা
সেই সুযোগেই দেখল কেমন খিল-তুলে-দেওয়া
বনবনান্ত ছিন্নভিন্ন কুঁড়েঘরগুলো
টিয়ারগ্যাসের কান্নামিছিলে কোনো ঘাস নেই
তার উপরেই গজিয়েছে চুন বালি ও সুরকি।
(Waldstueck)

এজাজ় আহ্‌মদ, দরবারি চিন্তা ও একটি সাম্প্রতিক বিতর্ক

দীপেশ চক্রবর্তী

এজাজ় আহ্‌মদ-এর সাম্প্রতিক গ্রন্থ 'ইন থিয়োরি : ক্লাসেস, নেশন্‌স, লিটারেচর্‌স' নিয়ে নানান পত্রিকায় আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে, তাই আমার এই স্বল্পপরিসর প্রবন্ধের উদ্দেশ্য আরেকটি 'পুস্তক সমালোচনা' নয়।[১] আজ ভারতবর্ষে— ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও— মার্ক্সবাদ ও উত্তর-আধুনিক (পোস্টমডার্ন) চিন্তার সম্পর্ক নিয়ে সমাজবিজ্ঞানী, সাহিত্যসমালোচক ও ঐতিহাসিক মহলে যে-বিতর্কের শুরু হয়েছে, আহ্‌মদের বইটি তারই অংশ। উত্তর-আধুনিক চিন্তা প্রতিক্রিয়াশীল, উত্তর-অবয়ববাদী (পোস্টস্ট্রাকচরালিস্ট) দর্শন প্রতিক্রিয়াশীল, মার্ক্সবাদের শত্রু— আহ্‌মদের বই-এ এই কথাটি ঘুরেফিরেই এসেছে। কথাটা বলায় আহ্‌মদ একা নন। দিল্লিস্থিত আরও কয়েকজন বিজ্ঞজনের রচনায় কথাটির প্রতিধ্বনি শুনেছি, পাশ্চাত্যেও কারো কারো একই মত।

বর্তমান রচনাটি যেহেতু আহ্‌মদের বই-এর প্রথাগত 'সমালোচনা' নয়, তাই বইটির মধ্যে যা প্রণিধানযোগ্য তা নিয়ে আলোচনার অবকাশ কম। তবু বলে রাখি, তৃতীয় দুনিয়ার সাহিত্য বিষয়ে ফ্রেড্‌রিক জেমিসনের বক্তব্যের আহ্‌মদ-কৃত সমালোচনা, রুশদির 'শেম' উপন্যাসের আলোচনা, এমন-কি এড্‌ওআর্ড সইদ-এর 'ওরিয়েন্টালিজ়ম' বইটির সম্পর্কে আলোচনার কিছু কিছু অংশ, আমাদের মনোযোগ দাবি করে। তা ছাড়া একটা খুব মোটা কথা যে মোটা সুরে বলেছেন আহ্‌মদ, তার মধ্যেও একটা সত্য আছে। সেটা হল এই যে আজকের পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাহিত্যের, বিশেষত তৃতীয় দুনিয়ার সাহিত্যের, ও নন্দনতত্ত্বের আলোচনায় সেইসব মানুষের কণ্ঠস্বর বেশি শোনা যায় যাঁরা বিশেষ সুবিধা বা অধিকার-প্রাপ্ত অর্থাৎ যাঁরা পাশ্চাত্যেই কর্মরত বা যাঁদের কনফারেন্স, ফেলোশিপ বা ভিজ়িটিং প্রফেসরশিপ সূত্রে ওইসব বিদ্যাচর্চাকেন্দ্রে সর্বক্ষণ গতায়াত। এ কথাটি সত্য তবে খুব মোটা কথা। অবশ্যই বক্তব্যটির সততা আরও বাড়ত যদি আহ্‌মদের বইতে এই স্বীকৃতি থাকত যে আহ্‌মদ ও দিল্লিস্থিত আরও অনেক অ্যাকাডেমিক এই সুবিধাভোগী শ্রেণীর বাইরে নন মোটেই, কিন্তু তা না-থাকলেও এই কথাটির যাথার্থ্য কমে না। কথাটি কিছু নতুন নয় ; কিন্তু সুবিধাপুষ্ট মানুষেরা স্বাভাবিক প্রবণতাবশতই অনেক সময় নিজেদের সুবিধের কথা ভুলে যান। আহ্‌মদ তাঁর বিশিষ্ট যোদ্ধৃভঙ্গিতে তা মনে করিয়ে দিলেন।

আহ্‌মদ যাকে বলেছেন 'সময়ের চিহ্ন' (দ্য সাইন্‌স অব টাইম), আমি সেই দিক থেকেই তাঁর বইটিকে পড়তে চাই ও পরিশেষে মার্ক্সবাদ ও উত্তর-অবয়ববাদী চিন্তার পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ে— অন্তত ভারতীয় ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে— একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা করতে চাই। আহ্‌মদের মার্ক্সবাদের একটি আন্তর্জাতিক ভূমিকা নির্ধারণ করে দিয়েছেন খ্যাতনামা নন্দনতত্ত্বালোচক টেরি ইগ্‌লটন। 'ইন থিয়োরি'-র মলাটের পিছনে বিজ্ঞাপিত এক মন্তব্যে ইগ্‌লটন বলেছেন :

> কোনো কোনো আমূলসংস্কারকামী (র‍্যাডিকাল) সমালোচক মার্ক্সবাদকে ভুলে গিয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু আহ্‌মদের এই বিধ্বংসী ও সাহসভরে-চলতিপ্রথা-বিরোধী সমালোচনার চেহারাধারী যে মার্ক্সবাদ, তা তাঁদের ভুলে যায় নি।

এই 'গুঁতিয়ে দেওয়া' 'বিধ্বংসী' মার্ক্সবাদকেই আমি 'দরবারি' নাম দিয়েছি। এই মার্ক্সবাদ মূলত নীতিবায়ুগ্রস্ত। এর কাছে মননশীল চিন্তাবিদ মানুষেরা দুটি ভাগে বিভক্ত : যাঁদের নৈতিক অধঃপতন হয়েছে আর যাঁদের হয় নি। যেমন ধরুন, কোন্ ধরনের রচনাকে 'এগ্‌জ়িলিক' ('exilic') বা নির্বাসিতের মনোভাবপূর্ণ রচনা বলা যাবে, এ বিষয়ে আহ্‌মদের বিচার খুব কড়া। 'নির্বাসন' কথাটির মানে আহ্‌মদের কাছে খুবই আক্ষরিক। যাঁদের সরকারি জুলুমে দেশ ছাড়তে হয়েছে, আহ্‌মদের ভাষায় বেছে নিতে হয়েছে 'মৃত্যু, কারাবাস বা নির্বাসন', তাঁরাই তো

'নির্বাসিত', একমাত্র তাঁদের রচনাই 'নির্বাসিতের রচনা' হিসেবে বর্ণনাযোগ্য। যাঁরা 'স্বেচ্ছায়'— আহ্‌মদের ভাষায় choose to'— দেশ ছেড়ে পাশ্চাত্যে গেছেন, সেই 'ক্ষুদ্র একটি অ্যাকাডেমিক এলিট যাঁরা জানেন যে তাঁরা আর ফিরবেন না', তাঁদের তো 'কেবলই ব্যক্তিগত সুবিধার' প্রশ্ন।[২] তাই আশিস নন্দী, গৌতম ভদ্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ নানান ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানীদের কথা ভুলে গিয়ে, হোমি ভাবার সমালোচনায় মুখর আহ্‌মদ লেখেন যে 'প্রগতি'র সমালোচনা কেবল ভয়ানক সচ্ছল ও ভয়ানকভাবে শিকড়-উপড়ানো তাত্ত্বিকেরাই করতে পারেন।[৩] এইসব সুবিধাভোগী মানুষদের আবার 'নির্বাসিত'-এর মনোভাব কোথা থেকে হবে ? এঁদের তো ভারতীয় সরকার তাড়িয়ে দেন নি ! (ভাগ্যিস আহ্‌মদ বাঙালি মধ্যবিত্ত নন, তা হলে জানতেন এক 'অত্যন্ত সচ্ছল' অথচ গভীরভাবে শিকড়-প্রোথিত মানুষের কথা, যিনি 'নির্বাসন'-এর প্রশ্নটিকে কথাটির আক্ষরিকতার সীমার বাইরে চিন্তা করে লিখেছিলেন :

মন যে দিল না সাড়া, তাই তুমি গৃহছাড়া
নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে।

আহ্‌মদের কাছে অবশ্য এ কথা মোটেই 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ'-এর সঙ্গে মেলানো যায় বলে মনে হবে না। ই. পি. টমসন একেই একবার বলেছিলেন, 'হিস্টেরিকাল অ্যান্ড ডায়াবলিকাল মেটেরিয়ালিজ়ম' !)

এ-হেন যে মার্ক্সবাদ— মার্ক্সের রচনার গভীর দার্শনিক প্রশ্নের সঙ্গে যার যোগাযোগ নেই বললেই চলে— সেই মার্ক্সবাদকেই আমাদের সময়ের দর্পণে দেখতে চাই। আমাদের, অর্থাৎ আমরা যাঁরা ভারতবর্ষের তথা দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস-সমাজ বুঝতে চাই, তাঁদের জন্য সময়ের কী বার্তা নিয়ে আসে এই মার্ক্সবাদ ? নৈতিক অধঃপতন বিচার করে বেড়াতে চায় যে-মার্ক্সবাদ, তার মুখ স্বভাবতই ক্ষমতার দিকে ফেরানো। তার স্বপ্ন : সেন্সরশিপ, পুলিস, জেলখানা, ফাঁসি, নিদেনপক্ষে নির্বাসন। তাই এ হল 'দরবারের' মার্ক্সবাদ। (আহ্‌মদরা সচেতনভাবে এইসব ভাবছেন, বলছি না।) কিন্তু আরও একটি বিশেষ অর্থেও ভারতীয় প্রেক্ষাপটে, আহ্‌মদের মার্ক্সবাদ 'সরকারি' বা 'দরবারি'। আহ্‌মদ যেভাবে সি. ডি. এ. (Colonial Discourse Analysis) বলে একটি গবেষণাক্ষেত্রকে চিহ্নিত করেন, সেই কায়দায় এই মার্ক্সবাদকেও ও. আই. এম. (Official Indian Marxism) বলে অভিহিত করা যায়।[৪] অফিসিয়াল, সেই অর্থেও এ 'দরবারি'।

এই মার্ক্সবাদের (ও. আই. এম.) প্রথম চিহ্ন সেই সুকুমার রায় -বর্ণিত জগাই-এর মনোভাব। চারপাশ থেকে সাত জার্মান-এর কাল্পনিক আক্রমণ, ফলে সেই অবস্থানে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত বেধড়ক ছাতা ঘুরিয়ে কতিপয় নির্দোষ পার্শ্ববর্তী মানুষের মস্তকচ্ছেদন— এই এর রাজনীতি। অর্থাৎ 'মার্ক্সবাদ গেল', এই রব তুলে ভ্রাতৃঘাতী বিধ্বংসী সমালোচনা। সোভিয়েত-পরবর্তী যুগে মার্ক্সীয় চিন্তার ওপর দক্ষিণপন্থী হানাদারি যথেষ্ট চলবেই। আহ্‌মদের সমালোচনার লক্ষ্য যদি হতেন দক্ষিণপন্থী চিন্তাবিদেরা তা হলে কিছু বলার থাকত না। কিন্তু যাঁদের প্রতি তীক্ষ্ণতম শরগুলি নিক্ষেপ করেছেন আহ্‌মদ, তাঁরা কেউ-ই দক্ষিণপন্থী নন : ফ্রেড্‌রিক জেমিসন, সলমন রুশদি, এড্‌ওআর্ড সইদ। আর যাঁদের প্রতি আহ্‌মদের দৃষ্টিভঙ্গি অবজ্ঞাসূচক উক্তিতে বিবৃত সেই হোমি ভাবা, রণজিৎ গুহ বা পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও বামপন্থী রাজনীতির মানুষ। বিশেষত রণজিৎ গুহ বা পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মার্ক্সবাদের জ্ঞান ও আগ্রহ কোনো অংশে আহ্‌মদের চেয়ে কম বলেও মনে হয় না।

কেন এই ভ্রাতৃঘাতী মনোভাব ? জবাব যা, তা কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতির সঙ্গে পরিচিত মানুষদের কাছে পুরোনোই লাগবে। একদা 'মার্ক্সবাদী' বা 'বাম' বলে চিহ্নিত মানুষেরা যদি আজ 'উত্তর-অবয়ববাদী' বা 'অবিনির্মাণী' (ডিকন্‌স্ট্রাকশনিস্ট) দর্শনে ও রচনায় আগ্রহী হন, তা তাঁদের বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় বহন করে। তাই তাঁদের জন্যই 'মার্ক্সবাদী' বীরেরা রেখে দেন সবচেয়ে ভারী ও মোটা অস্ত্রগুলি। আজকের পৃথিবীতে মার্ক্সবাদ বিপন্ন, আহ্‌মদের এই বোধের সঙ্গে অনেকেই একমত হবেন। মার্ক্সবাদের একটি পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন, এ-প্রশ্নেও হয়তো আহ্‌মদের সঙ্গে অনেকেরই কোনো তফাত থাকবে না। তফাতটা কোথায় ? তফাত এইখানে

যে আহ্‌মদ ফিরে যেতে চান পার্টির মার্ক্সবাদের পরিচিত ভাষায় যেখানে 'শ্রেণীসংগ্রামে'র তত্ত্বেই ইতিহাসের সমস্ত চাবিকাঠি লুকোনো থাকে। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, রণজিৎ গুহ বা সাব্‌অলটার্ন স্টাডিজ্‌-এর অপরাধ এই যে তাঁরা ওই পুনরুজ্জীবনের তাগিদে ফুকো-দেরিদা-লিওতার-দ্যলুজ়-হাইডেগার-নীট্‌শে প্রভৃতির দরজায় গেছেন। অশুচি কাজ হয়েছে এটাই। কারণ ফুকো-দেরিদা-ক্রিস্টেভা-প্রমুখের দর্শন আহ্‌মদের কাছে একবাক্যে 'প্রতিক্রিয়াশীল'।[৫] পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁর চিন্তাসমৃদ্ধ গ্রন্থ 'ন্যাশনালিস্ট থট অ্যান্ড দি কলোনিয়াল ওয়ার্ল্ড'-এ ইয়োরোপের অষ্টাদশ শতকের আলোকপ্রাপ্তির (এন্‌লাইটেন্‌মেন্ট-এর) যুগের সঙ্গে আমাদের ইতিহাসের সম্পর্ক নিয়ে অনেক ভাববার মতো প্রশ্ন তুলেছিলেন। তার মধ্যে একটি ছিল : এন্‌লাইটেন্‌মেন্ট যুক্তিবাদের বিচার (ক্রিটিক অব এন্‌লাইটেন্‌মেন্ট র‍্যাশনালিজ়ম)। জগাই-মার্কা বিধ্বংসী সমালোচনায় অবশ্য বিচার (*critique*) আর সরাসরি খারিজ (রিজেকশন) করে দেবার অবস্থানের মধ্যে যে-গুরুত্বপূর্ণ তফাত, সেই তফাতটিই অবলুপ্ত হয়ে যায়। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বই সম্বন্ধে আহ্‌মদের মন্তব্য : 'the main business of radicalism came to reside in the rejection of rationalism itself'।[৬]

এসবও পার্টির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের পুরোনো কায়দা : প্রতিপক্ষের বক্তব্যকে যথাসম্ভব সরলীকরণ করো, তার পর মারো এক ঘা। কিন্তু আহ্‌মদের ভ্রাতৃঘাতী মার্ক্সবাদ এক বিশেষ অর্থে আমাদের সময়ের চিহ্ন বহন করে। আহ্‌মদের আক্রমণের যাঁরা লক্ষ্য, তাঁরা সবাই পুরুষ। আহ্‌মদের সমালোচনা পড়ে যাঁকে মনে না-পড়ে উপায় নেই, তিনি সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে খ্যাতনাম্নী লেখিকা গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক। শ্রীমতী স্পিভাক ভারতীয় উপ-মহাদেশ বিষয়ে লেখেন ; দার্শনিকভাবে মার্ক্স-দেরিদা-নারীবাদ মেলাতে চান ; সাব্‌অলটার্ন স্টাডিজ়ের সংগ্রহ প্রকাশ করেন। এর চেয়ে আর ভালো লক্ষ্য কী পেতে পারতেন আহ্‌মদ ? কিন্তু স্পিভাক সম্বন্ধে টুঁ শব্দটিও নেই আহ্‌মদের বইতে। নারীবাদের সামনে 'বিধ্বংসী' মার্ক্সবাদী সমালোচনার 'পৌরুষে'র এই যে পলায়ন, এটাও একটি সময়ের চিহ্নই বলতে হবে। অন্য যুগের মার্ক্সবাদী হলে নারীবাদকে এমনভাবে সভয়ে পথ ছেড়ে দিতেন না পুরুষপুঙ্গব। তবু ভালো, যে এই তাণ্ডবনৃত্য— 'গেলেও বিচিত্রপথে, হয় নাই সে সর্বত্রগামী'।

দরবারি মার্ক্সবাদের দ্বিতীয় লক্ষণ : আত্মসমীক্ষার অভাব। একটা ছোটো উদাহরণ দিই আহ্‌মদের বই থেকে। এড্‌ওআর্ড সইদ বা জওহরলাল নেহরু যখন 'we' বা 'আমরা' কথাটি ব্যবহার করেন তখন আহ্‌মদ তাঁর পাঠকদের তৎক্ষণাৎ মনে করিয়ে দেন যে কথাটি কখনোই 'আত্মবিস্মৃত'-ভাবে ব্যবহৃত নয়, তা সবসময়ই বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত ও সেই তাৎপর্য বিশ্লেষণের যোগ্য। সইদ সম্বন্ধে আহ্‌মদ দেখাচ্ছেন : 'how strategically he deploys words like "we" and "us", to refer, in various contexts, to Palestinians, Third World intellectuals, academics in general, humanists, Arabs, Arab-Americans, and the American citizens at large'[৭]। নেহরুর সম্বন্ধেও একই বিশ্লেষণী পদ্ধতির প্রয়োগ করেন তিনি : 'But who is the "we" in Nehru's sentence? This needs some decoding...'[৮]। সেই আহ্‌মদ-ই অবলীলাক্রমে, যেন সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতভাবে, লিখে যান '*our* literary traditions', '*our* collectivity' ইত্যাদির কথা।[৯] এই 'we'টি কে ? এ-ও কি 'strategically deployed' নয় ? এর 'decoding'-এর প্রয়োজন নেই ? পাঠককে কোনো হদিশ দেন না আহ্‌মদ। অথচ একে 'decode' করা প্রয়োজন, নতুবা 'দরবারি' মার্ক্সবাদের সঙ্গে ক্ষমতার আঁতাতটা বোঝা যাবে না।

আহ্‌মদ এক জায়গায় নিজের সম্বন্ধে লিখছেন, 'I was born in India and I write poetry in Urdu'।[১০] অন্যত্র লিখছেন, 'the advantage of coming from Pakistan, in my own case....'।[১১] বই-এর মলাট জানাচ্ছে, বর্তমানে তিনি দিল্লিস্থিত। ভারতবর্ষে জন্মে, পাকিস্তানে বড়ো হয়ে, ভারতবর্ষে ফিরে আসার আগে আর অন্য কোথাও, অন্য কোনো দেশে আহ্‌মদ ছিলেন কিনা, ছাত্র ও কর্মজীবনের কতখানি পাকিস্তানেই বা অন্যত্র কাটে, ওসব বিষয়ে কিছুই জানান নি আহ্‌মদ। (কেন যে তাঁর আমেরিকায় অধ্যাপনার দীর্ঘ ইতিহাস তিনি বেমালুম চেপে গেলেন, তাও আমার জানা নেই)। আর জানি তাঁর বই থেকেই, যে তিনি

কট্টর মার্ক্সবাদী। রণজিৎ গুহ ব্যতীত— অবশ্য আহ্‌মদের মতে সাব্‌অল্‌টার্ন স্টাডিজ় হল পোস্টস্ট্রাকচরালিস্ট— ভারতীয় সব মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিকদের (নাম্বুদ্রিপাদ, কোশাম্বী, বিপান চন্দ্র, ইরফান হাবিব প্রমুখ) তিনি অনুরাগী ভক্ত। তো এই যে ভারতবর্ষে জন্ম, উর্দুতে কবিতা লেখেন, বিলেতে বই ছাপান, পাকিস্তান থেকে আগত, দীর্ঘকাল আমেরিকাবাসের উল্লেখ করেন না, এমন মার্ক্সবাদী মানুষটি যখন 'our literary traditions', 'our 'collectivity' লেখেন, তখন তাঁর 'we'টি কে?

আহ্‌মদের বই একটু খুঁটিয়ে পড়লে এ-প্রশ্নের জবাবের কিছু আভাস মেলে। যা পাওয়া যায় তা কৌতূহলোদ্দীপক। তাতে তাঁর মার্ক্সবাদের দিল্লির 'দরবারি' চেহারাটাও ফুটে বেরোয়। এটুকু আহ্‌মদ জানিয়েছেন যে তাঁর উল্লিখিত 'our literary traditions'-এর মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত আছে। এবং এর সঙ্গে যোগ আছে 'our unity'র। কেমন ঐক্য? 'the principle of our unity was civilizational and historical for many centuries before it came to be contained in the national form...' (পাঠক নেহরুর প্রতিধ্বনি শুনলে অবাক হবেন না)।[১২] এমন-কি সইদকে এক অনৈতিহাসিক (ahistorical) ও সত্তাবাদী (essentialist) 'ওরিয়েন্টালিজ়ম'-এর ধারণা প্রচার করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেও, আহ্‌মদ এই সভ্যতার ঐক্য সম্বন্ধে একটি সত্তাবাদী কথা লিখে বসলেন : 'This civilization has been a composite one precisely to the extent that it has possessed, in the cultural domain, a remarkable history of an essential unity in structures of feeling...'।[১৩] এখানে বিশেষভাবে স্মর্তব্য এই যে এই বইয়েরই গোড়ার দিকে আহ্‌মদ ভারতীয় সভ্যতার 'ঐক্য' নয়, 'জটিলতা'র কথা লিখেছিলেন। বস্তুত এমন কথা লিখেছিলেন যা পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞান পাণ্ডে বা গৌতম ভদ্র বা 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ়'-এর অন্য অনেকের বক্তব্যের খুবই কাছাকাছি :

> Now, after decolonization, our inability to acknowledge that the civilizational complexity of India simply cannot be lived or thought through in terms of the centralizing imperatives of the nation-state we have inherited from the European bourgeoisie... has meant that those earlier semiotics of administration and profession... have merely reproduced themselves on an extended scale.[১৪]

একদা যা ছিল 'complexity' তা পরবর্তীকালের বর্ণনায় 'essential unity' হল কী করে? 'complexity' ও 'unity' তো আর সমার্থক শব্দ নয়, 'essence'-এর কথা নাহয় বাদ-ই দিলাম। এটা ঘটনা যে ভারতীয় উপমহাদেশে এক অঞ্চলের সঙ্গে অপর অঞ্চলের সাংস্কৃতিক মিল ও পার্থক্য দুই-ই আছে। সেটাকে যদি আহ্‌মদ সংস্কৃতির জটিলত্ব নাম দেন, আপত্তি নেই। কিন্তু 'ঐক্য' কোনো ঘটনা নয়, এটি একটি বিশেষ মতাদর্শগত (ideological) দাবি। আহ্‌মদের 'we' এই মতাদর্শের নায়ক। এই মতাদর্শটির চরিত্র কী? কাদের 'ঐক্য'? নাগা-মিজোরা, আন্দামান-নিকোবরের 'আদিবাসী'রা, সিংহলবাসীরাও কি এই 'ঐক্যে'র অংশ?

নিজের তাত্ত্বিক অবস্থান বিষয়ে আহ্‌মদের কোনো আত্ম-জিজ্ঞাসা নেই, ফলে এ-প্রশ্নেরও কোনো সরাসরি জবাব নেই আহ্‌মদের লেখায়। উত্তরের আভাস আছে আহ্‌মদ-ব্যবহৃত 'our' কথাটির মধ্যেই। উপমহাদেশের সভ্যতার 'জটিলতা' থেকে 'ঐক্যে'র বক্তব্যে পৌঁছে আরেকটি আত্মপরিচয়জ্ঞাপক বর্ণনা ব্যবহার করলেন আহ্‌মদ : 'our canonical nationalism'।[১৫] অবশ্য ক্যাননিক্যাল ('canonical') বা 'আনুশাসনিক' কথাটার মধ্যে যিনি কথাটা ব্যবহার করছেন তাঁর সঙ্গে অনুশাসন বিশেষের একটি দূরত্ব বজায় রাখার ভঙ্গি আছে। কিন্তু তেমনি 'our' কথাটিতে একটি সংযুক্ত থাকার ভাব-ও আছে। তো এই 'আনুশাসনিক' জাতীয়তাবাদটি কী? আহ্‌মদ আরও স্পষ্ট করে বলেছেন যে এই জাতীয়তাবাদের একটি প্রধান পাঠ (text) হল নেহরুর 'ডিস্‌কভারি অব ইন্ডিয়া'।[১৬] এখন প্রশ্ন হচ্ছে : কোন্ জাতীয়তাবাদের 'আনুশাসনিক' গ্রন্থ নেহরুর এই বইটি?

প্রচুর গবেষণা না-করেও বলা যায় যে যেসব জাতীয়তাবাদ পাকিস্তানে বা বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর নতুন জাতি-রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে, সেইসব জাতীয়তাবাদী চিন্তায় নেহরুর এই গ্রন্থের কোনো 'আনুশাসনিক' মর্যাদা থাকা খুবই বিস্ময়কর হবে। সে মর্যাদা পাবে ইকবাল প্রমুখের রচনা কিংবা বাঙালি মুসলমানের ক্ষেত্রে হয়তো 'বিষাদসিন্ধু'র মতো গ্রন্থ। যে জাতীয়তাবাদী কণ্ঠ নেহরুর 'ডিস্‌কভারি অব ইন্ডিয়া'-কে our canonical nationalism'-এর একটি মূলপাঠ বলে অভিষিক্ত করে, তা ভারতীয় জাতি-রাষ্ট্রের যে-জাতীয়তাবাদ তারই অংশ, এবং 'our' কথাটির এই প্রয়োগ পরোক্ষে পাকিস্তানি কি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে 'বৈধ' বলে অস্বীকার করার মনোভাবই প্রকাশ করে। কারণ ভারতীয় উপমহাদেশে কোনো একটি 'আনুশাসনিক জাতীয়তাবাদ' তৈরি হয় নি— এই ভূখণ্ডে গত দেড়শো বছরে একাধিক 'আনুশাসনিক জাতীয়তাবাদ' সৃষ্ট হয়েছে, তার কিছু কিছু রাষ্ট্রগঠনে সক্ষম হয়েছে, কিছু হয় নি। 'our canonical nationalism' এই প্রাথমিক সত্যকে অস্বীকার করে।

আহ্‌মদের মার্ক্সবাদ, তাঁর 'we', 'our' ইত্যাদির মতোই এই কারণে 'দরবারি'। ভারতীয় ভূখণ্ডে স্বাধীনতার জন্য মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের যে-ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও দাবি অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার বৈধতা স্বীকারের কোনো জায়গা রাখেন নি এই ভারতবর্ষে-জন্মানো পাকিস্তান-হতে-আগত, বর্তমানে-দিল্লিতে-কর্মরত 'বিধ্বংসী' মার্ক্সবাদী সমালোচকটি। এই দরবারি মার্ক্সবাদের সঙ্গে কংগ্রেসী জাতীয়তাবাদের গভীর মিল এখানেই যে দুটি মতাদর্শই ভারতীয় (সভ্যতার) 'ঐক্যের' নামে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র-গঠনের সংগ্রামকে 'অবৈধ' বলে উড়িয়ে দিতে চান। এখানেই এঁরা আগ্রাসী ও অসহিষ্ণু। এর মধ্যে সত্যকার মার্ক্সবাদ অল্পই, এই মতবাদ ভারতীয় জাতি-রাষ্ট্রের স্বার্থে নিযুক্ত একটি দৃষ্টিভঙ্গি মাত্র। ভারতীয় সভ্যতার 'জটিলতা' নয়, 'ঐক্যের' দাবির রাজনীতি এইটাই। একে দিল্লির দরবারের মার্ক্সবাদ বা ও. আই. এম. ছাড়া আর কী বলব?

স্বভাবতই এই 'দরবারি' মার্ক্সবাদের অন্যতম বিশেষ একটি লক্ষণ হল কোনোরকম দার্শনিক বা গভীরভাবে সমালোচনাত্মক চিন্তায় অনীহা। বইটির নাম 'ইন থিয়োরি', কিন্তু এতে 'থিয়োরি' বা দর্শনের বিশেষ কিছু নেই। জেমিসন, সইদ বা রুশদি কেউ-ই শিক্ষায় দার্শনিক নন। এঁদেরকে শিখণ্ডী খাড়া করে যেসব 'পোস্টস্ট্রাকচরালিস্ট' দার্শনিকদের কেবল গালাগাল— 'reactionary anti-humanist'— দিয়ে কাজ সেরেছেন আহ্‌মদ, সেই ফুকো-দেরিদা-লিওতার-দ্যলুজ্‌ প্রমুখের লেখা তো খুবই সহজলভ্য। অথচ তাঁদের লেখা গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করে আহ্‌মদ সাহেব তাঁর মতামতে এসেছেন, এমন কোনো প্রমাণ নেই বইতে। ফুকোর সম্বন্ধে পাতা-দেড়েক আলোচনা আছে, আর সকলের নাম এসেছে এক-একটি এক লাইনের ফর্মুলা আবৃত্তির মধ্যে। কান্ট-হেগেল-হাইডেগার-এর কথা তো বাদই দিলাম, এমন-কি দেরিদার সঙ্গেও কোনো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের চিহ্ন নেই গোটা বইটিতে। আর এ যুগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যে দার্শনিক নীট্‌শে, তাঁর বক্তব্যের একটি এক লাইনের সারসংক্ষেপ করেছেন আহ্‌মদ, যা পড়লে মনে হবে নীট্‌শে নিশ্চয়ই ছিলেন বেশ বোকা একটি আন্ডারগ্রাজুয়েট ছাত্র : 'the Nietzschean idea that no true representation is possible because all human communications always distort the facts।'[১৭] উত্তর-অবয়ববাদী দর্শন সকলেরই ভালো লাগতে হবে বা বামপন্থার উপযোগী মনে হতে হবে, এ-ধরনের দাবি স্বভাবতই অযৌক্তিক। কিন্তু দেরিদা প্রমুখের রচনাকে না-পড়েই 'reactionary' নামকরণে পুরোনো কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরীণ বিতর্কের কথা মনে পড়ে যায়।

উত্তর-অবয়ববাদী দর্শনে ও তার জটিলতার অনুধাবনে আহ্‌মদের বইটি যে কত অগভীর, পাঠক তার পরিচয় পাবেন রাজনীতিকভাবে আহ্‌মদের সমগোত্রীয় ক্রিস্টোফার নরিস-এর 'দ্য ট্রুথ অ্যাবাউট পোস্টমডার্নিজ়ম' বইটি পড়ে দেখলে।[১৮] নরিস সাহেবের বইটিও উত্তর-আধুনিক তত্ত্বের ওপর খাপ্পা হয়ে লেখা। বামপন্থীর রচনা, রাজনীতিক অবস্থান আহ্‌মদের কাছাকাছি। কিন্তু ওইরকম না পড়ে খারিজ করে দেবার মনোভাব, বা 'আমি একটা ফিলসফার গাধা শুয়োর জানিস সেটা' বলে তর্ক শেষ করে দেবার ঝোঁক নেই। নরিস-এরও শিখণ্ডী আছেন— স্টুয়ার্ট হল— কিন্তু তাঁর পিছনে দণ্ডায়মান (অন্তত নরিসের দৃষ্টিতে) লিওতার-এর সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে নামেন নরিস। নরিসও মনে করেন যে 'উত্তর-আধুনিকতা' (postmodernism) এমন একটি 'সাংস্কৃতিক

আপেক্ষিকতা'-র (cultural relativism) মনোভাবের জন্ম দেয় যা রাজনীতিকভাবে 'প্রতিক্রিয়া'র পক্ষে কাজ করে। কিন্তু নরিস কেবল অপমানে বা অবজ্ঞায় কাজ সারেন না, তাঁর বইটি এটাও প্রমাণ করে দেয় উত্তর-অবয়ববাদী দার্শনিকদের একবাক্যে 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলে খারিজ করে দিলে তাঁদের চিন্তার জটিলতাকে ও ঐশ্বর্যকে অস্বীকার করা হয়। অধিক আর কী বলব, অমন যে র‍্যাশনালিস্ট চিন্তাবিদ হাবারমাস, যিনি ফুকো-লিওতারের সঙ্গে তর্কেও নেমেছেন, যাঁর দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিতি আমাদের দরবারি মার্ক্সবাদীদের চেয়ে একটু বেশি বলেই ধরা যায়, তিনিও এঁদেরকে বিতর্কের যোগ্য বলেই মনে করেছেন।[১৯]

২.

গোড়াতেই বলেছি, আহ্মদের বই এই রচনায় দরবারি মার্ক্সবাদের (ও. আই. এম.-এর) একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। আমি তাঁর রচনা থেকে ও.আই.এম.-এর লক্ষণগুলো বুঝতে চেষ্টা করেছি। কারণ আজকের ভারতবর্ষে দিল্লিস্থিত দরবারি মার্ক্সবাদীরা একটি দল পাকিয়েছেন। তাঁদের ধারণা, ভারতবর্ষে সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামের অন্যতম প্রধান শত্রু হল সাবঅলটার্ন স্টাডিজের সঙ্গে যুক্ত সমাজবিজ্ঞানীরা। আক্রমণ হয়েছে পার্থ চট্টোপাধ্যায়, গৌতম ভদ্রের ওপর, অল্প খানিকটা আমার ওপরেও। আক্রমণটা বড়ো কথা নয়, কী নিয়ে তর্ক সেইটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সেই প্রসঙ্গেই আমাদের দেশে মার্ক্সবাদী ইতিহাসানুসন্ধানে উত্তর-অবয়ববাদী বা উত্তর-আধুনিক দর্শনচিন্তার কোনো ভূমিকা আছে কিনা, সে সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেই বর্তমান নিবন্ধে দাঁড়ি টানছি।

দরবারি মার্ক্সিস্টদের বক্তব্যটা এইরকম : ভারতবর্ষের সমাজতান্ত্রিক-গণতান্ত্রিক সংগ্রামের আজ সবচেয়ে বড়ো শত্রু বি. জে. পি.-মার্কা 'হিন্দুত্ব' আন্দোলন। এই 'হিন্দুত্ব' আন্দোলন চিন্তার ক্ষেত্রে একধরনের 'স্বদেশীয়ানা' (indigenism) ছড়াচ্ছে, যার বক্তব্য 'দিশি' চিন্তা সব ভালো, 'বিদেশী' চিন্তা সব খারাপ। এই মিথ্যে 'স্বদেশীয়ানা'ই হিন্দুত্ব আন্দোলনের বুদ্ধিগত ভিত্তি। ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানী যাঁরা ইয়োরোপীয় এন্‌লাইটেন্‌মেন্ট র‍্যাশনালিজ্‌ম 'খারিজ' করেন, তাঁরাও হয় এই বি. জে. পি.-মার্কা 'স্বদেশীয়ানা'র শিকার নতুবা তাঁরা এতেই ইন্ধন জোগাচ্ছেন। জার্মানিতে ফ্যাসিবাদের উঠতির যুগে এইরকম এন্‌লাইটেন্‌মেন্ট-এর যুক্তিবাদ খারিজ হয়েছিল। ফলে দুয়ে দুয়ে চার করে বোঝাই যাচ্ছে, এইসব 'আলোকপ্রাপ্তি' ও 'যুক্তিবাদ' -বিরোধীরা আপাতভাবে মার্ক্সবাদের তকমা পরলেও ভিতরে ভিতরে ফ্যাসিবাদেরই দোসর, কাজেই দাও এঁদের মুখোস খুলে, ইত্যাদি...। এইরকমই সম্প্রতি লিখেছেন সুমিত সরকার।[১৯ক]

এই মোটা তর্কে এক্ষুনি যাব না, শুধু এটুকুই বলে রাখি : ১. ক্রিটিক (critique) করা আর খারিজ (rejection) করা এক নয়, যদিও অভিযোগকারীরা এ দুটো প্রায়ই গুলিয়ে ফেলেন। ২. যুক্তিবাদের সাহায্যেই তো পার্থ কী গৌতম তাঁদের বক্তব্য রাখেন, তাতে আলোকপ্রাপ্তির যুক্তিবাদী দর্শনের যা-ই সমালোচনা থাক্-না কেন। ৩. ইয়োরোপীয় আধুনিকতার 'ক্রিটিক' করলেই যদি তা ফ্যাসিবাদ হয় তা হলে তো মহাত্মা গান্ধি সবচেয়ে বড়ো ফ্যাসিবাদী! ৪. তা ছাড়া 'আধুনিকতা'র ক্রিটিক 'আধুনিকতা'রই অঙ্গ হতে পারে। ইস্কুল-কলেজে পড়াশুনো করে, আধুনিক বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা ও প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল থেকে যাঁরা 'আধুনিকতা' বোঝার জন্য চিন্তায় একটি আর্কিমিডীয় অবস্থান খোঁজেন, তাঁদের সরাসরি 'আধুনিকতা-বিরোধী' বলে ভাবাটা একটু স্থূল বুদ্ধির কাজ।

প্রশ্নটা হচ্ছে : আজকের ভারতবর্ষে মার্ক্সবাদী ও/বা নিম্নবর্গের ইতিহাস লিখতে গিয়ে চিন্তায় ইয়োরোপীয় 'আলোকপ্রাপ্তি' সম্বন্ধে একটি আর্কিমিডীয় অবস্থান খোঁজার প্রয়োজন আছে কি না।

কথাটা এখান থেকে শুরু করা যাক : বামপন্থী ইতিহাস গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন ও রক্ষার সংগ্রামের অংশ নিশ্চয়ই। একটা সময় ছিল, যেমন সত্তরের দশকে, যখন যে-ক্যাটিগরির সাহায্যে আমরা 'গণতন্ত্র' বা 'সমাজতন্ত্র' বা 'ধনতন্ত্র' -জাতীয় বিমূর্ত সামাজিক সম্পর্কগুলি চিন্তা করতে পারি, সেগুলিকে স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে

নিতাম। তার দার্শনিক বা তাত্ত্বিক দিক নিয়ে বেশির ভাগ ভারতীয় মার্ক্সিস্ট ইতিহাসবিদ কিছু চিন্তা করতেন না। কেবল মহাফেজখানা ঢুঁড়ে, দলিল দস্তাবেজ ঘেঁটে, এমন একটি কাহিনী তৈরি করতেন যাতে মনে হত জনসাধারণ বরাবরই গণতান্ত্রিক অধিকার পাবার অভিলাষী ও তজ্জন্য সংগ্রামরত, কেবল সাম্রাজ্যবাদীরা ও শোষকরা মিলে তাদের সফল হতে দিচ্ছে না। এক অর্থে আমরা ধরেই নিতাম যে 'গণতন্ত্র', 'সমাজতন্ত্র' ইত্যাদি ইতিহাসের 'স্বাভাবিক' নিয়মের অন্তর্গত। একটু সফিস্টিকেটেড ঐতিহাসিকরা মধ্যবিত্তের দোদুল্যমানতার কথা বলতেন। তা-ও ধরে নিতাম যে মধ্যবিত্তের পক্ষে তো ওটাই 'স্বাভাবিক'। বাংলার ইতিহাসে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নটি উঠত, কিন্তু প্রমাণ করার চেষ্টা হত যে ওর মূল পুববাংলার ঔপনিবেশিক সমাজের জমির মালিকানায় জমিদারের শোষণে ও মহাজনের সুদে।

আশির দশকে দু-তিনটে গোলমাল দেখা দিল এই ধরনের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে। এমনিতেই সত্তরের দশকে আমাদের গ্রাম্‌শি-আবিষ্কারের ফলে— কলকাতায় এই ধারায় ভগীরথ নিশ্চয়ই শ্রদ্ধেয় অশোক সেন মহাশয়— 'কালচর' তথা 'মতাদর্শগত আধিপত্য' বা 'হিগেমনি'র (hegemony) তত্ত্ব এল ('মতাদর্শগত আধিপত্য'-বিষয়ক চিন্তার ক্ষেত্রে অবশ্য ষাটের দশকের মাওবাদের কিছু অবদান ছিল)। রণজিৎ গুহ তাঁর কৃষকবিদ্রোহ সংক্রান্ত বইটিতে চৈতন্যের কথা, চেতনার বিশ্লেষণের পদ্ধতি, ইত্যাদি প্রশ্ন সোচ্চারে আলোচনা করলেন সম্পূর্ণ নতুন আলোকে। তাঁর প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ সাবঅলটার্ন স্টাডিজ়-এর (তখন!) 'তরুণ' ঐতিহাসিকেরা এটাও দেখলেন যে জাতীয় আন্দোলনের অনেক ক্ষেত্রেই কৃষক, শ্রমিক ও অন্যান্য নিম্নবর্গের মানুষেরা সংগ্রামে নেমেছেন, তাঁদের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই। এবং সে দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অনেক সময়েই মধ্য বা উচ্চবিত্তের দৃষ্টিভঙ্গির তফাত হয়েছে। অনেক সময় মিলও হয়েছে, কিন্তু সে পার্থক্য-মিলন ছাপিয়েও যে-কথাটি ক্রমশ এই গবেষণায় পরিস্ফুট হয়েছে তা হল এই যে ভারতীয় জীবনের সমস্ত চিন্তা ও কর্মকে ইয়োরোপীয় দর্শনজাত ফর্মুলার মধ্যে ঠেসেঠুসে পুরে দেওয়া শক্ত। অথচ গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন ও রক্ষার যে সংগ্রামগুলি, তাদেরও গুরুত্ব কিছু কমে না এবং সেইসূত্রে ইয়োরোপীয় দর্শনের প্রয়োজনও থেকেই যায়।

আশির দশকে আরও যে পরিবর্তনগুলি আজ গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, তা একদিকে উত্তর-অবয়ববাদী চিন্তা, অন্য দিকে নারীবাদী দর্শনের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা। গ্রাম্‌শির আলোয় যাকে একদিন নিছক 'মতাদর্শগত আধিপত্যে'র লড়াই বলে জানতাম, তাকে নিয়ে নতুন প্রশ্ন তুলে দিলেন ফুকো প্রমুখেরা। প্রশ্ন দাঁড়াল : 'মতাদর্শগত আধিপত্যে'র লড়াইতে যে-হাতিয়ার ব্যবহার হবে, সেখানে শত্রুর হাতিয়ার আর আমার হাতিয়ার কি সম্পূর্ণ আলাদা? যেমন ধরুন, বুর্জোয়াদের চিন্তায় 'গণতন্ত্র' ও মার্ক্সীয় চিন্তায় 'গণতন্ত্র' যদি ইয়োরোপীয় দর্শনের কতকগুলো সাধারণ সূত্র থেকে শুরু হয়ে, পরে ভিন্নমার্গী হয়ে থাকে, তা হলে তাদের মধ্যে যা 'সাধারণ' তা নিয়ে ক্রিটিক্যাল প্রশ্ন তোলা যায় কি? এদিক থেকে ফুকো এন্‌লাইটেন্‌মেন্টকে কতকগুলো নতুন শাসনের ছকে দেখালেন, তা নিয়ে তাঁর হাবারমাস ও অন্যান্যদের সঙ্গে তর্কও হল। অপর দিকে এন্‌লাইটেন্‌মেন্ট মানুষকে যে 'মুক্তি'র সন্ধান দিয়েছে— মার্ক্সের চিন্তা যার উত্তরাধিকারী— তা নিয়ে গভীর প্রশ্ন তুললেন কয়েকজন নারীবাদী দার্শনিকও। যেমন, ক্যারল পোম্যানের বই 'দ্য সেক্সুয়াল কনট্র্যাক্ট' বা ল্যুস ইরিগারের রচনা। এতে জানলাম, গণতন্ত্রের ভাবনাকে আজ আর পাশ্চাত্যে পুরুষ-নারীর ক্ষমতার সম্পর্কের বাইরে রাখা সম্ভব নয়। এঁরা কেউ-ই বলেন নি যে আমরা ইচ্ছে করলেই এই এন্‌লাইটেন্‌মেন্ট-চিন্তার বাইরে লাফ দিয়ে চলে যেতে পারি, কিন্তু এঁরা বারে বারেই চেষ্টিত হয়েছেন সেই আর্কিমিডীয় অবস্থান তৈরি করতে যেখান থেকে রাজনীতি সম্বন্ধে নতুন ও মৌলিক কথা ভাবা যায়।

বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্যে যে-প্রশ্নের যা উত্তর বেরুবে, তা-ই আমাদের জীবনে দুমদাম লাগিয়ে দিতে হবে, এ যুক্তি কেউ দেবেন না। প্রশ্নটি তাই আবার উত্থাপন করি : ইয়োরোপের এন্‌লাইটেন্‌মেন্ট সম্বন্ধে একটি আর্কিমিডীয় অবস্থান তৈরির প্রচেষ্টা আমাদের ইতিহাসচিন্তায় সাহায্য করতে পারে কি না। প্রশ্ন এটাই।

এজাজ় আহ্‌মদ তাঁর বইয়ের শেষ পৃষ্ঠায় বলছেন : সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সংগ্রামও একটি জাতীয় ভিত্তি

পরিগ্রহণ করে, কারণ বর্তমানে অস্তিত্বশীল জাতি-রাষ্ট্রগুলির সংগঠনই শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্রে একটি বাস্তব মূল সত্য।[২০] বেশ কথা। তা হলে দাঁড়ায় যে নাগরিক অধিকার ও জাতীয় অধিকার অর্জন ও রক্ষার লড়াই-ও নিশ্চয়ই গণতান্ত্রিক অধিকারের সংগ্রামের অংশ। অর্থাৎ উনিশ শতকের ফরাসি ইতিহাসের ক্ষেত্রে ইউজিন ওয়েবার যাকে 'ফ্রম পেজ্যান্টস্ ইনটু ফ্রেঞ্চমেন' আখ্যা দিয়েছিলেন ভারতবর্ষেও নিশ্চয়ই সেই ধরনের একটি প্রক্রিয়া— ফ্রম পেজ্যান্টস ইনটু ইন্ডিয়ান্স— গত দেড়শো বছর ধরে বিদ্যমান ? ফ্রান্সের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াটির চরিত্র বোঝাতে গিয়ে ওয়েবার সাহেব তার নাম দিয়েছেন, 'ইন্টার্নাল কলোনিয়ালিজ়ম'। অর্থাৎ প্রক্রিয়াটি সবসময় মধুর তো নয়ই (নিম্নবর্গের পক্ষ থেকে), তাতে ঔপনিবেশিক কায়দায় জোরজুলুমের যথেষ্ট জায়গাও আছে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে কি এই কৃষকের 'ভারতীয় নাগরিক' হবার ইতিহাস— যা তাঁর নাগরিকত্ব অর্জনেরই ইতিহাস— কেবলই সদিচ্ছাপূর্ণ, অহিংস, ক্ষমতাসম্পর্কশূন্য একটি মাধুর্যমণ্ডিত ইতিহাস ?

তা হলে দেখুন, 'গণতান্ত্রিক অধিকারের' সংগ্রামের ইতিহাসের মধ্যেই একটি প্যাঁচ আছে। হয় ধরে নিতে হয় মানুষমাত্রেই জন্মগতভাবে 'গণতান্ত্রিক' (দরবারি মার্ক্সবাদীরা যদি এটা মনে করেন তবে ওঁদের শরৎ চাটুজ্জের 'নারীচরিত্র'-এর মতো 'মনুষ্যচরিত্র'-জাতীয় একটা মেটাফিজিক্স তৈরি করতে হবে।), নইলে ধরতে হবে 'গণতান্ত্রিক চেতনা' একটা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আসে ও তার একটা শিক্ষাগত (পেডাগগিক) দিক থাকে। এখন 'শিক্ষা'র ইতিহাস কি কখনো 'মতাদর্শগত আধিপত্যে'র সংগ্রামের বাইরে হতে পারে ? সেই সূত্রে তাতে কি ক্ষমতার সম্পর্কের ইতিহাসের কথাও এসে পড়বে না ? অর্থাৎ, যে ইতিহাসের ভেতর দিয়ে কৃষকসন্তান ইস্কুলে যান, কলেজে যান, শহুরে হন ও পরিশেষে 'ভারতীয় নাগরিক' হন ও 'অধিকার' অর্জন করেন, সেই প্রক্রিয়াটি-ই কি একই সঙ্গে ভারতীয় ধনতান্ত্রিক শোষণ ও শহুরে মধ্যবিত্তের জাতীয় জীবনে 'হিগেমনি' বাড়াবার প্রক্রিয়া নয় ? তাই যদি হয়, তা হলে কি আমরা— মধ্যবিত্ত শহুরে বুদ্ধিজীবীরা— শুধু মার্ক্সবাদ কপচাচ্ছি বলেই সেই দায়িত্ব থেকে রেহাই পাব ?

এ কথা বলার অর্থ এই নয় যে কৃষকসন্তান ভারতীয় নাগরিক যাতে না হন, সেই প্রচেষ্টা করতে হবে। এর অর্থ একটাই : আমাদের চিন্তা করতে হবে মার্ক্সবাদের নিজস্ব ইতিহাস কী, তার সঙ্গে আধুনিক গণতন্ত্রে যেসব অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে— যেমন বিধানসংসদ, প্রেস, ভোটাভুটি, আইন, অধিকারের তত্ত্ব— সেসবের সম্পর্ক কী, এবং ওরা কী ধরনের জীবনযাত্রার ছক, ক্ষমতার বিন্যাসের ছক তৈরি করে ও আমাদের সমাজের বিদ্যমান অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও ক্ষমতার ছকের সঙ্গে এদের কী ধরনের ঐতিহাসিক সংযোগ তৈরি হয়েছে, ইত্যাদি। এটা বুঝতে গেলে মার্ক্সবাদের সঙ্গে অষ্টাদশ শতকে ইয়োরোপীয় আলোকপ্রাপ্তির ইতিহাসকে জানতে হয় এবং সেইখানেই ফুকো-দেরিদা-লিওতার ইত্যাদিরা— তাঁদের সঙ্গে আমরা একমত হই বা না হই— আমাদের সাহায্য করেন। অর্থাৎ, আমাদেরই সংগ্রাম করে এমন মার্ক্সবাদ তৈরি করতে হবে যা শাসকশ্রেণীর মতাদর্শগত হাতিয়ার নয় (ইন্দিরা গান্ধির আমলে তো মার্ক্সবাদী ইতিহাসের এই দশাই হয়েছিল)। এই কারণেই একটি আর্কিমিডীয় অবস্থানের প্রয়োজন। অন্যথায় মার্ক্সীয় দর্শনের একটি ক্রিটিক্যাল জিনিয়্যালজি আমরা রচনা করতে পারব না।

নিম্নবর্গের ইতিহাসের সন্ধানেই আজ জেনেছি যে আমাদের জীবনে এমন প্রচুর রসদ আছে যাকে ইয়োরোপ-নির্গত রাজনীতিক দর্শনের ছকে সম্পূর্ণ পুরে ফেলা যায় না। আমরা আত্মীয়তায়, সংগীতে, শিল্পে, কলায়, নৃত্যে, অভিনয়ে এমন অনেক মনোভাব ও সামাজিক সম্পর্ক প্রকাশ করি, যা বোঝার জন্য বা যার কল্পমূর্তি গঠনের জন্য ইয়োরোপীয় দর্শনের বা ইতিহাসের দ্বারস্থ হওয়া অনিবার্য হয়ে ওঠে না। ইতিহাস কীভাবে লিখব, প্রযুক্তি কেমন হবে, আধুনিক ছবি কেমন হবে, দর্শনই বা কী, পার্লামেন্ট বা ব্যুরোক্রেসি কী জিনিস— এসব কথা তাত্ত্বিকভাবে বুঝতে ইয়োরোপীয় অভিজ্ঞতা এড়াবার উপায় নেই আমাদের। অথচ ভারতীয় মার্গসংগীতের কথা ভাবুন : উনিশ শতক থেকে মধ্যবিত্তের প্রয়োজনে খানিকটা আধুনিকীকরণের চেষ্টা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ইয়োরোপীয় মার্গসংগীততত্ত্ব সম্পূর্ণ পরিহার করেও আমাদের রাগরাগিণীর তত্ত্ব বোঝা যায়। অন্তত ইতিহাসরচনাপদ্ধতি ভাবতে যে-পরিমাণ ইয়োরোপের দোরে হানা দিতে হয় আমাদের, সংগীতচর্চাপদ্ধতিতে ততটা

হয় না। আসলে ইয়োরোপ আমাদের জীবনে অনুপ্রবেশ করেছে অসমান ভাবে— কোথাও বেশি, কোথাও কম। আধুনিক শিক্ষিত বাঙালির জীবনে যেমন আছে সি. পি. এম. -মার্কা মার্ক্সবাদ, তেমনি আছে রবীন্দ্রনাথের কাছে পাওয়া বৈদান্তিক বা ঔপনিষদিক চিন্তা। আবার সেইসঙ্গে আছে পারিবারিক আচার, ক্রিয়াকর্ম, গুরুবাদ (সব পরিবর্তন সত্ত্বেও)। এই বৈচিত্র্যকে কী করে একটি ইয়োরোপীয় দর্শনের গ্রন্থিতে বাঁধব ? ও.আই.এম.-এর উত্তরটা সহজ ছিল : অর্থনীতিটা 'বেস', সংস্কৃতিটা 'সুপারস্ট্রাকচর'। সুপারস্ট্রাকচরে নানা ফেঁকড়া থাকতেই পারে, তা ওই 'বেস'-এ নানা গোলমালেরই প্রতিফলন। সত্তর দশকের ইতিহাসচর্চায় এই 'বেস'-এর নাম সোজা করে হয়েছিল 'কলোনিয়ালিজ়ম'। এই মন্ত্র উচ্চারণ করলে ও আমাদের 'বুর্জোয়া' হওয়া সম্পূর্ণ হয় নি বললে, স-ব পরিষ্কার হয়ে যেত।

আজ এই সহজ পন্থার ভূত ঘাড় থেকে নেমেছে। এটা বোঝা গেছে যে আমাদের সমস্ত ইতিহাস, সামাজিক-ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিন্যাস ইয়োরোপীয় দর্শনের ক্যাটিগরিতে ঢেলে সাজাতে যাওয়া সেই কুকুরের লেজ সোজা করার মতো কাজ। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ইয়োরোপীয় দর্শন— মার্ক্সবাদ তো একটি ইয়োরোপীয় দর্শনই বটে— বর্জন করে বাঁচা যাবে। বরঞ্চ বলি : আমাদের জীবনে ইয়োরোপীয় প্রাতিষ্ঠানিক প্রভাব কতখানি এসেছে, কোথায় তারা গভীর ও কোথায় তারা অগভীর, কোথায় ও কেন তারা অপরিহার্য, কোথায় আমরা স্বচ্ছন্দে ইয়োরোপীয় দর্শনের গভীর জ্ঞান ছাড়াই আমাদের জীবন ও সমাজ বুঝতে পারি— আজকের ইতিহাসের প্রশ্ন এগুলিই। এর জন্যও প্রয়োজন ইয়োরোপীয় এন্‌লাইটেন্‌মেন্টকে সমালোচনাত্মকভাবে বোঝা, আর এই বোঝার দৃষ্টিকোণটিই সেই আর্কিমিডীয় অবস্থান, যার কথা আগেই বলেছি।

এ কথা সত্যি যে পাশ্চাত্যে, বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য-অধ্যয়নের বিভাগগুলিতে, দেরিদা-ফুকো প্রমুখের রচনার দার্শনিক তত্ত্বগুলি জোলো হয়ে একধরনের 'সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতা'র (কালচরাল রিলেটিভিজ়ম) জন্ম দিয়েছে (মার্কিন মুলুকের ভাষায় এখন যাকে পলিটিক্যাল করেক্টনেস বলে, এ তারই অংশবিশেষ)। আহ্‌মদের রচনায় এই 'আপেক্ষিকতা'র তত্ত্বের বিরুদ্ধে অনেক বিরক্তির প্রকাশ আছে। এই বিরক্তি মার্ক্সবাদীদের একচেটে কিছু নয়, সম্প্রতি প্রখ্যাত 'স্ট্রাকচরালিস্ট' নৃতত্ত্ববিদ মার্শাল সাহ্‌লিন্‌স্-ও একটি ছোটো পুস্তিকায় এই জোলো বালখিল্য 'পোস্টস্ট্রাকচরালিস্ট'দের এক হাত নিয়েছেন।[২১] কিন্তু দার্শনিকভাবে জোলো আহ্‌মদের বইটিও। ভারতবর্ষে সাবঅলটার্ন স্টাডিজ় প্রসঙ্গে যে-বিতর্ক, তাতে এই 'সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতা'র (বা অন্ধ স্বাদেশিকতার) অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। 'সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতা' একটি অচল ও স্ববিরোধীতত্ত্ব, এ-কথা বহুদিন পূর্বেই বার্নার্ড উইলিয়াম্‌স তাঁর 'মর‍্যালিটি' শীর্ষক বইতে দেখিয়েছিলেন।[২২] আজ তার জিগির তোলার অর্থ ভারতবর্ষে ইতিহাস-চিন্তার বিতর্ককে একটি পুরোনো-বুলির-মাছি-তাড়ানোর অভ্যাসে পরিণত করা। বি. জে. পি. এসেছে বলেই কি চিন্তাভাবনার পাট চুকিয়ে সবাই মিলে দরবারি রাগে গাইতে হবে ? বি. জে. পি.-র কদর্য রাজনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু আমাদের 'আধুনিক'-হবার ইতিহাসে ইয়োরোপীয় দর্শন ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার সঙ্গে আমাদের জীবনযাত্রার কী কী ধরনের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, এটা আমাদের আধুনিকতার একটি মূল প্রশ্ন। এ বিষয়ে সকলেরই এক উত্তর হবে তা অবশ্যই নয়, কিন্তু উত্তর-খোঁজার প্রচেষ্টাটিকে যদি সম্পূর্ণভাবে বি. জে. পি.-নিধন যজ্ঞের অঙ্গীভূত করে ফেলা হয়— অর্থাৎ বি. জে. পি.-র লাভ হবে, না ক্ষতি হবে, এইটাই যদি 'আধুনিকতা'র ইতিহাস-জিজ্ঞাসার সত্য-যাচাইয়ের চূড়ান্ত নিরিখ হয়— তা হলে যজ্ঞটি খুব জোরালো হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু চিন্তার ভাণ্ডে শুধুই থাকবেন মা ভবানী ! দরবারি মার্ক্সবাদই আজকের ভারতবর্ষে বামমার্গীদের পলিটিক্যাল করেক্টনেস আন্দোলন। পাঠক, সাবধান !

টীকা

১. গত বছরে মার্কিন পত্রিকা *Public Culture*-এর একটি সংখ্যাই (vol. 6, No. 1, 1993) আহ্‌মদের বইটির মূল্যায়নে নিয়োজিত হয়। তাতে দেশস্থ লেখকদের মধ্যে ছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও বিবেক ধারেশ্বর।
২. *In Theory : Classes, Nations, Literatures*, London, 1992, pp, 68-69, 84-86.
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮
৪. নামটির জন্য আমি রণজিৎ গুহর কাছে ঋণী।
৫. *In Theory*, p. 192, 194.
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯।
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭১।
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৭।
৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫২, ২৫৫ (ইটালিক হরফ আমার : দী.চ.)।
১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬।
১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪।
১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৫।
১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৫-৫৬।
১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪-৭৫।
১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৬।
১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৬।
১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৩।
১৮. Christopher Norris, *The Truth about Postmodernism*, Oxford, 1993.
১৯. পাঠক দেখবেন : Jürgen Habermas, *The Philosophical Discourses of Modernity : Twelve Lectures*, Cambridge, MIT Press, 1987 ; Rechard J. Bernstein, ed., *Habermas and Modernity*, Cambridge, 1985 ; Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Explained to Children : Correspondence 1982-1985*, Sydney, 1992.
১৯ক. Sumit Sarkar, 'The Fascism of the Sangh Parivar', *Economic and Political Weekly*, 30 January 1993, pp. 163-167.
২০. *In Theory*, p. 318.
২১. Marshal Sahlins, *Waiting for Foucault*, Cambridge, 1993.
২২. Bernard Williams, *Morality : An Introduction to Ethics*, Harmondsworth, Middlesex, 1973.

ভারত ও মধ্য এশিয়া : সম্পর্কের পটভূমি

ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

উত্তরে, উত্তর-পশ্চিমে ও উত্তর-পূর্বে হিমালয় ও তার সঙ্গী পর্বতশ্রেণী (যেমন একদিকে হিন্দুকুশ, সুলেমান, ব্রাহুই, পাব ইত্যাদি এবং অন্য দিকে পাতকোই, নাগা, লুসাই, চীন পর্বত প্রভৃতি) এবং দক্ষিণে, দক্ষিণ-পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পূর্বে যথাক্রমে ভারত মহাসাগর, আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত ও সুনির্দিষ্ট ভারতীয় উপমহাদেশ ইতিহাসের আদিকাল থেকে এক পূর্ণ ভৌগোলিক সত্তার অধিকারী। এই সত্তা অন্তর্দেশীয় ভৌগোলিক বাধা (পাহাড়, নদী ইত্যাদি) এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা সত্ত্বেও অবিভাজ্য। এই ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের সূত্রের প্রথম সন্ধান দিয়েছিল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি, প্রাকৃত ভাষা ও ব্রাহ্মী লিপির বহুল প্রচলন। আঞ্চলিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও গড়ে উঠেছিল প্রায় সমগ্র উপমহাদেশব্যাপী এক সংযোগকারী সংস্কৃতি। প্রধানত এই ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের ফলে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতকের মধ্যে এই সমগ্র ভূখণ্ড তার অধিবাসীদের কাছে জম্বুদ্বীপ এবং গ্রিসীয় লেখকদের কাছে 'ইন্দোই (ইন্ডিয়া) নামে পরিচিত হল। খ্রিস্টীয় প্রথম কয়েক শতকের মধ্যে সারা উপমহাদেশের নাম হল ভারতবর্ষ। বায়ুপুরাণ-এর বর্ণনা অনুযায়ী 'সমুদ্রের উত্তরে ও হিমালয়ের দক্ষিণে যে ভূখণ্ড তার নাম ভারতবর্ষ, যার সন্ততিদের নাম ভারতী' (৪৫, ৭৫-৭৬)। বিভিন্ন পুরাণে ভারতবর্ষের যেসব নদী, পর্বত এবং জনপদের (ও উপজাতিদের) উল্লেখ আছে সেগুলির শনাক্তকরণ থেকে স্বতই প্রমাণিত হয় যে সমগ্র উপমহাদেশ ভারতবর্ষ নামে পরিচিত ছিল। এর অধিবাসীদের নাম ভারতী। এই নামের মধ্যেই ফুটে উঠেছে ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক অর্থে ঐক্যবদ্ধ এক জাতির চেহারা।[১] যুগে যুগে এই চেহারার বাইরের রঙ বদলালেও ভিতরের কাঠামোর কোনো মূলগত পরিবর্তন হয় নি।[২] জাতির জীবনে এই ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক আবশ্যিকতাকে সম্পূর্ণভাবে অবহেলা করা হয়েছিল ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশভাগের সময়। তার আগে পর্যন্ত ভারতবর্ষ বা ইন্ডিয়া একটি সুনির্দিষ্ট 'একক' ভূখণ্ড, যেখানে সর্বভারতীয় সংস্কৃতির ছত্রছায়ায় বহু আঞ্চলিক সংস্কৃতির বিকাশ অব্যাহত।

এই ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের চেহারা কিন্তু 'মধ্য' বা 'অভ্যন্তরীণ' এশিয়া (সেন্ট্রাল অথবা ইনার এশিয়া) নামে সাধারণত পরিচিত ভূখণ্ডে দেখা যায় না।[৩] এই নামের ঐতিহাসিকতাও 'ভারতবর্ষ' বা ইন্ডিয়া নামের মতো প্রাচীন নয়, বরং তুলনায় একেবারেই অর্বাচীন। তার উপরে আবার ওই নামের ভূখণ্ডের সীমানা নিয়ে নানা মতভেদ।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক ভি. ভি. বার্থোল্ড মধ্য এশিয়া বলতে প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম তুর্কিস্তান (বা পূর্বতন সোভিয়েত মধ্য-এশিয়া) এবং তৎসংলগ্ন কয়েকটি অঞ্চলকে বুঝিয়েছিলেন।[৪] বর্তমানে রুশরা সাধারণত কেবলমাত্র উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও কিরঘিজ অঞ্চল এবং কজাখস্তানের দক্ষিণ-অংশকে মধ্য এশিয়ার সীমানাভুক্ত বলে মনে করেন।[৫] আবার অনেক রুশ পণ্ডিতের মতে মধ্য এশিয়া ও অভ্যন্তরীণ এশিয়া দুটি পৃথক ভৌগোলিক সত্তা। এ. এম. খাজানভের ধারণা অনুযায়ী, মধ্য এশিয়া উত্তরে আরল সাগর ও কজাখ তৃণভূমি থেকে দক্ষিণে কোপেট-দাঘ ও হিন্দুকুশ এবং পশ্চিমে কাস্পীয় (কাস্পিয়ান) সাগর থেকে পূর্বে পামির অবধি বিস্তৃত। অন্য দিকে অভ্যন্তরীণ এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত : কাশগড়িয়া, জুঙ্গারিয়া (অর্থাৎ মোটামুটিভাবে সিন-কিয়াং বা হিন-জিয়াং ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল), মঙ্গোলিয়া এবং তিব্বত।[৬]

এই ধরনের পৃথককরণ যেসব ঐতিহাসিক মানেন না তাঁদের অনেকের মতে এই দুটি প্রধান ভূখণ্ড নিয়েই মধ্য এশিয়া।[৭] কিন্তু এঁদের মধ্যে কোনো কোনো পণ্ডিত মধ্য এশিয়া ও অভ্যন্তরীণ এশিয়া নাম দুটিকে প্রায়

সমার্থক বলে ধরে নিলেও দ্বিতীয়টির ভৌগোলিক বিস্তার উপরে নির্দিষ্ট অঞ্চলগুলিকেও ছাড়িয়ে যায় বলে দাবি করেন। ডি. সিনর এবং আর. এন. টাফে মনে করেন যে কৃষ্ণসাগরের উত্তর ও পূর্বে (বা মোটামুটিভাবে ৩০° দ্রাঘিমার পূর্বে), সুমেরু সাগরের দক্ষিণে, তুরস্ক, ইরান, আফগানিস্তান ও ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তরে এবং পূর্ব চীন সমেত পূর্ব এশিয়ার পশ্চিমে বিস্তৃত বিশাল ইউরেশীয় ভূখণ্ডই 'ইনার' বা 'অভ্যন্তরীণ' এশিয়া। এর সীমানার মধ্যে তুন্দ্রা-অঞ্চল, অরণ্য, তৃণভূমি ও মরুভূমি।[৮] সিনর-এর মতে ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করলে এই ভূখণ্ড স্থায়ীভাবে বসবাসকারী সভ্যজাতিদের বাসভূমির বাইরে অবস্থিত এশিয়া মহাদেশ। কিন্তু ইংরেজি 'ইনার' কথাটি যদি আক্ষরিক অর্থে বোঝায় 'অভ্যন্তরস্থ' বা 'অভ্যন্তরীণ', তা হলে সুমেরু সাগরের তীরবর্তী এশীয় অঞ্চল 'অভ্যন্তরীণ' এশিয়ার সীমানাভুক্ত হতে পারে না।[৯]

দেখা যাচ্ছে যে ইতিহাসের গবেষকদের কাছে 'অভ্যন্তরীণ' এশিয়া কখনো খুব বিস্তৃত আবার কখনো বেশ সংকীর্ণ বলে মনে হয়েছে।[১০] এই সমস্যার প্রধান কারণ নিশ্চয়ই 'মধ্য' বা 'অভ্যন্তরীণ' এশিয়ার ক্ষেত্রে প্রকৃতির দ্বারা সুনির্দিষ্ট সীমানার অভাব। এই সমস্যাকে আরও জটিল করেছে ইউরেশীয় তৃণভূমি কিংবা মরুভূমি অঞ্চলে আদি ও মধ্যযুগের মানুষদের সংস্কৃতির মান সম্পর্কে কোনো কোনো পশ্চিমা পণ্ডিতের অদ্ভুত ধারণা। সম্প্রতি প্রকাশিত এক গ্রন্থে 'অভ্যন্তরীণ' এশিয়াকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে 'সভ্য জগতের' বিপরীত 'বর্বরদের জগৎ' হিসেবে।[১১] কিন্তু একই গ্রন্থে ব্যবহৃত সংজ্ঞা অনুযায়ী 'অভ্যন্তরীণ' এশিয়ার অন্তর্গত বর্তমানে চীনের সিন-কিয়াং (বা হিন-জিয়াং) প্রদেশে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিস্কারের ফলে খ্রিস্টীয় প্রথম সহস্রাব্দের যে অমূল্য সাহিত্যসম্ভারের সন্ধান পাওয়া গেছে তা কোনো বর্বরজাতির দ্বারা রচিত, অনুলিখিত বা আলোচিত বলে মানা সম্ভব নয়। বরং মনে হয় যে পূর্বজগৎ সম্পর্কে পশ্চিমা শ্বেতকায়দের সংস্কারগত অবজ্ঞা তাঁদের অনেকের দৃষ্টিভঙ্গি এখনও আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

এ ছাড়া আছে রাজনৈতিক ধ্যানধারণা ও সুবিধার প্রভাব। মধ্য এশিয়ার বহুসংখ্যক ভৌগোলিক সংজ্ঞা অনুযায়ী পূর্ব তুর্কিস্তান (মোটামুটিভাবে বর্তমানের সিন-কিয়াং বা হিন-জিয়াং) মধ্য এশিয়ার অংশ। অন্য দিকে অবশ্য রাজনৈতিকভাবে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিভিন্ন সময়ে এই এলাকা চীনের অধীনে ছিল এবং বর্তমানে তার রাজনৈতিক সীমানাভুক্ত। তাই চীনারা সাধারণত এই অঞ্চলটিকে (রাজনৈতিক কারণে) পশ্চিম চীন বলে চিহ্নিত করলেও[১২] একে মধ্য এশিয়ার ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে রাখতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু কমিউনিস্ট চীন রাষ্ট্রসংঘের (ইউনাইটেড নেশন্‌স অর্গানাইজেশন) সদস্য হওয়ার আগে ইউনেস্‌কো-কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদনে চীনের এই অংশকে মধ্য এশিয়ার সীমানাভুক্ত করা হয় নি, যদিও আফগানিস্তান, ইরান, পাকিস্তান এবং এমন-কি, ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ভূখণ্ডকে মধ্য এশিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে (অন্ততপক্ষে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে)।[১৩] বর্তমানে অবশ্য ইউনেস্‌কোর প্রতিবেদনে সদস্য-রাষ্ট্র চীনের পশ্চিম অংশকে মধ্য এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয় ; যদিও এখনও পাকিস্তান ও উত্তর ভারতকে এর সীমানার মধ্যেই রেখে দেওয়া হয়েছে।[১৪]

মধ্য এশিয়া নামে কখনো কোনো রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন দেশ ও জাতি ছিল না। মধ্য এশিয়া একটি ভূগোলভিত্তিক অস্বচ্ছ ঐতিহাসিক ধারণা। সুতরাং এর ভৌগোলিক সীমানা মানচিত্রের ভিত্তিতেই করতে হবে। কিন্তু এশিয়ার ঠিক মধ্যভাগের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাগত অবস্থান ঠিকভাবে স্থির করা খুব সহজ নয়। কারণ এশিয়ার চার দিকের সীমানার কোনোটাই স্বাভাবিকভাবেই কোনো সরলরেখা ধরে বিস্তৃত নয়। তবে পশ্চিমে কাস্পীয় সাগর ও উরাল পর্বতমালা থেকে পূর্বে নান শান ও চীনের মহাপ্রাচীর এবং দক্ষিণে তিব্বত, ভারতীয় উপমহাদেশ, আমু-দরিয়া, আফগানিস্তান ও ইরান থেকে উত্তরে সাইবেরিয়ার পাইনগাছের বন সহ জলাভূমি অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডকে মধ্য এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই। এই ভূখণ্ডের সীমানার মধ্যে আছে চীনের সিন-কিয়াং (হিন-জিয়াং) ও কান-সু (বা গান-সু) প্রদেশ, মঙ্গোলিয়ার পশ্চিমাংশ, কজাখস্তান, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান ও কিরঘিজ অঞ্চল এবং দক্ষিণ সাইবেরিয়ার কিছু অংশ। এই অঞ্চল

মধ্য এশিয়ায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের পথরেখা

বা রাষ্ট্রগুলি মোটামুটিভাবে ৩৭° উত্তর থেকে ৬০° উত্তর এবং ৬০° পূর্ব থেকে ১০৫° পূর্বের মধ্যে অবস্থিত। এই মধ্য এশিয়ার অন্তরতম বা প্রধানতম অংশ তুর্কিস্তান। এর পূর্বাংশ (অর্থাৎ পূর্ব তুর্কিস্তান) চীনের রাজনৈতিক সীমানাভুক্ত, আর পশ্চিমাংশে আছে কয়েকটি স্বাধীন রাষ্ট্র (যেগুলি কয়েক বছর আগেও ছিল সোভিয়েত শাসনব্যবস্থার অধীন)।[১৫]

প্রাচীন ও মধ্য যুগের সংস্কার ও জীবনধারার নিরিখে বিচার করলে দেখা যায় যে এই বিশাল মধ্য এশিয়ায় ছিল দুটি প্রধান অঞ্চল। উত্তরে কজাখস্তানের তৃণভূমি থেকে আরম্ভ করে সাইবেরিয়ার ইএনিসি নদীর দক্ষিণ অংশের তীরবর্তী অঞ্চল এবং মঙ্গোলিয়া (এবং মধ্য এশিয়ার বাইরে হলেও মঙ্গোলিয়া-সংলগ্ন অন্তর্মঙ্গোলিয়া ও মাঞ্চুরিয়া) ছিল প্রাচীন ও মধ্য যুগে নানা যাযাবর জাতি ও উপজাতির বিচরণভূমি। অন্য দিকে, দক্ষিণে বক্ষু (অক্সাস) বা আমু-দরিয়া ও ইআক্সারটিস বা সির-দরিয়ার তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে এবং হিন-জিয়াং-এর তাকলা মাকান মরুভূমির উত্তরে ও দক্ষিণে বিভিন্ন মরূদ্যান সমেত ছোটো ছোটো বাসযোগ্য অঞ্চলে থাকত মোটামুটিভাবে স্থায়ী বসবাসকারী বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি।[১৬] এদের মধ্যে অনেকেই যাযাবরবৃত্তি ত্যাগ করে স্থায়ী অধিবাসীতে পরিণত হয়েছিল। আবার স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতি বা উপজাতির বাসভূমির মধ্যে দিয়ে যাযাবরদের অভিপ্রয়াণের সময় দুই শ্রেণীর মধ্যে সংঘাতও ঘটত। বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেদের জীবনধারা ও তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ, উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণের যোগাযোগ এবং এই সকল অঞ্চলের সঙ্গে বাইরের জগতের সম্পর্কের বিবরণ নিয়েই মধ্য এশিয়ার প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস। এই ইতিহাসের এক বড়ো অংশ জুড়ে আছে এই বিশাল ভূখণ্ডের সঙ্গে ভারতীয় উপমহাদেশের সম্পর্কের কথা।

২.

যেসব যোগাযোগের পথের মাধ্যমে এই সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তাদের সন্ধান খানিকটা মেলে বিভিন্ন প্রাচীন আকর গ্রন্থে। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম ও পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর কয়েকটি চীনা রচনা। চীনের পুরাতন হান বংশীয় রাজা উ-তি (খ্রি. পূ. ১৪১-৮৬)-কর্তৃক খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের তৃতীয় পাদে 'পশ্চিম' দিকে প্রেরিত দূত চ্যাং-কি'এনের এক প্রতিবেদন থেকে মনে হয় যে, সিন-কিয়াং অঞ্চলের উত্তর অংশের অর্থাৎ তাকলা মাকান মরুভূমির উত্তর দিকের এক পথ দিয়ে চীনের প্রধান অংশ থেকে কুই বা আমু-দরিয়ার তীরবর্তী ভূখণ্ডে যাতায়াত করা সম্ভবপর ছিল। চ্যাং-কি'এনের প্রতিবেদনে যে অবস্থার কথা বলা হয়েছে তা মোটামুটিভাবে খ্রিস্টপূর্ব ১৩০-২৯ অব্দের। এখানে বলে রাখা উচিত যে মূল প্রতিবেদনটি হারিয়ে গেছে। ফলে চ্যাং-কি'এনের সাক্ষ্য সম্পর্কে আমাদের নির্ভর করতে হয় স্সু-মা-তান ও স্সু-মা-চি'এনের বই 'শি-চি'তে এই প্রতিবেদন থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃত অংশের উপরে।[১৭] এইসব উদ্ধৃতি লিপিবদ্ধ হয় আনুমানিক খ্রি. পূ. ১০০ অব্দে বা তার অল্প আগে।

প্রাচীন যোগাযোগের পথ সম্পর্কে অনেক বেশি খবর পাওয়া যায় খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের 'হান-শু' বা 'চি'এন-হান-শু' গ্রন্থে। প্রাচীন চীন বা তদানীন্তন হান রাজ্য থেকে পশ্চিম দিকে যাবার দুটি পথের উল্লেখ করা হয়েছে : একটি 'উত্তরের পথ', অন্যটি 'দক্ষিণের পথ'। দুটি পথেরই শুরু য়ু(এ)-মেন ও ইয়াং অঞ্চল থেকে (অর্থাৎ বর্তমান কান-সু বা গান-সু প্রদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে)। দক্ষিণের পথ শান-শান রাজ্য (সিন-কিয়াং প্রদেশের লপ-নরের দক্ষিণস্থ অঞ্চল) পেরিয়ে এবং য়ু (এ)-তি'এনের (খোটানের) নিকটস্থ দক্ষিণ পর্বতমালার উত্তর দিয়ে ও এক নদীর পাশ দিয়ে সো-কু (এ) অঞ্চলে বা ইয়ারকন্দে পৌঁছোত। আরও পশ্চিমে (প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ-পশ্চিমে) এই পথ সু'ং-লিং বা পামির পেরিয়ে তদানীন্তন তা ইউএচ-চি (কুষাণ) রাজ্যের (অর্থাৎ ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমভাগে কুষাণ রাজ্যের এক অংশের) মধ্য দিয়ে আন-সি রাজ্যে (অর্থাৎ আর্সাকীয় পহ্লবদের ইরান সমেত রাজ্যে) এসে শেষ হত। 'উত্তরের পথ' কু (এ)-শি বা ইয়ার-খোটান অঞ্চল পেরিয়ে উত্তরের পর্বতমালার ও এক নদীর পাশ দিয়ে পৌঁছোত সু-লো বা কাশগড়ে। এর পরে এই পথ দিয়ে পশ্চিমে (বা উত্তর-

পশ্চিমে) তা-য়ু (এ)আন (উজবেকিস্তান ও কিরঘিজ দেশের সীমান্তবর্তী ফরগনা অঞ্চল), কা'ং-কু(এ) (সির-দরিয়া নদীর দুই পাশে এবং এই নদী ও আমু-দরিয়া বা অক্সাসের মধ্যবর্তী সুগুদ বা সোগদিয়ানার একাংশে) ইত্যাদি স্থানে যাওয়া যেত।[১৮]

আরও পথনির্দেশ পাওয়া যায় 'হৌ-হান-শু' গ্রন্থের ১১৮তম অধ্যায়ে, যা মোটামুটিভাবে ১২৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তৈরি এক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে লেখা। এই অধ্যায় থেকে মনে হয় যে চীনের তুন-হুয়াং (বা দুন-হুয়াং) থেকে এক পথ দিয়ে শান-শানে (অর্থাৎ সিন-কিয়াং প্রদেশের লপ-নরের দক্ষিণে) পৌঁছোনো যেত। এইখানে 'বিভিন্ন পশ্চিমদেশমুখী' দুটি রাস্তার শুরু, একটির গতি তাকলা মাকান মরুভূমির উত্তর দিয়ে, অন্যটির দক্ষিণ দিয়ে। দক্ষিণের রাস্তায় পড়ত চু-মো (চল্‌মদান বা বর্তমানের চারচান), য়ু (এ)-তি'এন (খোটান), সো-কু(এ) (ইয়ারকন্দ), সু'ং-লিং (পামির অঞ্চল), তা ইউএচ-চি রাজ্য (অর্থাৎ কুষাণ-শাসিত অঞ্চল যার মধ্যে ছিল কাশ্মীরসহ ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশ) এবং আন-সি রাজ্য (অর্থাৎ কুষাণ সাম্রাজ্যের পশ্চিমে অবস্থিত আর্সাকীয় পহ্লবদের অধীনস্থ ইরান সমেত এক ভূখণ্ড)।[১৯]

খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকের গ্রন্থ 'উই-লু'-এর মতে আলোচ্য পথটি শুরু হত তুন-হুয়াং-এর নিকটবর্তী য়ু-মেন-কুয়ানে। এই দক্ষিণের পথ ধরে যে-কোনো লোকের পক্ষে কি-পিন বা চি-পিম (প্রাচীন কাশ্মীর অর্থাৎ কাশ্মীর উপত্যকা সহ উত্তর-পশ্চিম ভারতের একটি অংশ), তা-সিয়া বা তা-হিয়া (প্রাচীন বাহ্লীক দেশের পূর্বাংশ বা বর্তমানে মোটামুটিভাবে হিন্দুকুশ পর্বতের উত্তরের অঞ্চলের পূর্বভাগে বাদাখশান ও ওয়াখান সমেত এক প্রদেশ) এবং তি'এন-চু (অথবা সেন-তু অর্থাৎ নিম্ন সিন্ধুনদের দুই তীরবর্তী অঞ্চল বা মোটামুটিভাবে বর্তমান সিন্ধুপ্রদেশ) প্রভৃতি দেশে যাওয়া সম্ভবপর ছিল।[২০]

'হৌ-হান-শু'-তে বর্ণিত 'উত্তরের পথে' পড়ত 'অগ্রবর্তী' কু-শি (তুরফানের অদূরবর্তী ইয়ার-খোটান), ইএন-কি' বা য়েন-কি' (অগ্নিদেশ বা এখনকার কারাশার), কুই-জু (কুৎ সি, কুচি বা কুচা), কু-মো (ভরুক বা এখনকার আক্‌সু), ওএন-সু (বর্তমানের উচ্-তুরফান) এবং সু-লো (কাশগড়)। 'উই-লু'-তে এই 'উত্তরের পথকেই' 'মধ্যবর্তী পথ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বইটির মতে য়ু-মেন কুয়ান থেকে নির্গত এই পথ প্রাচীন লৌ-লান (শান-শান রাজ্যের অন্তর্গত), কুই-জু (কুচা) প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত ছিল। খুব সম্ভবত এই পথের উপরে অবস্থিত কু-মো (আক্‌সু) থেকে যাওয়া যেত ইস্সিক-কুলের তীরবর্তী সক (শক) রাজ্যে।[২১]

'হৌ-হান-শু' আর-একটি রাস্তার ইঙ্গিত করে, যেটি য়ু-মেন, শান-শান, ই (বা য়ি)-ওউ (এখনকার হামি), কাও-চা'ং (তুরফান), 'অগ্রবর্তী' কু (এ)-শি (ইয়ার-খোটান), 'পশ্চাদ্‌বর্তী' কু (এ)-শি (গুচেনের নিকটস্থ এক অঞ্চল) ইত্যাদির উপর দিয়ে যেত। শেষ পর্যন্ত এই রাস্তা কুই-জু বা কুচাতে এসে 'উই-লু'-তে বর্ণিত 'মধ্যবর্তী' রাস্তার সঙ্গে মিলিত হত। 'উই-লু'-তে একে বলা হয়েছে 'নতুন পথ'। হয়তো এই পথের উপরে অবস্থিত কাও-চা'ং (তুরফান) অথবা ই-ওউ (হামি) থেকে বর্তমান মঙ্গোলিয়ার অন্তর্ভুক্ত ভূখণ্ডে পৌঁছোনো সম্ভবপর ছিল।[২২]

সু-লো বা কাশগড়ের উত্তর-পশ্চিমে বা পশ্চিমে ছিল : তা-য়ু (এ) আন (উজবেকিস্তান ও কিরঘিজিয়ার সীমানাবর্তী ফরগনা অঞ্চল), কা'ং-কু(এ) (যা এক সময়ে ইয়াক্সারতেস বা সির-দরিয়া নদীর দুই তীরে বিস্তৃত এবং আমু-দরিয়া ও সির-দরিয়ার মধ্যবর্তী সুগুদ বা সোগদিয়ানা দেশের অংশবিশেষ জুড়ে ছিল), তা-সিয়া (পূর্ব বাহ্লীক দেশ) ইত্যাদি। দক্ষিণে সু-লো বা কাশগড়ের খুব সম্ভবত যোগ ছিল সো-কু (এ) বা ইয়ারকন্দ এবং কি-পিন (প্রাচীন কাশ্মীর সহ উত্তর-পশ্চিম ভারতের একাংশ) প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে।[২৩]

খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের একেবারে শেষে ফা-সিএন (বা ফা-হিএন) খোটান থেকে খুব সম্ভবত ইয়ারকন্দ ও পামির হয়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রবেশ করেছিলেন।[২৪] খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে ভারত থেকে চীনে প্রত্যাবর্তনের পথে সুয়ান-সাং (বা হুয়ান-জাং) পো-তো-চা'ংন (বাদাখশান), কা-শ (কাশগড়), চে-কু-ক (ইয়ারকন্দ), কু-স-তন-ন (কুস্তন বা খোটান) প্রভৃতি দেশের ভিতর দিয়ে ভ্রমণ করেছিলেন।[২৫]

পূর্বোক্ত চীনা আকর গ্রন্থগুলির সাক্ষ্য থেকে মনে হয় যে সিন-কিয়াং প্রদেশের তাকলা মাকান মরুভূমির

উত্তর ও দক্ষিণস্থ পথ দিয়ে প্রাচীন চীন থেকে কাশগড়ে পৌঁছোনো যেত। এই পথ দুটির মধ্যে উত্তরের পথটির মাধ্যমে প্রাচীন চীনের সঙ্গে প্রথম পশ্চিম-মধ্য এশিয়া এবং তার মারফত ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। পরে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারে দক্ষিণের পথ সমধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

মধ্য এশিয়ার সঙ্গে পশ্চিম এশিয়া ও ভারতীয় উপমহাদেশের সংযোগের কয়েকটি প্রধান রাস্তার কথা জানা ছিল। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের কিছু রচনার পরবর্তী কালের উদ্ধৃতি থেকে মনে হয় যে উত্তর-পশ্চিম এশিয়া থেকে নির্গত এক পথ কাস্পীয় সাগরের দক্ষিণ দিক দিয়ে (অর্থাৎ বর্তমান ইরানের উত্তরাংশ দিয়ে) এবং হেকাতমপাইলস (দামঘান), আরিয়া (উত্তর-পশ্চিম আফগানিস্তানের হেরাট), দ্রাঙ্গে বা দ্রাঙ্গিয়ানা (দক্ষিণ-পশ্চিম আফগানিস্তানের সিস্তান), আরাকোসিয়া (কান্দাহার সহ দক্ষিণ-পূর্ব আফগানিস্তান) প্রভৃতি মারফত হোরতস্পানামে বা কাবুল অঞ্চলে পৌঁছোত। সেখান থেকে যাওয়া যেত 'ইন্দিয়ার (ইন্ডিয়ার) শহর পিউকোলাতিস বা পুস্কলাবতী (পেশোয়ার জেলার চারসাদা)', তক্ষশিলা বা তাক্সিলা (রাওয়ালপিণ্ডির কাছে) এবং আরও বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ অঞ্চলে। শেষ পর্যন্ত এই পথে পৌঁছোনো যেত পালিবোথরা বা পাটলিপুত্র (পাটনা অঞ্চলে)। এখান থেকে গঙ্গার (এক) মোহানা অবধি যাতায়াত করাও সম্ভবপর ছিল (নদীপথে বা স্থলপথে)।[২৬] হিন্দুকুশের উত্তরে এবং অক্সাস বা আমু-দরিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত বাহ্লীক (বাকত্রিয়া) দেশের রাজধানী বাকত্রার (বা বাল্‌খের) সঙ্গে পশ্চিম দিকে আরিয়া (হেরাট অঞ্চল) ও মার্গিয়ানা (তুর্কমেনিস্তানের মার্ভ অঞ্চল) ইত্যাদির সঙ্গে এবং উত্তর দিকে সোগদিয়ানা (আমু-দরিয়ার তীরবর্তী) এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে হিন্দুকুশের গিরিপথ পেরিয়ে কুভা (কাবৌরা বা কাবুল), কপিশা (বেগ্রাম), লম্পাক (লামঘান) প্রভৃতির সঙ্গে নিশ্চয়ই যোগাযোগ ছিল। ভারতীয় উপমহাদেশের সীমান্তের অদূরবর্তী পূর্ব আফগানিস্তানের লামঘান অঞ্চলে আবিস্কৃত মৌর্য নৃপতি অশোকের (আনু. খ্রি. পূ. ২৭২-২৩৬) দুটি শিলালেখতে উল্লেখিত কারপথি অর্থাৎ প্রভুর (বা সৈন্যবাহিনী যাতায়াতের) পথ[২৭] এবং এরাতসথিনিস (আনু. খ্রি. পূ. ২৭৫-১৯৪) -বর্ণিত পশ্চিম (উত্তর-পশ্চিম) দিক থেকে পালিমবোথরা (পাটনা অঞ্চল) অবধি বিস্তৃত 'রাজকীয় পথ'[২৮] বোধ হয় পশ্চিম এশিয়া থেকে নির্গত পথটির সঙ্গে যুক্ত ছিল। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষের দিকে সংকলিত 'স্তাথমোই পার্থিকোই' পুস্তিকায় ইউফ্রেতিস নদী-তীরবর্তী ভূখণ্ড থেকে আরাকোসিয়ার আলেকজান্দ্রাপোলিস পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যাতায়াতের যে পথের বর্ণনা পাওয়া যায়, সেটি বর্তমানের উত্তর ইরান, দক্ষিণ তুর্কমেনিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পূর্ব আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে প্রসারিত ছিল বলে মনে হয়।[২৯] খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের এক নাবিকের লেখা 'পেরিপ্লৌস তেস ইরিথ্রাস থালাস্সেস' থেকে জানা যায় যে থিন বা চীন থেকে বাণিজ্যসম্ভার [মধ্য এশিয়া], বাকত্রিয়া [ইত্যাদি এবং উত্তর ভারত] মারফত নর্মদা নদীর তীরস্থ বারুগাজা বা ব্রোচে নিয়ে আসা হত।[৩০]

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে খাইবার, গোমাল, বোলান বা মূলা গিরিপথের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করা যেত। নিম্ন সিন্ধু অঞ্চল থেকে ইরান যাওয়ার একটি পথ ছিল বিপদসংকুল মাকরান অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু বেশ দুর্গম পথ দিয়ে মধ্য এশিয়া থেকে কি-পিনে (অর্থাৎ কাশ্মীর উপত্যকাসহ উত্তর-পশ্চিম ভারতের এক অংশে) যাওয়া যেত। এই পথ কাশগড়, ইয়ারকন্দ পামির হয়ে হুনজাতে এবং আরও দক্ষিণে গিলগিটে পৌঁছোত। এখান থেকে চিলাস, দাসু, মনসেহ্‌রা বা আবোটাবাদ হয়ে তক্ষশিলাতে পৌঁছোনো যেত বলে মনে হয়। অন্য দিকে গিলগিট থেকে গিলগিট ও সিন্ধুনদের সংগমস্থল এবং সেখান থেকে আলম ব্রিজ অথবা বুঞ্জি ও আস্তর হয়ে দেওসাই অঞ্চলে পৌঁছোতে পারলে সেখান থেকে কাশ্মীর উপত্যকায় যাতায়াত সম্ভবপর ছিল।

মধ্য এশিয়া থেকে আগত পথঘাটের যোগ ছিল ভারতের বিখ্যাত উত্তরাপথের সঙ্গে। সম্ভবত এই পথ— বা তার অংশবিশেষ— উপরে উক্ত 'রাজকীয় পথ' থেকে অভিন্ন।[৩১]

নানা জাতীয় তথ্যসূত্র থেকে মনে হয় যে পূর্ব বা উত্তর-পূর্ব ভারত ও মধ্য এশিয়ার মধ্যেও যোগাযোগ ছিল তিব্বত ও দক্ষিণ-পূর্ব চীনের মাধ্যমে।[৩২] পূর্বোক্ত 'পেরিপ্লৌস তেস ইরিথ্রাস থালাস্সেস' পড়লে মনে হয়

যে উত্তর-পূর্বে হিমালয় অঞ্চল মারফত থিন বা চীনের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল।[৩৩] বিভিন্ন চীনা আকর গ্রন্থে সাং-কো নামে যে পথের উল্লেখ আছে সেটি খুব সম্ভবত চীনের স্সু-চু'য়ান অঞ্চলে (বর্তমানে সেচুয়ান [Szechwan] প্রদেশের একাংশে) শুরু হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব মধ্য-এশিয়ার চিয়াংদের বাসভূমি ও তিব্বতের মধ্য দিয়ে তি'এন-চু বা ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের কামরূপে পৌঁছোত।[৩৪] পথটি বোধ হয় নামকিন পর্বত পেরিয়ে সদিয়ার কাছে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় নেমে আসত।[৩৫] বোধ হয় এই পথকেই 'মহানিদ্দেস'-এ বলা হয়েছে শঙ্কু পথ।[৩৬]

মোটামুটিভাবে খ্রিস্টপূর্ব ও খ্রিস্টীয় কয়েক শতকের তথ্যসূত্রের ভিত্তিতে মধ্য এশিয়া ও ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে যোগাযোগের জন্য যেসব পথের নির্দেশ পাওয়া যায়, তাদের গতিরেখা পরবর্তীকালে যে ঠিক একই ছিল তা নয়। মধ্যযুগে কতকগুলি নূতন পথেরও ব্যবহার হয়েছিল। লাদাখ থেকে ইয়ারকন্দ যাবার একটি পথ খুবই ব্যবহৃত হয় এই যুগের শেষভাগে। এর সঙ্গে কাশ্মীর উপত্যকারও যোগ ছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারত, চীনের প্রধান অংশ ও তিব্বত থেকে নির্গত পথগুলি ইয়ারকন্দে মিলিত হত। এখান থেকে যাওয়া যেত কাশগড়ে এবং সেখান থেকে আরও অনেক পশ্চিমে, সমরকন্দ ও বুখারাতে। এখানেই শেষ হত পারস্য থেকে মার্ভ হয়ে আগত একটি পথ। আবার ভারত থেকে নির্গত পথও আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে সমরকন্দে এসে শেষ হত। শেষোক্ত পথগুলির মধ্যে একটি উত্তর-পশ্চিম ভারতের সীমান্ত থেকে কাবুল অঞ্চল হয়ে এবং (বোধ হয় খাওয়াক গিরিপথের মধ্যে দিয়ে) হিন্দুকুশ পর্বত পেরিয়ে বাঘলান ইত্যাদি মারফত বাল্‌খে পৌঁছোত। অন্য দিকে আরেকটি পথ পামির, সুগনান (সিগনান), ওয়াখান, বাদাখশান, কুন্ডুজ, খুলম্ ইত্যাদির উপর দিয়ে এসে বাল্‌খে শেষ হত। এখানে আমু-দরিয়া পার হয়ে মাবরান-নহ্‌র অঞ্চলের সমরকন্দে হাজির হওয়া খুব কষ্টসাধ্য ছিল না।[৩৭]

এই পথগুলি ঠিক বর্তমান যুগের রাজপথের মতো বিজ্ঞানসম্মতভাবে ও উচ্চমানের প্রযুক্তির সাহায্যে তৈরি অথবা সুরক্ষিত হত না। এইসব পথ মোটামুটিভাবে প্রকৃতি-নির্দিষ্ট পথ, যদিও এগুলির কিছু পরিবর্তন মানুষ তার প্রয়োজনমতো করে নিত। কোনো কোনো অঞ্চলে অবশ্য রাজকীয় ব্যয়ে রাস্তা তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা ছিল।[৩৮] কিন্তু তা সত্ত্বেও মরুভূমির বা পাহাড়ি রাস্তা অনেক স্থানে ছিল দুর্গম ও বিপদসংকুল। ফা-সিএন সিন্ধুনদের উপরে পাহাড়ের গা-কেটে-তৈরি এইরকম এক রাস্তার কথা লিখেছিলেন, যেখান দিয়ে পায়ে হাঁটাও ছিল দুঃসাধ্য। এখান থেকে আবার দড়ির তৈরি সেতুর সাহায্যে বিশাল সিন্ধুনদের অন্য তীরে যেতে হত।[৩৯] মরুভূমির ঝড়, তৃণভূমি অঞ্চলে দিক-নির্ণয়ের অসুবিধা, নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং ডাকাতদের দৌরাত্ম্য যাত্রীদের বিপদে ফেলতে পারত। নিজেদের পায়ে চলবার ক্ষমতা ব্যবহার করে এবং ঘোড়া, উট বা পশুবাহিত শকটের সাহায্যে এক স্থান থেকে অন্য দূরবর্তী স্থানে যেতে হত।

এত অসুবিধা সত্ত্বেও মধ্য এশিয়া ও ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে যুগে যুগে লোকে যাতায়াত করেছে, নিঃসঙ্গভাবে কিংবা কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে কিংবা দল বেঁধে। উদ্দেশ্য : অভিপ্রয়াণ, আক্রমণ, আধিপত্য স্থাপন, বাণিজ্যিক ক্রিয়াকর্মে অংশগ্রহণ, ধর্মপ্রচার, ভাগ্যান্বেষণ, জ্ঞানান্বেষণ বা নিছক দেশভ্রমণ, এমন-কি, রাজকীয় স্বার্থে সংবাদ আহরণ। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এই গমনাগমনের এক প্রধান ফল : ভারত ও মধ্য এশিয়ার মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ।

৩.

এই যোগাযোগের সংবাদ ও ইঙ্গিত ছড়িয়ে আছে প্রাচীন ও মধ্য যুগে বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থে এবং প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানে। এই আকর গ্রন্থগুলি সংস্কৃত, চীনা, গ্রিক, লাতিন, আরবি, ফারসি ইত্যাদি নানা ভাষায় লিখিত। এদের মধ্যে অনেকগুলির অস্তিত্ব ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে মধ্য এশিয়ার ইতিহাসচর্চার আরম্ভের সময়ে জানা ছিল। এ ছাড়া মধ্যযুগে পর্যটক, ধর্মপ্রচারক, ব্যবসায়ী ও প্রকৃতিসন্ধানীর— বিশেষত এইসব চরিত্রের ইয়োরোপীয়দের— মধ্য এশিয়ায় ভ্রমণ, আলোচ্য অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন রাজদূতের গমনাগমন এবং রুশ

সাম্রাজ্যের পূর্ব দিকে প্রসারের ফলে ঊনবিংশ শতাব্দী আরম্ভের আগেও মধ্য এশিয়া সম্পর্কে বহির্জগতের মোটামুটি একটা ধারণা ছিল।[৪০] মধ্যযুগের শেষভাগে পশ্চিম-মধ্য এশিয়াতে ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের উপস্থিতিও এর কিছু অংশের সঙ্গে ভারতীয়দের পরিচিতির ইঙ্গিত দেয়।[৪১] কিন্তু সামগ্রিকভাবে মধ্য এশিয়া সম্পর্কে বাইরের পৃথিবীর ধারণা খুব একটা স্পষ্ট ছিল না।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মধ্য এশিয়ায় রুশ সাম্রাজ্যের বিস্তার এবং ওই ভূখণ্ড সম্পর্কে আগ্রহী রুশ, ইংরেজ প্রভৃতি শক্তির রাজনৈতিক দূত ও চরদের ক্রিয়াকলাপ, দুর্বল চীনা সাম্রাজ্যের পরিমণ্ডলের অন্তর্গত পূর্ব তুর্কিস্তান সম্পর্কে অনেক তথ্য বাইরের জগৎকে জানাতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু মধ্য এশিয়ার, বিশেষত এর পূর্ব অংশের ভৌগোলিক প্রকৃতি ও প্রাচীন ইতিহাসের রহস্য উদ্‌ঘাটনে অগ্রণীর ভূমিকা নিলেন বিভিন্ন ভূগোলবিদ, উদ্ভিদবিদ্যাবিশারদ, মানচিত্রকার ও প্রত্নতাত্ত্বিক। পূর্ব তুর্কিস্তানের নানান অংশে দেশীয় লোকেদের সাহায্যে অনুসন্ধান ও উৎখননের ফলে যে বিচিত্র সম্ভারের আবিষ্কার হল তাতে যেমন ছিল নানা প্রাচীন স্থাপত্যের ও নান্দনিক কীর্তির ধ্বংসাবশেষ, অসংখ্য ধর্মীয় মূর্তি, চিত্র, দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্র, লেখাবলি ও মুদ্রারাজি, তেমনই ছিল বিভিন্ন ভাষায় লেখা পুঁথি। এই ভাষাগুলির কয়েকটির অস্তিত্বই (তুখারীয়, খোটানি [শক] ইত্যাদি) আগে জানা ছিল না। নানাজাতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে বহির্জগতের সঙ্গে পূর্ব-মধ্য এশিয়ার যোগাযোগের যে চিত্রগুলি ফুটে উঠল তাদের মধ্যে উজ্জ্বলতম হচ্ছে ওই ভূখণ্ডে প্রাচীনকালে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাধান্য।[৪২]

ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গে পূর্ব-মধ্য এশিয়ার একাংশের প্রাচীন যোগাযোগের প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া যায় ১৮৭৩-৭৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। ওই সময়ে ভারতের ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধি টি. ডি. ফোরসুথ খোটান (বা কাশগড় ?) অঞ্চলে কয়েকটি মুদ্রার সন্ধান পান যেগুলির একদিকে চীনা লেখ আর অন্য দিকে প্রাকৃত ভাষায় ও খরোষ্ঠী লিপিতে উৎকীর্ণ লেখ। পরবর্তীকালের গবেষণার ভিত্তিতে এই জাতীয় মুদ্রাগুলিকে প্রাচীন খোটানের খ্রিস্টপূর্ব প্রথম বা খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের মুদ্রা বলে মনে করা যেতে পারে। এগুলির প্রচারের জন্য খরোষ্ঠী লিপি ও প্রাকৃতের ব্যবহার খোটানের সঙ্গে ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশের যোগাযোগের ইঙ্গিত বহন করে। ভারতের ওই অঞ্চলে এই সময়ে খরোষ্ঠী লিপি ও উত্তর-পশ্চিমা প্রাকৃতের প্রচলন ছিল।[৪৩]

মধ্য এশিয়ায় প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের পরিচিতির প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায় এর প্রায় দেড় দশক পরে। ১৮৯০তে কুচা অঞ্চলের কুচারে থাকাকালীন এক তুর্কি ভদ্রলোকের কাছে একটি ভূর্জপত্রের উপরে ব্রাহ্মীলিপি ও সংস্কৃত ভাষায় লেখা পুঁথির সন্ধান পান ক্যাপ্টেন হ্যামিলটন বাওয়ার। পুঁথিটি কুচারের কাছে এক প্রাচীন বসতির ধ্বংসাবশেষে পাওয়া গিয়েছিল। পরে ভারতে এনে পরীক্ষা করে বোঝা গেল যে এ পুঁথিটি 'নবনীতক' ইত্যাদি কয়েকটি চিকিৎসা-সংক্রান্ত গ্রন্থের অনুলিপি। এই পুঁথি সাক্ষ্য দিচ্ছে প্রাচীন কুচা অঞ্চলে ভারতীয় চিকিৎসাপদ্ধতির প্রচলন ছিল।[৪৪]

ভূর্জপত্রের উপরে উত্তর-পশ্চিমা বা গান্ধারী প্রাকৃত ভাষায় আনুমানিক খ্রিস্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকের খরোষ্ঠী লিপিতে লেখা বৌদ্ধ গ্রন্থ ধম্মপদ-এর একাংশের সন্ধান পান ডি. ডি. রাইন এবং এফ. গ্রেনার্ড। খোটান অঞ্চলে ১৮৯২ সালে এটি সংগৃহীত। পরে, ১৮৯৭ সালে কাশগড়ে রুশ রাষ্ট্রদূত ন. থ. পেট্রভ্স্কি বইটির আর-এক অংশ উদ্ধার করেন। পালি ভাষায় লেখা ধম্মপদের বহু প্রচলন থাকলেও প্রাকৃত ভাষায় লেখা ধম্মপদের অস্তিত্ব এই আবিষ্কারের আগে জানা ছিল না। এ ছাড়াও মনে রাখা দরকার যে কোনো ভারতীয় ভাষায় ও লিপিতে লেখা বইয়ের জ্ঞাত ও সংরক্ষিত পুঁথি ধম্মপদের এই পুঁথির চেয়ে প্রাচীন নয়।[৪৫] পরে মধ্য এশিয়ার কুচা অঞ্চলে আবিষ্কৃত তালপাতার উপরে কুষাণ আমলের ব্রাহ্মী লিপিতে সংস্কৃত ভাষায় লেখা অশ্বঘোষের তিনটি রচনার অনুলিপির যে-অংশ পাওয়া গিয়েছিল তারও তারিখ প্রথম বা দ্বিতীয় শতক।[৪৬]

এই আবিষ্কারগুলি পণ্ডিত সমাজে, বিশেষত ইয়োরোপীয় বিদ্বৎসমাজে, আলোড়ন তুলেছিল। এর ঢেউ যে কলকাতাতেও পৌঁছেছিল তার প্রমাণ এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় এ. এফ. আর. হর্নলির কয়েকটি প্রবন্ধ এবং এই শহরে প্রকাশিত ও একই পণ্ডিতের সম্পাদিত 'দি বাওয়ার ম্যানাস্ক্রিপ্ট' গ্রন্থটি। পূর্ব-মধ্য এশিয়াতে

খ্রিস্টীয় প্রথম সহস্রাব্দে ভারতীয় সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাবের সম্ভাবনা স্পষ্টভাবে বোঝা গেল।

[illegible] শতাব্দীর শেষ দশক থেকে প্রত্নতত্ত্ববিদ, পণ্ডিত আর নানান ধরনের জিজ্ঞাসু ব্যক্তির উৎসাহে [illegible] অনুসন্ধানের ফলে পূর্ব-মধ্য এশিয়ার খ্রিস্টীয় প্রথম সহস্রাব্দের রাজনৈতিক ইতিহাস, ভাষা, লিপি, [illegible] সংস্কৃতি প্রভৃতি সম্পর্কে বিচিত্র তথ্য জানা গেছে। এই আবিষ্কৃত তথ্যের এক বিরাট অংশ মধ্য [illegible] প্রভাবের সাক্ষ্য দিচ্ছে।[47]

[illegible] সভ্যতা-সংস্কৃতির নিদর্শনরাজির এবং পুঁথি ও লেখমালার আবিষ্কার [illegible] শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে, অনেক অনুসন্ধানকারী দলের (বিশেষত ইয়োরোপীয়দের নেতৃত্বে [illegible] উদ্যোগে ফলে। গত অর্ধ শতাব্দীতেও বেশ-কিছু আবিষ্কার হয়েছে, যদিও সংখ্যায় বা গুরুত্বে সেগুলি প্রথম পাদের বা তার পূর্বের আবিষ্কারের সঙ্গে তুলনীয় নয়। আবিষ্কৃত নিদর্শনগুলি থেকে ইতিহাসের তথ্য আহরণের কাজ শুরু হয়েছিল গত শতাব্দীর শেষ পাদে, আজও তা চলছে।[48]

পশ্চিম-মধ্য এশিয়ার (বা পূর্বতন সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার) অন্তর্গত ভূখণ্ডের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের যোগাযোগের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনরাজি আবিষ্কৃত হয় প্রধানত বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে। গত দুই দশকেও কিছু আবিষ্কার হয়েছে। এই সমস্ত আবিষ্কারের কৃতিত্ব সোভিয়েত প্রত্নতাত্ত্বিকদের, যদিও ওইগুলির গুরুত্ব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বাইরের অনেক পণ্ডিতও সক্রিয়।[49]

ইয়োরোপীয় এবং (কয়েকজন ভারতীয়সহ) এশীয় পণ্ডিতদের গবেষণার ফলে প্রাচীন যুগে মধ্য-এশিয়ায় ভারতের প্রভাবের চিত্রটি যত ব্যাপক ও উজ্জ্বল, ভারতীয় উপমহাদেশে ওই সময়ে মধ্য এশিয়ার প্রভাবের ছবিটি ততটা বিস্তৃত বা পরিষ্কার নয়। তবে বিভিন্ন আকর গ্রন্থে মধ্য-এশীয়দের ভারতে উপস্থিতির নানা প্রমাণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধরনের প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু ও শিল্পনিদর্শন পরীক্ষা করলেও ভারতে মধ্য-এশীয় প্রভাবের ইঙ্গিত মেলে।

মধ্য যুগে এই দুই ভূখণ্ডের মধ্যে জনগোষ্ঠীর যাতায়াতের খবর এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগাযোগ-সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায় নানা আকর গ্রন্থে ও কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে। এই যুগে পরস্পরকে প্রভাবিত করবার ক্ষেত্রে মধ্য এশিয়ার কৃতিত্ব অপেক্ষাকৃত বেশি বলে মনে করাও যেতে পারে।

আধুনিক যুগে ভারত-মধ্য এশিয়া সম্পর্কে তথ্যসূত্রের তালিকায় নানা ধরনের চিঠিপত্র, প্রতিবেদন, দলিল এবং খবরের কাগজেরও স্থান আছে। এই যুগের সম্পর্ক প্রধানত পশ্চিম ও পূর্ব-মধ্য এশিয়ার রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষদের এবং ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন সরকারের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধের দ্বারা প্রভাবিত।

৪.

প্রাচীন ও মধ্যযুগের মধ্যবর্তী সীমারেখাটি অবশ্য খুব পরিষ্কার নয়। প্রকৃতপক্ষে কোনো দেশের বা অঞ্চলের ইতিহাসের এক যুগ থেকে অন্য যুগকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কারণ ইতিহাসের ধারা প্রবহমান। এক যুগের মধ্যেই থাকে পরের যুগের বৈশিষ্ট্যের সূচনা। কিন্তু ইতিহাস পর্যালোচনার সুবিধার জন্য যুগ-বিভাগ করতেই হয়। আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে এই যুগ-বিভাজন করতে হবে ভেবেচিন্তে— দুই ভূখণ্ডের প্রথাগত যুগ-বিভাগের কথা মনে রেখে। সুনির্দিষ্ট সীমানাহীন মধ্য এশিয়ার পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের— অর্থাৎ দুই প্রধান অঞ্চলের— ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ের জ্ঞাত তথ্যরাজি সবক্ষেত্রে তুল্যমূল্য না হওয়ার ফলে সমগ্র মধ্য এশিয়ার পক্ষে গ্রাহ্য যুগ-বিভাগ করাও মুশকিল। যেমন : পশ্চিম-মধ্য এশিয়াতে প্রাগৈতিহাসিক বা ইতিহাসের আদিম যুগের প্রচুর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গেলেও, পূর্ব-মধ্য এশিয়ার সিন-কিয়াং প্রদেশে প্রাগৈতিহাসিক সামগ্রী প্রায় কিছুই এখন পর্যন্ত মেলে নি।

এই ধরনের অসুবিধার কথা মনে রেখেও আলোচনার সুবিধার জন্য যুগ-বিভাগ করতেই হবে। মধ্য এশিয়ার একাংশের সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক যোগাযোগ প্রথম ঘটে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ পাদে,

যখন উভয় ভূখণ্ডেরই কিছু অংশ (পশ্চিম-মধ্য এশিয়া এবং ভারতের পঞ্জাব, সিন্ধু দেশ ইত্যাদি) হখামনিশীয় (Achaemenid) সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই ঘটনা উভয় ভূখণ্ডের যোগাযোগের ইতিহাসের ক্ষেত্রে এক যুগ-সন্ধিক্ষণ বলা যেতে পারে। সুতরাং আমাদের আলোচ্য বিষয়ের ইতিহাসের প্রাগৈতিহাসিক বা আদিম যুগের শেষ এবং প্রাচীন যুগের শুরু খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে।[৫০]

খ্রিস্টপূর্ব শেষ কয়েক শতাব্দী এবং খ্রিস্টীয় প্রথম সহস্রাব্দের মধ্য এশিয়ার ইতিহাসের দুটি দিক আছে। একদিকে : ১. সিন-কিয়াং ও পশ্চিম মঙ্গোলিয়া সহ পূর্ব-মধ্য এশিয়ার সঙ্গে চীনের (অর্থাৎ বর্তমান চীনের প্রধান বা পূর্বাংশের) পর্যায়ক্রমে সুসম্পর্ক ও বিরোধ বা ওই ভূখণ্ডে চীনের আধিপত্য স্থাপন ও স্থানীয় রাজশক্তি বা উপজাতিদের বিদ্রোহ বা বিরুদ্ধাচরণ। ২. মঙ্গোলিয়ার একাংশ সমেত উত্তর-পূর্ব মধ্য এশিয়া থেকে বিভিন্ন উপজাতি-কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে পশ্চিম দিকে পশ্চিম-মধ্য এশীয় অঞ্চল অবধি অভিপ্রয়াণ ও দখল বা আধিপত্য স্থাপনের প্রচেষ্টা ; এবং ৩. প্রথম সহস্রাব্দের দ্বিতীয়ভাগে পূর্ব-মধ্য এশিয়ার কিছু অংশে তিব্বতি শাসন কায়েম করার নানা প্রয়াস। অন্যদিকে : উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে সিন-কিয়াং সহ পূর্ব-মধ্য এশিয়ায় এবং অক্সাস বা আমু-দরিয়ার দক্ষিণ থেকে ওই নদীর উত্তরস্থ দেশে (অর্থাৎ পশ্চিম-মধ্য এশিয়ার Transoxiana বা মাবরান-নহর অঞ্চলে) রাজনৈতিক আধিপত্য এবং/অথবা সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার। ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব এই দুই পথ দিয়েই মধ্য এশিয়ায় পৌঁছেছিল। তার আগেই ইরানীয় সংস্কৃতির গভীর প্রভাব এবং হেলেনীয় সংস্কৃতির ছোঁয়াচ এসেছিল আমু-দরিয়া পার হয়ে। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষের দিকে, বিশেষ করে অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে, মাবরান-নহরে আরবদের রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপনের জন্য বড়ো বড়ো সামরিক আক্রমণও এসেছিল ওই নদীর দক্ষিণ দিক থেকে। এরই সঙ্গে শুরু হয়েছিল ইসলামকরণ, যার গতি ত্বরান্বিত হয় কারাখনী (Karakhanid) শাসক সাতুক বুগরাখান-এর ধর্মান্তরণে এবং পরে ৯৬০ খ্রিস্টাব্দে দুই লক্ষ তাঁবুর তুর্কি অধিবাসীর একসঙ্গে ইসলাম ধর্মগ্রহণে। ১০০৬ থেকে ১০০৮-এর মধ্যে খোটান ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অধীনস্থ হলেও পূর্ব-মধ্য এশিয়ায় ওই ধর্মের একাধিপত্য স্থাপনের গতি ছিল মন্থর। সেখানে দ্বাদশ শতাব্দীতেও নেস্তোরীয় (Nestorian) খ্রিস্টান সম্প্রদায় এবং বৌদ্ধ ধর্মের যথেষ্ট প্রভাব ছিল।[৫১]

মধ্য এশিয়ার ইতিহাসের আঞ্চলিকতায়, বা অন্তত রাজনৈতিক আঞ্চলিকতায়, কিছুকালের জন্য ছেদ পড়ে তেমুজিন বা গেন্‌ঘিস (চেঙ্গিস) খানের সময়ে (১১৬২-১২২৭) মোঙ্গল রাজশক্তির উত্থানে। তাঁর রাজত্বকালেই প্রায় সমস্ত মধ্য এশিয়ায় মোঙ্গল আধিপত্য স্থাপিত হয়। মোঙ্গল-আক্রমণের জোয়ারের ঢেউ উত্তর-পশ্চিম ভারতের সিন্ধুনদকে ছুঁয়েছিল। শীঘ্রই ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে উত্তর-পশ্চিম ভারতের একাংশ মোঙ্গলদের আধিপত্য মেনে নিয়েছিল। কুবলাই খানের রাজত্বকালে (১২৬০-১২৯৫) সমগ্র মধ্য এশিয়া ও চীন সমেত ইউরেশিয়ার এক বিশাল ভূখণ্ড মোঙ্গল সাম্রাজ্যের অধীনস্থ ছিল। এর আগে মধ্য এশিয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কখনো সামগ্রিকভাবে এক প্রভুশক্তির অধীন হয় নি। তাই ত্রয়োদশ শতাব্দী মধ্য এশিয়ার ইতিহাসে এক যুগ থেকে অন্য যুগে উত্তরণের সময়।[৫২]

ভারতের ইতিহাসেও এই শতাব্দীতেই মধ্যযুগের শুরু বলে সাধারণত ধরা হয়।[৫৩] সুতরাং ভারত ও মধ্য এশিয়ার সম্পর্কের ইতিহাসে মধ্যযুগের আরম্ভ ত্রয়োদশ শতকে।

ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ থেকে রুশ রাজশক্তির পূর্ব দিকে ক্রমপর্যায়ে আধিপত্য প্রসারের ইতিহাস জানা আছে। অষ্টাদশ শতকে কজাখস্তানের একটা বড়ো অংশ জারের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। রুশদের সাম্রাজ্যবিস্তারের এবং বাণিজ্যের জন্য নূতন অঞ্চল পাবার ইচ্ছার ফলে পশ্চিম-মধ্য এশিয়ায় অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় পাদে ও দ্বিতীয় ভাগে খান-শাসিত রাজ্যগুলির (Khanates) পতন হল। পশ্চিম-মধ্য এশিয়ায় কায়েম হল রুশ শাসন। চীনের দুর্বলতার সুযোগে আরও পূর্বে, ইলি নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে, জারের সাম্রাজ্যের বিস্তার হল। রুশীয়দের ঔপনিবেশিক শাসন, ভারতের ইংরেজ সরকারের মধ্য এশিয়ায় রাজনৈতিক, সামরিক ও বাণিজ্যিক অভিসন্ধি, রাশিয়া, চীন ও ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস, পূর্ব তুর্কিস্তানে চীনের মাঞ্চু

সাম্রাজ্যের দুর্বল কর্তৃত্ব এবং আঞ্চলিক বিদ্রোহ উনবিংশ শতকে মধ্য-এশীয়দের পক্ষে যে অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করেছিল তার খানিকটা নিরসন হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের শেষে চীনে নূতন (অস্থায়ী) সরকার স্থাপন, ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে মাঞ্চু সাম্রাজ্যের আনুষ্ঠানিক অবসান এবং সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা চীনের অন্যান্য অঞ্চলের মতো তার সীমানাভুক্ত পূর্ব-মধ্য এশিয়াতেও নূতন যুগের সূচনা করে। মঙ্গোলিয়া এই সময়ে চীনের নাগপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে, যদিও প্রায় এক দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতার পরে সেখানে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯২১-এ। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পরে পশ্চিম-মধ্য এশিয়াতে জারের শাসনের বদলে প্রতিষ্ঠিত হয় সোভিয়েত সমাজবাদী সাধারণতন্ত্রের শাসন। এইসব পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মধ্য এশিয়ার অধিবাসীদের সুখ ও সমৃদ্ধি না এলেও ওই ভূখণ্ডে নূতন রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং অন্তত এর এক বৃহৎ অংশে এক নূতন ধরনের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এই পরিবর্তনের সময়েই মধ্য এশিয়ায় আধুনিক যুগের সূচনা হয়েছিল বলে মনে করলে বোধ হয় ভুল হবে না।[৫৪]

ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে আধুনিক যুগ অবশ্য অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। এদিক থেকে দেখলে আলোচ্য মধ্যযুগ অষ্টাদশ শতকেই শেষ হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। কিন্তু আমাদের আলোচনায় মধ্য এশিয়ার যুগবিচারের প্রেক্ষাপটের কথা মনে রাখতে হবে। এ ছাড়াও ১৯০৭-এর রাশিয়া ও ব্রিটেনের সমঝোতার পরে বা অন্তত এই শতাব্দীর প্রথম পাদের পরে, মধ্য এশিয়া সম্পর্কে ভারতের ইংরেজ সরকারের ক্রিয়াকর্মের ধারার অনেকটা পরিবর্তনের গুরুত্বকেও স্বীকার করতে হবে। এইসব বিষয় বিবেচনা করলে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম পাদেই ভারত ও মধ্য এশিয়ার সম্পর্কের ইতিহাসে আধুনিক যুগের সূচনা হয়েছিল বলে ভাবা যেতে পারে।[৫৫]

৫.

এই যুগ-বিভাজনের, বিশেষত আধুনিক যুগের সূচনালগ্ন নির্ণয়ের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন করা যেতে পারে। কিন্তু একে আলোচনার এক সুবিধাজনক ভিত্তি বা পটভূমিকা হিসেবে মেনে নিতে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

যে বিষয়গুলি আলোচনা করা উচিত তাদের মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে প্রাগৈতিহাসিক বা ইতিহাসের আদিম যুগে মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতীয় উপমহাদেশের সম্পর্ক। প্রাচীন যুগে এই দুই ভূখণ্ডের মধ্যে জনগোষ্ঠীর গমনাগমন, পরস্পরের মধ্যে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক, প্রাচীন মধ্য-এশিয়ায় ভারতীয় ধর্ম, রীতি, নীতি, দর্শন, শাসন-ব্যবস্থা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, লিপি ও সাহিত্যের প্রচার, মধ্য এশিয়ার শিল্পে ভারতীয় প্রভাব এবং প্রাচীন ভারতের জীবনধারা, ধর্ম, ভাষা, প্রযুক্তিবিদ্যা ও শিল্পের উপরে মধ্য এশিয়ার প্রভাব সম্পর্কে অবশ্যই আলোচনা করতে হবে। মধ্যযুগে রাজনৈতিক, সামাজিক, বাণিজ্যিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে এবং প্রযুক্তিবিদ্যা, সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে এই দুই ভূখণ্ডের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং/অথবা একের উপরে অন্যের প্রভাবের বিচার করতে হবে। আধুনিক যুগে পাকিস্তান সমেত ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গে মধ্য এশিয়ার সম্পর্ক নির্ণয়ের সময় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলির উপরে জোর দেওয়া সংগত বলে মনে হয়।

বিস্তারিত বিচারবিবেচনা করার আগে এটা পরিষ্কারভাবে বুঝতেও হবে, মানতেও হবে যে 'ভারত ও মধ্য এশিয়া' শীর্ষক আলোচনা কেবলমাত্র মধ্য এশিয়ায় ভারতের প্রভাবের যশোগাথা রচনা নয়। প্রায় কোনো রাজনৈতিক বা সামরিক প্রভাব না খাটিয়ে প্রাচীন মধ্য-এশিয়ার সাংস্কৃতিক জীবনে ভারতের বিরাট এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রায় সর্বাত্মক উপস্থিতি নিঃসন্দেহে ভারতের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। কিন্তু ভারতীয় জীবনে মধ্য এশিয়ার উপস্থিতি উপেক্ষণীয় নয়, বিশেষত মধ্যযুগে। দুই বিশাল ভূখণ্ড, যে দুটিই আজ রাজনৈতিক বিচারে খণ্ডিত, তাদের মধ্যে যুগ যুগ ধরে সম্পর্কের বিচারের ফল 'ভারত ও মধ্য এশিয়া।'

টীকা

১. এই প্রসঙ্গে বি. এন. মুখার্জি, ফরেন নেমস্ অব দি ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট, মহীশূর, ১৯৮৯, পৃ. ১ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

২. ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'ভারতীয়দের জাতিত্ব— ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বিচারে', নন্দন, জানুয়ারি, ১৯৯৩, পৃ. ৫৯-৬১।

৩. এ. জি. ফ্রাঙ্ক, 'দি সেন্ট্রালিটি অব সেন্ট্রাল এশিয়া', স্টাডিজ় ইন হিস্ট্রি, খণ্ড ৭, সংখ্যা ১, ১৯৯২, পৃ. ৪৬।

৪. ভি. ভি. বার্থোল্ড, ফোর স্টাডিজ় অন দি হিস্ট্রি অব সেন্ট্রাল এশিয়া (ভি. এবং টি. মিনোর্স্কি-কর্তৃক অনূদিত), লন্ডন, ১৯৫৬, পৃ. ১ ইত্যাদি।

৫. এ. বেলিনিট্স্কি, দি এনসেন্ট সিভিলাইজ়েশন্স অব সেন্ট্রাল এশিয়া, লন্ডন, ১৯৬৯, পৃ. ১৫।

৬. এ. এম. খাজানভ, নোমাড্স্ অ্যান্ড দি আউটসাইড ওয়ার্লড, কেম্ব্রিজ, ১৯৮৪, পৃ. ৫।

৭. এল. আমবি, লাসি সঁত্রাল, ইস্তোয়ার এ সিভিলিজ়াসিঁও, পারি, ১৯৭৭, পৃ. ৫-৬ ; ইত্যাদি।

৮. ডি. সিনর, ইনার এশিয়া— হিস্ট্রি, সিভিলাইজ়েশন, ল্যাঙ্গুয়েজেস্— এ সিলেবাস, ব্লুমিংটন এবং দি হেগ্, ১৯৬৯, পৃ. ৫ ; ডি. সিনর (সম্পাদক), দি কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব আর্লি ইনার এশিয়া, কেম্ব্রিজ, ১৯৯০, পৃ. ৪, ১৯ ইত্যাদি।

৯. ডি. সিনর, ইনার এশিয়া ইত্যাদি, পৃ. ২। জি. হাম্ব্লি সমুদ্রের প্রভাব থেকে অভ্যন্তরীণ বা মধ্য এশিয়ার বিচ্ছিন্নতা বিশেষভাবে লক্ষ করেছেন (জি. হাম্ব্লি, সেন্ট্রাল এশিয়া, ১৯৬৯, পৃ. ১১)।

১০. এই প্রসঙ্গে এইচ. হার্টেল, 'ভূমিকা', অ্যালঙ দি এনসেন্ট সিল্ক রুট, নিউ ইয়র্ক, ১৯৮২, পৃ. ১৫ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

১১. ডি. সিনর (সম্পাদক), পূর্বোক্ত, প্রথম অধ্যায়।

১২. বেইজিং রিভিউ, খণ্ড ৩৩, সংখ্যা ৩৪, ১৯৯০, পৃ. ২০-২৬ ; স্টাডিজ় ইন হিস্ট্রি, জানুয়ারি-জুন, ১৯৯২, খণ্ড ৮, সংখ্যা ১, পৃ. ৪৮। ও. লাটিমোরের মতে চীনের অন্তর্গত অভ্যন্তরীণ এশিয়ার সীমানা 'কখনো এগিয়ে এসেছে, কখনো পিছিয়ে গেছে', অর্থাৎ চীনের প্রধান অংশের রাজনৈতিক দুর্বলতার সময় স্বাধীন বা প্রায়-স্বাধীন অভ্যন্তরীণ এশিয়ার পূর্ব সীমানা তার নিজস্ব সীমানার কাছাকাছি পৌঁছেছে ; আবার সিন-কিয়াং অঞ্চলে চীনের আধিপত্যের সময় চীনের অধিকার-বহির্ভূত অভ্যন্তরীণ এশিয়ার পূর্ব সীমান্ত অনেক পশ্চিমে (কাশগড়ের কাছে) সরে গেছে।

১৩. মধ্য-এশীয় সভ্যতা সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞদের পারি শহরে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ইউনেস্কো-আয়োজিত অধিবেশনের চূড়ান্ত প্রতিবেদন (নং এস. এইচ. সি./সি. এস./৪৭/৪), পৃ. ১।

১৪. মধ্য এশিয়ার সভ্যতার ইতিহাস-রচনা প্রকল্পের বিশেষজ্ঞদের পারিতে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে ইউনেস্কো-আয়োজিত অধিবেশনের চূড়ান্ত প্রতিবেদন (নং সি. সি./৭৮/কনফ./৬৩৬/৩), পৃ. ২।

১৫. তুর্কিস্তান নামের উৎপত্তির সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিভিন্ন তুর্কি বা তুর্ক-মোঙ্গল উপজাতির ইতিহাস। অবশ্য এই নামের উৎপত্তির অনেক আগে মোটামুটিভাবে হিন-জিয়াং অঞ্চলকে টলেমি খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে সেরিকা নামে অভিহিত করেছিলেন। এই অঞ্চলের মাধ্যমে চীনের সঙ্গে পশ্চিম অঞ্চলের যে বাণিজ্য হত তার এক প্রান্তিক কেন্দ্র ছিল সের বা সেরেস্ (৬, ২৬) বা বর্তমান কাশগড়। এই শহরের নাম অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল সেরিকা নামে পরিচিত হয়। ঠিক এইরকমভাবে মধ্যযুগে কাশগড় থেকে কাশগড়িয়া অঞ্চলের নামের উৎপত্তি।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিভিন্ন ইয়োরোপীয় রচনায়, পূর্ব তুর্কিস্তান ও তিব্বতকে 'হাই এশিয়া' (High Asia) বা 'উঁচু এশিয়া' বলে অভিহিত করা হত। ওই শতকের মাঝামাঝি নাগাদ এই রীতি ইংল্যান্ডে লুপ্ত হলেও জার্মানি ও ফ্রান্সে প্রচলিত ছিল ওই শতকের শেষ পর্যন্ত। এখনও এই নাম কখনো কখনো ব্যবহার করতে দেখা যায়। অষ্টাদশ শতকে পূর্ব তুর্কিস্তানকে প্রায়ই 'চীনা তাতারভূমি' (Chinese Tartary) নামে ডাকা হত (জে. এ. ডাব্স্, হিস্ট্রি অব ডিসকভারি অ্যান্ড এক্সপ্লোরেশন অব চাইনিজ় তুর্কিস্তান, দি হেগ, ১৯৬৩, পৃ. ৫)। মধ্য এশিয়ার অন্তত কিছু অংশসহ চীনকে কাথায় (কাতাই বা ক্যাথে [?] Cathay) নামে মধ্যযুগের ইয়োরোপীয়দের কোনো কোনো রচনায় পরিচয় দেওয়া হয়েছিল। এই নামটির উৎস কিতান (ইয়োরোপীয়দের কাছে : কিতাই) নামে অভিহিত এক রাজনৈতিকভাবে পরাক্রান্ত যাযাবর উপজাতীয় গোষ্ঠী। এদেরই একটি অংশ (লিআও) দশম শতক থেকে একাদশ শতকের প্রথম পাদ অবধি চীনে রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তার করেছিল। পরে কারাকিতান (বা কারাকিতাই) গোষ্ঠী চীনের প্রধান অংশের পশ্চিমে মধ্য-এশিয়াতে রাজত্ব করেছিল

(১১২৪-১২১১)। এর ফলে পশ্চিম এশিয়া ও ইয়োরোপে চীন (হিন-জিয়াং অঞ্চল সমেত) কিতান (বা কিতাই) নামে পরিচিত হয়। এয়োদশ শতকে নামটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য ছিল উত্তর চীনের সম্পর্কে। পরে নামটির ব্যবহার আস্তে আস্তে কমে আসে। কিন্তু ষোড়শ শতকের শেষের দিকে জেসুইট ধর্মপ্রচারক মাত্তিও রিচ্চি আবার এর ব্যবহার চালু করেন। বর্তমান যুগে অবশ্য এর প্রচলন সেরকম না থাকলেও কোনো কোনো পূর্ব ইয়োরোপীয় ভাষায় 'কিতাই' কথাটি চীনকে বোঝায় (ডি. সিনর, সম্পাদক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০০-৪০১)।

১৬. এই প্রসঙ্গে পি. সি. বাগচী, ইন্ডিয়া অ্যান্ড সেন্ট্রাল এশিয়া, কলিকাতা, ১৯৫৫, পৃ. ১ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

১৭. শি-চি, স্সু-পু পেই-য়াও সংস্করণ, অধ্যায় ১২৩, পৃ. ১ ক ইত্যাদি ; বি. ওয়াট্‌সন, রেকর্ডস অব দি গ্র্যান্ড হিস্টোরিয়ান অব চাইনা, খণ্ড ২, নিউ ইয়র্ক, ১৯৬১, পৃ. ২৬৬ ইত্যাদি।

১৮. পান-কু, চি'এন-হান-শু, তু'ং-ওএন শু-কু (এ) সংস্করণ, অধ্যায় ৯৬ ক, পৃ. ১ক ইত্যাদি।

১৯. হৌ-হান-শু, স্সু-পু পেই-য়াও সংস্করণ, অধ্যায় ১১৮ ; তুং-পাও, ১৯০৭, পৃ. ১৬৮ ইত্যাদি।

২০. তুং-পাও, ১৯০৫, পৃ. ৫২৬ ইত্যাদি।

২১. টীকা ১৯ ও ২০ দ্রষ্টব্য।

২২. হৌ-হান-শু, অধ্যায় ১১৮ ; তুং-পাও, ১৯০৭, পৃ. ১৬৯ ; ১৯০৫, পৃ. ৫৩৩ ইত্যাদি।

২৩. হৌ-হান-শু, অধ্যায় ১১৮ ; তুং-পাও, ১৯০৭, পৃ. ১৭০ এবং ১৮৯ ; চি'এন হান-শু, অধ্যায় ৯৬ক, পৃ. ৫ক। বি. এন. মুখার্জি, অ্যান এগ্রিপ্পান সোর্স এ স্টাডি ইন ইন্দো-পার্থিয়ান হিস্ট্রি, কলিকাতা, ১৯৭০, পৃ. ১৯৩।

২৪. ফা-সিএন, ফো-কুও-কি, চুয়ান ৪।

২৫. সুয়ান-সাং, তা তা'ং সি-ইউ-কি, চুয়ান ১২।

২৬. প্লিনি, নাচুরালিস হিস্তোরিয়া ৬, ২১, ৬১-৬৪।

২৭. বি. এন. মুখার্জি, স্টাডিজ ইন দি আরামাইক ইডিক্টস্ অব অশোক, কলিকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ১২, ১৪ ও ১৬।

২৮. স্ত্রাবো, গেওগ্রাফিকন, ১৫, ১, ৭৭ ; আরিয়ান, 'ইন্দিকে, ৩, ১-৫।

২৯. ইসিদোর, স্তাথমোই পার্থিকোই, ১ ইত্যাদি।

৩০. পেরিপ্লৌস তেস ইরিথ্রাস থালাসেসস, অনুচ্ছেদ ৬৪-৬৫।

৩১. কে. এ. নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী (সম্পাদক), এ কম্প্রিহেনসিভ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, খণ্ড ২, কলিকাতা, ১৯৫৭, পৃ. ৪৩৭-৪৩৮ ; সুত্তনিপাত, ৯৭৬ ইত্যাদি।

৩২. বি. এন. মুখার্জি, এক্সটার্নাল ট্রেড অব নর্থ-ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, নিউ দিল্লি, ১৯৯২, পৃ. ১৭ ইত্যাদি।

৩৩. টীকা ৩০ দ্রষ্টব্য।

৩৪. ই-চিং, কাও-সেং চুয়ান ; এল. লাহিড়ী, চাইনিজ মঙ্ক্‌স ইন ইন্ডিয়া, নিউ দিল্লি, ১৯৮৬, পৃ. ৫০ ; এক্সটার্নাল ট্রেড্ অব নর্থ-ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, পৃ. ২১-২২।

৩৫. জার্নাল অব দি গ্রেটার ইন্ডিয়া সোসাইটি, ১৯৫৬, খণ্ড ১৫, পৃ. ৯।

৩৬. মহানিদ্দেস, ১, ১৫, ১৭৪।

৩৭. ডব্লু. বার্থোল্ড, তুর্কিস্তান ডাউন টু দি মোঙ্গাল ইন্‌ভেসন (এইচ. এ. আর. গিব -কৃত ইংরেজি অনুবাদ), তৃতীয় সংস্করণ (লন্ডন, ১৯২৮) পুনর্মুদ্রণ, নিউ দিল্লি, ১৯৯২, পৃ. ৬৪ ইত্যাদি।

৩৮. স্ত্রাবো, পূর্বোক্ত, ১৫, ১, ৫০।

৩৯. ফা-সিএন, পূর্বোক্ত, চুয়ান ৭ ; এম. এ. স্টাইনের মতে এই পথটি ছিল দারেল থেকে মিরাবতের মধ্যে সিন্ধু নদের পাশ দিয়ে (এম. এ. স্টাইন, সেরিন্ডিয়া, খণ্ড ১, পৃ. ৮)।

৪০. জে. এ. ডাব্‌স, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১ ইত্যাদি।

৪১. মুজাফ্‌ফর আলম -কর্তৃক ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে মস্কোতে অনুষ্ঠিত এক আলোচনাচক্রে পঠিত প্রবন্ধে ('ইন্ডিয়ান কনট্যাক্ট উইথ সোভিয়েট সেন্ট্রাল এশিয়া : ট্রেড অ্যান্ড মাইগ্রেশন ইন দি মিডিভ্যাল পিরিয়ড') মুনযাত-ও মক্তুবৎ থেকে উদ্ধৃতি।

৪২. জে. এ. ডাব্‌স, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪ ইত্যাদি ; এল. আমবি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮ ইত্যাদি ; পি. সি. বাগচী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০ ইত্যাদি ; বি. এন. মুখার্জি, 'সেন্ট্রাল এশিয়া (ইনক্লুডিং নর্দার্ন আফগানিস্তান'), দি কালচরাল হেরিটেজ অব

ইন্ডিয়া, খণ্ড ৫, (এস. কে. চ্যাটার্জি -সম্পাদিত), কলিকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৭০৩ ইত্যাদি।

৪৩. জে. এ. ডাব্‌স, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭-৫৯ ; নিউমিস্‌ম্যাটিক ক্রনিকল, ১৮৭৯, পৃ. ২৭৫-৭৬ ; দি জার্নাল অব দি নিউমিসম্যাটিক সোসাইটি অব ইন্ডিয়া, ১৯৭৩, খণ্ড ৩৫, পৃ. ১০১ ইত্যাদি।

৪৪. জে. এ. ডাব্‌স, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫। এই সম্পর্কে তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ এ. এফ. আর. হর্নলি -সম্পাদিত, দি বাওয়ার ম্যানাস্ক্রিপ্ট, কলিকাতা, ১৮৯৩-১৯১২ দ্রষ্টব্য।

৪৫. জে. এ. ডাব্‌স, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬ ; জে. ব্রাফ, দি গান্ধারী ধম্মপদ, লন্ডন, ১৯৬২, পৃ. ১ ইত্যাদি।

৪৬. ডব্লু. ক্লভিটার এবং এল. হলজ্‌মান, সংস্কৃত্ হান্ডস্‌খ্রিফ্‌টেন অউস তুরফান ফুলডেন, ভাইসবাডেন, ১৯৬৭, পৃ. ১০ ও প্লেট ১।

৪৭. এই সম্পর্কে জে. এ. ডাব্‌স এবং এল. আমবি-র পূর্বোক্ত গ্রন্থ দুটি দ্রষ্টব্য।

৪৮. জে. এ. ডাব্‌স, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯ ইত্যাদি ; এম. সুলিভান, চাইনিজ় আর্ট : রিসেন্ট ডিসকভারিজ়, লন্ডন, ১৯৭৩, পৃ. ২৪ ; ইন্দো-ইরানিয়ান জার্নাল, ১৯৮৮, পৃ. ৯৮ ; ইত্যাদি।

৪৯. জি. ফ্রামকিন, আর্কিওলজি অব সোভিয়েট সেন্ট্রাল এশিয়া, লাইডেন, ১৯৭০, পৃ. ১১ ইত্যাদি ; এ. বেলিনিট্‌স্কি, এনসেন্ট সিভিলাইজ়েশন অব সেন্ট্রাল এশিয়া, লন্ডন, ১৯৬৯, পৃ. ১৭ ইত্যাদি।

৫০. আর. জি. কেন্ট, ওল্ড পার্সিয়ান : গ্রামার, টেক্‌স্ট, লেক্সিকন, দ্বিতীয় সংস্করণ, নিউ হাভেন, ১৯৫৩, পৃ. ১১৭ ও ১৩৭।

৫১. রাহুল সংকৃত্যায়ন, হিস্ট্রি অব সেন্ট্রাল এশিয়া, নিউ দিল্লি, ১৯৬৪, পৃ. ১৬ ইত্যাদি ; ডি. সিনর, (সম্পাদক), পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮ ইত্যাদি ; ডব্লু. সামোলিন, ইস্ট তুর্কিস্তান টু দি টুয়েলফ্‌থ্ সেঞ্চুরি, দি হেগ, ১৯৬৪, পৃ. ১৯ ইত্যাদি এবং ৮৪-৮৫।

৫২. রাহুল সংকৃত্যায়ন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪২-৬২ ; আর. সি. মজুমদার, (সম্পাদক), স্ট্রাগল্ ফর এম্পায়ার, বম্বে, ১৯৫৫, পৃ. ১৩২ এবং ১৪২-৪৪ ; দি নিউ এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, ম্যাক্রোপেডিয়া, খণ্ড ২৪, পঞ্চদশ সংস্করণ, শিকাগো, ১৯৮৫, পৃ. ৩৪৮-৫০।

৫৩. স্ট্রাগল ফর এম্পায়ার, সম্পাদকের ভূমিকা।

৫৪. ডি. কৌশিক, সেন্ট্রাল এশিয়া ইন মডার্ন টাইম্‌স্ : এ হিস্ট্রি ফ্রম দি আর্লি নাইন্টিন্‌থ্ সেঞ্চুরি, মস্কো, ১৯৭০, পৃ. ৩২-৬৩ ; ডব্লু. এবারহার্ড, এ হিস্ট্রি অব চাইনা, লন্ডন, ১৯৬৪, পৃ. ২৭৭-৭৯ ও ২৮৮-৯৪ ; সি. পি. ফিট্‌জেরালড্, চাইনা : এ শর্ট কালচরাল হিস্ট্রি, লন্ডন, ১৯৬১, পৃ. ৫৫৩ ; দি নিউ এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, পূর্বোক্ত খণ্ড, পৃ. ৩৫২।

৫৫. ডি. কৌশিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২ ; জে. এ. ডাব্‌স, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫১-৫২।

সম্পাদকমণ্ডলী নীতি হিসেবে স্থির করেছেন টীকায় বিদেশী বইয়ের রেফারেন্স দেওয়া হবে রোমান হরফে। বিদেশী ভাষার রেফারেন্স রোমান হরফে ছাপলে, পাঠকের পক্ষে লাইব্রেরিতে বইপত্র খুঁজে পাওয়ার যে নানান সুবিধার দিক আছে, সেটা বিবেচনা করে এই নীতি গৃহীত হয়। কিন্তু এই প্রবন্ধে লেখকের বিশেষ ইচ্ছাক্রমে বিদেশী গ্রন্থকার ও গ্রন্থের নাম ইত্যাদি বাংলা হরফে মুদ্রিত হল।

মন, মস্তিষ্ক ও গণিত্র[১]

দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

'(কেউ একটা হাত আমাদের চোখের কাছে নিয়ে এলে) চোখদুটো যে বন্ধ হয়ে যায়, সেটা আত্মার ক্রিয়ার বশে ঘটে না। আমাদের শরীরের যন্ত্রটাই এমনভাবে তৈরি যে, হাতটির গতি আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে অন্য এক গতির সৃষ্টি করে। এরই ফলে আমাদের পেশিতে জৈব রসের সঞ্চার হয়, যার দরুন চোখের পাতাগুলো বন্ধ হয়ে যায়।'

দেকার্ত (১৬৪৯)

প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে লেখা 'আত্মার সংরাগ' (*Les Passions de l'ame*')[২] বইয়ে দেকার্তের (১৫৯৬-১৬৫০) এই উক্তিটি একাধিক কারণে চিত্তাকর্ষক। প্রথমত, মানুষের শরীরকে যন্ত্র হিসেবে দেখা। মনে রাখবেন, মোটামুটিভাবে তিনি ছিলেন গালিলেও-র (১৫৬৪-১৬৪২) যুগেরই মানুষ। ধ্রুপদী বলবিদ্যার (classical mechanics) যথার্থ ক্রমবিকাশ সেই যুগেই শুরু হয়েছে। সেকালের মানুষের কাছে ঘড়ির কলকব্জা ছিল যেমন বিস্ময়কর তেমনি চিত্তাকর্ষক। জ্ঞানরাজ্যে আপ্তবাক্যের দাপট কমে গিয়ে তখন কার্যকারণের ধারণার উদ্ভব হচ্ছে। সব-কিছুর মধ্যেই মানুষ কারণের লীলা খুঁজতে শুরু করেছে। এর কয়েক দশক পরেই নিউটন বললেন যে, গতির বদলের পিছনে সর্বদাই থাকে কোনো-না-কোনো বলের প্রভাব। বস্তুত তাঁকে এমন প্রশ্নও করা হয়েছিল যে, গ্রহগুলো মহাকাশে প্রথম চলতে শুরু করল কোন্ বলের প্রভাবে। যাই হোক, বল আর গতির খেলা সেকালে যে-যন্ত্রটিতে সহজেই দেখা যেত তার নামই তো ঘড়ি। তাই অচিরে ঘড়িই হয়ে উঠল জড়বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় উপমা। শুধু জড়বিশ্বই বা কেন, যেখানে গতি সেখানেই যন্ত্রের অস্তিত্ব কল্পনা করা হতে লাগল। আর সেই যন্ত্রের চরমোৎকর্ষ দেখা যেত রাজারাজড়াদের প্রাসাদে রক্ষিত ঘড়ির সংগ্রহে, কিংবা তাঁদেরই উদ্যানের বিচিত্র জটিল ফোয়ারাগুলিতে। সন্দেহ নেই যে, এইসব দৃষ্টান্তের কথা মনে রেখেই দেকার্ত মানুষের শরীরকেও আজব কলকব্জার সমন্বয় বলে ভেবেছিলেন। সেই ভাবাটার একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। কারণ, দার্শনিক এবং গণিতবিদ হিসেবে দেকার্তের প্রতিপত্তি ছিল খুবই বেশি।

দেকার্তের উক্তিটির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এইখানে যে, আজকাল আমরা যাকে প্রতিবর্তী ক্রিয়া (reflex action) বলি, তার মধ্যে তিনি আত্মার প্রকাশ দেখেন নি। দেখেছিলেন মস্তিষ্কের প্রভাব। যে জৈব রসের (animal spirits) মারফতে সেই প্রভাব কাজ করে বলে তিনি ভেবেছিলেন তার মধ্যে আর যাই থাকুক, আধ্যাত্মিকতার নামগন্ধ ছিল না। সেই কালের পক্ষে নিছক দূরকল্পনা (speculation) হিসেবেও এটা খুব কম কথা ছিল না।

আর ঠিক এইখানে এসেই একটা জিনিস আমাদের নজরে পড়ে। মানুষের শরীরকে দেকার্ত যন্ত্র বলে ভাবছেন। সেখানে অবশ্য তিনি একা নন, বরং যুগধর্মের অনেকটা কাছাকাছি। দেহের পেশির ক্রিয়ার উপরে আত্মার বদলে মস্তিষ্কের প্রভাবের কথাই তিনি ভাবছেন। সেখানে তিনি একজন অগ্রদূত। কিন্তু মানুষের মনের কথা অন্তত এখানে তিনি তোলেন নি। সেটা একটু আশ্চর্য, কারণ আমরা তো জানি, 'মন বনাম জড়' শীর্ষক যে তর্কটা আজ বহুকাল যাবৎ দর্শনের দুনিয়ায় জারি আছে, দেকার্তকেই তার প্রবর্তক বলে ধরা হয়।

ওই তর্কের প্রসঙ্গ দিয়েই আলোচনাটা শুরু করা যেতে পারে।[৩]

মন ও মস্তিষ্ক : সমানয়ন ও জড়বাদ

একটু আগেই দেকার্তের প্রস্তাবিত 'জৈব রস'-এর কথা বলেছি। এও বলেছি যে, তার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার বালাই ছিল না। তা হলে বস্তুটা কী? দেকার্তের নিজের মতে জৈব রস

> জড় বস্তুখণ্ডের সমষ্টি ছাড়া কিছু নয়। সেই বস্তুখণ্ডগুলির অদ্ভুত গুণ এই যে, আয়তনে তারা অত্যন্ত ছোটো এবং চলাফেরায় অত্যন্ত দ্রুত... অনেকটা অগ্নিশিখার ভিতরকার কণাসমূহের মতো।[৪]

বলা বাহুল্য, এই ব্যাখ্যার ভাষা আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষা নয়। বরং এর মিল আছে মধ্যযুগের অ্যালকেমির ভাষার সঙ্গে। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথা এই যে, আজকাল যাকে স্নায়ুর ক্রিয়া বলা হয় তাকে দেকার্তই প্রথম বুঝতে চেষ্টা করেন আত্মাকে বাদ দিয়ে, জড়বস্তুর ক্রিয়ার মারফতে। এমন-কি, প্রাণীর অনুভব আর চলৎশক্তির মূল যে তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিংবা পেশিসমূহ থেকে দূরে অন্য কোথাও, অর্থাৎ মস্তিষ্কে, সেটাও তিনি ধরতে পেরেছিলেন।

'এটা অবশ্য সহজেই প্রমাণ করা যায় যে, যেসব জিনিস শরীরকে প্রভাবিত করে আত্মা সেগুলোকে একেকটি স্বতন্ত্র অঙ্গে স্থিত প্রভাব হিসেবে অনুভব করে না, করে মস্তিষ্কে স্থিত প্রভাব হিসেবেই। শরীরের বিভিন্ন অংশকে যেসব বাহ্য বস্তু স্পর্শ করে, স্নায়ুমণ্ডলীর গতির মারফতে তাদের বিচিত্র ক্রিয়া মস্তিষ্কে পৌঁছে যায়।'[৫]

সকলেই জানেন, যেসব রোগীর কোনো প্রত্যঙ্গ নিরুপায়বোধে কেটে বাদ দেওয়া হয়, অস্ত্রোপচারের বহুদিন পরেও তাঁরা অনেকসময় সেই হারানো প্রত্যঙ্গের উপস্থিতি অনুভব করেন, এমন-কি, তার ব্যথা-বেদনাও টের পান। পরিভাষায় একে বলা হয় অশরীরী প্রত্যঙ্গ (phantom limb)। বলা বাহুল্য, মস্তিষ্কে সঞ্চিত পূর্বস্মৃতিই এর কারণ। দেকার্ত সেই ঘটনাকেই মস্তিষ্কের মধ্যস্থতার প্রমাণ হিসেবে দাখিল করেছেন। কিন্তু মধ্যস্থতাটা কাদের মধ্যে? একদিকে তো শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। অন্যপক্ষ হিসেবে এইখানেই 'আত্মা'-র অনুপ্রবেশ। দেকার্তের বাক্যটি লক্ষ্য করুন : 'আত্মা সেগুলোকে একেকটি স্বতন্ত্র অঙ্গে স্থিত প্রভাব হিসেবে অনুভব করে না, করে মস্তিষ্কে স্থিত প্রভাব হিসেবেই।' দেকার্তের মতো একজন বড়ো দার্শনিক একটিও শব্দ অযথা ব্যবহার করেন না। সুতরাং ধরে নিতে হবে যে, তিনি যা বলতে চান ঠিক তা-ই বলছেন। ধরুন, প্রভাব বলতে কোনো রোগীর ডান পায়ের উরুতে একটি ব্যথার কথা ভাবা হচ্ছে। দেকার্তের বক্তব্য এই যে, রোগীর ডান উরুর ওই বিশিষ্ট অবস্থার খবর স্নায়ুর ভিতর দিয়ে গিয়ে মস্তিষ্কে জমা পড়ছে। অতঃপর মস্তিষ্কই সেটাকে ডান উরুর ব্যথা বলে শনাক্ত করে এবং টের পাওয়ায়। কিন্তু টের পায়-টা কে? দেকার্ত বলছেন, 'আত্মা'। আজকের ভাষায় আমরা হয়তো বলতাম 'মন'। এইখানেই মন আর জড়ের দ্বৈতবাদ এসে যাচ্ছে। অনেকটা এগিয়েও দেকার্ত ব্যাপারটা এড়াতে পারছেন না। অসুবিধাটা কীসের? আর-একটু খুলে জিজ্ঞাসা করা যায়, মস্তিষ্কই যদি তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের কেন্দ্র হয় তবে অনুভূতি এবং চিন্তার আধার হিসেবেও তাকেই চিহ্নিত করতে অসুবিধাটা কী?

আগেই বলেছি, দেকার্ত নিজে যন্ত্র সম্বন্ধে উৎসাহী ছিলেন। প্রাণের ব্যাখ্যায় যন্ত্রের উপমা সেইযুগেরই দান। সুতরাং মস্তিষ্কের ক্রিয়া বুঝতে গিয়ে দেকার্তও সেই উপমার কথাই ভেবেছিলেন। অন্য দিকে যিনি বলেন 'আমি ভাবি, অতএব আমি আছি', সেই দেকার্ত প্রাণী হিসেবে মানুষের দুটি ক্ষমতাকে বিশেষ মূল্য দিতেন : যুক্তিশীলতা এবং ভাষার ব্যবহার। ফলে তাঁর কাছে প্রশ্নটা দাঁড়িয়েছিল এই : এমন কোনো যন্ত্র কি নির্মাণ করা সম্ভব, যা যুক্তির নিয়মগুলি মেনে চলবে এবং সৃষ্টিশীলভাবে ভাষার ব্যবহার করতে পারবে? সতেরো শতকের সেই প্রথমার্ধে এ-প্রশ্নের অবধারিত উত্তর ছিল, 'না।' সুতরাং মস্তিষ্কের অতিরিক্ত একটি আত্মার দ্বারস্থ তাঁকে হতে হল। দার্শনিক প্রশ্নের উত্তরও যে কখনো কখনো টেকনোলজির অবস্থার উপরে নির্ভর করতে পারে, এটা তার একটা দৃষ্টান্ত।

তার পর প্রায় সাড়ে তিনশো বছর কেটে গেছে। যুক্তিশীল যন্ত্র জিনিসটা আজ আর আমাদের কাছে অভাবিত কিছু নয়। যুক্তির প্রদত্ত নিয়মাবলী মেনে নানারকম সংকেত (symbol) নিয়ে দ্রুতবেগে নাড়াচাড়া করার ব্যাপারে

মানুষের নির্মিত যন্ত্র এখন মানুষকে বহুদূর পিছনে ফেলে গেছে। পৃথিবীর আকাশে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করে যে তথ্য-সংস্থা (information system), কিংবা মঙ্গলগ্রহের আকাশে পৃথিবী থেকে পাঠানো মহাকাশযানের গতিবিধি পরিচালনা করে যে যন্ত্রসমবায়, যুক্তির ব্যবহারে তাদের দক্ষতা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন ওঠে না। জটিল কোনো যন্ত্রের তত্ত্বাবধানের ভার এইসব কৃত্রিম অভিভাবক সংস্থার উপরে দেওয়া হলে মানুষের চেয়ে অনেক বেশি তাড়াতাড়ি যন্ত্রটির বস্তুগত পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে নিয়ে এরা যুক্তিসংগত সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারে। সেই কারণেই যোগাযোগ আর নিয়ন্ত্রণের (communication and control) নানা ক্ষেত্রে এইসব যান্ত্রিক 'মস্তিষ্কের' ব্যবহার এতটা বেড়ে গেছে। কিন্তু এর ফলে 'মন বনাম জড়'-এর সেই পুরোনো বিতর্কের কি কোনো সুরাহা হয়েছে ?

কোনো কোনো তর্ক আছে যা সহজে যেতে চায় না। বড়োজোর রূপান্তরিত হয়। মন আর জড়ের দ্বৈতবাদ হচ্ছে সেইরকম একটা ব্যাপার। এ-তর্কের রূপান্তর না হয়ে উপায় ছিল না। কারণ, মন সম্বন্ধে আমাদের চিন্তাভাবনার ধরন আর ভাষা দুটোই বদলেছে। আর, জড় সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান তো বেড়েছে তার চেয়েও বেশি। যাই হোক, নিছক 'জড়' শব্দটা ব্যবহার না করে মানুষের মস্তিষ্ককেই যদি জড়জগতের নিয়মের অনুবর্তী সংস্থা বলে ভাবি, তবে তর্কটা দাঁড়ায় এইরকম : দেহের অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে আমাদের মস্তিষ্ক নানা অবস্থার ভিতর দিয়ে যায়, নানা প্রক্রিয়াও তার মধ্যে চলে। আবার যাকে আমরা মন বলি, তার মধ্যেও নানা প্রক্রিয়া ঘটে, নানা অবস্থায় সে থাকতে পারে বলে আমাদের ধারণা। মস্তিষ্কের সঙ্গে মনের যে ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, এটাও মোটামুটি পরীক্ষিত। এখন প্রশ্ন হল, মনের যাবতীয় অবস্থা এবং ক্রিয়াকে কি মস্তিষ্কের নানা সম্ভাব্য অবস্থা এবং ক্রিয়ার দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব ? ব্যাখ্যা বলতে এখানে উভয়ের মধ্যে এমন একধরনের সম্পর্ক-নির্দেশ বোঝাচ্ছে যাতে মনের প্রতিটি অবস্থা বা ক্রিয়ার সঙ্গে মস্তিষ্কের কোনো-না-কোনো অবস্থা বা ক্রিয়াকে দ্ব্যর্থহীনভাবে যুক্ত করা যাবে। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, এই সম্পর্ক নির্দেশের কাজটা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে অথবা অদূর ভবিষ্যতে হয়ে যাবে। প্রশ্নটা হচ্ছে, আদৌ এটা সম্ভব কিনা। যাই হোক, পরিভাষায় এটাকে বলা যেতে পারে সমানয়ন (reduction)। মনের অবস্থা তথা ক্রিয়াসমূহকে মস্তিষ্কের অবস্থা তথা ক্রিয়াসমূহে সমানীত করা সম্ভব কিনা, এটাই প্রশ্ন।

পাঠক লক্ষ করবেন, এই তর্কের খাতিরে মস্তিষ্ককে আমরা জড়জগতের নিয়মানুবর্তী বলে ধরেছি। তার পরেও প্রশ্ন থাকে, প্রাণীর অঙ্গ হিসেবে সে তো প্রাণের ধর্মেরও অংশীদার। জড়ের ধর্ম থেকে কীভাবে প্রাণের ধর্মে পৌঁছোনো যায়, এটা সেই বৃহত্তর প্রশ্নের অন্তর্গত। এ বিষয়ে আমরা অন্যত্র কিছু আলোচনা করেছি। সুতরাং আপাতত পুঁথি বাড়াব না। ধরে নেব যে মস্তিষ্ক জিনিসটা জড়বস্তু দিয়েই গড়া।

এখন সুধী পাঠক কি শুনে অবাক হবেন যে, বহু দার্শনিক এবং ধর্মতত্ত্ববিদের সঙ্গে সঙ্গে বেশ-কিছু মনস্তত্ত্ববিদ, স্নায়ুবিজ্ঞানী, প্রাণতত্ত্ববিদ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিবৃত্তি (artificial intelligence)-সংক্রান্ত গবেষকও মন আর মস্তিষ্কের সমানয়ন আদৌ সম্ভবপর বলে মনে করেন না ? বরং কোনো কোনো মহলে 'সমানয়ন' কথাটা স্রেফ গালাগাল হিসেবেই প্রচলিত। সেটা নাহয় অগ্রাহ্যই করা গেল। কিন্তু ওই একই শব্দ আবার আচরণবাদ (behaviorism), জড়বাদ (materialism), বুর্জোয়া ধনতন্ত্র, নিরীশ্বরবাদ ইত্যাদি বিবিধ নষ্টামির প্রতিশব্দ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ফলে তর্কটা মাঠে মারা যেতে পারে। সুতরাং সমানয়ন বলতে আমরা কী বুঝি সেটা একটু স্পষ্ট করে নেওয়া ভালো।

কথাটা এই : 'সমানয়ন' হচ্ছে দুটো স্বতন্ত্র তত্ত্বের মধ্যে দ্ব্যর্থহীন একধরনের অন্বয়। যেমন ধরুন, পদার্থবিদ বলবেন, আলো হচ্ছে একধরনের তড়িৎ-চুম্বক বিকিরণ (electromagnetic radiation)। অর্থাৎ পরস্পর সংশ্লিষ্ট তড়িৎ এবং চুম্বক বলের ঢেউ আকাশের (Space) কোনো অঞ্চলে প্রবাহিত হলে শক্তির যে বিকিরণ ঘটে, আলোর প্রবাহের ফলেও ঠিক তেমনটি ঘটে। আমরা বলব, আলো জিনিসটা তড়িৎ-চুম্বক বিকিরণের সঙ্গে সমানীত হয়েছে। অর্থাৎ ১. আলোর তত্ত্ব তড়িৎ-চুম্বক বিকিরণের তত্ত্বের সঙ্গে সমানীত হয়েছে, আর ২. তত্ত্বের

এই সমানয়ন এমনভাবে ঘটেছে যে, আলো এবং তড়িৎ-চুম্বক বিকিরণকে অভিন্ন বলে মনে করা যেতে পারে। এইভাবে দেখলে আলোর তত্ত্ব এবং তড়িৎ-চুম্বক বিকিরণের তত্ত্বের সমানয়নটাই মুখ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সকলেই জানেন, ব্রিটিশ পদার্থবিদ জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই কাজটি করে অক্ষয়কীর্তি অর্জন করেছেন। তবে জ্ঞানরাজ্যের মজা এই যে, আজকের যুগান্তকারী আবিষ্কার আগামীকাল পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্গত মুখস্থবিদ্যা হয়ে যায়। ম্যাক্সওয়েলের বিখ্যাত সমীকরণগুলিরও সেই দশা হয়েছে। তা নাহয় হল। কিন্তু তার ফলে জ্ঞানতত্ত্বের (epistemology) দিক থেকে সমানয়নের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমাদের উৎসাহ কি বেড়েছে ? বলা শক্ত। যাই হোক, মানসিক অবস্থা তথা ক্রিয়াসমূহকে মস্তিষ্কের অবস্থা তথা ক্রিয়াসমূহের সঙ্গে সমানীত করা যায় কিনা, এ প্রশ্নের পিছনে থাকে তত্ত্বের ওই সমানয়নের প্রশ্ন : ১. মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে এমন কোনো তত্ত্ব কি আছে যা স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়াসংক্রান্ত তত্ত্বের সঙ্গে সমানীত হতে পারে, এবং ২. তত্ত্বের এই সমানয়ন কি এমনভাবে সম্ভবপর যাতে প্রথমোক্ত তত্ত্বে বর্ণিত একেকটি অবস্থাকে শেষোক্ত তত্ত্বের দ্বারা বর্ণিত একেকটি অবস্থার সঙ্গে দ্ব্যর্থহীনভাবে অন্বিত করা যাবে ? ১. এবং ২. এই দুটি প্রশ্নেরই উত্তর যদি হয় 'হ্যাঁ', তবেই বলা যাবে যে মানসিক অবস্থাসমূহ মস্তিষ্কের অবস্থাসমূহের সঙ্গে সমানীত হতে পারে। এর মধ্যে অবশ্যই জড়িত আছে এমন তত্ত্বনির্মাণের তাগিদ যা সমানয়নের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে। অর্থাৎ সমানয়ন যদি সম্ভবপর হয় তবে এমন তত্ত্বই আমরা চাইব যা সেই সম্ভাবনাকে বাস্তব করে তোলে।

আগেই বলেছি, সমানয়নের সম্ভাবনাকেই সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন এমন দার্শনিক কিংবা বিজ্ঞানীর সংখ্যা মোটেই কম নয়। এঁদের যুক্তিটা কী ? মোটামুটিভাবে এঁদের দুভাগে ভাগ করা যায়।

১. প্রথম দলের যুক্তির প্রধান ভিত্তি হল মস্তিষ্কের গড়ন আর ক্রিয়ার জটিলতা। অর্থাৎ মানুষের মস্তিষ্কে এত বেশি-সংখ্যক স্নায়ুকোষ (neuron) আছে এবং পরস্পরের সঙ্গে তারা এত বিচিত্র রকমের সংযোগ তৈরি করতে পারে যে, মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ বুঝে ওঠা মানুষের অসাধ্য। অর্থাৎ কিনা আমাদের মাথাটা যতটা জটিল ততটা শক্তিশালী নয়। ফলে নিজেকে বুঝে ওঠা তার পক্ষে অসম্ভব। প্যাট্রিশিয়া চার্চল্যান্ড এঁদের নাম দিয়েছেন 'বিভ্রান্ত সংশয়বাদী'। দৃশ্যত এঁরা স্নায়ুবিজ্ঞানে অজ্ঞেয়বাদের পক্ষপাতী।

২. দ্বিতীয় দলটিকে চার্চল্যান্ড বলেছেন 'নীতিগত সংশয়বাদী'। এঁরা নিজেদের সংশয়ের সপক্ষে কোনো-না-কোনো নীতির সমর্থন জোগাড় করে থাকেন। যেমন ধরুন, আত্মমুখ (subjective) অভিজ্ঞতার অস্তিত্ব। এই দলটিকেও আবার নীতিগত আপত্তির ধরন অনুযায়ী দুভাগে ভাগ করা যায় :

ক. প্রথম দল বলেন, মানুষের মনে বিশিষ্ট একটি উপাদান আছে যা কোনো জড়বস্তু দিয়ে তৈরি নয়। আর

খ. দ্বিতীয় দল বলেন, মস্তিষ্কের নিজেরই এমন কিছু ধর্ম আছে যা কোনো জড়বস্তুতে পাওয়া যাবে না।

এসব মতের মুশকিল এই যে, মনের অবস্তুঘটিত উপাদান হোক আর মস্তিষ্কের 'পরাবাস্তব' ধর্মই হোক, মস্তিষ্কের বস্তুগত উপাদান এবং ধর্মসমূহের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক স্থাপিত হয় কীভাবে ? বস্তুর সঙ্গে অ-বস্তুর লেনদেনটা হবে কী উপায়ে ? শুধু ভাষা দিয়ে তো এ সমস্যার পার পাওয়া যাবে না। বিশদ মডেলটা কী হবে ? শেষ পর্যন্ত অবশ্য শুধু তর্কে বাজিমাতের ভিত্তির উপরে কোনো বিজ্ঞানই দাঁড়িয়ে থাকে না। একদিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর অন্য দিকে তত্ত্বগত কাঠামো, এই দুয়ের চলমান জটিল ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে একেকটা বিষয়ের রূপরেখা তৈরি হতে থাকে। এগোতে এগোতে সেই চলচ্ছবির চেহারায় অনেক বদল আসে। অনেক প্রকল্প (hypothesis) একসময়ে প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসে, কিন্তু পরে অভিজ্ঞতার নিরিখে ঝরে যায়। আবার অনেক অপ্রত্যাশিত অন্তর্দৃষ্টি অকস্মাৎ বিদ্যুৎ-চমকের মতো ঝলসে উঠে দৃশ্যপটের চেহারাটা বদলে দেয়। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, একটা রূপের আভাস পাওয়া যাচ্ছে যার মধ্যে মোটামুটি অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য আছে। আবার বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সঙ্গেও তার অসংগতি নেই। আধুনিক স্নায়ুবিজ্ঞানও এইভাবেই গড়ে উঠেছে, এখনও উঠছে।

অপরপক্ষে দেকার্তের 'মন বনাম জড়'-এর প্রকল্পটি একালের পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, প্রাণের অভিব্যক্তিবাদ, আণবিক প্রাণতত্ত্ব, ভ্রূণতত্ত্ব এবং অবশ্যই স্নায়ুবিজ্ঞানের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে উত্তরোত্তর খাপছাড়া বলে প্রতিভাত হচ্ছে।

যে কারণেই হোক, 'জড়বাদ' (materialism) কথাটায় অনেকেই একধরনের আঁশটে গন্ধ পান। কিন্তু জড় থেকেই বহুকোটি বছরের অভিব্যক্তির ভিতর দিয়ে ক্রমশ বৃহত্তর অণুসমূহ (macromolecules) রূপ পরিগ্রহ করেছিল এবং তার থেকেই সরলতম সপ্রাণ সংস্থার (living systems) উদ্ভব ঘটেছিল, এমন মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। আর, সেই প্রাণেরই শ্রেষ্ঠ বিকাশ যে চেতনায় (consciousness), তা নিয়ে বোধহয় মতান্তর নেই। জড় থেকে প্রাণ এবং প্রাণ থেকে চেতনার নিরন্তর বিকাশের ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য উক্তি এইসূত্রে মনে পড়ে :

> বিশ্বরচনার মূলতম উপকরণ পরমাণু ; সেই পরমাণুগুলি অচিন্তনীয় বিশেষ নিয়মে অতি সূক্ষ্ম জীবকোষরূপে সংহত হল। প্রত্যেক কোষটি সম্পূর্ণ এবং স্বতন্ত্র, তাদের প্রত্যেকের নিজের ভিতরেই একটা আশ্চর্য শক্তি আছে, যাতে করে বাইরে থেকে খাদ্য নিয়ে নিজেকে পুষ্ট, অনাবশ্যককে ত্যাগ ও নিজেকে বহুগুণিত করতে পারে। এই বহুগুণিত করার শক্তি দ্বারা ক্ষয়ের ভিতর দিয়ে মৃত্যুর ভিতর দিয়ে প্রাণের ধারা প্রবাহিত হয়ে চলে।
>
> এই জীবাণুকোষ প্রাণলোকে প্রথমে একলা হয়ে দেখা দিয়েছে। তার পরে এরা যত সংঘবদ্ধ হতে থাকল ততই জীবজগতে উৎকর্ষ ও বৈচিত্র্য ঘটতে লাগল। যেমন বহুকোটি তারার সমবায়ে একটি নীহারিকা তেমনি বহুকোটি জীবকোষের সমাবেশে এক-একটি দেহ। বংশাবলীর ভিতর দিয়ে এই দেহজগৎ একটি প্রবাহ সৃষ্টি করে নূতন নূতন রূপের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে চলেছে।... উদ্দাম তেজকে শান্ত করে দিয়ে ক্ষুদ্রায়তন গ্রহরূপে পৃথিবী যে অনতিক্ষুব্ধ পরিণতি লাভ করেছে সেই অবস্থাতেই প্রাণ এবং তার সহচর মনের আবির্ভাব সম্ভবপর হয়েছে, এ কথা যখন চিন্তা করি তখন স্বীকার করতেই হবে, জগতে এই পরিণতিই শ্রেষ্ঠ পরিণতি। যদিও প্রমাণ নেই এবং প্রমাণ পাওয়া আপাতত অসম্ভব, তবু এ কথা মানতে মন চায় না যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই জীবনধারণযোগ্য চৈতন্যপ্রকাশক অবস্থা একমাত্র এই পৃথিবীতেই ঘটেছে— যে, এই হিসাবে পৃথিবী সমস্ত জগৎধারার একমাত্র ব্যতিক্রম।

অত্যন্ত সংহত এই বিবরণ কিন্তু শুধুই কবির স্বজ্ঞার নিদর্শন নয়। এর প্রতিটি শব্দই সযত্নে নির্বাচিত এবং যথাযথ, সুতরাং অনুধাবনযোগ্য। এত সংক্ষেপে এতটা কথা এমন তাৎপর্যপূর্ণ ভাষায় বলা যে-কোনো বিজ্ঞানীর পক্ষেও সহজ হত না। সমানয়নের সম্ভাবনাকে মেনে নেওয়ার অসুবিধাটা যে নিছক জ্ঞানের ব্যাপার নয়, তার সঙ্গে ঐতিহ্যগত মনোভাবেরও যোগ আছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে একজন কবিও সেই বাধা অতিক্রম করতে পারেন, এটা নিশ্চয়ই চিত্তাকর্ষক।

কবির ওই উক্তির পর প্রায় যাট বছর কেটে গেছে। গত যাট বছরে প্রাণতত্ত্বের আশ্চর্য অগ্রগতি হয়েছে। স্নায়ুবিজ্ঞানেরও কম উন্নতি হয় নি। 'মন বনাম জড়'-এর তর্কের অবস্থাটা এখন কী দাঁড়িয়েছে ? কথাটা একটু ঘুরিয়ে বলাই বোধহয় সংগত হবে। এখনও পর্যন্ত যাবতীয় সাক্ষ্যপ্রমাণের ঝোঁক অবশ্যই তথাকথিত জড়বাদের দিকে। তবু এমন কথা বলা যাবে না যে, বংশগতি যে-অর্থে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব, ডি-এন-এ-র গড়ন যে-অর্থে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব, জড়বাদ সেই একই অর্থে সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং হলফ করে কেউ বলবেন না যে, কার্তেজিয় দ্বৈতবাদ কোনোমতেই ফিরে আসবে না। তবে সুদূর সেই সম্ভাবনা সত্ত্বেও ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদের মতোই সকর্মক প্রকল্প হিসেবে জড়বাদই নিঃসন্দেহে শ্রেয়।

কথাটা এইভাবে বললে যুক্তির বুনটের মধ্যে যেটুকু ফাঁক থাকে, অজ্ঞেয়বাদীদের পক্ষে সেইটুকুই যথেষ্ট। তাঁদের যুক্তিটা দাঁড়ায় এইরকম : যেহেতু স্নায়ুতন্ত্রের ঘটনাসমূহের ভিত্তিতে চেতনার ব্যাখ্যা করতে স্নায়ুবিজ্ঞান দৃশ্যত এখনও

অক্ষম, সেইহেতু ওইভাবে চেতনার ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ এঁদের যুক্তির ভিত্তি হচ্ছে অজ্ঞান। ঠিকমতো সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে পারলে এই অজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিকে রীতিমতো মনোরম করে তোলা যায়। অনেকে মনে করেন, মানসিক ঘটনাসমূহের বস্তুগত ব্যাখ্যা যে আদৌ সম্ভবপর, এই চিন্তাটাই তাঁদের স্বজ্ঞার পক্ষে অস্বস্তিকর। এককথায় এই আপত্তিকে বলতে পারি স্বজ্ঞা-বিবাদ (intuition dissonance)। অষ্টাদশ শতকে জার্মান দার্শনিক এবং গণিতজ্ঞ লাইব্‌নিট্‌স এর সূত্রপাত করেছিলেন। আর গত দুই দশকে জন এক্‌ল্‌স[৬] থেকে শুরু করে রজার পেনরোজ[৭] পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা এর নানা রকমফের উপস্থাপন করেছেন। এর যথার্থ উত্তর পাওয়া যায় বিজ্ঞানের ইতিহাসে। কোপার্নিকাস, গালিলেও, ডারউইন, আইনস্টাইন এবং হাইজেনবার্গ, এঁদের প্রত্যেকের কাজ সমকালীন বহু বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকের স্বজ্ঞাকে প্রবলভাবে আঘাত করেছিল। আবার শেষ পর্যন্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সেইসব কাজ অবিসংবাদিত প্রতিষ্ঠাও পেয়েছিল। এতে বোধহয় এইটুকুই প্রমাণ হয় যে, জ্ঞানের অগ্রগতি সর্বদা সরলরেখায় ঘটে না। স্নায়ুবিজ্ঞান সম্বন্ধেও যে সেই একই কথা খাটে, তার কিছু প্রমাণ ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে।

মস্তিষ্কের গড়ন ও ক্রিয়া : কিছু তথ্য

'মন বনাম জড়'-এর যে তর্কের কথা একটু আগে বলেছি, তাতে নতুন একটি মাত্রা যুক্ত হয় যদি গণিত্রের (computer) কথা ভাবি। গণিত্র অবশ্য নানাধরনের হতে পারে। আমরা তার বিশদ আলোচনায় না গিয়ে ওই জাতীয় যন্ত্রের এমন কতকগুলি সামান্য লক্ষণের কথা ভাবব, মানুষের মস্তিষ্কের গড়ন আর ক্রিয়া বোঝবার ব্যাপারে যাদের কিছু প্রাসঙ্গিকতা আছে। প্রাসঙ্গিকতা মানে নিছক সাদৃশ্য নয়, মূলত তুলনীয়তা। ঘটনা এই যে, মানুষের মস্তিষ্কের কিছু কিছু ক্রিয়াকে যন্ত্রের সাহায্যে অনুকরণ করবার চেষ্টার ফলেই গণিত্র নির্মাণ সম্ভবপর হয়েছিল। মস্তিষ্ক জিনিসটা তো প্রাণীর শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তাকে যখন জড় থেকেই উদ্ভূত বলে ভাবি, তখন প্রাণ আর অপ্রাণের সীমারেখাটাকে অন্তত সাময়িকভাবে ভুলে যাই। গণিত্র সম্বন্ধে কিন্তু আর সে কথা খাটে না। গণিত্র হচ্ছে মানুষের তৈরি যন্ত্র যা কোনো-না-কোনো ভাবে মানুষের মস্তিষ্কের ক্রিয়ার অনুকরণের সুবাদেই নির্মিত। বলা বাহুল্য, নানাধরনের ব্যবহারিক প্রয়োজনেই গণিত্রের উদ্ভব এবং সেখানেই তার উপযোগিতা। কিন্তু আমাদের এই আলোচনায় তার ভূমিকাটা একটু অন্যরকম। যন্ত্র হিসেবে গণিত্রকে জড় ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। অথচ মানুষের মস্তিষ্কের অন্তত কিছু কিছু ক্রিয়া 'সে' নকল করতে পারে। যে-পরিমাণে পারে, ঠিক সেই পরিমাণে মস্তিষ্কের ক্রিয়াকে আর পরাবাস্তবের এলাকায় ফেলা যায় না। তা ছাড়া জটিল যন্ত্র হিসেবে গণিত্রের মধ্যে সংগঠনের একাধিক স্তর থাকে। যেহেতু এ-যন্ত্র মানুষেরই তৈরি, সেইহেতু গণিত্রের জটিল ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সংগঠনের এই স্তরবিন্যাসের বিশদ সম্পর্কটা আমাদের জানা থাকে। অন্য দিকে মস্তিষ্কের গড়নও খুবই জটিল এবং তার মধ্যেও খুব জটিল স্তরবিন্যাস দেখা যায়। প্রশ্ন হচ্ছে, গণিত্রের গড়নের সঙ্গে তার ক্রিয়ার বিশদ সম্পর্ক যদি সযত্নে অনুধাবন করি, তবে তার সঙ্গে তুলনা করে মস্তিষ্কের গড়ন আর ক্রিয়ার পারস্পরিক সম্পর্ক ক্রমশ অনুধাবন করা অন্তত খানিকটা সহজ হবে না কি? এই তুলনামূলক চর্চার ব্যাপারটা বস্তুত ইদানীং রীতিমতো চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। বিশেষজ্ঞরা এর নাম দিয়েছেন গণনাত্মক স্নায়ুবিজ্ঞান (Computational Neuro-Science)। এই প্রবন্ধের বাকি অংশে আমরা এইরকম দৃষ্টিকোণ থেকেই মস্তিষ্ক আর গণিত্র সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করব।[৮]

প্রথমে মস্তিষ্কের কথাই ধরা যাক। এ-বিষয়ে শুধু সেইটুকুই বলব, গণনাত্মক স্নায়ুবিজ্ঞানের মোটা কথাগুলো বোঝার পক্ষে যা অপরিহার্য। অর্থাৎ মস্তিষ্কের গড়ন আর ক্রিয়া সম্বন্ধে আমরা একেবারে প্রাথমিক কিছু তথ্য পরিবেশন করব।

১. স্তরবিন্যাসের প্রকারভেদ : মস্তিষ্কের স্তরবিন্যাস বলতে তিনধরনের বিন্যাসের কথা ভাবা যায় : বিশ্লেষণের স্তরভেদ, সংগঠনের স্তরভেদ এবং প্রক্রিয়াগত স্তরভেদ। এর মধ্যে সংগঠনের স্তরভেদ হচ্ছে

শারীরস্থানের (anatomy) ব্যাপার। স্নায়ুমণ্ডলীর ক্ষুদ্রতম উপাদান যে অণু তার থেকে শুরু করে ক্রমশ বৃহত্তর ধাপগুলোকে এইভাবে সাজানো যেতে পারে : অণু, স্নায়ুসন্ধি (synapse), স্নায়ুকোষ (neuron), কোষের জালি (network), পরত (layer), মানচিত্র (maps) এবং তন্ত্র (systems)। প্রক্রিয়াগত স্তরভেদ হচ্ছে শারীরবৃত্তের (physiology) ব্যাপার। অর্থাৎ মস্তিষ্ক এবং বৃহত্তর স্নায়ুতন্ত্রের কোন্‌খানে কোন্ প্রক্রিয়াটা হচ্ছে, তার খতিয়ান। আর বিশ্লেষণের স্তরভেদ হচ্ছে মস্তিষ্কের পুরো কর্মপন্থার ব্যাপার। যে-কোনো একটি সমস্যার সমাধান করতে হলে মস্তিষ্ক সেটিকে মোটামুটিভাবে কয়েকটি ছোটো ছোটো অংশে ভেঙে নিয়ে প্রত্যেকটির জন্যে কিছু বিশদ কৌশল তৈরি করে। সেই কৌশলের যুক্তির ছকটাকে বলা হয় অ্যাল্‌গরিদ্‌ম্ (algorithm)। কথাটা এসেছে নবম শতকের বাগদাদ-নিবাসী গণিতজ্ঞ মহম্মদ অল্-খোয়ারিজ্‌ম্-এর নাম থেকে।[৯] শেষ পর্যন্ত অবশ্য স্নায়ুমণ্ডলীর একাধিক অংশের প্রাণরসায়নঘটিত এবং বৈদ্যুত ক্রিয়ার মারফতে সমাধানের কাজগুলো বস্তুগত স্তরে নিষ্পন্ন করতে হয়। এই গোটা ব্যাপারটাকেই বলা যেতে পারে বিশ্লেষণের স্তরভেদের ব্যাপার।

এই যে তিনরকমের স্তরবিন্যাস, এর মধ্যে সংগঠনের স্তরভেদটা একেবারে ভৌগোলিক ব্যাপার। মস্তিষ্কের বস্তুগত সংগঠন বুঝতে হলে এটা জানা দরকার।

২. সংগঠনের স্তরসমূহ : এর আগের অনুচ্ছেদে আমরা সংগঠনের সাতটি স্তরের কথা বলেছি : অণু, স্নায়ুসন্ধি, স্নায়ুকোষ, কোষের জালি, পরত, মানচিত্র এবং তন্ত্র। এক নম্বর ছবিতে এই সাতটি স্তরের বিশিষ্ট ক্রিয়া সমেত তাদের গড়ন এবং পরম্পরার একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে। এই ছকটি গর্ডন শেফার্ড -এর দেওয়া। পুরো মস্তিষ্কটাকে যদি উচ্চাঙ্গের একটা গণিত্র বলে ভাবি, তবে প্রতিটি স্তরই সেই গণিত্রের কাজে কোনো-না-কোনোভাবে অংশগ্রহণ করে। সংগঠনের এই বিস্তার থেকে একটা জিনিস বোঝা যায়। একটু আগে আমরা মস্তিষ্কের কর্মপন্থা নির্ধারণের কথা বলেছি, আবার বস্তুগত স্তরে তাকে নিষ্পন্ন করার কথাও বলেছি। এখন একনম্বর ছবিতে সংগঠনের যে ছক দেখানো হয়েছে, তাতে এটা বোঝা যাচ্ছে যে এই কর্ম নিষ্পাদনের ব্যাপারটা কোনো একটিমাত্র স্তরে ঘটে না, বিভিন্ন স্তরেই ঘটে থাকে। ছবিতে দেখতেই পাচ্ছেন, প্রত্যেক স্তরেই কিছু-না-কিছু রাসায়নিক তথ্য বৈদ্যুত ক্রিয়া ঘটছে। ছবির 'ছ' অংশে দেখা যাচ্ছে, একেবারে প্রাথমিক স্তরে, অর্থাৎ কোষঝিল্লী (cell membrane) তথা অণুর স্তরে, স্নায়ুসন্ধি কিংবা স্নায়ুখাত (channel) পেরিয়ে প্রেরকদ্রব্য (neurotransmitter) অথবা নিয়ন্তাদ্রব্য (neuromodulator) চলাচল করতে পারে। এই চলাচলের উপরেই স্নায়ুসমূহের ভিতর দিয়ে বৈদ্যুত বার্তার প্রবাহ নির্ভর করে। স্নায়ুসন্ধি পেরিয়ে বৈদ্যুত বার্তা প্রবাহিত হবে কি হবে না, সেটা প্রেরকদ্রব্যের গুণাগুণের উপর নির্ভর করে। আবার অন্য কিছু শর্তের উপরেও নির্ভর করতে পারে। যাই হোক, সেই হিসেবে প্রতিটি স্নায়ুসন্ধিই জটিল এক-একটি সুইচ। ছবির 'চ' অংশে সেটা সংক্ষেপে দেখানো হয়েছে। এখানে আর বার্তা প্রেরণের বিশদ রাসায়নিক ঘটনাগুলো ততটা বিবেচ্য নয়। বার্তা আদৌ প্রবাহিত হচ্ছে কিনা, হলে ঠিক কী ধরনের বার্তা সন্ধির ওপারে গিয়ে পৌঁছোচ্ছে, এগুলোই বড়ো কথা। অতঃপর এইরকম অনেক স্নায়ুসন্ধি পর পর অতিক্রম করে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র যে পরিপথ (circuit) দিয়ে বৈদ্যুত বার্তা বয়ে চলে, 'ঙ'-চিহ্নিত অংশে তা দেখানো হয়েছে। এর ঠিক উপরের ধাপই হচ্ছে স্নায়ুকোষ, যার একটু বিবরণ আমরা এখনই দেব। এক হিসেবে এই স্নায়ুকোষকে বলতে পারি মস্তিষ্কের স্থাপত্যের প্রাথমিক একক। এক-একটি ইট গেঁথে গেঁথে যেমন বাড়ি তৈরি হয়, স্নায়ুকোষের পর স্নায়ুকোষ মিলে তেমনি মস্তিষ্কের নির্মাণ। তবে একটি ইটের মধ্যে আমরা আরও বিশদ কোনো অনুপুঙ্খ খুঁজি না, কারণ গোটা বাড়িটার গড়নে সেই অনুপুঙ্খের তেমন প্রাসঙ্গিকতা থাকে না। স্নায়ুকোষের মধ্যে কিন্তু সংগঠনের যথেষ্ট বৈচিত্র্য থাকে। নিজের ভিতরকার এবং আশপাশের নানা উপাদানকে কাজে লাগিয়ে প্রতিটি স্নায়ুকোষ ছোট্ট একটি ব্যস্ত সংসারের মতো তার জীবনযাত্রা চালিয়ে যায়। এদিক দিয়ে তার স্বভাব দেহের অন্যসব কোষেরই মতো। কিন্তু তার প্রধান কাজ যেহেতু বার্তার পরিবহন, তার গড়ন আর ক্রিয়া দুটোতেই সেই উদ্দেশ্যের প্রতিফলন দেখা যায়। স্নায়ুকোষের উপরের ধাপগুলিকে আমরা বিভিন্ন মাপের কোষ-সমবায় বলেই ভাবতে পারি।
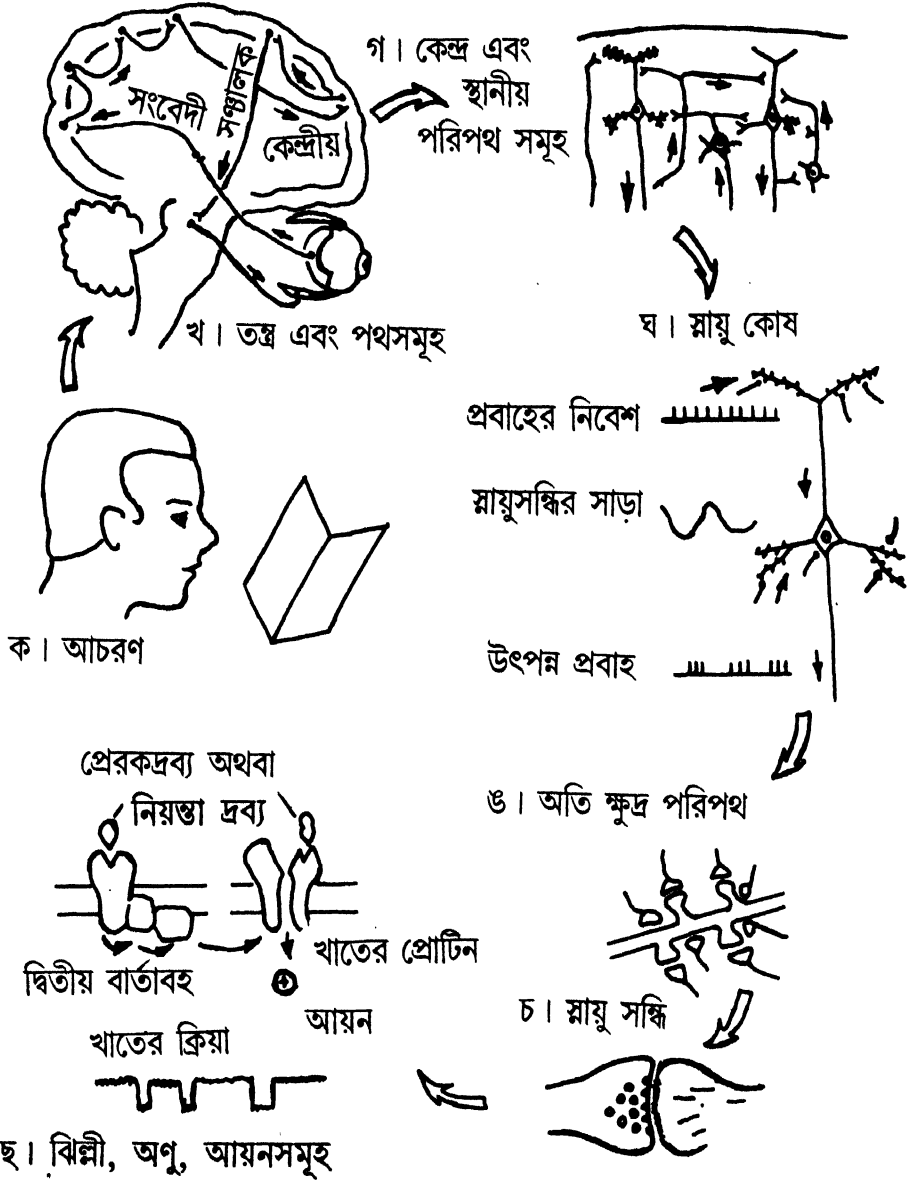
ছবি- ১

স্নায়ুমণ্ডলীর সংগঠনের স্তরভেদ (গর্ডন শেফার্ডের অনুসরণে) (১৯৯০)।

ছবি- ২
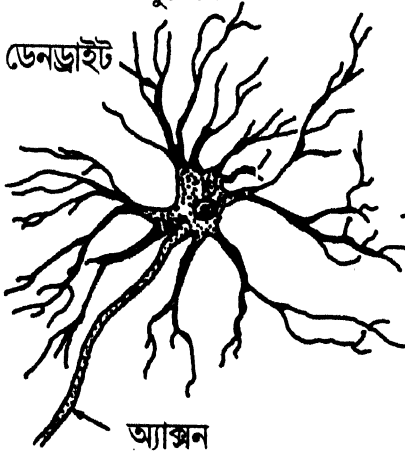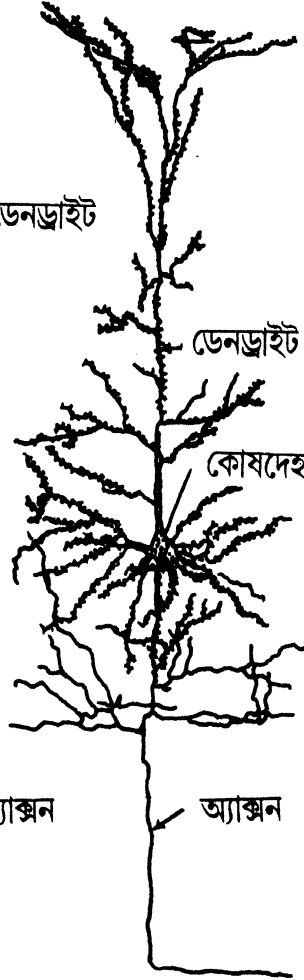
মস্তিষ্কের বিভিন্ন অঞ্চলে স্নায়ুকোষের আকারের বৈচিত্র্য

(কুফ্‌লার, নিকল্‌স এবং মার্টিন, ১৯৮৪)।

৩. স্নায়ুকোষ : স্নায়ুকোষকে এককথায় বলতে পারি স্নায়ুমণ্ডলীর যাবতীয় প্রক্রিয়ার প্রাথমিক একক। দেহের অন্যান্য কোষের ক্ষেত্রে যেমন হয়, স্নায়ুকোষেরও তেমনি গড়নের কোনো ধরাবাঁধা ছক নেই। স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন অংশে বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব অনুযায়ী স্নায়ুকোষসমূহের গড়নের রকমফের দেখা যায়। তবে কিছু কিছু সামান্য উপাঙ্গ সব স্নায়ুকোষেই থাকে। মোটামুটিভাবে এগুলো হল ডেনড্রাইট (dendrite), কোষদেহ (cell body) এবং অ্যাক্সন (axon)। ডেনড্রাইটসমূহের কাজ হচ্ছে বার্তা (signal) সংগ্রহ করা, তাই তারা গাছের শাখাপ্রশাখার মতো কোষদেহের আশেপাশে যতটা সম্ভব ছড়িয়ে থাকে। অপরপক্ষে অ্যাক্সনের কাজ হল ডেনড্রাইটগুলির সাহায্যে সংগৃহীত বার্তা বয়ে নিয়ে যাওয়া। স্নায়ুকোষটি যদি সংবেদী (sensory) স্নায়ুতন্ত্রের অংশ হয়, তবে বার্তাটা যাবে মস্তিষ্কে। আর স্নায়ুকোষটি যদি সঞ্চালক (motor) স্নায়ুতন্ত্রের অঙ্গীভূত হয়, তবে বার্তা যাবে কোনো-না-কোনো পেশিতে। যাই হোক, যেহেতু বার্তা বয়ে নিয়ে যাওয়াই অ্যাক্সনের কাজ, সেইহেতু তার গড়নটা হয় লম্বা নল বা কেব্‌ল-এর মতো। কখনো কখনো অ্যাক্সনের দৈর্ঘ্য চার মিটার পর্যন্ত হতে পারে। এই অ্যাক্সনেরই অন্য প্রান্তে থাকে স্নায়ুসন্ধি (synapse), যার কথা আগেই বলেছি। ডেনড্রাইট এবং অ্যাক্সন বাদ দিলে স্নায়ুকোষের যে অংশ বাকি থাকে, তাকেই বলব কোষদেহ (cell body)। এর মধ্যেই কোষকেন্দ্র (nucleus) থাকে। দু-নম্বর ছবিতে স্নায়ুমণ্ডলীর বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত চাররকমের স্নায়ুকোষের আকারের বৈচিত্র্য দেখানো হয়েছে। লক্ষ করবেন, নিজস্ব বিশিষ্ট কাজ অনুযায়ী সাধারণভাবে স্নায়ুকোষগুলির এবং বিশেষ করে ডেনড্রাইটগুলির গড়নের কতটা তারতম্য হতে পারে। চোখের রেটিনার তন্ত্রে স্নায়ুকোষগুলির সমাবেশ হয় খুবই ঘন। কারণ চোখের সাহায্যেই আমরা বহির্জগৎ সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি তথ্য সংগ্রহ করি। ফলে রেটিনার কোষগুলিতে ডেনড্রাইটের গুচ্ছটি যেমন ঘনসন্নিবদ্ধ, অ্যাক্সনের প্রান্তে স্নায়ুসন্ধিও তেমনি গুচ্ছের আকারে থাকে। অর্থাৎ বার্তা সংগ্রহ এবং প্রেরণ, দুটোই চলে পুরোদমে। আবার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সংবেদনশীলতা একটু বেশি না হলে চলে না, কারণ গন্ধ জিনিসটা কোনো-না-কোনো দ্রব্যের অণুসমূহের রাসায়নিক ধর্মের উপরে নির্ভর করে এবং নাসারন্ধ্রে সেইসব অণু খুব বেশি সংখ্যায় নাও এসে পৌঁছোতে পারে। তাই ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের স্নায়ুকোষে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ডেনড্রাইটের ঘন গুচ্ছ দেখতে অনেকটা ফুলের স্তবকের মতো হয়। এই ঘনত্বের দরুন সংবেদনস্থান থেকে যথাসম্ভব বেশি বার্তা সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে সহজ হয়।

৪. মস্তিষ্ক সম্বন্ধে কিছু দরকারি কথা : গড়নের এই যে সব খুঁটিনাটি, এগুলো ভালো করে জানলেই কি মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ বোঝা যাবে? সচরাচর কোনো যন্ত্রের ক্রিয়া বুঝতে হলে আমরা তো তাই করি— যন্ত্রটাকে হয় খুলে ফেলি নয়তো ভেঙে ফেলি। ফেলে বুঝতে চেষ্টা করি জিনিসটা কীভাবে কাজ করে। পরিভাষায় একে বলে উলটো এঞ্জিনিয়ারিং (reverse engineering)। হালফ্যাশনের ভাষায় বিনির্মাণও বলা যায়। অধিকাংশ যন্ত্রের ক্ষেত্রে কৌশলটা খাটে, কারণ বিশেষ একটি কোম্পানির তৈরি নতুন যন্ত্রের খুঁটিনাটি না জানা থাকলেও সেই ধরনের অন্য যন্ত্র সম্বন্ধে আমাদের কিছু-না-কিছু জ্ঞান থাকেই। যেমন, টয়োটা কোম্পানির 'করোনা' নামক বিশেষ মার্কামারা গাড়ির ইঞ্জিনের গড়ন আর ক্রিয়া আমরা না জানতে পারি, অন্ততপক্ষে সেই ধরনের অন্য গাড়ির ইঞ্জিনের গড়ন ও ক্রিয়া সচরাচর আমাদের জানা থাকে। কিন্তু যন্ত্রটি যদি একেবারেই আনকোরা নতুন হয়? অর্থাৎ তার গড়নের ভিতরকার মূলনীতিগুলোই যদি আমাদের জানা না থাকে? সে ক্ষেত্রে পদে পদে ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এমন-কি, অনেক দরকারি জিনিসও আমাদের নজর এড়িয়ে যেতে পারে। আবার বাইরে-থেকে-দেখা গড়নের কোনো কোনো বৈশিষ্ট্যকে অতিরিক্ত গুরুত্বও দিয়ে ফেলতে পারি। গড়নের ভিতরকার যেসব মূলনীতির কথা বলছি, সেগুলোর আবার বিশেষ যোগ থাকতে পারে যন্ত্রটির ক্রিয়ার সঙ্গে। সুতরাং সেগুলো জানা দরকার।

এই যে সমস্যার কথা বলছি, মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে খাটে। কারণ, যন্ত্র হিসেবে মস্তিষ্ক এখনও অনেকাংশেই আমাদের অজানা। ওর নকশাটাই আমাদের অপরিজ্ঞাত। এই প্রবন্ধের গোড়ার দিকে যে স্বজ্ঞা-বিবাদের কথা বলেছি, তার থেকে এ বিষয়ে সত্যিকারের কোনো সাহায্য পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ, মস্তিষ্কের ক্রিয়া সম্বন্ধে আমাদের কোনো স্বজ্ঞা নেই। আর যদি বা থাকে, তবে সত্যের সঙ্গে তার আদৌ কোনো সম্পর্ক আছে কিনা সন্দেহ। এ অবস্থায় স্বজ্ঞা জিনিসটা বিঘ্নও হয়ে উঠতে পারে।

এইসব কথা মনে রেখে মস্তিষ্কের গড়ন আর ক্রিয়া সম্বন্ধে কিছু খবর এখানে দিয়ে রাখছি। এর অনেকটাই সাম্প্রতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে পাওয়া।

ক. কাজের বিশেষীকরণ : স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে কাজের দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়ার ব্যাপারটা অনেকদিন থেকেই আমরা জানি। সামান্য জোঁক থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত যাবতীয় প্রাণীর ক্ষেত্রেই এটা দেখা যায়। তবে আমরা যখন বলি যে মস্তিষ্কের অমুক অংশ বিশেষভাবে অমুক কাজটা করে, তখন সেই অংশবিশেষের মোটাদাগের আচরণের কথাই বলি। অর্থাৎ বলি যে সেই অংশের গড়পড়তা কোষ বিশেষ একধরনের উদ্দীপকের (stimulus) প্রতিই লক্ষণীয়ভাবে সাড়া দেয়। অর্থাৎ এটা হচ্ছে কোষগুলির পরিসংখ্যানগত (statistical) আচরণের ব্যাপার। যেমন ধরুন, মস্তিষ্কের V1 অঞ্চলটিকে দৃষ্টিশক্তির সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ওই অঞ্চলের অধিকাংশ কোষেরই কারবার দৃষ্টিঘটিত বার্তা নিয়ে। কিন্তু ওরই মধ্যে কিছু অন্যধরনের কোষ থাকে যাদের কাজ দৃষ্টিশক্তি নিয়ে নয়, চোখের সঞ্চালনঘটিত বার্তা নিয়ে।

খ. স্নায়ুকোষ ও স্নায়ুসন্ধির সংখ্যা : অধিকাংশ উন্নত প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্রে স্নায়ুকোষ আর স্নায়ুসন্ধির সংখ্যা খুব বেশি। এত বেশি যে, পাটিগণিতের সাধারণ অঙ্কপাতন পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে গেলে অনেকটা জায়গা নেবে। তাই সংখ্যাগুলোকে আমরা 'দশ' সংখ্যাটির ঘাতের (power) আকারে লিখব। এইভাবে লিখলে মানুষের স্নায়ুমণ্ডলীতে মোট স্নায়ুকোষের সংখ্যা দাঁড়ায় মোটামুটিভাবে $১০^{১২}$, অর্থাৎ 'এক'-এর পিঠে বারোটা শূন্য বসালে যা হয় তাই। স্নায়ুসন্ধির সংখ্যা হবে তার চেয়ে বেশি, কারণ একটি স্নায়ুকোষ একাধিক অন্য স্নায়ুকোষে বার্তা পাঠাতে পারে। মানুষের স্নায়ুমণ্ডলীতে স্নায়ুসন্ধির গড়পড়তা সংখ্যা হল $১০^{১৫}$। সে তুলনায় ইঁদুর নামক ছোটো প্রাণীটি কিন্তু মোটেই নগণ্য নয়। তার মস্তিষ্কে স্নায়ুকোষের সংখ্যা $১০^{১০}$ এবং স্নায়ুসন্ধির সংখ্যা $১০^{১৩}$। আমাদের মস্তিষ্কের যে-অংশে অপেক্ষাকৃত উঁচুস্তরের কাজকর্ম হয়, সেই কর্টেক্স-এর (cortex) এক ঘন মিলিমিটার পরিমাণ কলাতে (tissue) থাকে গড়পড়তা $১০^{৫}$-সংখ্যক স্নায়ুকোষ এবং $১০^{৯}$টি স্নায়ুসন্ধি। অর্থাৎ গোটা স্নায়ুমণ্ডলীর তুলনায় মস্তিষ্কের এই অংশে স্নায়ুসন্ধির ঘনত্ব মোটামুটিভাবে দশগুণ বেশি। সুতরাং কর্টেক্স-এর এক-একটি স্নায়ুকোষ অপেক্ষাকৃত বেশি-সংখ্যক অন্য স্নায়ুকোষের সঙ্গে সংযোগ রচনা করতে পারে। যন্ত্র হিসেবে মস্তিষ্কের আশ্চর্য ক্ষমতার একটা বড়ো কারণ এই সংযোগশীলতা (connectivity)। সুতরাং মস্তিষ্কে স্নায়ুসন্ধির ঘনত্বের একটা গুরুত্ব আছে। সেই গড়পড়তা ঘনত্ব এইভাবে বোঝানো যেতে পারে। এক মিলিমিটারের হাজার ভাগের একভাগকে বলা হয় মাইক্রন (micron)। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে এবং উচ্চতায় এক মাইক্রন পরিমাণ ছোট্ট একটি কিউব যদি নিই, তবে তার আয়তন হবে এক ঘনমাইক্রন। মস্তিষ্কের এই পরিমাণ আয়তনে মোটামুটিভাবে একটি করে স্নায়ুসন্ধি পাওয়া যাবে। আর; একটিমাত্র স্নায়ুকোষের কথা যদি ভাবি, তবে তাতে স্নায়ুসন্ধির সংখ্যা হবে কয়েক হাজার বা তারও বেশি। স্নায়ুসন্ধির ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি হয় কর্টেক্স-এর দৃষ্টিশক্তিঘটিত অংশে (visual cortex)।

গ. সংযোগশীলতা : সংযোগশীলতাই যদি কর্মক্ষমতার প্রধান সূত্র হয়, তবে কর্টেক্স-এর স্নায়ুকোষগুলি কি বাস্তবিকই পরস্পরের সঙ্গে খুব বেশি মাত্রায় সংযোগ রচনা করে থাকে ? দেখা গেছে, কোষের ঘনত্ব কর্টেক্স-এ যতই বেশি হোক, মোটামুটিভাবে এক-একটি কোষ তার যাবতীয় প্রতিবেশী কোষের মধ্যে শতকরা মাত্র তিনভাগের সঙ্গেই কার্যত সংযোগ রচনা করে। টেলিফোন লাইনের কথা এইসূত্রে ভেবে দেখুন। কলকাতা শহরের যে-পাড়ায় টেলিফোনের সংখ্যা খুব বেশি, সে-পাড়ার টেলিফোন গ্রাহকেরা কি বেশিরভাগ সময় প্রতিবেশীদের সঙ্গেই কথাবার্তা বলেন ? মস্তিষ্কের মধ্যে দেখা যায়, নির্দিষ্ট কোনো কোষকলার ভিতরে বার্তার চলাচল যতটা হয়, বিভিন্ন শ্রেণীর কোষকলার মধ্যে আদানপ্রদান হয় তার চেয়ে অনেক বেশি। আর, মস্তিষ্কের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে যেমন বার্তার সঞ্চার হয়, তেমনি আবার উদ্দিষ্ট অঞ্চল থেকে উজানেও বার্তা ফিরে আসে প্রেরক অঞ্চলে। অনেকটা ধ্বনির প্রতিফলনের ফলে তৈরি প্রতিধ্বনির মতো। বার্তা আর প্রতিবার্তার এই পারস্পরিক ক্রিয়া মস্তিষ্কের স্বভাবেরই অঙ্গ।

ঘ. অ্যানালগ নিবেশ (analog inputs) / ডিজিটাল উৎপাদন (digital outputs) : যে-কোনো স্নায়ুকোষে

বাইরে থেকে যে বার্তা এসে পৌঁছোয়, তাকেই আমরা বলি নিবেশ (input)। আর স্নায়ুকোষ থেকে পরিণামে যদি কোনো বার্তা নির্গত হয়, তবে সেটাকে বলব তার উৎপাদন (output)। এই নিবেশ আর উৎপাদন দুটোই বিদ্যুৎ-ঘটিত ব্যাপার। একটি স্নায়ুকোষ থেকে প্রতিবেশী স্নায়ুকোষে যখন বার্তার সঞ্চার হয়, তখন দ্বিতীয় কোষটিতে খানিকটা বৈদ্যুত শক্তির সঞ্চার হয়। সেই শক্তিকে আমরা মাপি দ্বিতীয় কোষে সঞ্চারিত বিভব (potential) দিয়ে। টর্চলাইটের এক-একটি ব্যাটারিতে সচরাচর বিভবের পরিমাণ হয় দেড় ভোল্ট। সে-তুলনায় স্নায়ুকোষে সঞ্চারিত বিভবের পরিমাণ হয় খুবই কম, মাইক্রোভোল্ট পর্যায়ের। অর্থাৎ একভোল্টের দশ লক্ষ ভাগের একভাগ বা ওইগোছের। এখন, প্রশ্ন হচ্ছে, এককটা ছোটো হলেও সেই এককের সাহায্যে নিবেশ আর উৎপাদন যদি মাপি, তবে তাদের পরিমাণের মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্য কি পাব ? দেখা যায়, নিবেশের পরিমাণ যে পূর্ণসংখ্যা হবে তার কোনো মানে নেই, তার মধ্যে ভগ্নাংশও থাকতে পারে। অর্থাৎ প্রতিবেশী কোষগুলির ভিতর দিয়ে কোনো স্নায়ুকোষে আদৌ যদি বার্তা এসে পৌঁছোয় তবে তার পরিমাণ যেমন-তেমন হতে পারে। কিন্তু সেই যেমন-তেমন পরিমাণ নিবেশের দরুন গ্রহীতা কোষে কোনো বিভব আদৌ উৎপন্ন হবে কিনা, সেটা অন্য কথা। বস্তুত নিবেশের পরিমাণ একটা বিশেষ মাত্রা অতিক্রম করলে তবেই গ্রহীতা কোষে নতুন করে বার্তার উৎপাদন ঘটবে, নতুবা নয়। সেই বিশেষ মাত্রাকে বলা যায় বিভবের চৌকাঠ (threshold)। সুতরাং উৎপাদনের ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে 'হ্যাঁ' কিংবা 'না', এইগোছের। গ্রহীতা কোষে আশপাশের সমস্ত কোষ থেকে এককালীন যতটা বার্তা এসে পৌঁছোচ্ছে, তার মোট পরিমাণ যদি চৌকাঠের মাত্রাকে ছাড়িয়ে যায়, তবেই গ্রহীতা কোষে বার্তার উৎপাদন ঘটবে, নতুবা নয়। অর্থাৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বার্তার নিতিনিখুঁত পরিমাণটা জরুরি ব্যাপার নয়, আদৌ বার্তা তৈরি হচ্ছে কি না, সেটাই আসল কথা। তৈরি হলে বলব 'টক্কা' অর্থাৎ ১, আর তৈরি না হলে বলব 'ফক্কা', অর্থাৎ ০ (শূন্য)। এবারে কাছাকাছি বেশ-কটি গ্রহীতা কোষের কথা যদি ভাবি, তবে তাদের সাড়াটা গোনা যাবে ০ অথবা ১, ২, ৩ ইত্যাদি পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে। একেই আমরা বলি ডিজিটাল উৎপাদন। নিবেশের পরিমাণ কিন্তু উপযুক্ত যন্ত্রের সাহায্যে মাপা যাবে এবং সেই পরিমাণ যে পূর্ণ সংখ্যাই হবে তা নয়, ভগ্নাংশও হতে পারে। এটাকেই আমরা বলছি অ্যানালগ নিবেশ।

ঙ. সময়ের ভূমিকা ও পরিমাপ : স্নায়ুমণ্ডলীর বিভিন্ন পরিপথ (circuit) দিয়ে নানা বার্তার যে সমারোহ প্রবাহিত হয়, তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া কেমন হবে, সেটা অনেকাংশে নির্ভর করে তাদের কালগত সম্পর্কের উপরে। প্রবাহের বিভিন্ন পথের যেটি মিলনবিন্দু (node), এক-একটি বার্তা সেখানে কখন এসে পৌঁছোচ্ছে, সেই এসে পৌঁছোনোর মধ্যে সময়ের তফাত কতটা, এরই উপর নির্ভর করবে তাদের সামুদায়িক প্রভাব। আবার বাইরের জগতের ঘটনাবলীর সময়গত মাত্রার সঙ্গে, অর্থাৎ ছন্দের সঙ্গে, স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়াকলাপের ছন্দের মিল বজায় থাকা চাই। সঞ্চালক স্নায়ুতন্ত্রকে তাল রেখে চলতে হয় শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের সময়সীমার সঙ্গে। আর সংবেদী স্নায়ুতন্ত্রকে তাল রাখতে হয় বহির্জগতের জ্ঞাতব্য ঘটনার সঙ্গে। যেখানে মস্তিষ্কের একাধিক তন্ত্রের যৌথ গণনার ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত করতে হবে, সেখানে ওই গণনার প্রক্রিয়াগুলির মধ্যেও সময়ের মিল থাকা চাই। এই পুরো ব্যাপারটার জন্যে চাই জটিল যন্ত্র হিসেবে মস্তিষ্কের সঠিক স্থাপত্য। একই কালে সংগৃহীত (অর্থাৎ অল্পসময়ের মধ্যে সংগৃহীত) যাবতীয় নিবেশের ফলে গ্রহীতা কোষে যদি বিদ্যুতের বিভব উৎপন্ন হয়, টেলিভিশনের পর্দায় সেই বিভবকে দেখাবে তীক্ষ্ণ একটি চূড়ার মতো। একে বলা হয় স্পাইক (spike)। এই স্পাইকের জীবনকাল ১ মিলিসেকেন্ড-এর মতো, অর্থাৎ এক সেকেন্ডের হাজার ভাগের একভাগ। এর থেকে স্নায়ুতন্ত্রের ঘটনাবলীর কালগত পরিমাপের একটা ধারণা পাওয়া যাবে। কোষ থেকে কোষে বার্তার সঞ্চারের সময় স্নায়ুসন্ধিতে যে বিভব তৈরি হয় তাও কমপক্ষে এক মিলিসেকেন্ড এবং কখনো কখনো অনেক মিলিসেকেন্ড পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

চ. কোষ থেকে কোষে সঞ্চার : এককভাবে একটি স্নায়ুসন্ধিতে সমাগত নিবেশের ফলে সন্ধির ওপারের কোষটিতে যেটুকু প্রভাব তৈরি হতে পারে, তার পরিমাণ খুবই কম— চৌকাঠ বিভবের (threshold potential) মোটে ১ থেকে ৫ শতাংশ। কোথাও কোথাও অবশ্য এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন, গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্সের (cerebral cortex) অন্তর্গত ঝাড়লণ্ঠনের মতো কোষ (chandelier cell) অথবা ঝুড়ির মতো কোষে (basket cell)।

ছ. উদ্দীপনার ছক : সমাগত নিবেশের প্রভাব যদি চৌকাঠ বিভবের সমান বা তার বেশি হয়, গ্রহীতা কোষটি উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ তার মধ্যে লক্ষণীয় রকমের উঁচু এবং তীক্ষ্ণ বিভবের চূড়া বা স্পাইক তৈরি হয়। এখন ঘটনা এই যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এইসব চূড়ার উদ্ভবের হার এবং তাদের পারস্পরিক সংস্থান এক-এক ধরনের স্নায়ুকোষে এক-এক রকমের হয়। উদ্ভবের হার এবং কালানুক্রমিক বণ্টনের সামগ্রিক চেহারাটাকেই আমরা বলি কোষটির উদ্দীপনার ছক (firing pattern)। সামান্য একটু ব্যবস্থা করে নিলেই উদ্দীপনার এই ছকটা টেলিভিশনের পর্দায় দেখানো যেতে পারে। স্নায়ুবিজ্ঞানের অনেক তথ্যই এর থেকে পাওয়া যায়। মস্তিষ্কের থ্যালেমাস (thalamus) অংশের কিছু কিছু কোষে উদ্দীপনার ছকের যথেষ্ট বৈচিত্র্য দেখা যায়। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় একই কোষে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ছক দেখা যায়। কখন ছকটা কেমন হবে সেটা নির্ভর করে কোষটির মধ্যে তড়িতের বণ্টনের ইতিহাসের উপরে। আবার প্রায় সব স্নায়ুকোষেই সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে, নিবেশ ছাড়াই, স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনা দেখা যায়। উদ্দীপনার সর্বোচ্চ মান সচরাচর একশো কি দেড়শো মিলিভোল্টের মতো হয়। অর্থাৎ এইটেই হয় স্পাইকের সর্বাধিক উচ্চতা।

জ. গ্রাহক ক্ষেত্র তথা কেন্দ্র ও পরিপার্শ্বের সংগঠন : মস্তিষ্কের সংবেদী তন্ত্রের যে ক্ষুদ্রতম অঞ্চল উপযুক্ত উদ্দীপকের প্রভাবে একটা কোনো সাড়া দিতে পারে, তাকেই বলা হয় গ্রাহক ক্ষেত্র। শরীরের বহিরঙ্গের বিভিন্ন এলাকার সঙ্গে জড়িত গ্রাহক ক্ষেত্রের আয়তন বিভিন্ন রকমের হতে পারে। হাতের চেটোর গ্রাহক ক্ষেত্র আঙুলের ডগার গ্রাহক ক্ষেত্রের চেয়ে বড়ো হয়। আবার বাহুর গ্রাহক ক্ষেত্র হাতের চেটোর গ্রাহক ক্ষেত্রের তুলনায় অনেকটাই বড়ো হয়। আগেই বলেছি, বহির্জগৎ সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি তথ্য আমরা সংগ্রহ করি দর্শনেন্দ্রিয় দিয়ে। কর্টেক্সের দৃষ্টিশক্তিঘটিত অংশের (visual cortex) গ্রাহক ক্ষেত্রগুলি ওই দর্শনেন্দ্রিয়েরই সঙ্গে জড়িত প্রাথমিক গ্রাহক-ক্ষেত্রগুলির তুলনায় অনেকটা বড়ো হয়ে থাকে। চোখের রেটিনা থেকে মস্তিষ্কের দিকে বার্তা বয়ে নিয়ে যায় যে রেটিনা-গ্যাংগ্লিয়ন কোষসমূহ, তাদের মধ্যে কেন্দ্র আর পরিপার্শ্বের একটা সংগঠন (centre-surround organization) থাকে। সেই সংগঠন দুরকমের হতে পারে :

১. গ্যাংগ্লিয়ন কোষের গ্রাহক ক্ষেত্রের কেন্দ্রে উদ্দীপনা এসে পড়লে কোষটি উত্তেজিত হবে, কিন্তু কেন্দ্রের বাইরেকার এলাকায় উদ্দীপনা এলে কোষটি উত্তেজিত হবে না। এইধরনের সংগঠনকে বলা হয় 'সদর্থক কেন্দ্র/ নঞর্থক পরিপার্শ্ব' (on-center / off-surround) (তিন নম্বর ছবিতে ব্যাপারটা বিশদভাবে দেখানো হয়েছে)।

২. এর ঠিক বিপরীত সংগঠন, যাতে কেন্দ্রের উদ্দীপনা সাড়া জাগায় না কিন্তু পরিপার্শ্বের উদ্দীপনা সাড়া জাগায়, তাকে বলা হয় 'নঞর্থক কেন্দ্র / সদর্থক পরিপার্শ্ব' (off-centre / on-surround)।

এখন, যে-কোনো দৃশ্যেই কিছু আলোকিত বিন্দু থাকে, আবার কিছু বিন্দু থাকে যেগুলো অপেক্ষাকৃত অন্ধকার। দেখা গেছে যে রেটিনার সদর্থক কেন্দ্রযুক্ত কোষগুলি বিশেষভাবে সাড়া দেয় অন্ধকার বিন্দুগুলোর প্রতি, আর নঞর্থক-কেন্দ্রযুক্ত কোষগুলি বেশি করে সাড়া দেয় আলোকিত বিন্দুগুলির প্রতি। পাঠক লক্ষ করবেন, এর ফলে দর্শনেন্দ্রিয় থেকে মস্তিষ্কে যে বার্তা যাচ্ছে তা নিছক রেটিনার উপরে এসে পড়া আলোর তীব্রতার উপরে নির্ভর করছে না। গ্রাহক ক্ষেত্রের কেন্দ্রে যতটা আলো এসে পড়ছে, আর পরিপার্শ্বে যতটা আলো এসে পড়ছে, কার্যত এই দুটোর মধ্যে গ্যাংগ্লিয়ন কোষগুলি একটা তুলনা করে নিচ্ছে। আর সেই তুলনার খবরটাই মস্তিষ্কে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ফলে মস্তিষ্ক আলোর তীব্রতার কোনো চূড়ান্ত পরিমাপ করছে না, গ্রাহক ক্ষেত্রের উপরে আলো-অন্ধকারের তারতম্যটাই বিচার করছে। এতে তার সুবেদিতা অবশ্যই বেশি হতে পারছে।

দর্শনেন্দ্রিয়ের এই ক্রিয়ার মধ্যে গণিত্র হিসেবে মস্তিষ্কের কর্মপদ্ধতির কিছু বৈশিষ্ট্যও নজরে পড়ে। প্রবন্ধের গোড়ার দিকে আমরা স্বজ্ঞার কথা তুলেছিলাম। সেই স্বজ্ঞা এ-বিষয়ে কী বলে ? কতকটা আলোকিত এবং কতকটা অন্ধকার একটি দ্রষ্টব্য বস্তুকে দেখতে হলে চোখ আর মস্তিষ্ক কী ধরনের কৌশল অবলম্বন করবে ? নির্ভেজাল সহজ বুদ্ধি তো বলে যে দ্রষ্টব্য বস্তুর বিভিন্ন অংশের উপরে এসে-পড়া আলোর পরিমাণ মেপে মেপে গোটা বস্তুর
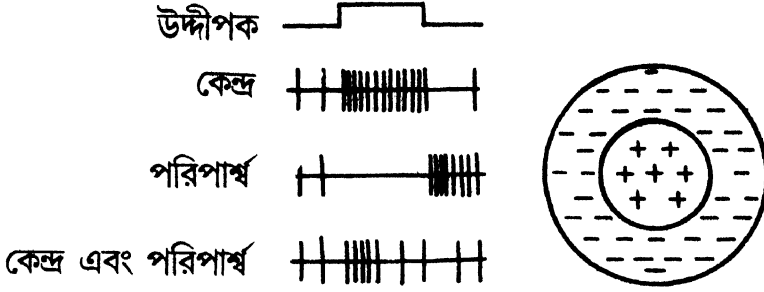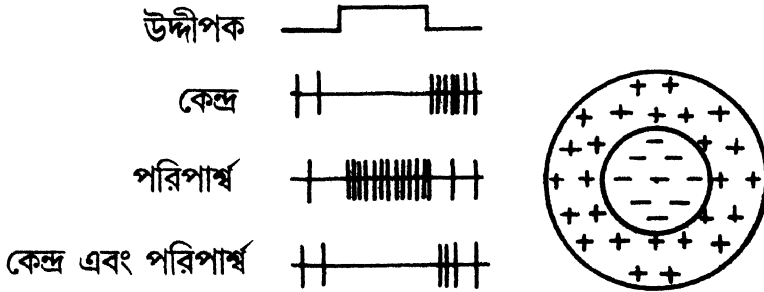
ছবি- ৩

রেটিনার অন্তর্গত গ্রাহক ক্ষেত্রে দুধরনের কেন্দ্র ও পরিপার্শ্বের সংগঠন। গ্রাহক ক্ষেত্রের কেন্দ্রের উপর আলো ফেললে সদর্থক কেন্দ্র সংবলিত কোষ প্রবলভাবে সাড়া দেয় (ছবির উপরের অংশ), কিন্তু নঞর্থক কেন্দ্র সংবলিত কোষ অসাড় হয়ে থাকে (ছবির নীচের অংশ)। কেন্দ্রের পরিপার্শ্বের উপরে আলো ফেললে ঠিক এর উলটো প্রতিক্রিয়া হয়। আর, কেন্দ্র ও পরিপার্শ্ব দুয়ের উপরেই ম্লান আলো ফেললে দুরকম কোষই দুর্বলভাবে সাড়া দেয়। (কোরেন ওয়ার্ড, ১৯৮৯)।

একটা মানসিক মানচিত্র তৈরি করাটাই হবে চোখ আর মস্তিষ্কের কাজ। অর্থাৎ আলোর তীব্রতা মাপাটাই হবে তাদের কৌশল। পরিভাষায় একেই বলা হয় অ্যানালগ পদ্ধতি (analog procedure)। কিন্তু এ ক্ষেত্রে রেটিনার স্নায়ুতন্ত্র এই পদ্ধতি অনুসরণ করছে না। কার্যত আলোর যথার্থ তীব্রতা না মেপে সে গ্রাহক ক্ষেত্রের দুটো অংশের মধ্যে আলোর তীব্রতার তারতম্য বিচার করছে। ক্ষেত্রের কেন্দ্রে যতটা আলো এসে পড়ছে তার সঙ্গে পরিপার্শ্বে এসে-পড়া আলোর তীব্রতার তুলনা করছে। এর জন্যে কেন্দ্র বা পরিপার্শ্ব কোথাও-ই আলোর যথার্থ তীব্রতা তাকে মাপতে হচ্ছে না। মাপতে গেলে ভুল কিছু-না-কিছু হতই। অপরপক্ষে তুলনার কাজে ভুলের সম্ভাবনা অনেকটা কম। উপরন্তু এই তুলনাটাও করা হচ্ছে প্রতিটি গ্রাহক ক্ষেত্রের কেন্দ্র এবং পরিপার্শ্ব এই দুটি অংশের মধ্যে কোন্‌টি বেশি আলোকিত সেটাই গুণে গুণে। প্রতিটি গ্রাহক ক্ষেত্র সম্বন্ধেই একই প্রশ্ন করা হচ্ছে : 'এই গ্রাহক ক্ষেত্রের কেন্দ্রটা বেশি আলোকিত, না কম ?' এ প্রশ্নের দুটিমাত্র উত্তর সম্ভব : ক. বেশি অথবা খ. কম। এইরকম প্রশ্নের অন্তর্নিহিত যুক্তিকে বলা হয় দ্বিচর যুক্তি (binary logic)। সুতরাং স্নায়ুতন্ত্রের কাজটা এখানে নির্ভর করছে দ্বিচর যুক্তির উপরে। এর উত্তরটাকে সংখ্যা দিয়েও প্রকাশ করা যায়। যথা ক = ১ এবং খ = ০। এবারে গ্যাংগ্লিয়নের কোষকলা থেকে ১ আর ০ এই দুরকমের উত্তরের বণ্টনটা জরিপ করে নেওয়াই হবে মস্তিষ্কের কাজ। এটা মূলত গণনার ব্যাপার। গণনার এই পদ্ধতিকে বলা হয় ডিজিটাল পদ্ধতি (digital procedure)। এই পরিচ্ছেদের ঘ অংশে ইতিপূর্বেই আমরা বার্তার উৎপাদন প্রসঙ্গে এর কথা বলেছি। যাই হোক, তথাকথিত সহজবুদ্ধিতে যেটাকে পরিমাপঘটিত সমস্যা বলে মনে হবে, এখানে মস্তিষ্ক সেটার সমাধান করছে গণনার মাধ্যমে। প্রকৃতি এখানে বস্তুতই স্বজ্ঞা-বিবাদী।

এইখানে আর-একটা কথা বলে রাখি। গৃহস্থ বাড়িতে বিদ্যুতের যে লাইন টানা হয় এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ যাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকেন, সেই লাইনে বিদ্যুতের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয় সুইচ-এর সাহায্যে। আলো জ্বালাতে হলে সুইচ 'অন' করতে হয়। আর নেভাতে হলে সুইচ 'অফ' করতে হয়। সুতরাং প্রতিটি সুইচ-এর দুটি মাত্র অবস্থা সম্ভব : হয় 'অন' আর নয়তো 'অফ'। এটাও দ্বিচর যুক্তির ব্যাপার। 'অন' বোঝাতে যদি '১' সংখ্যাটা ব্যবহার করি, আর 'অফ' বোঝাতে '০' (শূন্য), তবে বিদ্যুতের এই গৃহস্থ পরিপথেও দ্বিচর যুক্তি চলবে। বস্তুত বিদ্যুতের পরিপথ যেখানে ব্যবহার করব, সেখানেই এটা চলবে। বলা বাহুল্য, গণিত্রেও এটা চলে এবং যে-কোনো সংখ্যা বা শব্দকে সেখানে এরই সাহয্যে প্রকাশ করা যায়। ওই ধরনের গণিত্রকে বলে ডিজিটাল গণিত্র (digital computer)। সে প্রসঙ্গে পরে আসব। আপাতত মস্তিষ্কের কথা আর-একটু বলে নিই।

এখানে কেন্দ্র আর পরিপার্শ্বের যে সংগঠনের কথা বলা হল, থ্যালেমাসে এবং কর্টেক্সের অন্য অংশেও তার নমুনা পাওয়া যায়।

ঝ. গতিশীলতা (dynamic behaviour) : স্নায়ুকোষের যে গ্রাহক ক্ষেত্র সম্বন্ধে বলা হল, তাকে বলতে পারি ধ্রুপদী গ্রাহক ক্ষেত্র। সম্প্রতি তার বাইরেও এমন ঘটনার পরিচয় পাওয়া গেছে যা বেছে বেছে স্নায়ুকোষের বিশেষ বিশেষ ধরনের সাড়ার রূপান্তর ঘটায়। এই রূপান্তর নির্ভর করে গ্রাহক ক্ষেত্রের পরিপার্শ্বে এসে-পড়া উদ্দীপনার ধরনের উপর। বিড়ালের দৃষ্টিঘটিত কর্টেক্স-এ কিছু কোষ থাকে যেগুলো দ্রষ্টব্য বস্তুর কৌণিক অবস্থানের (orientation) প্রতি সংবেদনশীল। যেমন ধরুন, জার্মান স্নায়ুবিজ্ঞানী ব্রডমান-এর বর্গীকরণ[১০] অনুসারে যাকে বলা হয় কর্টেক্স-এর ১৭ নম্বর এলাকা, সেখানকার কিছু গ্রাহক ক্ষেত্র উল্লম্ব দাঁড়ির (vertical bar) উপস্থিতি ধরতে পারে। সম্প্রতি ওই ১৭ নম্বর এলাকাতেই মূল কোষগুলির সঙ্গে সমান্তরাল এবং সমাক্ষ (coaxial) কিছু দূরবর্তী কোষকে বাইরে থেকে উদ্দীপ্ত করে দেখা গেছে, এর ফলে মূল কোষগুলির সাড়ার পরিমাণ বেড়ে যায়। অর্থাৎ গ্রাহক ক্ষেত্রের সাড়ার ব্যাপারটা স্থাণু নয়, তার মধ্যে গতিশীলতা আনা যায়। কর্টেক্স-এর দেহসংবেদী অংশে (somatosensory cortex) এমন কিছু এলাকা আছে যা আঙুলের ডগার উদ্দীপনায় সাড়া দেয়। দেখা গেছে, আঙুলের ডগাগুলোকে বার বার উদ্দীপ্ত করা হলে কর্টেক্স-এর ওই এলাকাটি সম্প্রসারিত হয়— তার আয়তন বেড়ে যায়। গ্রাহক ক্ষেত্রগুলির এই গতিশীলতা মস্তিষ্কের একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

ঞ. সমান্তরাল স্থাপত্য (parallel architecture) : যে-কোনো ক্রিয়ার জন্যেই মস্তিষ্কে একই সঙ্গে বার্তার অনেকগুলি সমান্তরাল প্রবাহ দেখা যায়। অর্থাৎ গ্রাহক ইন্দ্রিয় থেকে মস্তিষ্ক পর্যন্ত নিবেশ পাশাপাশি অনেকগুলি সমান্তরাল স্রোতের মতো বইতে থাকে। যেমন ধরুন, বানরের রেটিনা থেকে দৃষ্টিঘটিত কর্টেক্স-এ যে বার্তা যায়, তার যাত্রা শুরু হয় দুরকমের স্বতন্ত্র গ্যাংগ্লিয়ন কোষ থেকে। বার্তার এই দুটি প্রবাহ শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছোয় দৃষ্টিঘটিত কর্টেক্স-এর V1 এলাকার চতুর্থ স্তরের অন্তর্গত দুটি স্বতন্ত্র উপস্তরে। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, পথিমধ্যে প্রবাহদুটির মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হয় না। পরস্পরের থেকে তারা মোটেই পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন থাকে না। বরং, খুব সম্ভব, পদে পদেই তাদের মধ্যে ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া ঘটে। এই সমান্তরাল স্থাপত্যের ব্যাপারটা খুবই ব্যাপক। বস্তুত মস্তিষ্কের একটিমাত্র সুদূরপ্রসারী বৈশিষ্ট্যের কথা যদি বলতে হয়, তবে সমান্তরাল স্থাপত্যের কথাই বলতে হবে। আবার সেই সমান্তরাল চরিত্রও যে নির্ভেজাল নয়, পাশাপাশি দুটি সমান্তরাল বার্তাস্রোতের মধ্যেও যে লেনদেন চলতে পারে, এর থেকে বোঝা যায় যে নানা বিচিত্র পথে বার্তাকে চালিত করবার ক্ষমতাই মস্তিষ্কের আশ্চর্য স্থিতিস্থাপকতা এবং নৈপুণ্যের ভিতরকার কথা।

গণিত্র কাকে বলব ? কয়েকটি মূলনীতি এবং পরিভাষা

এতক্ষণ 'গণিত্র' (computer) কথাটা আমরা অনেকটা ঢিলেঢালাভাবে ব্যবহার করেছি। এবারে ব্যাপারটাকে একটু গুছিয়ে নেওয়া দরকার।

খুব ছেলেমানুষি একটা প্রশ্ন দিয়ে শুরু করা যাক : গণিত্র কাকে বলব ? অর্থাৎ কীসের গুণে একটা যন্ত্র গণিত্র হয়ে ওঠে, আবার তার চেয়ে জটিল অন্য একটা যন্ত্র গণিত্র-পদবাচ্য নাও হতে পারে ? যেমন ধরুন, ইঞ্জিনিয়াররা স্লাইড রুল (slide rule) বলে একটা জিনিস ব্যবহার করেন (আজকাল পকেট ক্যালকুলেটরের কল্যাণে স্লাইড রুলের ব্যবহার কমে গেছে), যা দেখতে অনেকটা সাধারণ চ্যাপটা রুলার বা স্কেলের মতো। কেবল স্কেলটির গায়ে ছোট্টো আর-একটা স্বচ্ছ স্কেলের মতো জিনিস লাগানো থাকে, সেটাকে মূল স্কেলের দৈর্ঘ্য বরাবর সরানো যায়। এই সরল যন্ত্রটির সাহায্যে যোগবিয়োগ গুণভাগ সবই করা যায়। বিশেষজ্ঞদের জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা একবাক্যে বলবেন যে ওটাও একটা গণিত্র। অথচ সিলিং-পাখাকে কেউ গণিত্র বলবেন না। কিন্তু কেন ? যা দিয়ে অঙ্ক কষা যায় শুধু তাকেই কি আমরা গণিত্র বলব ? তা যদি হয়, তবে তো মস্তিষ্ককে সরাসরি গণিত্রের পর্যায়ে ফেলা যাবে না। কারণ এমন বহু কাজ আমরা মস্তিষ্কের সাহায্যে করি যার সঙ্গে অঙ্ক কষার কোনো সম্বন্ধ নেই। এমন-কি, কৃত্রিম গণিত্রের সাহায্যেও অজস্র রকমের কাজ করা যায় যাকে কোনোমতেই 'অঙ্ক কষা' বলা যায় না। সুতরাং আর-একটু তলিয়ে ভাবতে হবে।

এই প্রবন্ধের গোড়ার দিকে আমরা 'অন্বয়' কথাটা ব্যবহার করেছি। এখানে একটু অন্য প্রসঙ্গে কথাটা আবার ব্যবহার করব। ধরুন, 'স' অক্ষরটি দিয়ে একটি সংস্থাকে বোঝানো হচ্ছে। সংস্থাটি নানারকমের হতে পারে। অনেকগুলি সংখ্যার সমাবেশ হতে পারে, অনেকগুলি শব্দের সমন্বয় হতে পারে, ইত্যাদি। অন্য দিকে মনে করুন, 'গ' একটি বস্তুগত সংস্থা (physical system) যেটা নানারকম অবস্থায় থাকতে পারে। যেমন ধরুন, 'গ' যদি একটি বৈদ্যুত পরিপথ হয়, তবে সেই পরিপথের মধ্যে চলমান বিদ্যুতের প্রবাহ (current) দিয়েই 'গ'-এর অবস্থা নির্দেশ করা যেতে পারে। আবার 'গ' যদি মস্তিষ্কের একটি স্নায়ুকোষ হয়, তবে তার অন্তর্গত রাসায়নিক উপাদানগুলির গড় ঘনত্বই হতে পারে তার অবস্থার সূচক। আর 'গ' বলতে যদি একটা স্লাইড রুলকে বোঝায়, তবে মূল স্কেলের উপরে ছোটো চলতি স্কেলটির অবস্থানই 'গ'-এর অবস্থা নির্দেশ করবে। এখন, 'গ'-এর বাস্তব চেহারা যাই হোক-না-কেন, মনে করুন 'গ'-এর প্রতিটি অবস্থার সঙ্গেই 'স' নামক সংস্থাটির অবস্থার একটা দ্ব্যর্থহীন অন্বয় আছে। অর্থাৎ 'স'-এর প্রতিটি অবস্থার সঙ্গেই 'গ'-এর একটি করে অবস্থাকে যুক্ত করা যায়। এরকম ক্ষেত্রে সংস্থাদুটির অবস্থাগত অন্বয়কে বোঝাতে আমরা একটা পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করি। 'গ'-

এর অবস্থাগুলিকে আমরা 'স'-এর অবস্থাসমূহের প্রদর্শন (representation) বলি। এখন, 'গ' নামক বস্তুগত সংস্থাটি তো নানা অবস্থায় থাকতে পারে। ধরুন, প্রথমে সে ১ নম্বর অবস্থায় ছিল, তার পরে ২ নম্বর অবস্থায় গেল। যেহেতু এই দুটো অবস্থাই 'স'-এর কোনো-না-কোনো অবস্থার প্রদর্শন, সেইহেতু আমরা বলতে পারি যে 'গ' নামক সংস্থাটি 'স'-এর একটি প্রদর্শন থেকে অন্য প্রদর্শনে যাচ্ছে। অর্থাৎ 'গ'-এর অবস্থান্তর মানেই দাঁড়াচ্ছে প্রদর্শনের বদল। পরিভাষায় আমরা বলব, 'স'-এর প্রদর্শনসমূহের উপরে সংক্রিয়া (operation) ঘটছে। অর্থাৎ 'গ'-এর অবস্থান্তর মানেই প্রদর্শনের উপরে সংক্রিয়া ঘটা।

এখন, 'স' আর 'গ' এই দুটি সংস্থার অন্বয়টাকে যদি এইভাবে বর্ণনা করা যায়, তবে 'গ' নামক বস্তুগত সংস্থাটিকে আমরা গণিত্র বলব। এইটেকেই আমরা বলছিলাম, গণিত্র কাকে বলা যায় সে-বিষয়ে তলিয়ে ভাবা। এ পর্যন্ত যা বলা হল, তাতে এটুকু আশা করি পরিষ্কার হয়েছে যে এটা শুধুই অঙ্ক কষার ব্যাপার নয়। অঙ্ক অবশ্যই গণিত্রের সাহায্যে কষা যায়, কিন্তু তা ছাড়াও আরও অনেক কিছুই করা যায়। আসল কথা হচ্ছে দুটি সংস্থার ওই পারস্পরিক অন্বয়। কিন্তু সেই অন্বয় নিয়ে আমরা কী করব ? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ হয়, যদি মানচিত্রায়ণের (mapping) ধারণাটা একটু ছুঁয়ে যাই।

মানচিত্র ব্যাপারটা কী ? ভারতের মানচিত্রের কথাই ধরা যাক। জিনিসটা কী ? একদিকে আছে ভারত নামে একটা দেশ। পৃথিবী নামক গ্রহের স্থলভাগের একটা অংশের নাম এশিয়া মহাদেশ। সেই এশিয়ার দক্ষিণে একটি বড়ো ভূখণ্ডের নাম ভারত। সেই ভূখণ্ডে হাজার হাজার শহর আর কয়েক লক্ষ গ্রাম আছে। এখন, ভারতের মানচিত্র আঁকতে হলে আমরা কী করি ? একটা কাগজ নিয়ে তার উপরে মোটামুটি যতগুলো সম্ভব শহরকে দেখাই, অর্থাৎ 'প্রদর্শন' করি। কীভাবে করি ? ধরুন, কাগজের উত্তর-পূর্ব দিকে বড়ো মাপের একটা ফোঁটা বা বিন্দু আঁকি। এঁকে বলি, 'এটা কলকাতা।' অর্থাৎ কলকাতা নামক সুবৃহৎ শহরটাকে একটা বিন্দুর সাহায্যে প্রদর্শন করি। বস্তুত ওই বিন্দুটা হল কলকাতা নামক শহরের প্রদর্শন বা মানচিত্র (map)। তেমনি বোম্বাইয়ের মানচিত্র আঁকি পশ্চিম দিকে একটা বিন্দুর আকারে। এইভাবে ভারত নামক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের এক-একটি শহরকে দেখাই মানচিত্রের এক-একটি বিন্দু দিয়ে। এই যে প্রক্রিয়া, এটাকেই বলছি মানচিত্রায়ণ (mapping)। এর মূল কথাটা কী ? না, একদিকে আছে ভারত নামক ভূখণ্ডটির অন্তর্গত বহুসংখ্যক ভৌগোলিক বিন্দু। ভৌগোলিক বিন্দুর এই প্রদত্ত সমাবেশটিকে বলা যেতে পারে একটি 'অঞ্চল' (domain)। আর অন্য দিকে কাগজের উপরে আছে অনেকগুলি বিন্দু নিয়ে খানিকটা জায়গা, যার মধ্যে ওই অঞ্চলের বিন্দুগুলিকে মানচিত্রায়িত করতে হবে। সেই জায়গাটাকে বলা যাক মানচিত্রের প্রসার (range)। অর্থাৎ ভৌগোলিক বিন্দুর সমাবেশটিকে বলছি 'অঞ্চল', আর মানচিত্রের অন্তর্গত বিন্দুর সমাবেশকে বলছি 'প্রসার'। এবারে মানচিত্রায়ণ ব্যাপারটাকে আমরা একটু গুছিয়ে নিয়ে এইভাবে বলব। মনে করুন মানচিত্রে কলকাতার প্রতিনিধিস্থানীয় বিন্দুটি হল 'ক', বোম্বাইয়ের প্রতিনিধিস্থানীয় বিন্দু হল 'ব', মাদ্রাজের প্রতিনিধিস্থানীয় বিন্দু হল 'ম', ইত্যাদি। তা হলে অঞ্চল আর তার সঙ্গে যুক্ত প্রসারের বিন্দুগুলিকে আমরা এইভাবে জোড়ায় জোড়ায় লিখে দেখাতে পারি : (কলকাতা, ক), (বোম্বাই, ব), (মাদ্রাজ, ম), ইত্যাদি। লক্ষ করবেন, প্রতিটি জুড়িতেই প্রথমে আছে অঞ্চলের একটি বিন্দু, আর পরে প্রসারের অন্তর্গত সংশ্লিষ্ট বিন্দুটি। অর্থাৎ জুড়ির মধ্যে সদস্যের ক্রমটি সুনির্দিষ্ট। এবারে এইরকম যাবতীয় জুড়ির সমাবেশকেই আমরা বলতে পারি মানচিত্রায়ণ। আবার, গণিতের পরিভাষা ধার করে জুড়ির এই সমাবেশকে ফলন-ও (function) বলতে পারি। কীভাবে, সেটা একটু খুলে বলি।

চার নম্বর ছবির নীচের অংশে তিনটে স্বতন্ত্র বস্তুগত সংস্থা দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে প্রত্যেকটিই গণিত্র হিসেবে গণ্য হতে পারে (অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে ওই 'গ' জাতীয় সংস্থা)। ছবির উপরের বাঁদিকের অংশে রয়েছে কিছু সংখ্যার সমাবেশ, যেটাকে বলতে পারি 'অঞ্চল'। এই অঞ্চলের সদস্যসংখ্যা ২৪। সুতরাং এটা ঠিক ভারত নামক ভূখণ্ডের সঙ্গে তুলনীয় নয়। তবু এই অঞ্চলটিকেও ডান দিকের 'প্রসারে' এইভাবে মানচিত্রায়িত করতে পারি : (৩, ৯), (৮, ৬৪), (৭, ৪৯), (০, ০), (১, ১), (৯, ৮১) ইত্যাদি। এখানে প্রতিটি জুড়িতে দ্বিতীয়
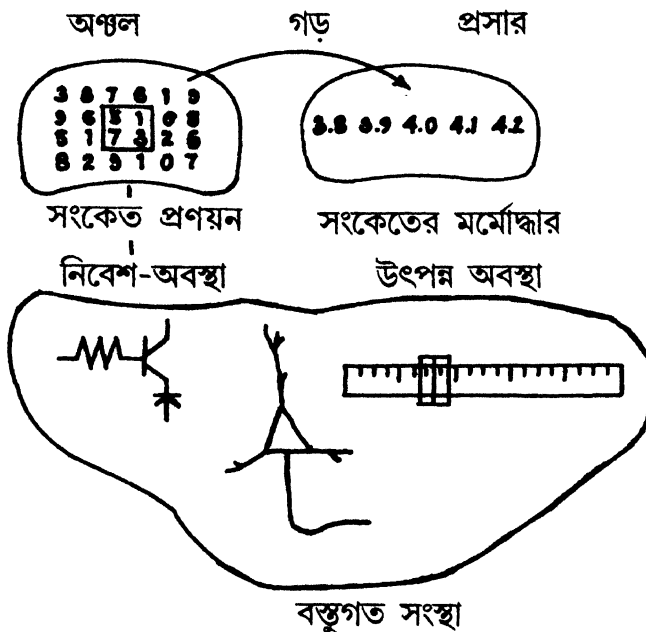
ছবি- ৪

বিভিন্ন ধরনের বস্তুগত সংস্থার সাহায্যে প্রদত্ত একটি অঞ্চলকে একটি প্রসারের মধ্যে মানচিত্রায়িত করা যায়। এখানে সেরকম তিনটে স্বতন্ত্র সংস্থা ('গ') দেখানো হয়েছে ছবির নীচের অংশে : একটি বৈদ্যুত পরিপথ, একটি স্নায়ুকোষের রাসায়নিক ঘনত্ব, আর একটি স্লাইড রুলের উপরে স্লাইডারের অবস্থান। মানচিত্রায়ণেরও তিনটে ধাপ : ১) বার্তার নিবেশটাকে 'গ' অর্থাৎ বস্তুগত সংস্থাটির উপযোগী সাংকেতিক চেহারা দেওয়া হয়, ২) 'গ' নামক সংস্থাটি নতুন অবস্থায় উত্তীর্ণ হয় এবং ৩) 'গ'-এর উৎপন্ন সাংকেতিক অবস্থার মর্মোদ্ধার করে মানচিত্রায়ণের ফলটা জেনে নেওয়া হয়। ছবিতে যে দৃষ্টান্তটি দেখানো হয়েছে, তাতে অঞ্চলের চারটি সংখ্যাকে বেছে নিয়ে তাদের গড়টাকে প্রসারের মধ্যে মানচিত্রায়িত করা হয়েছে। ইচ্ছে করলে আমরা অঞ্চলের প্রতিটি সংখ্যার বর্গও নির্ণয় করতে পারি। সেক্ষেত্রে প্রসার হিসেবে পাব একাদিক্রমে ২৪টি সংখ্যার বর্গের মান। (চার্চল্যান্ড ও সেনাওস্কি, ১৯৯২)।

সংখ্যাটি প্রথম সংখ্যার বর্গ। এ ক্ষেত্রে 'মানচিত্রায়ণ' বলতে বোঝাবে 'বর্গ নির্ণয়'। এইভাবে পুরো অঞ্চলের ২৪টি সংখ্যা থেকে ২৪টি জুড়ির যে সমাবেশ পাব, গণিতে তারই অপেক্ষাকৃত সুপ্রচলিত নাম হচ্ছে 'ফলন'। এই বিশেষ দৃষ্টান্তে সেই ফলনটিকে বলব বর্গ। এ ক্ষেত্রে যে-কোনো একটি জুড়িকে যদি সাংকেতিক আকারে লিখি (x,y) তবে x-এর সঙ্গে y-এর সম্পর্কটা হবে $y=x^2$। এবং বীজগণিতের এই সমীকরণটাই হবে মানচিত্রায়ণের নিয়ম (rule)।

তা হলে দেখতে পাচ্ছি, প্রদত্ত একটা অঞ্চলের উপাদানগুলিকে নিয়ে কোনো একটি প্রসারে মানচিত্রায়িত করাটাই গণিত্র জাতীয় সংস্থার কাজ। এই মানচিত্রায়ণের ব্যাপারটাকে 'ফলন' বলেও ভাবা যায়। মানচিত্রায়ণের জন্য যদি কোনো নিয়ম দেওয়া থাকে তবে সংশ্লিষ্ট ফলনটিকে গণনাযোগ্য ফলন বলা যেতে পারে। যেমন, বর্গ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে। এটা বোঝাবার জন্যেই আমরা বর্গের দৃষ্টান্তটি দিলাম। পাঠক লক্ষ করবেন, চার নম্বর ছবিতে কিন্তু বস্তুত আমরা বর্গের দৃষ্টান্তটি এঁকে দেখাই নি। দেখিয়েছি অন্য এক ধরনের মানচিত্রায়ণ। এবারে তার কথা বলি। কথাটা এই : মানচিত্রায়ণ মানেই কিন্তু এমন নয় যে প্রদত্ত অঞ্চলের প্রতিটি উপাদানই উৎপন্ন প্রসারের এক-একটি স্বতন্ত্র উপাদানে মানচিত্রায়িত হবে। লক্ষ করে দেখুন, চার নম্বর ছবিতে অঞ্চলের মাঝামাঝি অংশে চারটি সংখ্যা দেওয়া আছে : ৫, ১, ৭, এবং ৩। ছবির ডান দিকের 'প্রসার' অংশে পরপর পাঁচটি সংখ্যা সাজানো আছে : ৩.৮, ৩.৯, ৪.০, ৪.১, ৪.২। এর মধ্যে তীরচিহ্ন দিয়ে ৪.০ সংখ্যাটি নির্দেশ করা হয়েছে। তীরচিহ্নটি এসেছে 'অঞ্চল'টি থেকে। তার মানে কী? লক্ষ করবেন, ৫, ১, ৭ আর ৩, এই চারটি সংখ্যার গড় হল ৪.০। অর্থাৎ প্রদত্ত অঞ্চলের ওই চারটি সংখ্যা গিয়ে মানচিত্রায়িত হচ্ছে প্রসারের একটি মাত্র সংখ্যা ৪.০-তে। এই মানচিত্রায়ণটাকে আমরা যদি জুড়ির সাহায্যে দেখাই তবে চেহারাটা দাঁড়াবে : (৫, ৪.০), (১, ৪.০), (৭, ৪.০) এবং (৩, ৪.০)। আরও সংক্ষেপে দেখানো যায় এইভাবে : ({৫, ১, ৭, ৩}, ৪.০)। অর্থাৎ {৫, ১, ৭, ৩}, প্রদত্ত অঞ্চলের চারটি সংখ্যার এই সমাবেশ গিয়ে মানচিত্রায়িত হচ্ছে প্রসারের একটিমাত্র সংখ্যা ৪.০-তে। এখানে ফলনটা হচ্ছে গড় (average)।

একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন, মানচিত্রায়ণের এই ধারণার প্রয়োগের সম্ভাব্য ক্ষেত্রটা খুবই ব্যাপক। উচ্চতর প্রাণীসমূহ এবং মানুষের স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়াকলাপও তার আওতার বাইরে পড়ে না। বস্তুত সংবেদী স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে যখন বিভবের প্রবাহ মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছোয়, তখন সেই বিভবও একধরনের মানচিত্রায়ণ। বহির্জগতের প্রতিটি উদ্দীপক এইভাবে স্নায়ুমণ্ডলীতে সারাক্ষণ মানচিত্রায়িত হচ্ছে। এই কাজটা করছে বলেই স্নায়ুমণ্ডলী বা মস্তিষ্ককে আমরা গণিত্র বলতে পারি। এখানে আর কেবল বিন্দু থেকে বিন্দুতে কিংবা সংখ্যা থেকে সংখ্যাতে মানচিত্রায়ণেই ব্যাপারটা সীমাবদ্ধ থাকে না। অঞ্চল বলতে সমগ্র বহির্জগৎ, মস্তিষ্কের আবাসস্বরূপ দেহখানা, এমন-কি, ক্ষেত্রবিশেষে মস্তিষ্কের নিজেরই কোনো অংশকেও বোঝাতে পারে। আর প্রসার বলতে বোঝাবে সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলীর যাবতীয় অবস্থার সমাহারকে। এটাই হল গণিত্র হিসেবে মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের মোট পরিসর।

তা হলে সর্বসাকুল্যে গণিত্র বলতে কী বোঝাচ্ছে? বোঝাচ্ছে এমন একটি বস্তুগত সংস্থাকে যা 'ফ' নামক কোনো ফলন নির্ণয় করবার ক্ষমতা রাখে। সেই নির্ণয়ের কাজটা এইভাবে হয় :

১. বস্তুগত সংস্থাটির অবস্থাগুলি একে একে ফলন 'ফ'-এর মানসমূহে মানচিত্রায়িত হতে থাকে, এবং

২. মানচিত্রায়ণের এই কাজটি করতে গিয়ে বস্তুগত সংস্থাটিকে পরপর কতকগুলি অন্তর্বর্তী অবস্থার ভিতর দিয়ে যেতে হয়। সেই অন্তর্বর্তী অবস্থাগুলি ফলন 'ফ'-এর একটি অ্যাল্‌গরিদ্‌ম নিষ্পন্ন করে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা অ্যাল্‌গরিদ্‌মের কথা বলেছি। এখানে একটু অন্যভাবে সেই কথাই বলব : অ্যাল্‌গরিদ্‌ম হচ্ছে সসীম কোনো কর্মসূচি। যেমন ধরুন, পুলিপিঠে বানাবার পাকপ্রণালী, কিংবা বর্গমূল বার করবার কোনো পদ্ধতি।

এইখানে একটা প্রশ্ন কিন্তু এসে যাচ্ছে। এইভাবে সুনির্দিষ্ট কোনো অ্যাল্‌গরিদ্‌ম-এর সাহায্যে কোনো ফলন নির্ণয় করতে পারলেই কি আলোচ্য সংস্থাটিকে আমরা গণিত্র বলব? এ প্রশ্নের উত্তর হল : না, যেসব ফলন সংস্থাটি নির্ণয় করতে সক্ষম, সেগুলো আমাদের আগ্রহের বিষয়ীভূত হওয়া চাই। অর্থাৎ নির্ণেয় ফলনগুলির

কোনো-না-কোনো উপযোগিতা থাকা দরকার। এই বিষয়মুখ (objective) ব্যাপারটাও গণিত্রের সংজ্ঞার অপরিহার্য অঙ্গ।

টীকা

১. 'গণিত্র' শব্দটি বস্তুত 'কম্পিউটার'-এর চেয়েও বেশি যথাযথ, কারণ এর আক্ষরিক অর্থই হচ্ছে computing device। শব্দটি প্রাচীন ভারতীয় গণিতের সূত্রে পেয়েছি। আগ্রহী পাঠক *Indian Studies in Honour of Charles Rockwell Lanman* (Harvard University Press, 1929) গ্রন্থটি দেখতে পারেন।

২. Rene´ Descartes (1649), *Les Passions de l'ame*। ইংরেজি অনুবাদ রয়েছে : E.S. Haldane and G.R.T. Ross (1911), *The Philosophical Works of Descartes*, 2 vols., reprint, Cambridge, 1968, p. 338.

৩. এই আলোচনা খুবই বিশদভাবে করা হয়েছে Patricia Churchland-এর *Neurophilosophy—Toward a Unified Science of the Mind-Brain* (Cambridge, Massachusetts, 1986) বইটিতে। আমরা খুব সংক্ষেপে তাঁরই অনুসরণ করেছি।

৪. উপরে ২-সংখ্যক টীকা দেখুন।

৫. Rene´ Descartes, (1644). *The Principles of Philosophy*. এটিও Haldane ও Ross -এর সম্পাদিত *The Philosophical Works of Descartes*-এর অন্তর্গত (পৃ. ২৯৩)।

৬. John C. Eccles, *Facing Reality*, New York, Heidelberg, Berlin, 1970.

৭. Roger Penrose, *The Emperor's New Mind*, Oxford University Press, 1989.

৮. এ বিষয়ে সবচেয়ে সাম্প্রতিক এবং অতি উৎকৃষ্ট আলোচনা পাওয়া যাবে Patricia S.Churchland এবং Terrence J. Sejnowski-র *The Computational Brain* (Cambridge, Massachusetts, 1992) বইখানিতে। শুধু যে লেখকদের নিজস্ব গবেষণার ফল এতে বিবৃত হয়েছে তাই নয়, সাম্প্রতিকতম অবস্থাও (যাকে বলে state of the art) জানা যাবে। সুতরাং এ বইয়ের কাছে আমরা বিশেষভাবে ঋণী।

৯. D. J. Struik, ed., *A Source Book in Mathematics, 1200-1800*, Princeton, N.J., 1986, p.l.

১০. ১৯০৯ সালে জার্মান স্নায়ুবিজ্ঞানী কর্বিনিয়ান ব্রড্‌মান কোষসমূহের স্থাপত্যের ভিত্তিতে সমগ্র কর্টেক্সকে ৫০টি স্বতন্ত্র এলাকায় ভাগ করেন। পরে এইসব এলাকার কোনো কোনোটিকে ক্রিয়া অনুযায়ী আরও ছোটো ছোটো অংশে ভাগ করে নিতে হয়েছে। তবু সচরাচর কর্টেক্স-এর বিভিন্ন অংশকে বোঝাতে ব্রড্‌মানের সংখ্যাগুলিই ব্যবহার করা হয়।

দপ্তরিপাড়ার ডায়েরি

আফসার আমেদ

কলকাতার ভেতরেই সাঁইতিরিশ নম্বর ওয়ার্ডটা একেবারে কলকাতার কাছাকাছি। আবার পেরিয়ে-আসা ইতিহাসের কাছাকাছি। শেয়ালদার কাছাকাছি। কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ার কাছাকাছি। বইয়ের সঙ্গে কোথায় যেন যোগ আছে এই ওয়ার্ডটির। বইয়ের বাইরের পারিপাট্য শোভনতার সঙ্গে যোগ। ভেতরের সঙ্গে যোগ নেই। অদ্ভুত এই শান্তশিষ্ট নির্লোভ মানুষেরা। বই এঁদের হাত ছুঁয়ে বাজারে যায়। বইয়ে এঁদের কোনো লোভ জন্মায় না। বই এঁদের কোনো কাজে লাগে না। অনেকেই আছেন যাঁরা নিরক্ষর। আবার অনেকে একটু-আধটু পড়তে পারলেও বই প্রয়োজনীয় নয় তাঁদের কাছে। এমনই অসংগতির জীবন এখানে। কলকাতা মহানগরীর উন্নয়নের সঙ্গেও এই ওয়ার্ডের অসংগতি বিস্তর। যেন পুরোনো। যেন ইতিহাস বয়ে নিয়ে আসতে ভুলে গেছে সাঁইতিরিশ নম্বর ওয়ার্ডটিকে। মলিন ভাঙাচোরা ঘুপচিমতো ছোটো ছোটো কারখানাগুলি। দিনমানে অন্ধকার। চারপাশে আবর্জনা। দুর্গন্ধ। মনে হবে একসময় মানুষ এখানে বাস করত। এখনকার মানুষেরা যেন কোনো অতীত-মানুষ।

আমাদের আর-পাঁচটা দেখা জীবনের থেকে খসে-আসা মানুষগুলো। এখানকার সব শিশু শ্রমিকেরা প্রায়ই বিধবার সন্তান। কিশোর যুবক প্রৌঢ় বৃদ্ধ পুরুষরা প্রায় প্রত্যেকেই শিশুকালে এই কাজে এসেছিলেন। তাঁরাও ছিলেন বিধবার সন্তান। এখন যাঁরা মহিলা শ্রমিক প্রায় সকলে বিধবা। কিন্তু বিধবাজননী ও অনাথপুত্র মা-ছেলের রক্তবন্ধনজাত অবস্থান নেই। যে বিধবাসন্তান এখানে আসছে, সে নিজের বিধবা মায়ের হাত ধরে আসছে না। আবার অনাথসন্তানের হাত ধরে বিধবাজননী আসছেন না। সাঁইতিরিশ নম্বর ওয়ার্ডের অনাথ শিশুর মা শহরের উপকণ্ঠে কোনো গ্রামে থাকেন। সাঁইতিরিশ নম্বর ওয়ার্ডের বিধবাজননীর সন্তান শহরের উপকণ্ঠে কোনো গ্রামে থাকে।

এখন অনেক শিশু যুবক হয়ে উঠেছেন। যুবকেরা প্রৌঢ় হয়েছেন। এমন-কি প্রৌঢ়রা বৃদ্ধ হয়েছেন। নতুন করে আরো শিশু এসেছে। যুবকেরা অনেকে সংসার করেছেন। প্রৌঢ় ও বৃদ্ধরা সংসারের জন্য আকণ্ঠ ডুবে আছেন। কাজ কাজ আর কাজ। এই প্রবহমানতার যেন অন্ত নেই। আমাদের জীবনযাত্রার একেবারে বাইরে এঁরা। আজন্ম অসংগতি মৃত্যু পর্যন্ত প্রলম্বিত। অতি-দরিদ্রের জীবন, বুঝি। অতি-দরিদ্র বলতে ঝুপড়িবাসী, ফুটপাথবাসী। তাঁরা তো তাঁদের দারিদ্র্য দেখিয়ে দেন তাঁদের গৃহহীনতার মধ্যে দিয়ে, ইটের উনুন, খাবার সামান্য পাত্র ও ছেঁড়া কাঁথাকানির মধ্যে দিয়ে। ফুটপাথবাসীরাও রোজগার করেন, খান। কিন্তু এঁদের রোজগার ফুটপাথবাসীর থেকে কম। কেননা ফুটপাথবাসীর পরিবারে নারী পুরুষ শিশু সকলেই রোজগার করেন। কিন্তু সাঁইতিরিশ নম্বর ওয়ার্ডের শ্রমিকদের পোশাক-আশাক তুলনায় শোভন ও পরিচ্ছন্ন। একজন পুরুষ পরিবারের সকলের দায়িত্বপালন করেন। সন্তানের পড়াশোনার খরচ ওই আয়েই বহন করেন। আত্মীয়তা, লৌকিকতা, বিয়ের পণ দেওয়া, ইদে ও পুজোয় নতুন পোশাক-আশাক কেনা, এ সমস্ত-কিছুই বহন করেন। কলকাতার জনস্রোতের মধ্যে মিশে গেলে মনে হবে না ইনি আয় করেন মাসে ৫০০ টাকা। সাঁইতিরিশ নম্বর ওয়ার্ডের এইসব মানুষদের বেঁচে থাকার নানা ধরনধারণের খোঁজ খবর নিতে নিতে এই অসংগতির নানা ব্যাপার চোখে পড়ে। অঙ্কের মতো মেলানো যায় না। অনেক কিছু রহস্যাবৃত মনে হয়।

যেমন, অন্য অনেক কাজ আছে, যেখানে এই শ্রমিকরা দৈনিক দ্বিগুণ রোজগার করতে পারেন। কিন্তু একজনকেও দেখা যায় নি, যিনি এই কাজ থেকে অন্য কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। মরে না যাওয়া পর্যন্ত নিষ্কৃতি নেই, এখানকার কাজের জীবন থেকে। মিষ্টভাষী, বন্ধুবৎসল, ভদ্র স্বভাবের এঁরা। মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়ী। মিতব্যয়ী

অর্থে ব্যয় করবার মতো সামর্থ্য থাকে, এমন নয়। সঞ্চয়ী অর্থে সঞ্চয় করবার মতো অর্থ এঁদের আছে, এমনও নয়। স্বল্প রোজগারে সংসার চালান। উপার্জিত অর্থ যথাযথ খরচ করেন। সাপ্তাহিক উপার্জনের টাকা সপ্তাহের প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত সমানভাবে টেনে নিয়ে যান। হঠাৎ খরচ করে একদিনে শেষ করে দেন না। সংসার-অন্ত প্রাণ। সামান্য সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ভেতর সন্তুষ্ট। ক্ষোভ নেই। নেই হাহাকার। বেদনা আছে, বেদনার প্রকাশ নেই। বিচ্ছেদের স্মৃতি আছে প্রত্যেকেরই। নিজ রাষ্ট্র ও নিকট আত্মীয়ের বিচ্ছেদ আছে। যাঁরা ওপার থেকে এসেছেন তাঁরা স্বদেশ থেকে প্রত্যাখ্যাত। জন্মভূমি হারানোর শোক একভাবে আছে। আবার বিধবা যাঁরা, তাঁদের স্বামীর শোক। এই দুইয়ের বেদনাকে বাইরে থেকে চেনা খুব শক্ত। সচরাচর চোখে পড়বে না।

মালিক-শ্রমিক চরিত্রের মধ্যেও আশ্চর্যজনক অসংগতি। ছোটো কারখানার মালিকের ভেতরই বেশি অসংগতি। মালিক-শ্রমিককে দেখে চেনা মুশকিল কে মালিক, কে শ্রমিক। দুইয়ের শ্রেণীগত অবস্থান অঙ্কের মতো মিলতে চায় না। আচার-আচরণে সম্পর্কে, কথাবার্তায়, পোশাকে-আশাকে, শ্রমের ভেতর, মালিকটিকে চিনে নেওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে। আবার কখনো শ্রমিকটিকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কারখানার চাবির দায়িত্ব পেয়ে কারখানায় রাত্রিযাপন করেন। কারখানাটা তাঁর হাতে অনেকক্ষণ থাকে। এঁরা চোর নন, প্রতারণা এঁরা জানেন না। অপরাধ এঁদের ছোঁয় না।

এঁরা শ্রমবিমুখ নন। প্রতিদিন ১২ ঘণ্টা প্রত্যেককে কাজ করতে হয়। ৪ ঘণ্টা বাড়তি সময় কাজ করে সপ্তাহে তবে ১৫০ টাকা আয় করতে পারেন। কাজে ফাঁকি দেন না। দলবদ্ধ কাজের পরম্পরা থাকায় স্বভাবতই কেউ ফাঁকি দেবার সুযোগ পান না। স্বভাবও নয়। দ্বিতীয়, ফুরনে কাজ অনেকে করেন। কাজের পরিমাণ না বাড়লে আয় বাড়ে না। অবসরের সময় এঁদের কম। বাড়ি থেকে কারখানা প্রতিদিন যাতায়াতে অনেকটা সময় চলে যায়।

রাজনৈতিক দলের সঙ্গে এঁদের সংযোগ নেই বললেই চলে। এঁরা এড়িয়ে চলেন। আর অবকাশও থাকে না। ভোটের সময় ভোট দেন মাত্র। খাওয়া-পরার সংকট এঁদের কাছে প্রধান হয়ে আসে। আর শ্রমে সমর্পণ করা ছাড়া উপায়ও থাকে না। কাজ ও পরিবারের গণ্ডির বাইরে মেলামেশা নেই। বাসগৃহের সঙ্গে কারখানার দূরত্ব আছেই। আর ঘরে থাকার সময়ও সংক্ষিপ্ত। ফলে এঁদের কাছে ঘরের বিকল্প হয়ে ওঠে কারখানা। শ্রমিক-মালিক একসঙ্গে রান্না করে খাওয়ার ভেতর ঘরের বিকল্প। টিফিনের সময় একটু ঘুমিয়ে নেবার ভেতর। চিরুনি ও আয়না ব্যবহারের স্বভাবের মধ্যে। মহিলাদের শাড়ি বদলানো ও সামান্য সাজগোজের ভেতর। মহিলারা সহকর্মী পুরুষদের জল গড়িয়ে দেন। মহিলারা একে অপরের চুল আঁচড়ে দেন, বেঁধে দেন। কারখানার পরিবেশে এসমস্ত-কিছুই স্বাভাবিক ও সহজ। ঘরে থাকার অভাব এঁরা এভাবেই মেটান যেন।

দপ্তরিপাড়ার জাতব্যাবসা পূর্ববঙ্গীয় মুসলমানদের একচেটিয়া ছিল। এঁরা ছিলেন নিম্নবর্গীয় মুসলমান। প্রশাসনিক কাজ চালাবার প্রয়োজনে দপ্তরি শ্রমিকদের প্রয়োজন হয়। দরিদ্র মুসলমানদের ভেতর থেকেই এইসব কাজ শেখানো-পড়ানো হয়। ইংরেজ আমল থেকেই। যেমন তৈরি করে নেওয়া হয়েছিল দর্জি, বাবুর্চি, কোচোয়ান, আর্দালি, খানসামা ইত্যাদি ইত্যাদি। বাঁধাইশিল্পের কাজে মালিক ও কর্মচারী প্রথমের দিকে পূর্ববঙ্গেরই ছিলেন। পরে এখানকার মুসলমানদের সঙ্গে ওঠাবসা ও সম্পর্ক গড়ে ওঠার ফলে এদেশীয়র মধ্য থেকে শ্রমিক নিয়োগ হতে থাকে। এদেশীয় মুসলমানরা সাধারণত কর্মচারী ছিলেন। তার পর দেশভাগের ধাক্কায় পড়েন পূর্ববঙ্গীয়রা। পাসপোর্ট-ভিসার শিকার হন। যাতায়াত ক্রমশ জটিল হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে ঘর ও কারখানার দূরত্ব একটা রাষ্ট্রের সঙ্গে আর এক রাষ্ট্রের। পরিবারের টানে কোনো উপায়ে যদিও বিদেশে যেতেন, ফেরাটা তত সহজ হত না। কারখানার সঙ্গে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান গড়ে উঠত। সেই সময় এদেশীয় কর্মচারীরা কারখানা চালাবার সুযোগ পান। পূর্ববঙ্গীয় মালিকরাও স্বদেশে উপার্জনের উপায় খুঁজে নিয়ে ওখানেই থিতু হয়ে যান। মালিকানার হস্তান্তরের বিপুল পরিবর্তন ঘটে দেশভাগের অব্যবহিত পরে। ষাটের দশকের শেষার্ধেও খানিকটা। ষাটের দশকের দাঙ্গা পূর্ববঙ্গীয় মুসলমানদের পিছুটানকে ভুলিয়ে দেয়। দেশভাগের ধাক্কায় আর দাঙ্গায় উদ্বাস্তু হয়ে

পূর্ববঙ্গীয় হিন্দুরা এ দেশে চলে আসেন বিপুল সংখ্যায়। তাঁদের ভেতর থেকে দপ্তরিপাড়ার শ্রমিক নিয়োগ স্বাভাবিকভাবেই গড়ে ওঠে। এবং কারখানার কর্মচারী থেকে মালিক হওয়ার প্রক্রিয়ায় পূর্ববঙ্গীয় হিন্দু অনেকেই কারখানার মালিক হয়ে ওঠেন।

তা ছাড়া এই এলাকার স্থানীয় বসবাসকারী হিন্দুরাও কর্মসংস্থানের দৈন্যে এই ব্যাবসাকে অবলম্বন করে বাঁধাইশিল্পের সম্প্রসারণ ঘটান।

বাঁধাইশিল্পের কর্মচঞ্চল এলাকা পাটোয়ার বাগান। এখানে স্থায়ী বসবাসকারী উর্দুভাষী মুসলমানদের বাস চোখে পড়বার মতো। এখানে বাড়ির অধিকাংশ মালিকানা ওঁদেরই। ওঁদের কাছ থেকেই কারখানাগুলো ভাড়া নিয়েছেন দপ্তরি মালিকরা। স্থায়ী বাসিন্দারা দপ্তরি ব্যাবসার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন খুব কমই। বাড়িওয়ালা-ভাড়াটের সম্পর্কই বেশি। স্থায়ী বাসিন্দাদের থাকার জায়গা কম। একটি ছোটো ঘরে ১০/১২ জন সদস্যের পরিবার থাকছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকের দপ্তরিকাজ করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এঁরা এঁদের বসবাসের ঘরে বিকল্প কারখানার আদল গড়ে তুলছেন। বাড়ির মেয়েরা কারখানা থেকে ফর্মা এনে ভাঁজাই সেলাই করছেন নিজেদের বসবাসের ঘরে। এখানে আর এক অসংগতি। ঘর কারখানা হয়ে উঠছে। এঁরা অত্যন্ত দরিদ্র। মূল শ্রমিকদের বাইরে এঁরা। মূল শ্রমিকদের চেয়ে এঁরা দুঃস্থ। অথচ শ্রমিক ইউনিয়ন ১৯৮৯ সালে ১৮, ১৯, ২০ এপ্রিল তিনদিন প্রতীক ধর্মঘট ডেকেছিল যেসব দাবি নিয়ে তার মধ্যে অন্যতম একটি দাবি ছিল কারখানার বাইরে কাজ না দেওয়া। আন্দোলনের ভেতরও অদ্ভুতরকম অসংগতি। শ্রেণীসংঘর্ষের অঙ্কটাই উলটেপালটে যায়। ওই তিনদিন ধর্মঘটের একটি দিনের কথা : বাঁধাই মালিকরা পথসভা করলেন কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের সামনে (১৮ এপ্রিল ১৯৮৯) প্রকাশকদের বিরুদ্ধে, কাজের রেট বাড়ানোর দাবিতে। সেখানে মালিকদের সঙ্গে শ্রমিকরাও যোগ দিলেন। তার পর দপ্তরিপাড়ার নানা জায়গায় পথসভা হল। মালিকরা মাইকে বক্তৃতা দিলেন। প্রকাশকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য শ্রমিকভাইদের সাহায্য আহ্বান করলেন। এখানেও অঙ্ক মিলছে না।

আমরা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারি না। শেষ কথাও বলতে পারি না। আমাদের দেখা অসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে চায়। কোনো তত্ত্বের সঙ্গে মেলানোও যায় না। আমাদের দেখা শুধু। দেখা অসম্পূর্ণ হতে পারে ভেবে নিয়েই দেখা। সাঁইতিরিশ নম্বর ওয়ার্ডের মানুষদের সঙ্গে পরিচিত হতে চাওয়া।

কত কাজের সঙ্গেই আমরা পরিচিত হলাম। বাঁধাইশিল্পের সংলগ্ন ও সম্পর্কযুক্ত নানা কাজ। বই বাঁধাই, খাতা বাঁধাই, বুলিঙের কাজ, ফাইল তৈরির কাজ, প্যাড তৈরির কাজ, খাম বানানো, নাম্বারিঙের কাজ, কাগজের বাক্স, লেবেলিং, ছাঁট কাগজ বাছাবাছির কাজ, পাঞ্চিং, নানা কিছু। ৪০০ কারখানা আমরা দেখেছি। সবমিলিয়ে শ্রমিকের সংখ্যা পাঁচ হাজারের মতো। পুবে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, পশ্চিমে আমহার্স্ট স্ট্রিট, দক্ষিণে সূর্য সেন স্ট্রিট, মূল এলাকা এভাবে বেষ্টিত। ৩৭ নম্বর ওয়ার্ড। সূর্য সেন স্ট্রিটের থেকে উত্তরমুখো হাঁটলে বাঁয়ে থাকে পটোলডাঙা স্ট্রিট, ডাইনে রামনাথ বিশ্বাস লেন, বুদ্ধু ওস্তাগর লেন, ছকু খানসামা লেন, অ্যান্টনিবাগান লেন। বৈঠকখানা রোড ধরে মাঝামাঝি জায়গায় এসে পড়লে পুবের আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড থেকে একটি রাস্তা আমহার্স্ট স্ট্রিট পর্যন্ত গিয়ে মিশেছে। ওই রাস্তাটির দুদিকে দুটি নাম। বৈঠকখানা রোডের ডান দিক পর্যন্ত কালী সোম স্ট্রিট, বাঁদিক কাশী বোস রোড। মূল এলাকা পাটোয়ারবাগান এখান থেকেই শুরু। সরু সরু গলির ভেতর ছোটো ছোটো কারখানার সমাবেশ।

ছোটো কারখানায় ৫ থেকে ৭ জন শ্রমিক। এখানে মালিকও শ্রমিকের মতো কাজ করেন। এঁদের মধ্যে ২ জন মহিলা শ্রমিক। ১ জন শিশু শ্রমিক। গড়পড়তা দশ ফুট বাই দশ ফুট কারখানার আয়তন। সব কারখানাতেই মাচা। দরজা-লাগোয়া মাচায় ওঠার কাঠের ছোটো মই। মাচার ওপরে কাঠের 'তক্তি' ফেলে মহিলা শ্রমিকরা সেলাই ও ভাঁজাইয়ের কাজ করেন। নীচের মেঝেয় শীতলপাটি বিছিয়ে বাঁধাইয়ের কাজ করেন পুরুষ শ্রমিকরা। তাঁদের মধ্যে একজন থাকে 'বয়', শিশু শ্রমিক। ফাইফরমাস খাটা ও বাঁধাইয়ের কাজে সাহায্য করা তার কাজ। একপাশে থাকে কাটিং মেশিন। প্যাঁচমেশিন ও হটপ্রেস মেশিন। লেইয়ের গামলা। ফর্মা ভাঁজাই করে, 'মিছেল' টেনে

(ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে) সেলাই করে কারিগরদের হাতে চলে আসে। কারিগররা সেলাই বই প্যাঁচমেশিন বা ব্যাকিংমেশিনে পুট গোল করে 'পুস্তানি' লাগান। 'জেল' ধরান। কভার সাঁটেন। তৈরি বই হটমেশিনে দিতে হয়। এই বাঁধাইয়ের কাজটা ৪ থেকে ৫ জন কর্মী একযোগে করেন। সবার ওপরে 'হেড কারিগর' অর্থাৎ 'ওস্তাদ'। তার নীচে 'কারিগর'। তার নীচে 'নিম কারিগর'। তার নীচে 'সাগরেদ'। সব শেষে 'বয়'। 'বয়' কভারে লেই লাগানোর কাজ করে। তাকে 'পিলানো' বলে। 'ওস্তাদ' সমস্ত কাজটাকে পরিচালনা করেন। হেড কারিগর ১৫/১৬ টাকা 'রোজ' পান। 'কারিগর' ১৪/১৫ টাকা। নিম কারিগর ১১/১২ টাকা। সাগরেদ ৯/১০ টাকা। 'বয়' দৈনিক ২ টাকা।

মহিলা শ্রমিকদের 'রোজ' নেই। কাজের পরিমাণে মজুরি। তাঁদের ১০০০ শিট ভাঁজাই-সেলাইয়ের মজুরির হিসেবটা এইরকম :

ভাঁজাই		সেলাই	
আকার	দর	সুতো/দর	
		১/১	২/১
ডিমাই ৮ পেজি	২.৭৫	৭.৩০	৮.০০
ডিমাই ১৬ পেজি	৩.৬৮	৭.৩০	৮.৬০
ডবল-ডিমাই ৩২ পেজি	৫.০০	১০.০০	১০.০০
ডবল-ক্রাউন ১৬ পেজি	৪.২৫	১০.০০	১০.০০

১৬ পেজি ডিমাই ৪০০০ শিট ভাঁজাই করতে ৮ ঘণ্টা সময় লাগে। ৮ ঘণ্টা পরিশ্রম করলে একজন মহিলা শ্রমিক রোজগার করতে পারেন ৩.৬৮ × ৪ = ১৪.৭২ টাকা। এঁরা মাসের মধ্যে ২০ দিন কাজ পেয়ে থাকেন। বাকি দিন বসে কাটাতে হয়।

শ্রমিকদের বাসস্থানের সমস্যা আছে। কলকাতার উপকণ্ঠে স্টেশন এলাকায় অথবা বস্তিতে দরমা দেওয়া ঘরে, ভাড়ায় থাকেন। কোনো ক্ষেত্রে ঘরভাড়া ৫০ টাকা, কোনো ক্ষেত্রে ৩০/৪০ টাকা। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪ থেকে ৭ জন পর্যন্ত। প্রধান খাদ্য সবজি ও ভাত। মাছ খাওয়া হয়েই ওঠে না। এঁদের ছেলেমেয়েরা একটু বড়ো হলে তাদের কাজে লাগিয়ে দেন। সামান্য লেখাপড়া শিখিয়ে থাকেন। ব্যতিক্রমও আছে। কেউ কেউ ছেলের পড়াশোনার জন্য আয়ের এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত খরচ করেন প্রতিমাসে। এঁরা সাধারণত রেশনের ওপর নির্ভরশীল। এঁরা সকালবেলা ভাত খেয়ে আলুসেদ্ধ ভাত সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। টিফিনের সময় খান। বাড়তি খরচ বাসভাড়া। ট্রেনের রাস্তা হলে বিনাটিকিটে যাতায়াত করেন। মেয়েরা যাঁরা কাজে আসেন তাঁদের মধ্যে অনেকে বিধবা। কেউ কেউ স্বামীপরিত্যক্তা অথবা স্বামী তাঁদের খেতে দিতে পারেন না। অথবা সংসার বেড়ে যাওয়ায় বাড়ির বউকে কাজে আসতে হয়েছে। এঁরা কেউ কেউ নিজের হাতে রান্না করে, খেয়ে, সঙ্গে আলুসেদ্ধ ভাত নিয়ে আসেন। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার দিকে বিধবাজননীর নজর বেশি। স্বামীপরিত্যক্তাদেরও। যে ঘরের বধূকে সংসার বেড়ে যাবার কারণে কাজে আসতে হয়েছে, এঁদের বয়স ৪০-এর ওপরে। এঁদের স্বামীরা অন্য কোনো কাজ করে থাকেন। স্বামীর আকস্মিক মৃত্যু-হওয়া বিধবাযুবতীরা কেউ বৃদ্ধ হয়েছেন। কেউ কেউ সদ্যবিধবাযুবতী। এঁদের বয়স ২৬ থেকে ৩০-এর মধ্যে। এঁরা সপ্তাহে ৬০/৭০ টাকা আয় করতে পারেন।

সব বিধবার আত্মকথা একরকম নয়। বিধবাদের কেউ কেউ দারিদ্র্যের চাপে এখানে কাজ করতে আসার পর, বাড়ির অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ফিরে এলেও কাজ ছাড়েন না। এখানে সকলের সঙ্গে থাকতে ভালো লাগে। নিজের দুঃখ-যন্ত্রণার কথা ভুলে থাকতে পারেন। সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্কে সময় কাটে। এখানে শুধু ঘরের বিকল্প নয়, দাম্পত্যের বিকল্প। এ বিকল্প বিকল্পই, দাম্পত্য নয়।

সুলতানের কারখানায় দুজন মহিলা কাজ করেন। এঁদের বয়স তিরিশের মধ্যে। এঁরা মাচার ওপরে কাজ

করেন। একজনের নাম আশা, অন্যজনের নাম সীমা। ওঁদের ভাগ্যবিপর্যয়ের বৃত্তান্ত শুনেছি। প্রতিদিন ওঁদের খোঁজখবর নিতাম। ওঁরা কাজ করতে করতে অনুচ্চকণ্ঠে গান গাইতেন। নিজেদের মধ্যে খুবই বন্ধুত্ব ছিল। ওঁদের সঙ্গে প্রথম আলাপের মুহূর্তে আশা দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে কিছুক্ষণ বিমর্ষ হয়ে ছিলেন। আশার কী হল, সীমাকে শুধিয়েও জানতে পারি নি তখন। পরে ব্যাপারটা বোঝা যায়। স্বামীর কথা হঠাৎ মনে পড়ার ব্যাপার। এমন-কি স্বামীর মতো দেখতে, এমন কাউকে শনাক্ত করে ফেলেন এঁরা। এটা একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। স্বামী নেই, অথচ স্বামী বিষয়টা এমন অহরহ অষ্টপ্রহর হয়ে ওঠে যেন। নিরবয়ব এক স্বামিত্বের সঙ্গ নিয়ে থাকেন যেন। আশার বাড়ি মসলন্দপুর। স্বামী ইস্টার্ন রেলে চাকরি করতেন। ১৯৮৬ সালের ৫ মে মারা যান। হার্ট ফুটো হয়ে গিয়েছিল। এখন তিন ছেলেমেয়ের বিধবাজননী আশা। কারখানায় মাঝে মাঝে ফিট হয়ে যেতেন। একদিন দেখা গেল আশাকে বিমর্ষ হয়ে বসে থাকতে। সবাই কাজে বসে গেছেন। তিনি বসে আছেন। তাঁর এই বসে থাকার ব্যাপারে সহকর্মী ও মালিকের প্রশ্রয় আছে। কারখানায় আসার অব্যবহিত পরে এই ঘটনা। আশার মনখারাপ করে বসে থাকার কারণ জানা যায়, গতদিন ছিল আশার স্বামীর 'বাৎসরিক'। ওঁরা বলেন 'বছরকি'। স্বামীহীনতার পরিচয় নিয়ে এঁদের এখানে থাকা। অন্যকে বুঝতে দেওয়া। কিছুক্ষণের জন্য স্বাভাবিক হাসিঠাট্টা কথাবার্তা স্তব্ধ করে দেন এঁরা। এই স্তব্ধতার এক সংবেদনশীলতা আছে। পরবর্তী সময়ে আরো দাবি তৈরি হয়, আরো হাসিঠাট্টার আরো কথাবার্তার।

সীমা ও আশাকে দেখা গেছে নীচের পুরুষ সহকর্মীদের সঙ্গে নানা কথায় হাসাহাসি করতে। ঠাট্টা ইয়ার্কি তামাশা করতে। রসালাপে মেতে উঠতে। একদিন দেখা গেল, সীমার বাঁ হাতের কব্জি ধরে এক কারিগর ঘড়ির সময় দেখছেন। ঠাট্টার ছল। সীমার চোখেমুখে খুশির ভাব। জল নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি। সহকর্মীদের সঙ্গে কর্মস্থলে এইভাবে থাকার মধ্যে প্রাণ খুঁজে পান যেন তাঁরা। তাঁদের চোখমুখের অভিব্যক্তি দেখে বুঝতে পারা যায়। দাম্পত্যের বিকল্পমাত্র।

আশা অত্যন্ত ভেতরগোঁজা ধরনের মহিলা। হাসিঠাট্টায় স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ। সীমার চেয়ে বছর চারেকের বড়ো হবেন। সীমা চটুল ও প্রগল্ভ। দেখতেও ভালো। সে তুলনায় আশার স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছে। কথায় কথায় সীমার কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলাম, বিয়ে করতে ইচ্ছে করে কিনা ওঁর। মনের কথার সহজে তল পাওয়া যায় না। অনেক ঘুরিয়েপেঁচিয়ে নানা প্রশ্ন করে জানা গেল বিয়ে করতে ইচ্ছে যায়। তাঁর বিয়ে করা উচিত হবে না জেনেই বলেছেন বিয়ে করতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করা ও বিশ্বাস করা এই দুইয়ের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। সীমা বিশ্বাস করেন না বিধবারা বিয়ে করতে পারেন।

মনে পড়ে, তাঁদের একসঙ্গে বসে কাজ করার সময় নানা কথা বলে চলা। নানা ভাববিনিময় করে চলা। আবার বহুক্ষণ অদ্ভুত নীরবতা। দুজনেই নানা ভাবনায় বুঁদ হয়ে আছেন। অনেক না-বলা কথা নিয়ে যেন ওঁরা খেলছেন। অদ্ভুত নীরবতা। অদ্ভুত অভিব্যক্তি।

কয়েক মাস পরে ছবিটা বদলে গেল আচমকা। সীমার সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না আশার। মালিক এ নিয়ে বিব্রত। কেননা, সীমার কাছে কিছুদিন হল একজন পুরুষ আসেন। মালিককে যাঁর পরিচয় গোপন করেন সীমা। আত্মীয় বলেন। এবং সেই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিটি সীমার সঙ্গে মাঝেমাঝেই দেখা করতে আসেন। যে মাচার ওপর আশা ও সীমা দুজনে কাজ করেন সেখানে পুরুষটি সীমার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে থাকেন। আশা এ ঘটনা সহ্য করতে পারেন নি। এই নিয়ে সীমার সঙ্গে আশার বিরোধ বাধে। কেউ কাউকে আর সহ্য করতে পারেন না। কিছুদিন আশা নীচে নেমে সেলাই-ভাঁজাইয়ের কাজ করতে থাকেন। আশার মধ্যে চাপা ক্রোধ ও গুমরানি। একসময় মালিককে জানিয়ে দেন আশা। দুজনের মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়া হয়। মালিক বাধ্য হন, সীমাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিতে।

আশার মুখ থেকে শোনা যায়, সীমার কাছে যে পুরুষপ্রেমিকটি আসতেন, তিনি সম্ভবত হোমগার্ডের কাজ করতেন। ট্রেনের নিত্যযাত্রায় সীমার সঙ্গে আলাপ। সীমার প্রশ্রয়ে তিনি কারখানার মাচা পর্যন্ত ছুটে আসতেন।

এই কারখানা ছেড়ে দিয়ে সীমা অন্য কারখানায় কাজ নিলেন। আশা কুৎসার ঢঙে সীমার এই প্রেমকাহিনী শোনাতেন। সীমা কত খারাপ সেটা বোঝাতেন। আশা বলতেন, 'ওকে কত বুঝিয়েছি, কদিন ভালোবাসবে ? এক বছর, দু বছর ! তার পর পাখি উড়ে পালাবে। সীমা বুঝত না।' আশা বুঝতেন না, কোনো বিধবা কাউকে ভালোবেসে চিরদিনের সঙ্গী হতে পারেন। আশা কঠিন বাস্তব থেকে কথা বলেন। উপলব্ধি করেন। বিয়ে তিনিও করতে পারেন, এ কথা যখন তাঁকে বোঝানো হয়, তিনি বলেন, 'যে বিয়ে করল সে হয়তো আমাকে মেনে নেবে। কিন্তু আমার বাচ্চাদের ? কক্ষনো না !'

আশা প্রায় প্রায়ই ফিট হতেন কারখানার ভেতর। ওঁর হিস্টিরিয়া ছিল। মাঝে মাঝে কারখানার মালিক কর্মচারীরা বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসেন। তিনি বলেছেন, তাঁর নাকি স্বামী খুব ভালো ছিলেন। যতদিন বিয়ে হয়েছিল, একদিনও রেগে কথা বলেন নি স্বামী। একদিনও মারেন নি। আশার কথায় 'আমি যখনই বেরোই, আমার স্বামীর নাম স্মরণ করে রাস্তায় বেরোই। সকালবেলা উঠে স্বামীকে নমস্কার করি।'

সুলতানের কারখানায় সীমা ও আশাকে প্রথম দেখার দিনে আমার ডায়েরি :

১২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮

সাধনা কারখানায় আজ থেকে আসছে। অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। বাড়িতে বসেছিল দশদিনের ওপর। লক্ষ্মণদার কারখানার আর-একজন কর্মচারী জামাল, সেও কাজে এসেছে। তার জ্বর হয়েছিল। প্রতিমা চ্যাটার্জি বললেন বইয়ের 'সিজ়িন' পরিবর্তন হচ্ছে, খুব অসুবিধায় পড়তে হবে। পুজোর পরেই 'নাইট' (ওভারটাইম) পাওয়া যেত, সেটা না থাকলে অসুবিধা হবে। কারণ পুজোয় অনেক খরচ হয়ে যায়, পুজোর পরে ওভারটাইম করে অনেক সুবিধে হয়। তা ছাড়া গরমের সিজ়িন আসছে— একটানা বেশিক্ষণ কাজ করা অনুকূল নয়। কথায় কথায় বললেন, 'আটার দাম বেড়েছে জানেন ?' জানতাম না। আটার দর বাড়ায় তিনি চিন্তিত।

নাসিরউদ্দিন, সুলতান ও আরো কয়েকজনের কারখানায় 'নাইট' হচ্ছে। কারণ, আগামী পরশু 'বাংলা বন্‌ধ'। পরশু কাজ বন্ধ থাকবে বলে পরশুর কাজ আজ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। দপ্তরিপাড়ায় আজ দারুণ তৎপরতা।

সুরাফের কারখানার এক যুবককে জিজ্ঞাসা করলাম, কত 'জুশ' (ফর্মা) সেলাই করতে পারবেন আজ ? (সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা, ১ ঘণ্টা টিফিন বাদ দিলে ১১ ঘণ্টা)। তিনি জানালেন, আড়াই হাজার 'জুশ'।

সুলতানের কারখানায় দুজন মহিলা শ্রমিক বিকেল ৫টায় ছুটি করে চলে যাবেন। নীচে নেমেছিলেন সাড়ে ৪টার সময়। হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে যায়। ওঁরা ওপরে আর উঠলেন না। মাচায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। কোনো জানালা নেই। সুলতান বললেন, 'বাড়ির মালিক জানালা করতে দিচ্ছে না। এ পাড়ার মাস্তানদের টাকা খাইয়ে জানালা বসাব।'

সুলতান মার্কেটে বেরিয়ে গেলেন।

মহিলা দুজন (আশা ও সীমা) নীচে কারিগর ও সাগরেদদের কাছে বসলেন। একজনের বয়স ২৭/২৮, অন্যজনের ২৪/২৫। অবিবাহিত মনে হয়। (পরে জেনেছি বিধবা।)

দ্বিতীয় মহিলাকে (সীমা) জিজ্ঞাসা করলাম : 'আপনার সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলে বিরক্ত হবেন ?'

'না। কেন ?'

'আপনার বাবা মা আছেন ?'

'আছেন।'
'তা হলে আপনি রোজগার করতে বেরিয়েছেন ?'
'আমরা আমাদের জন্যে রোজগার করতে এসেছি।'
'বাবা-মার সংসারে টাকা দেন ?'
'না, আমরা আমাদের জন্যে টাকা খরচ করি।'
প্রথম মহিলা (আশা) : 'খাই দাই, জামাকাপড় কিনি।'
থমকে গেলাম। ধরতে পারছিলাম না ব্যাপারটা। বললাম : 'কিছু লুকোচ্ছেন মনে হচ্ছে।'
প্রথম মহিলা (আশা) জানালেন ওঁদের দুজনের স্বামীই মারা গেছেন। অকালমৃত্যু।
জিজ্ঞাসা করলাম : 'আপনারা আর বিয়ে করছেন না কেন ?'
প্রথম মহিলা (আশা) : 'মেয়েছেলের একটাই বিয়ে হয়।'
'কেন, বিয়ে তো করা উচিত ছিল।'
দ্বিতীয় মহিলা (সীমা) : 'আবার বিয়ে!'
প্রথম মহিলা : 'মেয়েছেলেদের একবারই বিয়ে হয়।'
বললাম : 'আপনাদের তো বয়স কম, বিয়ে না করে থাকবেন কেন ?'
প্রথম মহিলা : 'কে বিয়ে করবে ? যাকে বিয়ে করব, সে হয়তো আমার বাচ্চাদের দেখতে পারবে না। দুদিন পরে ছেড়ে দেবে।'
আচমকা বিয়ের প্রশ্নে দুজনেই মানসিকভাবে দারুণ নাড়া খেলেন। চোখে মুখে সেই ভাবনার অভিব্যক্তি দেখলাম। নীরবতারও।

এইসব বিধবারা, বিধবার সন্তান বয় (শিশু শ্রমিক)-দের ব্যাপারে অপত্যস্নেহ বোধ করেন। এই স্নেহবোধ নিহিত থাকে। তাকে সচরাচর দেখা যায় না। সম্পর্ক ও প্রশ্রয়ে থাকার ব্যাপারটা দেখা যায় না। এড়িয়ে চলেন। তার পেছনে মনস্তাত্ত্বিক কারণ নিশ্চয়ই কাজ করে। নিজের পুত্র বিধবার সন্তান এবং নিজে বিধবা, এই ব্যাপারটা এই পরিচয় এড়িয়ে থাকতে চান। এক পলায়নপরতা থাকে। বয় কাজে ভুল করলে, ওস্তাদ মারেন। তখন এই বিধবা শ্রমিকদের নিষ্ঠুরভাবে বলতে শোনা গেছে, 'যার বাপ নেই, সে মন দিয়ে কাজ করবে না কেন ?' বয়কে মারধোর বেশি করা হয়ে গেলে তবেই এইসব বিধবাদের জননীহৃদয় প্রকাশ হয়। তখন 'ওস্তাদ' ও কারিগরদের বকতে দেখা যায়। 'মারেন কেন, আপনাদের বাড়িতে কি বাচ্চা নেই ?' তখন ওস্তাদ বা কারিগরকে বলতে শোনা যায়, 'এটা বাড়ি নয়, কাজের জায়গা।' সেখানেও সম্মতি আছে এইসব মহিলাদের। মার-খাওয়া শিশু শ্রমিকদের এই সময়ই প্রশ্রয় দেন তাঁরা। হাত ধরে টেনে নিয়ে যান। কান্না থামান। এবং তাদের বকাঝকাও করেন। শিশু শ্রমিকদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের জটিলতা প্রচুর।

আমরা অনেকের জীবনকথা নথিভুক্ত করি। তাঁরা তাঁদের বয়ানে বলে যান, আমরা তাকে আত্মকথার মতো লিখে নিই। এঁরা সাধারণত বলতে চান না নিজেদের কথা। আমরা তাঁদের জীবনবৃত্তান্ত শোনার ভেতর দিয়ে কিছু বোঝার চেষ্টা করেছিলাম মাত্র। কিছু অতীত এসে পড়ে। বাকিটুকু সাম্প্রতিকের বেঁচে থাকা। ব্যাখ্যাবিশ্লেষণে না গিয়ে সীমা দাসের আত্মজৈবনিক কথন তুলে ধরছি। যেহেতু সীমা দাসের কারখানার জীবনে নানা পটপরিবর্তন হতে দেখেছি। এই পরিবর্তনের আগে যে-জীবন সেই সময়ের আত্মকথন :

আমার নাম সীমা দাস। বাড়ি মসলন্দপুর। বাবার নাম বিমল বসু। বাবা এখন কিছু করেন না। আমরা ৪ বোন ৩ ভাই। আমার বয়স এখন ২৮ বছর। মায়ের নাম পদ্ম বসু। বড়ো ভাই দোকানে দোকানে ওষুধ সাপ্লাই করে। ওর ওপরই সংসারের সমস্ত ভার। আমি ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়ি। আমার পরে এক ভাই ছিল, সে তখন মারা যায়। রক্ত আমাশা হয়েছিল। আমার ভাইয়ের বয়স

হয়েছিল ১০ বছর। আমার তখন ১৩/১৪ বছর বয়স। ভাইটি মারা যাবার পর আমার মায়ের বাচ্চা হয়। সেই সময় সংসারে কাজকর্ম করার লোক ছিল না। আমি তখন বড়ো। আমাকে সংসার দেখাশোনা করতে হয়।

আমার মেজোভাই স্কুল ফাইনাল পাস করে। চাকরি করছে ৮ বছর হল। বাবা ১০ বছর চাকরি ছেড়েছে। বাবা চাকছি ছেড়ে বাড়িতে জায়গাজমি দেখাশোনা করে। ৫ কাঠার ওপর বাড়ি। ৩ বিঘে ধানজমি। কল, বাথরুম আছে। পাকা বাড়ি। ২টি ঘর, সামনে বারান্দা।

আমার বিয়ে হয় ১২ বছর আগে। দেখাশোনা করে বিয়ে হয়। আমার স্বামী আমাকে বিয়ের আগে দেখেন নি। শ্বশুর দেখেছিলেন।

আগে আমার শ্বশুরের কোনো সন্তানাদি হয় নি। আমার স্বামীকে মানুষ করেছিলেন। পরে কিন্তু ৪৫ বছর বয়সে শাশুড়ির গর্ভে সন্তান আসে। পুত্রসন্তান হয়। জয়নগরে আমার স্বামীর বাড়ি ছিল। আমার শ্বশুর আলমবাজার জুটমিলে চাকরি করতেন। এক সহকর্মীর ৫/৬ বছরের সন্তানকে নিয়ে মানুষ করেন। স্বামীর আসল বাবা-মায়ের সঙ্গে কোনো যোগাযোগই ছিল না। আমার শ্বশুর ব্যানার্জি, আমার স্বামী দাস, আমি বসু। শ্বশুর, আমার স্বামীকে নিজের ছেলের মতোই দেখত। আমাকে এখন সে-রকমই দেখে। আমি শ্বশুরবাড়িতেই থাকি। শাশুড়ির ছেলে হয় যখন, তখন আমার স্বামীর বয়স ১৯/২০। কিন্তু কোনোরকম মন্দচোখে দেখত না আমার স্বামীকে। এখনো দেখে না। আমার ছেলেপিলে আছে।

আমার শ্বশুরমশাই চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। ওঁর ছেলেটি স্কুল ফাইনাল পাস করে ঘরে বসে আছে। দেওরের বয়স ২২ বছর। চাকরি অনেক খুঁজছে, হচ্ছে না। চাকরির জন্য এক জায়গায় ৪ হাজার টাকা ঘুষ দিল, তবুও হল না। মসলন্দপুরে এক ভদ্রলোকের কাছে। ইলেকট্রিসিটি বোর্ডে।

আমার বিয়ে হবার ৮ বছর পরে আমার স্বামী মারা যান। আমার স্বামীর সাইকেল মেরামতির দোকান ছিল। দোকানটি শ্বশুরমশাই নিজে করে দিয়েছিলেন। সাইকেল দোকানে ছোটোবেলা থেকে রেখে, আলমবাজারে মেরামতের কাজ শিখিয়েছিলেন। আমার বিয়ের আগেই শ্বশুর চাকরি ছাড়েন। তখন আমার স্বামীর টাকাতেই সংসার চলত।

আমার ১ ছেলে ১ মেয়ে। ছেলে বড়ো, ৯ বছর বয়স। মেয়ের বয়স ৪ বছর। ছেলে ক্লাস থ্রিতে পড়ে। ছেলেমেয়েকে শ্বশুর শাশুড়ি দেখাশোনা করে— আমি যখন কাজে আসি। আমার দেওরটি এখনো বিয়ে করে নি।

আমার স্বামীর ব্লাড ক্যানসার হয়। অসুখ ধরা পড়ার এক সপ্তাহ পর স্বামী মারা যায়। এক সপ্তাহও লাগে নি। সোমবারে শুধু বমি হচ্ছিল, গায়ের মধ্যে জ্বালা হচ্ছিল। বৃহস্পতিবার মারা যায়। এক্স-রে করে জানা যায়, এই অসুখ হয়েছিল। আমার স্বামী মারা যেতে খুব দুঃখ পেয়েছিল শ্বশুর। এখনো আমাকে তাঁর নিজের পুত্রবধূ হিসেবেই পরিচয় দেন। স্বামী মারা যাওয়া থেকে এই ৪ বছর শ্বশুরবাড়িতেই আছি।

স্বামী মারা যাবার পর বাড়িতে কান্নাকাটি করছিলাম। সংসারে অশান্তি। তখন আমার এক দিদির সঙ্গে এখানে কাজে আসি। স্বামীর জন্য কান্নাকাটি করতাম। বাড়ি ভালো লাগত না। মন টিকত না, তাই কাজে আসি। দারিদ্র্যের জন্য আসি নি। আমার এই সামান্য পয়সায় সংসার চলে না। ওরাই চালায়। এখানে দশজনের সঙ্গে থাকি। মন ভালো থাকে। কোথাও ভালো লাগে না। তবু এখানে কাজের মধ্যে থাকি। কাজ করতে হয় বলে ভুলে থাকি।

৯ মাস হল এখানে কাজে এসেছি। কাজে নিয়ে আসে আমার মাসতুতো দিদি। সেও বিধবা। বাড়িতে অসহ্য লাগত। এখানে ভুলে থাকি। কিন্তু মনের দুঃখ বেদনাকে কিছুতে সরাতে পারি না। ৯ মাস আগে যখন কাজে ঢুকি ৩০ টাকা সপ্তাহ পেতাম। ২ মাস পর ৫০ টাকা সপ্তাহ হয়। এখনো

সপ্তাহে ৫০ টাকা মতো হয়। আমরা সকাল ৯টা থেকে ৫টা পর্যন্ত কাজ করে বাড়ি ফিরে যাই। দাদার কাছে (মালিক) ফুরনে কাজ করি না, রোজে। দাদা আমাদের যা বলেন করি। দাদা আমাদের ঠকানও না, জেতানও না। ২দিন কাজে না এলেও মাইনে দেন।

আমার মাইনে ছেলের প্রাইভেট টিউশনের খরচে, বইখাতা কলমে লাগে। আর আমার হাতখরচে লাগে। প্রতি সপ্তাহে ২০/৩০ টাকা সংসারে দিই। রোজগারের টাকায় নিজের সায়া ব্লাউজ জামাকাপড় আর ছেলেমেয়েদের জামাকাপড় কিনি।

আমাদের সংসারে ৬ জন। ৪ জন প্রাপ্তবয়স্ক, ২ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক। সপ্তাহে চাল লাগে ১০ কিলোগ্রাম ১০×৫ =৫০টাকা। মাসে ১৩ টাকার জ্বালানি (গুল) লাগে। শ্বশুরের ডাক্তার-খরচ আছে। ভালো খরচ। ব্লাডপ্রেসারের রোগী।

ধান পাট তিল হয় জমিতে। ব্যাঙ্কে কিছু টাকা আছে শ্বশুরমশাইয়ের। মাসে মাসে কিছু টাকা তুলে সংসার চলে। শ্বশুরের সার্ভিসের টাকা। স্বামীও ওই অ্যাকাউন্টে টাকা রাখত।

খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে কোনো নিষেধ মানি না। মাংস আগে থেকে খেতাম না। এখনো খাই না।

সকালে বাড়ি থেকে সাধারণত কিছু খেয়ে আসি না। শুধু চা কিংবা হরলিকস গুলে খেয়ে আসি। সঙ্গে টিফিন আনি। এখানে ৯টার সময় টিফিন করি। পরোটা রুটি কলা আনি। দুপুরে ভাত খাই। দুপুরের জন্যে ভাতও নিয়ে আসি। সাধারণত সেদ্ধভাত খাই। কখনো আলুসেদ্ধ আনি, কখনো ডিম সেদ্ধ, কখনো বা মাছভাজা আনি। মাংস খাই না বলে ভাতের মধ্যে একটু ঘি নিয়ে আসি।

বাড়িতে রান্না করে শাশুড়ি। মাছ হয়, মাছ না হলে ভাজা, তরকারি হয়।

সহকর্মীদের সঙ্গে একতাভাব নিয়ে থাকি। কাজের সময়ই এদের সঙ্গে দেখা হয়, আর দেখা হয় না। দাদা (কারখানার মালিক) আমাদের বাড়ি গিয়েছিলেন। আমার জ্যাঠতুতো ননদদের একটা স্টল আছে হাওড়ার হাটে। স্টলটা কিনে নিয়ে সুলতানদা (মালিক) নিজের ভাইকে বসাবে বলে কথা বলতে গিয়েছিলেন।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার মধ্যে বাড়ি চলে যাই। বাড়ি গিয়ে স্নান করি বা হাত-পা ধুয়ে খেয়েটেয়ে নিই। খাওয়াদাওয়া ৯টা-সাড়ে ৯টায় হয়ে যায়। বাচ্চারা আর পুরুষরা আগে খেয়ে নেয়। তার পরে আমি আর শাশুড়ি খাই। সাড়ে দশটার মধ্যে শুয়ে পড়ি। আমার নিজস্ব ঘর আছে। ভোর ৫টার সময় ঘুম থেকে উঠি। উনুনে আঁচ হয়তো দিলাম, হয়তো রান্না কিছুটা করলাম। ৬টা ৫০-এর ট্রেন ধরি। বাড়ি থেকে স্টেশন ১০ মিনিটের হাঁটাপথ।

ছেলেমেয়েদের জন্য ভাবি। তাদের লেখাপড়া করাব। তাদের বাবা নেই। ছেলেকে বেশিদূর পর্যন্ত পড়াব। মেয়েকে পড়িয়ে গানবাজনা শিখিয়ে ভালো জায়গায় বিয়ে দিয়ে দেব। ছেলেমেয়েদের ভালো সব মায়েরাই চায়, সে কি হবে আমার কপালে ? এখানে আমি কাজে আসি, ওরা ঠাকুমার কাছে থাকে। ওদেরই ন্যাওটা। ছেলে মেয়ে দুদিন আমাকে না দেখলেও কোনো কথা নেই। ওদের কাছেই ঘুমোয়। ছেলেমেয়েদের নিজে নিয়ে শোয়ার জন্য কোনো জোর করি না।

ঘুম আসতে দেরি হয়। তখন স্বামীর চিন্তা করি। কীরকম ছিলাম, কীরকম হলাম। এই সব। জীবনে হিসটিরি অনেক। খুব কষ্ট করে মানুষ হলাম। বিয়ে হল। স্বামী ছাড়া আর কী মেয়েদের জীবনে ? ১০ বছরও স্বামীকে পেলাম না। আমাদের দুজনের মধ্যে এমন একতা ছিল ! ৮ বছরের মধ্যে আমার সঙ্গে কোনোদিন রেগে কথা বলে নি। সে মানুষটাকে ভুলতে পারি ! আমার পিসতুতো বোনেরা আমার থেকে বয়সে বড়ো। তাদের এখনো বিয়েই হয় নি। আর আমার এর মধ্যে বিয়ে সংসারধর্ম, ছেলেপুলে হয়ে গেছে। এসব কি বলার লাগে ! এ তো আপনি বুঝতেই পারবেন !

এখানে নাইট (ওভারটাইম) করি না। আমাকে যেমন দাদা (মালিক) না এলেও মাইনে ঠিক ঠিক দেন, তেমনি আমিও দেখি। দেখলাম, নীচে লোক কম, কাজ আটকে যাচ্ছে, কাজ করে দিয়ে আসি। এখানে আমার সহকর্মী আশা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল ৩ মাস আগে। মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে যায়।

দাদা না থাকলে কাজে আমরা ঢিলে দিই না।

এই অঞ্চলে যেসব মহিলারা কাজ করে তাদের অনেকের সঙ্গে ভাবসাব আছে। ছুটির পরে ওদের সঙ্গে দেখা হয়। স্টেশনে কথা হয়। আমরা নিজেদের মধ্যে দুঃখের কথা বলাবলি করি। রঙিন শাড়ি পরি, মাছও খাই, শ্বশুরবাড়ি থেকে কোনো বাধা আসে না।

আমার শ্বশুর-শাশুড়ি চান, ৫টায় ছুটি হয়ে যায়, ৭.৩০-এর মধ্যে আমি যাতে বাড়ি ফিরে আসি। কোথাও যাওয়া, সিনেমা দেখা পছন্দ করেন না। ট্রেন লেট হয়েছে, বাড়ি ফিরতে দেরি হয়েছে, আমার শ্বশুর স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে এসেছেন। শ্বশুর শাশুড়ি কখনোই বলেন না, তোমার কম বয়স, আর-একটা বিয়ে করো। আমি বিয়ে করতে চাই না আর। হয় না কি এটা ? সবার মন তো সমান নয় ! আমার নিজের থেকে বাধা আসছে। কী দরকার ! এখন কি তা হয় ! আমার দুটো বাচ্চা আছে। তাদের ভবিষ্যৎ আছে। আমার সুখের জন্য বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে চাই না। আমি এসবের জন্যেই পারি না।

এর মধ্যে কাউকে আমার মনে লেগেছে, কাউকে আমার ভালো লাগে, কাউকে ভালোবাসি— তা আমার করবার কিছু আছে ? (জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কাউকে মনে লেগেছে কিনা, ভালোবেসেছেন কিনা ?) আমি এ-ব্যাপারে খুব কষ্ট পাই। কাউকে বলাও যাবে না। স্বাভাবিক, কষ্ট পেতে হয়। (বললেন, কাউকে ভালোবাসেন। দুজনের দেখা হবার আকুলতা আছে।)

রেডিয়ো বেশি শুনি না। নাটক যাত্রা ছায়াছবির গান হলে রেডিয়ো শুনি। টিভি দেখি না। সবাই বলে দুঃখ লাগলে সিনেমা দেখতে। আমার আবার সিনেমা দেখলে দুঃখ হয়। সংসারের কথা নিয়েই তো সিনেমা হয় ! এইজন্যে যাই না, দেখি না।

রবিবারে বাড়িতে থাকি। কাচাকুচি করি। বাড়ির কাজ করি। বাপের বাড়িতে ৪/৫ মাস পরে যাই। গেলে রাত্রে থাকি না। রবিবারে আমার সব মেয়ে বন্ধুবান্ধবরা আসে। ওরা কেউ কেউ বাড়িতে সেলাই মেশিনে কাজ করে, টিউশনি করে। ওদের সঙ্গে কথা বললে দুঃখ জাগে, দুঃখ সরে, দুটোই হয়।

৯ মাস এখানে কাজ করছি, তার মধ্যে ১৪০/১৯০ টাকার শাড়িও কিনেছি।

ছুটির দিনে ছেলেমেয়েদের পরিষ্কার করি। ছুটির দিনে নিজে রান্না করার শখ নেই।

স্বামী যখন থাকত, শিব, লক্ষ্মীর ব্রত করতাম। বাড়িতে এখন লক্ষ্মীপুজো করি প্রতি সপ্তাহে। গুরু বালক ব্রহ্মচারী। এক সপ্তাহ লেকটাউনে বসেন, এক সপ্তাহ সুখচর আশ্রমে বসেন। আমি বালক ব্রহ্মচারীর কাছ থেকে মন্ত্র নিয়েছি। একবারই দেখা করে এসেছি। কানে কানে একটা কথা বলেছিলেন, সে কথা বলতে নেই। বাংলাতেই বলেছিলেন।

পোশাকে-আশাকে বাইরে থেকে এঁদের বিধবা বলে ধরা যাবে না। অবিবাহিতা মনে হবে। হাতে শাঁখা নোয়া নেই। কপালে সিঁদুর নেই। পরনে ছাপা শাড়ি। সুতি অথবা সিনথেটিক। কাঁধে ফোমের ব্যাগ। সামান্য সাজগোজও করে থাকেন। যে শাড়ি পরে আসেন সে শাড়ি কাজের সময় খুলে রাখেন। কারখানায় থাকে আটপৌরে শাড়ি। শাড়ি বদলে নিতে দেখা যায় প্রতিদিন। মাচার ওপর উচ্চতা বড়ো জোর তিনফুট। ওখানে শাড়ি বদলাবার অসুবিধে। ফর্মা ও বইয়ের আড়ালের ভেতর বা কাটিং মেশিনের আড়ালে এঁরা শাড়ি বদলাবার

কাজ নিত্য দুবেলা করে থাকেন। বাড়ির মেয়েরা যেমন একটু আড়াল খুঁজে নেন, তেমনটা দেখায়। এঁরা মালিকের সঙ্গে আত্মীয়তা পাতাবার ব্যাপারে উৎসাহী। বাড়ির কোনো অনুষ্ঠানে মালিককে নেমন্তন্ন করেন। মালিক বাড়িতে গেলে খুব খুশি হন।

একটা কারখানায় মালিক শ্রমিক হিন্দু মুসলমান মিলিয়ে মিশিয়ে থাকেন। কিন্তু শ্রমের ঐক্যে সাম্প্রদায়িক ব্যাপারটা নিরুদ্দেশ থাকে। সহজ ও স্বচ্ছন্দ তাঁদের মেলামেশা। এমন-কি নারীপুরুষ মেশেন সহজ স্বাভাবিকতায়। কোনো জড়তা নেই। বাঁধাইশিল্প মুসলমানদের জাতব্যাবসা। হিন্দুদের এইসব কাজে নিযুক্ত করার ব্যাপারে মুসলমান মালিক ও ওস্তাদদের উদারতা মনে রাখবার মতো। যাঁরা এখানে এসে পড়েন, তাঁরা একেবারে নিঃস্ব, নিরন্ন। তাঁদের আশ্রয় দিয়ে কাজ শিখিয়ে মুসলমান মালিক ও ওস্তাদেরা উদার মনের পরিচয় দিয়েছেন। এখন শ্রমিকের মধ্যে অর্ধেক হিন্দু অর্ধেক মুসলমান। শ্রমিক গঠনটাই বদলে গেছে। হিন্দু শ্রমিকরা খুবই শ্রদ্ধাশীল মুসলমান মালিক ও ওস্তাদদের ব্যাপারে। কৃতজ্ঞতা তাঁরা প্রকাশ করেন। যেসব হিন্দু শ্রমিক, শ্রমিক থেকে কারখানার মালিক হয়েছেন, তাঁরা তো এঁদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এখানে এলে মনে হবে হিন্দু মুসলমানে কোনো বিভেদ নেই। এঁরা যে দুই সম্প্রদায়ের, এই ভেদরেখাটা অন্তর্হিত হয়ে যায়। কিছুটা অর্থনৈতিক স্তরের চাপে আলগা হয়ে যায় ধর্মসম্প্রদায়ের ভেদ-বিভেদ। আবার কিছুটা শ্রমগত সান্নিধ্যে সম্পর্কে সহমর্মিতায় সংঘর্ষে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায় বিভেদের ঘেরাটোপগুলি। মূলস্রোতের জীবনের সঙ্গে এঁদের জীবনের অসংগতি এ-ব্যাপারটিতেও দেখা গেল। যদিও ব্যাপারটা ইতিবাচক। এমন-কি গত ৯২-এর দাঙ্গায় মুসলমান মালিক বেশ-কিছু হিন্দু শ্রমিককে ·দিনের সময় নিরাপদ আশ্রয়ে নিজের কারখানায় রেখেছেন। খাইয়েছেন। পুরোনো অন্যান্য দাঙ্গার সময়েও এরকম ঘটেছে, এ কথা বাঁধাইশিল্পের শ্রমিক-মালিকদের মুখ থেকে শোনা যায়।

বহুদিন বই বাঁধাইশিল্পের সঙ্গে ছিলেন তৈফুর রহমান। বাড়ি বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলার সেলিনাবাদে। গত বছরও ছিলেন। বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। বয়স নব্বইয়ের মতো। পুরোনো মানুষ। এই শিল্পের অনেক দিনের ইতিহাস গায়ে মেখে এসেছেন। খুব সজ্জন ও বন্ধুবৎসল মানুষটি। প্রকাশক পাড়ায় সম্মান ও কদর খুব। মাত্র দুজন কর্মচারী রেখে কাজ করতেন। ওই বয়সে নিজেও কাজ করতেন। এমন-কি তাঁর কাছে দিল্লি থেকে ফর্মা আসত বাঁধাইয়ের জন্য। পরিচ্ছন্ন ও নিখুঁত কাজ করার জন্য বাজারে তিনি কিংবদন্তি। কিন্তু কারখানাটি ছিল তাঁর একেবারে ছোটো। কারখানা নয়, কাজ দিয়েই তিনি মান পেতেন। একসময় বাঁধাইশিল্প পূর্ববঙ্গীয় মুসলমানদের যে ছিল, তারই নমুনা, তৈফুর রহমান। এখানে ব্যাবসা করতেন, বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গেই। গত বছর তিনি বাংলাদেশে ফিরে যান, এবং মারা যান। যেমনভাবে আর-পাঁচটা বছরের মতো স্বদেশে ফিরে যেতেন, তেমনই গিয়েছিলেন। গত বছর যাওয়াটা তাঁর শেষযাত্রা হয়েছিল।

তিনি এখানে ব্যাবসা যে করতেন শেষের দিকে। থাকতেন যে, সংসারের প্রয়োজনে এই বয়সে কাজ করতেন, এমনটা ভেবে নেওয়া যায়, কিন্তু তা সত্যি নয় তৈফুরের ক্ষেত্রে। এই বই ও ফর্মার গন্ধ, এখানকার মানুষদের সঙ্গে সম্পর্কের টানই তাঁকে মৃত্যুর কয়েকমাস আগে পর্যন্ত রাখতে পেরেছিল। তিনি চলে যেতেন, আবার ঠিক ফিরে আসতেন।

তাঁর কাছ থেকে অতীত বাঁধাইখানার একটা আন্দাজ পেতে চেয়েছিলাম। কখনো তিনি শ্রমিকের জবানিতে কথা বলেছেন, কখনো মালিকের। আবার কখনো ইতিহাস রচয়িতার মতো কথা বলেছেন, মন্তব্য করেছেন :

> আমি খুব ছোটোবেলায় এখানে এসেছি। এই কাজে ঢুকেছি। মামাদের কারবার ছিল এখানে। বাঁধাই কারখানা ছিল। তারা কারবার তুলে দিয়ে চলে গেছে। বরিশালে। ওখানে গিয়ে প্রেস ও বাঁধাইখানা করেছে। ছোটোমামা আমাকে এখানে নিয়ে আসে। তখন ১০/১২ বছর বয়স ছিল। মামাদের কাছে কাজ করে মাইনে পেতাম না। নিজেদের কারবার। ওই খাওয়া-পরা পেতাম।

* * *

প্রথম জীবনে বাঁধাই কারখানায় যে কাজ করতাম, তখন এই কারবারটা ভালো ছিল। এই পুরো পাড়াতে মুসলমানদের কারখানা ছিল। এইসব মুসলমানরা বাংলাদেশী মুসলমান। এদের সঙ্গে যারা কাজ করত, তারাও বাংলাদেশী মুসলমান। এখন হিন্দুরা ঢুকেছে। তখন এই কারবারকে ঘেন্না করত। এখন তো একেবারে ঝুঁকে পড়েছে। তখন, শ্রমিক ছিল শ্রমিক, মালিক ছিল মালিক। এখন কর্মচারীরা এমন ব্যবহার করে যে মালিকও কর্মচারীর মতোই। ভোর ৬টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত একরোজ কাজ হত। মাইনে বেশি ছিল না। তখন ব্রিটিশ সরকারের সময়, জিনিসপত্রের দাম কম ছিল।

তখন এখানে রাস্তায় গ্যাসলাইট জ্বলত। কারখানায় হ্যাজাক জ্বলত। কারবাইডের বাতি জ্বলত। পানি দিয়ে রাস্তা ধুয়ে যেত সরকারের লোক।

এই যে শ্রমিকরা এখন ৮ ঘণ্টা কাজ করেন, সেটা আমরা, আমিই করেছি। আমি লেবার আন্দোলনের অ্যাসিস্টেন্ট ছিলাম। আমাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মিসেস প্রভাবতী দাশগুপ্ত, পিএইচ. ডি.। সেক্রেটারি নয়ন খাঁ। বাঁধাই মালিক গুন্ডা লাগিয়ে আমাকে মারধোর করে। মাথায় দাগ আছে এখনো। আমিও মারতে পারতাম, কিন্তু মারি নি। আমি লেবার তো! আমাকে টাকার লোভও দেখিয়েছিল। তোমাকে এত টাকা দিচ্ছি, বাড়িতে ৬/৭ বছর দেশে থেকে এসো। আমি যাই নি।

* * *

আমি তো এই কারবার জানতাম না! অনেক কষ্ট করতে হয়েছে আমাকে। এই ঘরটা আমি ভাড়া নিলাম। প্রথম কারখানাটা পাশে ছিল। এটা দ্বিতীয় কারখানা। প্রথম কারখানা-ঘরটা ৬৪-র রায়টে হাতছাড়া হয়। আমি দেশে চলে যাই। আমার পার্টিরা এসে মেশিন খুলে নিয়ে বলে যে তুমি চলে যাও। আমাকে বর্ডার পার করিয়ে দিয়ে বলে যে, শান্তি হলে এখানে এসো। এই পার্টি হলেন, এস. কে. পালিত। তার পর একটা কারখানায় এসে আশ্রয় নিই। তার পর বর্তমান কারখানাটি নিই।

প্রথম পার্টি আমার এস. কে. পালিত। তার পর আমার কাজের সুনাম হয়, তখন আমাকে পার্টিরা ডেকে ডেকে কাজ দিয়েছেন। তার পর আনন্দবাজারের কানাই সরকার, সুনীল ব্যানার্জি, নির্মল গোস্বামী, এঁরা তিনজনে মিলে 'ত্রিবেণী' নামে একটা প্রকাশনা খুললেন। ওঁরাই আমাকে নানা জায়গায় পরিচয় করিয়ে দেন। মিত্র ও ঘোষের সঙ্গে পরিচয় হয়।

কানাই সরকার আমার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করতেন। তিনি পার্টি, আমি বাইন্ডার। গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুমথনাথ ঘোষের সঙ্গে এই সূত্রে আলাপ হয়। গজেনবাবুর কাজ তো এখনো করছি। মিত্র ও ঘোষের।

'ত্রিবেণী' হয় স্বাধীনতার পরে। সমরেশ বসুর সঙ্গেও আলাপ হয়। উনি ওঁর বই 'ত্রিবেণী'তে দিতেন। আমি বাইন্ডিং করতাম। এইজন্য আলাপ। সমরেশ বসুর ছেলে দেবকুমার বসু, ওঁর কাজও আমার কাছে হয়।

* * *

হটপ্রেসের বিলিতি মেশিন আমার। এই মেশিনটা থেকে নকশা নিয়ে কারবার করেন এক বাঙালি। তিনি হটপ্রেস মেশিন তৈরি করেন। কোম্পানির নাম, জি. সি. নন্দী অ্যান্ড সন্‌স, ইঞ্জিনিয়ার, হাওড়া।

এখন আমার পাসপোর্ট নেই। আমি ইন্ডিয়ান। যাই, খুব কম— বাংলাদেশে। এবার আশা করছি, ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্ট করে যাব। ভারতের নাগরিকতা পাওয়ার জন্য আমি ভারত সরকারের বিরুদ্ধে কেস করি। প্রথমে সিটি কোর্টে, পরে হাইকোর্টে এবং শেষে সুপ্রিম কোর্টে কেস করি। ১৮/২০ বছর এই কেস চালাই। সুপ্রিম কোর্টে আমাকে একবারই যেতে হয়েছে। পরামর্শ দিয়ে একমাত্র উকিল ছাড়া কেউ সাহায্য করেন নি। আমার একটা বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া পাসপোর্ট ছিল, সেটা ভারত সরকার সিজ করে আমাকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিলেন। তার পর এখানে এসে হাইকোর্টে

কেস করি। হাইকোর্ট আমাকে স্টে অর্ডার দিল। উকিল হাসান ইমাম আসকা। ওঁর হয়ে সিদ্ধার্থশংকর রায় একবার দাঁড়িয়েছিলেন। তখন উনি ১০০০ টাকা নিতেন। আমি হাতে ধরে ৫০০ টাকা দিই। তখন উনি তামাশা করে বলেছিলেন, আপনি সিটিজেনশিপ পাবেন না, আমি আটকে দেব।

বাঁধাইশিল্পে প্রধানত ছোটো কারখানাগুলিতে মালিক কতখানি মালিক, শ্রমিক কতখানি শ্রমিক এ ব্যাপারটাতেও অসংগতি ও জটিলতার শেষ নেই। আমরা তৈফুর রহমানের আত্মকথনের ভেতর যা আঁচ করেছি। এখানে মালিক শ্রমিক ভেদরেখা কম। ছোটো কারখানার মালিক একজন শ্রমিকের থেকে সামান্য অর্থনৈতিক সচ্ছলতা পেয়ে থাকেন। কারখানার ভেতর মালিকটিকে চেনাই যাবে না। একসঙ্গে রান্না করে খাওয়া, একসঙ্গে কর্মচারীদের সঙ্গে কাজ করা এসবের ভেতর চেনা যাবে না। খাওয়ার তফাত যেমন নেই, তেমনি কাজের তফাত দিয়ে চেনা যাবে না। এইসব মালিকদের আপাত-শ্রমিক স্বভাব থেকে যায়। পোশাকে ও কাজের ভেতর। মানসিকতায়ও থাকে। এসব মালিকরা শ্রমিক থেকে মালিক হয়েছেন, যেহেতু।

এঁদের মালিকত্ব স্বভাবের প্রকাশ ঘটে খুবই সন্তর্পণতায়, গোপনে। আপাতদৃষ্টিতে তা দেখা যায় না। সেটা কাজের প্রক্রিয়ার ভেতর নিহিত থাকে। সে ব্যাপারটা একমাত্র কর্মচারীরা অনুভব করে থাকেন। দ্রুত কাজ করানোর ব্যাপারে মালিকের তৎপরতা থাকে। যেমন একঘণ্টা টিফিনের নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেলে, কর্মচারীরা দু-চার মিনিট দেরি করতে থাকলে, মালিক নিজে কাজে বসে যান। আর কাজটা দলবদ্ধতায় হয়! সে কারণে কারো আর ফাঁকি দেবার উপায় থাকে না। কিংবা কাজের ৮ ঘণ্টার নির্ধারিত সময় কেটে গেছে। অথচ সামান্য কাজ পড়ে থাকছে। তখন মালিক তৎপরতায় আরো খানিকটা বেশি কাজ করিয়ে নেন। আবার এই কাজের প্রক্রিয়ায় মালিককে শুধু শ্রমিক হয়ে উঠতে দেখা যায়। দলবদ্ধ কাজে মালিক কাজ দ্রুত করতে না পারলে ওস্তাদ কারিগর আর-পাঁচটা শ্রমিককে যেমন ধমক দেন, মালিককেও দেন। অদ্ভুত জটিলতা মালিক-শ্রমিক পরিচয়ের ভেতর। মালিকের হাতের কাছে কাজের কোনো উপকরণ বা যন্ত্রপাতি থাকলে, আদেশের ঢঙে শ্রমিকরা বাড়িয়ে দিতে বলেন। কাজের ভেতর নানা কথা চলে। তাতে কাজের ব্যাঘাত হয় না। ইয়ার্কি তামাশা চলে। মালিক-শ্রমিকের অংশগ্রহণ সমানরকম হয়। অপরিসর কারখানা। বই ও ফর্মায় ভর্তি হয়ে যায়। তার মধ্যেই শ্রমিকদের বসার জায়গা তৈরি করে নিতে হয়। নানা সময়েই বসার অবস্থান বদলে যায়। হয়তো মালিকের পাশে কোনো শ্রমিকের জুতোজোড়া আছে। ওই শ্রমিকটি গিয়ে আনবেন, তেমন পরিসর নেই। তখন মালিকই শ্রমিকের জুতোজোড়া বাড়িয়ে দিচ্ছেন।

আবার, কারখানার যিনি মালিক তাঁর কারখানার শ্রমিকরা, অতীত দিনে মালিকের সহকর্মীও বটে। সুলতানের কারখানায় এখন মোশারফ শ্রমিক। এক সময় ওঁরা একই মালিকের ঘরে কাজ করেছেন। মালিক অশিক্ষিত, শ্রমিক পড়াশোনা জানেন। শ্রমিকটিকে দিয়ে কিছু পড়িয়ে নেবার দরকার হলে পড়িয়ে নেন মালিক। শ্রমিকরা কাজে ভুল করলে মালিক বকাঝকা করেন। শ্রমিক বকুনি হজম করেন। মালিক ফণিভূষণ দেবনাথ বলেছেন, 'কর্মচারীরা কাজ ভুল করলে কী করব আর। আমি তার থেকে খেসারত নেব কী করে ? কাজে ভুল হয়। আমিও তো কর্মচারী ছিলাম!'

যেমন, এক শ্রমিককে জিজ্ঞাসা করি, শ্রমিকরা ঠেকায় পড়লে মালিকরা কত টাকা পর্যন্ত অগ্রিম দিতে পারেন ? শ্রমিকটি বলেন, 'মালিকের অবস্থা তো সবই জানি। কত চাইলে পাব, তাও জানি।' অন্য একজন মহিলা শ্রমিককে একই প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন 'বেশি টাকা অ্যাডভান্স নিলে দুদিন আগে বলে রাখতে হবে। মালিকও জোগাড় করবে।' এ থেকে বোঝা যায়, মালিকের অর্থনৈতিক দিকটা কীরকম।

কোথায় কী ইউনিট আছে, তার সংখ্যা কত, আমরা হিসেবনিকেশ করেছিলাম। একটা মোটামুটি চেহারা পাওয়া যায়। তা যে অসম্পূর্ণ এ মানতে আমি রাজি। কেননা থাকার ঘরটুকুর মধ্যেও কারখানা ঢুকে পড়েছে। ঘর আর কারখানা মিলেমিশে যায়। আবার গলির গোলকধাঁধায় অনেক কারখানার হদিশ আমরা পাই নি। আবার

এত বৈচিত্র্য যে, অনেক ধরনের কারখানা অথবা দোকানকে আমরা অন্তর্ভুক্ত করি নি। যেমন : বোর্ডের দোকান, পাঞ্চিঙের কারখানা, রঙঘর (ব্যবসায়ী খাতার মলাট যেখানে রাঙানো হয়), বাঁধাই বই ও খাতার পুটে স্বর্ণাক্ষরে ছাপার কারখানা, এসমস্ত বাদ চলে গেছে।

রাস্তার নাম অনুসারে ইউনিটগুলি ভাগ করি :

পাটোয়ার বাগান	১৯৯
বৈঠকখানা রোড	৬৯
কালী সোম স্ট্রিট	১০
পটোলডাঙা স্ট্রিট	৭
কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট	৫৪
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড	১৬
রামনাথ বিশ্বাস লেন	১০
বুদ্ধু ওস্তাগর লেন	১৬
অ্যান্টনিবাগান লেন	১৬
সূর্য সেন স্ট্রিট	২
ছকু খানসামা লেন	১
মোট	৩৯৯ ইউনিট

বাঁধাই কাজ ও তৎসম্পর্কিত কারখানাগুলিকে কাজের অনুসারে ভাগ করলে, কোন্‌টা কত ইউনিট তার একটা হিসেব নিতে চেয়েছিলাম :

বই	৯২
খাতা	১৩৫
বুলিং	২৯
ফাইল	৫
প্যাড	৩৫
খাম	৪৬
নাম্বারিং	১০
প্যাকেট	২৯
লেবেলিং	২
ছাঁটবাছ	৩
মিশ্র কারখানা	১৩
মোট	৩৯৯ ইউনিট

শ্রমিকদের মধ্যেও কত বৈচিত্র্য। কেউ কাজ করেন ফুরনে, কেউ কাজ করেন রোজে। আবার কেউ কেউ প্রতিদিন ঘুরে ঘুরে কাজ করেন। এঁরা ভাসমান শ্রমিক। যাঁরা কাজ শিখে কাজের স্তরগুলো পেরোতে থাকেন, তাঁদের কারখানা বদল না করলে মজুরি বাড়ে না। কেননা যে-কারখানায় কাজ শিখছেন, সেখানে যে-মজুরি পান, অন্য কারখানায় গেলে বেশি মজুরি পাবেন। যেখানে কাজ শেখেন সে কারখানার মালিক সুযোগ নেন। যাঁরা দক্ষ শ্রমিক তাঁরা সাধারণত প্রতিদিন কাজ পেয়ে থাকেন। এঁরা যেখানে কাজ করেন, সেখানে ওভারটাইম করেন অথবা অন্য কারখানায় বিকেল ৫টার পর ওভারটাইম করেন। আবার মাসমাইনে পাওয়া শ্রমিকরাও আছেন। এঁরা রবিবার ছুটি পান। রোজ-শ্রমিকরা প্রতিদিনের মজুরি পান। মাসমাইনের শ্রমিকরা বছরে রবিবার

ছাড়াও ১৮টা ছুটি পেয়ে থাকেন। দক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে রোজে কাজ করার প্রবণতা বেশি। মাসমাইনের শ্রমিকদের দৈনিক মজুরির হিসেবের থেকে কিছু বেশি পান তাঁরা। তা ছাড়াও ছুটির দিনে এমন-কি রবিবার এমন-কি উৎসবের দিনেও কাজ করে রোজগার বাড়ান। বছরের প্রায় দিনই কাজে কাজে কাটে এঁদের। ছুটি নেবার মালিক নিজেই। পারিবারিক অনুষ্ঠান তাঁদের বাড়িতে ধরে রাখতে পারে না। এমন-কি ধর্মের উৎসবেও। ধর্ম ব্যাপারটা এঁদের কাছে অবসরের, বিলাসিতার। প্রতিদিনের ধর্মের আচার উপাসনা পুজো অর্চনা নামাজ পড়া এঁদের নেই। বিরামহীন কাজে জুতে যাওয়াই প্রধান কারণ। সামাজিক পরিচয় ও জীবনযাপন থেকে সে-কারণেই বিচ্ছিন্ন।

ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি নেই। কেউ হিন্দু কেউ মুসলমান এই ধর্মবোধটুকুই শুধু। ধর্মীয় উৎসবের দিনেও এঁদের কাজ করতে দেখা গেছে। পুজোর একটি দিন ডায়েরি থেকে তুলে ধরছি :

> ১৯ অক্টোবর ১৯৮৮
>
> পুজোর চারদিনের ছুটির শেষ দিন আজ। আজ দশমী। দপ্তরিখানা অঞ্চলে ৬/৭টি পুজোমণ্ডপ। মাইক বাজছে, আর যুবকদের ভিড়। আশ্চর্য, অনেকগুলি কারখানা খোলা। সেখানে কাজ হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল মুসলমানদের কারখানাগুলি খোলা। বুলিং কারখানার এক কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি 'আমরা রোজে কাজ করি, তাই কাজ করছি। তা ছাড়া আমাদের পরবে আমরা ছুটি নিই।' খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, সব মুসলমান মালিকের কারখানা খোলা, তা নয়। অনেক বন্ধও। যেমন এই কদিন সুলতান কারখানা বন্ধ রেখেছিলেন। আজ দশমীতে খুলেছেন। তৈফুর রহমান দশমী পর্যন্ত বন্ধ রাখছেন।
>
> সব মিলিয়ে দপ্তরিপাড়ায় ছুটির মেজাজ।
>
> হিন্দু মালিকের কারখানাও খোলা দেখা গেল। আর্জেন্ট কাজের জন্য কারখানা খুলে কাজ হচ্ছে। দেশবন্ধু বুলিঙের খাতা বাঁধাইয়ের কারখানাটি। আবার হিন্দু সেলাইকর 'মাসি' আজ দশমীর দিন এসে কাজ করছেন সুলতানের কারখানায়। মাসির সমস্যা, প্রতিদিন কাজ পান না, আজ বেরিয়ে কাজ পাবেন, এই নিশ্চয়তায় বেরিয়েছেন।

দপ্তরিপাড়ার শ্রমিক পরিবারের সদস্যসংখ্যা গড়পড়তা ৫ থেকে ৭ জন পর্যন্ত। প্রত্যেকের গ্রাসাচ্ছাদন পরিবারের একমাত্র রোজগেরের রোজগারের ওপর নির্ভর। কেউ ১২৫ টাকা সপ্তাহে রোজগার করেন। কেউ ১৫০ পর্যন্ত। তার বেশি নয়। হিসেবটা কিন্তু ১৯৮৮-১৯৮৯ সালের অনুসারে। শ্রমিক পরিবারগুলির এই স্বল্প রোজগারে কীভাবে চলে, তার একটা নমুনা দেওয়া যাক :

যতীন্দ্রনাথ রায়ের ২ ছেলে, স্বামী স্ত্রী ও শাশুড়ি নিয়ে ৫ জন পরিবারের সদস্য। নিজের ঘরে থাকায় ঘরভাড়া এখন আর দিতে হয় না। এখন থাকেন বামনগাছি। আগে ভাড়াঘরে বাঘাযতীন লাইনে থাকতেন। শ্বশুরের পয়সায় থাকার বাড়ি করেন। সাড়ে তিন হাজার টাকা লাগে। এখন যতীন্দ্রনাথ সপ্তাহে ১০০ টাকা রোজগার করেন।

সপ্তাহে ৮ কিলোগ্রাম চাল লাগে	৮ × ৫ = ৪০.০০	টাকা
সপ্তাহে ৬ কিলোগ্রাম আটা লাগে	৬ × ৩ = ১৮.০০	টাকা
প্রতিদিন বাজার খরচ ৩ টাকা, সপ্তাহে	৩ × ৭ = ২১.০০	টাকা
ক্যান্টনমেন্ট থেকে মান্থলি কাটেন, বামনগাছি থেকে নয়। মাসে ২৬ টাকা লাগে। সপ্তাহের হিসেবে	= ৬.৫০	টাকা
সপ্তাহে তেল মশলা জ্বালানি ও অন্যান্য	= ১৪.৫০	টাকা
মোট খরচ	১০০.০০	টাকা

পুজোর আগে বোনাসের টাকায় ছেলেদের জামাকাপড় নিজের ও স্ত্রীর শাড়ি জামা কেনেন। তার মধ্যে অসুখ-বিসুখ আছে। নানাকিছু। মুখে হাসিটুকুও থাকে। প্রসন্ন হয়ে থাকতে জানেন। জীবন যেমন চলে, তেমনই যেন। তাঁদের ব্রত যেন কাজ করা আর অল্পে সন্তুষ্ট থাকা। হঠকারিতা নেই। নেই উল্লম্ফন। হঠাৎ করে কারো ভাগ্য খুলে যায় না। জীবনের কোনো চমক নেই। জীবনে বিশৃঙ্খলাও নেই। একই খাতে, একইরকম বৈচিত্র্যহীন বয়ে চলা। মনে হতে পারে নিয়তির মতো নির্ধারিত যেন জীবন। পূর্বনির্ধারিত। এই সাঁইতিরিশ নম্বর ওয়ার্ড।

পু.ল. দেশপাণ্ডের সঙ্গে

শর্বরী রায়চৌধুরী

পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ দেশপাণ্ডে-র (জন্ম : ৮নভেম্বর ১৯১৯) পঁচাত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে তাঁর এই স্মৃতিচারণ করছেন শিল্পী শর্বরী রায়চৌধুরী। দেশপাণ্ডেজি মারাঠি পাঠকমহলে পু.ল. দেশপাণ্ডে বা শুধুই পু.ল. নামে পরিচিত। তাঁর বিষয়ে একটি বইয়ের নামই হচ্ছে : 'অসে হে পু.ল.' (পু.ল. এইরকম, ১৯৬৮)। শর্বরী রায়চৌধুরীর স্মৃতিচিত্রণের ভূমিকা হিসেবে পু.ল.-এর এই সংক্ষিপ্ত পরিচিতি লিখে দিয়েছেন অধ্যাপক বীণা আলাসে :

পু.ল. দেশপাণ্ডের জন্ম মধ্যবিত্ত পরিবারে মুম্বাই (বোম্বাই) শহরে। শিক্ষা মুম্বাই আর পুনেতে। অল্প বয়সে পিতৃহীন এই প্রতিভাবান যুবককে বিচিত্র ধরনের জীবিকা গ্রহণ করতে হয়। কেরানিগিরি, ইস্কুলমাস্টারি, থেকে কলেজে অধ্যাপনা আর অধ্যক্ষতা যেমন করেছেন, তেমন কাজ করেছেন আকাশবাণীতে আর দূরদর্শনে। সাহিত্য নাটক সংগীত সিনেমা অভিনয়— শিল্পসাহিত্যের বহুতর ক্ষেত্রে তিনি রেখেছেন প্রতিভার স্বাক্ষর। গোগোল আর ব্রেশটের নাটক থেকে তরজমাও করেছেন তিনি।

তাঁর বহু বইয়ের মধ্যে বাঙালি পাঠকসমাজের কাছে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে : 'বঙ্গচিত্রে' (বঙ্গচিত্রাবলি, ১৯৭৪)। এই বইয়ে ধরা আছে বাঙলার সরস ছবি, বিশেষত শান্তিনিকেতনের স্মৃতিরঙ্গ।

বৃদ্ধত্ব অনিবার্য ; কিন্তু পু.ল. দেশপাণ্ডের মতন মানুষকে তাঁর পাঠক বৃদ্ধ হতে দেয় না। কারণ, পু.ল. লিখে, গান গেয়ে, অভিনয় করে প্রায় দুই প্রজন্মকে নিজের নিজের ক্ষুদ্রতার দিকে তাকিয়ে হাসতে শিখিয়েছেন। 'ব্যক্তি আনি বল্লী' (ব্যক্তি আর চরিত্র, ১৯৬২) নামে বইয়ের জন্যে সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কার (১৯৬৫) নেবার সময়ে তিনি বলেন :

> আমি যুঝেছি, ভণ্ডামির বিরুদ্ধে, বুদ্ধিজীবীসুলভ বুলি-কপচানোর বিরুদ্ধে, 'জনসাধারণের-জন্যে-কে-মাথা-ঘামায়' মার্কা মতাদর্শের বিরুদ্ধে। আর যখন সংগ্রামই বেছে নিলুম আমি, তখন আমার হাতে এল অন্য এক অস্ত্র। এই অস্ত্রটা কিন্তু আমি নিজে বেছে নিই নি। এ হল এক দান, যা ঈশ্বর সমস্ত গরিব মানুষকে দিয়ে থাকেন : রসবোধ।

তবে পু.ল. শুধুই রঙ্গরসিকতার কারবারি নন। সামাজিক আর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছেন বার বার। যেখানেই পেষণ আর অসততা দেখেছেন, রুখে দাঁড়িয়েছেন তিনি নির্ভয়ে। জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ স্মরণযোগ্য।

দলিত লেখকদের লেখা মন দিয়ে পড়ে, কমবয়সী লেখকদের খবর রেখে, নিরলস উৎসাহ দিয়েছেন তাঁদের।

যিনি পুরুষোত্তম লক্ষণ দেশপাণ্ডে, তিনিই সেই পুরুষোত্তম, আমাদের সবার কাছে পি. এল. অথবা পু.ল. দেশপাণ্ডে এবং আমার কাছে পু.ল.দাদা।

পু.ল.দাদার বহুমুখী প্রতিভা সর্বজনবিদিত। আমাদের সমাজের কুরুচিপূর্ণ জীবন নিয়ে বিদ্রূপাত্মক লেখা বা হাস্যোদ্দীপক রসাল লেখায় তাঁর তুলনা মেলে না। তাঁর হালকা রসাপ্লুত নাটকের অভিনয় মানুষের জীবনের বহু দুঃখদুর্দশাকে ভুলিয়ে দিয়ে এক আনন্দসাগরে ভাসাতে পারে। আবার তাঁর কাব্যসম্ভার গভীর রসে পূর্ণ, কোথাও হালকা রসের লেশ নেই। এসব কাব্যে যেন একটা ক্ল্যাসিকাল স্ট্রাকচর পাওয়া যায়। এ যেন কখনোই পুরোনো হয় না।

আমার মনে পড়ে, পু.ল. দাদার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় কলাভবনে নন্দনবাড়ির সামনে। তিনি আর প্রফেসর দিনকর কৌশিক নন্দনবাড়ি থেকে রাস্তায় বেরিয়ে আসছিলেন, আর ঠিক সেই মুহূর্তে একজন রিকশাচালককে তার রিকশায় বসিয়ে ওই রাস্তা দিয়ে আমি যাচ্ছিলাম রিকশা চালিয়ে। পু.ল.দাদা তাঁর 'বঙ্গচিত্রে' বইটিতে এই ঘটনাটি আরও রসিয়ে লিখেছেন, অনুবাদ করে কৌশিকদা সেটা শুনিয়েছিলেন আমাকে। প্রথমটায় পু.ল.দাদার বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল কোন্‌টা শবরী রায়চৌধুরী, যে বসে আছে সে, না যে চালাচ্ছে সে। পরে বুঝতে পেরে তিনি খুব হাসলেন।

পু.ল. দাদা সম্ভবত ওই সময়ে রবীন্দ্রসাহিত্য পড়বার এবং বাংলা ভাষা শেখবার জন্য এসেছিলেন। বিস্ময় লাগে এই ভেবে যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে কী করে ভাষা শেখা সম্ভব। কিন্তু দেখলাম যে তাঁর মতো মহাপুরুষের পক্ষে সবই সম্ভব হতে পারল। রাস্তায় যেদিন তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা,তার কদিন পর আমার বাড়িতে এসে দেখা না পেয়ে ছোটো একটা কাগজে বাংলা হরফে হিন্দি একটা লাইন লিখে গিয়েছিলেন : 'আপকি দরশন সে ভগবানকি দরশন আসান হ্যায়।' কী চমৎকার এই ছোটো চিঠি।

পু.ল.দা-র মতো বিশাল প্রতিভার লোক আমার মতো এত ছোটো মাপের মানুষের সঙ্গে অতি সহজভাবে বন্ধুত্ব করেছেন ভেবে মাঝেমধ্যে আমার বেশ লজ্জা ও সংকোচ হয়। সম্ভবত আমাকে তিনি ভালোবেসেছেন। পণ্ডিত মল্লিকার্জুন মনসুরের গান তাঁরও যেমন ভালো লাগে, আমারও ঠিক তেমনি লাগে। আমাকে মল্লিকার্জুনজির বহু গান তিনি সংগ্রহ করে দিয়েছেন। মনসুরজিকে অনেক কাছে পাবারও সুযোগ করে দিয়েছেন তিনি। শেষ পর্যন্ত যে তাঁরও স্নেহ ভালোবাসা আমি পেয়েছি, তার মূলে ছিলেন পু.ল.দাদা।

পু.ল.দাদার মতো এত বড়ো বহুমুখী প্রতিভার লোক আমি আর দেখেছি বলে মনে হয় না। একদিকে যেমন তিনি প্রতিভাবান অভিনেতা, অন্য দিকে তেমনি তাঁর গলায় মারাঠি নাটকের গান আর তাঁর হারমোনিয়াম বাজনা। এমন আর আমি শুনি নি। ছেলেবেলা থেকে তিনি হারমোনিয়ামের তালিম পেয়েছিলেন নটবর ও সংগীতকার গোবিন্দরাও টেম্বের কাছে। পাঁচ বছর বয়সের জন্মদিনে তাঁর বাবা না কি তাঁকে হারমোনিয়াম উপহার দিয়েছিলেন— এ কথা একবার আমাকে বলেছিলেন পু.ল.দা।

কথায় কথায় হঠাৎ একদিন তিনি আপশোস করে বলেছিলেন যে ছেলেবেলায় সংগীতসাধনার অনেক সুযোগ পেয়েও পরে বেলগাম কলেজে তাঁকে ইংরেজি পড়াতে হয়েছে! তিনি বলেছিলেন, ইংরেজির শিক্ষক তো লাখে লাখে মেলে, বড়ো সংগীতকার হয় কজন? অবশ্য এই আপশোস কেন তা বোঝা যায় না। তিনি তো কিছু কম নন। সৌভাগ্যবশত আমি তাঁর কিছু হারমোনিয়াম বাজনা রেকর্ড করতে পেরেছিলাম। পাকা রাগরাগিণীর চলনে আর রাগের বিলম্বিত বিস্তারে আজকের দিনে এ-রকম সোলো-হারমোনিয়াম আর কারো শুনি নি। তাঁর গুরু গোবিন্দরাও টেম্বেজির কিছু ছোটো ছোটো বাজনা আমার কাছে আছে। গোবিন্দরাওজি যখন বাজাতেন তখন হয়তো এ-রকমই বাজাতেন। নাট্যকার পরিচয় ছেড়ে যদি পু.ল.দাদাকে শুধু সংগীতের দিক থেকে দেখা যায়, তবে তাঁর বাজনাকেও সবার উপরে জায়গা দেওয়া যায়। শান্তিনিকেতনে এসে যতদিন তিনি থেকেছেন, সবসময়েই হাস্যকৌতুক ছাড়া তাঁর বাকি সময়টা কেটেছে সংগীতালোচনায়। কখনো বড়ো বড়ো সংগীতশিল্পীদের গান নকল করে গেয়ে শোনাতেন। সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক ও মানুষ বলে তিনি মানতেন পণ্ডিত মল্লিকার্জুন মনসুরকে। আমিও। পু.ল.দাদা তাঁকে সহোদর বড়ো ভাইয়ের মতো ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন। মনসুরজির সংগীতের রূপরস আস্বাদন করতে তিনিই শিখিয়েছেন আমাকে। এমন তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার তাঁর সুরের চলন, কোনো রাগের সা শুনলেই যেন সেই রাগের সম্পূর্ণ প্রকাশ বোঝা যায়— এমন আর শোনা যায় নি। যেন ট্রানজিসটর রেডিয়ো, সুইচ টিপে দিলেই পুরো আওয়াজ চলে আসে, পুরোনো দিনের ভাল্‌ব-সেট-রেডিয়োর মতো গরম হওয়ার সময় লাগে না।

পু.ল.দা প্রায়ই গান শুনতে আসতেন আমার সংগ্রহ থেকে। একদিন শুনতে চাইলেন শুধু কেশরবাঈ। যতদূর মনে পড়ে, সেদিন তাঁকে প্রায় আড়াই ঘণ্টা কেশরবাঈ শুনিয়েছিলাম। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন : 'থামাও এবার,

আমার যে নেশা চড়ে গিয়েছে!' সত্যিই অনেক সংগীতে মাদকতা আছে বলে আমরা তৃপ্ত হই। সেটা একটু বেশি হলে মত্ত অবস্থাও বোধ করি।

আমার তৈরি কোনো কোনো মূর্তি দেখতে পু.ল.দাদার ভালো লাগত। সেই সুযোগে একবার সভয়ে তাঁর কাছে প্রস্তাব করেছিলাম, কেশরবাঈয়ের মূর্তি গড়ব। সেইসময়ে পু.ল.দা থাকতেন সান্তাক্রুজের মুক্ত অঙ্গনে তাঁর নিজের বাড়িতে। বম্বেতে এসে তাঁর আশ্রয়ে আমাকে থাকতে বললেন। সেইসময়ে একদিন আমাকে নিয়ে গিয়ে কেশরবাঈয়ের সঙ্গে কথা বলিয়ে ওঁকে রাজি করিয়ে দিলেন। কলকাতায় অল ইন্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্সে কেশরবাঈয়ের সঙ্গে অবশ্য খুবই পরিচয় হয়েছিল। পু.ল.দাদা একদিন কৃপা করে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন মহাজাতিসদনে রাত্রের আসরে তাঁর গান শুনবার জন্য। কিন্তু তাই বলে, আমি যে তাঁর মূর্তি গড়তে চাই এ কথা সরাসরি বলব কীভাবে! ভীষণ ভয় করছিল। পু.ল.দা যোগাযোগ করে না দিলে এটা সম্ভবই হত না।

সত্যিই একটা মস্ত অভিজ্ঞতা, জন্ম জন্ম মনে থাকবে। প্রথম যেদিন কেশরবাঈ আমার জন্য বসলেন, কঠিন সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। পু.ল.দা সহায় ছিলেন বলে সামলে নিতে পেরেছি। গদিওয়ালা একটা বড়ো চেয়ারে কেশরবাঈকে বসতে দেওয়া হয়েছিল। মূর্তি গড়া সবে শুরু করেছি। মাটি দিয়ে যখন আমরা মূর্তি গড়ি তখন কঙ্কাল থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে মাংসপেশি লাগাতে থাকি, তার পর যখন উপরে ত্বক অবধি তৈরি হয়ে যায়, মূর্তি গড়তে কোনো ভুল না থাকলে তখন আর চিনতে কোনো অসুবিধে হয় না। বাঈজি তো প্রথমেই মূর্তির কঙ্কাল দেখে বেজায় রেগে গিয়ে চেয়ার থেকে উঠে পড়ে নিজেই মূর্তিতে মাটি লাগাতে শুরু করলেন। রেগে গিয়ে আমাকে বললেন : 'মেরেকো বুঢ্‌ঢি সমঝতে হো?' আমি বললাম : 'তা হলে আপনিই তৈরি করুন, আমি যাচ্ছি।' তিনি আমার গায়ের জামা টেনে ধরলেন এবং বললেন : 'হামারা মূর্তি আগর পসন্দ না আওয়ে তো উস মূর্তি আউর তুমকো লেকে উপরসে নীচে গিরা দুঙ্গী।' আমি তো ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। জীবনমরণ পণ, খুবই ভয়ে ভয়ে কাজ করতে লাগলাম রোজ। পু.ল.দাদা অনেক ব্যাখ্যা করে বাঈজিকে বোঝালেন, মূর্তিগড়ার শুরু আর সংগীতের শুরু দুটো একেবারেই আলাদা। তখন থেকে তিনি পূর্ণ অবয়বের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

তখন দেখেছিলাম কেশরবাঈয়ের কাছ থেকে কিছু শুনবার জন্য পু.ল.দা নিজেই বিভিন্ন রাগে মাঝে মাঝে গাইছিলেন। রাগের উপর দখল আছে বলেই অত বড়ো বাঈজির সামনে গাইতে পারছিলেন। কেশরবাঈও তখন মাঝে মাঝে লম্বা তান দিয়ে দেখাচ্ছিলেন। এ ছাড়া আমার কাজে উৎসাহ দেওয়ার জন্য প্রায়ই পু.ল.দা বাঈজির জোয়ান বয়সের গানের কিছু টেপ শোনাতেন। যতক্ষণ কেশরবাঈ আমার জন্য বসতেন, অনর্গল কথা বলে যেতেন। বলতেন সংগীতজগতের বহু লোকের কথা, তাঁর গুরুজি ওস্তাদ আলাদিয়া খাঁ সাহেবের কথা। শুনতে শুনতে নিজেকে অনেক ভাগ্যবান মনে করি। আর, এত বড়ো বাঈজির কাছে গিয়ে এত রঙের কথা শোনা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে কেবলমাত্র পু.ল.দাদার জন্য, তিনি না থাকলে নিশ্চয় এত কথা খুলে বলতেন না কেশরবাঈ। সেখানে আমার মূর্তি গড়াটা একটা বাহানা মাত্র। যেসব কথা তাঁর কাছে শুনেছিলাম তখন, সেসব যদি রেকর্ড করে রাখা যেত, অনেক তথ্য থেকে যেত তবে।

মূর্তিটার সামনের দিকে একটু একটু আদল এসেছে যখন, তখন আমার খুব দরকার হল তাঁর মাথার পিছনের গড়নটা দেখা, বিশেষ করে স্কাল-এর ভিতরকার রূপ। কিন্তু ভয়ে আর সে কথা কিছুতেই বলা গেল না যে : 'শাড়ির ঘোমটা সরিয়ে একটু দেখাবেন কি?' অনেক ভেবে একটা উপায় ঠাওরালাম পরদিন। প্রথমে আন্দাজমতো একটা ন্যাড়া মাথা তৈরি করলাম আর তার উপর ছোট্ট একটা বড়ি খোঁপা লাগালাম। যা ভাবছিলাম তাই হল। তিনি রেগে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঘোমটা নামালেন আর সগর্বে বললেন : 'তুমি কি ভেবেছ আমার মাথায় মোটেই চুল নেই? তাই অত ছোটো খোঁপা?'

পরে অবশ্য আমাকে ঘোমটাপরা মূর্তিই করতে হয়েছিল, কিন্তু কাপড়ের নীচে মাথার গড়ন আগে ঠিকমতো গড়ে নিয়ে তার পর শাড়ি দিয়ে ঘোমটা পরাতে হয়েছিল। যাই হোক, মূর্তিটার অনেককিছুই ওঁর পছন্দমতো

করতে হয়েছিল। বলেছিলেন একটু জোয়ান বয়সের মূর্তি গড়তে। মূর্তির একটা প্লাস্টার কাস্ট কেশরবাঈয়ের শিবাজি পার্কের বাড়িতে আজও রাখা আছে।

প্রথম দিকে, অর্থাৎ ১৯৭১ সালে পু.ল.দাদা যখন পনেরো দিন কি একমাস রবীন্দ্রসাহিত্যপাঠের জন্য মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে আসতেন, কখনো কখনো তখন আমার কাছে এসেও থাকতেন। সে-সময়ে তিনি আমার কাছে বিনোদদা আর কিঙ্করদার বিষয়ে অনেক কথা জানতে চাইতেন, বিশেষ করে বিনোদদার কথা, তাঁর শিল্পভাবনার, তাঁর অভিজ্ঞতা ও অভিব্যক্তির কথা। এজন্য আমাকে বিনোদদার সব কথা খুব মন দিয়ে শুনতে হত, পু.ল.দাদার কাছে এসে তার বিশদ বর্ণনা করতে হত।

শিল্প সম্বন্ধে বিনোদদার জ্ঞান চেতনা এবং চিরনূতন সৃষ্টির জন্য তাঁর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অন্তর্দৃষ্টির তুলনা মেলা কঠিন। তাঁর কাজকর্ম দেখে আর তাঁর শিল্পালোচনা শুনে আমার মনে হয়েছে তাঁর একমাত্র তুলনা দেওয়া যায় লুডভিগ বেঠোফেনের সঙ্গে। বেঠোফেন তাঁর বেশির ভাগ মহান সংগীত সৃষ্টি করেছেন সম্পূর্ণ বধির হয়ে যাবার পর। বিনোদদা তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে জগতের সব রূপ রঙ আকার দেখেছেন অন্তরের অনুভূতির পরশে। তাঁর সৃষ্ট হিন্দিভবনের দেয়ালচিত্র এক ঐতিহাসিক শিল্পকর্মের নিদর্শন। চোখ থাকতেও তো আমরা এত গভীরে দেখতে পারি না। বিনোদদাকে দেখেছি, আজকের পৃথিবীতে কোন্ প্রান্তে কেমন শিল্পচর্চা চলছে তার সবটাই তিনি জানতেন। বিশেষ করে নবশিল্পীদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। মার্কিন দেশ থেকে ফিরে আসবার পর বিদেশের আর্ট মুভমেন্ট বিষয়ে আমার কাছে কিছু শুনতে চাইলে বলেছিলাম : 'বড়ো শিল্পী যাঁরা মধ্যপঞ্চাশ থেকে সুনাম অর্জন করেছেন, পিকাসো থেকে জাকোমেত্তি (Giacometti) অবধি, খুব সহজে ওঁদের ইভল্যুশন বোঝা যায়। তার পর আমেরিকা আর ইংলন্ডের নবজাগরণের অত্যন্ত অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের খুবই রেস্টলেস মনে হয়েছে।' বিনোদদা এ কথা শুনে বললেন : 'শুনুন, আমার এ বিষয়ে একটা কথা বলার আছে। এক বৃদ্ধার আলিঙ্গনের চেয়ে এক যুবতীর পদাঘাত অনেক সুখদায়ক ও মিষ্টি।' শুনে আমি স্তম্ভিত। শান্তিনিকেতনের মতো ট্র্যাডিশনের বেড়াজালে সারাজীবন কাটিয়েও তাঁর শিল্পচেতনা গোটা বিশ্বে খুঁজে বেড়াচ্ছে নতুন সৃষ্টির প্রেরণা। চমৎকৃত হয়ে তাঁর মুখে কথাটা আবার শুনতে চাইলাম, যেন কথাটা বুঝি নি। মুচকি হেসে কথাটার পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি। আমি বললাম : 'তা যুবতীর সঙ্গেই বা আলিঙ্গন হবে না কেন ?' উত্তরে তিনি বললেন : 'দাঁড়ান, ক্রমশ।'

নতুন যৌবনের শিল্পীদের প্রতি তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি জেনে আমার দৃষ্টির পরিধিও যেন অনেকটা বেড়ে গেছে। আমার মুখ থেকে বিনোদদার এসব কথা শুনে পু.ল.দাদার এত ভালো লেগেছে যে তাঁর 'বঙ্গচিত্রে' বইটিতে বিনোদদার এই কথাবার্তা বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন। বাঙালি চরিত্র নিয়ে মারাঠি ভাষায় লেখা এই বই।

১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে, শরৎপূর্ণিমাতে, পণ্ডিত মল্লিকার্জুন মনসুরের বাড়িতে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন পু.ল.দাদা। ধারওয়ার যাওয়ার পথে তাঁর নাটকের জন্য দুদিন তিনি ছিলেন বেলগামে। সেখানে তাঁর প্রতি সমস্ত বেলগামবাসীর যে শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার ছবি দেখেছি তার তুলনা নেই। মল্লিকার্জুনজিকে পু.ল.দাদার সঙ্গে একেবারে একাত্ম বলে মনে হয়। আমরা যাওয়াতে পণ্ডিতজি এমন-কি দুপুরের খাওয়ার পরে বিশ্রামেরও তেমন প্রয়োজন মনে করলেন না, গান শোনাতে বসে গেলেন। শুরু করলেন গৌড়সারং থেকে। তার পর মালবি, শ্রী, ইমন প্রভৃতি গাইলেন বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। তার পর সন্ধেবেলায় পূর্ণিমার আলোয় আমাদের নিয়ে বসলেন ছাদে, বলতে লাগলেন পুরোনো দিনের গাইয়েদের কথা। নানা কথার মধ্যে বলছিলেন তাঁর খুব অল্পবয়সের অভিজ্ঞতার কথা। বলছিলেন, পণ্ডিত ভাস্কর বুয়া বখলে-র মেয়ে যখন মারা গিয়েছেন, পণ্ডিতজি শোকে এত মুহ্যমান যে কাঁদতেও পারছেন না, নিশ্চল পাথর হয়ে আছেন। তার পর সন্ধেবেলা যখন কন্যার দেহ নিয়ে শ্মশানে যাচ্ছেন, তার পিছনে ভাস্কর বুয়াজি কী আবেগে গেয়েছিলেন মুলতানি 'কবন দেশ গ্যায়োঁ'। ঠিক

সেইভাবেই মল্লিকার্জুনজি গানখানা গেয়ে শোনাচ্ছিলেন। হয়তো সাত-আট মিনিট। আমার আর পু.ল.দাদার দুজনেরই চোখে তখন জল।

পু.ল.দাদার কথা অল্পকথায় শেষ করা যায় না। বহুমুখী প্রতিভার কথা ছেড়ে দিলেও নিছক মানুষ হিসেবেই তিনি মহান। পৌরাণিক গল্পে দাতা কর্ণের কথা অনেক শুনেছি। কিন্তু এ যুগে আমার মনে হয় পু.ল.দাদা তাঁর থেকে কিছু কম নন। তাঁর পঞ্চাশ বছরের জন্মদিনে মহারাষ্ট্রের একটি অন্ধস্কুল তাঁকে সংবর্ধনা জানিয়েছিল। পু.ল.দা যখন সেখানে পৌঁছোন, সভাঘর ছিল অন্ধকার। আলোর কথা জিজ্ঞেস করতেই অন্ধকারের ভিতর থেকে একজন বললেন : 'আমাদের আলো তো আপনি।' পু.ল.দাদা ওই সময়ে অন্ধস্কুলের সাহায্যার্থে একলক্ষ টাকা দান করেন। একদিন তিনি বলেছিলেন : 'আমি জীবনে দশ পয়সা রোজগার করলে ন পয়সা পরের জন্য দিয়ে এক পয়সা রাখি নিজের জন্য।' এমন ত্যাগী মহাপুরুষের কথা তো কেবল ইতিহাসেই মেলে। আজকাল এমন আর কজন আছেন ? কোথায় ?

আলেখ্য

বিষ্ণু দে : পাঠোদ্ধারের সঞ্চয়

চৌকাঠের মাথা আর তলা জুড়ে দাঁড়িয়েছিলেন, পাঞ্জাবিতে, ডাইনে-বাঁয়ে ফাঁক ছিল, একটা ফ্রেমের ছবির মতো, অবিচল ছবি, সে হয়তো ১৯৫৬ হবে কিংবা ১৯৫৭, আর তাঁর বয়স বড়ো জোর ৪৭ কিংবা ৪৮ কিন্তু তাতেই অবয়বে একটা টানটান প্রৌঢ়ত্ব এসে গিয়েছিল। মনে নেই, কিন্তু যেন দেখেছিলাম, চুলগুলো তখনই কাঁচাপাকা। তারাভূষণ মুখোপাধ্যায় আমাকে পাঠিয়েছিলেন বিষ্ণু দে-র কাছে। তারাভূষণবাবু তখন 'বাক্' প্রকাশনা শুরু করেছেন। যামিনী রায়ের আঁকা মলাটে ধূর্জটিপ্রসাদের 'অন্তঃশীলা' বেরিয়েছে। তার আগে আমি 'অন্তঃশীলা' পড়ি নি। সেই প্রথম পড়ে একেবারে মুগ্ধ। খবরটা পৌঁচেছিল তারাভূষণবাবুর কাছে। তিনি তাঁর দোকানে আমাকে ডেকে বিষ্ণুবাবুর নাম করে বললেন, 'সাহিত্যপত্র'-এর জন্যে একটা আলোচনা লিখতে। সময় দিয়েছিলেন। আর বিষ্ণুবাবুকে চমকে দেওয়ার ইচ্ছায় মাসখানেকের রাতদিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে প্রুস্ত পড়ে শেষ করি। সদ্য-প্রুস্ত-পড়া 'অন্তঃশীলা'র সমালোচনা কী বস্তু হতে পারে সেটা যে-কোনো বিবেচক মানুষই অনুমান করতে পারেন। আমি লেখাটি জমা দিই তারাভূষণবাবুরই হাতে। তার পর তিনি একদিন বললেন, বিষ্ণুবাবু আমাকে দেখা করতে বলেছেন। ঠিকানা নিয়ে একদিন চলে যাই শেষ সকালের দিকে। তার পর সেই দরজা খুলে চৌকাঠের ফ্রেমে ছবি হয়ে দাঁড়ানো আর খুব চাপা গলায় দু-একটি মাত্র কথা।

বিষ্ণুবাবুর শরীরে খুব বেশি ভঙ্গি ছিল না। তাঁর শরীরের স্থিরতায় গুটিকয়েক মাত্র পরিচিত ভঙ্গিতে চিড় ধরাতেন, তার পরই আবার সে-চিড় মিলিয়ে দিতেন। একটু বাঁ দিকে ঘাড় ঘোরাতেন, যে-চেয়ারে বসতেন সেটাতে ডান দিকে ঘাড় ঘোরানোর জায়গা ছিল না। সেইজন্যে কখনো-কখনো ডাইনেও তাকাতেন গলাটাকে একটু বেঁকিয়ে লম্বা করে। তাতে কপালে ভাঁজ পড়ত অনেক। দরজা দিয়ে বাইরে তাকাতেন কিন্তু কতটা তাকাতে পারবেন সে হিসেব তাঁর জানা ছিল তাই চোখ খুব বেশি বাইরে না গেলেও দৃষ্টিটা বাইরে অনেক দূর পর্যন্ত মেলে রাখতেন। তাঁর ঘরের আড্ডার কারো ওপর যখন চোখ ফিরিয়ে আনতেন তখন সে চোখ নিবিড় হয়ে উঠত। কপালে আবার রেখা ফুটে উঠত— এবার খাড়াখাড়ি। সেই তন্ময়তা নিয়ে হঠাৎ খুব তুচ্ছ একটা কেচ্ছা বলতে শুরু করতেন কারো সম্পর্কে, বেশির ভাগই চেনা গল্প, অনেক বার শোনা। আর বলতে-বলতেই মুখটা হাসিতে ভরে উঠতে চাইত। মুখে আবার রেখা দেখা দিত— ঠোঁটের আর চোখের দুপাশে। সিগারেটটা শেষ করে অ্যাশট্রেতে খুব নিপুণভাবে নেবাতেন। তার পর অ্যাশট্রেটা ঝাঁকিয়ে ছাইগুলোকে অ্যাশট্রের ভিতর ফেলতেন। অ্যাশট্রেটাকে আবার পুরোনো জায়গায় রেখে দিতেন। লম্বা-লম্বা হাতের সেই ভঙ্গিগুলো তাঁর বসার ভঙ্গির সঙ্গে মিলে যেত। বোঝা যেত, কাজের নৈপুণ্য তাঁর স্বভাবগত, সে যত ছোটো কাজই হোক-না কেন। এ-মানুষ সচরাচর অপ্রস্তুত হন না। বা, যেখানে ইনি মথিত হন, অপ্রস্তুত হন, সে-জায়গাটা বড়ো বেশি অদৃশ্য। সেই অদৃশ্য থেকে তিনি ঠিক বেরিয়ে আসতেন আবার নিপুণ ও প্রস্তুত। বিষ্ণুবাবুর এই নেপথ্যটা খুব দৃষ্টিগোচর ছিল না। অন্তত আমাদের, যাঁরা তাঁর বাইরের ঘর পর্যন্ত গিয়েছি, তাই যেতে চেয়েছি, ভিতরের চৌকাঠটা পার হই নি, বা রিখিয়ায় যাই নি।

আমি যে-কদিন বিষ্ণুবাবুকে তাঁর নিজস্ব আড্ডার মাঝখানে দেখেছি, সে মাত্র দু-একদিনই হবে, পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি, তাতে আমার মতো কবিমুগ্ধ নবযুবকের মনে হতে পারে— তিনি যেন একটু আলতোভাবে সেই আড্ডায় মিশে থাকতেন। সে-আড্ডাটা একটু বেশিমাত্রায় উজ্জ্বল ছিল, পোশাকে-আশাকেও, কথাবার্তায় তো বটেই, একটু বেশি আত্মসন্তুষ্ট আড্ডা, বাইরের হাওয়া সে-আড্ডাকে এলোমেলো করে দিত না বা বাইরের

হাওয়ায় এলোমেলো কেউ যেন সে-আড্ডায় স্বচ্ছন্দ বোধ করত না। কিন্তু সেটা নিশ্চয়ই ঠিক নয়। যাঁরা সে-আড্ডায় থাকতেন তাঁরা অনেকেই তো ছিলেন বেশ এলোমেলো, তাঁদের পায়ে কলকাতার ধুলো তো অন্তত থাকতই, চুলেও লেগে থাকত খড়কুটো। কিন্তু এই আড্ডা বিষ্ণুবাবুকে যতটা প্রভাবিত করত, বিষ্ণুবাবু আড্ডাকে প্রভাবিত করতেন তার চাইতে অনেক বেশি। কথা দিয়ে নয়, কারণ, তিনি তো স্বভাবতই ছিলেন স্বল্পবাক, তাঁর উপস্থিতি দিয়ে। সেইজন্যে বিষ্ণু দে-র আড্ডায় প্রায় সবাইই ছিলেন ছোটোখাটো বিষ্ণু দে। অথচ ওঁদের অভিজ্ঞতা ও বাক্‌-ভঙ্গি তো ছিল কত আলাদা। সেই বৈচিত্র্যের স্বাদ বিষ্ণু দে-র আড্ডায় প্রথম যখন দু-একবার গিয়েছি, পাই নি। বোধহয় বড়ো কবির বড়ো ব্যক্তিত্বের একটা চাপ থাকে। বিষ্ণু দে-র আড্ডার ওপর বিষ্ণু দে-র সেই চাপ ছিল। এটার একটা বিপরীত প্রক্রিয়াও আছে। বিষ্ণুবাবুর ওপর বিষ্ণু দে-র আড্ডার আবার একটা উল্টো চাপ ছিল।

কিন্তু এই আড্ডাটা তাঁর পক্ষে দরকারি ছিল। একটু তো ঘরমুখো মানুষই ছিলেন। শুনেছি, বাড়ির অনেক কাজ নিজের হাতে করতেন। খাবার জায়গায় প্রত্যেকের রুটিতে মাখন বা অন্য কিছু লাগিয়ে দিতেন নিজের হাতে। বাড়ির সবার জুতো কালি করে দিতেন নিয়মিত। নিজের কাগজপত্র নিজে গুছিয়ে রাখতেন নিপুণভাবে। এইসব ছোটো ছোটো কাজের বৃত্ত হয়তো তাঁকে আত্মরক্ষারও একটা বৃত্ত তৈরি করে দিত। তাঁর নিজের আঁকা নিজের লক্ষ্মণের গণ্ডি। এই আড্ডা ছিল তাঁর কাছে বাইরের দূত। নানা জনের নানা কথা থেকে তিনি বানিয়ে নিতেন তাঁর এই শহরের একটা শেষতম চেহারা, এমন-কি, কোথায় কী ঘটছে সে-বিষয়েও তাঁর খবর-সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা ছিল বিস্ময়কর। কবিরা কী করে লক্ষ্মণের গণ্ডি কাটেন আর কী করে তা পেরোন— তা এক কবিরাই জানেন। কোনো কবি হয়তো সারা শহর পায়ে-পায়ে ঘুরে কবিতার ছন্দ বানান, কোনো কবি হয়তো এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে কবিতার পদ বানান। এই আড্ডা বিষ্ণুবাবুকে তাঁর অনেক কবিতা দিয়েছে।

তাই কি বিষ্ণু দে-র এক ধরনের কবিতায় মন্তব্য বা প্রতিক্রিয়াই হয়ে ওঠে প্রধান। বোঝা যায়, তিনি ঘটনা থেকে দু-এক পা সরে গিয়ে কবিতাটিতে ঢুকতে পেরেছেন। আর তাঁর একটা প্রধান ভঙ্গিই হয়ে যায় দর্শকের ভঙ্গি। সবচেয়ে কম বয়সে বোধহয় এই কবি নিজেকে বৃদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন। বৃদ্ধের অধিকার থাকে শুধু দেখার, দেখে একটু-আধটু মন্তব্য করার। এ-ভঙ্গি 'অন্বিষ্ট' পর্যন্ত দেখা যায় না কিন্তু 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'-এ এসে গেছে আর এ-ভঙ্গি যে কত কাব্যময় এক ভঙ্গি তার উদাহরণ তো 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'।

বিষ্ণু দে-র পরিপার্শ্ব পরোক্ষকে তাঁর কাছে প্রত্যক্ষ করিয়ে দিয়েছে। যাঁরা সেই পরিপার্শ্বের অন্তর্গত ছিলেন, বিভিন্ন সময়ে, তাঁরা বলতে পারবেন, কবিত্ব ছাড়াও তাঁর মননের ওপর এই পরিপার্শ্বের প্রভাব কতখানি পড়েছিল। তাঁর মননের একটা অক্ষ তৈরি হয়েছিল মার্ক্সবাদকে ধরে। কিন্তু সেখানেও তাঁকে বিরোধিতা করতে হয়েছে, তর্ক করতে হয়েছে, তর্কে অনেক সময় জিতেছেন, অনেক সময় হেরেছেন। মননের এই মার্ক্সবাদী অক্ষটিকে তাঁর পরিপার্শ্ব চলমান রেখেছে। আর বাইরের সেই তর্কবিতর্ক থেকে তিনি সরে গেছেন কখনো 'অন্বিষ্ট'তে।

একজন কবি আর কতদিন কবিতা লেখেন, পঁচিশ বছর, তিরিশ বছর, চল্লিশ বছর, বা, এমন-কি, পঞ্চাশ বছরও। কবিতা লেখাটাকে এতদিন অভ্যস্ত রাখা কঠিন। কেউ বেশি লিখে সেই অভ্যাসটাকে শরীরগত করে নেন। কেউ কম লিখে বলার কথা জমা করে রাখেন। বিষ্ণুবাবুর এই মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট অক্ষ তাঁকে চলমান রেখেছিল। কিন্তু বোধহয় সেখানেই তাঁর কবিতার একটা গতি খাত পেয়ে গিয়েছিল, সেই খাতটার মধ্যেই তাঁর কবিতার জোয়ার-ভাঁটা খেলত। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশ কংগ্রেসের আগে পর্যন্ত কমিউনিস্ট-মার্ক্সবাদী জীবনভাষ্যে কোনো চাঞ্চল্য ছিল না। ছিল না বললে ভুল বলা হবে। আমাদের দেশে সেই চাঞ্চল্য প্রথম এসেছিল ১৯৪৮ থেকে ৫০ সালে— কমিউনিস্ট পার্টি যখন বেআইনি হল। তার আগে পর্যন্ত, 'সন্দীপের চর' অবধি, তাঁর কবিতায় কোনো সংশয় নেই। কবিতার উচ্চারণ সত্য উচ্চারণের সঙ্গে মিশে গেল আর সেটাই হয়ে উঠল কবিতার ভঙ্গি। তার পর কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরীণ বিরোধ সে কবিতাকে করে তুলল দ্বন্দ্বসংকুল। কিন্তু তখনো তো অভ্রান্ত ধ্রুবতারা ছিল সোভিয়েত পার্টি ও স্তালিন। তাই 'অন্বিষ্ট'-এর কবিতার দ্বন্দ্বের মধ্যেও এক চিরায়ত উপস্থিত

থাকে। সেই চিরায়তেই আঘাত লাগল সোভিয়েত পার্টির বিংশ কংগ্রেসে ও সোভিয়েত সরকারের হাঙ্গেরি-আক্রমণে। বিষ্ণুবাবুর কবিতা এই দ্বন্দ্বকে স্বীকার করে নিল না। যে-স্থিরবিন্দুতে তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বকে ও কবিতাকে বেঁধেছিলেন তাকে তিনি রক্ষা করতে চাইলেন। দেশের ভিতরে তখন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সম্পন্নতা আর দারিদ্র্য আমাদের এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার ভিতর ঠেলে দিয়েছে। সে-অভিজ্ঞতাকেও তিনি কবিতায় গ্রহণ করতে চাইছিলেন কিন্তু সেই গ্রহণের প্রয়োজনীয় কাঠামো ইতিপূর্বে তৈরি করে তোলেন নি। কোথায় একটা আর্তি জমা হচ্ছিল। সে-আর্তি কবিতার ভাষা খোঁজে। সেই সন্ধানেই শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যান 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'-এ। কবিরা কোন্ অজানা থেকে তাঁদের ভাষা পেয়ে যান— আমরা তা হাজার অনুমানেও জানতে পারি না। সব সময় সে-ভাষা যে আমরা পড়ে উঠতে পারি তাও নয়। রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের কবিতা তাঁর সমকালীনরা পড়ে উঠতে পারেন নি। জীবনানন্দের শেষ বয়সের কবিতা তাঁর সমকালীনরা ধরতে পারেন নি। হয়তো এখনও পর্যন্ত বিষ্ণু দে-র শেষ বয়সের কবিতার ভাষা আমরা ধরতে পারি নি। তিনি তো উচ্চারণ করেছিলেন, 'সেই অন্ধকার চাই।'

কিংবা এও তো হতে পারে 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'-এর পর থেকে তাঁর কবিতা আরও ডাইড্যাকটিক হয়ে পড়ছিল, সেখান থেকে কবিতা উঠে আসবে এই আশায়। কিন্তু 'অন্বিষ্ট', 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'-এর পর তৃতীয় ক্লাইম্যাক্স আর আসে নি। তখন দীর্ঘ কবিতা শুরু হয়ে অসম্পূর্ণ থাকে, ছোটো কবিতা সম্পূর্ণ হয়েও অসম্পূর্ণ থাকে।

কবিদের হয়তো আপনা মাংসে হরিণা বৈরী। কবিতা রচনার শুরুতে যে-উপকরণগুলিকে কবিতার পক্ষে প্রয়োজনীয় করে তোলেন, কবিতা রচনার শেষ পর্বে সেই উপকরণগুলিই হয়ে ওঠে ভার। তখন একে-একে সব অলংকার খোলার পালা শুরু হয়, নিরাভরণের হদিশ শুরু হয়। কিন্তু অনেক ভূষণই আজ শরীরের অঙ্গ হয়ে গেছে। সে ভূষণ আর শরীর থেকে খোলা যায় না। নিরাভরণকে খুঁজতে-খুঁজতে কখন নিজের অজ্ঞাতেই শেষ উচ্চারণ এসে যায়। সেটা যে শেষ উচ্চারণ তা না জেনেই শেষ উচ্চারণ করতে হয়। দু-একটি বিরল ক্ষেত্রে এই নিখিল চরাচরও কবির সঙ্গে কবিতা লেখে— তখন উচ্চারণের সমাপ্তি ঘোষিত হয়। রবীন্দ্রনাথে হয়েছিল। বিষ্ণু দে তাঁর কবিতার শেষ উচ্চারণ করতে পারেন নি। কেমন অস্পষ্টতায় হারিয়ে গেল তাঁর অবসান।

উপকরণের এমন আয়োজন আর-কোনো কবির ছিল কি? ছবিতে একদিকে যামিনী রায় আর-এক দিকে ক্যালকাটা গ্রুপ। গানে একদিকে রবীন্দ্রসংগীত, ভারতীয় মার্গসংগীত, ইয়োরোপীয় ক্ল্যাসিক্যাল। দর্শন। রাজনীতি। আর সব-কিছুতে তাঁর অবগাহনের পূর্ণতা। ছবি তাঁকে কেমন আবিষ্ট করত তা চোখে দেখি নি, তাঁর কবিতায় পড়েছি। তাঁর সেই বিখ্যাত আড্ডার ঘরে যামিনী রায়ের বিশালাকার ছবিগুলোও অংশ নিত। গান শুনতে দেখেছি— রবীন্দ্রসংগীত ও ইয়োরোপীয় ক্ল্যাসিক্যাল। হাতের আঙুলে কখনো-কখনো ছন্দ রক্ষা করতেন আর তাকিয়ে থাকতেন সেই কাছে কিন্তু দূরে। গায়ককে খুব একটা ফরমায়েশ করতেন না। মাঝে-মাঝে তাকিয়ে মৃদু হাসতেন। বোধহয় স্পর্শ করতে চাইতেন গায়কের ভিতরের স্বতঃস্ফূর্ততাকে, যে-স্বতঃস্ফূর্ততা ছাড়া গলা দিয়ে গান সুর হয়ে বেরবেই না। সেই নীরব চাহনির বিনিময়ে গায়ক তাঁর ভিতর থেকে গান গেয়ে উঠতেন। কোথাও একটা বিনিময় নিশ্চিতই ঘটাতে পারতেন। আর খুব স্বল্প তাকিয়ে অনুমান করতে চাইতেন গায়ক গানের সঙ্গে কতটা লিপ্ত হয়ে যাচ্ছেন। গানটা তাঁর শুধু শোনা ছিল না, গায়ককে অনেকখানি দেখাও ছিল। এক-একটা গানের নাটকীয় উপস্থাপনা তাঁর ভালো লাগত বেশি। ৭১-এ বাংলাদেশের শিল্পীদের একটা অনুষ্ঠানের পর, তার পরদিন সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরুণ সেনের সঙ্গে। আমাদের জন্যে দরজা খুলে দিলেন কিন্তু আমরা সবাই বসার আগেই নিজেই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন— 'কাল সনজীদা কী গান গেয়ে উদ্‌বোধন করলেন, আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে।' বলে হাসি মুখে হাতটা ঘুরিয়ে দিয়ে আবার বললেন, 'আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে।' আর, আমার অন্তত সেই প্রথম মনে হল আগের দিন সন্ধ্যায় সনজীদা খাতুনের গানের নির্বাচন ছিল কী অমোঘ। যখন যুদ্ধ চলছে তখন, 'আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে।' বিষ্ণুবাবু

অনুষ্ঠানে যান নি। তাঁর বাড়ির সবাই গিয়েছিলেন। তাঁদের কাছেই গানটার কথা শুনেছিলেন। তার পর আর ভুলতে পারেন নি। সেদিন আমরা যতক্ষণ ছিলাম প্রায়ই হাত ঘুরিয়ে বলছিলেন, 'আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে'। কোথাও একটা কবিতা তৈরি হয়ে উঠছিল হয়তো।

গান, ছবি, দর্শন, রাজনীতি, নন্দনতত্ত্ব— এই সবই কেমন অনায়াসে তাঁর কবিতার উপকরণ হয়ে ওঠে। তাতে তাঁর কবিতায় রামধনু জেগে ওঠে দিগন্ত জুড়ে অনবরত। কবিতার সংজ্ঞা বদলে যায়। কবিতার ছন্দে নতুন বাক্‌-স্পন্দ জেগে ওঠে। তাঁর কবিতার পাঠ এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে। শিল্পের সংজ্ঞা নতুন অর্থ পায়— যা মুহূর্ত আগেও কোথাও ছিল না, তা মুহূর্ত পরে চিরস্থায়ী এক উচ্চারণ হয়ে যায়। কবিতা তাঁর কাছে ছিল দিগ্‌বিজয়। তাঁর কখনো অস্ত্রের অভাব হয় নি।

আবার সেইজন্যেই তাঁকে মূল্য দিতে হয়েছে। তাঁর অসংখ্য কবিতা আছে যেখানে গান নেই, ছবি নেই, রাজনীতি নেই, দর্শন নেই, নন্দনতত্ত্ব নেই, অস্ত্র ব্যবহার নেই, দিগ্‌বিজয় নেই— শুধুমাত্র কয়েকটি চরণ আছে, যেন উদাসীন কয়েকটি চরণ, যেন এমন মাটিতে এমন পদচিহ্ন যা সারা বেলাতেও লুপ্ত হয় না। তাঁর সেই কবিতাগুলি পাঠকের মনোযোগ পায় নি। পাঠক একজন কবিকে এক রকম করে চিনে নিতে চায়। তার পর আর সেই চেনাটাকে বদলাতে চায় না। একজন কবির জন্যে পাঠক একবারই নিজেকে বদলায়। আরও ঘনঘন বদলাতে তার আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরে। বিষ্ণু দে-র বেলায় বাংলা পাঠক তাঁর একটা চেহারা অনেক কষ্টে চিনে নিয়েছে, তার পর আর সে-চেহারা সে বদলাতে চায় নি। বিষ্ণু দে তাঁর অজস্র রচনায় এখনো অপঠিত থেকে গেছেন। হয়তো মহৎ কবিরা তাই থাকেন। পৌত্র যখন পিতামহ হবে তখনো যাতে সেখানে পাঠোদ্ধারের সঞ্চয় কিছু থাকে।

দেবেশ রায়

শব্দকোষ : ইংরেজি থেকে বাংলা

কোনো সন্দেহ নেই, এই মুহূর্তে ঢাকার বাংলা একাডেমী বাংলা ভাষাচর্চা, গবেষণা, অভিধান ও সন্ধানপুস্তক প্রকাশনার সবচাইতে বড়ো ও সক্রিয় প্রতিষ্ঠান। তাঁদের কর্মকাণ্ড বিস্তৃত। অভিধান প্রকাশনা তার একটি। শব্দাভিধান ও বিষয় অভিধান মিলিয়ে কুড়িটিরও বেশি কোষগ্রন্থের প্রকাশক এই সংস্থা। বইগুলিতে বিদ্যাচর্চার যে ফসল সঞ্চিত হচ্ছে, ভবিষ্যতে তা-ই হবে বাংলা ভাষা অনুশীলনের আরও সমৃদ্ধরূপের ভিত্তিভূমি।

বাংলা পৃথিবীর একটিমাত্র দেশেরই রাষ্ট্রভাষা। দেশটির নাম বাংলাদেশ। কিন্তু আধুনিক বিশ্বে, বিশেষ করে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলির মানুষের পক্ষে কেবল মাতৃভাষা জানলে সব কাজ চালানো সম্ভব নয়। জানতেই হয় দ্বিতীয় একটি বিদেশী ভাষা। ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার অথবা অন্য কোনো কারণেই হোক, এই উপমহাদেশের দেশগুলিতে সে ভাষা ইংরেজি। এ দেশে ও বাংলাদেশে ইংরেজি-জানা মানুষ বেশ-কিছু আছেন। আর এও সত্য যে ইংরেজি-জানা মানুষেরা ইংরেজি-না-জানাদের থেকে ভালো অবস্থায় আছেন। তাই মাতৃভাষার ব্যাপকতর ব্যবহারের বিষয়ে যতই জোরালো আন্দোলন হোক-না কেন, এই উপমহাদেশের ইংরেজি-না-জানা মানুষের ইংরেজি শেখার ঝোঁক বাড়ছে। কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশনের ভাষাশিক্ষার বিদ্যালয়ে 'স্পোকন্ ইংলিশ'-এ ভর্তি হওয়ার জন্য যে লাইন পড়ে তা অত বড়ো ভবনটিকে সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলে। ভারতে রাজ্যে-রাজ্যে সংযোগের ভাষা মূলত ইংরেজি। বাংলাদেশে সে সমস্যা নেই। আবার ইংরেজি ভাষা শেখার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজিয়ানা অভ্যাসের যে প্রবণতা, যার ভিত্তি জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধে, তা ভারতে ক্রমবর্ধমান। বাংলা না জানা পশ্চিমবঙ্গের অনেক বাঙালি তরুণ-তরুণীর কাছে কোনো লজ্জার কারণ নয়, বরং এই না জানার মধ্যেই যেন আছে বেশ একটু গর্ব। ইংরেজিতে 'স্ট্রং' বাংলায় 'উইক' পড়ুয়াদের সংখ্যা উচ্চবিত্তদের মধ্যে আগে থেকেই বাড়ছিল, সম্প্রতি তা জেলাশহরে, এমন-কি, গ্রামেগঞ্জের নিম্নবিত্তদের মধ্যেও ছড়িয়েছে। জানি না বাংলাদেশে ব্যাপারটা অন্যরকম কি না। অনুমান করি, হয়তো সংখ্যাটা তত ভয়াবহ হয় নি সেখানে আজও, কিন্তু প্রবণতায় সম্ভবত কোনো ভিন্নতা নেই।

শুধু একটি ভাষা জানলেই যে চলবে না, এ কথা আলোচ্য অভিধানের শুরুতেই জানিয়ে দেন ঢাকার বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ। 'একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে বাঁচতে হলে এ ইংরেজিকে আয়ত্ত না করে কোনো উপায় নেই।' আয়ত্তীকরণকে সহজসাধ্য ও যথাযথ করতেই এই অভিধানটির প্রণয়ন। 'প্রসঙ্গ-কথা'য় পাই অন্যের ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি হক কথা। 'প্রত্যেক ভাষার একটি নিজস্ব বাকভঙ্গি এবং রীতি থাকে। সেখানেই ভাষার অনন্যতা। এই বাকভঙ্গি বা রীতির ভাষান্তর হয় না। এই ভঙ্গি এবং রীতিটিকে খুঁজতে হয়, জানতে হয়, অনুভব করতে হয় সে ভাষার নিজস্ব পরিমণ্ডলে। যে কোনো ইংরেজি শিক্ষার্থীকে তাই ইংরেজি ভাষার কথ্য ও লিখিত রূপটিকে ক্রমাগত শ্রবণ এবং বলার মাধ্যমে আয়ত্ত করতে হয়।' আয়ত্ত করার প্রধান উপায় তা হলে 'শ্রবণ' ও 'বলা', আর এটা যাঁরা করছেন তাঁদের সাহায্য করার জন্যই এই ইংরেজি-বাংলা অভিধান।

আয়তনে XVI + ১০৮৮ + ৩০ পৃষ্ঠা। প্রসঙ্গ-কথা, ভূমিকা, অভিধান ব্যবহারবিধি, উচ্চারণ ও প্রতিবর্ণীকরণ, ABBREVIATIONS প্রথম ষোলো পৃষ্ঠায় (I–XVI)। এর পর ১০৮৮ পৃষ্ঠার অভিধান দু কলমে ছাপা। অর্থাৎ অভিধানটি মাপে বেশ বড়ো। শেষ ৩০ পৃষ্ঠার পাঁচ পৃষ্ঠা জুড়ে IRREGULAR VERBS (পরিশিষ্ট ১) ; ছয় পৃষ্ঠার COMMON ABBREVIATIONS (পরিশিষ্ট ২) ; পাঁচ পৃষ্ঠার AFFIXES (পরিশিষ্ট ৩) ; আট পৃষ্ঠা জুড়ে NUMERICAL EXPRESSIONS (পরিশিষ্ট ৪) ; WEIGHTS AND MEASURES (পরিশিষ্ট ৫) দু পৃষ্ঠা ; তিন পৃষ্ঠার PUNCTUATION (পরিশিষ্ট ৬) ও শেষের এক পৃষ্ঠায় মৌলিক পদার্থের নাম THE CHEMICAL ELEMENTS (পরিশিষ্ট ৭)।

অভিধানটিতে মূল শব্দ আছে কমবেশি পঞ্চাশ হাজার। কেমন করে পাওয়া গেল সংখ্যাটা ? বইটিতে কোনো উল্লেখ নেই এ বিষয়ে। গুনে দেখার সুযোগও হয় নি বর্তমান আলোচকের। তবে, কোনো স্বীকৃতি না থাকলেও এটি মূলত A.S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* — অভিধানটিকে অনুসরণ করে লেখা। এই ইংরেজি অভিধানটিতেই ঘোষণা আছে মূল শব্দের সংখ্যা বিষয়ে। সেই সূত্রেই জানা গেল সংখ্যাটি।

ইংরেজি-বাংলা অভিধান সংকলনে যদি সাহেবদের লেখা কোনো অভিধানকে আদর্শ বলে ধরা হয় তাতে দোষের কিছু নেই। বরং লাভের দিকটাই বড়ো। শব্দ, অর্থ ও উদাহরণে অক্সফোর্ডের ওই অভিধানকে অনুসরণ করা হলেও সম্পাদক বেশ-কিছু নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন এই অভিধানে যা আমাদের ভাবায় ও আকৃষ্ট করে। প্রথমেই বলা উচিত উচ্চারণ-নির্দেশের জন্য প্রতিবর্ণীকরণের পদ্ধতিটির কথা। তিনি আই.পি.এ. সংকেতলিপি ব্যবহার করেন নি, কারণ 'এর সঙ্গে অধিকাংশ পাঠকই পরিচিত নন।' তাই 'বাংলা অক্ষরে' উচ্চারণ দেখিয়েছেন। বাংলা স্বরধ্বনির উচ্চারণে হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ নেই, কিন্তু হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরবর্ণ ও স্বরচিহ্ন আছে। এইগুলিকে কাজে লাগানো হয়েছে। দীর্ঘ আ-এর জন্য 'াঃ'-চিহ্ন। হ্রস্ব-স্বরের জন্য উপরে স্বরবর্ণ। প্রধান অ্যাকসেন্ট বা স্বরাঘাতের প্রতীক উপরে দণ্ড-চিহ্ন, 'মৃদু স্বরাঘাতের' জন্য নীচে দণ্ড। *Abrasion* শব্দের প্রতিবর্ণীকরণ আ'ব্রেইশ্‌ন্‌। বুঝতে হবে প্রথম আ-এর উচ্চারণ হবে খুব কম সময় ধরে। 'ব্রে'-র উপর জোর বা অ্যাকসেন্ট। ই-ধ্বনি হবে খুবই সংক্ষিপ্ত, আর 'শ্‌ন্‌' প্রায় একইসঙ্গে বলতে হবে। ইম'পিআরিআলিজাম্‌ — জ-এর আ-কারটা ছোটো, এই আ-ধ্বনি প্রায় নেই বললেই চলে। মাঃসটাশিপ্‌ (*mastership*)। অভিধানটিতে অবশ্য এখানে দুটো মুদ্রণপ্রমাদ আছে — অ্যাকসেন্টের চিহ্ন নেই, নেই শেষের হস্‌ চিহ্ন। অবশ্য হস্‌-চিহ্নের অনুপস্থিতি যে মুদ্রণপ্রমাদ তা জোর করে বলা যাচ্ছে না। ওই চিহ্নটি কোথায় কী কারণে ব্যবহার করা হয়েছে, তার কোনো উল্লেখ নেই উচ্চারণ-সংক্রান্ত নির্দেশে। বই-এর মধ্যে অনেক জায়গাতেই ওই চিহ্নটি নেই, যদিও আমাদের মনে হয়েছে থাকা প্রয়োজন ছিল। যেমন ম্যাচ (*match*^{2}), ম্যাস (*mass*), ˌরী'গ্রুপ (*re-group*),'ভ্যালিট (*valet*), 'শোºটিজ (*shortage*), রীম (ream), ম্যাশ (*mash*),'ম্যারিজ (*marriage*), ম'রূন (*maroon*), মেইক (*make*),'ম্যাগনাম (*magnum*), ইক'সেল (*excel*), ই'কসেস (*excess*), ই'ভিনস (*evince*) — আরও অনেক আছে। তাই মনে হয় এই না থাকাটা হয়তো বিশেষ কোনো কারণে যার ব্যাখ্যা সম্ভবত ভুল করেই দেওয়া হয়ে ওঠে নি নির্দেশিকায়।

উচ্চারণ যা দেখানো আছে, তা ঠিক না ভুল এ তর্কে যাওয়া অনর্থক। একেবারে অন্যের ভাষার অনেক কিছুই হয়তো আয়ত্ত করা যায়, উচ্চারণ ঠিক ঠিক যায় না। ইংরেজরা কখনোই দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী 'আর' ছাড়া স্বরধ্বনির পরের 'আর' উচ্চারণ করেন না, আমেরিকানরা করেন— এটা কতদূর সত্য জানি না। কিন্তু আদ্য 'আর' যে উচ্চারিত হয় তার উল্লেখ থাকা দরকার ছিল। নইলে দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী ছাড়া অন্য 'আর'-এর উচ্চারণই হয় না— এমন একটা ধারণা হয়ে যেতে পারে। এইসব সত্ত্বেও

বঙ্গালিপির মাধ্যমে উচ্চারণ বোঝানোর যে রীতি এখানে ব্যবহৃত হল, তার তারিফ করি। একটু ঘষামাজায় এটাই অন্য ভাষার উচ্চারণও বাংলায় লেখার একটা সাধারণ রীতি হয়ে উঠতে পারে। আর শুধুমাত্র প্রতিবর্ণীকৃত শব্দ দেখে যে ঠিক ঠিক উচ্চারণ শেখা যায় না, সে-কথাও বইটিতে স্পষ্টভাবেই লেখা আছে। সঙ্গে সৎ পরামর্শ— শিক্ষার্থীরা যেন বি বি সি টিভি কিংবা রেডিয়ো শোনেন।

শীর্ষ শব্দের পরে যে বিবৃতি থাকে তাকে বলা হয়েছে ভুক্তি। কী কী আছে এই ভুক্তিতে ? (শীর্ষশব্দে) শব্দটা কোথায় ভেঙে লেখা/ছাপা যাবে তার চিহ্ন, উচ্চারণ, পদপরিচয়, বিশেষ্য হলে তা গোনা যায় কি যায় না তার উল্লেখ ; ক্রিয়া হলে তা সকর্মক না অকর্মক— সে খবর ; শব্দটির সঙ্গে আর কিছু যোগ হয়ে অন্য শব্দ তৈরি হলে সে শব্দগুলিও আছে ; বিশিষ্ট কিংবা আলংকারিক প্রয়োগজনিত অর্থান্তর ; বাক্যাংশ ক্রিয়া ; আছে বহুবচনের রূপ, পদান্তর, অর্থান্তর ও অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োগের দৃষ্টান্ত বাক্য অথবা বাক্যাংশে শব্দটির প্রয়োগ। নেই কেবল ব্যুৎপত্তি। কিন্তু তা আর কজন খোঁজেন ? সেজন্য অন্য অভিধান আছে। সাধারণ একজন পাঠকের একটা দুই ভাষার অভিধানের কাছে যা চাহিদা থাকতে পারে, তার প্রায় সবটাই মেটে এতে। বরং বাড়তিও কিছু পাওয়া যায়। দেখাই যাক কয়েকটা :

> **future** ['ফিউ্যচা(র্)] *n, adj* ১ [U, C] ভবিষ্যৎ, ভবিতব্য, ভাবী, ভবিষ্য, ভাবীকাল, উত্তরকাল। for the ~ ভবিষ্যতের জন্য : provide for the ~ ভবিষ্যতের সংস্থান করা। in ~ ভবিষ্যতে। ২ (*adj* কিংবা *n*-এর atrib প্রয়োগ) ভবিষ্যৎ, ভাবী, ভবিষ্যমান : the ~ life, পরকাল ; his ~ wife তার ভাবী বধূ। ৩ *pl* (বাণিজ্য) যে-পণ্য কেনার সময়ে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করা হলেও যার মূল্যপরিশোধ ও হস্তান্তর ভবিষ্যতে হবে ; ভাবীপণ্য। ~·less *adj* ভবিষ্যৎশূন্য।

[U], [C], [U, C] সংকেত কেবল বিশেষ্য পদের জন্য : [U]— গোনা যায় না, [C]— গোনা যায়, [U, C] — দুরকমই হওয়া সম্ভব। *future* বিষয়ে যা জ্ঞাতব্য, তার সবটাই আছে, প্রয়োগও আছে। কেবল ৩ নম্বর অর্থের একটা-দুটো উদাহরণ দিলে ভালো হত। *future* দিয়ে তৈরি অন্য শব্দ *futurism, futurist, futurity,* পৃথক্‌ভাবে যথাস্থানে পাওয়া যায়।

> **mir·ror** ['মিরা(র্)] *n* ১ আয়না, আরশি, দর্পণ, মুকুর। ~ '**image** কোনো বস্তুর প্রতিবিম্ব বা প্রতিলিপি যাতে ডান ও বামের অবস্থান উল্টে যায় ; উল্টা ছবি। ২ (লাক্ষ.) যা কোনো কিছু প্রতিফলিত করে ; দর্পণ : The book in [*sic.*] a ~ of our society. ☐ *vt* (সাহিত্য বা লাক্ষ.) প্রতিফলিত/প্রতিবিম্বিত/মুকুরিত করা।

বেশ ভালোই তো মনে হয়। কিন্তু আরও কিছু উদাহরণ নিলে কিছু কিছু অসুবিধের দিকটা এসে পড়ে।

> **evol·ution** [ˌঈভ়া'লূশ্‌ন্ US : ˌএভ়] *n* ১ [U] বিকাশের প্রক্রিয়া, বিবর্তনপ্রক্রিয়া : He prefers ~ to revolution. ২ প্রাণের বিকাশ সংক্রান্ত বিবর্তন মতবাদ। ২ [*sic.*] (সৈন্যদল, যুদ্ধ-জাহাজ অথবা নৃত্যশিল্পীদের) পরিকল্পিত পদচারণা। ~·**ary** [ˌঈভ়া'লূশানরি US* : ˌএভ়া'লূশানেরি] *adj* বিবর্তনমূলক।

এইখানে দুজায়গায় খটকা লাগে। প্রথমত 'বিবর্তন' ব্যাপারটা 'প্রাণের' না 'প্রাণীর' বিকাশ সংক্রান্ত ? আমরা কিন্তু দ্বিতীয়টাই জানতাম। আর সৈন্যদল কিংবা নৃত্যশিল্পীদের 'পরিকল্পিত পদচারণা' বোঝা যায়। কিন্তু 'যুদ্ধ-জাহাজের' পদচারণা ? কেন হল এইরকম ? উত্তরটা একটু খুলে বলাই ভালো। এই অভিধানটি হর্নবি-র অভিধান অনুসরণে তৈরি বলে যে কথা বলা হয়েছিল, তা একটু সংশোধন

করে দিতে হয়। এটি প্রকৃতপক্ষে হর্নবি-র *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*-এর বঙ্গানুবাদ। কয়েকটি বাড়তি এন্ট্রি অবশ্য আছে এতে। কিন্তু অনুবাদে আড়ষ্টতা এড়ানো যায় নি বহু জায়গাতে। অক্সফোর্ডের অভিধানটিতে এ প্রসঙ্গে আছে '3[C] movement according to plan (of troops, warships, dancers etc.)'। ইংরেজি *movement* শব্দের অনেক অর্থের মধ্যে একটি হতেই পারে 'পদচারণা', তবে অভিধানের মধ্যে তাকে জাহাজের সঙ্গে না লাগালেই যেন ভালো হত। এ তো গেল হুবহু বঙ্গানুবাদের সমস্যা। আবার তাকে এড়াতে গেলে যে সমস্যা আছে তাও এই একই এন্ট্রির 'বিবর্তন'-বিষয়ক 'ভুক্তি'তে পাওয়া যাচ্ছে। হর্নবি-তে আছে (*evolution*) '2 [U] (theory of the) development of more complicated forms of life (plants, animals) from earlier and simpler forms' যাকে এড়িয়ে গিয়ে 'প্রাণ' ও 'প্রাণীর' গোলমালটা এনে ফেলা হল। শুধু 'বিবর্তন' হলেও চলত। লক্ষণীয় এই অভিধানে 'বিবর্তন মতবাদ' আছে, যা কিনা 'theory of evolution', আর এই কারণেই হর্নবি 'theory of the' অংশটি বন্ধনীতে ঢুকিয়ে দেন। 'complicated forms of life'-কেও স্পষ্টতর করেন বন্ধনীর মধ্যে 'plants, animals' যোগ করে। এই ইংরেজি-বাংলা অভিধানে অনুবাদ করতে গিয়ে বাংলার 'ভঙ্গি ও রীতিটিকে' প্রায়শই রাখা যায় নি তার 'নিজস্ব পরিমণ্ডলে'। অনেক ভুক্তির বাংলা অংশ তাই যেন অ-বাংলা শোনায়।

আর এই কারণেই অনেক জায়গাতেই বাংলা-অংশের অর্থোদ্ধারে দ্বারস্থ হতে হয় মূল বইটির অর্থাৎ 'অ্যাডভান্সড্ লার্নারস'-এর। যেমন, *maul* শব্দের অর্থ 'দুর্ব্যবহার বা অত্যাচারের মাধ্যমে আঘাত করা'। 'দুর্ব্যবহার', 'অত্যাচার' কেমন করে হতে পারে আঘাতের মাধ্যম ? অতএব আবারও যেতে হয় উৎসে। সেখানে আছে 'hurt or injure by rough or brutal handling'— তখনই বোঝা যায় ব্যাপারটা। কিন্তু এইখানে যে অনেকগুলি প্রয়োগ দেখানো আছে তা নেই বাংলা-ইংরেজি অভিধানটিতে। ধাঁধায় পড়ি *quasar*-এর সংজ্ঞায়। 'অত্যন্ত দূর থেকে আগত রেডিও অথবা আলোক-তরঙ্গ।' তাই ? কোন্‌টা *quasar* ? তরঙ্গ না তার উৎস ? ফলে আবারও হর্নবি খুলতে হয়— 'very distant source of radio or light waves'— বিজ্ঞানের অভিধানেও এইরকমই পাওয়া যায়। মনে হয় যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন না অনুবাদক। *pea-jacket* কী ? 'নাবিকদের ব্যবহার্য ছোট আকারের দুই বুকওয়ালা মোটা উলের ওভারকোট।' কোন্‌টার দুই বুক ? 'মোটা উলের' না 'ওভারকোটের' ? এ প্রশ্নটা অবশ্য নেহাত প্রশ্ন করার জন্যই করা, কারণ উলের দুই বুক হতে পারে না। কিন্তু বাক্যের গঠন থেকে এ প্রশ্নটা আসে। আরও আসে ছোটোই বা কোন্‌টা ? 'ওভারকোট' না 'বুক' ? এটা কিন্তু বোঝা যায় না সত্যিই। তাই সাহেবের বই দেখি— 'short double-breasted overcoat of thick woollen cloth, as worn by sailors'— এর অনুবাদেই বিপত্তির একশেষ। *pine* —'দেবদারুর মতো চিরহরিৎ সুচের মতো দেখতে পত্রবিশিষ্ট খাড়া বৃক্ষবিশেষ।' এটা কি বাংলা ? কী ছিল উৎসে ? 'Kinds of evergreen tree with needle-shaped leaves.'। *pinch-beak*-এ পাই 'সস্তা গহনায় ব্যবহারের জন্য অ্যালয় ও জিঙ্কের মিশ্রিত সংকর ধাতু।' অ্যালয় মানেই তো সংকর। 'alloy of copper and zinc, simulating gold, used in cheap jewellery, etc.'— এর অনুবাদে এতটা বিপাকে পড়াটা খুবই আশ্চর্যের। *gear*-কে অতি সহজেই বলে দেওয়া হয়, 'যন্ত্রের, বিশেষ যান্ত্রিকযানের চালক অংশ ; গিয়ার ;...'। 'যান্ত্রিক যানের চালক অংশের' কী অর্থ হবে বোঝা যাচ্ছে না। যাঁরা শব্দটির সঙ্গে পরিচিত তাঁরা একরকম বুঝবেন। অন্যদের ভাবনায় ইঞ্জিনটাই গিয়ারের প্রতিশব্দ হয়ে ওঠার আশঙ্কা। গিয়ার বলতে মোটর গাড়ির 'গিয়ার বক্সকেই' ধরা হল, দাঁত-কাটা চাকার কোনো উল্লেখ রইল না। হর্নবি-তেও

নেই। কিন্তু সেখানে ছবিতে দেখানো আছে নানান ধরনের গিয়ার। এই বইতে ছবি নেই। *lark* হল 'ছোট গানের পাখি, বিশেষত skylark ; ভরতপাখি।' 'ছোট গানের পাখি' কেন ? না মূল বই-এ আছে 'small songbird, esp the skylark.'। এইসব উদাহরণে কিছুটা শঙ্কিত হয়ে পড়ি, বাংলা একাডেমীর মতো সম্ভ্রান্ত বিদ্যাচর্চা কেন্দ্রের বইতে বাংলা ভাষার এইসব নমুনা আমাদের বিহ্বল করে তোলে। পাতা ওলটালেই নানান রকম বিস্ময় অপেক্ষা করে থাকে। *ice-hockey* হল 'জমাট বরফের উপর ছয়জন খেলোয়াড়-সংবলিত দুই দলের মধ্যে একটি রাবারের চাকতি-সহযোগে ক্রীড়নীয় খেলাবিশেষ (খেলোয়াড়দের পায়ে থাকে স্খলনপাদুকা এবং হাতে যষ্টি) ; তুষার হকি।' স্খলনপাদুকা কী ? সেটা হল *skate*-এর বাংলা। মূল বইতে আছে 'wearing skates'.। কিন্তু skate-এ স্খলনপাদুকা পাই না। *skate* : 'বরফের উপর দিয়ে দ্রুতগতিতে পিছলে চলার জন্য বুটজুতার তলায় লাগানো ইস্পাতের পাত ; স্কেট।' 'One of a pair of sharp-edged steel blades to be fastened to a boot for moving smoothly over ice'— এই আছে মূল বইতে। এই 'ইস্পাতের পাত' যে কীভাবে 'স্খলনপাদুকা' হয়ে রইল তার উত্তর পাওয়া যায় না।

এই জাতীয় আরও অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া চলে। আর তা থেকে তুলে ধরা যায় অভিধানটির প্রধান দুর্বলতা। কিন্তু সেখানেই থেমে গেলে এই বড়োসড়ো অভিধানটির আলোচনা সম্পূর্ণতা পাবে না। বস্তুত ইংরেজি ভাষা ও ভাষারীতির সঙ্গে পরিচয় করানোর জন্য কোনো মৌলিক ও অপরীক্ষিত পন্থায় না গিয়ে তাঁরা যে একটি বহুল-প্রচারিত ইংরেজি অভিধানকে অনুসরণ করেছেন, তা নিঃসন্দেহে সমর্থনযোগ্য। আমরা পেয়ে যাই প্রচুর ইংরেজি শব্দবন্ধ, ফ্রেজ়াল ভার্ব কিংবা সংযোগমূলক ক্রিয়া আর দৃষ্টান্ত বাক্য অথবা বাক্যাংশ। অনেক দৃষ্টান্তবাক্যকে হুবহু অনুবাদ না করে তাকে দেশ-কালের উপযুক্ত করে নেওয়া হয়েছে। এতে ভালো বৈ মন্দ হয় নি। কখনো বা অর্থ লেখাতেও ঈষৎ পরিবর্তন করা হয়েছে ইংরেজি মূল-এর। যেমন, *limousine* শব্দে। 'Large, luxurious motor-car with an enclosed body the front seats being separated by means of a partition (as in a London taxi)'। এখানে তাকে বদলানো হল। তাতে ভালোই হওয়ার কথা, কারণ লন্ডন ট্যাক্সির উদাহরণ এ দেশে বোধগম্য হবে না। পরিবর্তে পাওয়া গেল, 'কাঁচের গ্লাস দিয়ে সামনের অংশ পৃথককৃত বিলাসবহুল মোটর গাড়ি।' কিন্তু 'কাঁচের গ্লাস' দিয়ে পৃথক্‌কৃত !

এইসব খানাখন্দ বাদ দিলে অভিধানটি অবশ্যই একটি কাজের অভিধান হয়ে উঠতেই পারে। কিছু প্রশ্ন থেকেই যায়। অভিধান নির্ভুল হবে, তাকে ব্যবহারকারীরা নির্ভয়ে ব্যবহার করবেন— এটাই তো কাম্য। কিন্তু তা-ও কি বলা যাবে নির্দ্বিধায় ? বিশেষ্য শব্দে [U], [C] ব্যবহার করা হয়েছে। কেন— তা-ও আলোচিত হয়েছে আগে। কিন্তু সব বিশেষ্যের সঙ্গেই তো ওইরকম কোনো মার্কা থাকা উচিত। কিন্তু অনেক বিশেষ্যের ক্ষেত্রেই তা নেই। যেমন, ***cistern, circus, clapper, dictionary, item, obelisk, parent, screw, sea*** ইত্যাদি আরও অজস্র শব্দ। ব্যবহার-বিধি এই বিষয়ে নীরব। অতএব দেখতে হয় ***Advanced Learner's Dictionary*** যেখানে স্পষ্ট ব্যাখ্যা আছে উদাহরণসহ। যে বিশেষ্য শব্দের বহুবচনের রূপ হয় তাদের [C]-মার্কা দেওয়া হয়েছে। একবচনে এদের আগে *a, an,* ***another*** বসতে পারে। যাতে [C] অথবা [U] কিছুই নেই তারাও এই শ্রেণীর। [U]-মার্কা বিশেষ্য হলে তার বহুবচনের রূপ হয় না। এদের আগে ***some, enough, much, more*** লাগতে পারে, কিন্তু ***a, an*** হবে না। এই অতি জরুরি বিষয়টির ব্যাখ্যা না থাকায় এই অভিধান ব্যবহারকারীরা অসুবিধায় পড়বেন। যা দাঁড়িয়েছে তাতে বাংলা একাডেমীর এই ইংরেজি-বাংলা অভিধানটি ব্যবহার করতে হলে হাতের কাছে হর্নবি-র বইটিও রাখতে হবে।

ভূমিকায় বাংলা একাডেমীর কম্পিউটার বিভাগের 'নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের' প্রতি 'কৃতজ্ঞতা প্রকাশ' করা হয়েছে। তাঁদের জন্যই 'মুদ্রণের জটিল কাজটা শুরু করা সম্ভব হয়'— এ কথাও জানা যায় ওই ভূমিকা থেকে। মুদ্রণে কম্পিউটার লাগে প্রধানত প্রি-প্রেস অর্থাৎ টাইপসেটিং-এর কাজে। বইটির কাজ দেখে কম্পিউটার প্রযুক্তিতে তাঁদের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেলেও টাইপোগ্রাফি বিষয়ে কোনো উচ্চ মানের কাজের নমুনা এখানে নেই। হরফের সৌন্দর্যের দিকটাকে টেকনোলজির কাছে হার মানানো হয়েছে। যুক্তবর্ণের ক্যারেকটার ফ্র্যাগমেন্টসগুলিকে 'এক্স' হাইটের মধ্যে রাখার ব্যাপারটা অনুপস্থিত। ৪২৭ পৃষ্ঠার 'অক্ষুণ্ণ', শব্দটির চেহারা দৃষ্টিকটু। কার্নিং-এর অসামঞ্জস্য সর্বত্র। উ-কার 'ম'-, 'য'-এর সঙ্গে ঠিক জায়গাতেই লাগে, কিন্তু 'ক'-, 'ফ'-এর সঙ্গে নয়। 'গ'-, 'শ'-এর উকার স্বচ্ছ করা হয়েছে, কিন্তু স্ + ত্ + উ কিংবা ন্ + ত্ + উ রয়ে গেছে সাবেকি সাটের। র-ফলা নেমে গেছে বেশি নীচে। আর চিহ্নটাও একটু স্থূল। আরও আছে এই ধরনের ব্যাপার। আশা করি বাংলা একাডেমীর দক্ষ কর্মীরা এই বিষয়ে আরও নজর দেবেন। বইটির মুদ্রণের কাজ ভালো। টাইপোগ্রাফির গোলমালের জন্য দেখতে খারাপ লাগে, কিন্তু সে দায় অফসেট প্রিন্টারদের ওপর বর্তায় না। কাগজও বেশ ভালো। কাপড়ের বাঁধাই হলে ভালো হত, কারণ কাগজের বাঁধাই কিছুদিনের মধ্যেই ছিঁড়ে যাবে।

মুদ্রণপ্রমাদ কিছু আছে— কিন্তু প্রথমে উল্লেখ-করা হস্-চিহ্নের ব্যাপারটাকে বাদ দিলে খুব বেশি নয়। *sap*²-তে সকর্মক ক্রিয়ার চিহ্নের পরই এসে পড়ে কাউন্টেব্‌ল নাউনের সংকেত [C]। ৭০০ পৃষ্ঠায় 'অপরাহ্ন', ৬৫১ পৃষ্ঠায় 'অপসৃয়মান' (একে মুদ্রণপ্রমাদ বলব ?)। তবে এই আয়তনের বইতে এই প্রমাদের সংখ্যা বেশি নয়।

সিলেব্‌ল-অর্থে 'শব্দাংশ' শব্দটির ব্যবহার দেখে মনে হয় একটা ভালো পারিভাষিক শব্দ পাওয়া গেল। কিন্তু একটু ভাবলেই অসুবিধেটা টের পাওয়া যায়। আম, স্ত্রী, গান, ওই— প্রভৃতি অসংখ্য এক সিলেব্‌লের শব্দের ক্ষেত্রে অংশই হয়ে দাঁড়াবে সম্পূর্ণের সমান। এই কারণে 'শব্দাংশ' কথাটির এইরকম ব্যবহার কি ঠিক হবে ? এই অভিধানের পরিশিষ্ট অংশগুলি অত্যন্ত ভালো ও কাজের। বিশেষ করে AFFIXES ও IRREGULAR VERBS-এর তালিকায় সবাই উপকৃত হবেন।

Zillur Rahman Siddiqui, ed., *Bangla Academy English-Bengali Dictionary*, Bangla Academy, Dhaka, 1993. Tk 120·00 US $ 10·00.

অশোক মুখোপাধ্যায়

নাট্যজিজ্ঞাসা

নাট্যকলার আলোচনা— তার তত্ত্বের ব্যাখ্যা, তথ্যের বিবরণী বা নাটকের ভাষ্য— পাশ্চাত্য সমালোচনা— সাহিত্যের একটি অপরিহার্য অঙ্গরূপেই স্বীকৃত। সেখানে তার চলার গতিটিও একটি অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত। প্রাচীন গ্রিসে অ্যারিস্টটল-এর কাব্যতত্ত্ব দিয়ে যার সূচনা, সেই ইয়োরোপীয় নাট্য-সমালোচনার ধারা এই বিংশ শতাব্দীতেও বেকেট্-ব্রেশ্‌ট্-স্তানিস্লাভ্‌স্কি-র নাট্যতত্ত্বের ব্যাখ্যায় সমৃদ্ধ হয়েছে, রেমন্ড উইলিয়ম্‌স্ - মার্টিন এস্‌লিন - চার্লস মারোভিৎস্ -এর নাট্যভাষ্যে পরিপুষ্ট হয়েছে। এমন-কি, শুধু

শেক্সপিয়ার-কে কেন্দ্র করেই নাট্য-সমালোচনার একটি বিশেষ ধারা গড়ে উঠেছে। প্রতিতুলনায়, ভারতীয় সমালোচনা-সাহিত্যে নাট্য-আলোচনা/সমালোচনার তেমন কোনো ক্রমবিকাশ প্রায় নেই বললেই চলে। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' আধুনিক ভারতীয় নাট্যচিন্তাকে অনেকাংশে বিশ্লেষণ করতে অপারগ জেনেও, বহু সময়ে আমরা তারই দ্বারস্থ হই বিকল্প ভারতীয় নাট্যতত্ত্বের অভাবে। বাংলায় অবশ্য নাট্যকলার কিছু আলোচনা, কিছু ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা সময়ে সময়ে হয়েছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন জায়গায়, বিক্ষিপ্তভাবে হলেও, নাট্যশিল্প সম্পর্কে কিছু উক্তি, কিছু মন্তব্য করেছেন, যার মধ্য দিয়ে তিনি প্রায়শই পাশ্চাত্য নাট্যের বিপরীতে ভারতীয় নাট্যরীতির স্বকীয়তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন :

> আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রবরূপে প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলেমানুষি। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা। —'ভূমিকা', তপতী[১]

বা,

> ভাবুকের চিত্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ আছে, সে রঙ্গমঞ্চে স্থানাভাব নাই। সেখানে জাদুকরের হাতে দৃশ্যপট আপনি রচিত হইতে থাকে। সেই মঞ্চ, সেই পটই নাট্যকারের লক্ষ্যস্থল ; কোনো কৃত্রিম মঞ্চ ও কৃত্রিম পট কবিকল্পনার উপযুক্ত হইতে পারে না।
>
> —'রঙ্গমঞ্চ', বিচিত্র প্রবন্ধ[২]

তেমনি গিরিশচন্দ্রও তাঁর নাট্যচিন্তা বিবৃত করেছেন তাঁর একাধিক প্রবন্ধে— 'রঙ্গালয়' (১৩০৭), 'বর্ত্তমান রঙ্গভূমি' (১৩০৮), 'নাট্যকার' (১৩১৭) ইত্যাদি।[৩] তা ছাড়া, বিশেষ বিশেষ নাট্যকারের নাট্য-প্রতিভা নিয়েও অনেক অন্তর্ভেদী পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। সেসবই বাংলার নাট্য-সমালোচনাকে নানা দিক থেকে পুষ্ট করেছে। তবু, নাট্যকলায় তত্ত্ব ও কর্মের সমন্বয়ে সামগ্রিকভাবে বাঙালির নাট্যচেতনার বিকাশ, বা সেই চেতনার সঙ্গে ভারতীয় নাট্যভাবনার সংযুক্তি— এই ধরনের আরও আলোচনার এখনও প্রয়োজন আছে। যেমন প্রয়োজন আছে বাংলা নাট্য-সমালোচনার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতার প্রতিষ্ঠা।

শম্ভু মিত্রের নাট্যবিষয়ক আলোচনাকে আমাদের বিচার করতে হবে এই প্রেক্ষাপটে। নাট্যকলার ব্যাখ্যা তিনি অনেক আগেই করতে শুরু করেছিলেন, তাঁর টুকরো প্রবন্ধের মধ্যে। সেসব প্রবন্ধ পরে সংকলিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পেয়েছে। নাট্যবিষয়ক আলোচনা নিয়ে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'অভিনয়-নাটক-মঞ্চ' (১৯৫৭) ; তার পর এল 'প্রসঙ্গ : নাট্য' (১৯৭৯)। কিন্তু এখানেই তিনি থেমে থাকেন নি। এই ন'য়ের দশকে পৌঁছেও তিনি পরপর তিনখানি মূল্যবান গ্রন্থ আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন : 'সন্মার্গ সপর্যা' (১৯৯০), 'কাকে বলে নাট্যকলা' (১৯৯১) এবং 'নাটক রক্তকরবী' (১৯৯২)। মূলত এই তিনটি গ্রন্থকে আশ্রয় করেই আমাদের এই আলোচনা। তবে, স্বাভাবিক কারণেই মাঝে-মধ্যে আগেকার দুটি গ্রন্থেরও দরকার হয়ে পড়বে।

'সন্মার্গ সপর্যা'-র অনেক রচনা আগে প্রকাশিত হয়েছিল 'অভিনয়-নাটক-মঞ্চ' বা 'প্রসঙ্গ : নাট্য' গ্রন্থে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুনর্মুদ্রণের সময়ে এসেছে পরিবর্তন বা পরিমার্জন। যেমন, 'বাংলা থিয়েটার' প্রবন্ধটি 'অভিনয়-নাটক-মঞ্চ'-তে পূর্বপ্রকাশিত (পৃ. ২৫-৩৪)। অল্প কিন্তু লক্ষণীয় কিছু বদল ঘটিয়ে[৪], এটিকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে 'সন্মার্গ সপর্যা'-য় (পৃ. ১২-১৬)। আবার 'প্রসঙ্গ : নাট্য'-তে অন্তর্ভুক্ত 'স্বাভাবিক অভিনয়' (পৃ. ৪৩-৫৯), কিছু পরিবর্তিত রূপে এসেছে 'সন্মার্গ সপর্যা'-য়, 'একটি আলোচনা' শিরোনামে (পৃ. ৬৮-৭৬)। উল্লেখ্য, নাটক-রচয়িতাকে 'নাট্যকার'-এর পরিবর্তে 'নাটককার' রূপে চিহ্নিত করার যুক্তি 'প্রসঙ্গ : নাট্য'-এর সর্বশেষ নিবন্ধে এসেছে এইভাবে : '...নাটক যিনি লেখেন তিনি নাটককার, আর পুরো নাট্যের যিনি রূপ দেন তাঁরই নাম নাট্যকার হ'লে ঠিক শোনায়' ('অতঃ কিম্ ?', প্রসঙ্গ : নাট্য, পৃ. ২৩৮)। সন্মার্গ সপর্যা-র সর্বত্রই নাট্যকারের পরিবর্তে নাটককার শব্দেরই

প্রয়োগ হয়েছে নাটক-রচয়িতাকে নির্দেশিত করতে। এই পরিবর্তন তো শুধু শব্দচয়নের পরিবর্তন নয়, এখানে একটি ধারণাগত পরিবর্তনেরও ইঙ্গিত আছে।[৫]

আলোচ্য দ্বিতীয় গ্রন্থ, 'কাকে বলে নাট্যকলা' প্রধানত একটি বক্তৃতার অনুলিপি ; তাই এর মধ্যে 'মুখে-মুখে বলার ধরনটাই রাখা আছে' ('ভূমিকা', কাকে বলে নাট্যকলা, পৃ. ৭)। তবু, এই সহজ 'বিবরণ ভঙ্গি'-র মধ্যে থেকেই তিনি 'কাকে বলে নাট্যকলা'-র মতো একটি জটিল বিষয়ের অবতারণা করেছেন। বিষয়বস্তুর জটিলতা সত্ত্বেও এক সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত, অনায়াস ভঙ্গিতে তার ব্যাখ্যান চলে এই গ্রন্থে। কত গভীরভাবে একটি বিষয়কে অনুধাবন করলে এমন সহজ হওয়া সম্ভব তাই দেখে আমরা চমৎকৃত হই।

আর 'নাটক রক্তকরবী' নাট্যশিল্পের প্রয়োগ-কুশলতার এক অসাধারণ নিদর্শন। ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত একটি নাটককে কীভাবে নাট্য-উপযোগী করে, অর্থাৎ পারফর্মেটিভ টেক্সট হিসেবে, পাঠ করতে হয়, কীভাবেই বা সেটিকে মঞ্চে জীবন্ত করে তোলা যায়, তা-ই তিনি আমাদের হাতে ধরে শিখিয়েছেন এই গ্রন্থে। আগের কিছু রচনাতেও তিনি এ-ধরনের কাজ করেছিলেন— যেমন, 'রক্তকরবী' (প্রসঙ্গ : নাট্য, পৃ. ১৪১-১৫৫) বা 'ইয়োকাস্তে' (প্রসঙ্গ : নাট্য, পৃ. ১৬৮-১৭৩ ; সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ৭৭-৮০)। তবু 'নাটক রক্তকরবী'-তে একটা গোটা নাটককে— 'রক্তকরবী'-র মতো একটা নাটককে— আদ্যোপান্ত এইভাবে বিশ্লেষণ করার ফলে নাট্যকলার একটা সামগ্রিক চেহারা, একটা টোট্যাল থিয়েটার আমাদের চোখের সামনে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

২.

আলোচ্য এই তিনটি গ্রন্থেই শম্ভু মিত্র নাট্যকলার নানা তত্ত্ব ও তথ্য উপস্থাপিত করেছেন। সেসবের বিশদ আলোচনায় যাওয়ার আগে দু-একটি কথা হয়তো স্পষ্ট করে নেওয়া দরকার। গোড়াতেই মনে রাখতে হবে যে শম্ভু মিত্র প্রধানত নাট্যকর্মী। অর্থাৎ, তিনি মুখ্যত অভিনেতা এবং/অথবা প্রযোজক (বা তাঁর নিজের পরিভাষায়, 'নাট্যকার')— সেই তাঁর আদি পরিচয়। তাঁর নাট্যবিষয়ক আলোচনা বা এমন-কি তাঁর নিজের নাটকরচনা এসেছে তার পরে। 'সন্মার্গ সপর্যা'-র ভূমিকায় তিনি নিজেই বলেছেন :

> প্রবন্ধ লেখাটা তো আমার মূল কাজ নয়। আমার নাট্যকর্মের পরিপ্রেক্ষিতেই এর অস্তিত্ব।
>
> —'ভূমিকা', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ৫।

নাটক রচনার নেপথ্য কাহিনীও হয়তো বা তা-ই ; 'ভালো' নাটকের অভাবেই পরিচালক/প্রযোজককে নিজেই নাটক-রচনায় ব্রতী হতে হয়। মোট কথা, শম্ভু মিত্রের এইসমস্ত প্রবন্ধে নাট্যকলা নিয়ে যাবতীয় আলোচনা মূলত তাঁর মঞ্চে কাজ করার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল।

শুধু তাই নয়, তাঁর সমস্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যে— নাটকের প্রযোজনায়, নাটক-রচনায়, প্রবন্ধের আলোচনায়— তিনি তাঁর জীবনের সমস্ত আহরিত জ্ঞান, সমস্ত সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে যেন চালিত করেছেন এক অভিমুখে— নাট্যকলার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে। তাই কখনো অর্থনীতি, কখনো সমাজবিজ্ঞান, কখনো চিত্রশিল্প, কখনো ভাষাতত্ত্ব— এ-সমস্তই তিনি ব্যবহার করেছেন নাট্যকে আরও স্পষ্টরূপে বুঝতে, বোঝাতে। সে-আলোচনার বিস্তারে যাওয়ার আগে, প্রসঙ্গক্রমে হয়তো এখানে জানানো যায় যে ১৯৯২ সালে বিশ্বভারতী শম্ভু মিত্রকে 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত করবার পর, শান্তিনিকেতনে তাঁর একটি বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। থিয়েটারের কথা বলতে গিয়ে সেখানে তিনি নানা প্রসঙ্গ টেনে আনেন— দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কথা, রাজনৈতিক ডামাডোলের কথা, সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের কথা, ভাষাবিকৃতির কথা, বর্তমান ভারতবর্ষে আমাদের জীবনপ্রবাহের কথা। এবং পরিশেষে তিনি জানান

যে এইসমস্ত মিলিয়েই তাঁর কাছে 'থিয়েটার' ; থিয়েটার বা শিল্পচর্চা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, হতে পারে না।

শম্ভু মিত্র তাই সবসময়ে নাট্যকলাকে দেখেছেন জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করে, যে-সংযুক্তি আমাদের নাট্যচর্চার মধ্যে আমাদের জীবনবোধেরই ছায়া ফেলে। এ-কথার প্রকাশ আমরা ঘুরে-ফিরে তাঁর লেখায় পেতে থাকি :

> ... জীবনকে বুঝবো বলেই শিল্পের দ্বারস্থ হই ; আশা করি যে, শিল্পী তার জীবনের দামে জীবনকে যতোটা বুঝেছে তারই আলো দিয়ে আমাকে আমার আত্মা খুঁজে পাওয়ার পথে সাহায্য করবে। —'অনন্যেপায়' [অনন্যোপায়], সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ৪৬ ;
>
> তাই আমি বিশ্বাস করি যে নাট্যকলার কেন্দ্রে আছে মানুষ। বিমূর্ত মানুষ নয়, একেবারে রক্তমাংসের বহুস্তরিক এবং বহুপার্শ্বিক মানুষ। এই মানুষ, এবং তার সম্পর্ক।... মহৎ নাট্যকলার প্রত্যেকটা চরিত্রের একটা জীবন দর্শন আছে।
>
> —কাকে বলে নাট্যকলা, পৃ. ৫০ ;
>
> শিল্পকলা বোধ করি এইটুকুই করতে পারে। এই প্রচণ্ড 'টুকু'-ই। যাতে আমাদের মনকে জাগ্রত করতে পারে, আমাদের সূক্ষ্ম অনুভবগুলোকে প্রখর ক'রে দিতে পারে, আর আমাদের বোধকে আরো ব্যাপক ও গভীর করে দিতে পারে। আর তাতেই তো আমরা দেহে ও মনে আরো একটু ভালো ক'রে বাঁচতে শিখি। —নাটক রক্তকরবী, পৃ. ৫।

৩.

'আরো একটু ভালো করে বাঁচতে' শেখায় বলেই জীবনের সঙ্গে নাট্যকলার এমন ঘনিষ্ঠ সংযোগ, আর এই বোধ থেকেই শম্ভু মিত্র নাট্যকলাকে সেই বৃহত্তর জীবনের অঙ্গীভূত করেই সেই শিল্পের বিশ্লেষণ করেন, তাকে বুঝতে চেষ্টা করেন ওই বৃহত্তর জীবনের নানা দৃষ্টিকোণ থেকে। তাই সেই জীবনের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান তত্ত্ব-তথ্য দিয়ে তিনি নাট্যকলার অনুপুঙ্খ পর্যালোচনা করেন। অসাধারণ ধীশক্তির প্রয়োগে তিনি একটি কোনো শিক্ষাধারা বা ডিসিপ্লিন-এর জ্ঞানকে ব্যবহার করেন তাঁর নিজের ডিসিপ্লিন, সেই নাট্যকলাকে বুঝতে, পুষ্ট করতে, উন্নত করতে। তাঁর 'অভিনয়-নাটক-মঞ্চ' গ্রন্থে তিনি একসময়ে লিখেছিলেন : 'এরকম যতো থীয়োরী হয়েছে, সবই আমি দেখেছি একটু না একটু সাহায্য করে এক একটা বিশেষ ক্ষেত্রে' ('কয়েকটি অভিনয়ের জন্মকথা', অভিনয়-নাটক-মঞ্চ, পৃ. ৪৩)। তাই, নাটক ও অভিনয়ের, নাটককার ও অভিনেতার পরস্পর-নির্ভর সম্পর্ককে বোঝাতে শম্ভু মিত্র একাধিকবার মহাকাশের যুগ্মতারার (বাইনারি স্টার্‌স্) দ্বৈতনৃত্যের উপমা টেনে এনেছেন (সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ৭১-৭২ ; কাকে বলে নাট্যকলা, পৃ. ৩৮)। আবার সংগীতের হারমনি-র কথা মনে রেখে তিনি বুঝিয়েছেন কীভাবে নাটকের মহলায় ভিন্ন ভিন্ন অভিনেতা অভিনেত্রী একে অপরের সঙ্গে সহ-অভিনয় করতে করতে অভিনয়ের একটা সামগ্রিক ঐকতান বা হারমনি তৈরি করেন, যেমনভাবে সংগীতে শ্রুতি-অর্ধশ্রুতিকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে সংগীতের একটা সম্পূর্ণ নিটোল রূপ প্রকাশ পায় (কাকে বলে নাট্যকলা, পৃ. ৪৮-৪৯)। সংগীতের বিশেষত পাশ্চাত্য সংগীতের মধ্যে ভিন্ন বা বিবাদী স্বরের সহাবস্থানে যে অর্কেস্ট্রেশন গড়ে ওঠে তারই প্রয়োগ তিনি দেখতে পান রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'-তে:

> ...মাঝখানে মূল বাজনাটা হচ্ছে নন্দিনীর কণ্ঠ,— এবারে আলাদা আলাদা যন্ত্রের মতো

আলাদা আলাদা কণ্ঠ আসছে, এবং এগুলো সমস্ত মিলিয়ে একটা orchestration তৈরি হচ্ছে। —কাকে বলে নাট্যকলা, পৃ. ৫৭

অনুরূপ বিশ্লেষণ আছে 'নাটক রক্তকরবী'-তেও। সচেতনভাবে লক্ষ না করলেও, এই 'সাঙ্গীতিক কলাকৃতি' দর্শকের বোধের মধ্যে ঠিকই অনুভূত হয়, এ-কথা বলে শম্ভু মিত্র আরও যোগ করেন : 'এবং যেখানে দর্শক ভাষাটা বোঝে না, সেখানে সে প্রখর দৃষ্টিতে প্রত্যেক চরিত্রের ধরন অনুধাবন করার চেষ্টা করে, এবং সেই উৎকর্ণ মনোযোগেই সে এই orchestrationটা বুঝতে পারে। এটা আমার অভিজ্ঞতা' (নাটক রক্তকরবী, পৃ. ২৫)। অন্য দিকে, সংলাপ উচ্চারণের আলোচনায় তিনি দেখিয়ে দেন যে নাটকের ভাষা মূলত দৈনন্দিন কথোপকথনের ছন্দের ওপর নির্ভরশীল, লিখিত পাঠে সে ছন্দ অনেক সময়েই ঠিকমতো ধরা পড়ে না। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'-তে গোকুলের 'ওরে ভয়ংকরী' বা তাঁর নিজের 'চাঁদ বণিকের পালা'-র একটি সংলাপ, 'দেবে দেবে ! তুমি চলে এসো।' কীভাবে উচ্চারিত হতে পারে অভিনয়ে, তারই বিশ্লেষণ ক'রে তিনি এ-কথাই প্রতিষ্ঠিত করেন যে 'লিখিত বর্ণের সীমিত প্রকাশক্ষমতার জন্যেই অভিনয়কালে নট-নটীরা সেটা পেরিয়ে যায়' (কাকে বলে নাট্যকলা, পৃ. ২৫)। উপরন্তু, যে-ভাবে আমরা প্রাত্যহিক জীবনে দু-ধরনের কণ্ঠস্বর ব্যবহার করি— একটি, দৈনন্দিন সাধারণ কথাবার্তার জন্য ; অন্যটি গভীরতর কোনো বোধের প্রকাশে— সেইভাবে অভিনেতাকেও আয়ত্ত করতে হয় ওই দু-ধরনের কণ্ঠের নিপুণ কিন্তু আয়াসহীন প্রয়োগ। কীভাবে এই প্রয়োগ হয় বা হওয়া উচিত তার বিবরণ শম্ভু মিত্র দেন তাঁর 'কিছু সূত্র মাত্র' প্রবন্ধে (সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ১৭১-১৭৫)[৬]। আবার, তাঁর নিজের 'রক্তকরবী' প্রযোজনায় কেমনভাবে ব্যবহার হয়েছিল এই দু-ধরনের কণ্ঠস্বর তার হদিশ পাওয়া যায় বিশুর কণ্ঠ-প্রয়োগের বর্ণনায়। চন্দ্রা-ফাগুলাল-গোকুলের সঙ্গে বিশু কথা বলে 'দৈনন্দিন ভঙ্গীতে'। অর্থাৎ সামান্য একটু উঁচু পর্দায় হালকা গলায়। কিন্তু যখন বিশু বলে— "একদিকে ক্ষুধা মারছে চাবুক, তৃষ্ণা মারছে চাবুক..." ইত্যাদি, তখন তো আর খালি হাল্কা গলায় কথা বলাটা থাকে না, অত্যন্ত তিক্ত ও ক্ষুব্ধ একটা স্বর আসে। এবং সেটা পড়তে পড়তেই আমরা বুঝতে পারি যে এ চরিত্রটায় গভীরতা আছে' (নাটক রক্তকরবী, পৃ. ৩৭-৩৮)। পরিস্থিতি অনুযায়ী কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহারের যে-কথা ভাষাবিদরা বলে থাকেন, তারই সুকৌশল প্রয়োগ শম্ভু মিত্র করেছেন স্বক্ষেত্রে, নাটকের ক্ষেত্রে। আবার, 'রক্তকরবী' নাটকের মানুষগুলোর মধ্যে দিয়ে আধুনিক সভ্যতার বিপর্যস্ত মানব-সত্তাকে বোঝবার তাগিদে কখনো এনেছেন পাশ্চাত্য দুনিয়ার বিচ্ছিন্নতাবাদের উদাহরণ (নাটক রক্তকরবী, পৃ. ৪২), আবার কখনো তুলে ধরেছেন নিজের দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট :

> ... এই সংগঠিত অংশের আয়তন সারা দেশের শ্রমজীবী মানুষের (পুরুষ ও নারীর) তুলনায়— শতকরা হিসেবে— অত্যন্ত কম। সেই অসংগঠিত অংশের লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবীর অবস্থার কথা মনে করলে যক্ষপুরীর মজুরদের কথা— বিশেষ করে রাজার এঁটো হয়ে ছিবড়ের মত যে মানুষগুলো বেরিয়ে আসে— তাদের কথা একেবারে এক মনে হয়। তাই বড় শহরের গাড়ি সারানোর গ্যারেজের ছেলেদের মুখে, ছোট টাউনের ঢালাইয়ের কারখানার বা চায়ের দোকানের ছেলেদের মুখে— যাদের, যখন কাজ পায় তখন কম ক'রে বারো ঘণ্টা খাটতেই হয়,— মাঝে মাঝেই তাদের মুখে আমরা কিশোরের মুখটাকে ঝলকে উঠতে দেখি।...
>
> —নাটক রক্তকরবী, পৃ. ৪০

এইসব বিবরণের মধ্যে যখন মানুষের 'বিচ্ছিন্ন ভগ্নাংশের মত' হয়ে যাওয়ার কথা ওঠে, বা যখন শুনি গ্রাম থেকে উৎপাটিত-হয়ে-আসা মানুষের এখন শহুরে পরিস্থিতিতে 'কাজটা থেকে মনটাই বিচ্ছিন্ন', বা যখন পড়ি 'লোভের ভিত্তিতে এই যে সংগঠনের রূপ ... সেখানে ব্যক্তিগত মানুষের কোনো হিসেব

নেই, কোনো মর্যাদা নেই' (নাটক রক্তকরবী, পৃ. ৪১-৪২), তখন সেইসব উক্তির অন্তরালে হঠাৎ হঠাৎ ঝলসে ওঠে ফ্রয়েড বা য়ুং বা মার্ক্স-এর উপস্থিতি। তবু, আমাদের মানতেই হবে যে এইসব চিন্তাবিদদের তত্ত্বজ্ঞান প্রয়োজনমতো আহরণ করেও শেষ পর্যন্ত সে-সমস্তকে শম্ভু মিত্র ব্যবহার করেছেন তাঁর নাটক বোঝার, নাটক করার কাজে, তাঁর নিজস্ব স্বতন্ত্র ধরনে। বিশেষত, 'নাটক রক্তকরবী' বইটির মধ্যে এই সত্য বারে বারে ফুটে উঠেছে।

৪.

শম্ভু মিত্র তাঁর যাবতীয় কর্মকাণ্ডের মধ্যে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান অবিরাম চালিয়ে গিয়েছেন— সে অনুসন্ধান আধুনিক ভারতীয় নাট্যের যথার্থ রূপটির অনুসন্ধান। গণনাট্য সংঘের মুখপত্রে যে 'আদর্শ ও লক্ষ্য'-এর ঘোষণা করা হয়েছিল, তার সর্বপ্রথম বিবেচ্য বিষয় ছিল :

> (ক) অভিনয়, নৃত্য, গীত ও আনুসঙ্গিক [আনুষঙ্গিক] শিল্পকলা সম্পর্কে আমাদের দেশ ও জাতির যে মহান প্রগতিশীল ঐতিহ্য রহিয়াছে— জনগণের আশা আকাঙখার [আকাঙ্ক্ষার] পরিপ্রেক্ষিতে তাহাকে অগ্রসর করা। —খসড়া গঠনতন্ত্র : গণনাট্য সংঘ, পৃ. ৩

পরবর্তীকালে গণনাট্য ছেড়ে চলে এলেও শম্ভু মিত্র তাঁর নিজের মতো করে 'আমাদের দেশ ও জাতির...মহান প্রগতিশীল ঐতিহ্য'-এর খোঁজ চালিয়ে গেছেন, তাঁর নাট্যসাধনার মধ্যে। অবশ্যই অন্যান্য গণনাট্য-কর্মীদের যাত্রায় ফিরে যাবার অভিমত তিনি মেনে নিতে পারেন নি[৭], তাই সন্ধান চালিয়েছেন অন্যত্র। তাঁর মনে হয়েছে আমাদের সামগ্রিক 'পরিচয় ভ্রষ্টতা'[৮]-র মধ্যে আমাদের নাট্যশিল্প তার ভারতীয়ত্ব হারিয়েছে, যে ভারতীয়ত্বের মধ্যে 'একটা গভীর বোধ আছে। তার সঙ্গে যদি আমরা যুক্ত হতে না পারি, সেই অনুভবের নিবিড়তার মধ্যে যদি ডুবে যেতে না পারি, তা হলে আমরাই বিনষ্ট হবো— তা-সে যতোই ইংরেজি বুক্‌নি আওড়াই' ('যা দেখেছি', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ১৬৫)। অথচ এটাও ঠিক যে প্রাচীন ভারতের নাট্যচর্চায় আমরা ফিরে যেতে পারি না, যেমন পারি না বাকি পৃথিবীর জ্ঞানের ভাণ্ডারকে, অভিজ্ঞতার সঞ্চয়কে উপেক্ষা করতে। সমস্ত রকম গোঁড়ামি বাদ দিয়ে, অথচ নিজেদের পরিচয় বজায় রেখে, 'আমাদের কাজ হোল আজকের মানুষ ও আজকের জীবন প্রকাশ করা' ('ইতি কর্তব্য', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ৪১) :

> আমাদের শিকড়ের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে এই জটিল ও বহুস্তর বাস্তবকে কি আমরা পারবো প্রকাশ করতে ? গভীরভাবে, এবং সূক্ষ্মতার সঙ্গে ?... আজকের নাট্যের রূপ আজকের হিসেবেই সৃষ্টি করতে হবে। —'সম্পৃক্তি', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ১৯৪।

সেই 'শিকড়ের' সন্ধান করতে গিয়েই তিনি খুঁজে পান ভারতীয় শিল্পের ঐতিহ্যে নিহিত বিমূর্ততা বা অ্যাবস্‌ট্র্যাকশন প্রয়োগের রীতি। শুধু শিল্পেই নয়, ভারতীয় মানসতায় এই রীতি প্রোথিত। তাই চলে আসে মাটির প্রতিমার মধ্যে দেবীর রূপকল্পনার প্রসঙ্গ ('যা দেখেছি', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ১৬৪-১৬৫) ; আসে কবি বিষ্ণু দে -উল্লিখিত বাঁকুড়ার ঘোড়ার উদাহরণ বা যামিনী রায়ের চিত্রের মধ্যে সাধারণ মজুরের 'তার পরিচিত কোনো স্ত্রীলোকের বৈধব্যের দুঃখটা মূর্ত' দেখতে পাওয়ার বৃত্তান্ত ('কীভাবে রবীন্দ্রনাথে পৌঁছানো গেল', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ১৮৩-১৮৪)। এমন-কি, এই শতাব্দীতে লেখা কিছু বাংলা নাটকেও 'নিয়তি' বা 'ভারতমাতা'-র মতো কিছু বিমূর্ত চরিত্র কেমনভাবে এসে পড়ে, অথচ দর্শক তাদের

অনায়াসে মেনে নেয়, তারও উল্লেখ পাই ('রক্তকরবী', প্রসঙ্গ : নাট্য, পৃ. ১৪১-১৪২ ; নাটক রক্তকরবী, পৃ. ৪৮)। শম্ভু মিত্র একবার নেহাতই কথাচ্ছলে এই আলোচক ও উপস্থিত অন্যান্যদের কাছে চিত্রে আঁকা কোনো প্রণামরত নারীমূর্তির উদাহরণ দেন, যার মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করার ভঙ্গিটির মধ্যে তার আত্মনিবেদনের ভাবটি সুস্পষ্ট।[৯] তিনি বলেন যে, চিত্রকর ওই ভাবটি ফুটিয়ে তুলতে নারীটির মেরুদণ্ড প্রায় নিটোল এক অর্ধবৃত্তাকারে চিত্রিত করবেন, যা বাস্তবে কোনো সাধারণ মেয়ের পক্ষে করা প্রায় অসম্ভব। তবু, ওই ভঙ্গিটির মাধ্যমে আত্মনিবেদনের যে অ্যাব্‌স্ট্র্যাকশন বা ভাব ধরা পড়ে, তা অনেক বেশি 'সত্য', বাস্তবের কোনো স্থূল বা কংক্রিট প্রণামের ভঙ্গির থেকে। এইভাবেই বাস্তবের ডিসটরশন [বিকৃতি ?] ঘটিয়ে শিল্পের অ্যাব্‌স্ট্র্যাকশন-এর 'সত্য' তৈরি হয়।[১০] এর আরও অনেক দৃষ্টান্ত শম্ভু মিত্র উল্লেখ করেছেন তাঁর বিভিন্ন নিবন্ধে (দ্রষ্টব্য : 'ইতি কর্তব্য', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ৪৩-৪৪ ইত্যাদি)। এবং 'ভারতীয় শিল্পের তত্ত্ব' বলে তিনি চিহ্নিত করেছেন তার 'আত্মার মূর্তি ধ্যান' করার ক্ষমতাকে ('ইতি কর্তব্য', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ৪৪)।

এই অ্যাব্‌স্ট্র্যাকশন-এর সত্যকে ভারতীয় রীতিতে খুঁজে পাওয়ার তাগিদে শেষ অবধি তাঁকে রবীন্দ্রনাথে পৌঁছোতে সাহায্য করেছে। তিনি অনুধাবন করেছেন যে রবীন্দ্রনাটক আধুনিক হয়েও ভারতীয়— তার ভাবে, তার আঙ্গিকে। ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক জীবনপ্রবাহের জটিলতা মিশে গেছে সেইসব নাটকে ; 'কেবল একজন নাটককার বুঝি এই সংঘাতের মধ্যে থেকেও সেই সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ' ('একটি অন্বেষণে', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ৮৯)। শম্ভু মিত্রের আধুনিক ভারতীয় নাটকের সন্ধান তাই এসে পৌঁছোল রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভার সম্যক উপলব্ধিতে :

> এই যে নানাস্তর এক সঙ্গে মিশে যাওয়া, একেবারে দেখ্‌তা-সত্যি থেকে গভীর দর্শনের সত্য পর্যন্ত এই-যে দোলন, এইটেই আমি এতোদিন ধ'রে সন্ধান ক'রে এসেছি।
>
> —'কীভাবে রবীন্দ্রনাথে পৌঁছানো গেল', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ১৮৯

আবার,

> সময়ের নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে দেশের সংস্কৃতির যে পারম্পর্য কালানুক্রমে চলে আসে... সেই সাংস্কৃতিক পরম্পরা-বোধ যে শিল্পীর সৃষ্টিতে থাকে তাকেই আমরা আমাদের যুগের প্রতিভূ ব'লে মানি, মহৎ শিল্পী ব'লে মানি। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে তাঁর সময়কার সেই আধুনিকতম বোধ দেখতে পাই আমরা। তাই তাঁর দোরে গিয়েই আমাদের শিশিক্ষু ছাত্রের মতো শিখতে হবে যে আমাদের কালকে আমরা কী ক'রে প্রকাশ করব।
>
> —নাটক রক্তকরবী, পৃ. ৫২।

শম্ভু মিত্র যেহেতু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে খুঁজে পান 'একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান ও অসাধারণ দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন মানুষ' ('কীভাবে রবীন্দ্রনাথে পৌঁছানো গেল', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ১৮৭), তাই তাঁর নিজের রবীন্দ্রচর্চাও এগোয় বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টিকে অবলম্বন করে। শাণিত বুদ্ধি ও গভীর জীবনবোধ বা দৃষ্টিক্ষমতার সমন্বয়ে তাঁর পরিচালনায় রবীন্দ্রনাট্য-প্রযোজনাগুলি এক-একটি অনবদ্য শিল্পকীর্তি হয়ে ওঠে— 'চার অধ্যায়', 'রক্তকরবী', 'বিসর্জন', 'রাজা'। রবীন্দ্রনাটক যে কতখানি মঞ্চসফল হতে পারে তাই তিনি করে দেখিয়ে দিয়েছেন। সেই নাট্যপদ্ধতির— এবং রবীন্দ্রনাটকের অনুশীলনীর— একটা আন্দাজ পেতে আমরা স্মরণে রাখতে পারি রবীন্দ্রনাট্য-সংলাপের উচ্চারণরীতি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য :

> শহুরে কথাবার্তার মধ্যে একটা inhibition আছে, একটা দেওয়াল আছে। কিন্তু এই সমস্ত সংলাপ অত্যন্ত খোলামেলা, যা বলে তা পুরো হৃদয় দিয়ে বলে।...রবীন্দ্রনাথ 'কাব্যিক' না। তাঁর কাব্যে তিনি বারবার সাধারণ কথোপকথনের সুর এনেছেন। এবং সেই জন্যেই সেগুলো

> ঝল্‌মল্‌ করে পাঠকের সামনে। কাব্যিক হ'লে কেবলমাত্র অবাস্তব সুরই থাকতো। এগুলোর কাব্য ফোটে আমাদের দৈনন্দিন কথোপকথনের সুরের মধ্যে দিয়ে। নইলে 'কখন ছাগল তুই চরাবি' ব'লে গান হ'তে পারে কখনও ?
>
> —'রক্তকরবী প্রসঙ্গে', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ২২

অনুরূপ আলোচনা পাওয়া যায় 'কাকে বলে নাট্যকলা' বা 'নাটক রক্তকরবী'-র মধ্যেও। 'নাটক রক্তকরবী'-র সম্পূর্ণ বইটি জুড়েই তো রয়েছে ওই রবীন্দ্রনাটকটিকে বোঝার, নিজের মননের আয়ত্তে আনার এক যুক্তিনির্ভর, বুদ্ধিদৃপ্ত, গভীর উপলব্ধি-জড়িত প্রচেষ্টা। আর সেই প্রচেষ্টাই তো রূপ দিয়েছিল বহুরূপীর 'রক্তকরবী'-র প্রযোজনাকে, যা বাংলা রঙ্গমঞ্চে 'এক ঐতিহাসিক মর্যাদাময় ঘটনা'[১১] রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

শম্ভু মিত্রের রবীন্দ্রনাটক-চর্চার প্রসঙ্গে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমাদের মনে রাখতে হবে। তিনি রবীন্দ্রনাথকে আধুনিক ভারতীয় নাট্যের 'ক্লাসিক'[১২]-এর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু, তাঁর আধুনিক ভারতীয় নাট্যের অনুসন্ধান শেষ হয়ে যায় নি রবীন্দ্রনাথে পৌঁছিয়ে ; বরং বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ থেকেই তাঁর যাত্রা শুরু— রবীন্দ্র-প্রদর্শিত পথেই তাঁকে এগোতে হবে। এ-বিষয়ে খুব স্পষ্ট শম্ভু মিত্রের অভিমত : '... তিনি তো আমাদের পথের শেষ ন'ন, তিনি আমাদের পথের পাথেয়। আমাদের মহার্ঘ দিশারী' ('একটি অন্বেষণে', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ৯১)।

৫.

আগেই বলা হয়েছে যে শম্ভু মিত্র মুখ্যত অভিনেতা-প্রযোজক-'নাট্যকার'— সেটাই তাঁর প্রথম পরিচয়। তাই সেই অভিনেতা-প্রযোজক-'নাট্যকার' স্বভাবতই বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন নাট্যকলার বিভিন্ন উপাদান নিয়ে, যেসব উপাদানকে আশ্রয় করে তিলে তিলে গড়ে ওঠে এই তিলোত্তমা-শিল্প। এইসব বিশ্লেষণের মধ্যে অবশ্যই অভিনয় শিল্প একটা বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে। 'সন্মার্গ সপর্যা'-র 'একটি আলোচনা' শীর্ষক নিবন্ধে— যেটিকে 'প্রসঙ্গ : নাট্য'-এ 'স্বাভাবিক অভিনয়' শিরোনামে পাওয়া যায়— শম্ভু মিত্র 'আচরণ' বনাম 'অভিনয়' এই পুরোনো তর্কের মোকাবিলা করে, এগিয়ে যান 'স্বাভাবিক অভিনয়' সম্পর্কে নিজ বক্তব্যের দিকে :

> কিন্তু অভিনয় তো কেবলমাত্র 'আপনি চায়ে ক' চামচ চিনি খান— ?' জাতীয় মনোভাবের প্রকাশ নয়। অনেক গভীর মনোভাব, অনেক গভীর উপলব্ধি তাতে প্রকাশ করবার থাকে। ...সুতরাং দেখা যাবে যে স্বাভাবিকত্বটা ওপরের নয়, ভিতরের ব্যাপার। সত্য হয়ে ওঠার ব্যাপার। এবং সত্যমাত্রেই বহুস্তরিক।
>
> —'একটি আলোচনা', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ৭৫

'প্রসঙ্গ : নাট্য'-এ এই প্রবন্ধের যে-পাঠ আছে তার পরিসমাপ্তিতে তিনি এই ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছোন যে '... অভিনয়ের স্বাভাবিক হবার দায়িত্ব নেই, কিন্তু সত্য হবার আছে' (প্রসঙ্গ : নাট্য, পৃ. ৫৮), শিল্পীকে বহু ঘটনাকে, বহু অভিজ্ঞতাকে, 'চেপে ছোটো করতে হয়, কাজে কাজেই সেটা তখন নির্যাসের মতো তীব্র এবং ঘন হয়ে ওঠে' ; আর তাই শিল্পের মধ্যে 'স্বাভাবিক জীবনের শিথিলতা নেই, কান-পর্যন্ত-টানা ধনুকের ছিলার মতো এর সমস্ত পরিমণ্ডলটাই অতিতানিত' ('অভিনয় কী ?', অভিনয়-নাটক-মঞ্চ, পৃ. ৯৬ ; 'অভিনয় শিল্প', প্রসঙ্গ : নাট্য, পৃ. ৬২)। সেইজন্যেই নাট্যাভিনয়ের মধ্যে তাঁর কাছে যা দামি তা হল 'নটনটীদের আবেগ, তাদের passion' ('একটি আলোচনা', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ৭২)।

সেই আবেগের প্রকাশই নাট্যে এক গভীরতর মাত্রা সংযোজন করে :

> আমি বারেবারে দেখেছি যে অভিনয়ে যখন মানুষের গভীর আবেগ এইরকম ক'রে প্রকাশ হয় তখন সেটা নাটকের গণ্ডী ছাড়িয়ে যেন অন্য আর একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছয়।
>
> —'কিছু স্মরণীয় অভিনয়', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ৯৬।

প্রবন্ধটির এই অংশে তিনি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'মাটির ঘর' নাটকে অবিস্মরণীয় অভিনয়ের বর্ণনা দিচ্ছিলেন। এইরকম আবেগময় অভিনয়ের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব যথেষ্ট স্পষ্ট : 'অভিনয়ে তথাকথিত[১৩] naturalism-এ আমি কোনো দিন আনন্দ পাইনি। বিরাট মানুষের বিরাট দুঃখ বা বিরাট আবেগ আমাকে অনেক বেশী মুগ্ধ করে' ('শিশিরকুমার', প্রসঙ্গ : নাট্য, পৃ. ১৮১-১৮২, সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ২০২)।

কেবলমাত্র অভিনয় নয়, পাশাপাশি নাট্যশিল্পের অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপাদানেরও বিস্তৃত আলোচনা আমরা পাই শম্ভু মিত্রের লেখায়। এইসমস্ত উপাদানের সুষম, সুসংগত সংমিশ্রণেই গড়ে ওঠে নাট্যের সামগ্রিক চেহারা ; তাই এদের প্রতি বিশেষ যত্নশীল দৃষ্টি সেই পরিচালক-প্রযোজকের। 'মঞ্চসজ্জার ভূমিকা' প্রবন্ধটি পড়লে বোঝা যায় যে মঞ্চসজ্জার বাহুল্য তাঁর শিল্পরুচিকে কখনোই তৃপ্তি দেয় নি। সে-সব তাঁর মনে হয়েছে 'যতোসব অলৌকিক উদ্ভট কাণ্ড' ('মঞ্চসজ্জার ভূমিকা', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ৪৭)। প্রতিতুলনায়, তাঁর মন টেনেছে রবীন্দ্রনাট্যে অন্য ধরনের মঞ্চসজ্জার প্রয়োগ, যেখানে 'নাটক অনুযায়ী প্রেক্ষাগার ও মঞ্চকে একছন্দে সাজানো হয়েছে' (পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮)। নাটকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে মঞ্চসজ্জার এই সুষম ছন্দোবদ্ধতা তৈরির চেষ্টাতেই 'নবান্ন'-র প্রযোজনায় এসেছিল চটের পর্দার ব্যবহার, বা 'জবানবন্দী'-তে পুরোনো ফ্ল্যাটগুলোকে উল্টে দাঁড় করানো হয়েছিল, কাঠের ফ্রেমগুলো দর্শকের দৃষ্টি-পথে রেখে ('কীভাবে রবীন্দ্রনাথে পৌঁছানো গেল', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ১৮০-১৮১)। আবার ' "রক্তকরবী"-তে সংগীত প্রয়োগ' নিবন্ধে শম্ভু মিত্র ফিরে দেখেন কীভাবে খালেদ চৌধুরী নাটকটির আবহরচনায় অসাধারণ উদ্ভাবনী ক্ষমতা দেখিয়েছিলেন। তার বিস্তৃত বিবরণ দিতে দিতে তাঁর মন্তব্য : 'নাট্যের সঙ্গীত যে সমগ্র নাট্যের মধ্যে অঙ্গীভূত, যেখানে মঞ্চের ক্রিয়ার সঙ্গে সে এমনভাবে জড়িত যে রং আলো কথা সুর সব মিলিয়ে একটা অখণ্ড সত্তা পায়। সেই নিটোল সময় তৈরী হয় "রক্তকরবী"-র বেশ কয়েক জায়গায়' (' "রক্তকরবী"-তে সঙ্গীত প্রয়োগ', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ১১৩)। এইভাবেই নাটক, অভিনয়, মঞ্চসজ্জা, আলো, সংগীত, নির্দেশকের কারুকৃতি— সব মিলিয়ে কীভাবে মঞ্চের ওপর একটা সামগ্রিক নাট্য বা টোট্যাল থিয়েটার তৈরি হয়ে উঠতে পারে, তারই পরিচয় আমরা পাই 'নাটক রক্তকরবী'-র পাতায় পাতায়। যেমন : রাজার এঁটোদের বেরিয়ে আসার নাট্য-মুহূর্তটি, তার অনুপুঙ্খ খুঁটিনাটি নিয়ে ধরা আছে শম্ভু মিত্রের প্রতিবেদনে :

> এই সময়ে সামনের আলো অনেক ক'মে যেত। একটু পরে তার চরিত্রের বদল হত। পিছনের কিছু লালচে আলো জ্বলত। ইত্যাদি। ঘড়ঘড়ি বলে একটা বিরাট যন্ত্র খালেদ তৈরি করিয়েছিল, তার হাতল ঘোরালে বিকট শব্দ হত, সেটা চলত। বড় নাকড়াটা খুব জোরে বাজত। তার সঙ্গে বাঁশিও ছিল। উচ্চস্বরের বাঁশি। আর, ঢেউ খেলান মোটা গেজের টিনের ওপর খুব মোটা ভারী শিকল দিয়ে কখনও আছড়ান হত, কখনও ঢেউয়ের ওপর দিয়ে বা কিনারের ওপর দিয়ে টানা হত, আর কখনও-বা সাপের ল্যাজ ধরে নাড়ানর মত নাড়ান হত প্রচণ্ড শব্দে।...
>
> আমাদের রক্তকরবী নাট্যে নন্দিনী যে-জায়গা থেকে চীৎকার করে অনুপ শকলুকে ডাকত সে-জায়গাটা রাজার এঁটোদের যাওয়ার পথ থেকে বড় জোর ছ' সাত ফুট দূরে। এবং

মাঝখানে কোনো প্রতিবন্ধকও যে ছিল না সেটা এতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত দর্শকই দেখতে পেয়েছে। সুতরাং নন্দিনী সোজা গিয়ে অনুপ বা শকলুর হাত ধ'রে ঝাঁকানি দিতে পারত। কিন্তু সে তা দিত না, এবং দর্শকও সেটা সম্ভব মনে করত না। দর্শকদের মনে হত নন্দিনী তাদের অনেক কাছে, মঞ্চের সম্মুখভাগে রয়েছে। আর এঁটোরা যেখানে বেরিয়ে আসতে গিয়ে ছিটকে ছিটকে পড়ছে সেটা যেন অনেক দূরে। এই দূরত্বের কল্পনা হত দর্শকদের মনে সেটাকে সাহায্য করবার জন্যে এই বিশেষ ক্ষেত্রে মঞ্চসজ্জাকে ও আলোকে একটু কৌশলের সঙ্গে ব্যবহার করা হত বটে, কিন্তু দৃশ্য হিসেবে মঞ্চকে ছোট বা বড় মনে করার প্রক্রিয়া চলতে থাকে দর্শকদের মনে। —নাটক রক্তকরবী, পৃ. ৫৬

এইসময়ে 'আলোতে অন্ধকারেতে বাজনাতে শব্দেতে ও অভিনয়ে' এবং সেইসঙ্গে মঞ্চসজ্জার ব্যবহারে ও কম্পোজিশনের বিন্যাসে নাট্যমুহূর্তটিতে একটা 'তীব্রতা প্রকাশ পেত' ; একটা গোটা নাট্য-চেহারা ফুটে উঠত, তৈরি হত একটা টোট্যাল থিয়েটার। তখন শম্ভু মিত্রের অনুভবেই একটা 'আদর্শ থিয়েটার'-এ যা হওয়া উচিত তাই হয়ে উঠত : '... একটা নাট্যাভিনয়ের মধ্যে নাটককার, অভিনেতা ও মঞ্চ পরিকল্পনাকার সকলেই নিজের নিজের শিল্পীর অধিকারে আত্মসম্মানে মণ্ডিত' ('কিছু স্মরণীয় অভিনয়', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ৯৯)।

৬.

এই টোট্যাল থিয়েটার-এর যথার্থ প্রয়োগ আধুনিক বাংলা থিয়েটারে শিশিরকুমার ভাদুড়ির পর শম্ভু মিত্রের নাট্যশৈলীর মধ্যেই প্রথম পরিস্ফুট হয়ে উঠল। শিশির ভাদুড়ির প্রয়োগ-নৈপুণ্য[১৪] অনেক সময়েই অলক্ষিত থেকে গেছে তাঁর কালে, হয়তো সেইজন্যেই সেই 'নির্দেশক শিশিরকুমার' শেষে হারিয়ে গিয়েছেন— অন্তত শম্ভু মিত্রের সেইরকমই মনে হয়েছে ('শিশিরকুমারের প্রয়োগকলা সম্পর্কে', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ১০৬)। এই আশঙ্কা তিনি আগেও ব্যক্ত করেছেন : 'বুঝি সে প্রতিভা দুরন্ত বলেই আত্মঘাতী হলো।' ('যুদ্ধোত্তর যুগে বাংলা মঞ্চে সংকট', অভিনয়-নাটক-মঞ্চ, পৃ. ১৪)। শিশির-উত্তর যুগে শম্ভু মিত্র তাঁর নাট্য-প্রযোজনায়— কী গণনাট্যে, কী বহুরূপীতে— যখন আরও একবার এই টোট্যাল থিয়েটার রচনায় ব্রতী হলেন, তার মধ্যে দিয়ে নাট্যের এক নতুন স্বাদ এসে পৌঁছোল। এই টোট্যাল থিয়েটার-এর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছেন শম্ভু মিত্রের সমসাময়িক নবনাট্যের আরও একজন পথিকৃৎ : উৎপল দত্ত। উৎপল দত্তের ভাষায় : 'থিয়েটার নানা শিল্পের মিলিত সৃষ্টি, আর এই মিলের ভিত্তি হল পরস্পরের সঙ্গে ক্রমশ একাত্ম হওয়ার প্রচেষ্টা। শব্দকে হতে হবে বর্ণ, বর্ণকে হতে হবে শব্দ।' ('থিয়েটারের ভাষা', চায়ের ধোঁয়া, পৃ. ১১৭)[১৫]। নাট্যকলায় এই নতুন স্বাদ তাই ছড়িয়ে পড়তে লাগল নবনাট্য আন্দোলনের প্রযোজনাগুলির মাধ্যমে, পুরোনো প্রচলিত থিয়েটারি কায়দাকে বদলে দিয়ে।

এই নবনাট্যের যে ধারা চল্লিশের দশকে সূচিত হল তার পুরোধা ছিলেন শম্ভু মিত্র এবং তাঁর নেতৃত্বে 'বহুরূপী' নাট্যসংস্থা। উদ্দেশ্য ছিল 'সৎ' নাট্যের বিকাশ— 'অর্থাৎ honest থিয়েটার। যেখানে নিজেদের সত্য অনুভব, সত্য উপলব্ধির কথা বলা হবে।' ('একটা বোঝবার চেষ্টা', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ১৭৮)। এই উদ্দেশ্যের সূচনা গণনাট্য-পর্বেই— তৎকালীন সাধারণ রঙ্গালয়ের 'প্রাণহীন উদ্যমহীন লুপ্তযৌবনের মতো'[১৬] থিয়েটারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার তাগিদে। তার পর সেই গণনাট্য-অধ্যায়ে এল মতানৈক্য, এল শিল্পীর স্বাধীনতা বনাম রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুশাসন, প্রয়োজন হয়ে পড়ল গণনাট্য ছেড়ে বহুরূপী-র সংগঠন, শুরু হল নবনাট্য আন্দোলনের যাত্রা। এসবই তো আজ পরিচিত ইতিহাস। তবু

সেই ইতিহাসের প্রেক্ষাপটেই নবনাট্যের উৎপত্তি, তার আদর্শ ও লক্ষ্য, তার ব্যাপ্তি ও বিস্তার, তার সংকট ও সমস্যা, তার পর্যায়বদল, এমন-কি, তার বর্তমান লক্ষ্যভ্রষ্টতার প্রবণতারও বিচার হওয়া প্রয়োজন। শম্ভু মিত্র তাঁর 'সন্মার্গ সপর্যা'-র ভূমিকায় লিখেছেন :

> কিসে ও কখন-কখন এই নাট্যধারা অচিন্তিত তুঙ্গে উঠেছে, বা কিসে ও কখন এর পতন হয়েছে, এর কোনো বিজ্ঞানী বিশ্লেষণ হবে হয়তো কোনোদিন। কিন্তু কিছু হিসেব মনের মধ্যে স্পষ্ট থাকলে আজকের কাজে বড়ো সাহায্য হোত। আমাদের সকলের। শিল্পীর ও দর্শকেরও।
>
> —'ভূমিকা', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ৭

সেই 'হিসেব'-এরই একটা আন্দাজ— খুবই বড়ো মাপের আন্দাজ— পাওয়া যায় এই প্রবন্ধ-সংকলনে। নবনাট্য আন্দোলনের কথা সরাসরিভাবে এসেছে বেশ-কিছু রচনায়— 'সমস্যার একটা দিক' (পৃ. ২৩-২৫), 'আন্দোলনের প্রয়োজনে' (পৃ. ২৬-৩৮), 'আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও আমরা' (পৃ. ৫১-৫৬), 'নবনাট্যের বিচার' (পৃ. ৫৬-৬১), 'একত্র অথচ স্বাধীন হওয়ার সভ্যতা' (পৃ. ১২১-১৩০), 'একটা বোঝবার চেষ্টা' (পৃ. ১৭৬-১৭৮), ইত্যাদি। আর বাকি যেসব প্রবন্ধে হয়তো এরকম সরাসরিভাবে নবনাট্যের প্রসঙ্গ আসে নি, সেগুলিও কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই 'চল্লিশের দশকে নতুন ধরনের যে নাট্যপ্রয়াস শুরু হয়', তার মধ্যে যেভাবে 'নাট্যকলা ও সমাজকে ... উপলব্ধি করবার চেষ্টা', নতুন 'পথ অন্বেষণের চেষ্টা'[১৭], তারই ভাবনায় অনুপ্রাণিত। আসলে এটা তো মনে রাখতে হবে যে যিনি এইসব প্রবন্ধের রচয়িতা এবং যিনি সেই নবনাট্যের অন্যতম প্রধান পুরোহিত তিনি শেষ অবধি একই মানুষ।

এই নবনাট্য আন্দোলনের নতুন ভাবাদর্শের সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল 'ভালো' নাটকের অনুসন্ধান। এর আগে, বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকগুলির না ছিল কোনো সাহিত্যগুণ, না কোনো শৈল্পিক উৎকর্ষ। বৌদ্ধিক আবেদন নয়, এগুলোর অধিকাংশের মধ্যেই ছিল শুধু 'বে-বুদ্ধি উচ্ছ্বাস' ('বাংলা থিয়েটার', অভিনয়-নাটক-মঞ্চ, পৃ. ৩০)। তাই, 'বাঙলা থিয়েটারে নাট্যকারেরা পারিতোষিক পেয়েছেন কেবলমাত্র নাটকের পপুল্যারিটির জোরে, সাহিত্য হ'য়ে ওঠার জোরে নয়' ('নাট্যসাহিত্য : দু-একটি কথা', প্রসঙ্গ : নাট্য, পৃ. ১০)। তাই শুধু অভিনয়ের জোরে 'আলমগীর' বা 'কেদার রায়'-এর মতো নাটক উতরে যেত। এই পরিস্থিতি ভাঙার চেষ্টায় নবনাট্য খোঁজ শুরু করল এমন নাটকের যার মধ্যে আমরা 'জীবনের গভীরতম সত্যগুলিকে উপলব্ধি করি' ('সমস্যার একটা দিক', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ২৩), যে-নাটক মানুষের 'মার্জিত হৃদয়বৃত্তির তৃপ্তির জন্য' (পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪)। এবং সেই খোঁজই অবশেষে শম্ভু মিত্রকে পৌঁছে দিয়েছে রবীন্দ্রনাটকের জগতে। সে-বিবরণ আমরা ইতিপূর্বেই দিয়েছি।

নবনাট্য আন্দোলনের পুরোধায় থেকে, বহুরূপী-র অন্যতম কর্ণধারের ভূমিকা পালন করে, শম্ভু মিত্রকে দক্ষ সংগঠকের দায়িত্বও বহন করতে হয়েছে। তাঁর সেই পরিচয়টিও আমরা পেতে থাকি 'সন্মার্গ সপর্যা'-র প্রবন্ধের মধ্যে। তাঁর সাংগঠনিক অভিজ্ঞতার জোরেই তিনি বুঝতে পারেন যে 'নাটক করি কেন ?' এই প্রশ্নের উত্তর প্রত্যেক নাট্যকর্মীর নিজের কাছে পরিষ্কার থাকা দরকার। তাঁর নিজের উত্তর তিনি দিচ্ছেন 'ক' ছদ্মনামধারীর স্বীকারোক্তির ভিতর : 'কী করবো, আমি-যে ভালোবেসেছি' ('প্রেমের পরিশ্রম', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ১২৮)। তবে, নাটক তো একা হয় না, তাই দল গড়ার প্রয়োজন, অন্য মানুষের প্রয়োজন, 'এমন অনেক লোক দরকার যাঁদের চরিত্রে শিল্পকর্ম অনিবার্য, যাঁদের শিল্পচর্চা চারিত্রিক ঋজুতার সঙ্গে জড়িত, শিল্প যাঁদের বাঁচার একটা সীরিয়াস অঙ্গ' ('আন্দোলনের প্রয়োজনে', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ৩৫)। সংগঠনে মতৈক্য আনার জন্য জোর করে চাপানো নিয়মানুবর্তিতায় তাঁর অনীহা ; এমন-কি, আদর্শগত পার্থক্যের কারণে পৃথক দল গঠন অনেক সময়েই বেশি স্বাস্থ্যকর মনে হয়েছে তাঁর (পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬)। তবে, বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের পর্যায়বদলে এত অধিকসংখ্যক

নাট্যসংস্থার আত্মপ্রকাশে তিনি পুলকিত নন, বরং অনেকটাই শঙ্কিত, কারণ, '...গুণগত উৎকর্ষ কি সংখ্যার তালে, না বেতালে ? গুণান্বিত না হলে দেশেরও ভবিষ্যৎ নেই, নাট্যের নেই। মানুষেরও নেই' ('একত্র অথচ স্বাধীন হওয়ার সভ্যতা', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ১২৯)। আর বাঙালির নাট্যচেতনাকে একত্রে সংহত করে যে ন্যাশনাল থিয়েটার তৈরির কাজে তিনি ব্রতী হয়েছিলেন, নানা প্রতিকূলতার চাপে সেই পরিকল্পনা তাঁকে পরিত্যাগ করতে হয়েছে। অথচ একটা ব্যাপকতর নাট্যক্ষেত্র রচনার স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন বলেই, আমাদের সকলকে ডাক দিয়েছিলেন :

> বাঙলা নাট্যকর্মীদের এখনো অনেক কিছু করতে বাকি আছে। তুচ্ছ দলাদলির ঊর্ধ্বে উঠে তাকে বাঙলা নাট্যের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এমন একটা নাট্যভঙ্গী আয়ত্ত করতে হবে যা একেবারে ভারতের, একেবারে বাঙালীর।... এই লক্ষ্যে পৌঁছুতে গেলে ন্যাশনাল থিয়েটার সম্পর্কে আমাদের গভীরভাবেই ভাবা উচিত।... জাতি তার নিজের নৈতিক জোরে জাতীয় রঙ্গমঞ্চ তৈরী ক'রে নেবে।
>
> —'ন্যাশনাল থিয়েটার', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ১২৩

পরিতাপের বিষয় যে, তাঁর এই আবেদন আমাদের কানে পৌঁছোলেও, আমাদের হৃদয়ে পৌঁছোয় নি। তাই জাতীয় রঙ্গমঞ্চ নির্মাণের সমস্ত উদ্যোগ আজ অপসৃত। অথচ, শম্ভু মিত্রের এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলে হয়তো বাংলার নাট্যচর্চায় নতুন প্রাণসঞ্চার হতে পারত।

৭.

বাংলা নাট্য-আন্দোলনের, বিশেষত নবনাট্য-আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত অনেক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব এবং তথ্য ধরা রইল শম্ভু মিত্রের লেখনীতে— তাঁর আগের দুটি বইয়ে যেমন, সাম্প্রতিককালের এই তিনটি বইয়েও তেমনি। এরই নিরিখে হয়তো কোনোদিন নবনাট্য-আন্দোলনের, বহুরূপী-র ভূমিকার এবং শম্ভু মিত্রের নিজের অবদানের বিশ্লেষণ হবে, মূল্যায়ন হবে। 'সন্মার্গ সপর্যা' বা 'কাকে বলে নাট্যকলা'-র গুরুত্ব এইখানেই। তবে, এই আলোচকের মতে, 'নাটক রক্তকরবী'-র মতো গ্রন্থের তাৎপর্য যেন আরও একটু বেশি। কারণ, আলোচক শম্ভু মিত্র, তাত্ত্বিক শম্ভু মিত্র, প্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্রকে ছাপিয়ে এখানে বড়ো হয়ে ওঠেন প্রযোজক-পরিচালক শম্ভু মিত্র। তিনি নিজেই একসময়ে অভিনয়-শিল্পের আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন : '... theory ও practice-এর একটা সামঞ্জস্য বিধান চাই। থিয়োরী থাকে প্র্যাকটিস্‌কে ঠিক পথে চালিত করতে, আবার প্র্যাকটিস-ই সাহায্য করে থিয়োরীটাকে ঠিকমতো গভীরভাবে বুঝতে' ('অভিনয় কী ?' অভিনয়-নাটক-মঞ্চ, পৃ. ১০৬)। এই থিয়োরি ও প্র্যাকটিস-এর 'সামঞ্জস্য বিধান'-এ কেমনভাবে মহৎ নাট্য সৃষ্টি হয় তারই উৎকৃষ্ট উদাহরণ বহুরূপী-র 'রক্তকরবী' প্রযোজনা। আর সেই প্রযোজনার বিবরণ যখন পাই স্বয়ং প্রযোজক-পরিচালকের লেখনীতে, তখন সেই রচনা, সেই 'নাটক রক্তকরবী', বিশেষ তাৎপর্যময়তায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আমাদের জন্য, উত্তরকালের জন্য, এই গ্রন্থের মধ্যে থেকে যায় রবীন্দ্রনাটকের একটি কিংবদন্তী প্রযোজনার প্রত্যক্ষ দলিল। রবীন্দ্রনাটকের প্রযোজনায় যে-ঝুঁকি, যে-উত্তেজনা, যে-রোমাঞ্চ এবং সর্বোপরি নিজেকে আরও একটু বুঝতে পারার, নিজেকে টান-টান করে মেলে ধরার যে-আনন্দ, সে-সবেরই হদিশ পাই শম্ভু মিত্রের অভিজ্ঞতার প্রকাশে। জানতে পারি যে, নাটকটির ব্যাখ্যা নিয়ে যেমন তাঁকে অনেক আপত্তি, প্রতিবাদের মুখোমুখি হতে হয়েছিল, তেমনি আবার উৎসাহ, সমর্থন এসেছিল অনেক প্রাজ্ঞ, সূক্ষ্মবোধসম্পন্ন মানুষের কাছ থেকে। যেমন, রাজা-চরিত্রের নানা গোলমেলে ভাষ্যের মধ্যেও সুস্পষ্ট ঘোষণা ছিল নন্দলাল বসু-র : 'এ হল আজকের

মানুষের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি' ('নাটক রক্তকরবী', পৃ. ২৬)। রবীন্দ্রনাথের 'অভিভাষণ'-এ রাজার বৈজ্ঞানিক শক্তির জোরে বেড়ে রাবণ হয়ে ওঠার পরিচয় শম্ভু মিত্র আগেই পেয়েছিলেন। সে-কথাই প্রতিষ্ঠিত হল আবার নন্দলালের মন্তব্যে। সে-কথাই প্রকাশ পেল শম্ভু মিত্রের নিজের ব্যাখ্যাতেও :

> একবার যদি বোঝা যায় যে যক্ষপুরীর আজকের এই ঐশ্বর্য এই প্রতাপ সম্ভব হয়েছে এই রাজার দ্বারা— তাই সে ঐ যক্ষপুরীর রাজা— তাহলে আর কোনো অসুবিধে থাকে না।...
>
> রাজা এখানে একটা মানুষ। যার একদিন যৌবন ছিল আজ নেই। তার কষ্ট, তার রাগ, তার উদভ্রান্তি, এইসব নিয়ে তাকে একটা মানুষের রূপের মধ্যে ধরা হয়েছে।— রবীন্দ্রনাথের নাটকে এরা সব বিমূর্ত চরিত্রের নয়। —নাটক রক্তকরবী, পৃ. ২৬-২৭

এই রাজার পোশাকে, নন্দলালের ইঙ্গিতের অনুসরণে, আঁকা থাকত একটি দাঁতালো চাকা, যা ওই বৈজ্ঞানিক শক্তিরই অনুষঙ্গবাহী। অবশ্য, নাটকের শেষে, রাজা মঞ্চে এলেও, আলোর নিপুণ নিয়ন্ত্রণে তাকে প্রায় অন্ধকারেই রেখে দেওয়া হত।

রাজা যে একই সঙ্গে ব্যক্তিমানুষ এবং বৈজ্ঞানিক শক্তির প্রতিভূ, তার যন্ত্রণা যে এই যন্ত্রযুগের সংঘাতময় জীবনেরই যন্ত্রণা, সেই সংঘাত যে তার চরিত্রের মধ্যে স্ববিরোধিতা ও আত্মদ্বন্দ্ব তৈরি করেছে— এ-সমস্তই যেন বিশেষ ব্যঞ্জনা পেত ওই আলো-আঁধারের রহস্যময়তায়। আলোয়-উদ্ভাসিত সম্পূর্ণ দৃশ্যগোচর রাজার চেয়ে এই আবছা আলোয় প্রায়-ছায়ামূর্তির মতো রাজার উপস্থিতি হয়তো তার সম্বন্ধে দর্শকের কল্পনাকে আরও উশ্‌কে দিত যে কল্পনায় এই বহুস্তরিক চরিত্রের পরস্পরবিরোধী দিকগুলো আরও সহজে অনুমান করা যায়। আর তখন, আরও একবার চমকে উঠতে হয় শম্ভু মিত্রের অসাধারণ প্রয়োগনৈপুণ্যের পরিচয় পেয়ে। আরও একবার তাই প্রমাণ হয়ে যায় 'নাটক রক্তকরবী'-গ্রন্থটির কতখানি প্রয়োজন ছিল— ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য।

৮.

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আরও একটি প্রয়োজনীয় কাজ শম্ভু মিত্র করেছেন— বিগত দিনের কয়েকটি স্মরণীয় প্রযোজনা বা প্রযোজক বা অভিনেতার বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্মৃতিচারণের ভিতর দিয়ে সেই যুগের নাট্যচর্চার সঙ্গে আমাদের পরিচিত করিয়েছেন ; সেইসব নাট্যপ্রতিভার প্রতি নিজেও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, আমাদেরও সশ্রদ্ধ করে তুলেছেন। বাইরের মহলের সমস্ত 'যথাযথ'-সমালোচনাকে ডিঙিয়ে এই জানা ও জানানো ভেসে আসে নাট্যজগতের অন্দরমহল থেকে। সেখানেই এই স্মৃতিচারণের বিশেষ মূল্য।

শিশিরকুমার ভাদুড়ির নাট্যপ্রতিভাকে শম্ভু মিত্র অনেকবার স্মরণ করেছেন অনেক ক্ষেত্রে। নাট্যসম্পাদনায় শিশিরকুমারের অসাধারণ দক্ষতার সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। 'দিগ্বিজয়ী' নাটকে, দিল্লি-ধ্বংসের দৃশ্যে, নাদির শাহের সংলাপ বাদ দিয়ে শিশিরকুমার মঞ্চের ওপর একটি বিশেষ ছবি তৈরি করতেন, যা ধ্বনি ও আলোর সহযোগে একটি তীব্র নাট্যমুহূর্তকে ধরিয়ে দিত ('শিশিরকুমারের প্রয়োগকলা সম্পর্কে', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ১০৫)। শম্ভু মিত্রের মতে শিশিরকুমারই আধুনিক বাংলা নাটকের 'প্রথম প্রয়োগকার' এবং 'তাঁর হাতেই নাট্যাভিনয় প্রথম শ্রুতির ও দৃষ্টির সমন্বয় বিধান করলো। এবং মঞ্চসজ্জায় একটা কল্পনা প্রকাশ পেল' ('মঞ্চসজ্জার ভূমিকা', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ৪৭)। আরেক প্রবন্ধে লেখেন : 'শিশিরকুমার হলেন প্রকৃত অর্থে বাঙলা রঙ্গমঞ্চের প্রথম নির্দেশক। নাট্য-অভিনয়কে একটি সামগ্রিক শিল্পকর্ম হিসেবে তিনিই প্রথম দেখেন' ('বাংলা মঞ্চ ও অভিনয়ের বিবর্তন রেখা', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ১৪৭)। শিশিরকুমার ভাদুড়ির এই প্রচেষ্টায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি নিজেও চেষ্টা করেছেন

তাঁর নাট্যকে একটি 'সামগ্রিক শিল্পকর্ম'-এর রূপ দিতে ; সে-আলোচনা আমরা পূর্বেই করেছি। কখনো শিশির ভাদুড়ির 'বুদ্ধিমার্জিত অভিনয়ভঙ্গী' দেখে শম্ভু মিত্রের মনে হয়েছে যেন তিনি 'চরিত্রটির বাইরে দাঁড়িয়ে তাকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখাচ্ছেন...' ('কিছু পুরনো কথা', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ৬৫), আবার কখনো তিনি মুগ্ধ হয়েছেন সেই পূর্বসূরী-অভিনেতার হিরোয়িক অভিনয়ের ব্যাপ্তিতে ('কিছু স্মরণীয় অভিনয়', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ৯৮)। শিশিরকুমারের নাট্যপ্রতিভার মধ্যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসামান্য ধীশক্তির প্রয়োগ শম্ভু মিত্রকে আকৃষ্ট করে।[১৮] তিনি বুঝতে পারেন এই মানুষটির 'চিন্তাটা এইরকম প্রত্যেকটা চরিত্রাভিনয়ের খুঁটিনাটি পর্যন্ত বিস্তৃত', অনুধাবন করতে পারেন কেমনভাবে তাঁর নাট্যপ্রযোজনা, 'চোখ, কান, বুদ্ধি ও হৃদয়কে, কখনো একটার পর একটাকে, কখনো বা একসঙ্গে সবগুলোকে তৃপ্ত করে...' ('শিশিরকুমারের প্রয়োগকলা সম্পর্কে', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ১০৪)।

অন্য দিকে, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য বা যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর মতো অভিনেতারা কীভাবে তাঁদের পরিমিতিবোধের মধ্যে আবেগের নির্যাসকে ধরে রাখতে পারতেন, তারও কিছু বিশদ বিশ্লেষণ পাওয়া যায় শম্ভু মিত্রের প্রবন্ধে ('কিছু স্মরণীয় অভিনয়', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ১৫-১৮)। সেইসঙ্গে আছে আক্ষেপ, কারণ এঁদের অভিনয়প্রতিভা সমসাময়িককালে যোগ্য সম্মান লাভ করতে পারে নি ('একটি আলোচনা', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ৭৬)। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের প্রতি যে এক গভীর শ্রদ্ধাবোধ শম্ভু মিত্র তাঁর মনের মধ্যে লালন করেন, তা-ই ফুটে বেরোয় 'পিতৃতর্পণ' (সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ১৬৬-১৭০) বা 'মহর্ষি' (পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৭-২০০) শীর্ষক প্রবন্ধে : 'আমাদের জীবনের কেন্দ্রে যদি তখন মহর্ষি অমন দৃঢ়ভাবে না থাকতেন তাহলে সেই গড়ে ওঠবার সময়ে আমরা টিঁকতুম কিনা জানি না, টিঁকলেও বোধহয় একটা অন্য চেহারা হয়ে যেত' ('পিতৃতর্পণ', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ১৬৭)।

আবার, সমসাময়িক বন্ধু, এককালের সহ-নাট্যকর্মী, বিজন ভট্টাচার্যের অভিনয়-ক্ষমতারও স্পষ্ট বিবরণ আছে, আছে তাঁর নাট্যরচনার প্রতিভার সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি। 'মরা চাঁদ' বা 'নবান্ন'-তে তাঁর অভিনয়রীতির বর্ণনা দিতে দিতে শম্ভু মিত্র-র মন্তব্য : '...আমার মনে হয়েছে যে, বাস্তবের (যে-বাস্তবকে আমরা প্র্যাকটিক্যাল যুক্তির ছাঁচে ব্যাখ্যা করি) তার বিপরীতেই বিজন দাঁড় করাত তার অনুভবের তীব্রতাকে। ঐখানেই তার বৈশিষ্ট্য, আর ঐখানেই তার সমস্ত জোর' ('বিজন', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ২১০)। এখান থেকেই যেমন বিজন ভট্টাচার্যের 'অগোছালোপনা'-র শুরু, তেমনি এখানেই আছে তাঁর 'সমস্ত শিল্পসৃষ্টির উৎস' (পূর্বোক্ত, পৃ. ২১০, ২১১)।

শম্ভু মিত্রের এইসব স্মৃতিচারণ মেদহীন, বাহুল্যবর্জিত ; অথচ প্রতিটি উল্লিখিত নাট্যব্যক্তিত্ব তাঁদের নিজস্ব প্রতিভার বৈশিষ্ট্যের বিবরণে ভাস্বর হয়ে আছে তাঁর লেখনীতে।

৯.

শম্ভু মিত্রের সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে এবং অবশ্যই তাঁর নাট্য-আলোচনার মধ্যেও— তাঁর প্রখর যুক্তিবাদী সত্তাটি বার বার আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। নাট্যচর্চার মধ্যে তাই তিনি খুঁজে পান বুদ্ধি-আশ্রিত বোধের প্রকাশ। তাই অযৌক্তিক, অবিবেচক আবেগের বন্যা নয়, 'বে-বুদ্ধি উচ্ছ্বাস' নয়, যুক্তিনির্ভর আবেগময়তায় তাঁর বিশ্বাস। সেই ১৯৫৭-র প্রথম গ্রন্থটিতেই তিনি লিখেছিলেন :

> হৃদয়বৃত্তির সঠিক চর্চা বুদ্ধিচালিত পথেই।
>
> —'বাংলা থিয়েটার', অভিনয়-নাটক-মঞ্চ, পৃ. ৩১

বাক্যটিতে সামান্য দু-একটি কথা সংযোজন করে, এই উক্তিটিই ফিরে এসেছে 'সন্মার্গ সপর্যা'-য়, প্রবন্ধটির

পুনর্মুদ্রণের মধ্যে[২০]। সেইজন্যেই শম্ভু মিত্র রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আবিষ্কার করেন 'একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান ও অসাধারণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ' ('কীভাবে রবীন্দ্রনাথে পৌঁছানো গেল', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ১৮৭) ; বুঝতে পারেন যে, 'তাঁর সংলাপের সেই ধারালো বুদ্ধিটা যদি না বোঝাতে পারি লোককে, যদি সেই সংলাপ বুদ্ধিবর্জিত "কাব্যিক-কাব্যিক" সুরে পড়ি, তাহলে নিজেদের যে-টুকু বুদ্ধি আছে তারও অপমান ঘটাই' (পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯০)। সেইজন্যেই তিনি মুগ্ধ হন শিশিরকুমার ভাদুড়ির বুদ্ধিমার্জিত আবেগের প্রকাশে : 'কথা যে কেবল সেন্টিমেন্টবাহী নয়, তাতে যে বুদ্ধির বিচিত্র রং ঝলমল করে, সেটা কেবলমাত্র তাঁর অভিনয়েই বুঝতে পারতুম' ('নবনাট্যের বিচার', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ৫৮)। সেইজন্যেই ব্রেশ্‌ট্ আর স্তানিস্লাভ্‌স্কির নাট্যরীতির মধ্যে তেমন কোনো বৈপরীত্য তাঁর কাছে ধরা পড়ে না ('ব্রেখ্‌টের থিয়েটার', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ১০৯-১১১)। সেইজন্যেই তিনি ঘোষণা করতে পারেন : 'নাটকটা খালি নিজের বুদ্ধি নিয়েই বুঝতে হবে' (কাকে বলে নাট্যকলা, পৃ. ৪৫)।

এইটে যখন না ঘটে, তখন তাঁর আশঙ্কা জাগে সেই ১৯৫৭-তে যেমন, ১৯৯১-তেও তেমনি :

> সেই বুদ্ধির আবেদন আমরা বর্জন করেছি, ফলে হৃদয়ের আবেদনও এসে দাঁড়িয়েছে চমকের আবেদনে।
>
> —'বাংলা, থিয়েটার', অভিনয়-নাটক-মঞ্চ, পৃ. ৩০ ; সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ১৪

এবং

> তখন বড় ভয় হয় বড় দুঃখ হয় যে এরা যদি পৃথিবীটাতে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা যদি দেখতেই না শেখে, তাহলে আমরা যে বলছি— আমাদের বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া চাই, জীবনকে বোঝা চাই— সেসব হবে কী করে ?
>
> —কাকে বলে নাট্যকলা, পৃ. ৪৭-৪৮

এই 'ভয়', এই 'দুঃখ' তাঁর মধ্যে তখন এক সিনিক-কে জাগিয়ে তোলে। লক্ষ্যভ্রষ্ট বাংলা থিয়েটারের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি সন্দিহান হয়ে পড়েন। কারণ তিনি দেখতে পান সেই থিয়েটারকে ঘিরে রয়েছে যে বৃহত্তর সমাজ সেখানে :

> সমস্ত সময়টা ধ'রে তান্ত্রিকদের মারণ-যজ্ঞ চলতে থাকে— সব মূল্যমানকে ভাঙবার জন্যে, পুরো সমাজটাকে উৎকেন্দ্রিক করে দেবার জন্যে।
>
> —'ভূমিকা', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ৭

এই লক্ষ্যভ্রষ্টতা, এই মূল্যমানের অবক্ষয়, এই সমাজব্যাপী জীবনব্যাপী 'মারণ-যজ্ঞ'-এর তাণ্ডব, এই অশুভ চক্রের সর্বগ্রাসী আগ্রাসন— এরই ছবি কি ফুটে ওঠে নি শম্ভু মিত্রের অন্য এক অতুলনীয় সৃষ্টিকর্মের মধ্যে, তাঁর 'চাঁদ বণিকের পালা'-র মধ্যে ? সেই একই তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি, সেই একই বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিনির্ভরতা, সেই একই গভীর জীবনবোধের উপলব্ধি তাই ছড়িয়ে থাকে তাঁর নাট্য-প্রযোজনায়, নাট্য-আলোচনায়, নাটক-রচনায়। শঙ্খ ঘোষের ভাষা ধার করে বলা যায় :

> মায়ামমতাহীন যে 'প্রচণ্ড ভয়ংকর অন্ধকার' আমাদের সামনে ছড়িয়ে থাকে জীবন নাম নিয়ে, তারই সঙ্গে তাহলে একটা বোঝাপড়া করতে চান তিনি, খুঁজে নিতে চান 'গোটা জীবনের মানে', বুঝে নিতে চান কীভাবে তার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে একেবারে নিঃস্বতা আর সর্বনাশের পটে।
>
> —'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে tussle?' স্যাস্, দশম বার্ষিক সংখ্যা, ১৯৯৩, পৃ. ৩২৩-৩২৪

এইভাবেই তাই কাজ করে চলেছেন 'নাটককার' শম্ভু মিত্র, 'নাট্যকার' শম্ভু মিত্র। তাঁর সমস্ত কাজের মধ্যে দিয়েই— শুধু নাট্যবিষয়ক প্রবন্ধের ক্রমান্বয় প্রকাশেই নয়— বয়ে চলেছে তাঁর নিজস্ব নাট্যভাবনার

একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। তাঁর নাট্যজীবনের উষালগ্ন থেকে আরম্ভ করে সেই প্রবাহ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে, সমৃদ্ধতর হয়েছে। সেইভাবেই শম্ভু মিত্র তাঁর যাবতীয় নাট্য-ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে তাঁর নিজস্ব নাট্যভাবনার একটি সুস্পষ্ট ধারাবাহিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন।

টীকা

১. রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮ (১৯৬১), পৃ. ১০৩৩।
২. পূর্বোক্ত, ১৪, পৃ. ৭৪৪-৭৪৫।
৩. গিরিশচন্দ্র রচনাবলী ১, রথীন্দ্রনাথ রায় ও দেবীপদ ভট্টাচার্য -সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৬৯, পৃ. ৭৩৯-৭৪৯।
৪. যেমন, স্বাধীনতা আন্দোলন ও তৎকালীন দেশাত্মবোধক নাটকের প্রসঙ্গে 'বে-বুদ্ধি উচ্ছ্বাস' (অভিনয়-নাটক-মঞ্চ, পৃ. ৩০) কথাটি পরিহার করা হয়েছে সন্মার্গ সপর্যা-র পাঠে।
৫. গিরিশচন্দ্রও বহু ক্ষেত্রে 'নাটককার' কথাটিকে এইভাবে ব্যবহার করেছেন : 'সুতরাং আকাঙ্ক্ষা ও চমৎকারিত্ব উৎপাদন করা নাটককারের এক স্বতন্ত্র কৌশল' ('নাট্যকার', গিরিশ রচনাবলী ১, পৃ. ৭৪৮)। অবশ্য, পাশাপাশি 'নাট্যকার' কথাটির প্রয়োগও সেখানে পাওয়া যায়।
৬. অভিনয়-নাটক-মঞ্চ গ্রন্থে শম্ভু মিত্র বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের অভিমত অনুসরণে কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্য প্রকাশের ব্যাখ্যা করেন ('অভিনয় কী ?' অভিনয়-নাটক-মঞ্চ, পৃ. ১০৮-১১২)।
৭. 'বাংলা থিয়েটার', অভিনয়-নাটক-মঞ্চ, পৃ. ২৭-২৮ ; সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ১৩-১৪। 'ইতি কর্তব্য', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ৪১-৪২।
৮. 'একটি অন্বেষণে', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ৮৮।
৯. অভিনয়কালে মঞ্চে ভঙ্গির ব্যবহার প্রসঙ্গে সুজাতার প্রণামের ভঙ্গির উল্লেখ করেছেন (কাকে বলে নাট্যকলা, পৃ. ৫৪)।
১০. প্রায় একই ধরনের ইঙ্গিত আছে উৎপল দত্তের 'বাস্তব ও বাস্তবোত্তর' প্রবন্ধে (চায়ের ধোঁয়া, কলকাতা, ১৯৭৯, পৃ. ১০৮-১০৯)।
১১. শঙ্খ ঘোষ, কালের মাত্রা ও রবীন্দ্র-নাটক, কলকাতা, ১৯৬৯, পৃ. ১০৪।
১২. নাটক রক্তকরবী, পৃ. ৪০।
১৩. 'তথাকথিত' কথাটি সন্মার্গ সপর্যা-র পাঠে এসেছে, প্রসঙ্গ : নাট্য-এর পাঠে কথাটি অনুপস্থিত ছিল।
১৪. 'শিশিরকুমার হলেন প্রকৃত অর্থে বাঙলা রঙ্গমঞ্চের প্রথম নির্দেশক। নাট্য-অভিনয়কে একটি সামগ্রিক শিল্পকর্ম হিসেবে তিনিই প্রথম দেখেন' ('বাংলা মঞ্চ ও অভিনয়ের বিবর্তন-রেখা', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ১৪৭)।
১৫. তবে এটাও ঠিক শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় বহুরূপীর প্রযোজনায় যে রুচিশীল সুষম সামগ্রিকতার ছাপ থাকত, উৎপল দত্তের পরিচালনায় ও প্রযোজনায় সব সময়ে তেমনটি যেন ঘটত না। উৎপল দত্ত অনেক সময়েই শ্রুতির ওপরে দৃশ্যকে, বাচিক সংলাপ বা সংগীত প্রয়োগের ওপরে আঙ্গিক অভিনয় বা আলোক-সম্পাত বা মঞ্চসজ্জাকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে ফেলতেন।
১৬. 'বাংলা মঞ্চ ও অভিনয়ের বিবর্তন-রেখা', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ১৫১।
১৭. 'ভূমিকা', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ১০।
১৮. 'তাঁর নাট্য-প্রয়োজনায়, তাঁর অভিনয়ে, তাঁর বাচনভঙ্গীতে, তাঁর উচ্চারণে আমি নিজে প্রথম বুদ্ধির দীপ্তি স্পষ্টত অনুভব করলুম' ('নবনাট্যের বিচার', সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ৫৮)।
১৯. অভিনয়-নাটক-মঞ্চ, পৃ. ৩০।
২০. 'কারণ হৃদয়বৃত্তির সঠিক চর্চা তো বুদ্ধিচালিত পথেই' ('বাংলা থিয়েটার, সন্মার্গ সপর্যা, পৃ. ১৫)।

শম্ভু মিত্র, সন্মার্গ সপর্যা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সনস্ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, মাঘ ১৩৯৬ (জানুয়ারি ১৯৯০)। মূল্য চল্লিশ টাকা।

কাকে বলে নাট্যকলা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৯১। মূল্য পনেরো টাকা।

নাটক রক্তকরবী, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স্ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯২। মূল্য চল্লিশ টাকা।

অভিজিৎ সেন

সংলাপ

গল্প ও তার গোরু

বিশ্বভারতী পত্রিকা (নবপর্যায় ১) হাতে এল। শ্রীঅরুণ নাগের পাণ্ডিত্যপূর্ণ দীর্ঘ প্রবন্ধটি পড়ে দু-একটি মন্তব্য করার লোভ সামলাতে পারছি না!

অরুণের লেখায় রঙপুর জেলার অন্তর্গত ভবচন্দ্রপাট এবং ভবচন্দ্র রাজার উল্লেখ আছে। রাজা ভবচন্দ্র বা হবুচন্দ্র কীভাবে নির্বোধ হন সে ব্যাপারে একটি গল্প— একে কি 'কথা' বলা যাবে?— প্রচলিত ছিল ওই অঞ্চলে। গল্পটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক।

দেখা নয়, শোনা কথা বলছি। আমাদের ছোটোখাটো যা তালুকমুলুক ছিল ওই অঞ্চলে তার মধ্যে অবস্থিত ছিল একটি জীর্ণ মন্দির। মন্দিরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ধাতুনির্মিত দেবীমূর্তিটি না কি ক্রমে ক্ষয় পাচ্ছে— এটাই ছিল স্থানীয় জনশ্রুতি। কেন দেবীমূর্তিটি ক্ষয় পাচ্ছে তার সঙ্গে হবুচন্দ্র রাজার নির্বুদ্ধিতাপ্রাপ্তির ঐতিহ্যকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে গল্পটিতে।

অম্বুবাচীর দিন দেবী রজস্বলা হন। সেদিন মন্দিরে পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ। নিষেধ অমান্য করে রাজা প্রবেশ করেন মন্দিরে এবং রজস্বলা অবস্থায় দেখে ফেলেন দেবীকে। সরোবরে স্নানরতা কৌমার্যের দেবী আর্টেমিসকে দেখে ফেলবার জন্য প্রাণ দিতে হয়েছিল থিবিসের রাজপুত্র অ্যাক্টিয়নকে। ওভিদ-এ চমৎকার বর্ণনা আছে কীভাবে হতভাগ্য যুবকটি পরিণত হলেন একটি হরিণে এবং তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর নিজের শিকারী কুকুরের দল। ভবচন্দ্রের ভাগ্য কিন্তু অত কিছু করুণ ছিল না, ক্রুদ্ধ দেবীর অভিশাপে লোপ পেল শুধু তাঁর বুদ্ধি।

এই শাস্তি কিন্তু মেনে নিতে পারলেন না ভবচন্দ্র। রজস্বলা অবস্থায় দেবীকে তিনি দেখেছেন ঠিকই। তবে তাঁর যুক্তি হল, পুরুষ হলেও তিনি তো দেবীর সন্তান। তা সত্ত্বেও দেবী যখন তাঁকে এত বড়ো অভিশাপ দিতে পেরেছেন, তাঁকেও রাজা পাল্টা অভিশাপ দিলেন : দিনে দিনে ক্ষয়প্রাপ্ত হবেন তিনি।

কাহিনীটির মধ্যে মাতৃতন্ত্রকে ঘিরে একটি সাংস্কৃতিক প্রত্নস্মৃতি সংরক্ষিত আছে— ব্রহ্মণ্যতন্ত্রের প্রসারে ক্ষীয়মাণ মাতৃতন্ত্র— এরকম কোনো আজগুবি দাবি আমি রাখছি না। তবে বেশ-কয়েকটি বিপরীতার্থক যুগ্মের সমাবেশ যে একে বৈশিষ্ট্য দিচ্ছে, তা মনে হয় না অস্বীকার করার উপায় আছে : শুচি/অশুচি, নারীত্ব/পুরুষত্ব, সন্তান/মাতা, নিষেধ/লঙ্ঘন, জৈব প্রক্রিয়া/ধর্মোপাসনা, শারীরিক ক্ষয়/বুদ্ধিলোপ। আরও যা মজার কথা, সামগ্রিকভাবে কাহিনীটি গড়ে উঠেছে এক জোড়া অভিশাপকে অবলম্বন করে। এদের একটির কথা— হবুচন্দ্রের বুদ্ধিলোপ— সবাই জানে; দ্বিতীয়টি এতদূর ফলে গেছে যে তা লোকস্মৃতি থেকে কার্যত বিদায় নিয়েছে।

আমার আলোচনা কি একটু অব্যাপারেষু ব্যাপারম্ হয়ে যাচ্ছে? সে যাই হোক, অরুণের প্রবন্ধের তাত্ত্বিক কাঠামো সম্পর্কে আমার ছোটো দু-একটি যে আপত্তি আছে আমি তা নিবেদন করছি।

প্রবাদে বলে— অরুণও কার্যত বলছেন— গল্পের গোরু গাছে ওঠে। গোরু কত কিসিমের, গাছেরই বা কী কী জাত এবং তাতে সে ওঠেই বা কত বিচিত্র কায়দায়, অরুণের প্রবন্ধের জোর এসে পড়ছে এই জায়গায়। আমার বিনীত ধারণা, বৈচিত্র্যের দিকে নজর চলে যাবার ফলে দুর্বল হয়ে পড়েছে প্রবন্ধটির তাত্ত্বিক ন্যায়। বাস্তবকে ডিঙিয়ে যাবার ব্যাপারে গোরুটির এই যে আপ্রাণ প্রবণতা, শুধু তার রকমফের নয়, যুক্তিবিন্যাসের দিকে মনোযোগ সংহত করবার প্রয়োজন ছিল। প্রবন্ধের শেষের দিকে যে নঞর্থকতার কথা অরুণ বলছেন— বাস্তবকে যা প্রতিরোধ করছে, প্রয়োজনে ভাঙছে— সেদিক দিয়ে এগোলে গল্পকে যুক্ত করা যেত আধুনিক এবং উত্তর-আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে, যেমন পরা-বাস্তবতা এবং জাদু বাস্তবতা। মনে হয়, ব্যাপারটির প্রয়োজন ছিল।

ধরা যাক, উদ্ভটের ট্যাক্সোনমি বা বর্গীকরণ করা সম্ভব। কিন্তু শুধু বিচিত্রকে আস্বাদ করতে চাইলে কি এটা সম্ভব হবে ? এর জন্য প্রয়োজন সূত্রায়ণের, যদিও তা বলে যে তত্ত্বের কোনো অনড় যান্ত্রিক নিগড় তৈরি করতে হবে এমন কোনো দাবি আমি রাখছি না। আমার প্রশ্ন : বাস্তবের বাইরে গোরুটির এই যে যদৃচ্ছ গমনাগমন, তার তাৎপর্য কি সব গল্পেই এক ? কোথাও তা হয়তো দেয় কাল্পনিকের আস্বাদনজনিত রোমাঞ্চ, মুহূর্তের শিহরন জুগিয়ে যা ফুরিয়ে যায় ; কোথাও তার কেন্দ্রে রয়েছে বাস্তবের সচেতন প্রতিকূলতা। প্রসঙ্গত, পরাবাস্তবতার মধ্যে আর্নস্ট ব্লক বাস্তবতার বিরুদ্ধে উচ্চারিত এই প্রতিবাদই তো লক্ষ করেছিলেন।

তা ছাড়া বাস্তবের বাইরে যা রয়ে গেল— অব-বাস্তব, অ-বাস্তব, অতি-বাস্তব এবং পরা-বাস্তব— থাকবন্দী করে তাদের সাজিয়ে নিলে কেমন হত ? অনেকটা যেন, খাড়াই বরাবর, বাস্তবের পায়ের তলায় অব-বাস্তবের থাক থেকে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলে, বাস্তবকে ডিঙিয়ে, তার মাথার ওপর রয়ে গেছে অতি-বাস্তব ; আর চার পাশে, অনুভূমিক বিস্তারে তবে তার নাগালের বাইরে, ছড়িয়ে রয়েছে পরা-বাস্তব, যা বাস্তবের সমান্তরাল। অতি-বাস্তবে যে উল্লম্ফন রয়েছে শ্রুত সাহিত্যে তার বড়ো নমুনা রূপকথা ; যেমন অ-বাস্তবের সাহিত্য এবং শিল্প হল যা মূলত উদ্ভট ও কিমাকৃতি। এ যেন বাস্তবের ওপর এক অলীক আয়না মেলে রচনা করা হল এক অলীক ক্ষেত্র ; এবং এই স্থানান্তর বা ক্ষেত্রান্তরের ফলে যা গড়ে উঠল তা-ই হল, আমাদের দ্বিধান্বিত বিচারে, অ-বাস্তব। সে ক্ষেত্রে ডিসটোপিয়া এবং ঐতিহাসিক আশাভঙ্গের কাহিনীকে নিশ্চয় যুক্ত করতে হবে অব-বাস্তবের সঙ্গে। এটা একটি সম্ভাব্য ছক, তাই আরও মূল্যবান নানা বিকল্প সূত্রায়ণের সম্ভাবনাকে কিন্তু কোনো মতেই নাকচ করা যাচ্ছে না।

আর একটি কথা। অরুণ যেসব গল্পের দিকে আমাদের মনোযোগ টেনেছেন, তাদের অধিকাংশই শ্রুত, অর্থাৎ মৌখিক। মৌখিকতার একটি তাত্ত্বিক নির্দিষ্টতা আছে, অভিজ্ঞতাটি ধরা দিচ্ছে একটি জ্যামিতিক সংগঠনের মধ্যে। যে সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়াটিকে অভিহিত করা হচ্ছে 'গল্প বলা' বলে, তার কেন্দ্রে রক্তমাংস নিয়ে সরাসরি উপস্থিত বক্তা। গল্পের অভিমুখ কেন্দ্রাতিগ : বাইরে, পরিধি বরাবর উৎকর্ণ হয়ে রয়েছে যেসব শ্রোতা, তাদের দিকে এর ঢাল। দেশে ও কালে, যেমন বেঞ্জামিন দেখিয়েছেন, শ্রোতৃমণ্ডলীর অভিজ্ঞতার বাইরে থেকে জোগাড় করে এনে, তাদের দিকে তিনি এগিয়ে দিচ্ছেন নব নব অভিজ্ঞতাকে— না, তাদের টুকরো টুকরো খণ্ডকে নয়, কাহিনীকে, গ্রন্থিত সামগ্রিককে। স্মরণ করুন সূতকে, শাহারজাদি বা সিন্ধবাদকে, জাতকের ভগবান বুদ্ধকে।

যা অতিপ্রাকৃত, যা পরা-বাস্তব, বক্তার চৈতন্যমণ্ডিত শারীরিক উপস্থিতিই তো তার মধ্যে সংক্রামিত করছে বাস্তবের জীবিত দ্যোতনাকে। গল্প বলার ঢাল বেয়ে, বাস্তব ও পরা-বাস্তবের মধ্যে এর ফলে যে যৌগপদ্য গড়ে উঠছে, বর্জন নয়, গড়ে উঠছে যে পারস্পরিক অবলম্বনের ন্যায়, আলোচ্য প্রবন্ধে অরুণ কিন্তু এই উভ-টানের ওপর তাঁর মনোযোগকে রাখছেন না। এটা মনে হয় দরকার ছিল।

প্রত্যাশা থেকেই যে আমার এই আলোচনা, আশা করি, অরুণ তা বুঝবেন।

অনিরুদ্ধ লাহিড়ী

আদিবাসী সমাজ

নবপর্যায় বিশ্বভারতী পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় বিনয় চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধ 'ঔপনিবেশিক পূর্বভারতের আদিবাসী সমাজ : সাম্প্রতিক কয়েকটি ধারণার বিচার' খুবই সময়োপযোগী চিত্তগ্রাহী এবং চিন্তা উদ্রেককারী। প্রবন্ধটি আমার মতো নৃবিজ্ঞানের ছাত্রের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। বিনয় চৌধুরী দেভাইয়ের বই অবলম্বন করে কয়েকটি প্রশ্ন তুলেছেন। সব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে অতিদীর্ঘ লেখার প্রয়োজন হবে তাই আমি মূলত, আদিবাসী

এই অভিধাটি নিয়ে এবং সাম্প্রতিক আদিবাসী আন্দোলনের বিষয়ে নিজের নৃতাত্ত্বিক ক্ষেত্র সমীক্ষার (anthropological field work) ভিত্তিতে অভিজ্ঞতা ও ধারণার কথা আলোচনা করার চেষ্টা করব।

দেভাইয়ে আদিবাসীর সংজ্ঞা ও ইতিহাস নিয়ে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন আলোচ্য প্রবন্ধে বিনয় চৌধুরী সে সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেন। বিনয় চৌধুরী মহাশয়ের মতের সঙ্গে আমি একমত। বাস্তবিক এই ট্রাইব, অটোক্‌থন্‌স, ইন্ডিজেনাস পিপল এবং তার প্রতিশব্দ নিয়ে একটা বিশেষ অশান্তি এবং জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। আদিবাসী অভিধাটি একটা ভুল মানসিকতা গঠনে সহায়তা করছে। ট্রাইবের এই অবৈজ্ঞানিক প্রতিশব্দ নিছক অবহেলায় আমাদের দেশে চালু হয়ে গেল। কাজেই 'আদিবাসী' শব্দটি প্রথমে আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। ট্রাইব শব্দটির প্রতিশব্দ হিসাবে আদিবাসী, উপজাতি, বন্যজাতি, অরণ্যবাসী, খণ্ডজাতি, জনজাতি ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। এ ছাড়া আদিম নৃগোষ্ঠী, ক্ষুদ্রভাষা সম্প্রদায়, আদিমজাতি ইত্যাদি শব্দ প্রচলনের স্বপক্ষেও প্রবন্ধাদি লেখা হয়েছে। শব্দার্থগত বিভ্রান্তি এড়াবার জন্য আমি বর্তমানে ট্রাইব, টোটেম, টাবু, কাস্ট, নেশন ইত্যাদি শব্দ অবিকলভাবে ভারতীয় ভাষায় গ্রহণ করা উচিত বলে মনে করি, অবশ্যই ইংরাজি আভিধানিক অর্থ অপারিবর্তিত রেখে। সংখ্যার ক্ষেত্রে দেখছি সর্বভারতীয় ভাবে আন্তর্জাতিক আরবি সংখ্যাকেই গ্রহণ করা হয়েছে। ডিএনএ আরএনএ ইত্যাদি শব্দও গ্রহণ করা হয়েছে।

ভারতবর্ষে বিভিন্ন নৃজাতি এবং ভাষাগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে কৃষ্ণবর্ণ বা নিগ্রো, নিগ্রয়েড, নেগ্রিটো, নিগ্রবটু জাতির মানুষই প্রাচীনতম। দক্ষিণ ভারতের ইরুলা, কাদির কুরুম্বা পনিয়ন ও আন্দামান নিকোবর দ্বীপসমূহে এঁদের দেখতে পাওয়া যায়। নৃবিজ্ঞানের পরীক্ষায় কিন্তু কোথাও এঁদের অবিমিশ্রভাবে পাওয়া যায় না। দেহগঠনের ও ভাষার বিচারে পূর্ব ভূমধ্যসাগরের দেশ থেকে যাঁরা আগত, তাঁরা হলেন প্রোটো-অস্ট্রালয়েড বা আদিম দক্ষিণাকার মানুষ, যাঁদের নাক চ্যাপ্টা, কপাল দীর্ঘ ও গায়ের রঙ কালো। তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষদের মধ্যে এই শ্রেণীর মানুষ দেখা যায়। অস্ট্রিক বা দক্ষিণ দেশীয় লোকরাও সম্ভবত ভূমধ্যসাগরতীরবর্তী অঞ্চল, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি স্থান থেকে ভারতে প্রবেশ করেন। অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত এঁরা ছড়িয়ে পড়েন। এই অস্ট্রিকভাষী জনগণ তীক্ষ্মমুখ লগির দ্বারা গর্ত খুঁড়ে চাষ, কলা নারকেল পান সুপারি আদা হলুদ এবং মুরগি প্রতিপালন প্রচলন করেন। পরবর্তীকালে দ্রাবিড় ও আর্যভাষী জাতিগোষ্ঠী ভারতে প্রবেশ করেন। কালক্রমে এঁদের সকলের মধ্যেই দৈহিক, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক মিশ্রণ ঘটে এবং কিছুসংখ্যক আর্যভাষীগোষ্ঠীর সঙ্গে স্বাঙ্গীকরণ ঘটে যায় (assimilation)। যে-সকল অস্ট্রিকভাষী স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেছিলেন আর্যভাষীগণ তাঁদের চিহ্নিত করার জন্য নাম দেন নিষাদ। কোল মুণ্ডা সাঁওতালি হো ভূমিজ খাড়িয়া কোরকু জুয়াং খাসিয়া নিকোবরী এই নিষাদ গোষ্ঠীর অন্তর্গত। অস্ট্রিকদের পর ভারতে ভূমধ্যসাগর ও আর্মেনীয় অঞ্চল থেকে দ্রাবিড় গোষ্ঠী ভারতে আগমন করেন। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন ৩৫০০ খ্রি. পূ. থেকে ২৭৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত এঁদের আধিপত্য ছিল। এর পর প্রবেশ করেন আর্যভাষীগোষ্ঠী এবং সমগ্র উত্তর ভারতে তাঁদের আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। ভাষা ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের অনুসন্ধানের ফলে দেখা যায় যে দ্রাবিড় ও নিষাদগণও ধীরে ধীরে আর্যভাষা ও সংস্কৃতি এবং আর্যভাষীগণও নিষাদ ও দ্রাবিড় শব্দ ও সংস্কৃতি গ্রহণ ক'রে এক মিশ্র সংস্কৃতির রূপ দেন এবং এই মিশ্র সংস্কৃতিই ভারতের সংস্কৃতি ও মানস -রূপে গড়ে উঠতে থাকে।

শারীরিক নৃবিজ্ঞানের দিক থেকেও ভারতবর্ষের সর্বত্র এই জাতিগোষ্ঠীর মিশ্রণ দেখা যায়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভাষার দিক থেকে এ মিলন-মিশ্রণ সম্পর্কে গভীর ও দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন চারটি বিশিষ্ট ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত বিভিন্ন ভাষা বর্তমান ভারতে প্রচলিত : ১. অস্ট্রিক বা দক্ষিণ বা নিষাদ ২. দ্রাবিড় ৩. ইন্দো-ইয়োরোপীয় (আর্য) এবং ৪. ভোট-চীন বা মোঙ্গল বা কিরাত। তিন হাজার বছরের অধিক কাল এগুলির পারস্পরিক প্রভাবে মৌলিক পার্থক্য সত্ত্বেও কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ গড়ে উঠেছে। একটি ভারতীয় সাংস্কৃতিক মানস তৈরি হয়েছে।

আমার শিক্ষক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে শুনেছিলাম যে স্যর হারবার্ট রিজ্‌লের স্ত্রী

নাট্‌শিভাবাপন্ন ছিলেন এবং তাঁর দ্বারা তিনি প্রভাবিত ছিলেন। রিজ্‌লে ভারতের এক রাষ্ট্রীয়তার বোধ অসম্ভব বলে মনে করতেন। কিন্তু তাঁর *Peoples of India* বইতে ভারতের তথাকথিত অন্ত্যজ সমাজের মধ্যে একটি সমতাসূত্র লক্ষ করেছেন। গ্রিয়ার্সনও ভারতের শত শত ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে মূলভাষা মাত্র কয়েকটি স্বীকার করেছেন ও এর মধ্যে সমতাসূত্র লক্ষ করেছেন। এই বিষয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা' পুস্তকে বিশদ আলোচনা করেছেন। বিনয় চৌধুরী মহাশয়ের উত্থাপিত কিছু প্রশ্নের সমাধান হয়তো এতে পাওয়া যাবে। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে এবং পরে 'ভারতকোষ'-এ ওরাওঁদের একটি শাখা কোড়ারা কীভাবে হিন্দু-সমাজে মিশে যাচ্ছেন সে সম্পর্কে আমার গবেষণার ফলাফল জানিয়েছি। আবার পটুয়াদের সম্পর্কে দীর্ঘকাল গবেষণার পর জেনেছি এঁরা আদিম অবস্থা থেকে হিন্দুদের সংস্পর্শে এসে কীভাবে হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মীয়ভাব গ্রহণ করেছেন। আবার পরবর্তীকালে নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক কারণে মুসলমান আগমনের পর এঁদের ইসলামকরণ হয়েছে। পরে এঁরাই আবার একই কারণে হিন্দুত্বের দিকে গিয়েছেন। এ বিষয়টি আমি আলোচনা করেছি *Cultural Oscillation* নামক বইয়ে। এই ধরনের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অবস্থানকারী জনগোষ্ঠী হচ্ছেন রাজস্থানের মেয়ো সম্প্রদায় এবং কর্ণাটকের গদ্দি আহির সম্প্রদায়, যাঁরা নামাজ পড়েন আবার গৃহে অম্বাদেবীর মূর্তি পূজা করেন। আমি ধারওয়ারের উপকণ্ঠে মুসলমান বলে পরিচিত গদ্দি আহিরদের প্রতিটি গৃহে অম্বাদেবীর মূর্তি অথবা বিশাল ছবি দেখেছি। কেরলের মোপলারা ধর্মে মুসলমান হলেও তাঁদের পূর্বপ্রচলিত মারিমোক্কায়ম বা মাতৃতান্ত্রিক উত্তরাধিকার আইন মানেন। গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের মসজিদও গম্বুজওয়ালা নয়, সাধারণ চৌচালা গৃহ। সারা ভারতবর্ষে এ ধরনের অজস্র উদাহরণ দেখানো যেতে পারে যা উচ্চকোটির ভারতবর্ষীয় মানুষের সাধারণজ্ঞানের বাইরে। ভারতীয় সামাজিক ইতিহাসে জনগোষ্ঠীর মিশ্রণের এই প্রক্রিয়া আজও সক্রিয়।

ট্রাইব ঔপনিবেশিকদের মনগড়া একটি শব্দ নয়। প্রয়োজনবোধেই এর উদ্ভব। ঔপনিবেশিকবাদীরা একে কখনো প্রশাসনের খাতিরে বিভাজন সৃষ্টির কাজে লাগিয়েছেন। বহু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানও তাঁদের উদ্দেশ্য সাধনে ট্রাইবের ব্যবহার করেছেন। ভোটের উদ্দেশ্যেই হোক আর বিপ্লবের উদ্দেশ্যেই হোক এর ব্যবহার আমাদের মোটেও অজানা নয়। অনেকেরই এ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। আগুন বা অণু সৃষ্টি না ধ্বংসের কাজে ব্যবহৃত হবে তা নির্ভর করে মানুষের সুবুদ্ধি ও কুবুদ্ধির উপর। বিজ্ঞানের আবিষ্কারের উপর নয়, সত্যানুসন্ধানী গবেষণার উপর নয়। আধুনিককালে রাজনৈতিক প্রয়োজনে বহু শব্দেরই অপপ্রয়োগ হচ্ছে। সকল মানুষের ভোটাধিকার একটি ভালো ব্যবস্থা কিন্তু বিচ্ছিন্নতার প্রশ্রয় দিয়ে, গোষ্ঠীবদ্ধতার উশকানি দিয়ে ভোট ব্যাঙ্কের নামে কলঙ্কজনক প্রচেষ্টায় কোনো দলের, উপদলের সাময়িকলাভ হলেও শেষ পর্যন্ত দেশের মানুষের ক্ষতিই হবে।

বর্তমান অবস্থার বিচারে বিনয় চৌধুরী যে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন, যে প্রশ্ন তুলেছেন তা কেবল সময়োপযোগী নয়, গুরুত্বপূর্ণও বটে। একজন নৃবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে তাঁর সঙ্গে দ্বিমত হবার অবকাশ নেই। বর্তমান সমস্যাকে এভাবে উপস্থাপনের জন্য তিনি আমাদের অশেষ ধন্যবাদার্হ।

বিনয় চৌধুরী লিখেছেন : এই আদিবাসী সমাজ যদি বিশিষ্ট অর্থে ট্রাইব না হয় তা হলে তার স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা একান্তই জরুরি। এ প্রসঙ্গে আমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই ধরনের সমাজে পরিবর্তন নিয়ে একটি মাত্র উদাহরণ এখানে আলোচনা করব। আমার শিক্ষক নির্মলকুমার বসুর তত্ত্বাবধানে persistence of culture বিষয়টি নিয়ে সমীক্ষা শুরু করি ষাটের দশকে। ১৯৬৩ থেকে ৬৬ সালে বিশ্বভারতীতে পথঘাট, কোয়ার্টার, কেন্দ্রীয় দপ্তর, বিজ্ঞান বিভাগ, ছাত্রদের হস্টেল ইত্যাদি দ্রুত নির্মিত হতে থাকে। শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হঠাৎ অনেক বেড়ে গেল। শান্তিনিকেতনের জনসংখ্যা এবং ভূমিব্যবহারের দ্রুত পরিবর্তন ঘটে গেল। তার প্রভাব সাঁওতাল গ্রামগুলি এবং আশপাশের অঞ্চলে দ্রুত বিস্তার লাভ করল। পরপর কয়েকটি নির্বাচন এল। সমস্ত রাজনৈতিক দল, নতুনভাবে গড়ে-ওঠা স্বেচ্ছাসেবীদল মহিলা সংগঠন, ব্লক ডেভেলপমেন্ট এবং সর্বশেষে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রভাব গ্রামগুলিতে এত ব্যাপকভাবে পড়ল যে সাঁওতাল গ্রামগুলির গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেল। পুরোনো

সাঁওতাল মূল্যবোধ, সমতাবোধ লুপ্ত হয়ে গেল। ট্র্যাডিশনাল নেতৃত্ব নামে মাত্র রইল, ফলে সাঁওতাল সমাজের ভেতরের বন্ধন শিথিল হয়ে গেল। নতুন কর্মক্ষেত্রে (যেমন : বিদ্যালয়ে, সরকারি অফিসে চাকুরি, রিক্সা চালানো, বাসের ড্রাইভারি, কন্ডাক্টরি ইত্যাদি) সাঁওতালরা যোগ দিলেন, ফলে প্রতিবেশী দিখুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেল। শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বেড়ে গেল। সাঁওতাল গ্রামে কালীপূজার কিছুটা প্রচলন ছিল। কোনো কোনো বাড়িতে বেলগাছের নীচে পাথর ত্রিশূল বসিয়ে শিবপূজা ছিল। এখন চাঁদা তুলে সরস্বতী পূজা শুরু হল। প্রথম বছর নিজেরাই পূজা করলেও পরে ব্রাহ্মণ পুরোহিত এসে পূজা করতে লাগলেন। আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে এঁরা পরিষ্কার বললেন : তোদের ছেলেরা লেখাপড়া করবে আর আমাদের ছেলেরা লেখাপড়া করবে না ? পূজাকে কেন্দ্র করে শুরু হল মাইক, হিন্দিগান। পরে সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের সাংস্কৃতিক সংগঠন তৈরি হল। নিজেদের লেখা নাটক যাত্রাগান শুরু হল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকসংস্কৃতি আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে নতুন উদ্যমে এইসব সংস্থা গড়ে উঠতে লাগল, পত্রপত্রিকা সাহিত্যচর্চা বহুল পরিমাণে বেড়ে গেল। ধীরে ধীরে একটা মধ্যবিত্ত মানসিকতার স্তর গড়ে উঠল। সেইসঙ্গে গড়ে উঠল জাতীয় ঐক্যবোধের চেতনা। অলডিজির স্বীকৃতি, রাজনৈতিক দলগুলির সহায়তা, এই চেতনা বিকাশের সহায়ক হয়ে উঠল। প্রথম দিকে সারি ধরম অর্থাৎ সত্য ধর্ম সাঁওতাল ও খ্রিস্টান সাঁওতালদের মধ্যে সামান্য সংঘাত তৈরি হয়েছিল। কিন্তু কালক্রমে সাঁওতাল জাতীয়তাবোধ দানা বাঁধতে লাগল। একই প্রক্রিয়ায় হো মুণ্ডা ওরাওঁদের মধ্যে জাতীয় চেতনা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ঝাড়খণ্ড আন্দোলন একটি আর্থসামাজিক ভূমি খুঁজে পেল। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠন স্বীকৃত। স্বাধীনতার আগে থেকেই কংগ্রেস এই নীতি মেনে চলে আসছিল। স্বাধীনতা-আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন সমগ্রদেশে সাম্রাজ্যবাদই ছিল মূল শত্রু। কাজেই অভ্যন্তরীণ বিরোধ মাথা তুলতে পারে নি, স্বাধীনতা ছিল মূল কাম্য। সমাজবিজ্ঞানে প্রতিরোধ বা বিরোধের মধ্যে দিয়ে ঐক্য একটি স্বীকৃত ধারণা। স্বাধীনতার পর গোষ্ঠীচেতনাকে নানাভাবে জাগ্রত করে ভোট আদায়ের একটি পন্থা প্রায় সকল দলই গ্রহণ করেছে। কখনো জাতপাঁতের মধ্য দিয়ে, কখনো tribe এবং non-tribe -এর মধ্য দিয়ে, কখনো ভাষার মধ্য দিয়ে, কখনো ধর্মের মধ্য দিয়ে বিরোধ জাগিয়ে গোষ্ঠী ঐক্য এনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এর ফলে গোষ্ঠীচেতনা (এথনিক কনশাসনেস) দানা বাঁধছে। আর্থ-সামাজিক পটভূমিকা, সাংগঠনিক ক্ষমতা ও নেতৃত্বের যোগ্যতা অনুসারে ভারতবর্ষের এই গোষ্ঠীচেতনা বিকাশের বিভিন্ন স্তর দেখা যায়। টানা ভগৎ, সিধু কানুর মতো স্বপ্নাদিষ্ট দৈব নেতৃত্ব অথবা সম্মোহনকারী (ক্যারিজ়ম্যাটিক) নেতৃত্ব খুব সহজে এখন গড়ে উঠবে না। তবে এ ধরনের নেতৃত্ব কোথাও যে আর হবে না তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। আকাঙ্ক্ষা ও চেতনার বহুল বিস্তার যেখানে ঘটবে সেখানে এ ধরনের নেতৃত্ব আসতে পারে এবং সে আন্দোলনও তখন অনেক জোরদার হয়ে উঠবে। বিশ্বরাজনীতির খেলা থেকেও আজ আর কোনো জায়গাই মুক্ত নয়। তার প্রভাব প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে আছেই। এই বাস্তব সত্য অস্বীকার করার কোনোই উপায় নেই। নেতৃত্ব আজকাল হয়ে ওঠে না অনেক সময় তৈরি করা হয়। জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং ভোগবাদের প্রসারও গোষ্ঠীচেতনা জাগিয়ে তোলার কাজে সহায়ক হয়ে উঠছে।

সবচেয়ে বড়ো কথা ইতিহাসের ধারায় জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটবেই, কখনো ধীর গতিতে কখনো প্রবল শক্তিতে তা আত্মপ্রকাশ করবেই। বিরোধ ও ঐক্য, সংঘর্ষ ও স্থিতি এই দোলাচলের মধ্য দিয়ে মানসবসমাজ বিকশিত হবে। সংঘর্ষ ও শান্তি কোনোটাই শেষ কথা নয়। তবে মানুষের প্রচেষ্টা হওয়া উচিত সংঘর্ষের পথ এড়িয়ে শান্তির পথে, সহযোগিতার পথে ছোটো বড়ো সকল মানবগোষ্ঠীর বিকাশের পথ নির্ণয় করা। এই পন্থা আবিষ্কারই হবে সভ্যতা।

বিনয় ভট্টাচার্য

আফ্রিকার সমাজ-ইতিহাস জিজ্ঞাসা

নবপর্যায়ে বিশ্বভারতী পত্রিকার প্রকাশারম্ভ অত্যন্ত আনন্দজনক ঘটনা। আমরা এর পাতায়, প্রথম সংখ্যার মতোই, চিন্তাসমৃদ্ধ রচনা আশা করব।

সাধারণ পাঠক হিসেবে প্রথম সংখ্যা বিষয়ে কিছু প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করছি। আপনাদের প্রস্তাবিত 'সংলাপ' বিভাগে যোগ্য বিবেচিত হলে লেখাটি ছাপবেন, এই অনুরোধ।

প্রথমে কয়েকটা তুচ্ছ কথা সেরে নিই। মাদাম সিলভ্যাঁ-লেভির ডায়েরির অনুবাদে কিছু ফরাসি শব্দ ভুল ছাপা হয়েছে— যেমন, 'monde' হয়েছে 'mondle' (পৃ. ২৯), তার ঠিক আগে 'mon coeur' (আমার হৃদয়) এর mon-তে বড়ো হাতের M ব্যবহার কেন, বোঝা যাচ্ছে না। ৩৪ পৃষ্ঠাতে 'পর রোয়াঈয়াল' যে নামটির প্রতিবর্ণীকরণ সেই 'Port-Royal' কথাটা প্রথম বন্ধনী চিহ্নের মধ্যে লেখা হয় নি, জায়গাটা ফাঁকা থেকে গেছে।

অধ্যাপক বিনয় চৌধুরীর প্রবন্ধের কিছু উক্তি ও মন্তব্যকে ঘিরে কয়েকটা কথা বলতে সাহস করছি, বিশেষ করে ঝাড়খণ্ড-বিষয়ক বই প্রধান আলোচ্য বিষয় হলেও, রচনাটিতে আফ্রিকাপ্রসঙ্গ অনেকটা জায়গা নিয়েছে বলে :

১. 'ট্রাইব' কথাটির 'ইটিমোলোজিকাল', 'সেমান্টিক' অর্থ, বা তার রোমান উৎসকে বাদ দিয়ে বলা যায়, কলোনিয়াল লেখকরা (ইতিহাস, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, নৃতত্ত্ব বা অন্য যে-কোনো বিষয় বিভাগেই হোক) কথাটা ব্যবহার করেছিলেন একটি বিশিষ্ট মানসিকতা থেকে। সেটি হল : আফ্রিকার 'কম্যুনিটি'গুলিকে হয় প্রকটভাবে বা সস্নেহে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা ; সেখানে তাঁরা ট্রাইবের কোনো নিটোল সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দিয়েছেন কিনা মনে হয় না সেটা খুব একটা ভাববার কথা। 'স্টেট' এবং 'স্টেটলেস' বা 'অ্যাসেফেলাস (acephalous) সোসাইটি'তে বিভাজনও অনেকটা ওই মানসিকতা থেকেই জাত। এবং সেখানে ভাবখানা এই : উন্নত গতিশীল সমৃদ্ধ সমাজ থেকে এইসব নিরক্ষর, স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি -আশ্রয়ী ছোটো ছোটো বদ্ধজলার মতো নরগোষ্ঠীকে আলাদা করে বোঝাবার পক্ষে 'ট্রাইব' লেবেলটা বেশ সুবিধাজনক। এ কথাটি অধ্যাপক বিনয় চৌধুরীর রচনাতে একটু অন্যভাবে ১১৫ পৃষ্ঠাতে উল্লিখিত হয়েছে। বাংলাতেও 'জাতি' থেকে 'উপজাতি' আলাদা করার পিছনে মনে হয় ওই তুচ্ছতা-নির্দেশক মানসিকতা কাজ করে। আমার মনে হয়, আফ্রিকাতে ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধে 'ট্রাইব' কথাটির ব্যবহারকে বোঝবার জন্য এটাই যথেষ্ট। এখন, ব্যবহারে শব্দের অর্থ বা দ্যোতনা তো পালটে যায়, শব্দের গায়ে অনেক নতুন অনুভব লেগে তাকে অন্যরকম করে দেয়। 'আফ্রিকান পণ্ডিতদের' ওই শব্দটির প্রতি বিরূপতা আফ্রিকাতে উপনিবেশবাদবিরোধী জাতীয়তাবোধের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু সেইসঙ্গে এ কথাটাও মানতে হবে যে 'ট্রাইব' শব্দটির অনৌচিত্য বিষয়ে নালিশ শুধু ইবাদান স্কুল অব হিস্ট্রির আফ্রিকান পণ্ডিতদের কাছ থেকে আসে নি, আফ্রিকা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অনাফ্রিকীয় পণ্ডিতরাও এ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। যেমন সন্দেহ করেছেন 'রাষ্ট্র' ও 'মাথাবিহীন সমাজ' এই ভাগাভাগিকেও।

২. আমলাদের রচনায় উনিশ শতকী নৃতত্ত্ববিদদের ধারণার কোনো প্রভাব দেখি না— এটা বোধহয় আফ্রিকার ক্ষেত্রে বলা যাবে না। হয়তো কুমার সুরেশ সিং-এর ভাষা ধার করে বলা যাবে যে আফ্রিকাতে ফরাসি দেলাফোস্ (Delafosse), বিন্জার (Binger) বা ইংরেজ রাট্রে (Rattray)-র মতো 'administrators turned ethnographers' বা তাঁদের রচনাতে, অনেকক্ষেত্রে আফ্রিকানদের প্রতি দরদ সত্ত্বেও গোবিনোর মতো বর্ণবিদ্বেষীর 'নৃতত্ত্বচর্চা' দ্বারাও প্রভাবিত ছিলেন। অপরপক্ষে ইয়োরোপ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকৃত 'বৈজ্ঞানিক' মনোভঙ্গি নিয়ে এবং ঔপনিবেশিক স্বার্থর সঙ্গে কোনোভাবেই যুক্ত না থেকেও

আফ্রিকা বিষয়ে মূল্যবান রচনা দু-একজন রেখে গেছেন, জাতীয়তাবাদের আবেগের প্রকোপে সেটা ভোলাও উচিত হবে না— যেমন হাইনরিখ্ বার্থ্ (Barth) এবং নাখ্‌টিগাল্ নামক দুই জার্মান পর্যটক। ঊনবিংশ শতকের কেন, তার আগেরও 'ভ্রমণবৃত্তান্ত' (ওই কথাটির মধ্যেও একটা পণ্ডিতম্মন্যের তুচ্ছতা-নির্দেশ নিহিত থাকে) বা অন্যান্য রচনাতে আফ্রিকার উপস্থাপনা ব্যাপারটি বোধহয় একমাত্রিক নয়। যেমন একমাত্রিক নয় আফ্রিকার ক্ষেত্রে 'ইতিহাস' ও 'নৃতত্ত্বের' সম্পর্কের ইতিহাস। সে কথায় আসব পরে।

৩. কলোনিয়াল মানসিকতায় আচ্ছন্ন অপমানকর নৃতত্ত্বের বিরুদ্ধে ইবাদান স্কুলের আফ্রিকান পণ্ডিতদের প্রচেষ্টাতেই প্রথম আফ্রিকার ইতিহাস প্রতিষ্ঠা পেল— এ কথাটি আংশিক সত্য, পূর্ণত নয়। নানা দিক থেকে আপত্তিকর ব্যাখ্যা-সংবলিত হলেও, আফ্রিকার ইতিহাস রচনার ইতিহাসে আমলাদের প্রাথমিক প্রচেষ্টাকেও ফেলে দেওয়া যাবে না, যদি আমরা ইতিহাস-রচনার ইতিহাস বিষয়ে আগ্রহী থাকি, 'উত্তরাধুনিক' চিন্তায় ইতিহাস ব্যাপারটাকেই সন্দেহ করার বিষয়টাকে আপাতত পাশ কাটিয়ে। এ ক্ষেত্রে তাই ধরা যাক আলান বার্নস্ (Burns)-এর নাইজেরিয়ার ইতিহাস আফ্রিকার ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে মূল্যবান উদাহরণ। তার প্রচণ্ড আপত্তিকর দিকগুলোর (যেমন ওপোবো দ্বীপে জাজা নামক এক বিখ্যাত বুদ্ধিমান বণিক-রাজার প্রাথমিক প্রতিরোধ আন্দোলনের অপব্যাখ্যা, ব্রিটিশরাজের মহিমাকীর্তনের জন্য) আমরা নিন্দা করব, কিন্তু মানতেই হবে এটা নিছক নৃতত্ত্বের বই নয় ('প্রভাব' আছে), ইতিহাসেরই বই। এই বই-এর প্রকাশের একবছর পর অর্থাৎ ১৯৬৩ সালে (এত পরেও!) বিখ্যাত ঐতিহাসিক ট্রেভর রোপার আফ্রিকা বিষয়ে তাঁর কুখ্যাত অপমানকর উক্তিটি করেন যে, আফ্রিকার ইতিহাস আরম্ভ হচ্ছে ইয়োরোপীয় পর্ব থেকে, তার আগে মহাদেশটা ছিল অচল জলাশয়, 'movement'বিহীন, অর্থাৎ নৃতাত্ত্বিকের অবগাহনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। আর ওই মহান ঐতিহাসিক এই হতভাগ্য মহাদেশের 'উপজাতি'দের 'barbaric gyration'-এ আগ্রহী নন আদৌ, সে কথা সরবে জানিয়েছিলেন। ইবাদান স্কুলকে যতই মূল্য দিই (যেটা তাঁদের প্রাপ্য) এবং কেম্ব্রিজ স্কুলকে নিয়ে যতই ব্যঙ্গবিদ্রূপ করি (আমার কীরকম মনে হয় আজকাল 'তত্ত্ব' জিনিসটা ফ্যাশনের মতো দশকে দশকে পাল্টায়, আবার ফিরেও আসে কখনো কখনো!), এ কথা বোধহয় ভোলা উচিত নয় যে ট্রেভর রোপারের এ অসম্মানজনক উক্তির প্রতিবাদে সক্রিয় হয়ে জন ফেজ বা রোলান্ড্ অলিভার আফ্রিকার ইতিহাস-রচনার ব্যাপক উদ্যোগ নিয়ে কাজটা তাঁদের মতো করে অল্পসময়ে অনেকটা এগিয়ে দেন! তাঁদের মতাদর্শ, তাঁদের ব্যাখ্যা, তাঁদের মধ্যে অনেকের আটলান্টিক দাসব্যাবসা ব্যাখ্যা বা 'রাষ্ট্র' ও 'অরাষ্ট্র'তে বিভাজন— এসবকে আমরা সন্দেহ করতে পারি, কিন্তু সমস্ত কৃতিত্ব ইবাদান স্কুলের আজায়ি-প্রমুখ আফ্রিকান পণ্ডিতের ওপর বর্তালে মনে হয় না ঠিক হবে। বরং তাতে একধরনের ভাবপ্রবণ জাতীয়তাবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। অর্থাৎ বার্নাড লিউইস (গ্রন্থ : *History, Remembered, Recovered, Invented,* 1975) যাকে 'Recovered History' বলছেন, সে ক্ষেত্রে ফেজ্ অলিভার প্রমুখ কেম্ব্রিজ স্কুলের ঐতিহাসিকদের কর্মকে এখনও স্বীকৃতি দিতেই হবে। ফ্রান্সেও দ্যশাঁ (Deschamp) বা কর্নভ্যাঁ (Cornevain) এইভাবে ইতিহাস উদ্ধারের কাজে রত হয়েছিলেন। আমার তো মনে হয় না এঁদের স্বীকৃতি দিলে সেটা কলোনিয়ালিজ়মকে বা নিওকলোনিয়ালিজ়মকে সমর্থন করা হবে।

৪. আফ্রিকার ইতিহাস রচনায় মৌখিক উপাদানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য, কিন্তু তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে তাকে ঘিরে সইদ্-এর 'ওরিয়েন্টালিজ়ম'-সদৃশ একটা 'আফ্রিকানিজ়ম' জাতীয় সমসত্ত্বীকরণ প্রশ্রয় পেতে পারে। ইবাদান স্কুলের পণ্ডিতরাও অনেক লিখিত উপাদান (আরবি ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় ভাষার ; আর ইথিওপিয়ার নিজস্ব লিপিসহ গীজ় ও তজ্জাত আমহারিক ভাষা তো কবে থেকেই রয়েছে!) ব্যবহার করেছেন। 'ওর‍্যাল ট্রাডিশন' নিয়ে বাড়াবাড়ি করার ব্যাপারে আপত্তি আফ্রিকান পণ্ডিতরাও কেউ কেউ জানিয়েছেন— তাঁদের মধ্যে একজন মুডিম্বে (Mudimbe), যদিও তিনি ইবাদান স্কুলের পণ্ডিত নন।

৫. আফ্রিকাতে ব্রিটিশদের 'ইনডাইরেক্ট্ রুল' স্থাপন বিষয়ে অধ্যাপক বিনয় চৌধুরীর একটি উক্তিতে আমার

খটকা লাগছে। 'উপনিবেশের সামাজিক রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তাদের (কলোনিয়াল শাসকদের) সম্পূর্ণ অজানা' ছিল কি সত্যি ? যে অঞ্চলকে ব্রিটিশ 'ইনডাইরেক্ট্ রুল' স্থাপনের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এলাকা বলা হয়— সেই উত্তর নাইজেরিয়ার ফুলানি হাউসা -অধ্যুষিত বিশাল অঞ্চল— সেখানকার ইসলাম-বিধৃত সোকোটো খলিফাতন্ত্র (Sokoto Caliphate) সম্পর্কে লুগার্ড (Lugard) সাহেব তো বেশ জানতেন শুনতেন ! তাঁর তো অভিজ্ঞতার বহর কম ছিল না ! আসলে, ব্যাপারটা 'জানা, না-জানার' নয়— স্বার্থচিন্তাগত, উপযোগিতাশ্রয়ী ; কম খরচে, কম আমলায়, কম ঝামেলায় কাজ চলে গেলে, সেই তো ভালো ! তাকে তত্ত্বের পোশাক পরিয়ে বাইরে একটা সম্ভ্রান্ত চেহারা দেওয়া। তারই সঙ্গে যুক্ত ছিল ব্রিটিশদের এক ধরনের চতুরতা— 'দেখো আমরা কত ভালো, ফরাসিরা কত খারাপ, আমরা আফ্রিকার প্রাক্-কলোনিয়াল সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করি, তাই তাদের বিনাশ চাই না বলে এই ব্যবস্থা, আর ফরাসিরা তাদের আসিমিলাসিয়ঁ (assimilation) নীতির প্রাবল্যে আফ্রিকান সংস্কৃতিকে বিলুপ্ত করে কালো-ইয়োরোপীয়ান বানাচ্ছে'— এইরকম একটা কথা বিশ্বকে বলা। লক্ষ করলে দেখা যাবে, প্রথম মহাযুদ্ধের আগে প্রস্তুত আফ্রিকা নিয়ে ব্রিটিশদের তৈরি তথ্যচিত্র বা ডকুমেন্টরি ফিল্মগুলোতে (তাদের চরিত্র বেশ 'নৃতাত্ত্বিক' !) ওই আত্মপ্রশংসার ভাব প্রকট। আর 'ডাইরেক্ট রুল' চালু ব্রিটিশরা আফ্রিকাতে একেবারে কোথাও করে নি তা তো ঠিক নয়। যেখানে তা প্রয়োজন তা করেছে, বিশেষ করে শ্বেতকায়রা বসতিস্থাপন করেছিল যে অঞ্চলে, যেমন— কেপ কলোনি বা কেনিয়া। আর ফরাসিদেরও তো অ্যাসোসিয়াসিয়ঁ (association) বলে একটা কথা ছিল— তারাও তো দুরকম কলোনিয়াল প্রশাসনিক নীতি চালিয়েছে প্রয়োজনানুসারে, ইন্দোচীনেও। কাজেই এ ব্যাপারে নীতির ক্ষেত্রে যার যার প্রয়োজনটাই ছিল একমাত্র কথা। তা ছাড়া এখন অনেক পন্ডিত (আফ্রিকান নয়) দেখাতে চেয়েছেন যে 'প্রত্যক্ষ' ও 'পরোক্ষ'-তে ওই বিভাজন, কথার কথা ছিল মাত্র, তার বেশি কিছু নয়।

৬. দুষ্ট নৃতত্ত্ব থেকে সুস্থ নৃতত্ত্বে উত্তরণ এবং উত্তরণ পর্বে নৃতাত্ত্বিকের ইতিহাসকে স্বীকৃতিদান (আফ্রিকান ক্ষেত্রে) তেমন সহজ সরল একরৈখিক ব্যাপার মনে হয় না, বিশেষ করে *History and Theory* পত্রিকার ১৯৯৩ সালের আফ্রিকা-বিষয়ক বিশেষ সংখ্যাতে জঁ-লু আমসেল (Amselle)-রচিত 'Anthropology and Historicity' নামক প্রবন্ধটি পড়ার পর। এখানে একটা কথা আছে, নৃতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব বিষয়ে আফ্রিকার ক্ষেত্রে শুধু ব্রিটিশ পণ্ডিতদের দিকে তাকালে বোধহয় হবে না, ফরাসিদের দিকেও তাকাতে হবে। সেখানে দেখা যাবে, ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে লুসিয়াঁ লেভি-ব্রুল (Levi-Bruhl) লা মর্তালিতে প্রিমিতিভ্ বা *Primitive Mentality* নামক পুস্তকে অপমানকর নৃতত্ত্বকে কীভাবে আফ্রিকার গায়ে এঁটে দিচ্ছেন। বঙ্গানুবাদে কিছুটা উদ্ধৃত করা যায়, কিছু কিছু শব্দ ইংরেজিতে রেখে বিশেষ কারণে : 'মিস্টিক প্রিমিটিভ এবং প্রি-লজিকাল মানসিকতার সঙ্গে শ্বেতকায়দের চিন্তাপদ্ধতি এতই গভীরভাবে পৃথক যে এক থেকে অন্যতে হঠাৎ গমন অভাবনীয় ;... প্রথম (অর্থাৎ 'প্রি-লজিকাল মানসিকতা') থেকে দারুণ অভিঘাতে দ্বিতীয়তে (অর্থাৎ 'শ্বেতকায় মানসিকতা'তে) পরিবর্তন মানববিদ্যার ক্ষেত্রে একটি আকর্ষক বিষয় বলে পরিগণিত হতে পারে, কিন্তু বর্তমান অবস্থা তার অনুকূল নয়, ভবিষ্যতেও অনুকূল হবে কিনা সন্দেহ।' 'মানববিদ্যা' (Science de l'homme) বিষয়ে এইরকম মানসিকতার মধ্যে আফ্রিকার যথার্থ ইতিহাসের স্বীকৃতির স্থান নেই। অনেক পরে লেভি স্ত্রোস -কর্তৃক 'প্রিমিটিভ' সমাজেও ইতিহাসের সাধারণ স্বীকৃতি ('There is no society, however primitive, which does not been the "scar of events", nor any society in which history has sunk completely without trace'— *Structural Anthropology*, পৃ. ২৩) ব্রদেল (Braudel) এক জায়গায় (*On History* গ্রন্থে, পৃ. ৩৬) উদ্ধৃত করে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তা হলে কী হবে, পরের প্যারাগ্রাফেই ব্রদেল সেই লেভি-স্ত্রোস্‌কে নিয়েই অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন— যেখানে দেখা যাচ্ছে ইতিহাসকে একটু খোঁচা মেরে নৃতাত্ত্বিকমশায় বলছেন : প্লেটোর

সঙ্গে একঘণ্টা কথা বলে যতটা 'জানা' যেত, তা নাকি সম্ভব নয় 'all our classical treatises on coherence and incoherence of ancient Greek Civilisation' থেকে। আর 'scar of events'-কে মূল্যদানের সঙ্গে লেভি-ব্রুলের 'প্রি-লজিকাল'-এর ওপর 'লজিকাল' মানসিকতার প্রবল আঘাত নির্দেশের মানসিকতার মধ্যে তফাত কি খুবই বেশি ? তা ছাড়া 'Long Durée' তত্ত্বও কি ইতিহাসচিন্তার ক্ষেত্রে খুব একটা সুবিধাজনক ব্যাপার ?

আম্‌সেল দেখিয়েছেন জর্জ বালাদিঁয়ের (Balandier)-এর মধ্যে ইতিহাসের স্বীকৃতি ছিল। কিন্তু মেইয়াসু (Meillassoux)-র রচনাতে তেমন নেই। সেখানে আফ্রিকার 'internal dynamism'-কে এখনও তেমন শ্রদ্ধা করা হয় নি। এমন-কি, মার্কসিস্টদের (সবরকম, সার্ত্র সমেত) 'discontinuism'-তত্ত্ব বা 'traditional' ও 'critical' society-তে পৃথক্‌করণের মধ্যেও একভাবে নৃতাত্ত্বিকদের মতো করেই আফ্রিকার inner dynamism-কে অগ্রাহ্য করার সমর্থন আছে এ কথা বলে লেখক ব্যাপারটাকে আরও জটিল করে দেখিয়েছেন। অতএব আফ্রিকা বিষয়ে 'ট্রাইবাল' হোক বা না-হোক, ইতিহাস ও নৃতত্ত্বের সহাবস্থান বিদ্যাচর্চাক্ষেত্রে বোধহয় এখনও তেমন শান্তিপূর্ণ হয় নি। আর নৃতত্ত্ব বা অ্যানথ্রপলজি বা এথ্‌নলজি, যে নামেই ডাকা হোক, যদি সেখানে ইতিহাসকে অতটা স্বীকৃতি দেওয়া হয়, আমসেল্ যেভাবে সেটা কাম্য বলছেন তাঁর মালি রাজ্য নিয়ে গবেষণাক্ষেত্রে, তবে তো বোধহয়, ফুকুইয়ামার কায়দায় 'নৃতত্ত্ব'-রই মৃত্যু ঘোষণা করতে হবে, 'ইতিহাস'-এর নয় ! কেননা তখন তো 'প্রিমিটিভ', 'ট্রাইব' এসব কথা অবান্তর হবে, এবং 'নৃতত্ত্ব' 'সমাজতত্ত্বের' মধ্যে সম্পূর্ণ বিলীন হবে ! তা না করলে কিন্তু কুলোকে অ্যাকাডেমিক মহলে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত proliferation of disciplines-এর যে অভিযোগ আনে, তা আরও জোরদার হতে পারে, তখন শুধু ফুকুইয়ামার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকদের সাবধান হবার ব্যাপার থাকবে না। ওইসব কুলোকদের বিষয়ে 'নৃতাত্ত্বিক'দেরও সাবধান হতে হবে ! রব গর্ডন (Rob Gordon) এবং অ্যানড্রু শ্পীগেল (Andrew Spiegel) তাঁদের *Annual Review of Anthropology*-তে প্রকাশিত প্রবন্ধে ওইভাবে নৃতত্ত্বকে সন্দেহ করেছেন সম্প্রতি। এবং *Southern African Review of Books* পত্রিকায় সেই প্রবন্ধের আলোচনার শিরোনাম লেখক মার্টিন হল দিয়েছেন 'Dead Hand of Anthropology'!

ধ্রুব গুপ্ত
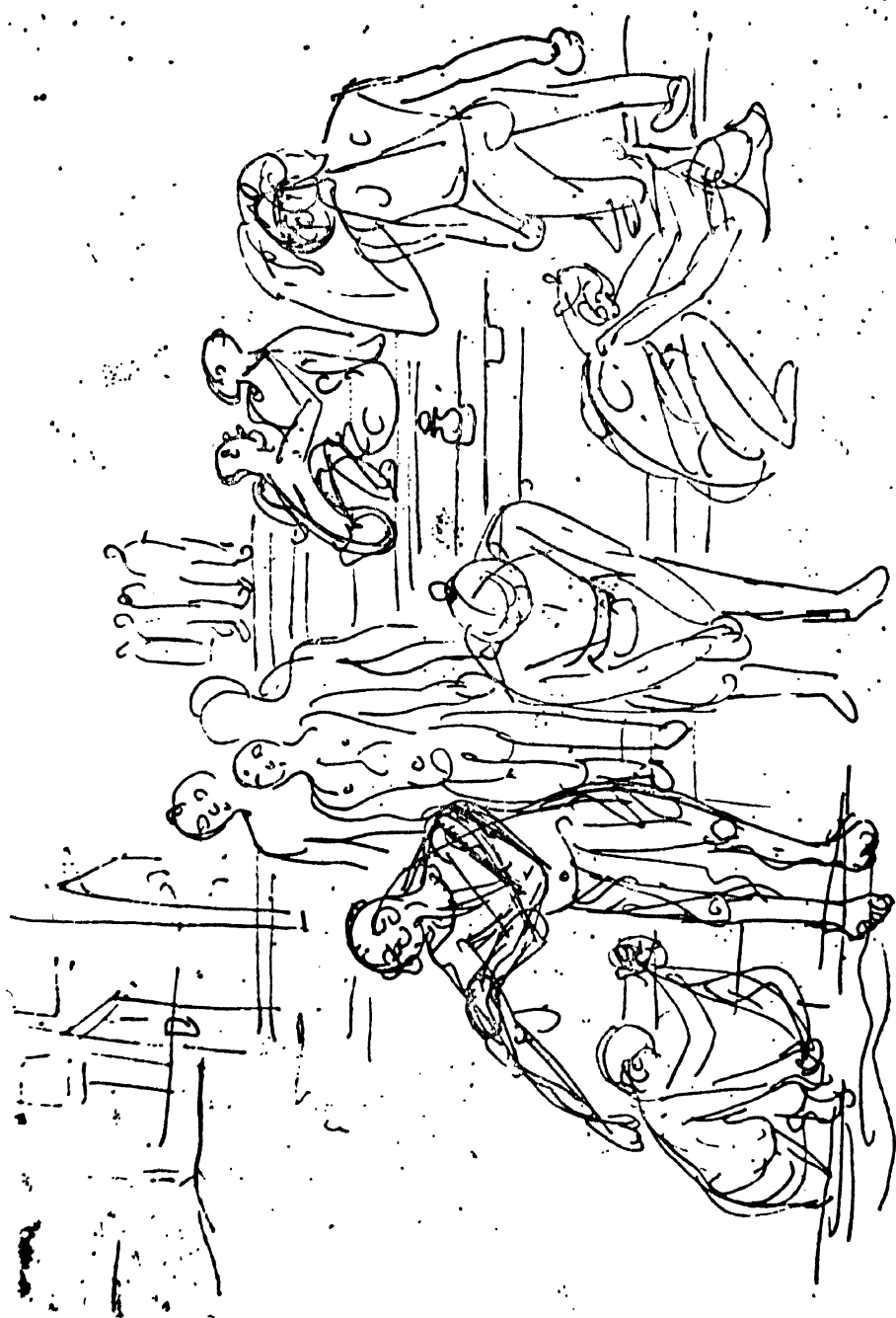
[স্নানের ঘাট]

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

[পাঁচটি হাঁস]

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

বিনোদবিহারীর স্কেচ প্রসঙ্গে

দেবাশিস ভট্টাচার্য

স্কেচ-ছবিতে শিল্পী সংক্ষিপ্ত ও দ্রুতরেখায় চার পাশের গতিশীল জগতের কোনো এক মুহূর্তকে ধরে রাখতে চায়। কখনো বা মনের পটে ভেসে-ওঠা কোনো রূপকে নিয়ে খসড়া-ছবি বানাতে সে স্কেচ করে। বাস্তবানুগ বা কল্পনানুগ যাই হোক-না কেন শিল্পী বিনোদবিহারীর স্কেচের বৈশিষ্ট্য তার অন্তর্নিহিত কম্পোজিশনের বাঁধুনিতে। এখানেও প্রতিটি স্কেচে আমরা দেখি ছবির ভেতরের বিভিন্ন আকার— নর-নারী, পাখি, গাছ বা অন্য কিছু— ছবির পটকে এমনভাবে বিভাজন করছে ও চুম্বকের মতো টেনে রেখেছে যে পটভূমির শূন্যস্থানের আকৃতিও একটা প্যাটার্ন তৈরি করছে এবং কম্পোজিশন অক্ষুণ্ণ রেখে ছবির কোনো রেখা বা আকারকে নড়াচড়া করানো প্রায় অসম্ভব।

আলোচনার সুবিধার জন্য আমি চারটি স্কেচের চারটি নাম দিয়ে তাদের সাজিয়ে নিচ্ছি এই অনুক্রমে :

১. দুই নারী	৩. নদীর ঘাট
২. পাঁচটি হাঁস	৪. ক্লাসঘর।

প্রথম দুটি স্কেচ সম্ভবত মানসচিত্রের খসড়া। প্রথমটিতে দুই নারীর দেহভঙ্গি ও তার সঙ্গে সংগতি রেখে হাত-মাথার হিসেবি কৌণিক উপস্থাপন একক রূপকল্পের সৃষ্টি করেছে। ছবিটিতে দৃশ্যত এক উৎক্ষিপ্ত গতি অনুভব করা যায়। এই গতিকে সহায়তা করার জন্যই সম্ভবত ছবির নীচে মধ্যবিন্দু থেকে ঘাস-পাতা বা ফোয়ারার মতো কটি রেখা ব্যবহার করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ছবিতে পাঁচটি হাঁস ও গাছের ডালপাতা চক্রাকারে সাজানো। কিন্তু এর মধ্যে এক কেন্দ্রাতিগ গতি আছে, যার ফলে ছবিটিতে ছড়িয়ে পড়ার মূর্ছনা অনুভূত হয়।

তৃতীয় ও চতুর্থ স্কেচ সম্ভবত বাস্তবানুগ। তাই এতে তাৎক্ষণিক স্বাদ স্পষ্ট। নদীর ঘাটের দৃশ্যে বাঁদিকের মানুষজন এক ত্রিভুজ-আকারের মধ্যে সাজানো। ফলে পাশে সিঁড়ি ও পটভূমির সংযোজনা এক কৌণিক গতি সঞ্চার করেছে।

চতুর্থ ছবিটিতে অত্যন্ত সরল অথচ বলিষ্ঠ রেখায় সম্ভবত ক্লাসরুমের কোনো মুহূর্তকে ধরা হয়েছে। এখানে দুদিকে ছবির সীমা ভেঙে শরীর ছড়িয়ে পড়ায়, এক বিশালত্বের অনুভব স্পষ্ট। নিখুঁত জ্যামিতিক বিভাজন থাকা সত্ত্বেও রেখার দেশজ সজীবতা ছবিকে কোথাও জ্যামিতিক আকারসর্বস্ব, নিষ্প্রাণ করে নি।

স্বরলিপি

যারা বিহান-বেলায় গান এনেছিল আমার মনে
সাঁঝের বেলায় ছায়ায় তারা মিলায় ধীরে।
একা বসে আছি হেথায় যাতায়াতের পথের তীরে ॥
আজকে তারা এল আমার স্বপ্নলোকের দুয়ার ঘিরে।
সুরহারা সব ব্যথা যত একতারা তার খুঁজে ফিরে।
প্রহর-পরে প্রহর যে যায়, বসে বসে কেবল গণি
নীরব জপের মালার ধ্বনি অন্ধকারের শিরে শিরে ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুর-স্মৃতি : অমিতা ঠাকুর
স্বরলিপি : প্রফুল্লকুমার দাস

সা সা II{ সা সা -দা -া | দা পা -া -া | রজ্ঞা -মপা -দণা -া | দা পা মপা মা
যা রা বি হা ০ ন্ | বে লা ০ য় | গা০ ০০ ০০ ন্ | এ নে ছি০ ল

-া -া জ্ঞা -রা | জ্ঞা -রা -মমজ্ঞা -রা -জ্ঞা -া সঋা -সণা | সা -া -া -া
০ ০ আ ০ | মা ০ ০০০ ০ ০ র্ ম০ ০০ | নে ০ ০ ০

সা সা -জ্ঞা রা | জ্ঞা -া রা জ্ঞা -া রা জ্ঞা -মমজ্ঞা | -রা -জ্ঞা -া -ঋসা
সাঁ ঝে র্ বে | লা য়্ ছা য়া য়্ তা রা ০০০ | ০ ০ ০ ০০

সা সা -জ্ঞা -া | ঋা -সা সা সা } | সা জ্ঞা রা জ্ঞা | রা জ্ঞা রা জ্ঞ
মি লা ০ য়্ | ধী ০ রে ০ | এ কা ব সে | আ ছি হে থা

-মমজ্ঞা -রা -জ্ঞা -ঋসা | -া -া সা সা | সা সঋা -জ্ঞমা -া | জ্ঞা ঋা -জ্ঞা ঋা
০০০ ০ ০ ০০ | ০ য়্ যা তা | য়া তে০ ০০ র্ | প থে র্ তী

সা -া -া -া | -া -া সা সা II
রে ০ ০ ০ | ০ ০ "যা রা"

II {সা সা সা রা | জ্ঞা মা -া -সা | -সঋা -জ্ঞমা জ্ঞা মা | -া -া -া -া
আজ কে তা রা | এ ল ০ ০ | ০০ ০০ আ মা | ০ ০ ০ র

রা -া জ্ঞা রা | জ্ঞা -া জ্ঞমা জ্ঞা | -ঋা -জ্ঞা ঋা -া | সা -া -া -া
স্ব প্ ন লো | কে র্ দু০ য়া | ০ র্ ঘি ০ | রে ০ ০ ০

সা -দা দা পা | পা -া -জ্ঞা -া | পা পদা -ণদা -পদা | মপা মা -া -া
সু র্ হা রা | স ০ ০ ব্ | ব্য থা০ ০০ ০০ | য০ ত ০ ০

রা -া জ্ঞা রা | জ্ঞা -া -া -া | জ্ঞমা জ্ঞা -ঋজ্ঞা ঋা | সা -া -া -া }
এ ক্ তা রা | তা ০ ০ র্ | খুঁ০ জে ০০ ফি | রে ০ ০ ০

দা দা -া দা | ণা ণা র্সা -া | র্সণা র্সা -া -া | -া -া -া -া
প্র হ্ র্ প | রে প্র হ র্ | যে০ যা ০ ০ | ০ ০ ০ য়্

র্সণা র্সা -র্জ্ঞা র্ঋা | র্সা -া -া -া | না র্সা -ণর্সা -র্ঋা | ণর্সা ণা -দপা -দা
ব০ সে ০ ব | সে ০ ০ ০ | কে ব ০০ ল্ | গ০ নি ০০ ০

-পা -া -া -া | সা সা -জ্ঞা -া | রা জ্ঞা -া রা | জ্ঞা -া জ্ঞরা জ্ঞা
০ ০ ০ ০ | নী র ০ ব্ | জ পে র্ মা | লা র্ ধ্ব০ নি

-রজ্ঞা -মজ্ঞা -রজ্ঞা -ঋসা | -া -া সা -া | সা সা সঋা -জ্ঞমা | জ্ঞা ঋা -জ্ঞা ঋা
০০ ০০ ০০ ০০ | ০ ০ অ ন্ | ধ কা রে০ ০র্ | শি রে ০ শি

সা -া -া -া | -া -া সা সা II II
রে ০ ০ ০ | ০ ০ "যা রা"

গানটির তালমুক্ত গীতরূপ বিশেষভাবে অবহিত হওয়া আবশ্যক

"৩ নভেম্বর ১৯৪০ তারিখের সকালে কলিকাতার বেতার-কেন্দ্র হইতে রবীন্দ্রসংগীতের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়।— উহা শুনিয়া, জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কবি এই গানটি রচনা করিয়া শ্রীমতী অমিতা ঠাকুরকে শিক্ষা দেন। তাঁহারই সৌজন্যে মুদ্রিত পাঠ নির্ধারিত হইয়াছে। শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার আমাদিগকে এই গানের সন্ধান দেন।

এই বৎসর ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে কালিম্পঙে কবি নিদারুণ ভাবে পীড়িত হইয়াছিলেন ; কলিকাতায় আসিয়া রোগমুক্তির পর ৩০ অক্টোবর তারিখে একটি কবিতা রচনা করেন : একা বসে আছি হেথায়। দ্রষ্টব্য 'রোগশয্যায়'। 'যারা বিহান-বেলায় গান এনেছিল আমার মনে' উক্ত রচনারই গীতরূপ বলা যায়।" গ্রন্থপরিচয়, গীতবিতান ৩ (ফাল্গুন ১৩৯৮ সংস্করণ), পৃ. ১০১২।

"আমার কাছ থেকে গানের (যারা বিহান-বেলায়) সুরটি সংগ্রহ করে ও অতীব যত্ন-সহকারে স্বরলিপি করে শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস এই গানের সুরটি ধরে রেখেছেন।... স্বরলিপির মাধ্যমে ধরে না রাখলে হারিয়ে যেত।"— শ্রীমতী অমিতা ঠাকুর।

দ্র. দিনেন্দ্র সংগীতায়তন -আয়োজিত রবীন্দ্রসংগীতের বিশিষ্ট শিক্ষক গবেষক ও শিল্পী শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস মহাশয়ের সংবর্ধনা উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকা, ২ অক্টোবর ১৯৯৪।

সম্পাদকীয়

'আর্লি রেমিনিসেন্‌সেস' নাম দিয়ে একটি রচনা আলেক্স আরন্‌সন পাঠিয়েছিলেন বিশ্বভারতী পত্রিকার জন্যে। 'পুরোনো দিনের স্মৃতি' তারই তরজমা। ওঁর আত্মকথার যে-তৃতীয় খণ্ডটি এখনও প্রকাশিত হয় নি, এইটে হয়তো তারই এক অধ্যায়। আত্মকথার প্রথম খণ্ডে— যার নাম 'ব্রিফ ক্রনিক্‌ল অব দি টাইম'— অবিভক্ত বাংলায় তাঁর প্রবাসের দিনগুলির কথা (১৯৩৭-১৯৪৬) ধরে রেখেছেন আরন্‌সন। স্বভাবতই সে বইয়ের একটা বড়ো অংশ জুড়ে আছে শান্তিনিকেতনের সারি সারি স্মৃতিছবি। প্রথম খণ্ড থামছে ১৯৪৬ সালে। আর এই 'পুরোনো দিনের স্মৃতি' শুরু হচ্ছে ঠিক তার পরের বছর থেকে, ১৯৪৭ সাল থেকে, যখন উনি শিক্ষকজীবন আরম্ভ করেন ইজরায়েলে। এ লেখার প্রাথমিক পটভূমি : আরব-ইজরায়েলের রাজনৈতিক সংঘর্ষ ; ক্লাসে কবিতা পড়ানোর মাঝখানে বোমারু বিমানের হঠাৎ আক্রমণ ; সাইরেনের উচ্চকিত সংকেত ; ভয়ংকর সন্ত্রাস। 'মুদ্রিত লেখার উপর ছায়া ফেলে যাচ্ছে অবলীয়মান সাম্রাজ্যবাদ।' কবিতার পঠনপাঠনের পক্ষে খুব যে ললিত প্রশ্রয়ের পরিবেশ এ কথা বলা চলে না মোটেই! সংকটদীর্ণ সেই দিনগুলিতে এই আন্তর্জাতিক মানুষটির মনে ঝলসে উঠেছে শান্তিনিকেতনের মানবিক সম্বন্ধপাতের স্মৃতি। আত্মজৈবনিক এই রচনা হয়ে ওঠে একই সঙ্গে ধারাবাহিক আখ্যান এবং মানুষের পরিস্থিতির— বিশেষত শিক্ষাজগতের হালহকিকতের— ধারাভাষ্য।

এই সংখ্যা থেকে আন্তর্জাতিক সাহিত্যের আলোচনা আরম্ভ হল অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের রচনা দিয়ে। বিশ্বসাহিত্যের সাম্প্রতিক লেখকদের বিষয়ে তো বটেই, চিরায়ত লেখকদের বিষয়েও রচনা প্রকাশের ইচ্ছা রইল আমাদের।

প্রথম সংখ্যায় দেজ়িরে সিল্‌ভ্যাঁ লেভির ডায়েরি পড়ে আমরা জেনেছিলাম বিশ্বভারতীর প্রথম অতিথি-অধ্যাপক সিল্‌ভ্যাঁ লেভি ১৯২১ সালের ১৭ নভেম্বর শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে শুরু করেন 'ভারতের সঙ্গে বিদেশের সম্পর্ক' এই বিষয়ে বক্তৃতামালা। যেন সেই ধারারই জের টেনে ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই সংখ্যা থেকে শুরু করছেন ভারত ও মধ্য এশিয়ার সাংস্কৃতিক দেওয়া-নেওয়ার দীর্ঘ ইতিহাস। এই রচনাটি শেষ হবে চারটি স্বয়ংপূর্ণ কিস্তিতে। বহুদিন আগে, ১৯৩৭ সালে, প্রবোধচন্দ্র বাগচী এবিষয়ে তাঁর গবেষণার ফসল গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছিলেন 'ভারত ও মধ্য-এশিয়া' নামে। তার পর বাংলায় এ নিয়ে গবেষণাসমৃদ্ধ রচনা আমাদের তো আর চোখে পড়ে নি।

দুই কিস্তিতে ছাপা হচ্ছে দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের ঔৎসুক্যজাগানো রচনা, 'মন, মস্তিষ্ক ও গণিত্র'। এ প্রসঙ্গে লেখক একটি চিঠিতে জানাচ্ছেন : 'এর পরের কিস্তি...শুরু হবে কৃত্রিম ও জৈব গণিত্রের [কম্পিউটর] তুলনা দিয়ে। তার পরে থাকবে সেই সুপ্রসিদ্ধ প্রশ্ন : গণিত্র কি স্বয়ংক্রিয় এবং স্বয়ংভর হতে পারবে ? যদি হয় তবে কী হবে সেই স্বয়ংভরতার শর্ত ?'

দেবেশ রায় আর শর্বরী রায়চৌধুরীর রচনাকে যদি বলা যায়, কালিকলমে আঁকা ব্যক্তিস্বরূপের প্রতিকৃতি, তা হলে আফসার আমেদের গদ্যকে বলব, জনগোষ্ঠীর আলেখ্য। তরুণ সাহিত্যিক আফসার আমেদ দপ্তরিপাড়ায় বাঁধাইশিল্পের কর্মীদের মধ্যে প্রজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করেছিলেন অশোক সেনের তত্ত্বাবধানে, সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস-এর এক প্রকল্পে। তাঁর অভিজ্ঞতার নির্যাস পাওয়া যাবে সমাজবিজ্ঞান আর কথাসাহিত্যের প্রান্তছোঁয়া এই নতুন জাতের গদ্যে। বাঁধাইকর্মীদের শ্রমজীবন -কেন্দ্রিক এই বৃত্তান্তে আফসার খুলে খুলে দিচ্ছেন আমাদের চিরচেনা কলকাতার মধ্যবর্তী এক অচেনা কলকাতাকে। তুলে ধরছেন, ওঁদের জীবনবাস্তবের এমনসব দিক যা অঙ্কের মতন মেলানো যায় না কেতাবি তত্ত্বের সঙ্গে। বাংলায় এই বিশেষ জাতের গদ্যচর্চা আরও এগোতে থাকলে, আমাদের সমাজবিজ্ঞান আর কথাসাহিত্য হয়তো খুঁজে পাবে নতুন কোনো পরিপ্রেক্ষিত।

পশ্চিমের কেতাবি তত্ত্বের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান আছে দীপেশ চক্রবর্তীর প্রবন্ধে। বিতর্কময় বিতর্কজাগানো তাঁর রচনার এইটেই, বোধ করি, সবচেয়ে তীক্ষ্ণ আর জরুরি প্রতিপাদ্য। বাস্তবিক, অঙ্কমেলানো বাঁধাছক ভেঙে না ফেললে এই দুর্বোধ-জটিল সময়ের মোকাবিলা করা অসম্ভব। দীপেশ বলছেন, সাম্প্রতিক গবেষণায় এটা ক্রমশ পরিস্ফুট হয়েছে যে 'ভারতীয় জীবনের সমস্ত চিন্তা ও কর্মকে ইয়োরোপীয় দর্শনজাত ফর্মুলার মধ্যে ঠেসেঠুসে পুরে দেওয়া শক্ত।' একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটা তিনি পেশ করছেন এভাবে : 'ইতিহাস কীভাবে লিখব, প্রযুক্তি কেমন হবে, আধুনিক ছবি কেমন হবে, দর্শনই বা কী, পার্লামেন্ট বা ব্যুরোক্রেসি কী জিনিস— এসব কথা তাত্ত্বিকভাবে বুঝতে ইয়োরোপীয় অভিজ্ঞতা এড়াবার উপায় নেই আমাদের। অথচ ভারতীয় মার্গসংগীতের কথা ভাবুন : উনিশ শতক থেকে মধ্যবিত্তের প্রয়োজনে খানিকটা আধুনিকীকরণের চেষ্টা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ইয়োরোপীয় মার্গসংগীততত্ত্ব সম্পূর্ণ পরিহার করেও আমাদের রাগরাগিণীর তত্ত্ব বোঝা যায়।'

প্রশ্নটা উঠে আসছে এন্‌লাইটেন্‌মেন্ট বা আধুনিকতার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে, এই বিষয়ে বিতর্ক থেকে। বিচার (*critique*) আর খারিজ এক ব্যাপার নয় ; সুতরাং এন্‌লাইটেন্‌মেন্টের বিচারকে খারিজের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলাটা স্থূলবুদ্ধির কাজ বৈকি ! আসলে তো এন্‌লাইটেন্‌মেন্টকে বোঝার জন্যেই তাকে বিচার করে নেওয়ার প্রয়োজন।

আধুনিকতার এই বিচার দু ধরনের হতে পারে :

১. যুক্তিবিশ্লেষণ আর ঐতিহাসিক গবেষণার আলোয় এর নঞর্থক দিক তন্ন তন্ন করে দেখানো। কী সেই নঞর্থক দিক ? দীর্ঘ ফিরিস্তির দরকার নেই, দু-একটির উল্লেখ করা যায় এখানে। যেমন : এন্‌লাইটেন্‌মেন্ট পর্বে ক্ষমতার পেষণের সঙ্গে জ্ঞানের অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ ; নারীপুরুষের সম্পর্কের মধ্যে প্রভুত্বের ছক ; সমাজে আলোদেনেওয়ালা আর আলোলেনেওয়ালার খাড়াখাড়ি বিভাজন ; আমি'র সঙ্গে না-আমি'র অমানুষিক বিচ্ছেদ। এন্‌লাইটেন্‌মেন্টের এইসব অন্ধকার দিক সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করে তুলেছেন সাম্প্রতিক কালে পশ্চিম মহাদেশের বহু সমাজবিজ্ঞানী দার্শনিক আর নারীবাদী ভাবুক।

২. আধুনিকতার আরেক ধরনের বিচারও সম্ভবপর— সক্রিয় সৃষ্টিমুখী বিচার। সে বিচারের রীতি শুধু নেতিতে থামা নয় : আমাদের ইতিহাস-সমাজ-সংস্কৃতির বাস্তবকে জেনে বুঝে তার উপযোগী এক দেশজ আধুনিকতার পথ খোঁজা। আর, একই সঙ্গে, ক্রমে ক্রমে সে পথ গড়ে তোলা। এই পথ-খোঁজা পথ-বানানোর নির্ভর হবে স্বাবলম্বন, আত্মশক্তি। সে পথের অভিমুখ স্বদেশীসমাজের দিকে। স্বদেশীসমাজ বলতে এখানে রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক সমাজও বোঝাচ্ছি না ; সিভিল সোসাইটি অর্থাৎ পৌর সমাজও বোঝাচ্ছি না। বোঝাতে চাইছি কমিউনিটি বা কৌমকে : সমাজের যে-এলাকা এন্‌লাইটেন্‌মেন্টের আলোকচ্ছটা থেকে বঞ্চিত। চারপাশে ছড়ানো আবহমানের এই কৌমসমাজ, আদিবাসী সমাজ, লৌকিক জগৎকে প্রত্যক্ষণের পরিধির মধ্যে নিয়ে আসা এই সময়ের একটি প্রধান কর্মসূচি হয়ে উঠতেই পারে।

\+ \+ \+

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের একটি স্কেচ খাতা আছে নীহার চক্রবর্তীর সংগ্রহে। সেখান থেকে চারটি স্কেচ নীহারবাবু আমাদের ব্যবহার করতে দিয়েছেন, ফোটোও তুলিয়ে দিয়েছেন তিনি। তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই স্কেচগুলি নিয়ে যে ছোটো আলোচনাটি সাগ্রহে লিখে দিয়েছেন দেবাশিস্ ভট্টাচার্য, তা বিন্যস্ত হল ছবির পরিচিতি হিসেবে।

এই সংখ্যায় মানচিত্রটি এঁকে দিয়েছেন শমীন্দ্র ভৌমিক। পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ দেশপাণ্ডের বিষয়ে কয়েকটি তথ্যনিরূপণে সাহায্য করেছেন সাহিত্য অকাদেমীর আঞ্চলিক সচিব নির্মলকান্তি ভট্টাচার্য আর মহারাষ্ট্র নিবাস ও ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল বিব্‌লিওগ্রাফির কর্মীরা। আর শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যায় মুদ্রিত সোমনাথ হোরের ভাস্কর্যের আলোকচিত্রটি পেয়েছিলাম রবীন্দ্রভবনের ফোটোগ্রাফি বিভাগের সৌজন্যে। এঁদের কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ।

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রক্তকরবী

পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ

সম্পাদনা : শ্রীপ্রণয়কুমার কুণ্ডু

শেষবর্ষণ

নাটক

সংকলন ও সম্পাদনা : শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক

রবীন্দ্র-রচনাবলী ॥ অষ্টাবিংশ খণ্ড

●

মুকুল দে

আমার কথা

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭

শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা ১৭ -কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
টাইপসেটিং : পেজমেকারস্, ২৩বি রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ২৬।
মুদ্রক : পি. এম. বাকচি অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯ গুল্ ওস্তাগর লেন, কলিকাতা ৬।

নবপর্যায় ৩

মাঘ-চৈত্র ১৪০১

সম্পাদক

প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য

বিশ্বভারতী পত্রিকা

নবপর্যায় ৩

মাঘ-চৈত্র ১৪০১

বিশ্বভারতী পত্রিকা নবপর্যায় ৩ : মাঘ-চৈত্র ১৪০১

সম্পাদক : প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য ০ সহকারী সম্পাদক : সুবিমল লাহিড়ী

সূচিপত্র

চিত্রসূচি

প্রচ্ছদলিপি : বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

মুর‍্যাল : কলাভবন ডিজাইন বিভাগের বাড়ি

কল্পাতি গণপতি সুব্রহ্মণ্যন্

বিশ্বভারতী পত্রিকা

নবপর্যায় ৩। মাঘ-চৈত্র ১৪০১

শান্তিনিকেতনে শিল্পকলার ভূমিকা *

কল্পাতি গণপতি সুব্রহ্মণ্যন্

শান্তিনিকেতনে শিল্পকলার ভূমিকা নিয়ে আলোচনার এই প্রয়াস আমার পক্ষে হয়তো বা একটু ধৃষ্টতা হয়ে যাচ্ছে। আজ থেকে চৌত্রিশ বছরেরও আগে আমার ছাত্রজীবন কেটেছিল এখানে ; তার পর থেকে এখানে আমি এসেছি ক্বচিৎ কখনো, অল্প সময়ের জন্যে। আপনারা অনেকেই এখানকার দীর্ঘদিনের বাসিন্দা ; কেউ কেউ তো বড়োই হয়েছেন এই জায়গাটার বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে। তাই এখানকার ইতিহাস, কীর্তি, নানান উত্থানপতন সম্পর্কে আমার চেয়ে আপনারা নিশ্চয় অনেক বেশি ওয়াকিবহাল। ফলে এ-বিষয়ে আমার এই আলোচনা শোনার ধৈর্য আপনাদের না-ও থাকতে পারে। আর সেটাই তো স্বাভাবিক।

তা সত্ত্বেও আমি যে এই ধৃষ্টতা প্রকাশ করছি তার একমাত্র কারণ হল : যে-শান্তিনিকেতনের কথা আমি বলতে যাচ্ছি সেটা পঁচাত্তর বছর আগেকার বীরভূমের রুক্ষ জমিতে অবস্থিত সেই ছোট্টো বসতিটুকু নয় ; এমন-কি, আজকের এই উদ্ভিন্ন ট্যুরিস্ট সেন্টারও নয় ; আমার শান্তিনিকেতন হল এক 'স্বপ্নলোক', যার অবস্থান আমারই মনের দিগন্তে কোথাও। সত্যি কথা বলতে কী, যখন কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ি আমরা— ঠিক যেমন যখন কোনো কোনো মানুষকে ঘিরে গড়ে তুলি অনুরাগ— তখন সেই প্রতিষ্ঠান বা মানুষ এক স্বপ্নময় সত্তা নিয়ে, প্রভা হয়ে ঘিরে থাকে আমাদের। আমাদের মতো মানুষের কাছে শান্তিনিকেতন তেমনই একটি জায়গা।

বিশাল চুম্বকের টানে ছোটো ছোটো লোহার টুকরোর মতো আমরা কেউ কেউ সেই সময়ে শান্তিনিকেতনে চলে এসেছিলাম। কোনো এক মানসিক অনিবার্যতায় যেন আমাদের এখানে আসতেই হয়েছিল ; অন্য কোথাও নয়। এখানে আসার পিছনে আমাদের প্রত্যেকের হয়তো কিছু নিজস্ব কারণ ছিল, কিন্তু তার চেয়েও শক্তিশালী ছিল এই বিশাল আকর্ষণ। অন্তত আমার ক্ষেত্রে এটাই সত্য। আমি যখন এখানে এলাম তখন রবীন্দ্রনাথও আর নেই। যে-রবীন্দ্রনাথকে আমি জানতাম, তিনি ছিলেন এক 'স্বপ্নলোকের মানুষ' ; তাঁর সাহিত্য শিল্পকর্ম ও বাণীর মহিমায় গড়ে-ওঠা যেন এক পরম প্রতিমা। তাঁর প্রত্যক্ষ উপস্থিতির বিভাময় সম্মোহে আসি নি আমি। তবে এটা অনুমান করতে পারি যে তাঁর প্রত্যক্ষ উপস্থিতির সামনে পড়লে নিশ্চিত বিহ্বল হয়ে পড়তাম। স্বভাবপ্রকৃতিতে আমার চেয়ে ঢের বেশি সংশয়ী ও দৃঢ়চেতা মানুষও রবীন্দ্রনাথের সামনে যেভাবে অভিভূত হয়ে বিনতি জানিয়েছেন সেটা তাঁদের নিজেদেরও অবাক করেছে।

কেন আমাদের এভাবে আসতেই হল শান্তিনিকেতনে ? এক অর্থে, এই প্রশ্নের উত্তর পাব অন্য একটি প্রশ্নের জবাবে : রবীন্দ্রনাথ, যিনি কিনা ছিলেন এক স্বপ্নদ্রষ্টা কবি, অদম্য ভ্রমণপিপাসু, যিনি মাটিতে শিকড় গজানোর চেয়ে নদীবক্ষে নৌকায় ভেসে বেড়ানোতেই অনেক স্বস্তি পেতেন, কেন এই ধরনের একটি শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলার কথা চিন্তা করলেন ? অনেকেই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও জানিয়েছেন কেন,

---

* শান্তিনিকেতনে ১৯৭৮ সালের ২৮ এপ্রিলে 'দি রোল অব আর্টস ইন শান্তিনিকেতন' নামে প্রদত্ত বক্তৃতার অনুবাদ।

এবং এ-বিষয়ে গবেষণারত পণ্ডিতেরাও এ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা থেকে আমরা জানতে পারি যে শান্তিনিকেতনের মতন একটি শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলার চিন্তার পেছনে ছিল তদানীন্তন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তাঁর দুঃসহ অভিজ্ঞতা। সেইসব শিক্ষাগার ছিল জেলখানা। শিশুদের কয়েদ রাখা হত সেখানে আর চাপানো হত জেলের মতোই একঘেয়ে রুটিনেবাঁধা নিত্যকৃত্য। যার পরিণতি ছিল শিশুদের মনের ক্লান্তি ও হৃদয়ের শুষ্কতা। কোনো স্বাভাবিক শিশু এই ধরনের শিক্ষাকেন্দ্রে আসতে চাইত না। যদিও বা কেউ ভুলবশত বা অনিচ্ছায় চাপে পড়ে কখনো প্রবেশ করত, সে বেরিয়ে আসত এক খণ্ডিত মানুষ হয়ে। এখানে জীবনবিচ্ছিন্ন, অপ্রয়োজনীয় তথ্যের চাপে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ত শিশুর মন, তার অন্তরের তাগিদ ছিল অস্বীকৃত। এইভাবে এক ক্লান্তিকর, আনন্দবিহীন শিক্ষা-প্রক্রিয়ার শিকার হত শিশুরা। সম্ভবত তাঁরাও শৈশবে এই যন্ত্রণার শিকার হয়েছিলেন বলে, এ কাজে নিযুক্ত শিক্ষকরা এই শিক্ষাদানপদ্ধতি অনুসরণ করে এক বিকৃত তৃপ্তি পেতেন। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে, পরিপার্শ্ব বিষয়ে অজ্ঞতা, অনুভূতির স্থূলত্ব আর বিকৃত পরিপ্রেক্ষিত-বোধ এই শিক্ষাপদ্ধতির পরিণাম। তিনি টের পেয়েছিলেন, এক ধরনের আনন্দহীনতার জন্ম দেয় এই শিক্ষাপদ্ধতি। নিরক্ষর কৃষকরা এর চেয়ে অনেক বেশি আনন্দে থাকেন। ওই চাষীরা তো আছেন মাটির কাছাকাছি, ঘাস-কাদা ফল-ফুল পশু-পাখি ও প্রতিবাসী মানুষজনের নিকট সান্নিধ্যে ; তাঁরা একে অন্যের আনন্দে আনন্দিত হন, দুঃখে দুঃখী ; অজ্ঞতার মধ্যেও তাঁরা কিন্তু সর্বদাই প্রাণবন্ত। তিনি দেখলেন যে ভাবনাচিন্তাহীন এক কর্তব্যবোধ থেকে অথবা একটা ডিগ্রি, তকমা আর কৌলীন্যের আশায় লোকে এই শিক্ষা গ্রহণ করছে, পিতামাতাও তাঁদের সন্তানদের এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে পাঠাচ্ছেন। তিনি এও দেখলেন যে এই শিক্ষার বিষয়বস্তু দেশজ সংস্কৃতির সঙ্গে অনেকটাই সম্বন্ধহীন। আর যে-সমস্ত দিশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই সম্বন্ধটা রয়ে গেছে সেখানেও তার চেহারাটা ছিল বীভৎস বিকৃত ও সাম্প্রদায়িক ; তাদের শিক্ষাপদ্ধতিটাও ছিল ওই একইরকম নৈর্ব্যক্তিক অনুশাসনসর্বস্ব। রবীন্দ্রনাথ তাঁর চার পাশের লোকজনের মধ্যে যে-অশোভনতা ইতরতা সংকীর্ণতা দারিদ্র্য ও বিশৃঙ্খলা দেখেছিলেন আর সৃজনশীলতার অভাব লক্ষ করেছিলেন, এ-সমস্তই তাদের নিপীড়িত শৈশবের পরিণাম বলে উনি মনে করতেন। এর একটা নিরাকরণের উপায় খুঁজতে চাইলেন তিনি।

এদেশে বা বিদেশে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই যে এইরকম বোধে পৌঁছেছিলেন, তা নয়— আর সেটা আমরাও জানি, উনি নিজেও জানতেন। তাঁর শিক্ষাচিন্তা থেকে অনেক তথ্যপ্রমাণ বিচার করে গবেষকরা বলেছেন যে যাঁর শিক্ষাভাবনা হয়তো সচেতন মনে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন, তিনি হলেন রুশো, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে লেখা যাঁর 'এমিল' বইটি পৃথিবীর নানান প্রান্তের মানুষের শিক্ষাভাবনাকে প্রভাবিত করে। কী ছিল সেই 'এমিল'-এর বৈশিষ্ট্য, যার প্রভাব এত ব্যাপক ? প্রথমত এই বইয়ে স্বাধীনতা আর মানবস্বভাবের মৌলিক ভালোত্বের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এও স্পষ্ট করে বলা হয় : প্রতিটি ব্যক্তির সহজাত ক্ষমতার স্ফুরণ ঘটাতে পারলে তবেই তার বিকাশ সার্থকতম হয়ে ওঠে ; স্বভাবের বিরুদ্ধে তাকে চালিত ক'রে নয়। ওই 'এমিল' বইটিতে রুশো মেনে নিচ্ছেন যে প্রাচীন কালের ঐকত্রিক সমাজের যত প্রতিষ্ঠান, সেগুলো সবই ছিল এক-একটি অচলায়তন। আবার সেই মৃত সমাজের জায়গায় যে নতুন নাগরিক সমাজ গজিয়ে উঠছে তার প্রতিষ্ঠানগুলিরও খামতি বিস্তর। মানুষের স্বাধীনতার নব্য ধারণার আলোকে, এই বইয়ে সেই শিক্ষার কথা বলা হয়, যে-শিক্ষা ব্যক্তিস্বরূপের স্বাধীনবিকাশের জন্যে ; যে-শিক্ষার অবস্থান সামাজিক অথবা প্রাতিষ্ঠানিক পেষণের বিপরীতে।

রুশো বিশ্বাস করতেন যে যথার্থ শিক্ষাপ্রক্রিয়া নির্ভর করে তিনটি সম্পর্ক-স্থাপনের ওপর : ১. নিজের স্বভাবের সঙ্গে সম্পর্ক, ২. অন্য মানুষজনের সঙ্গে সম্পর্ক, ৩. চার পাশের জগৎ ও পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক। রবীন্দ্রনাথও এইভাবে ভেবেছিলেন। কিন্তু উনি দেখলেন যে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় পূর্বোক্ত তিনটি সম্পর্কের একটিরও কোনো স্থান নেই। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীর নিজস্ব প্রকৃতিকে স্বীকার করে না ; তাকে বিচ্ছিন্ন

করে রাখে অন্য মানুষজনের থেকে ; চার পাশের জগৎ ও পরিবেশ সম্পর্কে তার সমস্ত আগ্রহকে নিবিয়ে দেয়। এই সম্পর্ক-সাধনের জন্য শিক্ষাপরিবেশের একটা আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। প্রয়োজন এমন এক স্থানিক পরিবেশের, যেখানে ছাত্র-শিক্ষক উভয়েই উদ্দীপিত হবে, এবং উভয়ের মধ্যে এক সহজ অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠবে। এটা শহরে সম্ভব নয় কেননা সেখানকার জীবনধারায় স্থায়ী সম্পর্কের তেমন অবকাশ নেই। তাই তিনি বেছে নিলেন পল্লীপরিবেশ। সেখানে এই সম্পর্কগুলো গড়ে উঠুক ব্যক্তিগত স্তরে, 'ভালোবাসা'য় সিঞ্চিত হয়ে— এই আকাঙ্ক্ষার কথাই উনি বলেছেন, তাঁর রোম্যান্টিক ভাষায়। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের যুক্তি ছিল এই : কেউ যখন তার আপন তাগিদে চলতে শিখবে, বাইরের জগতের সঙ্গে তার প্রতিটি সংযোগ-সংঘাত হয়ে উঠবে গভীর ও আন্তরিক অভিজ্ঞতা। প্রকৃত অর্থে সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি তখনই তৈরি হবে যখন মানুষ জানবে কীভাবে পরস্পরকে ক্রমাগত ঋদ্ধ করে তুলে পাশাপাশি বেঁচে থাকতে হয়। এবং কেউ যখন তার পরিবেশকে নিবিষ্ট মনে প্রত্যক্ষণ করতে পারে, তখন তার অন্তর্দৃষ্টিতে খুলে যায় অস্তিত্বের রহস্য। ওই তিন ধরনের সম্বন্ধের অন্তর্যোগ ঘটে যে-শিক্ষাপ্রক্রিয়ায় তা মানুষকে করে তোলে সৃজনশীল, করে তোলে জীবনশিল্পী। তাঁর শিক্ষাদর্শন বিষয়ে এক বিবৃতিতে এ কথাটা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে বলেন, 'আমার শিক্ষাভাবনা থেকে একটাই মূল নীতি বেরিয়ে আসে : যাও, সেইখানে জীবনের মোকাবিলা করো, যুক্ত হও জীবনের সঙ্গে, যেখানে সে পূর্ণ।'

হয়তো এই চিন্তাভাবনার প্রথম জন্ম নামগোত্রহীনভাবে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এইসব ভাবনা হয়ে উঠল মানবিক পরিস্থিতির ক্রিটিক (*critique*) বা বিচার। আর সেই পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ স্বদেশেরও বটে ; আবার বৃহত্তর বিশ্বেরও বটে। সৌভাগ্যক্রমে প্রাক্-স্বাধীন ভারতবর্ষে আমরা এমন কয়েকজন চিন্তানায়ক পেয়ে যাই, যাঁরা ছিলেন বড়ো পরিপ্রেক্ষিতের অধিকারী। ছোটো ছোটো সমস্যারও তাঁর খুঁজে গেছেন মৌলিক সমাধান। এঁদের প্রত্যেকেই, রবীন্দ্রনাথ গান্ধি বিবেকানন্দ অথবা দয়ানন্দ সরস্বতী, তৎকালীন পরিস্থিতিকে মেনে নিতে পারেন নি। তাঁরা উপলব্ধি করেন যে সমাজের এই দুর্বলতা, এই বিশৃঙ্খলা অসততা, মনের এই দারিদ্র্য আর ক্ষুদ্রতা, এসমস্তই, হল মনুষ্যস্বভাবের অধঃপতনের পরিণাম। এর প্রতিকার সম্ভব একমাত্র বোধ ও চরিত্র -চর্চার মাধ্যমে এই স্বভাবেরই পরিবর্তন ঘটিয়ে। প্রত্যেকেই অবশ্য নিজস্ব সমাধানের পথ খুঁজে নিয়েছিলেন। জীবনের প্রতিটি কাজকে শিল্পায়িত করে তুলতে হবে, প্রত্যেক ব্যক্তির নিহিত সম্ভাবনার ঘটাতে হবে সৃজনময় উন্মীলন— এ-ই ছিল রবীন্দ্রনাথের পথনির্দেশ।

তাই এটা তো খুব স্বাভাবিক যে গোড়া থেকেই মূল পরিকল্পনায় শান্তিনিকেতনে শিল্পকলার একটা বড়ো ভূমিকা ছিল। শুধু পেশাদারি শিক্ষাক্রম হিসেবেই নয় ; সে ভূমিকা ছিল বহুমুখী ; বহুস্তর লক্ষ্যের দিকে অন্বিত। এটাই উদ্দেশ্য ছিল : শান্তিনিকেতনের ছত্রচ্ছায়ায় আপন-কাজে-মগ্ন একদল সৃজনশীল মানুষের উপস্থিতিতে দীপ্ত হয়ে উঠবে গোটা পরিবেশ ; সেখানে তৈরি হবে চুম্বকের টান ; আর তাঁদের সেই সৃষ্টিমুখী কর্মপ্রবাহ ছড়িয়ে পড়বে সমগ্র সমাজপরিমণ্ডলীর স্তরে স্তরে। প্রত্যাশিত ছিল— এর ফলে শান্তিনিকেতনের সমাজে ক্রমে ক্রমে সঞ্চারিত হবে জীবনের গুণগত মান বিষয়ে এক নবীন বোধ ; ভাবনায় আর কাজে যুক্ত হবে নতুন এক শুচিশ্রী সংবিৎ ; ছড়িয়ে পড়বে আনন্দ আর চরিতার্থতার এক নবীন অনুভব। যে-কোনো কার্যকর শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে এটা তো অতি বরণীয় লক্ষ্য।

যে-শিক্ষাতত্ত্বের রূপরেখা উপরে পেশ করলাম, তার ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথের এবং নন্দলাল বসুর মতো তাঁর আরও কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহযোগীর বিচিত্র সৃষ্টিপ্রতিভা একটা কর্মক্ষেত্র পেল। আমরা তো জানি, রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র একজন বড়ো কবিই নন, তিনি ছিলেন সংবেদনশীল নাট্যকার, অনুপম সংগীতকার, অত্যন্ত মৌলিক ও ক্ষমতাবান চিত্রশিল্পী এবং সর্বোপরি এক সূক্ষ্মদর্শী, রুচিমান মানুষ। নন্দবাবু আসার পর, রবীন্দ্রনাথ তাঁর মধ্যে খুঁজে পেলেন এক উপযুক্ত সহযোগী যিনি তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সৃষ্টিকর্মের সঙ্গে সুর মেলাতে পারবেন। তাঁরা দুজনে পরস্পরকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন ; বস্তুত রবীন্দ্রনাথ নন্দবাবুর অবদানকে এতটাই গুরুত্ব দিয়েছিলেন যে লর্ড রোনাল্ডশে'র বিরাগভাজন হওয়ার আশঙ্কা সত্ত্বেও, কলকাতার 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি

অব ওরিয়েন্টাল আর্ট’ থেকে নন্দলালকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসতে কুণ্ঠিত হন নি। একবার শান্তিনিকেতনে এসে পড়তেই, এখানকার কাজকর্মে নন্দবাবু সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সঁপে দিলেন। কলাভবনে শিল্পকলা শেখালেন ; রবীন্দ্রনাথের নাটকের জন্য পোশাক ও মঞ্চসজ্জার ডিজাইন করলেন, যোগ দিলেন নাট্য প্রযোজনায়। ঋতু-উৎসবের সাজসজ্জা উপচার অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা রচনা করলেন তিনি। চিত্রশোভিত করলেন ইমারতগুলির দেওয়াল ; অলংকরণ করলেন [illegible] প্রকাশনার। নানান ধরনের কারুকলায়— যেমন, আলপনা বয়নশিল্প মালাগাঁথা অথবা তোরণ-নির্মাণ— [illegible]য়সীদের শিক্ষিত করলেন তিনি। শিষ্টাচার, পরিচ্ছন্নতা ও সুন্দর পরিবেশের এক উঁচু প্রতিমান স্থাপন করলেন। ক্যাম্পাসের বিন্যাস, বাড়ির নকশা, আর ঘরের অভ্যন্তর পরিকল্পনায় ন্যূনতম উপকরণ ব্যবহারের এক নির্দিষ্ট ধারা প্রবর্তন করেন তিনি। শান্তিনিকেতনের সেই উজ্জ্বলতম দিনগুলিতে, নিজে [illegible] করে যে-সময়ে নন্দ[illegible] ব্যক্তিগতভাবে সমস্ত কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করতেন, সেখানকার নকশা [illegible] বৈশিষ্ট্য ছিল এক সহজ সামঞ্জস্য আর স্বচ্ছন্দ শৃঙ্খলা।

এটা অবিসংবাদিত যে এ-ব্যাপারে তিনি চীন আর জাপান থেকে কিছু সূত্র গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল, দুজনেই, নিজেদের মতো করে চীন আর জাপানকে যেভাবে জেনেছিলেন, তার দ্বারা প্রভাবিত হন। ১৯১৬ সালে জাপান থেকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জাপানিদের ‘হৃদয়ের মিতব্যয়িতা’র প্রশংসা করে লেখেন, ‘এই ভাবের সংযমকে হৃদয়ের চাঞ্চল্য কোথাও ক্ষুব্ধ করছে না। আমাদের মনে হয়, এইটেতে জাপানের একটা গভীর পরিচয় আছে।... আবেগের বোধ এবং প্রকাশকে খর্ব করে সৌন্দর্যের বোধ এবং প্রকাশকে প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়ে তোলা যেতে পারে— এখানে এসে অবধি এই কথাটা আমার মনে হয়েছে।’ তিনি লক্ষ করেন যে শৃঙ্খলা পরিচ্ছন্নতা কঠোর শ্রম ও বীর্য এবং তারই সঙ্গে নিয়ন্ত্রণবোধ ও সংযম জাপানের মানুষের বৈশিষ্ট্য। এই কারণেই ‘জাপানির মনে এই সৌন্দর্যরসবোধ পৌরুষের সঙ্গে মিলিত হতে পেরেছে।’ জাপানিদের কাছে তিনি এটা শুনে বিস্মিত হন যে এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাঁরা পেয়েছেন ‘বৌদ্ধধর্মের প্রসাদে’। কারণ তিনি লক্ষ করেন যে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম ‘আমাদের জীবনযাত্রাকে তো এমন আশ্চর্য ও সুন্দর সামঞ্জস্যে বেঁধে তুলতে পারে নি।’ জাপানিদের জীবনধারার আপেক্ষিক সমসত্ত্বতা, রুচির আপেক্ষিক সারূপ্য রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত মুগ্ধ করে। এর সঙ্গে উনি প্রতিতুলনা করেন আমাদের রুচি ও জীবনধারার বিষম উচ্চাবচতার। উনি আক্ষেপের স্বরে বলেন, ‘জীবনযাত্রার রীতি যদি আমরা অসংকোচে জাপানের কাছ থেকে শিখে নিতে পারতুম, তাহলে আমাদের ঘরদুয়ার এবং ব্যবহার শুচি হত, সুন্দর হত, সংযত হত। জাপান ভারতবর্ষ থেকে যা পেয়েছে তাতে আজ ভারতবর্ষকে লজ্জা দিচ্ছে, কিন্তু দুঃখ এই যে সেই লজ্জা অনুভব করবার শক্তি আমাদের নেই।’

নন্দবাবুও নানানভাবে চীন আর জাপানের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের সূত্রে ওকাকুরা ও তাঁর কয়েকজন শিষ্যের সঙ্গে আলাপ হওয়ার ফলে নন্দবাবু জাপানি শিল্পসংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হন আর কালি-তুলির কাজ শেখেন (১৯১৭) কাম্পো আরাই-এর কাছে। শিল্পশিক্ষা বিষয়ে ওকাকুরার ভাবনা নন্দলালের কাছে এতই সুচিন্তিত মনে হয় যে সেই ভাবনা উনি কলাভবনের প্রায় নির্দেশক নীতি হিসেবে গ্রহণ করেন। কলাভবনে শিল্পশিক্ষার এক নতুন পথের কথা ভাবলেন তিনি। শিক্ষার্থীদের ভারতের পরম্পরাগত শিল্পে দীক্ষা দিয়ে ওদের সামনে খুলে দিতে চাইলেন আমাদের শিল্পভাষার সঞ্চিত ভাণ্ডার। কিন্তু উনি চান নি যে কলাভবন একটি প্রাচীনপন্থী আটেলিয়ার বা কর্মশালার মতো কেবলই পুরোনো রূপকল্পের পুনরাবৃত্তি করে চলুক। বরঞ্চ উনি চেয়েছিলেন, কী চতুষ্পার্শ্বের প্রাকৃতিক পরিবেশ, কী সংগ্রহশালার শিল্পপরিবেশ যেন প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সংবেদনে, ব্যক্তিগত স্তরে, গভীর সাড়া জাগায়। তারা উপলব্ধি করুক কীভাবে একটা শিল্প-ঐতিহ্যের ভাষা আর প্রকৃতির প্রত্যক্ষ রূপ পরস্পরের প্রতিযঙ্গও রচনা করে আবার সমৃদ্ধও করে তোলে পরস্পরকে। আর এ প্রসঙ্গে ওকাকুরার ভাবনা— একই সঙ্গে অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা ও আগামীর দিকে এগিয়ে যাওয়া, এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান— নন্দলালের কাছে খুবই গ্রহণযোগ্য মনে হল। নন্দলালের এই চিন্তাদিগন্ত আরও প্রসারিত হল যখন উনি ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চীন ভ্রমণ করে এলেন।

কিন্তু কলাভবনের জন্য এই প্রগতিমুখী বা সুষম কর্মসূচি রচনা ছিল নন্দলালের কর্মকাণ্ডের একটি ছোটো অংশ। তাঁর শিল্প পরিপ্রেক্ষিত ছিল আরও বিস্তৃত ; উনি গোটা পরিবেশটারই রূপান্তর ঘটাতে চেয়েছিলেন। তাঁর চিন্তাভাবনার সংকলন 'শিল্পকথা'র গোড়াতেই তিনি এ বিষয়টি পরিস্ফুট করেন এই বলে যে, 'আমাদের শিক্ষাদানের আদর্শ যদি সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাদান হয়, কলাচর্চার স্থান এবং মান বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সঙ্গে সমান থাকা উচিত।' এর অভাবে কোনো পূর্ণ মানসিক গঠন সম্ভব নয়। শিল্পকলা সম্পর্কে শিক্ষিত লোকের স্থূল রুচি দেখে উনি আক্ষেপ করেন। এটা দেখে উনি অবাক হয়ে যান যে সেরেফ রুচিবোধের অভাবে তাঁরা নিজেদের চার পাশের সহজপ্রাপ্য সুন্দর জিনিসপত্র অবহেলা ক'রে সস্তা জাপানি পুতুল আর রঙ-চকচকে জার্মান মোড়কে আকৃষ্ট হন। উনি বলেন, '...রসবোধের দৈন্যও তেমনি পীড়াদায়ক হয়ে উঠছে। এর প্রতিকারের উপায় এ কালের শিক্ষিত সমাজে কলাশিক্ষার প্রচলন ব্যাপকভাবে করা ['ব্যাপকভাবে' শব্দটা লক্ষণীয়] ; কারণ এই শিক্ষিত সমাজই জনসাধারণের আদর্শস্বরূপ।' নন্দলালের মতে, শিল্পচর্চার শুরু ঘর থেকেই— পরিবেশ-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা থেকেই। 'সৌন্দর্যজ্ঞানের অভাবে যাঁরা বাড়ির উঠানে ও ঘরের মধ্যে জঞ্জাল জড়ো করে রাখেন, নিজের দেহের এবং পরিচ্ছদের ময়লা সাফ করেন না, ঘরের দেয়ালে পথে ঘাটে রেলগাড়িতে পানের পিক ও থুতু ফেলেন, তাঁরা যে কেবল নিজেদেরই স্বাস্থ্যের ক্ষতি করেন তা নয়— জাতির স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি করেন', এই বলে উনি আমাদের সতর্ক করে দেন। যারা ভাবে শিল্পকলা শুধু আয়েশি ও ধনী ব্যক্তির জন্য, তাদের উদ্দেশে নন্দলাল বলেন যে অর্থমূল্যে শিল্পবস্তুর পরিমাপ হয় না। একজন দরিদ্র সাঁওতাল গ্রামবাসীর রুচি ও সৌন্দর্য-বোধ ছাত্রাবাসের বেশিরভাগ শিল্প-শিক্ষার্থীর চেয়ে অনেক গভীর। এই রুচিবোধ কীভাবে সঞ্চার করা যায় ? কীভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যায় শিল্পকলা বিষয়ে আগ্রহ ? নন্দলাল বলেন, এর জন্যে চাই : জনসাধারণের মধ্যে শিল্পসামগ্রীর ব্যাপক চলন আর শিল্পকলার উৎকৃষ্ট বইপত্র ছাপানো। তা ছাড়া, দেশের নানান কলাকেন্দ্র যাতে সাধারণ লোকে দেখে আসতে পারেন ; যাতে তাঁরা মেলায়, উৎসবে যোগ দিতে পারেন— তারও ব্যবস্থা চাই। আর শিল্প শিক্ষার্থীর প্রতি তাঁর উপদেশ এই : নিজেকে মেলে ধরো প্রকৃতির অফুরন্ত দৃশ্যসমারোহের সামনে।

সুন্দর জিনিসের খোঁজে নন্দলালের দৃষ্টি সর্বত্র উদ্যত হয়ে থাকত। যে-জিনিস যত সাধারণ আর অনাড়ম্বর— যেমন, গ্রামীণ কারিগরের ছোটোখাটো হাতের কাজ অথবা গ্রামের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য জিনিসপত্র— সে জিনিস ততই তাঁর প্রিয়। ঝুড়ি, ঘাসের গয়না, ছুরি, কাটারি, নারকোলের মালার পাত্র— এসমস্ত-কিছুই তাঁর কাছে মহান শিল্পবস্তুর মতোই মূল্যবান। আর কী উৎসুক আগ্রহে তিনি এসমস্ত জিনিস কলাভবনের জন্য সংগ্রহ করতেন ! তিনি চাইতেন, তাঁর মতো, তাঁর ছাত্রছাত্রীরাও বিস্তৃত এক আগ্রহের বৃত্ত তৈরি করে নেবে। আর সেই আগ্রহ-বৃত্তের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা শিল্পচর্যা চালিয়ে যাবে সমান তেজে, সমান নিষ্ঠায়। এর ফলে কলাভবনের ছাত্রের চোখের সামনে শিল্পচর্চার এত প্রসারিত এক পরিধি খুলে গেল, যা আর কোনো প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষক তুলে ধরতে পারতেন না। আর এর জন্য তাঁর ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যেকেই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। শিল্পশিক্ষা ও রুচিচর্চা সম্পর্কে নন্দলালের চিন্তাভাবনায় ছিল উদারতা, ছিল বিস্তৃতি। নিশ্চিতভাবে এটা আমরা বলতে পারি, এদেশে তৎকালীন শিল্পশিক্ষাব্রতীদের মধ্যে একমাত্র নন্দলালই চিন্তা করেছিলেন সামগ্রিক শিল্পপরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে। এবং এ-বিষয়ে তিনি দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন যে নীচের স্তর থেকে নন্দনচর্চার কোনো প্রক্রিয়া সচল না থাকলে উচ্চতর কোনো শিল্পোৎকর্ষ সাধনের স্বপ্ন নিষ্ফলতায় পর্যবসিত হবে। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও যেহেতু শুধুমাত্র একটি প্রতিষ্ঠান নয়, একটা মূল্যবোধ গড়ে তোলায় ব্রতী হয়েছিলেন, তাই ছোটো মাপের পেশাদারি সাফল্যে উনি সন্তুষ্ট হতেন না। নন্দলাল বলেছেন যে গুরুদেব জানতেন, শিল্পীসৃষ্টির জন্য যা একান্ত দরকার তা হচ্ছে শিল্পের একটা আবহাওয়া ; আর এই আবহাওয়া সৃষ্টির জন্যই তিনি নন্দলালদের ডেকে আনেন শান্তিনিকেতনে। সেই ভূমিকাই নন্দলাল পালন করে গেছেন, এবং সেইরকমই একটা আবহাওয়া তৈরির চেষ্টা করেছেন যা হবে ঐশ্বর্যবান অথচ বিনীত ; সতেজ অথচ সংবেদনশীল— ঠিক যেরকমটা জাপানে দেখে রবীন্দ্রনাথ

রোমাঞ্চিত হয়েছিলেন। যদি পরবর্তীকালে এই গোটা প্রক্রিয়া একধরনের পুনরাবৃত্তি আর পৌরুষবর্জিত পেলবতার প্রবণতায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে থাকে, তার দায় নিশ্চিতভাবে নন্দলালের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর চাপানো যায় না।

শিল্পচিন্তার রূপান্তরের ক্ষেত্রে জাপান কেন এতটা প্রভাব বিস্তার করল— শুধু ভারতেই নয়, ইয়োরোপ এবং পরে আমেরিকাতেও— এ বিষয়ে কিছু আলোচনা এখানে করা যেতে পারে। এ শতাব্দীর গোড়াতে জাপানের প্রতি ভারতের আগ্রহের কারণগুলি তো আমরা জানি— যেমন, এশিয়ার পুনরুত্থানের প্রবল এক প্রতীক হয়ে উঠেছিল জাপান ; আবার জাপানই হচ্ছে সেই প্রাচ্য দেশ যে, পশ্চিমী শিক্ষা ও কারিগরি বিজ্ঞানের প্রভাবের সামনে প্রথম নিজেকে মেলে ধরেও নিজের মূল্যবোধ ও জীবনধারার পরম্পরাগত বিশিষ্টতা বজায় রাখে। এ ছাড়া জাপানের বিরামহীন শিল্পোৎপাদন, নির্ভুল সাংগঠনিক ক্ষমতা ও অদমনীয় জাত্যভিমান আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে দৃষ্টান্ত হিসেবে হাজির হয়। ১৯০৫ সালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জাপানের জয়ের পরে এই মনোভাব আরও প্রবল হয়ে ওঠে। এশিয়াবাসীর মনে হল, জাপানের এই জয় যেন এক অতিকায় ড্রাগনের বিরুদ্ধে খুদে এক সেন্ট জর্জের জয়। শিল্পকলার ক্ষেত্রে জাপানি প্রভাবের কারণ, অন্তত মূল কারণ, অবশ্যই এগুলো নয়। উনবিংশ শতাব্দীতে ইয়োরোপীয় শিল্পীরা উকিয়ো-এ (Ukiyo-e) ছাপাই-ছবির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ফলে জাপানের দ্বারা প্রভাবিত হন। উকিয়ো-এ ছবিকে ধারণাগতভাবে বলা যায়, পশ্চিমী রিয়ালিজ্‌ম আর প্রাচ্যের আখ্যানধর্মী ছবির মধ্যবর্তী এক চিত্ররীতি। তার ওপর, এই ছবির ছিল এক ধরনের হেডনিস্ট বা প্রেয়োবাদী আবেদন, যা ইয়োরোপের চোখে একেবারে অপরিচিত লাগে নি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের ফরাসি ভিন্‌য়েৎ (*vignette*) থেকে হারুনোবু আর হিরোশিগের জাপানি ভিন্‌য়েৎ অথবা পারির রঙ্গিণীদের ছবি থেকে যোশিওয়ারার রঙ্গিণীদের ছবি— ইয়োরোপীয়দের কাছে এই যাতায়াত একেবারেই কষ্টসাধ্য ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমে, আধুনিক ভারতীয় শিল্পে জাপানি প্রভাব এসে পড়ে একটু ভিন্নভাবে। এই প্রভাব পড়ে এমন একটা সময়ে যখন ভারতীয় শিল্পীরা— বিশেষত সেই শিল্পীরা যাঁরা পরম্পরাপন্থী ছিলেন না— ধর্মগত প্রতিমাপ্রতীককে সত্যিকারের বোধ ও বিশ্বাস দিয়ে আর ছুঁতে পারছিলেন না। ফলে তাঁরা ভর খুঁজতে চাইছিলেন চার পাশের স্বাভাবিক বাস্তবতার বিশ্বে। কিন্তু ইয়োরোপীয় রিয়ালিজ্‌মের ধরনে নয় ; তাঁদের আকৃষ্ট করে চীন ও জাপানের দীর্ঘ শিল্পপরম্পরার বিবিক্ত প্রকৃতিবাদ, তার মরমী অন্তর্মুখিতা। এ ছাড়া চীন-জাপানের কারুশিল্পের বৈচিত্র্য, ব্যাপকতা এবং তার সর্বাঙ্গীণ রুচিবোধ তাঁদের যে মুগ্ধ করে, সে তো আগেই বলেছি। আর যা তাঁদের প্রবলভাবে টানে তা হল : জাপানি চারু ও কারু শিল্পের বাহুল্যবর্জিত রূপ ও রীতি ; প্রতীক-ব্যবহারে অতিস্পষ্টতা পরিহার ; আর সংবৃত ধর্মনিষ্ঠতা। এইসব গুণই আরও দু দশক পরে মার্কিনি শিল্পী আর স্থপতিদেরও বিশেষ আকৃষ্ট করে।

বিশের আর তিরিশের দশকে শান্তিনিকেতনে শিল্পচর্চা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। নন্দবাবু ও তাঁর কলাভবনের সতীর্থদের পক্ষে এটা ছিল কর্মিষ্ঠতার কাল ; আর রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও বহু দিক দিয়ে এই বছরগুলি ছিল খুবই সৃষ্টিশীল, কর্মচঞ্চল। আগেই যেসব কর্মকাণ্ডের উল্লেখ করেছি সেগুলো ছাড়াও, এই সময়ে অপেশাদারদের জন্য এক কারুশিল্প আন্দোলনের সূচনা হয়। শ্রীনিকেতনে স্থাপিত হল পেশাদারি কারুশিল্পেরও একটি বিভাগ : 'শিল্পসদন'। নাট্য ও সংগীত-চর্চার ক্ষেত্রেও এই সময়ে বর্ধিষ্ণু বেগ লক্ষ করি। সেইসময়ে একটা খোলামেলা, মুক্ত মনোভাবের যেমন সাক্ষাৎ পাই, তেমনই পরিচয় পাই নানা দিকে উদ্‌ভাবনী প্রচেষ্টার। লোকশিল্প, লোকসংগীত, লোকধর্ম ও লোকাচার সম্পর্কে আগ্রহও গড়ে তোলা হয় এই সময়ে। ছাত্রছাত্রীরা যাতে গ্রামীণ শিল্প, লৌকিক উৎসব এবং নানান দেশজ শিল্পপ্রকরণ সম্পর্কে আগ্রহী হয়, এ ব্যাপারে নন্দলাল বিশেষভাবে সচেষ্ট হন। এ হল সেই সময়, যখন আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃতি-কেন্দ্র হিসেবে বিশ্বভারতী খ্যাতিলাভ করতে থাকে।

এটা অনস্বীকার্য যে এই কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রীয় ভর ছিল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি। কাজের এই গুণগত মান ও বৈচিত্র্য, এই খোলামেলা পরিশীলনের আবহাওয়া, আর প্রতিটি ক্ষেত্রেই মৌলিক পরিপ্রেক্ষিত খোঁজার

ব্যাপারে এই যে প্রগাঢ় লিপ্ততা— এসমস্তর উৎস ছিল রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব। তাই দৃশ্যপট থেকে যখন সরে গেলেন তিনি, তখন বিশ্বভারতীর চরিত্র ধীরে ধীরে বাঁক নিল নৈর্ব্যক্তিকতার দিকে। কাজকর্মের গতিও শ্লথ, ব্যাহত হতে শুরু করল। কিন্তু যতদিন নন্দবাবু সক্রিয় ছিলেন, তিনি শিল্পচর্চার কাজকর্ম অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টাও যেমন চালিয়ে যান, তাঁর প্রচেষ্টায় একটা ব্যক্তিগত স্পর্শও তেমন বজায় থাকত সেসব কাজে। তবে এ ক্ষেত্রেও একটা বদল ক্রমে ক্রমে পরিলক্ষিত হল।

স্বাধীনতার কয়েক বছর পরে বিশ্বভারতী হয়ে উঠল একটা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। তার পরে এর গোটা চরিত্রটাই গেল বদলে। কাজকর্ম চলতে থাকলেও ভাঁটা পড়ল উদ্যমে। কোনো কোনো উদ্যোগ বন্ধই হয়ে গেল ; কোনো কোনোটা দুর্বল হয়ে পড়ল। শিল্পকলা সংক্রান্ত যত কাজ চলছিল, সেগুলি একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিশেষীকরণের খণ্ড খণ্ড পৃথক ক্ষেত্র হয়ে উঠল। একটি ছোটো অথচ সহমর্মী পরিমণ্ডলীর পক্ষে যেভাবে তার পুরোনো নান্দনিক প্রতিমান মেনে চলা সম্ভব ছিল, বৃহত্তর অ্যাকাডেমিক প্রতিষ্ঠানের পাঁচমিশেলি ভিড়ে, জটিলতায়, তা হয়ে পড়ল দুঃসাধ্য। নন্দবাবুর পরে, সেইরকম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব আর একজনও ছিলেন না যিনি নান্দনিক বিবেকরক্ষকের ভূমিকা নিতে পারতেন। শিল্পকলার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগেব পেশাদারি কৌলীন্যও বাড়ল, সামর্থ্যও বাড়ল ; কিন্তু পুরোনো দিনের সেই ব্যাপক প্রভাব আর রইল না। যেটুকুও সম্ভাবনা ছিল, তা চাপা পড়ে গেল আগ্রহের অভাবে। কী উৎসব-অনুষ্ঠানের, কী উৎসব-মিছিলের, কী মণ্ডসজ্জার ডিজাইনে সেই উদ্‌ভাবনী কল্পনা থাকল না আর। হারিয়ে গেল অতীতের সেই সংযম আর সূক্ষ্মতা। কিন্তু উৎসব আর মেলা টিঁকে রইল তো বটেই বরং বাড়তে থাকল আকারে, আয়তনে। বেড়ে চলল মেলা ও উৎসবের প্রতি জনতার টান আর সমাদর। তবে এই যে ক্রমবর্ধমান জনাদর, এতে নানান ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটল প্রতিষ্ঠানের ভিতর। কেউ কেউ একে খুশি মনে স্বাগত জানালেন ; কেউ বা প্রকাশ করলেন অসহ্য বিরক্তি ; অন্তত একাংশ মনে করলেন, এখন শহুরে বাজারি-ভিড়ে আক্রান্ত হল গ্রামের পরিবেশে গড়ে-ওঠা এই নিভৃত শিক্ষাশ্রম।

বছরের পর বছর ধরে যা ঘটছে, সেবিষয়ে যে-ছবি তৈরি হয়েছে আর নানান সময়ে যা খবর পেয়েছি, তারই ভিত্তিতে উপরের কথাগুলি বললাম। সমালোচনা করা আমার অভিপ্রায় নয়। যেহেতু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ও পরিস্থিতি দুইই বদলায়, যে-কোনো প্রতিষ্ঠানেই এরকম পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। কথাটা বিশ্বভারতীর ক্ষেত্রে আরও বেশি প্রযোজ্য, যেহেতু তার কর্মকাণ্ডের নিউক্লিয়স ছিলেন যে-কর্মীমণ্ডলী তাঁরা অনেকটাই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্বের ওপর নির্ভর করেছিলেন।

কিন্তু এরকম একটা জায়গা যখন তার নোঙর ছিঁড়ে বেরিয়ে যায়, তখনই তার পরিবর্তে 'স্বপ্নলোক' ভেসে ওঠে। কথাটা স্ববিরোধী শোনালেও সত্যি যে এই 'স্বপ্নলোক' বরং বাস্তবের চেয়ে অনেক বেশি স্থির, স্থায়ী। অন্তত যতক্ষণ না তার অন্তর্লীন আদর্শ বাতিল হয়ে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের মূল আদর্শের কি উপযোগিতা আছে আজও ? আজকের পরিস্থিতিতে কি সেগুলো গ্রাহ্য, ব্যবহার্য ? যে-কর্মধারার সূচনা করে যান তিনি, তা কি আজও প্রাসঙ্গিক ? যেসব প্রতিষ্ঠান উনি গড়ে তুলেছিলেন, আজকের জগতে কি তাদের কোনো মূল্য আছে ? এই ধরনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমরা সামনে রাখতে পারি। যদি এর সবক'টির উত্তর হয় 'না', তা হলে আমাদের এই স্বপ্ন মুছে ফেলে সব ভুলে যাওয়াই ভালো।

আমার মতে রবীন্দ্রনাথের বোধ আর ভাবনা অনেকাংশে আজও সত্য। যাকে তিনি মূল সমস্যা হিসেবে শনাক্ত করেন এবং তার প্রতিকারের যে-পথ ওঁর প্রত্যক্ষণে ধরা দেয়, আজও সেসব অলীক হয়ে যায় নি। পার্থক্য যদি বা কিছু ঘটেও থাকে তা কেবল কর্মপদ্ধতির কিছু অনুপুঙ্খে। সত্যিই হয়তো বিগত পঞ্চাশ বছরে জগৎ অনেকটাই বদলে গেছে এবং তার সঙ্গে বদলে গেছে শান্তিনিকেতনও। শান্তিনিকেতনের নিসর্গপটও পালটে গেছে : ঊষর, রিক্ত রূপ হারিয়ে, আজ তা ভরে উঠেছে সবুজে আর বর্ণবিভায়। এই কয়েক প্রজন্মে, মানুষও গেছে পালটে— বদলেছে এমন-কি, গ্রামের আদিবাসীরাও, যাঁদের মনের প্রসাদ ও সারল্য একদা মনে হয়েছিল অপরিবর্তনীয়। কিন্তু আমাদের জীবনের গুণ আর লাবণ্য বিবর্ধনের প্রয়োজন তো আজও রয়েছে। সে কাজ

হয়তো বর্তমান সময়ে আরও সুসাধ্য ; কারণ এ যুগের মানুষ সেকালের তুলনায় সামাজিক সংস্কার বা বিধিনিষেধের শৃঙ্খল থেকে ঢের বেশি মুক্ত হয়ে উঠছেন। আজ হয়তো রবীন্দ্রনাথের মতো মহীরুহ ব্যক্তিত্ব আমাদের মাঝখানে নেই, কিন্তু তাঁর চিন্তাভাবনার ওপর ভর করে দাঁড়ালে কাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় পরিপ্রেক্ষিত পেয়ে যাব আমরা। এভাবেই তো পরম্পরা গড়ে ওঠে। হয়তো রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো কর্মপদ্ধতি একটু বেশি ব্যক্তিনির্ভর, রোম্যান্টিক, আর জীবনের ইতর বাস্তবতার সংস্পর্শহীন ; কিন্তু তার বিকল্প তো আমরা খুঁজে নিতেই পারি। তাঁর শিক্ষাদর্শন থেকে হয়তো এমন নানান প্রকল্প উঠে আসে, যা উনি নিজেও স্পষ্ট রূপায়ণ করে যেতে পারেন নি। কিন্তু সেটাও তো আমরাই করতে পারি আজ।

মূলগত প্রশ্নটি তবু থেকেই যায়। নিজেদেরকে যে-প্রশ্নটা করা প্রয়োজন তা হল : 'এ প্রতিষ্ঠান কি সেই ল্যাবরেটরি হয়ে উঠতে পারে, যা এই দেশকে উজ্জীবনের পথনির্দেশ দেবে, যা সঞ্চার করবে প্রকর্ষের বোধ ? মানুষের মনুষ্যত্ব অনাহত রাখার কোনো এক পন্থা— তা সে যত সামান্যভাবেই হোক— কি এই প্রতিষ্ঠান দেখাতে পারবে ?' যদি তা সম্ভব হয়, তা হলে শিল্পকলা এই প্রতিষ্ঠানে আজকের তুলনায় আরও বৃহৎ, আরও কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করতে বাধ্য। কারণ পূর্বনির্মিত সমাধান দাক্ষিণ্য সহকারে বিতরণ করে মানুষের সমস্যার তো মীমাংসা হয় না ! তার পথ একটাই : মানুষের মধ্যে যে সৃষ্টিশীল সামর্থ্য নিহিত আছে, তার উন্মেষ ঘটানো। আর এটা যখন ঘটে, তার দৃষ্টির দিগন্তই পালটে যায়।

সৃষ্টিশীল কাজের এই গুরুত্ব নিয়ে আজ আর বিশেষ মতান্তর নেই। ব্যক্তিত্বের সম্প্রসারণে আর পরিশীলনে এ ধরনের কাজ যে অনুঘটকের (ক্যাটালিস্ট) ভূমিকা পালন করে— এই সত্যটা আন্তর্জাতিক শিক্ষাবিজ্ঞানী মহল মেনে নিয়েছেন। এটা বিশেষভাবে মানছেন তাঁরাই, যাঁরা শিক্ষার বড়ো অবদান নিয়ে— অর্থাৎ ব্যক্তির রূপান্তর বা মুক্তি সাধনে শিক্ষার ভূমিকা নিয়ে— চর্চা করছেন। শিক্ষার তো আবার অন্যতর কার্যকারিতাও আছে। সেসব ক্ষেত্রেও— যেমন, প্রত্যক্ষণের আর স্নায়ুতন্ত্রের নৈপুণ্য বিবর্ধনে— এই সৃষ্টিশীল কাজের ভূমিকা কম নয়। এই কারণে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নানান ধরনের আর্টস্ প্রোগ্রাম বা শিল্পচর্চার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ফলবান করে তোলবার জন্যে এই সৃষ্টিশীল কাজকর্মের পরিধি ক্রমাগত বাড়িয়ে যেতে হয়, তার মূল অংশটিকে কেন্দ্রে রেখে। এই যে কেন্দ্রীয় অংশ, এর শিল্পগত মান উঁচু হওয়াও আবশ্যিক ; আবার এতে প্রকৃত সংবেদনশীল গুণী মানুষদের শামিল করাও জরুরি। আর ঠিক এই ব্যাপারটা শান্তিনিকেতনে বিশের ও তিরিশের দশকে ঘটতে পেরেছিল বলেই তখন এই ধরনের কর্মসূচী এত সার্থক হয়। এমন-কি আজও শান্তিনিকেতনে শিল্পচর্চার এই কেন্দ্রীয় অংশটির— কী চিত্রকলার, কী ভাস্কর্যের, কী সংগীতের, কী নৃত্যের— গুণগত মান যথেষ্ট উঁচু। হয়তো অভাব ঘটছে ব্যাপনের (diffusion) ; পারস্পরিক সংযোগের, দেওয়া-নেওয়ার। বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় আগের মতোই রীতিপদ্ধতিহীন স্বতঃস্ফূর্ততায় আর ব্যক্তিগত উদ্যোগে ওই ব্যাপন ও সংযোগের প্রক্রিয়া সচল হবে— এতটা প্রত্যাশা ঠিক বাস্তবও নয়, সংগতও নয়। আজকে তার জন্যে সচেতন কর্মসূচি রূপায়ণের প্রয়োজন।

কাজের শ্রেণীবিভাগ তো হয়েই আছে ; রবীন্দ্রনাথ আর নন্দবাবুর প্রভাবে যে-কাজকর্মের সূত্রপাত হয় তার পরিধিও যথেষ্ট বিস্তৃত। তার মধ্যে পড়ে এইসব কাজ :

১. পরিবেশের সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ;
২. কমিউনিটি বা কৌমের সাধারণ্যে শিল্পকলার প্রসার ;
৩. চারু ও কারু -শিল্পে বা ডিজাইন রচনায় কৌমের দক্ষতা যাতে বাড়ে সে ব্যাপারে উৎসাহ সৃষ্টি ;
৪. পরিশীলিত সৌন্দর্যবোধের আবহাওয়া তৈরি ;
৫. চারু ও কারু -শিল্পে পেশাদারি কর্মসূচি গ্রহণ ;
৬. শিল্পকলা ও তৎসংক্রান্ত বিষয়ে পঠনপাঠন আর গবেষণার কর্মসূচি ;
৭. কলাবিদ্যার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ-সৃষ্টির কর্মসূচি।

শান্তিনিকেতনে শিল্পকলার ভূমিকা

এই প্রকল্পকে সার্থক করে তুলতে নীচের এই কার্যক্রম আমাদের প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করবে :

১. বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি সমিতি গড়া কাম্য যার কাজ হবে পরিবেশ উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ -এর উদ্দেশ্যে সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনা তৈরি করা। এই সমিতি সরেজমিন সমীক্ষা আর তদন্তের মারফত এ-ব্যাপারে নানান বিকল্প পথেরও সন্ধান করবে। বিশেষজ্ঞরা এই প্রক্রিয়ায় শামিল হলে সাধারণ মানুষ পরিবেশ-পরিকল্পনার নানা সমস্যা বিষয়ে ক্রমে ক্রমে ওয়াকিবহাল হয়ে উঠবেন।

২. শিল্পকলা/ডিজাইন-এর সুপরিকল্পিত প্রদর্শনীর কর্মসূচি রূপায়ণ (যাতে শিল্পকলাকে পৌঁছে দেওয়া যায় বৌমের সাধারণ্যে)। এই কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে চালানোর জন্যে কলাভবনে একটি বিশেষ সেল গড়ে তুলতে হবে যেখানে প্রদর্শনীর পক্ষে প্রয়োজনীয় উপকরণ সমাহৃত থাকবে।

৩. সাধারণ্যের জন্যে স্বল্পমেয়াদি কারু/শিল্প/ডিজাইন শিক্ষার কর্মসূচি প্রবর্তন। এই কর্মসূচি এমনভাবে পরিকল্পিত হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে তা জনবোধ্যও হয় এবং তার ধারাবাহিকতাও অক্ষুণ্ণ থাকে। শিল্পশিক্ষার এই কর্মসূচি বিশ্ববিদ্যালয়ের লাগাতার শিক্ষাপ্রকল্পের (কনটিনিউইং এডুকেশন) এক বিশেষ গুরুত্বময় অংশ হয়ে উঠতে পারে। শিল্পশিক্ষার প্রাথমিক বইপত্র ছাপানো আর যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জাম তৈরিও এই কর্মসূচির অঙ্গ।

৪. শান্তিনিকেতন-সমাজের যৌথ-উৎসবের পরিকল্পনা এমন হওয়া চাই, যেন রুচির প্রত্যাশিত মান থেকে তা নেমে না যায়। উৎসব বা পার্বণ এই রুচিময় আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারে, যদি এসব অনুষ্ঠানে গোটা সমাজ যোগ দেয় পরিশীলিতের, দীক্ষিতের মানসিকতা নিয়ে। ব্যর্থ হয়ে যাবে এ প্রচেষ্টা, যদি এইসব উৎসব ধ্বস্ত হতে থাকে শহুরে বিনোদন-সন্ধানীর ভিড়ে। কাণ্ডজ্ঞানের কাজ হবে, ট্যুরিস্টদের বিনোদনের জন্যে পৃথক উৎসব বা মেলার আয়োজন করা। তা করতে পারলে, শান্তিনিকেতন-সমাজের এই একান্ত ঘরোয়া উৎসব আয়তনেও ছোটো রাখা যায়, তার নিভৃতিও অপরাহত রাখা যায়। ট্যুরিস্টদের জন্যে বিলেতের শেক্সপিয়র ফেস্টিভ্যালের আদলে বা দেশবিদেশের ক্র্যাফট-বাজারের মতন লোকশিল্প লোকসংগীতের উৎসব বা হস্তশিল্পের মেলার কথাও ভাবা যায়, এই সূত্রে। অবশ্য এসব কিছুর মান রাখতে হবে উঁচু। এই ধরনের মেলা আর উৎসব থেকে যথেষ্ট টাকাকড়িও তোলা যেতে পারে।

৫. শিল্পশিক্ষার যেসব কর্মসূচি বর্তমানে চলিত আছে, সেগুলোকে আরও সমৃদ্ধ, আরও শক্তিশালী করতে হবে। প্রবর্তন করতে হবে নাট্য আর ডিজাইন শিক্ষার নতুন কর্মসূচি। নাট্য আর ডিজাইন : এই দুই কলাবিদ্যা শিল্পকে যেমন বিশেষজ্ঞের মিনার থেকে সাধারণ্যের সজীব স্তরে ছড়িয়ে দেয়, তেমন সৃষ্টি করে পারস্পরিক বিনিময়ের, ঘাতপ্রতিঘাতের এক প্রক্রিয়া। ডিজাইনের যে-কর্মসূচির কথা ভাবছি, তার পরিধির মধ্যে পড়বে— নিত্যব্যবহারের জিনিসপত্র স্থাপত্য পরিবেশ গৃহসজ্জা নাটমঞ্চ আর সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান।

৬. দেশজ চারু ও কারু -কলা সম্পর্কে গভীরতর গবেষণার আয়োজন আর এবিষয়ে যা-কিছু তথ্য পাওয়া যায়, তা সংকলনের, বর্গীকরণের ও পরিবেশনের ব্যবস্থা। এর পাশাপাশি শুরু করা চাই গ্রামসমাজের সঙ্গে দেওয়া-নেওয়া আর সংযোগের কর্মসূচি।

৭. শান্তিনিকেতন-সমাজের প্রত্যেক সদস্যকে— তা তিনি বিজ্ঞান দর্শন কৃষি বা যে-কোনো বিদ্যার চর্চা করুন-না কেন— শিল্পকলায় আগ্রহী করে তুলতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনিও নিজের অধিগত বিদ্যার বিশিষ্ট দিক এবং সে বিদ্যার সৃষ্টিমুখী সম্ভাবনা বিষয়ে আর-সকলকে অবহিত করবেন।

এত যে বিস্তর কথায় এই কর্মসূচি পেশ করলাম, এতে তো মনে হতেই পারে : কাজটা কী প্রকাণ্ড আর কত কঠিন ! কিন্তু একবার এই চেষ্টাটুকু শুরু করলেই বোঝা যাবে, এই কাজ মোটেই তত দুঃসাধ্য নয়। যাই হোক, অন্তত আমাদের মতন জনকয়েক মানুষের পক্ষে— যাদের কাছে শান্তিনিকেতন এখনও এক 'স্বপ্নলোক'— এই চেষ্টার বিকল্প নেই। ঠিকই, রবীন্দ্রনাথ তো আজ আর নেই যে তাঁরই ব্যক্তিত্বের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে আমাদের টেনে এনে শামিল করবেন এক সম্মিলিত কর্মব্রতে। কিন্তু তাঁর নির্দেশিত আদর্শ তো মৃত নয়, সজীব। সজীব বলেই সে আদর্শ আমাদের জাগিয়ে রাখতে সমর্থ। তার ধ্রুব আলোয় আমরা যদি আমাদেরই কাজের এক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারি, তা হলে নিজের জন্যেও কিছু করা হয়, অন্যের জন্যেও কিছু করা হয়।

অনুবাদ : সৌমিক নন্দী মজুমদার

নির্মাণ থেকে বিনির্মাণ

শেফালী মৈত্র

বিদ্বৎসমাজে 'বিনির্মাণ' কথাটা প্রায়ই শোনা যায়। ভারতের দার্শনিক সমাজে অবশ্য বিনির্মাণ নিয়ে চর্চা কমই হয়। তাই দেখে অনেকে এমনও সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান যে ভারতের দার্শনিকরা বড়োই রক্ষণশীল— এইসব নতুন হাওয়া তাঁদের প্রাকার ভেদ করে ঢুকতে পারে না। এখনও তাঁরা আঁকড়ে আছেন পুরোনো যুগকে, যে-যুগকে কোনো এক সময় আধুনিক বলা হত। নবীনরা পরিহাস করেন এইসব জ্ঞানপ্রবর দার্শনিকদের। উচ্চগ্রামে ঘোষণা করেন তাঁরা : পৃথিবী আধুনিক যুগ থেকে আধুনিকোত্তর যুগের দিকে ছুটে চলেছে। এই পরিবর্তনে আজ যাঁরা শামিল না হবেন, কাল তাঁদের এই পরিবর্তন গ্রাস করবে। যেমন, তা গ্রাস করছে দুনিয়ার অনেক অচলায়তনকে। উদাহরণস্বরূপ প্রথমেই বলা হয়, রুশ দেশের কথা ; মনে করিয়ে দেওয়া হয়, এখন খুলে-দেওয়ার যুগ, কোনো ভৌগোলিক এলাকাকে আগলে আলাদা করে রাখলে চলবে না : বার্লিন প্রাচীর ভেঙে গেছে ; চীনের প্রাচীর চিচিং ফাঁকের মন্ত্রে বিদেশী পুঁজির কাছে খুলছে। অতএব, মননের রাজ্যেই বা কেন চিন্তার গোঁড়ামি থাকবে ? রাজনীতি বা অর্থনীতিতে যেসব ধারণাকে মৌলিক ও অকাট্য মনে হত, এক-এক করে সবগুলোই যখন চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে ভেঙে পড়ছে তখন কোথাও কোনো মৌলিক ধারণা থাকা কি সম্ভব ? না কি থাকতে দেওয়া উচিত ? যা-কিছু চিরকালীন বা ধ্রুব বলে মনে হত, তাও চোখের সামনে নস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে ; যেন এমন হওয়ারই কথা ছিল, না হওয়াই ছিল অস্বাভাবিক। এত দিন দর্শনের জগতে এই ঘটনা না ঘটবার দুটো কারণ দেখানো হয়। প্রথম কারণ : স্বার্থবুদ্ধি। আর দ্বিতীয় কারণ : সেই স্বার্থবুদ্ধিকে প্রচ্ছন্ন রাখার যৌক্তিক ক্ষমতা। নবীনদের অভিযোগ : বিভিন্ন সময়ে আধুনিকতার নামে দার্শনিকরা নানা মৌল ধারণার বনিয়াদ (ফাউন্ডেশনাল কনসেপচুয়াল স্কিম) নির্মাণ করেছেন আর সেইসঙ্গে যুক্তির জাল বিস্তার করে লোককে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন। লোককে বোঝানো হয়েছে যে এই ধারণাগুলি পরম সত্য, মৌল, অপরিহার্য। নব্যরা মনে করেন, এই ভাঁওতাটুকু বুঝে নিতে পারলে আমাদের প্রধান কাজ হবে এইসব মৌল ধারণার প্রবক্তাদের চিহ্নিত করা এবং জনসাধারণকে দেখিয়ে দেওয়া যে প্রতিটি তথাকথিত মৌল ধারণাই আসলে নির্মিত ধারণা— কোনো একটি প্রেক্ষিতে, কোনো একটা প্রয়োজনে, এই ধারণা তৈরি করা হয়েছে। এই ধারণাগুলির কোনোটিই নিত্য, ধ্রুব, সংশয়াতীত নয়। সব অচলায়তনেরই আবেষ্টন (ক্লোজার) মনগড়া— তা সে আবেষ্টন ধারণারই হোক, আদর্শেরই হোক অথবা তন্ত্রেরই হোক। এ থেকে বেরুতে হবে। আর এর থেকে বেরুতে গেলে চাই : বিনির্মাণ। অর্থাৎ নির্মিত ধারণাগুলিকে এক-এক করে বিনির্মাণ করতে হবে। তখনই দেখানো যাবে এই ধারণাগুলির কোনোটিই শাশ্বত ছিল না, প্রতিটি ধারণার [illegible]ভাব ছিল, এবং প্রতিটি ধারণাই ধ্বংসযোগ্য। কোনো ধারণার জন্ম একটা স্বয়ম্ভূ ঘটনা নয়। কোনো একটা প্রেক্ষিত থেকে, কোনো একটা অনুষঙ্গে, ধারণার জন্ম হয়। সেই কারণেই বিনির্মাণবাদীরা মনে করেন, কোনো ধারণাই কালাতীত নয়। পরিপ্রেক্ষিত বদল আর অনুষঙ্গ বদলের সঙ্গে ধারণার বদল হয়। ধারণা মাত্রেরই একটা পরিপ্রেক্ষিত আছে, আছে প্রাসঙ্গিকতা। এর কোনোটাই কালাতীত হতে পারে না।

নির্মাণ থেকে বিনির্মাণে যাওয়াই যদি আধুনিকোত্তরতার অন্যতম প্রকল্প হয়ে থাকে তবে এই প্রকল্পে অধিকাংশ দার্শনিকের উৎসাহ না থাকাটাই স্বাভাবিক। তাঁরা মনে করতেই পারেন যে এই প্রকল্পে শামিল হওয়া মানেই নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারা। তার চেয়ে আধুনিক থাকাই মঙ্গল, আধুনিকোত্তর হয়ে কাজ নেই। এই নব্যবিপ্লবের অনেক উৎসাহী প্রবক্তা প্রথাগত দর্শনচর্চার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। তাঁদের পরামর্শ হল বিশ্ববিদ্যালয়গলিতে দর্শনচর্চাকে পাঠ্যক্রমে স্বতন্ত্র স্থান না দেওয়া। দর্শনের পঠনপাঠন অন্য কোনো শাস্ত্রের

অনুগামী হয়ে বড়ো জোর টিঁকে থাকতে পারে। তার মানে অবশ্য এই নয় যে দর্শনের পঠনপাঠন এযাবৎ অপরাপর শাস্ত্র থেকে বিযুক্ত ছিল। ভাষাদর্শন, সমাজদর্শন, ইতিহাসদর্শন, ন্যায়দর্শনের মতো সমাসবদ্ধ নামপদ আমরা অনেকদিন যাবৎই ব্যবহার করে আসছি। তা হলে কি ধরে নেওয়া যায় না যে ইতিপূর্বেও দর্শনশাস্ত্র অন্যান্য শাস্ত্রের সহকারী হয়েই সহযোগিতা করে এসেছে ? বিনির্মাণের প্রবক্তারা বলবেন, দর্শনের সহযোগিতা ছিল খানিক দূরে থেকে, ভিন্ন আসনে বসে। এই সহযোগিতা সহগামিতাও নয়, অনুগামিতাও নয়। দার্শনিক যেন অপরাপর শাস্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, একটা উচ্চাসন থেকে সহযোগিতার হাত বাড়ান— অনেকটা ঠিক সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির মতো। প্রতিটি শাস্ত্রবিদ যেন এক-একটি হাইকোর্ট। স্বক্ষেত্রে অতি নিপুণভাবে তাঁরা নিজস্ব প্রক্রিয়ায় কতগুলি সিদ্ধান্তে এসে যান। পরবর্তী পর্যায়ে দার্শনিকের কাজ হল এই প্রক্রিয়ার উপযোগিতা, প্রাসঙ্গিকতা, বৈধতা বিচার করা আর সেইসঙ্গে এঁদের সিদ্ধান্তটিকেও বিচার করা। প্রথম পর্যায়ে প্রতিটি শাস্ত্র তার নিজ নিজ বিচার সেরে নিলে পরবর্তী পর্যায়ে দার্শনিক তাঁর বিচারে বসেন ; এই কারণেই দার্শনিকের বিচারকে বলা যায়, মেটাডিস্‌কোর্স বা অতিবর্তী বিচার। অর্থাৎ দর্শনের যেন নিজস্ব কোনো বিচার নেই ; অপরের গবেষণার সিদ্ধান্তের ওপর খবরদারি করাই তার কাজ। এ-হেন শ্রমবণ্টন ভারি অন্যায় মনে হতে পারে। কেউ ভাবতেই পারেন : আমার শাস্ত্র সম্বন্ধে আমি যতটা জানি একজন দার্শনিক তার চেয়ে বেশি জানেন কি ? উত্তরে বলতে হয়, কোনো একটি শাস্ত্র সম্বন্ধে দার্শনিক কখনোই বেশি জানেন না— দার্শনিকের কারবার ওই 'জানা' ক্রিয়াটাকে নিয়ে। দার্শনিক যেসব বিষয় নিয়ে চর্চা করেন তার একটা মুখ্য বিষয় হল জ্ঞানতত্ত্ব বা এপিস্টিমোলজি। সহজ কথায় বলতে গেলে দার্শনিক চর্চা করেন জ্ঞান সংশয় বিশ্বাসের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে, এদের স্বরূপ এবং লক্ষণ নিয়ে। দর্শনচর্চার এই ব্যাখ্যান শোনার পরেও বিস্ময় থেকে যেতে পারে। অভিযোগের সুরে প্রশ্ন করাই যায়, 'তা বলে দার্শনিককে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির সঙ্গে তুলনা করা হবে ? দার্শনিক কি দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ? তাঁর নিজের কি ভুল হতে পারে না ? তাঁর বিচার কে করবে ?' দার্শনিক অবশ্যই ভুল করতে পারেন, মানুষ মাত্রেই ভুল করতে পারে, তবে দর্শনতত্ত্বে ভুল থাকলে চলবে না। দার্শনিকের তত্ত্ব কতগুলি স্বতঃসিদ্ধ আশ্রয়-বাক্যের ওপর ভর করে গড়ে উঠবে। অন্তত আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের জনক আমাদের তা-ই শিখিয়েছেন। সেই কবে সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়াতে ফরাসি দার্শনিক দেকার্ত আমাদের শিখিয়েছেন যে আমরা যদি সতর্ক থাকি এবং ঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করি তা হলে আমরা সংশয়াতীত সত্যজ্ঞান অবশ্যই পাব। শুধু তাই নয়, কোন্ জ্ঞান সংশয়াতীত তা চিনে নেওয়ার লক্ষণও দেকার্ত আমাদের চিনিয়ে দিলেন। কোনো একটি জ্ঞান সংশয়াতীত হওয়া মানে এই নয় যে জ্ঞাতার মনে কোনো সংশয় নেই। সেভাবে দেখলে দেখা যাবে কোনো মৌলবাদীই তাঁর জ্ঞান সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করেন না। সংশয়াতীত জ্ঞান হবে যুক্তির দ্বারা সমর্থিত আর তাই অকাট্য ; তার বিপক্ষে কখনোই কোনো বিরুদ্ধ যুক্তি দাঁড় করানো যাবে না। এখানেই বিনির্মাণবাদীদের আপত্তি। তাঁরা যেহেতু জ্ঞানের আপেক্ষিকতা স্বীকার করেন, সেহেতু, কোনোরকম বনিয়াদি বা ফাউন্ডেশনাল জ্ঞান তাঁরা মানতে রাজি নন। সবরকম বনিয়াদি তত্ত্ব এবং তথ্যকে তাঁরা সন্দেহের চোখে দেখেন এবং চেষ্টা করেন বিনির্মাণ করতে। দার্শনিকরা নানা ধরনের বনিয়াদি ধারণাকে সমালোচনা করেছেন : কান্ট আক্রমণ করেছেন দেকার্তকে, হ্বিট্‌গেনস্টাইন বর্জন করেছেন ফ্রেগের অনেক কথা। এইসব বাদপ্রতিবাদকে বিনির্মাণবাদীরা দেখেন ঘরোয়া কোঁদল হিসেবে। সত্যিকারের ঘর ভেঙে বেরিয়ে আসার ঝুঁকি নিয়ে এঁরা পরস্পরের সমালোচনা করছেন বলে তাঁরা মনে করেন না। এঁদের ঘর যুক্তির নিগড়ে বেষ্টিত। এঁরা যাই বলেন যুক্তি দিয়ে বলেন এবং মনে করেন যুক্তির সমর্থন থাকা মানে তা সত্য হওয়া। আমরা এখানে পাশ্চাত্য দর্শনের যে-ভাবনার ইতিহাস সাজাবার চেষ্টা করব তা বিশ্লেষণাত্মক যুক্তিবাদী দার্শনিকদের ভাবনার ইতিহাসের খণ্ডাংশ। এই আলোচনার ভেতর দিয়ে বোঝা যাবে কীভাবে যুক্তির সাহায্যে পূর্বপক্ষ খণ্ডন করা হয়েছে এবং যুক্তি দিয়েই কীভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করা হয়েছে। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি বার বার ঘটায় বিনির্মাণবাদীরা জোর পাচ্ছেন— ঢালাও ফতোয়া তাঁরা জারি করছেন সব বনিয়াদী ভারনার বিরুদ্ধে। যুক্তিবাদী দর্শন দেকার্ত থেকে শুরু করে এই শতকের শেষ

অবধি অনেক ঘাত-প্রতিঘাত অনেক আত্মসমালোচনার মধ্যে দিয়ে এসেছে, তা সত্ত্বেও তা বিনির্মাণবাদীদের আস্থাভাজন হতে পারছে না, কেন পারছে না, তা দেখা এই আলোচনার অন্যতম উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল দেখানো যে যুক্তিবাদী দর্শনের বিরোধিতা করলেও বিনির্মাণবাদীরা দর্শনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারছেন না। আমরা দেখব কেমন করে বনিয়াদি দর্শনের একটা পাল্টা প্রতিক্রিয়া বিনির্মাণের রূপ নিয়েছে। ইতিহাসের একটা একরৈখিক চালে কখনোই দর্শনভাবনা নির্মাণ থেকে বিনির্মাণে এসে পৌঁছোয় নি— ঠিক যেমনটি এই লেখায় হয়তো আভাস দেওয়া হচ্ছে। নানা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চাপের ভেতর দিয়ে এই চারশো বছরের ইতিহাস গড়ে উঠেছে। আমরা খুব মোটা দাগে এখানে নির্মাণ থেকে বিনির্মাণের যাত্রাপথ অনুসরণ করার চেষ্টা করছি। দেকার্তকে যেহেতু আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের জনক মনে করা হয় সেহেতু আধুনিকোত্তরদের মনোযোগ ওঁর ওপরেই বেশি।

দেকার্ত মনে করতেন, সংশয়াতীত জ্ঞানের পরিচয় হবে তার স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতা। তিনি এও মনে করতেন যে এই স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতার নিরিখেই সব জ্ঞানের গ্রহণযোগ্যতা বিচার করা যাবে। দেকার্ত তাঁর 'ডিস্‌কোর্স অন মেথড' বইটিতে সংশয়াতীত জ্ঞানের ওপর জ্ঞানের ইমারত গড়ার পন্থা-পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন। জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনাকে দর্শনের কেন্দ্রে এনে দেকার্ত পাশ্চাত্য দর্শনের অভিমুখ বদলে দিলেন। এযাবৎ দর্শনের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল পরাবিদ্যা বা মেটাফিজিক্‌স। দার্শনিক সরাসরি জানতে চাইতেন, জগতের স্বরূপ কী? ঈশ্বরের সঙ্গে সৃষ্টির সম্পর্ক কী? ইত্যাদি। দেকার্ত বললেন, আমাদের শুরু করতে হবে 'আমি কী জানতে পারি?'— এই প্রশ্ন দিয়ে। আমাদের দেখতে হবে সংশয়াতীতভাবে আমি কী জানি? আমরা যা সংশয়াতীতভাবে জানি তা-ই হবে সত্য। সত্য জ্ঞানই হবে জগতের সঠিক প্রতিবিম্ব। তিনি মনে করলেন, মানুষের মন যেন জগতের আয়না, তাকে যত ঘসে মেজে স্বচ্ছ করা যাবে জগতের প্রতিবিম্ব তত নিখুঁত হয়ে তাতে ধরা পড়বে। দেকার্তের মতে মনকে স্বচ্ছ করার উপায় হল বিশুদ্ধ যুক্তির ওপর নির্ভর করা। প্রত্যক্ষণ, আবেগ, ইত্যাদির প্রভাবে আমাদের মন আবিল হতে পারে। আমাদের জ্ঞান যত যুক্তিনির্ভর হবে ততই তা স্বচ্ছ আর স্পষ্ট হবে; ততই জগৎকে আমরা সঠিকভাবে বুঝতে পারব। দেকার্ত মনে করতেন, স্বচ্ছ ও স্পষ্ট জ্ঞান আমাদের হতে পারে। যাতে মানুষের স্বচ্ছ ও স্পষ্ট জ্ঞান হতে পারে তার জন্য ঈশ্বর নানাভাবে মানুষকে সাহায্য করেছেন। প্রথমত, ঈশ্বর মানুষকে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ধারণার অধিকারী হওয়ার ক্ষমতা দিয়েছেন কারণ ঈশ্বর দয়ালু। দ্বিতীয়ত ঈশ্বর যেহেতু প্রতারক নন উনি আমাদের স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ধারণার অনুরূপ জগৎ সৃষ্টি করেছেন; জগতের মধ্যে কোনো অন্তর্নিহিত অস্পষ্টতা (ইনট্রিন্‌সিক ভেগনেস)-কে ঈশ্বর ঠাঁই দেন নি। তা ছাড়া, আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে আমাদের বোধের অনধিগম্য করে ঈশ্বর কখনোই জগৎ সৃষ্টি করবেন না। ঈশ্বরের এত সাহায্য সত্ত্বেও কিন্তু একটা সমস্যা থেকে যায়। জগৎকে সচরাচর আমরা অভিজ্ঞতা দিয়েই জেনে থাকি আর দেকার্তের মতে আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান নির্ভরযোগ্য নয়। তা হলে কি পার্থিব জগৎকে আমরা প্রত্যক্ষণ দিয়ে জানি না, যুক্তি দিয়ে জানি? দেকার্তের মতে জগতের মধ্যে তার মূল সূত্র গাণিতিক পরিভাষায় বিধৃত হয়ে আছে আর ঈশ্বর আমাদের যে যৌক্তিক ক্ষমতা দিয়েছেন তা দিয়ে আমরা এই রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারি।

তা হলে দেখা যাচ্ছে মানুষের স্বচ্ছ ও স্পষ্ট জ্ঞান হওয়ার জন্য যেসব শর্ত বা কারণাংশ মুখ্যত প্রয়োজন তা দেকার্তের মতে ঈশ্বর আমাদের মঞ্জুর করেই রেখেছেন। উনি আমাদের সঠিকভাবে জানার ক্ষমতা দিয়েছেন আর সেইসঙ্গে জগৎকে সঠিকভাবে জানার উপযোগী করে গড়েছেন। দেকার্তের এই ব্যাখ্যার দরুন জ্ঞানতত্ত্বের চর্চা দর্শনের কেন্দ্রস্থলে এল। জ্ঞানতত্ত্বের চর্চা প্রাধান্য পেলেও মানুষ জ্ঞাতা হিসেবে সম্পূর্ণ স্বনির্ভর হয় নি। স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ধারণা পাওয়ার জন্য পরোক্ষভাবে তাকে ঈশ্বরের কৃপার ওপর ভরসা করতে হল। দেকার্তের কথা যদি ঠিক হয়, তা হলে ঈশ্বরের দয়ার ওপর মানুষের স্বচ্ছ ও স্পষ্ট জ্ঞানলাভ নির্ভর করে।

দেকার্তের প্রায় একশো বছর পরে কান্ট জ্ঞানতত্ত্বকে দর্শনের মুখ্য আলোচনার বিষয় হিসেবে স্বীকার করেও মানুষকে তার অপেক্ষাকৃত গৌণ ভূমিকা থেকে মুখ্য ভূমিকায় নিয়ে এলেন। কান্ট মনে করলেন, মানুষের

সক্রিয় অবদান ছাড়া কোনো জ্ঞানই সম্ভব নয়। দেকার্তের জ্ঞাতার মতো মানুষ শুধু সত্য উন্মোচন করে চলে না, বিম্বের মতো মানুষ জ্ঞানের নিষ্ক্রিয় গ্রহীতা নয়, মানুষ সক্রিয়ভাবে জগৎকে বুদ্ধিগ্রাহ্য করে তোলে। মানুষের দেওয়া বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যার ফলে জগতের প্রকৃত স্বরূপ বিকৃত হতে পারে, তবু মানুষ নিরুপায় ; তাকে তার মতো করে জগৎকে বুঝে নিতে হয়। জগতের প্রকৃত স্বরূপ কী, আমরা জানি না, কোনোদিন জানতে পারবও না। আমরা চিরকাল জগৎকে জানব আমাদের আরোপিত কতগুলো গঠন ও বিন্যাসের মধ্যে দিয়ে। জগৎকে ব্যাখ্যা করা বা বোঝার জন্য আমরা আমাদের মতো করে যুক্তি দিয়ে আমাদের জগৎকে বিন্যস্ত করি। এই বিন্যাস কিন্তু আমাদের কল্পনার ফসল নয়। কবিকে সমর্থন করে কান্ট কখনোই বলবেন না 'আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, /চুনি উঠল রাঙা হয়ে।' কান্ট মনে করেন, আমাদের সমস্ত জ্ঞানজ ক্রিয়ায় যুক্তি জাল বিস্তার করে আছে। ফলে আমাদের যুক্তি জগতের বিভিন্নতাকে নির্দিষ্ট কতগুলি বিন্যাসে, নির্দিষ্ট নিয়মমাফিক সাজায়। আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়-উপাত্ত থেকে পাওয়া বৈচিত্র্যকে দেশ ও কালের মাত্রা দিয়ে বিন্যস্ত করি (দেশ ও কাল আমরা পাই ইনটুইশন থেকে)। এরপর এক-এক করে পরিমাণ, গুণ, সম্বন্ধ ইত্যাদি কন্‌সেপ্ট বা ধারণা প্রয়োগ করে অভিজ্ঞতালব্ধ জগৎকে বুঝি। যে ধারণা বা কন্‌সেপ্ট (কান্টের পরিভাষায় এগুলি ক্যাটিগরি) প্রয়োগ করে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতাকে বুঝি সে ধারণাগুলি কিন্তু আমরা অভিজ্ঞতা থেকে পাই না, এগুলি অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ ধারণা। মানুষ বৌদ্ধিক জীব হওয়ার দরুন এই ধারণাগুলি তার থাকে। কান্ট মনে করেন, এই ধারণাগুলির সঙ্গে অ্যারিস্টটলের লজিকের ফর্মের আশ্চর্য মিল রয়েছে। তাঁর মতে প্রতিটি লজিকের ফর্মের অনুরূপ আমাদের একটি করে ধারণা আছে আর প্রতিটি ধারণার অনুরূপ একটি করে লজিকের ফর্ম রয়েছে। কান্টের কাছে একটিই লজিক গ্রাহ্য ছিল : অ্যারিস্টটলের দ্বিমাত্রিক ধ্রুপদী লজিক। দ্বিমাত্রিক, কারণ এই লজিকে একটি বচনের দুটিমাত্র সম্ভাব্য মাত্রা থাকতে পারে— ঘটনাটি হয় সত্য নয় মিথ্যা হবে, এই দুটি কোটি ছাড়া আর কোনো যৌক্তিক দেশ নেই। কাজেই জগতের বিভিন্নতাকে যখন বিভিন্ন ক্যাটিগরিতে সাজানো হবে তখন স্পষ্ট সাদাকালো রেখা দিয়ে বর্গ-বিভাজনের সীমা টানতে হবে। অর্থাৎ যে-কোনো বস্তু 'ক' সম্বন্ধে আমরা বলতে পারি যে 'ক'-এর স্থান হয় 'ঙ'-এর কোটিতে অথবা 'ঙ'-এর বিপরীত কোটিতে। এই দুই-এর মাঝামাঝি আর তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম কোনো স্থান নেই। এই জায়গায় ন্যায়বৈশেষিকদের সঙ্গে কান্টের একটা সাদৃশ্য রয়েছে। বৈশেষিকরা যখন পদার্থ বিচার করেন তখন সাংকর্য স্বীকার করেন না। (সাংকর্য স্বীকার করলে গোত্ব ও অশ্বত্বের একত্র সমাবেশ স্বীকার করতে হয়। একটা সাম্প্রতিক উদাহরণ নিলে বলতে হয় : বাঘ [টাইগার] আর সিংহ [লাইয়ন] মিলে যখন টাইগন জন্মায় তখন তা একটা নতুন জাতি বলে গণ্য হওয়া উচিত— দুই সামান্যের বা জাতির সমাবেশ এটা নয়। কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে কোনো কোনো দার্শনিক 'ভেগ অবজেক্ট' স্বীকার করেন, এই অবজেক্ট-কে কোনো একটি বিশেষ কোটিতে ফেলা যায় না। দুই কোটির সীমাবর্তী অঞ্চলে তাদের অধিষ্ঠান। আলংকারিক অর্থে বলা যায়, এদের অবস্থান সাদা আর কালোর মধ্যবর্তী এক ধূসর অঞ্চলে। এমন একটা ধূসর অঞ্চল মানলে দ্বিমাত্রিক লজিকের অসুবিধে হয়।)

লজিকের নিয়ম আর আমাদের জগৎকে সাজানোর নিয়মের মধ্যে কান্ট কোনো পার্থক্য দেখতে পান না। লজিকের নিয়মানুসারে আমরা আমাদের জগৎকে বিন্যস্ত করি ওই লজিকানুগ কতগুলি ক্যাটিগরি দিয়ে। শুধু তা-ই নয়, এই ক্যাটিগরি বাদ দিয়ে আমরা চিন্তা করতে পারি না। যাতে কোনো ক্যাটিগরি লাগে না— যার গুণ নেই, পরিমাণ নেই, সম্বন্ধ নেই— এমন কিছুর কথা আমরা চিন্তা করব কী করে ? তাকে বুঝব কী করে ? তাই কান্ট বলেন, 'উই নিড্ ক্যাটিগরিজ টু মেক্ দ্য এক্সপিরিয়ন্স অব অ্যান অবজেক্ট থিংকেবল্'।

বিভিন্ন ক্যাটিগরির মধ্যে কান্ট একটি অন্তর্লীন সম্পর্ক বা ইন্টার্নাল রিলেশন স্বীকার করেন। এই অন্তর্লীন সম্পর্কযুক্ত ক্যাটিগরিমণ্ডলকে কান্ট ক্যাটিগরিয়াল ফ্রেমওয়ার্ক বা ক্যাটিগরি-কাঠামো বলেন। এই ক্যাটিগরি বা তাদের অন্তর্লীন সম্পর্ক কোনোটাই আমরা অভিজ্ঞতা থেকে পাই না, পাই অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষভাবে। এগুলি সর্বজনীন ও আবশ্যিক ক্যাটিগরি। কান্ট মনে করেন যে অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ ধারণামাত্রেই আবশ্যিক এবং

ক্ষেত্রনির্বিশেষে সত্য ; প্রতিতুলনায় বলা যায়, অভিজ্ঞতা-নির্ভর ধারণামাত্রেই সম্ভাব্য ; এগুলি ক্ষেত্রবিশেষে সত্য বা মিথ্যা হতে পারে। অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ ধারণা এবং অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ ধারণার মধ্যে প্রথম পার্থক্য করেছিলেন লাইব্‌নিট্‌স ও পরে ডেভিড হিউম। সাম্প্রতিককালে, অবশ্য, এই দ্বিভাজনের কথা বললেই কান্টের প্রসঙ্গ চলে আসে।

পাশ্চাত্য দর্শনের আধুনিক পর্ব শুরু হয় দেকার্ত আর কান্টের অবদান দিয়ে। আধুনিকরা মনে করলেন, সচেতনভাবে দর্শনচর্চার একটা নির্দিষ্ট অন্বেষণের পদ্ধতি ছকে দেওয়াই দার্শনিকের কাজ। এই অন্বেষণের গোড়াতে থাকবে সংশয়, তার পর এক-এক করে প্রতিটি বিষয়ের কার্যকারণ বুঝতে হবে ; বুঝে নিয়ে প্রতি বিষয়ের একটা যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিতে হবে।এক কথায়, কোনো সিদ্ধান্তে আসার আগে গোটা বিষয়টাকে যাচাই করে নেওয়া চাই। সুকুমার রায়ের মতো 'গোড়ায় তবে দেখতে হবে কোত্থেকে আর কী করে'! আধুনিকদের শত্রু দুজন : যারা অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে কখনোই প্রশ্ন তোলে না ; আর যারা প্রশ্ন করা থেকে কখনোই বিরত হয় না। অর্থাৎ 'ডগ্‌ম্যাটিকরা' আর 'স্কেপ্‌টিকরা'। এই দুই বিপরীত চাপ সামলাতে গিয়ে আধুনিকদের মনে হল দর্শনচর্চা আরম্ভ করতে হবে জিজ্ঞাসা দিয়ে আর শেষ করতে হবে সমে এসে। সব সংশয়ের নিরসন হলেই একমাত্র ইতি টানা যাবে, তার আগে নয়। এমন পরিকল্পনার কথা ভাবতে ভালোই লাগে ; তবু প্রশ্ন থেকেই যায়—এটা কি সম্ভব ? যাঁরা সংশয়ের চূড়ান্ত নিরসনের কথা বলেন, তাঁরা উত্তর খোঁজেন কোনো আধিভৌতিক স্তরে অথবা কোনো অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ যুক্তির কোটিতে। বিনির্মাণবাদীরা মনে করেন, সত্যিই কোনো তত্ত্বের বা ব্যাখ্যার এমন চূড়ান্ত বৈধতা (লেজিটিমেশন) থাকতে পারে না। দার্শনিকরা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়ার নামে একটা গল্প ফাঁদেন আর সেই গল্পের বৈধতা জোগাতে গিয়ে আর-এক গল্প ফাঁদেন। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পটি একটি মেটান্যারেটিভ। বিনির্মাণবাদীরা মনে করেন, মেটান্যারেটিভ দেওয়ার চেষ্টা যাঁরা করেন তাঁরা আধুনিক আর এই দ্বিতীয় স্তরের ব্যাখ্যার ফাঁকি যাঁরা ধরিয়ে দিতে চান তাঁরা আধুনিকোত্তর বা পোস্ট মডার্ন।

আমরা বলছিলাম কান্টের কথা। কান্টের অব্যবহিত পরে এল একটা কান্ট-বিরোধী প্রকৃতিবাদী ঢেউ। ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে একদল মনোবিজ্ঞানী প্রস্তাব করলেন যে দার্শনিকদের মূল আলোচ্য বিষয় যদি হয়ে থাকে 'নিশ্চিত জ্ঞান পাওয়া সম্ভব কিনা' বা 'নিশ্চিত জ্ঞান পাওয়ার উপায় কী', তা হলে দার্শনিকরা অনধিকারচর্চা করছেন। এ সমস্যার সমাধানের জন্য দার্শনিকের দ্বারস্থ হয়ে লাভ নেই ; এর জন্য আসতে হবে মনোবিজ্ঞানী বা নৃতাত্ত্বিকের কাছে, তাঁরাই এইসব প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে পারেন। কান্ট যে এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন না, তা নয়। তবু তিনি মনে করতেন যে তাঁর জ্ঞানজ প্রক্রিয়ার আলোচনা আদ্যন্ত দার্শনিক আলোচনা, তার সঙ্গে মনস্তত্ত্বের আদৌ যোগ নেই। মনোবিজ্ঞানের কোটিতে জ্ঞানজ প্রক্রিয়ার আলোচনা চলে গেলে আমাদের নিজ নিজ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার চর্চা করা ছাড়া উপায় থাকবে না, তখন দেশকালের প্রেক্ষিতে জ্ঞানের ব্যাখ্যা দিতে হয়। জ্ঞানজ প্রক্রিয়ার কোনো অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ সামান্য ধর্ম আছে বলে আর দাবি করা যাবে না। তার মানে, আবারও, আমরা কী জানি ? এবং কীভাবে জানি ? এইসব প্রশ্নের আবশ্যিক নিশ্চিত ব্যাখ্যা পাব না। কতগুলো তাৎক্ষণিক আর আপেক্ষিক ব্যাখ্যা নিয়ে আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে অনেকে কান্টের বিরোধিতা করলেও ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে আবার কান্টচর্চার ঝোঁক ফিরে এল। ১৮৬৫ সালে অটো লাইবম্যান ধুয়ো তুললেন 'কান্টে ফিরে চলো' (ব্যাক্ টু কান্ট)। কান্টের দর্শনে কেউই কোনোদিন পুরোপুরি ফিরে যান নি। তাঁর দর্শনের কয়েকটি মৌলিক ধারণা, বিতর্কিত হলেও, আজও আমাদের ভাবনায় রয়ে গেছে— বিশেষ করে, তিনি যেভাবে আমাদের অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ বিচার আর অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ বিচারের মধ্যে পার্থক্য করতে শিখিয়েছেন বা যেভাবে বলেছেন কোনো জ্ঞানই মনন-নিরপেক্ষ নয়।

কান্টের 'ক্রিটিক অব পিওর রিজ্‌ন' লেখা হয় ১৭৮১ সালে, তার প্রায় একশত বছর পরে ১৮৭৯ সালে জার্মান দার্শনিক গট্‌লব ফ্রেগে তাঁর 'বেগ্রিফস্‌স্ক্রিফ্ট' লেখেন। সাম্প্রতিক পাশ্চাত্য দর্শনের রূপকারদের মধ্যে

ফ্রেগে অন্যতম। দেকার্ত বা কান্টের মতোই গুরুত্বপূর্ণ তাঁর অবদান। দেকার্তকে যেমন আধুনিক দর্শনের জনক বলা হয়, তেমনি ফ্রেগেকে মনে করা হয় ইঙ্গ-মার্কিন বিশ্লেষণাত্মক দর্শনের জনক। কী করে তিনি জার্মান মুলুকে বসে, জার্মান ভাষায় দর্শনচর্চা করে ইংরেজিভাষী দার্শনিকদের প্রভাবিত করলেন তার ইতিহাস কিঞ্চিৎ জটিল। ফ্রেগের দর্শনভাবনার নিয়তি বিচিত্র ও আপাতবিরোধী। তাঁর দর্শনভাবনা যুগপৎ উপেক্ষিত এবং প্রভাবশালী। উপেক্ষিত, কারণ তাঁর অনেক লেখার জন্য তিনি প্রকাশক পান নি ; নিজের দেশে তাঁর লেখার তীব্র সমালোচনা তাঁকে সহ্য করতে হয়, আর এইসব মিলিত কারণেই হয়তো তিনি কর্মজীবনে উন্নতি করতে পারেন নি। ব্রিটিশ দর্শনমহলে ফ্রেগে পরিচিতি লাভ করেন রাসেলের মধ্যস্থতায়। তাঁর লেখা পড়ে সবিশেষ উত্তেজিত হয়ে রাসেল তাঁকে চিঠি লেখেন ১৯০২ সালে। তারপর চিঠির মাধ্যমে চলে তাঁদের লজিকের নানা কূট প্রশ্নের চুলচেরা বিচার। রাসেল তাঁর 'প্রিন্‌সিপিয়া ম্যাথেমাটিকা' গ্রন্থে ১৯১০ সালে লেখেন 'লজিকের সব প্রশ্নে আমরা মুখ্যত ফ্রেগের কাছে ঋণী' ; এর পর তাঁর ছাত্র হিবট্‌গেন্‌স্টাইনকে লজিক শেখার জন্য তিনি ফ্রেগের কাছে পাঠান। হিবট্‌গেন্‌স্টাইন অনেক জায়গায় ফ্রেগের কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন, যেখানে করেন নি সেখানেও ফ্রেগের প্রভাব সুস্পষ্ট। শুধু হিবট্‌গেন্‌স্টাইন আর রাসেল নয়, এঁদের মাধ্যমে বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে আজ অবধি ব্রিটেন ও আমেরিকার দার্শনিকদের ওপর ফ্রেগে প্রভাব বিস্তার করেই চলেছেন।

ছাত্রাবস্থায় ফ্রেগের মুখ্য অনুশীলনের বিষয় ছিল গণিত, গৌণ বিষয় হিসেবে তিনি রসায়ন ও দর্শনের পাঠ নেন। গণিতের পথ দিয়েই তাঁর দর্শনে প্রবেশ। গণিতের জন্য তিনি খুঁজছিলেন একটা অকাট্য ভিত্তি বা চূড়ান্ত বনিয়াদ। তাঁর মনে হল গণিত তার নিজের চূড়ান্ত বনিয়াদ জোগাতে পারবে না ; এর জন্য লজিকের সাহায্য লাগবে। সে-যুগে মূলত অ্যারিস্টটলের লজিকের প্রচলন ছিল। ফ্রেগে দেখলেন, এই লজিক দিয়ে তাঁর কাজ চলবে না ; কারণ অ্যারিস্টটলের লজিকে যে-জাতীয় অনুমানের পদ্ধতি স্বীকার করা হয়েছে তা আমাদের দৈনন্দিন লৌকিক প্রয়োগের উপযোগী হলেও গণিতের পক্ষে অনুপযোগী। অ্যারিস্টটলের লজিকে কথ্য ভাষার প্রভাব অত্যন্ত বেশি। কথ্য ভাষায় আমরা যেভাবে শব্দবিন্যাস করি বা শব্দবিন্যাসের যেসব বিধি ব্যবহার করি সেইসব বিধি-ই যেন লজিকের নিয়মের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। ফ্রেগে মনে করলেন যে কথ্য ভাষার কাঠামো আর গণিতের কাঠামো এক নয় ; তাই তাঁকে তৈরি করতে হল তাঁর নিজের লজিক আর সেইসঙ্গে ফ্রেগে দিলেন এই লজিকের উপযোগী একটি স্ক্রিপ্‌ট্ বা লিপি। এই স্ক্রিপ্‌টের উদ্দেশ্য আমাদের বিভিন্ন ধারণা লিপিবদ্ধ করা। এই লিপির পারিভাষিক নাম জার্মান ভাষায় 'বেগ্রিফস্‌শ্রিফ্‌ট' যার ইংরেজি অনুবাদ করা হয়েছে 'কন্‌সেপচুয়াল স্ক্রিপ্‌ট্'। ফ্রেগে 'কন্‌সেপ্ট' শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে 'থট' শব্দটি ব্যবহার করেন। এটিও একটি পারিভাষিক শব্দ যা মনস্তত্ত্বের পরিচিত 'থট' থেকে পৃথক। ফ্রেগের 'থট' বিশুদ্ধ মনন ভিন্ন কিছু নয়, এর কোনো মানসিক অনুষঙ্গ নেই। তিনি মনে করতেন, লজিকের সম্পর্ক থটের ফর্ম বা স্বরূপের সঙ্গে। থটের ফর্ম থেকে আমরা সব সত্যের বিধি 'লজ় অব্ ট্রুথ', পেয়ে যাই এবং এই বিধি সর্বত্র প্রযোজ্য (ইউনিভার্সালি অ্যাপ্লিকেবল্)। ফ্রেগে বলেন, সব বিজ্ঞানই সত্যের অন্বেষী কিন্তু লজিক সত্যের নিয়ামক-বিধির অন্বেষী। একবার এই সত্যের বিধি বুঝে নিতে পারলে বিভিন্ন প্রসঙ্গ আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে। যেমন, আমরা বুঝব কী করে একটি ভাষার অর্থনির্ণয় করতে হয়। বুঝে যাব, ভাষাগত অর্থ (সেন্স) ও ভাষাগত নির্দেশ (রেফারেন্স)-এর পার্থক্য কী, তাদের মধ্যে সম্পর্কই বা কী ? বুঝব, বিভিন্ন ধারণার অন্তর্লীন সম্পর্ক ; যেমন, সত্যের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক এবং উভয়ের সঙ্গে আবশ্যিকতার সম্পর্ক ইত্যাদি। এইভাবে আমরা যুগপৎ গণিতের ভিত্তি কী তা বুঝব আর জগতের স্বরূপ কী তা-ও বুঝতে পারব।

ফ্রেগেই প্রথম ভাষাচর্চার দিকে দর্শনের অভিমুখ ঘুরিয়ে দিলেন। একদিক থেকে দেখতে গেলে এই পদক্ষেপ যুগান্তকারী ঠিকই ; আবার আর-এক দিক থেকে দেখলে বোঝা যায়, দর্শনের মূল প্রশ্ন একই থেকে যাচ্ছে ; 'স্বচ্ছ আর স্পষ্টভাবে আমরা কী জানতে পারি ?' আধুনিক যুগের প্রথম পর্বে দেকার্ত আর কান্ট মনে করেছিলেন, এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে জ্ঞানের স্বরূপ বিচার করে ; ফ্রেগে এবং ফ্রেগের পরের দার্শনিকরা মনে করলেন,

এই প্রশ্নের উত্তর ভাষার দিকে মনোযোগ দিলে পাওয়া যাবে। কারণ ভাষা যুগপৎ মন ও বাহ্য জগতের প্রতিবিম্ব। ভাষারূপী প্রতিবিম্ব সত্যনিষ্ঠ হোক বা না-হোক, ভাষার ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। ভাষার মাধ্যমেই একমাত্র জগৎকে জানার চেষ্টা করা যায়। দেকার্ত বলেছিলেন, মানুষের মন জগতের প্রতিবিম্ব। মানুষের মন বড়ো রহস্যময়। এ নিয়ে ঠিক সাবলীলভাবে সর্বজনগ্রাহ্য দর্শন হয় না। প্রতিবিম্বের উপমা বাজায় রেখে, ভাষাকে মনের স্থলাভিষিক্ত করে আলোচনাটাকে যেন লোকচক্ষুর অন্তরাল থেকে লোকচক্ষুর সম্মুখে আনা গেল— চলে আসা হল মনোজগৎ থেকে ভাষার রাজ্যে। এতে করে পরিবেশ বদল হলেও পরিস্থিতির বড়ো একটা বদল হয় নি। কান্ট জগৎটাকে দেখছিলেন ধারণার ভেতর দিয়ে। ফ্রেগে, রাসেল, গোড়ার দিকের হ্বিট্‌গেনস্টাইন মনে করছেন, ভাষাই কনসেপ্টের বাহক ; ফলে, এঁরা জগৎটাকে দেখছেন বা চিনছেন ভাষার ভেতর দিয়ে। তলিয়ে দেখতে গেলে এঁরা সকলেই কন্‌সেপ্টের জাল বিস্তার করে জগৎটাকে বুঝবার চেষ্টা করছেন। জালের উপমাকে আর একটু এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। জালের ফুটোগুলো যদি গোল-গোল হয় তা হলে তার ভেতর দিয়ে জগৎ একরকম দেখাবে ; আর যদি বরফির মতো হয় আর-এক রকম দেখাবে জগৎ। দেকার্ত, কান্ট, ফ্রেগে এবং এই ঘরানার পূর্ববর্তী দার্শনিকরা— যেমন, প্লেটো অ্যারিস্টটল— ও সাম্প্রতিক কালের নব্য কান্টপন্থীরা— যেমন, কার্নাপ, স্ট্রসন, —নানারকম যুক্তির জাল বা কন্‌সেপ্টের জালের কথা বলেছেন। কেউ বলতেই পারেন, দেশ ও কালকে নিউটনের মতো করে ভাবতে হবে ; কেউ বলতে পারেন, আইন্‌স্টাইনের মতো করে দেশকালকে সাপেক্ষধর্মী ভাবতে হবে। কল্পনার ডানা মেললে অনেক কিছুই সম্ভব মনে হতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে : এদের মধ্যে কোন্ ব্যাখ্যাটা ঠিক ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত ব্যাখ্যা মিলবে না। গোড়ায় আমরা প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলাম দার্শনিক আমাদের দেখাবেন কী করে ব্যাখ্যার সমে এসে থামতে হয় ; অথচ বাস্তবে আমরা যেন এক অনন্ত অনেকান্তের অবস্থা স্বীকার করে যাচ্ছি। এই পরিস্থিতি থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার বহুল প্রচলিত একটা সমাধান হল : আপাত স্বরূপ আর প্রকৃত স্বরূপের মধ্যে প্রভেদ টেনে বলা, যেখানে আপাত বিভেদ চোখে পড়ে সেখানে আদতে পার্থক্য নেই। ঠিক যেমন একটি বাক্যকে আপাতদৃষ্টিতে যে-জাতীয় মনে হয় প্রকৃতপক্ষে বাক্যটি সে-জাতীয় না-ও হতে পারে, একটি বাক্যের আকার দেখে মনে হতে পারে তা প্রশ্নসূচক অথচ তলিয়ে দেখলে হয়তো দেখা যাবে তা বর্ণনাত্মক বাক্য।

হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন তাঁর 'ট্র্যাক্‌টেটাস' (১৯২১) গ্রন্থে খুব জোর দিয়ে এই মত পোষণ করেন। তিনি বলেন, সব ভাষার একই যৌক্তিক আকার বা লজিকাল ফর্ম— সেটা প্রচলিত ভাষাই হোক, বা কাল্পনিক কোনো ভাষাই হোক। কারণ তাঁর মতে ভাষা জগতের প্রত্যয়িত প্রতিচ্ছবি— সে জগৎ বাস্তব জগৎই হোক, বা সম্ভাব্য জগৎই হোক। সব জগতের উপাদান এক ; উপাদান বিন্যাসের নিয়মও এক। জগতের প্রতিটি উপাদানের নিজস্ব ধর্ম আছে, যার দ্বারা পূর্ব-নির্ধারিত হয়ে থাকে কোন্ উপাদানের সঙ্গে কোন্ উপাদান যুক্ত হবে। যেমন : যে-উপাদানের রঙ আছে তা যুক্ত হতে পারে দেশ-যুক্ত উপাদানের সঙ্গে ; সুর-যুক্ত উপাদানের সঙ্গে নয়। কোনো বাস্তব বা কল্পিত জগতে কখনোই আমরা এমন উপাদানের সংযোজন পেতে পারি না, যার ফলে আমরা পেয়ে যাব 'লাল গানে নীল সুর হাসি হাসি গন্ধ'। হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন বলবেন, এমন জগৎ কল্পনা করারও প্রসঙ্গ ওঠে না ; কারণ এমন জগৎ সম্ভবপর নয়। সব জগতের একই ফর্ম। হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইনের মতে ফর্ম হল গঠন বা স্ট্রাক্‌চরের সম্ভাবনা ('ফর্ম ইজ দ্য পসিবিলিটি অব স্ট্রাক্‌চর') আর গঠন বা স্ট্রাক্‌চর হল ফর্মের নিদর্শন (স্ট্রাকচর ইজ্ দ্য অ্যাক্‌চুয়ালাইজেশন অব ফর্ম')। একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটাকে আর-একটু স্পষ্ট করা যায় : দুটো বাক্য তুলনা করা যাক : 'রাম যদুকে মেরেছে' আর 'যদু রামকে মেরেছে'। হ্বিট্‌গেনস্টাইন বলবেন, দুটো বাক্যের ফর্ম এক। দুটিতেই একটি কর্তা, একটি কর্ম ও একটি ক্রিয়াপদ আছে ; অথচ বাক্য দুটির স্ট্র্যাক্‌চর ভিন্ন, একটিতে রাম কর্তা, অন্যটিতে যদু কর্তা। হ্বিট্‌গেনস্টাইন যখন বলেন, বাস্তব জগৎ আর সম্ভাব্য জগতের যৌক্তিক ফর্ম এক, তখন দুটি জগৎ হুবহু এক তা বলছেন না। ফর্ম এক হয়েও স্ট্রাক্‌চর ভিন্ন হতে পারে। এর সঙ্গে আমাদের চিন্তার বা কল্পনার সীমাবদ্ধতার কোনো সম্পর্ক নেই— এমন জগৎ হতে পারে না যেখানে

লাল গানে নীল সুর লাগে। এখানে কান্টের সঙ্গে হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইনের মতপার্থক্য লক্ষণীয়। কান্ট বলবেন, জগতের প্রকৃত স্বরূপ আমর' কখনোই জানি না, জানতেও পারব না। আমরা আমাদের চিন্তার কাঠামোর কথা বলতে পারি— সেই কাঠামো অপরিবর্তনীয়। আমাদের চিন্তার কাঠামোর মধ্যে দিয়ে আমরা জগতের স্বরূপ বুঝবার চেষ্টা করি কিন্তু আমাদের এই বোঝাটাই ঠিক কিনা আমরা জানতে পারি না। অন্য পক্ষে, হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন বলছেন, জগতের যে গঠন, সেই গঠনই আমাদের ভাষারও গঠন এবং আমাদের চিন্তারও গঠন। জগৎ, ভাষা ও মননের সাযুজ্যের কথা বলে অনেককে সন্তুষ্ট করতে পারলেও সন্দেহবাদীদের সন্তুষ্ট করা যাবে না। জগৎ, ভাষা আর মনন এক সূত্রে গাঁথা রয়েছে এবং তিনেরই গঠন এক বললেই সন্দেহবাদীরা তা মেনে নেবেন না, প্রমাণ চাইবেন। হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন নিজেও এই মত বেশি দিন মানতে পারেন নি। তিনি হাড়ে হাড়ে টের পেলেন যে সকলের চিন্তার কাঠামো এক নয়। এমন কি, এক ভাষায় কথা বললেও একের ভাষা অপরে বুঝতে পারে না। ভিয়েনা থেকে যুদ্ধের পরে ইংল্যান্ডে এসে তাঁর এই তিক্ত অভিজ্ঞতা হল ; তাঁর অন্যতম জীবনীকার রে মঙ্ক, ব্রিটেনপ্রবাসী হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইনের এই তিক্ত অভিজ্ঞতার অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য ছবি তুলে ধরেছেন।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে গিয়ে ১৯৩০ সাল নাগাদ হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন বলতে আরম্ভ করলেন, সব কথারই একটা উপযুক্ত অনুষঙ্গ আছে, কোনো কথারই অনুষঙ্গ-নিরপেক্ষ অর্থ নেই। এই জাতীয় কথা আমরা এর আগে ফ্রেগের অনুষঙ্গ-ধারণা বা কনটেক্সট প্রিন্সিপ্‌ল-এর মধ্যে পেয়েছি। গোড়ার দিকে হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইনও এই মত পোষণ করতেন। ফ্রেগে-হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইনের অনুষঙ্গ-ধারণা খুব সীমিত ছিল। তাঁদের বক্তব্য ছিল, একটি পদের স্বতন্ত্রভাবে কোনো অর্থ নেই ; একমাত্র বাক্যের অনুষঙ্গে পদ তার অর্থ খুঁজে পায়। 'অনুষঙ্গ' বলতে কেবল এইটুকুই বোঝাতেন তাঁরা। 'ট্র্যাক্‌টেটাস' লেখার পরে হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইনের ধারণা পাল্টাতে থাকে। তিনি মনে করতে শুরু করেন, অর্থ-সঞ্চারের ন্যূনতম বাহন বাক্য হতে পারে না, বাক্যেরও অনুষঙ্গ জানতে হবে। প্রতিটি বাক্যকে আমাদের সমগ্র যাপনের প্রেক্ষাপটে (ফর্ম অব লাইফ-এ) রেখে বুঝতে হবে। সমগ্র যাপনের প্রেক্ষাপটের ধারণা হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইনের একান্ত নিজস্ব। 'যাপনের প্রেক্ষাপট' একটা বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেন তিনি। যাপনের প্রেক্ষাপট আমাদের সমস্ত চিন্তা, ভাবনা ও ভাষাপ্রয়োগের প্রেক্ষাপট হিসেবে কাজ করে, প্রতিটি প্রয়োগকে এর নিরিখে বুঝতে হয়। অনেকটা ঠিক প্রতিমার চালচিত্রের মতো।

যাপনের প্রেক্ষাপটের উল্লেখ করা মানেই ভাষার প্রয়োগের দিকে তাকানো ; ফ্রেগের মতো ভাষার প্রয়োগ-নিরপেক্ষ ধারণার দিকে তাকানো নয় ; ভাষার ব্যবহারের দিকে নজর দেওয়া। হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন তাঁর 'ইন্‌ভেস্টিগেশন্‌স'-এ বললেন, ভাষার প্রয়োগ-নিরপেক্ষ কোনো স্বরূপ নেই। নানা প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে ভাষা তৈরি হয়। ফলে দেকার্তের মতো কোনো স্বতঃসিদ্ধ সত্য বা ফ্রেগে-কান্টের মতো কোনো অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ ধারণা থাকতে পারে না। ভাষা নিয়ে এই নতুন ভাবনাচিন্তার কথা হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন তাঁর কেম্ব্রিজের ছাত্রদের ক্লাসে বলেন, ইতস্তত লিখেও রাখেন, কিন্তু ছাপতে রাজি হন নি। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর ছাত্রছাত্রীরা এইসব লেখা অনুবাদ করেন ও ছাপেন। তাঁর এই মরণোত্তর প্রকাশনের মধ্যে প্রথম মুদ্রিত হয় 'ইন্‌ভেস্টিগেশন্‌স' (১৯৫৩)। এখানে যেন আমরা এক নতুন হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইনকে পাই। তিনি এখন বলেন, ভাষাকে ঘসে মেজে একটা স্পষ্ট বিম্বের রূপ দেওয়া যাবে না ; ভাষা আর ভাষার ব্যবহার ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ব্যবহার-নিরপেক্ষ কোনো লজিক আমাদের নেই ; লজিকের নিয়মাবলি তৈরি হয় ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে। ভাষা আমরা কেমন করে ব্যবহার করি বোঝাতে গিয়ে উনি খেলার উপমার সাহায্য নিয়েছেন। প্রতিটি খেলার নিয়মাবলি আলাদা, খেলার প্রয়োজনে নিয়ম তৈরি হয়। প্রতিটি পৃথক পৃথক খেলার এমন কোনো সামান্য ধর্ম নেই যে-ধর্ম সম্বন্ধে আমরা বলতে পারি 'নিত্যত্বে সতি অনেক-সমবেতত্বম্'। খেলার সাধারণ ধর্ম একমাত্র প্রয়োগ থেকেই উঠে আসে। আর প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত হয় যাপনের প্রেক্ষাপট দিয়ে।

'ইনভেস্টিগেশনস'-এর এইসব চিন্তাভাবনা বিশেষ সাড়া জাগায়। মনে করা হয়, স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ধারণার সৌধ নির্মাণের দায়িত্ব থেকে দর্শন মুক্তি পেল, মুক্তি পেল দেকার্ত, কান্ট, ফ্রেগে, রাসেল, 'ট্র্যাক্‌টেটাস'-এর

পরম্পরা থেকে। হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইনের 'ট্র্যাক্‌টেটাস' এই শতকের প্রথমার্ধে যে-প্রভাব বিস্তার করে ঠিক সেই একই প্রভাব বিস্তার করে তাঁর 'ইনভেস্টিগেশন্‌স', এই শতকের শেষে। এই দুই পর্যায়ের হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইনকে পৃথক করা হয় যথাক্রমে নবীন হ্বিট্‌গেনস্টাইন্‌ আর প্রবীণ হ্বিট্‌গেনস্টাইন বলে। প্রবীণ হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইনের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে দার্শনিকরা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বর্জন করে তথ্যের বর্ণনার দিকে মনোযোগী হলেন। দর্শনের এই পরিবর্তিত কর্মসূচির সমর্থনে তাঁরা হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইনের উক্তি কাজে লাগান : 'ব্যাখ্যা চেয়ো না, বর্ণনা করো'। ওঁর প্রভাবে অনুষঙ্গের ধারণাও একটা বিশেষ দ্যোতনা পেল। দর্শনিকরা এখন বলতে আরম্ভ করলেন অনুষঙ্গ-নিরপেক্ষভাবে কিছু বলা যাবে না, আমরা যাই বুঝি-না কেন ; তা বুঝতে হবে একটা বিশেষ অনুষঙ্গে।

'ইনভেস্টিগেশন্‌স' গ্রন্থে, হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন যখন যাপনের প্রেক্ষাপটের কথা বলেন, তখন একক ব্যক্তির স্বতন্ত্র যাপনের কথা বলেন না, গোষ্ঠীর যাপনের কথা বলেন। অনেক ভাষ্যকার মনে করেন, উনি সমগ্র মানুষের যাপনের কথা বলছেন। এই যাপনের একটা ইতিহাস যেমন আছে তেমনি স্থায়িত্বও আছে। লৌকিক ভাষার মধ্যে লোকব্যবহার বিধৃত থাকার মানে এই নয় যে তার ব্যাকরণ, তার লজিক বা সাধারণভাবে ভাষাব্যবহারের নিয়মাবলি মুহুর্মুহু পালটাতে থাকে। সব নিয়ম আবশ্যিক আর সব নিয়ম আপতিক— এই দুই বিকল্প ছাড়াও একটা তৃতীয় বিকল্প থাকতে পারে। হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন যেন বলতে চাইছেন যে অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ আবশ্যিকতা আর অভিজ্ঞতা-নির্ভর আবশ্যিকতার মাঝামাঝি আর-একটা জায়গা আছে, যেখানে আমরা এমন কিছু সংজ্ঞা পাই, যা আবশ্যিক অথচ আত্যন্তিক আবশ্যিক নয়। যাপনের পরিপ্রেক্ষিত থেকে কথা বলা মানে এমন একটা জায়গা থেকে কথা বলা। যেমন : আমরা যখন যাপনের পরিপ্রেক্ষিতে স্থির করতে চাই 'সংজ্ঞা' শব্দের সংজ্ঞা কী ? বা 'ব্যাখ্যা' বলতে আমরা কী বুঝি ? কিংবা লজিক বা গণিতের বিচার করার সময় আমরা যে শর্ত ব্যবহার করি তা নিরূপিত হয় কী করে ? তখন এই প্রশ্নগুলির উত্তর এইসব শব্দের (যেমন, 'সংজ্ঞা', 'ব্যাখ্যা', 'শর্ত') প্রয়োগ থেকে পাই। ধরা যাক, কেউ জানতে চায়, 'সংজ্ঞা' কাকে বলে, তখন হ্বিটগেন্‌স্টাইনের পরামর্শ হবে, লৌকিক ব্যবহারে এই শব্দটির ব্যবহার লক্ষ করো। 'সংজ্ঞা' শব্দটি বিভিন্ন জনে বিভিন্ন স্থলে কী অর্থে ব্যবহার করে দেখে আমরা শব্দটির মানে জেনে যাব। এই পরামর্শ পেয়ে কেউ দমে যেতে পারে। তার মনে হতে পারে, প্রয়োগের কোনো ঠিক আছে নাকি ? নানা জনের নানা প্রয়োগ, কার কথা মানব ? কোন্‌ প্রয়োগটা ঠিক ? এমন কোনো লক্ষণ দেওয়া যাবে না, যা তার আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত লক্ষণ। হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন বলছেন, আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত লক্ষণ কোনো ক্ষেত্রেই দেওয়া সম্ভব নয়। বিভিন্ন ব্যবহারের মধ্যে আমরা 'সাদৃশ্য' পেতে পারি 'সাজাত্য' পেতে পারি না। ঠিক যেমন একটি পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে সাদৃশ্য থাকে, কেনো সামান্য ধর্ম থাকে না, তেমনি 'সংজ্ঞা' শব্দের বিভিন্ন প্রয়োগের মধ্যে আমরা সাদৃশ্য খুঁজে পাব তার বেশি কিছু নয়। এই সাদৃশ্যকে বলা যায় ফ্যামিলি রিজেমব্লেন্স বা পরিবারোপম সাদৃশ্য।

'যাপনের প্রেক্ষাপট' হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইনের পরের দিকের লেখায় একটা মুখ্য ও মৌলিক স্থান অধিকার করে থাকলেও তিনি কোথাও এই ধারণার বিস্তারিত ব্যাখ্যা বা উদাহরণ দেন নি। মোটামুটিভাবে বলা যায়, আমরা যে-কথাগুলি বিশ্বাস করি, যে-আদর্শ মেনে চলি, যেভাবে কাজ করি, তার একটা নকশা বা প্যাটার্ন আছে। ইতিহাসের কোনো এক সময়ে দাঁড়িয়ে মানুষ সেই সময়ের জ্ঞানের, বিশ্বাসের, মূল্যবোধের সমন্বিত নকশা সম্বন্ধে সচেতন থাকে— এই সচেতনতা সে তার যাপনের ভেতর দিয়ে, তার পরিবেশ থেকে পেয়ে যায়। এর কোনো ফর্মুলা নেই, এটা কাউকে শেখানো যায় না : যে জানে সে আপনি জানে। এই জানা কোনো একটা বিশেষ ভাষা জানা বা সেই ভাষার ব্যাকরণ জানা নয়। একটা ভাষা জানলেই তার যাপনের পরিমণ্ডল জানা হয়ে যায় না। যে-কারণে হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন বলেন, একটি সিংহ কথা বললেও তার কথা আমরা বুঝব না, কারণ তার যাপনের প্রেক্ষাপট আমাদের অজানা।

হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইনের এই বক্তব্য থেকে মার্কিন দার্শনিক কোয়াইন বিশেষ অনুপ্রেরণা পান। ১৯৫৩ সালে 'ইনভেস্টিগেশন্‌স' প্রকাশিত হয় আর তার পরের বছরেই কোয়াইন তাঁর 'টু ডগ্‌মাজ় অব এম্পিরিসিজ়ম' লিখে

ছোটোখাটো একটা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেন। প্রথম দিকে 'ইনভেস্টিগেশন্‌স'-এর প্রকাশনা তেমন সাড়া জাগাতে পারে নি। বইটা সূত্রাকারে লেখা কয়েকটা বিক্ষিপ্ত বক্তব্যের সংকলন— যার অর্থ উদ্ধার করা কঠিন। মোটামুটি সত্তরের দশকের পরে এটি একটি ক্লাসিকের স্থান পেয়ে যায়। তুলনামূলকভাবে কোয়াইনের লেখা সহজবোধ্য। প্রতিটি বক্তব্য বিশ্লেষণ করে, টুকরো টুকরো যুক্তি দিয়ে তিনি তাঁর আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যান। অনেকেই মনে করেন, সাম্প্রতিককালে মার্কিন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের দার্শনিক মহলে, প্রভাবশালী দার্শনিকদের মধ্যে কোয়াইন অন্যতম প্রধান, পাশাপাশি আরও দুজনকেও তাঁরা প্রাধান্য দেন : রিচার্ড রোরটি আর কোয়াইনের ছাত্র ডোনাল্ড ডেভিড্‌সন। রোরটি মনে করেন যে কোয়াইন আর ডেভিড্‌সন হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইনের বক্তব্যকে তার অনিবার্য সিদ্ধান্তে নিয়ে গেছেন এবং রোরটি তাঁর নিজের কাজকেও সেই একই ঘরানার অন্তর্ভুক্ত করে দেখেন। তিনি মনে করেন এটাই মার্কিন দর্শনের মূল ঘরানা। তিনি এটাকে জন ডিউই -প্রবর্তিত ঘরানা হিসেবে চিহ্নিত করেন।

'টু ডগমাজ্‌...' প্রকাশের মধ্যে দিয়ে কোয়াইন খ্যাতি লাভ করতে শুরু করেন। উনি ওই প্রবন্ধে দাবি করেন, আধুনিক দর্শন কান্টের একটি ভ্রান্ত ধারণার শিকার হয়েছে— আমরা ভুল করে ভাবি যে অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ বচন এবং অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ বচন দুটি ভিন্ন কোটির বচন। আমাদের সব বচনের মধ্যেই কিছু তত্ত্ব ও কিছু ইন্দ্রিয়-উপাত্ত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মিশে থাকে। এই মিশ্রণের কোনো নির্দিষ্ট অনুপাত নেই, কোনো কোনো অংশে তত্ত্বের ভাগ বেশি হতে পারে, কোনোটাতে ইন্দ্রিয়-উপাত্ত বেশি। কোয়াইন মনে করেন, জগতের যে-ব্যাখ্যাই আমরা দিই-না কেন, তা সর্বদাই কোনো বিশেষ পরিপ্রেক্ষিত থেকে দিই। হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইনের মতে পরিপ্রেক্ষিত স্থির হয় যাপনের পরিমণ্ডল দিয়ে আর কোয়াইন বলেন পরিপ্রেক্ষিত স্থির হয় আমাদের 'ওয়েব অব বিলিফ' বা বিশ্বাসের পরিমণ্ডল দিয়ে। মাকড়সার জালের মতো আমাদের প্রতিটি বিশ্বাস অপরাপর বিশ্বাসের সঙ্গে কোনো একটা সম্পর্কের ছকে বাঁধা থাকে। মাকড়সার জালের যেমন একটা কেন্দ্র থাকে আর থাকে একটা প্রান্তিক দেশ যা গাছের ডাল বা অন্য কোনো বস্তুকে ছুঁয়ে থাকে, আমাদের বিশ্বাসের পরিমণ্ডলেও তেমনি একটি কেন্দ্রীয় দেশ আর একটি প্রান্তীয় দেশ আছে— কেন্দ্রে আছে তত্ত্বপ্রধান বিশ্বাস আর প্রান্তে আছে অভিজ্ঞতা-প্রধান বিশ্বাস। প্রান্তীয় বিশ্বাসগুলি সংবেদনাত্মক উদ্দীপকের সঙ্গে কার্য-কারণ সম্পর্কে যুক্ত। যেমন : আমি যখন বলি 'পাঁচ সংখ্যাটি দুই সংখ্যাটির চেয়ে বড়ো', তখন আমি আমার তাত্ত্বিক বিশ্বাসের কথা বলছি আর যখন বলি 'বৃষ্টি পড়ছে' তখন আমি আমার প্রত্যক্ষণের কথা বলি। আরও গভীরে যদি যেতে চাই, যদি জানতে চাই 'সংখ্যা' মানে কী ? বা 'বৃষ্টি' কাকে বলে ? তখন এক-এক জনের বিশ্বাসের পরিমণ্ডল সাপেক্ষে এর উত্তর এক-এক রকম হবে। বিজ্ঞানী তাঁর পরিমণ্ডল থেকে এক রকম উত্তর দেবেন ; দার্শনিক কথা বলবেন, তাঁর নিজস্ব বিশ্বাসের পরিমণ্ডল থেকে ; কোনো আদিম মানুষ আর-এক পরিমণ্ডল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলতে পারেন। কোয়াইন মনে করেন, আধুনিক যুগে আমরা সচরাচর বিজ্ঞানীর বিশ্বাসের পরিমণ্ডলকেই গ্রহণযোগ্য মনে করি। বিশেষত পদার্থবিজ্ঞানীর ব্যাখ্যাকে আমরা নির্ভরযোগ্য মনে করি। আর তাই বিজ্ঞানের ছকে আমরা আমাদের বিশ্বাসের কাঠামোকে গড়ার চেষ্টা করি। সমস্যা হল সব বিজ্ঞানী এক তত্ত্ব স্বীকার করেন না। এর কারণ বোঝাতে গিয়ে কোয়াইন বলছেন যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্পূর্ণত তথ্যের দ্বারা নিরূপিত হয় না— সর্বদাই তথ্যের অকুলান থাকে। এই সমস্যাটাকে উনি বলেন, 'আন্‌ডারডিটারমিনেশন'-এর সমস্যা। এর ফলে নানা বিকল্প ব্যাখ্যার সুযোগ থেকে যায়। একাধিক ব্যাখ্যা যেখানে দেওয়া যায় সেখানে কোনো ব্যাখ্যাই যে ঠিক নয়— এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। অনেক বিকল্প ব্যাখ্যার মধ্যে একটা ব্যাখ্যা আমাদের বেছে নিতে হয়। এই নির্বাচনের পদ্ধতি বা শর্ত নিয়ে সমস্যা দেখা দিতে পারে। সেখানে আমাদের নানা দিক দেখে তুল্য মূল্য বিচার করতে হয়— দেখতে হয় কোন্‌ ব্যাখ্যাটা বেশি ব্যাপক, কোন্‌টা আমাদের অন্যান্য দৃঢ়মূল বিশ্বাসের সঙ্গে বেশি খাপ খায়, কোন্‌টা অপেক্ষাকৃত সরল ইত্যাদি।

একটু ভাবলেই বোঝা যাবে কোয়াইনের এই বক্তব্য স্বীকার করা মানে আপেক্ষিকতার দিকে ঝোঁকা।

হ্বিট্গেনস্টাইনের 'ইনভেস্টিগেশন্স'-এর ভেতর দিয়ে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন একবার আপেক্ষিকতার দিকে ঝুঁকল ; আবশ্যিকতার কোনো দেশকাল-নিরপেক্ষ পরিচয় রইল না— আবশ্যিকতা মাত্রই যাপনের পরিপ্রেক্ষিত-সাপেক্ষ একটা ধারণা হয়ে গেল। এইবার, কোয়াইনের কথা যদি ঠিক হয়, যদি অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ সত্য আর অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ সত্যের বিভাজন বাতিল করতে হয় আর সেইসঙ্গে যদি ধ্রুব সত্য, শাশ্বত সত্য, সামান্য জ্ঞান ইত্যাদি বিজ্ঞানও না দিতে পারে, তা হলে আর পায়ের তলায় মাটি থাকে কই ? থিয়োরির তলায় বনিয়াদ ? সবই হয়ে যায় কোনো-না-কোনো থিয়োরি-সাপেক্ষ বীক্ষণ।

বিনির্মাণবাদীদের এটাই সন্দেহ : শাশ্বত সত্য বলে কিছু নেই, সব সত্যই আপেক্ষিক। তবে তো তাঁদের পূর্বসূরি গ্রিক সফিস্টরা অন্যায় কিছু বলেন নি, যখন তাঁরা বললেন 'হোমো মেন্সুরা'— মানুষই সত্যমিথ্যার মানদণ্ড ঠিক করে। গ্রিক যুগে এই বক্তব্যকে আশ্রয় করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল এক উগ্র ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা। এক শ্রেণী মনে করতে আরম্ভ করল, কোনো যুক্তিই যখন অকাট্য নয়, কোনো আদর্শই যখন শিরোধার্য নয়, কোনো প্রত্যক্ষণই যখন চূড়ান্তভাবে নির্ভরযোগ্য নয়, তখন যা-হোক একটা ব্যাখ্যা দিলেই হয় ; যা-হোক একটা আদর্শ স্বীকার করলে বা না করলে কী এসে যায়। এই কি চিন্তার আসল মুক্তি ? এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের চিন্তার স্বরাজের ধারণা কারো কারো মনে পড়তে পারে। কিন্তু বিনির্মাণবাদীদের চিন্তামুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের চিন্তার স্বরাজের ধারণার তুলনা করা যায় না। কৃষ্ণচন্দ্র আপত্তি করছিলেন নির্বিচার বিদেশী প্রভাবের বিরুদ্ধে ; তিনি চাইতেন, নিজের যাপনের পরিপ্রেক্ষিত থেকে ধ্রুবত্বের অন্বেষণ করতে। তাঁর জেহাদ ছিল চিন্তার দাসত্বের বিরুদ্ধে ; কোনো আবশ্যিক সত্য নেই— এমন কথা তিনি মানতেন না। বিনির্মাণবাদীরা বিনির্মাণকে দেখছেন চিন্তার গণতন্ত্রীকরণের চূড়ান্ত সোপানরূপে। এতে নারীবাদীরা বিশেষ আশান্বিত, তাঁরা বিনির্মাণকে দেখছেন পুরুষশাসিত অচলায়তন থেকে মুক্তি-পাওয়ার হাতিয়ার হিসেবে। দেরিদা মনে করেন, পাশ্চাত্য দর্শনের যুক্তিকেন্দ্রিকতার সঙ্গে পুরুষ-প্রাধান্যের একটা প্রত্যক্ষ যোগ আছে। [১]

আপেক্ষিকতা মানার ফলে যে সমস্যাগুলি মার্কিন দার্শনিকদের সবচেয়ে বেশি ভাবাচ্ছে সেগুলির দিকে এবার তাকানো যাক।

আপেক্ষিকতার মূল সমস্যাকে কোয়াইন অনুবাদের সমস্যা বলে মনে করেন। এই জাতীয় সমস্যার ইঙ্গিত আমরা 'ইনভেস্টিগেশন্স'-এ পাই যখন হ্বিট্গেনস্টাইন বলেন, 'একটি সিংহ কথা বললেও তার কথা আমরা বুঝব না'। কোয়াইন একটি উদাহরণের সাহায্যে সমস্যাটিকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। ধরা যাক, একজন আদিবাসী (যার ভাষা আমরা জানি না) মাঠের মধ্যে একটি সাদা বস্তুর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, 'গাভাগাই' আর একজন ইংরেজিভাষী একই বস্তুর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, 'র‍্যাবিট'। সমস্যা হচ্ছে এরা পরস্পরের কথা বুঝবে কী করে ? এরা কি ধরে নিতে পারে যে তারা একই বস্তুর সম্বন্ধে একই কথা বলছে ? এই সমস্যাটিকে পারিভাষিক শব্দে বলা হয় : দ্য প্রবলেম অব র‍্যাডিকাল ট্র্যানস্লেশন বা নিরালম্ব অনুবাদ। এখানে এমন একটি অনুবাদের পরিবেশের কথা বলা হচ্ছে যেখানে উভয় অনুবাদকারীর কারো কাছেই অনুবাদ-সহায়ক কোনো নিয়মাবলি বা ট্র্যানস্লেশন ম্যানুয়াল নেই, তাদের কোনো দোভাষী নেই, তাদের কোনো অভিধান নেই, তারা একই পরিবেশে মানুষ হয় নি। আপাতদৃষ্টিতে তারা একই বস্তু সম্বন্ধে কথা বলছে মনে হলেও তা জানার কোনো উপায় নেই। 'গাভাগাই' শব্দটি উচ্চারণের দ্বারা একাধিক মানে সূচিত হতে পারে : এর মানে র‍্যাবিটের গায়ের রঙ হতে পারে, একটি বিশেষ বয়সের র‍্যাবিট হতে পারে, গোটা র‍্যাবিটের একটা অংশের কথা বুঝিয়ে থাকতে পারে, ইত্যাদি। তা হলে কি আদিবাসীটির কথা কোনোদিনই আমরা অনুবাদ করতে পারব না ? এই উদাহরণ আপাত-নিরীহ কিন্তু আসলে তত নিরীহ নয়। এবার এই অনুবাদের স্থান, কাল, পাত্র বদল করে একটা আধুনিক পরিস্থিতি ভাবা যাক, যেখানে দুই [illegible]র পরিমণ্ডল থেকে এসে দুজন ব্যক্তি আন্তর্জাতিক কোনো সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে চায়। আমরা কি ধরে নেব, পরস্পরের ভাষা আমরা অনুবাদ করতে পারব না ? কোয়াইন মনে করছেন, পারব ; তবে এই জাতীয় আর সব স্থলের মতো এখানেও আমাদের একাধিক

অনুবাদ সম্ভব বলে মনে হবে, হলফ করে বলতে পারব না : এটাই ঠিক। কারণ আমরা অনুবাদ করব আমাদের পরিপ্রেক্ষিত থেকে অথচ আদিবাসীটি কথা বলছে তার বিশ্বাসের পরিমণ্ডল থেকে এবং মাঝখানে যে প্রত্যক্ষণলব্ধ তথ্যটুকু পাব তা চূড়ান্ত ও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছোনোর জন্য কখনোই যথেষ্ট হবে না— তথ্য সব সময় তত্ত্বের প্রয়োজন অনুপাতে আনডারডিটারমিনড বা অপর্যাপ্ত ব'লে। তবু আমাদের অনুবাদ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে কোয়াইনের পরামর্শ হল : অনুবাদ করার সময় আদিবাসীটির আচরণ আর অঙ্গভঙ্গি বা সে আর যা-কিছু করছে তা একাধিক অনুষঙ্গে লক্ষ করা (যে-কোনো বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের তথ্য সংগ্রহ করার সময় যেমন হয়ে থাকে)। এইসঙ্গে আমাদের একটা সূত্র মেনে চলতে হবে— উদারম্মন্যতার সূত্র বা প্রিন্সিপ্‌ল অব চ্যারিটি অর্থাৎ, আমাদের ধরে নিতে হবে : যে-লজিকের নিয়ম অনুসারে আমরা আমাদের বিশ্বাসের পরিমণ্ডলে একটা বিশ্বাসের সঙ্গে আর-একটা বিশ্বাসের সম্বন্ধ-সূত্রে গাঁথি, আদিবাসীটিও আমাদের মতো, একই লজিক ধরেই তার সব যুক্তিগুলিকে সাজিয়েছে। আমাদের বিশ্বাস ভিন্ন হতে পারে কিন্তু আমাদের বিশ্বাস-সমন্বয়ের সূত্র ভিন্ন নয়। যেমন : আমরা কেউই কোনো বিরোধাভাসকে বিশ্বাস করি না কারণ ল অব কনট্রাডিকশনের বৈধতা আমরা সকলেই স্বীকার করি : যার ফলে কোনো বচনকে একসঙ্গে আমরা সত্য এবং মিথ্যা বলে স্বীকার করব না। তাই আমাদের উদাহরণের আদিবাসীর ওপর আমরা যে বিশ্বাসই আরোপ করি-না কেন তার ওপর পরস্পরবিরোধী বিশ্বাস আমরা আরোপ করতে কখনোই পারি না। আমাদের অনুবাদের ফলে যদি কখনো মনে হয়, আদিবাসীটি বিরোধাত্মক বিশ্বাস পোষণ করছে তা হলে বুঝতে হবে আমাদের অনুবাদে কোথাও ভুল হয়েছে। লজিকের আর সব সূত্র, যেমন, কনজাংশন, ডিসজাংশন, ইমিপ্লিকেশনও অনুরূপভাবে আদিবাসীটির বিশ্বাসপুঞ্জ সংগঠনের নিয়ামক বলে মনে করতে হবে। এটাই প্রিন্সিপ্‌ল অব চ্যারিটি বা উদারম্মন্যতা নীতির নিহিত অর্থ। এই নীতি প্রয়োগের ফলে কোন্ অনুবাদটি ঠিক, তা না বলা গেলেও কোন্‌টি ঠিক নয়, তা নিশ্চিতভাবে বলা যাবে। দেখা যাচ্ছে, আপেক্ষিকতা মানলেও কোয়াইন লজিকের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিচ্ছেন। তিনি মনে করেন, দ্বিমাত্রিক লজিকের সাহায্য নিয়ে আমরা অনুবাদ করি আর এই দ্বিমাত্রিক লজিক বর্জন করার কোনো কারণ তিনি এখনই দেখছেন না ; ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না। ভবিষ্যতে কোনো বিকল্প লজিকের প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু লজিকের বিকল্প কখনোই থাকবে না। কান্ট, অ্যারিস্টটলের মতো কোয়াইন বলছেন না যে লজিকের পরিবর্তন অসম্ভব তবে কান্ট-অ্যারিস্টটলের মতো উনি লোগোসেন্ট্রিজ্‌ম বা যুক্তিকেন্দ্রিকতা অবশ্যই স্বীকার করেন। আমরা চিরকাল জানি মার্কিনমুলুক ইয়োরোপকেন্দ্রিকতার বাইরে। আমেরিকাকে জানি প্র্যাগমাটিজ্‌মের পীঠস্থান রূপে। চার্লস স্যান্ডার্সপিয়র্স, জন ডিউই, উইলিয়াম জেমস-এর দেশের লোক হয়ে কোয়াইন কি না শেষে এইসব যুক্তিবাদীদের জালে পড়ে গেলেন ? বিনির্মাণবাদীদের দৃষ্টিতে এটা জালই। তাঁদের অভিযোগ : আমরা বিভিন্ন ধারণার জাল বুনি তার পর সেই জাল জগতের ওপর ফেলি। জালের খোপ গোল গোল হলে জগৎ একরকম দেখায় আর জালের খোপ তিনকোণা হলে জগৎ আমাদের কাছে আর-একরকম রূপ নেয়। দার্শনিকরা গত একশো বছর ধরে এই জাতীয় কাজের জন্য জালরূপে ভাষাকে ব্যবহার করছেন। ফলত যুক্তিবাদী দর্শন ত্যাগ করেও ভাষাকে যুক্তিবাদীদের মতো করে ব্যবহার করা হচ্ছে অর্থাৎ ভাষাকে দেখা হচ্ছে একটা কনসেপচুয়াল সেট্ হিসেবে। কোয়াইন যেমন যুক্তিবাদী দার্শনিক না হয়েও ভাষাকে এইভাবে দেখছেন। যখন মনে করা হবে এই জাল জগৎ থেকে পাওয়া তখন ভাবা হবে আমাদের ভাষার গঠন আর জগতের গঠন মিলে যাচ্ছে— দেকার্ত যেমন আশা করতেন— ভাষা তখন জগতের প্রতিবিম্ব। ভাষা আর জগতের সম্পর্ককে আর-এক ভাবেও দেখা যায়। মনে করা যায়, ধারণার জাল মানুষ জোগায় ; এই জাল জগতের সঙ্গে মিলতেও পারে, না-ও পারে। দুই-এর মধ্যে মিল আছে কি নেই জানার কোনো উপায় নেই। কান্ট আর কোয়াইন এই দ্বিতীয় মত পোষণ করেন। ভাষাকে ধারণার জাল হিসেবে দেখার ফলে তার বর্ণনাত্মক ভূমিকা মুখ্য হয়ে যায়। বর্ণনা করতে গেলে বর্ণনার একটা বিষয় চাই আর সেই বিষয় সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দিতে হয়। বিষয়ের একটা পরিচয় দেওয়া মানে সেই পরিচয়ের বিপরীত পরিচয় বারণ করা বা সেই বিপরীত পরিচয়ের প্রতিবন্ধক হওয়া।

যেমন : আমি যদি বলি, 'ক' সাদা, তার দ্বারা এ-ও বলা হল যে 'ক' অ-সাদা নয় (কালো নয়, হলুদ নয়, লাল নয়, ইত্যাদি)। প্রতিটি বর্ণনাকে এমন স্পষ্ট মোটা দাগে দুটো কোটিতে ভাগ করে ভাবতে দার্শনিকরা আমাদের শিখিয়েছেন, অন্তত বিনির্মাণবাদীদের অভিযোগ তা-ই। এটাকেই তাঁরা নিন্দার্থে বলেন, লজিক-কেন্দ্রিকতা বা লোগোসেন্ট্রিজম। সব লজিক অবশ্য এ কথা বলে না : দ্বিকোটিক লজিক ছাড়াও বহুকোটিক লজিক আছে। তবে এটা ঠিকই, কোয়াইন যখন উদারম্মন্যতা নীতির কথা বলেন তখন উনি দ্বিকোটিক লজিকের নিয়মের সর্বজনীনতার কথাই বলেন। কোয়াইন এই একটা জায়গায় এসে রক্ষণশীল হয়ে রইলেন। মানুষে মানুষে ভাষার মাধ্যমে ভাববিনিময়ের সম্ভাবনাকে সম্ভবপর করতে গিয়ে তিনি এটা করলেন। ইতিহাসের এপার থেকে ওপার বা এক সংস্কৃতি ও পরিবেশ থেকে আর-এক সংস্কৃতি ও পরিবেশে ভাষা দিয়ে পৌঁছোনোর কোনো সুনির্দিষ্ট উপায় তিনি দেখতে পান না। একটি ভাষা থেকে আর-একটি ভাষায় অনুবাদ যে হয় না তা কোয়াইন মনে করেন না। সমস্যা হচ্ছে, একটা ভাষার বহু অনুবাদ হতে পারে— বিভিন্ন অনুবাদের মধ্যে কোন্ অনুবাদটা ঠিক জানার কোনো উপায় নেই।

কোয়াইনের চিন্তাধারার ওপর কান্টের সুস্পষ্ট প্রভাব আমরা দেখতে পাই যখন তিনি একদিকে ইন্দ্রিয়-উপাত্ত ও অন্যদিকে বিশ্বাসের পরিমণ্ডলের কথা বলেন। তাঁর লেখা থেকে কখনো কখনো মনে হয় তিনি ইন্দ্রিয়-উপাত্ত আর বিশ্বাসের পরিমণ্ডলের মধ্যে একটা যোগসূত্র দেখতে পাচ্ছেন আবার কখনো মনে হয় দুই-এর মধ্যে সম্পূর্ণ পার্থক্য স্বীকার করছেন। ডেভিড্সনের মনে হয়েছে, কোয়াইন দুই-এর মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখতে চাইছেন। ডেভিড্সন খানিকটা আইরনির সুরে একে বলেন, কোয়াইনের থার্ড ডগমা। এর আগে কোয়াইনই আমাদের দুটো ডগমার কথা শিখিয়েছেন। থার্ড ডগমার প্রতিবাদে ডেভিড্সন বলেন, আমাদের মনে করা উচিত নয় যে একদিকে আমাদের ধারণার জালরূপী স্কিম বা ছক রয়েছে আর একদিকে আমাদের অব্যাখ্যাত জগৎ বা কন্টেন্ট পড়ে আছে। ডেভিড্সনের মতে দুই-ই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

আপেক্ষিকতাবাদ কোয়াইনের মতো ডেভিড্সনও স্বীকার করেন যদিও তাঁর মতে আপেক্ষিকতার মূল সমস্যা অনুবাদের সমস্যা নয় ; ইন্টারপ্রিটেশন বা ব্যাখ্যার সমস্যা। পরস্পরের ভাষা অনুবাদ করেও পরস্পরের ভাষা আমরা না-ও বুঝতে পারি। ঘুরে ফিরে যেন আবার আসে হিবট্গেনস্টাইনের সেই সিংহ ! ডেভিড্সন ব্যাখ্যার এই সমস্যাকে বলেছেন, প্রবলেম অব র‍্যাডিকাল ইন্টারপ্রিটেশন বা নিরালম্ব ব্যাখ্যার সমস্যা। ব্যাখ্যার-সাফল্যের জন্য ডেভিড্সনও মনে করলেন প্রিন্সিপ্ল অব চ্যারিটি বা উদারম্মন্যতা-নীতি অনুসরণ করা দরকার। ডেভিড্সনের উদারম্মন্যতা-নীতি অবশ্য কোয়াইনের চেয়ে ব্যাপক। তিনি বলেন, শুধু লজিকের নিয়মের বেলায় নয়, প্রায় সব ব্যাপারে, সব মানুষের বিশ্বাস এক, শুধু তা-ই নয়, প্রতিটি মানুষের প্রায় সব বিশ্বাসই ঠিক এবং প্রত্যেকে যেটাকে যৌক্তিক মনে করে সেটাকে বিশ্বাস করে, অযৌক্তিক মনে হলে বিশ্বাস করে না। অপরের কথা আমাদের বুঝতে হবে এইরকম উদার মনোভাব নিয়ে। ডেভিড্সনের মতে শব্দ, শব্দার্থ ও বিশ্বাস এই তিনটিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন করে ভাবা যায় না। মানুষের একটি মাত্র বিশ্বাসকে তার অপরাপর বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে বোঝা যায় না— এক-একটি বিশ্বাস বুঝে নিয়ে গোটা বিশ্বাসের পরিমণ্ডল বোঝার চেষ্টা বৃথা। অপরের বিশ্বাসের পরিমণ্ডল সম্বন্ধে আমাদের যা-কিছু জানা আছে তার সবটুকুর সাহায্য নিয়ে তাকে বুঝতে হবে, সেইসঙ্গে ধরে নিতে হবে যে তার বিশ্বাসের জগতে একটা নিহিত সংগতি রয়েছে। একটি উদাহরণের সাহায্যে ডেভিড্সন আমাদের প্রতিটি বিশ্বাসের এই জড়িয়ে থাকার ব্যাপারটা বুঝিয়েছেন। বরফ গলে যায়— এই বিশ্বাস আমরা কারো ওপর আরোপ করতে পারি না, যদি-না সেইসঙ্গে আরও অনেক বিশ্বাস তার ওপর আরোপ করি, যেমন : বরফের সঙ্গে জলের সম্পর্ক, তাপমাত্রার সম্পর্ক, জমা আর গলার পার্থক্য সম্বন্ধে ধারণা ইত্যাদি অনেক কিছু। মানুষের বিশ্বাসের জগতের সংবাদ পাই অবশ্য তার ভাষার ব্যবহার দেখে, সরাসরি আমরা কারো মনোজগতে পৌঁছোতে পারি না ; সরাসরি বহির্জগতেও পৌঁছোতে পারি না, ভাষার মাধ্যমেই যেতে হয়।

আমরা পরস্পরকে কোনো অবলম্বন ছাড়া বুঝি কী করে ? নিরালম্ব ব্যাখ্যাই বা কী করে দিই ? বোঝানোর

জন্য ডেভিড্‌সন বিশেষ করে দুটি ধারণার ওপর নির্ভর করেছেন। প্রথমটি হোলিজ়ম বা অখণ্ডতার ধারণা অর্থাৎ তথ্য, তথ্যগত অর্থ ও সে-বিষয়ে বিশ্বাসের মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে, এর কোনোটিকে বিচ্ছিন্নভাবে জানা যাবে না। দ্বিতীয়টি সংগতি বা কোহিয়ারেন্সের ধারণা। কোহিয়ারেন্স বলতে ডেভিড্‌সন যৌক্তিক সংগতি বোঝেন। তথ্য, তার অর্থ, আর সেই বিষয়ে বিশ্বাসের মধ্যে একটা যৌক্তিক সংগতি থাকে ; যেমন থাকে একটা বিশ্বাসের সঙ্গে আর-একটা বিশ্বাসের। নেতিবাচকভাবে বলতে গেলে যৌক্তিক সংগতি মানে অযৌক্তিকতার অভাব আর ইতিবাচকভাবে বললে বলতে হয় যৌক্তিক সংগতি মানে যৌক্তিক অনুধারণ বজায় রেখে বিচার করা— 'মেকিং জাজ্‌মেন্টস্ অ্যাকর্ডিং টু লজিকাল ইমিপ্লিকেশন'। এই প্রসঙ্গে একটা কথা অনেক সময় আমাদের নজর এড়িয়ে যায়। আমাদের প্রতিটি বিশ্বাস পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত বলতে যা বোঝায়, প্রতিটি বিশ্বাস পরস্পরের সঙ্গে যৌক্তিক সম্পর্কে সম্পর্কিত বলতে তা বোঝায় না। মনে হয়, ডেভিড্‌সন দ্বিতীয় সম্পর্কের কথা বলছেন— বিশ্বাসে বিশ্বাসে সম্পর্ক বলতে তিনি যৌক্তিক সম্পর্কের কথা ভাবছেন। এই ভাষ্যের সমর্থন আমরা পাই প্রণবকুমার সেনের লেখা 'দ্য কন্‌সেপ্ট অব র‍্যাশনালিটি' প্রবন্ধে।[২] প্রথম ভাষ্যের সমর্থন পাই মল্‌পাস-এর লেখার মধ্যে।[৩] মল্‌পাস মনে করেন, যদিও প্রথমদিকের বেশির ভাগ লেখায় ডেভিড্‌সন সংগতি বলতে যৌক্তিক সংগতির কথা বলেছেন ইদানীং উনি বিশ্বাসের সঙ্গে, কামনা, বাসনা, ভীতি, আশার সম্পর্কের কথাও বলছেন। মল্‌পাস-এর মতে বিশ্বাসে বিশ্বাসে সম্পর্ক থাকলেই যে তা যৌক্তিক হতে হবে তার কোনো মানে নেই। সংগতির এমন প্রসারিত ব্যাখ্যার মাধ্যমে মল্‌পাস ডেভিড্‌সনের সঙ্গে হাইডেগারের সাদৃশ্য দেখতে পান। মনে হতে পারে, কী করে ডেভিড্‌সনের মতো কট্টর অ্যানালিটিক ঘরানার দার্শনিকের সঙ্গে বিপরীত মেরুর অস্তিবাদী দার্শনিকের তুলনা করলেন মল্‌পাস। এই সাদৃশ্য মল্‌পাস একা দেখেন না। জেনে আশ্চর্য লাগতে পারে যে ১৯৯০ সালে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সেমিনার হয় যেখানে আলোচনার বিষয় ছিল 'ডেভিড্‌সন ও হাইডেগার : কার্টেজীয় সমালোচক' ('ডেভিড্‌সন অ্যান্ড হাইডেগার : ক্রিটিক্স অব কার্টেজিয়ানিজ়ম')। ডেভিড্‌সনের দর্শনের এই দুই জাতীয় ভাষ্যের (সেন ও মল্‌পাস) মধ্যে কোন্‌টা স্বীকার করা হবে তার ওপর নির্ভর করছে ডেভিড্‌সনের নিয়তি। যদি কোহিয়ারেন্স বা সংগতি বলতে নিছক সাযুজ্যের কথা বলে থাকেন তিনি তবে বিনির্মাণবাদীদের রোষ থেকে আপাতত রেহাই পাবেন। অপরপক্ষে সংগতি বলতে যদি যৌক্তিক সংগতির কথা বলে থাকেন তবে বিনির্মাণবাদীরা তাঁকে লোগোসেন্ট্রিক ক্লোজ়ার বা যুক্তিকেন্দ্রিক আবেষ্টনের দায়ে অভিযুক্ত করবেন। দ্বিতীয় সম্ভাবনাই বেশি কারণ কোয়াইনের সঙ্গে ডেভিড্‌সনের ঘোষিত সম্পর্ক বড়োই নিকট, তার ওপর রোর্‌টি সোৎসাহে ডেভিড্‌সনকে দেরিদার বিরুদ্ধে যখন সাক্ষী মানছেন তখন ডেভিড্‌সনকে হাইডেগারের দলে ফেলা সত্যিই শক্ত।

লোগোসেন্ট্রিক ক্লোজ়ার ব্যাপারটা কী আর সেটা কতখানি দূষ্য তা একটু বুঝে নেওয়া দরকার। বিনির্মাণবাদীদের মতে ক্লোজ়ার বা আবেষ্টন থাকা মাত্রই দূষ্য, তা সে লজিকের বৃত্তেই হোক বা জ্ঞানমীমাংসার বৃত্তেই হোক, অথবা আদর্শ বা বিজ্ঞানের কোনো বৃত্তে হোক। ব্যাখ্যার যে-কোনো একমাত্রিকতাই অগণতান্ত্রিক, তথা দূষ্য। ইতিহাস আমাদের দেখিয়েছে যে ধ্রুবত্বের দাবি বারে বারে করা হয়েছে ; কিন্তু কোনো দাবিই ধোপে টেঁকে নি, তবু দার্শনিক একটা কোনো শাশ্বত ধ্রুব সত্য যুক্তি বা বিজ্ঞান বা মতাদর্শের মধ্যে দিয়ে জগতের ব্যাখ্যা খুঁজেই চলে— এমন কোনো ধ্রুব সত্য যা দর্শনকে একটা সুপ্রতিষ্ঠিত চেহারা দিতে পারে। দেরিদা মনে করছেন, যখনই আমরা আমাদের বক্তব্যকে এমন কতগুলি স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ধারণার নিরিখে সাজিয়ে ফেলতে চাই, আমরা এমন কিছু বিষয় দেখতে পাই যা আমাদের নিটোল ব্যাখ্যার গোলকের মাপে খাপ খেতে চায় না, তখন এগুলিকে সামলাতে গিয়ে আমাদের কল্পিত গোলকটিকে আর নিটোল রাখতে পারি না, হয় খোঁচা বেরিয়ে থাকে, নয়তো কোথাও কিছু বাদ পড়ে যায়। তবু যেন সব দার্শনিক বলতে চান, 'কোনো বাক্য বোধগম্য হবে না যদি না অমুক, অমুক, অমুক স্বীকার করা হয়'। এই শূন্যস্থানে কান্ট বসালেন ইন্‌টুইশন আর ক্যাটিগরি-কাঠামো। অর্থাৎ 'কোনো বাক্যই বোধগম্য হবে না যদি না তা মানুষের ইন্‌টুইশন আর ক্যাটিগরি-কাঠামোর

দ্বারা বিন্যস্ত হয়'। ফ্রেগে আর হ্বিট্‌গেনস্টাইন বলছেন, কোনো বাক্য বোধগম্য হবে না যদি না বাক্যটি তাঁদের দেওয়া লজিকের কাঠামো বা ফর্মের মধ্যে পড়ে। আর ডেভিড্‌সন বলেন, কোনো বাক্য বোধগম্য হবে না যদি না বাক্যটি তাঁর দেওয়া কোহিয়ারেন্স বা সংগতির শর্ত পূরণ করে। এভাবে একটা মাত্রা দিয়ে গোটা জগৎকে দেখতে চাওয়াটা দেরিদার মতে একটা ক্লোজার বা আবেষ্টন। এঁরা প্রত্যেকে মনে করছেন, তাঁরা যা বলছেন তা-ই শেষ কথা এবং আর যে যা বলছে তার নির্গলিতার্থ যদি তাদের বক্তব্যের সঙ্গে মিলে যায় ভালো নয়তো সেটা প্রলাপ। দার্শনিকরা যখন বলেন, 'কোনো বাক্য বোধগম্য হবে না যদি না অমুক, অমুক, অমুক স্বীকার করা হয়' তখন কোনো বাক্য বলতে সব বাক্যকেই বোঝানো হচ্ছে ; এমন-কি, যে বাক্যের মাধ্যমে এই রায় দেওয়া হচ্ছে (ওপরের উদ্ধৃত বাক্য, 'কোনো বাক্যই বোধগম্য হবে না...') তার ক্ষেত্রেও এই রায় প্রযোজ্য। এভাবে কথা বলাটা দূষ্য, যখন একটি বাক্য অন্য বাক্য সম্বন্ধে কথা বলে তখন প্রথম বাক্যটি নিজের সম্বন্ধে কোনো কথা বলতে পারে না। দার্শনিকরা যখন তাঁদের দর্শনের সৌধ রচনা করেন তখন যে আশ্রয়-বাক্যের ওপর সেই সৌধ ভর করে থাকে তার সম্বন্ধে, সেই আশ্রয়-বাক্যটি সম্বন্ধে, যেন আর কোনো সংশয় ঘোষণা করা যাবে না বলে তাঁরা মনে করেন—ওটা যেন স্বতঃসিদ্ধ। একটি রূপক ব্যবহার করে বলা যায় যে এই দার্শনিকদের ব্যাখ্যায় যেন আছে শুধু আশ্রয়-বাক্য আর তার থেকে নিষ্কাশিত কতগুলি সিদ্ধান্ত, আর বাদ বাকি, চার পাশে যেন সাদা মার্জিন। মনে করা হয় এই আশ্রয়-বাক্য আর তার থেকে নিষ্কাশিত সিদ্ধান্ত অনন্য ; বিকল্প কোনো ব্যাখ্যা আর কোনো শাস্ত্র জোগাতে পারে না, এই ব্যাখ্যা যেন সর্বব্যাপ্য, এর বাইরে আর বোঝার কিছু থাকে না ; দাবি করা হয়, এই ব্যাখ্যা চূড়ান্ত, এর কোনো নড়চড় হতে পারে না। পাশ্চাত্য বিনির্মাণের পরিভাষায় দার্শনিকরা আমাদের দিচ্ছেন একটি অদ্বিতীয়, সমগ্র, বদ্ধ, শব্দতালিকা (ইউনিক, টোটাল, ক্লোজড ভোকাবুলারি)।

দেরিদা বলতে চান, এমন আশ্রয়-বাক্যের সাহায্য নেওয়া মানে একধরনের মেটাফর বা উৎপ্রেক্ষার সাহায্য নেওয়া— কোনো মেটাফরই অনৈতিহাসিক নয় যদিও এই কথাটা আমরা অনেক সময় স্বীকার করতে চাই না। ইতিহাস বদলের সঙ্গে আমাদের মেটাফর বদলায়, পালটে যায় দর্শন। এই সত্যটুকু অস্বীকার করলেই আমরা কোনো-না-কোনো ক্লোজার বা আবেষ্টন সৃষ্টি করে ফেলি। দেরিদার এই বক্তব্যের সঙ্গে রোর্‌টি একমত।

দার্শনিকরা যদি হতাশ হয়ে জানতে চান, তাঁদের এতদিনের গড়ে তোলা সব দার্শনিক সাধন বাতিল করে দিলে তাঁরা জগতের ব্যাখ্যা দেবেন কী করে ? রোরটির উত্তর খুব সোজা। উনি মনে করেন, দার্শনিকদের নিটোল ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের সঙ্গে মানিয়ে তাৎক্ষণিক ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত। উনি বলেন, আমাদের সামনে একাধিক বিকল্প সব সময় থাকে ; দার্শনিকদের ব্যাখ্যাই একমাত্র নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। অনেক সময় দার্শনিকদের ব্যাখ্যার চেয়ে কবির দেওয়া ব্যাখ্যা আমাদের বেশি ফলপ্রসূ মনে হতে পারে। আবার কখনো প্রযুক্তিবিদদের ব্যাখ্যা প্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। প্রয়োজনমতো আমরা ব্যাখ্যা বেছে নিতে পারি। মনে রাখতে হবে যে আধুনিক থেকে আধুনিকোত্তর হওয়া মানে : সর্বকালজয়ী ব্যাখ্যা আমরা আর খুঁজব না, দার্শনিকরা যদিও এই সর্বকালজয়ী ব্যাখ্যাই দিতে চান। এ জাতীয় ব্যাখ্যা অদরকারি হলে রোর্‌টি মনে করছেন, দর্শনের ওপর নির্ভরশীলতাও হয়ে উঠবে আপেক্ষিক। তাঁর এই নব্য-প্রয়োগবাদকে তিনি কোনো নির্দিষ্ট ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত করতে চাইছেন না, এমন-কি কোনো রাজনৈতিক মতের সঙ্গেও না। তিনি মনে করেন, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি মূলত গণতান্ত্রিক, যেখানে একাধিক মত ও পথকে আশ্রয় দেওয়া হয়। আমরা জানি গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে চলে আর সংখ্যাগরিষ্ঠের মত সব সময় যে ন্যায্য তা নয়। রোর্‌টির অভিধানে ন্যায্য-অন্যায্যের ধারণাও অবশ্য আপেক্ষিক। আধুনিকোত্তর যাত্রায় রোর্‌টির এক সময় দেরিদাকে সেথো মনে হয়েছিল— তিনি চেয়েছিলেন প্রয়োগবাদ আর বিনির্মাণের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটাতে। দেরিদা-ভক্তদের এতে বিশেষ আপত্তি। আপত্তি যাঁরা জানাচ্ছেন তাঁদের পুরোভাগে রয়েছেন ক্রিস্টোফর নরিস, জোনাথন কুলার, রোডল্‌ফ গার্শে প্রমুখ। এঁদের মতে বিনির্মাণবাদীরা নব্য-প্রয়োগবাদীদের

মতো দার্শনিকদের সৌধ ভাঙার খেলা খেলছেন'না। বিনির্মাণবাদীরা খেলায় মাতেন নি ; দার্শনিক সৌধ বিনির্মাণে তাঁরা যথোপযুক্ত যুক্তি ব্যবহার করে চলেছেন। গার্শে মনে করেন, দেরিদা একদিকে যেমন কান্টের কড়া সমালোচক অন্যদিকে তিনি কান্টের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। নরিস মনে করছেন মার্কিন দেশে রোর্‌টির প্রভাবে বিনির্মাণ মূলত একটা মজাদার ভাঙাগড়ার খেলার রূপ নিয়েছে ; এর ফলে বিনির্মাণ দর্শনের কোটি থেকে সরে গিয়ে সাহিত্য-সমালোচনার হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাহিত্যিকেরা সর্বত্র রূপক দেখে বেড়াচ্ছেন, সবই যেন নির্মাণ, সব তত্ত্বই যেন গল্প বা ন্যারেটিভ, তাই তা সাহিত্য-সমালোচনার এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে। নরিস এটাকে বলেন, সাহিত্যিকের সাম্রাজ্যবাদ, যা অত্যন্ত বিপজ্জনক। কুলার মনে করছেন, দর্শন ও সাহিত্যের পার্থক্য বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। এমনও হতে পারে যে সাহিত্য-সমালোচনার নিরিখে আমরা দর্শনকে দেখব, আর দর্শনের সমালোচনার নিরিখে দেখব সাহিত্যকে।

এই জাতীয় সব মন্তব্য শুনে রোর্‌টি হতাশ। ওঁর মতে দেরিদা এবং দেরিদার এই ভক্তেরা এখনও কান্ট-হাইডেগারের ধারায় চিন্তা করে যাচ্ছেন। তাঁরা চাইছেন, যুক্তির সাহায্য নিয়ে যুক্তির আবেষ্টন খুলে দিতে। তাঁরা বলেন কী! যুক্তিকেন্দ্রিকতার বিরোধিতা করার যুক্তি! তা হলে কি এঁরা যে-ডাল কাটতে যাবেন, সেই ডালেই বসার জায়গা খুঁজছেন? রোর্‌টি যেন কিছুটা করুণা করে বলছেন, বিকল্প পন্থাই বা এঁদের কী হতে পারে? যুক্তিকেন্দ্রিকতার শেকড় এমন ছড়িয়েছে যে তার বাইরে দাঁড়িয়ে লড়াই করার জন্য যুক্তিনিরপেক্ষ কোনো জায়গা পাওয়া ভার।

এমতাবস্থায় তা হলে কী করা যায়? রোর্‌টির সমাধান খুব সহজ। তিনি পালটা প্রশ্ন করেন : যুক্তিকেন্দ্রিকতার ছিদ্র অন্বেষণ করেই বা লাভ কী? এই অসম্ভব প্রকল্প হাতে না নিলেই হয়। পূর্বপক্ষ খণ্ডন করে কোনো সাম্প্রতিক সমস্যার সমাধান কখনো হয় না। পূর্বতন মত খণ্ডন করার পরিশ্রম করার চেয়ে পুরোনোকে ভুলে গেলেই হয়। ইতিহাস ঘেঁটে কী হবে?[৪] নরিস আমাদের বলেন, এই আপাত-সারল্যের পেছনে মারাত্মক রাজনীতি কাজ করে যাচ্ছে— আমাদের বলা হচ্ছে ইতিহাসের পাপকে ভুলে যেতে আর সেই পাপের স্রোতকে উপেক্ষা করতে। কেবল বর্তমানকে দেখতে এবং তা-ও আবার সর্বসম্মতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে। দেশব্যাপী বা জগৎব্যাপী এই সর্বসম্মতি নিশ্চয় কোনো স্বয়ম্ভূ ঘটনা নয়— আমরা জানি কী জাতীয় চাপের মধ্যে দিয়ে সব শেয়ালের এক রা শোনা যায়। নরিস জানতে চান গণতন্ত্রের মহান বাণীর অন্তরালে রোর্‌টি ইতিহাসের এই পরিকল্পিত অবজ্ঞার মধ্যে দিয়ে কী রাজনীতি খেলছেন?

সবদিক ভেবে রোর্‌টির মনে হয়েছে তাঁর কাছে কোয়াইন-ডেভিড্‌সন আঁতাতই ভালো। ওঁরাই সত্যিকারের আধুনিকোত্তর দার্শনিক। কোয়াইন আর ডেভিড্‌সন -এর উদারস্মন্যতার নীতিতে যে যুক্তিনির্ভরতা প্রতিফলিত হয়েছে তাতে এই আঁতাতে অসুবিধে হবে বলে রোর্‌টির মনে হচ্ছে না। এটাও তাঁর একটা প্র্যাগ্‌মাটিক সিদ্ধান্ত কি না কে জানে?

রোর্‌টি যতই মনে করুন দর্শনের পরিমণ্ডল থেকে না বেরুলে আধুনিকোত্তর হওয়া যায় না, দেরিদা তবু দর্শনচর্চা ছাড়তে রাজি নন। ফরাসি দেশে 'গ্রুপ ফর রিসার্চ ইনটু দ্য টিচিং অব ফিলসফি'-র দেরিদা একজন উদ্যোগী সদস্য। দেরিদাদের চেষ্টায় ফরাসি দেশে স্কুলের পাঠ্যক্রমে দর্শন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই পাঠ্যক্রমে দর্শনের মূল শাখাগুলি— নীতিশাস্ত্র, রাষ্ট্রদর্শন, জ্ঞানতত্ত্ব — বজায় রাখার সপক্ষে দেরিদা বিভিন্ন লেখায় মত প্রকাশ করেছেন।[৫] ১৯৯১ সালে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারেও দেরিদা বলেছেন, 'আমি তাদের মধ্যে নই যারা বলে দর্শনের পালা শেষ...এটা [দর্শনের এই ক্লোজার বা আবেষ্টন] আমাদের চিন্তার সুযোগ করে দেয় ; মৃত্যুর সঙ্গে এটা তুল্য নয়, বা ইতির সঙ্গে, কিন্তু এটা একটা সুযোগ....। ঐতিহ্য বহাল রাখার জন্য, দক্ষতা প্রদানের জন্য, ঐতিহ্যমণ্ডিত লেখা পাঠের জন্য...আমাদের চাই দার্শনিক প্রতিষ্ঠান।'[৬] দেরিদা চান দর্শনের হাতিয়ার দিয়ে দর্শনকে আঘাত করতে। ওঁর জেহাদ যুক্তির আবেষ্টন বা লোগোসেন্ট্রিক ক্লোজার-এর বিরুদ্ধে। দেরিদা মনে করেন, দর্শন মাত্রই রূপকাত্মক বা গল্পকথা। তাঁর লেখায় যথেষ্ট দার্শনিক ঋজুতা আমরা দেখতে পাই।

দেরিদা কখনোই দর্শন ছেড়ে সাহিত্যের খাতায় নাম লেখানোর কথা বলেন নি। তাঁর পরিকল্পনা দ্ব্যর্থহীন, তিনি যেন দার্শনিকদের বলতে চাইছেন : 'তোমারি শিল তোমারি নোড়া তাই দিয়ে ভাঙি তোমার দাঁতের গোড়া।'

টীকা

১. '...I have attempted to show that logocentrism or phonocentrism which is proper to western metaphysics, is also a form of phallocentrism'. Raoul Mortley, ed., *French Philosophers in Conversation*, London and New York, 1991, pp 103-104.

২. Pranab Kumar Sen. 'The Concept of Rationality' in *Reference and Truth*, Delhi, 1991.

৩. J. E. Molpas, *Donald Davidson and the Mirror of Meaning*, Cambridge, 1992.

৪. 'The result of genuinely original thought, on my view, is not so much to refute or subvert our previous beliefs as to help us to forget them by giving us a substitute for them.' Richard Rorty, 'Is Derrida a Transcendental Philosopher?' *Yale Journal of Criticism*, 1989, reprinted in *Essays on Heidegger and Others, Phliosophical Papers*, vol II, Cambridge, 1991, p 121.

৫. J. Derrida, 'The Principle of Reason : The University in the Eyes of Its Pupils', *Diacritics*, vol xix, No. 2, 1983.

৬. Raoul Mortley, ed., *French Philosophers in Conversation*, pp 106-07.

এ রচনায় 'এক্সপ্ল্যানেশন' আর 'ইন্টারপ্রিটেশন'— এই দুই অর্থেই 'ব্যাখ্যা' শব্দটি প্রযুক্ত।

'আরণ্যক' : ভারতবর্ষ কোন্ দিকে

শিশিরকুমার দাশ

একমাত্র যদি নাও হয়, 'আরণ্যক' একটি প্রসিদ্ধ বাংলা উপন্যাস যার পটভূমিই শুধু বহির্বাংলা নয়, যার অধিকাংশ চরিত্রই অ-বাঙালি। আর এই উপন্যাসের চরিত্র সংখ্যা বড়ো কম নয়। প্রকৃতি আর মানুষ এমনই ভাবে এখানে পরস্পরের সঙ্গে জড়ানো যে তাদের আলাদা করে দেখা কঠিন। আরও কঠিন হয়ে পড়ে যদি একটিকে বাস্তব আর অন্যটিকে নিতান্তই বানানো বলে মেনে নিতে হয়। কুশীনদীর অপর পারে এক দিগন্তবিস্তীর্ণ অরণ্য প্রান্তর আছে, বিভূতিভূষণ জানিয়েছেন যে সেই ভৌগোলিক স্থানটিই তাঁর আখ্যানের পটভূমি। পটভূমির বাস্তবতা বা 'সত্যতা এবং আখ্যানের 'উপন্যাসত্ব' বিশেষভাবে ঘোষণা করার একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে। আমার মনে হয় তা নিহিত আছে আখ্যানের গঠনের মধ্যে এবং বিশেষ পরিমাণে আখ্যান-পরিকল্পনায়। স্থানিক বাস্তবতার প্রাধান্য যে ভ্রমণকাহিনীকে উপন্যাসের থেকে পৃথক করে চিনে নেওয়ার একটা উপায় সে বিষয়ে খুব সূক্ষ্ম তর্ক করার প্রয়োজন দেখি না। অন্তত বিভূতিভূষণ যখন 'আরণ্যক' রচনা করেছিলেন, সেই উত্তর-আধুনিকতাপূর্ব আখ্যান ও ইতিহাসের স্পষ্ট-বিভক্ত সীমাক্ষেত্রের অবিতর্কিত যুগে, তখনকার পাঠক-পাঠিকা উপন্যাস আর ডায়েরি ও ভ্রমণকাহিনীর পার্থক্য চিনে নিতেন সত্যমূলকতার ভিত্তিতে। বিভূতিভূষণ এমন একটা আখ্যান তৈরি করেছিলেন যার মানুষ এবং প্রকৃতি দুই-ই তাঁর পাঠক-পাঠিকা-সমাজের অভিজ্ঞতার বাইরে। এমনই অপরিচিত একটি পৃথিবী তাঁর কাহিনীর পটভূমি, যে তার অস্তিত্বের বাস্তবতা নিয়ে তিনি কোনো সংশয়ের অবকাশ রাখতে চান নি। 'আরণ্যক' কাহিনীতে কোনো কোনো শহর ও জনপদের উল্লেখ আছে— তারা আমাদের ভৌগোলিক অভিজ্ঞতার অন্তর্গত বলেই— তারা যে বাস্তব এ কথাটা আখ্যানকারকে বলে দিতে হয় না। বলে দিতে তখনই হয়, অথবা বলে দেবার প্রয়োজন তখনই হয়, যখন তাদের অস্তিত্ব বাস্তব হওয়া সত্ত্বেও তারা আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে, অর্থাৎ অপরিচিত। 'আরণ্যক'-এর অপরিচিত পটভূমির সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি পটভূমিও আছে, সে পটভূমি বাংলা দেশের প্রকৃতি এবং বিশেষভাবে কলকাতা শহর। স্পষ্টভাবে সেই পটভূমি কাহিনীতে ধরা দেয় না ঠিকই, কিন্তু 'আরণ্যক'-এর আরণ্য পটভূমির সমস্ত মহিমা, সমস্ত সৌন্দর্য, সেই প্রচ্ছন্ন পটভূমির বৈপরীত্যে। লেখককে তাই ঘোষণা করে দিতে হয় যে এই প্রচ্ছন্ন পটভূমিটি যেমন বাস্তব, যেমন ভৌগোলিক সত্য, তেমনই বাস্তব, তেমনই ভৌগোলিক সত্য 'আরণ্যক'-এর পটভূমি।

'আরণ্যক'-এর আখ্যান যেমনই উন্মোচিত হতে থাকে, তেমনই স্পষ্ট হয়ে ওঠে এর আখ্যানের অন্তর্বর্তী দুটি বিরোধী স্রোত। আর সেই বিরোধিতার পূর্বসংকেত এর কাহিনী-চরিত্র-বিষয়ে লেখকের মন্তব্য। শুধু অপরিচিত আরণ্যপ্রকৃতির কুশল চিত্রণের জন্যই যে কোনো অসতর্ক পাঠক-পাঠিকা একে ভ্রমণকাহিনী বলে ভুল করতে পারেন তা নয়, এর মধ্যে বার বার আছে আরণ্যসমাজের নানা খুঁটিনাটির বর্ণনা, নানা তথ্যের সমাহার, যেসব তথ্য এক সমাজবিজ্ঞানী সাগ্রহে সংগ্রহ করে থাকেন। সেই তথ্যগুলি যে বানানো, 'উপন্যাস' মাত্র, এমন কথা লেখক বলেন নি। তাদের বাস্তবতা বা তথ্যমূল্য নেই এমন প্রশ্নও পাঠক-পাঠিকার মনে ওঠার সম্ভাবনা নেই। বরং মনে হয়, সেইসব তথ্য আখ্যানের মধ্যে একটা বিশেষ প্রয়োজনেই নিজের জায়গা খুঁজে নিচ্ছে। অর্থাৎ শুধু প্রকৃতি নয়, মানবসমাজেরও একটা বাস্তব ভিত্তি আছে— যেমন সব আখ্যানেই থাকে। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে যা আছে তা এক বিপরীতের দ্বন্দ্ব। প্রকৃতির বৈপরীত্য এবং মানবসমাজের বৈপরীত্য। আর এই বিপরীতের দ্বন্দ্বই এর আখ্যান নির্মাণের অন্যতম প্রধান কৌশল।

২.

বৈপরীত্যের সূচনা করেন আখ্যানের কথক স্বয়ং। কথকের একটা নাম আছে : 'সত্যচরণ'। কিন্তু দেখা যাবে শহর থেকে অরণ্যে স্থান-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যক্তিনামটার ব্যবহার আর হয় না। অসংখ্য আরণ্য চরিত্রগুলির মধ্যে সে এমনই স্বতন্ত্র যে তার পরিচিতির জন্য নাম অবান্তর। অশিক্ষিত, বিহারী চরিত্রগুলির মধ্যে (তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিসত্তা উদ্‌ভাসিত হয় স্বতন্ত্র ব্যক্তিনামে। এই কথক একজন শিক্ষিত বাঙালি। সে আরণ্য জগতে এক বহিরাগত ; শুধু বহিরাগত নয়, সে এই জগতের প্রতি বিরক্ত, অপ্রসন্ন। তার সঙ্গে সঙ্গে আরণ্য পটভূমির মধ্যে প্রবেশ করে আর-একটি ভূগোল— নাগরিক ভূগোল। সেই ভূগোল শুধুমাত্র কথকের। সেই ভূগোল কলকাতা।

কাহিনীর সূচনা এবং উপসংহারে কথকের ভৌগোলিক অবস্থিতি কলকাতায়। আর এই অবস্থান আখ্যানের গঠনে এক তাৎপর্যপূর্ণ কৌশল। সমগ্র কাহিনীর মধ্যে কলকাতার উপস্থিতি অন্তঃশীল, এবং এই আরণ্যপ্রকৃতির প্রতিবাদী। কথক মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত (অর্থাৎ ইংরেজিশিক্ষিত) শহরের মানুষ ; সংস্কৃতির অভিমান তার প্রবল, সভ্য মানুষের প্রয়োজন সম্বন্ধে তার ধারণা স্পষ্ট ('বন্ধুবান্ধবের সঙ্গ, লাইব্রেরি, থিয়েটার, সিনেমা, গানের আড্ডা') এবং সেইসঙ্গে অশিক্ষিত অসংস্কৃত বিহারীদের প্রতি তার অপার অবজ্ঞা।[১] এই কথকের কাজ এক বিস্তীর্ণ আরণ্য অঞ্চলে জমি বিলিবন্দোবস্ত করা। অরণ্যের উচ্ছেদ করে বসতি স্থাপন করা। এই কাজে বাঙালি কথকটি অবশ্য যন্ত্র মাত্র। সে ধনী জমিদার ও ব্যবসায়ীদের কর্মচারীমাত্র। তার চার পাশের প্রকৃতি তার নিজস্ব এবং পরিচিত প্রকৃতির থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এই ভিন্নতার জন্যই সে প্রথম থেকে এই অরণ্যের মধ্যে এক প্রতিকূল অধিবাসী। কিন্তু তার প্রাথমিক প্রতিকূলতা যতটা না প্রকৃতির বিরুদ্ধে তার চেয়ে বেশি মানুষের বিরুদ্ধে।

> ....নিজের ঘরে বসিয়া বসিয়া, যে কয়খানি বই সঙ্গে আনিয়াছিলাম তাহা পড়িয়াই কোন রকমে দিন কাটাই। কাছারিতে লোকজন যারা আছে তারা নিতান্ত বর্বর, না বোঝে তাহারা আমার কথা, না আমি ভাল বুঝি তাহাদের কথা।

প্রকৃতির চেয়েও, কথক অনেক বেশি বিচ্ছিন্ন তার পরিচিত সংস্কৃতি থেকে। এই সংস্কৃতির সঙ্গে তার যোগ 'বই'— ভাষা। এই ভাষা তাকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে এই 'নিতান্ত বর্বর' সমাজ থেকে।

---

১. ভারতবর্ষের প্রত্যেক অঞ্চলের লোক নিজ নিজ অঞ্চলের বা নিজ ভাষাগোষ্ঠীর বাইরের লোকদের কতকগুলি স্থাণু ভাবমূর্তি রচনা করেছে। নানা সামাজিক, রাজনৈতিক কারণে এই মূর্তিগুলি গড়ে উঠেছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই মূর্তিগুলি সেই অঞ্চলের বা ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের পক্ষে সম্মানজনক নয়। ধীরে ধীরে এই মূর্তিগুলি জীবন থেকে সাহিত্যেও প্রবেশ করেছে। তামিল সাহিত্যে অ-তামিলভাষী কিংবা উত্তর-ভারতীয়দের, পাঞ্জাবি সাহিত্যে অ-পাঞ্জাবিদের, মারাঠি সাহিত্যে অ-মারাঠিদের কিংবা বাংলা সাহিত্যে অ-বাঙালিদের এইরকম স্থাণু মূর্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙালির চোখে ভারতবর্ষের সব প্রদেশের সব ভাষাগোষ্ঠীর স্থাণু মূর্তি এক নয়, ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু বিশেষভাবে যে দুটি অঞ্চলের মানুষের প্রতি শিক্ষিত বাঙালির অবজ্ঞা, অনুকম্পা ও নির্দয়তার মধ্য থেকে এই স্থাণু মূর্তি গড়ে উঠেছে সে দুটি অঞ্চল হল ওড়িশা এবং বিহার। বাংলা সাহিত্যে মারাঠি, পাঞ্জাবি, রাজস্থানী, গুজরাতি, ওড়িয়া বিহারী ইত্যাদি চরিত্রের রূপায়ণ সম্বন্ধে সাধারণ পরিচয়ই যাঁর আছে তিনি উপলব্ধি করবেন যে এই স্থাণু মূর্তিগুলির গঠনের জন্য দায়ী অগভীর অভিজ্ঞতা এবং 'অন্য'-কে বোঝার সহানুভূতির অভাব। গত শতাব্দী থেকে বাঙালির লেখায় (এবং প্রাত্যহিক আচরণে) বিশেষভাবে ধিক্‌কৃত এবং নিন্দিত হয়েছেন বিহারী এবং ওড়িয়া। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে অ-বাঙালি সাহিত্যে বাঙালির যে স্থাণু মূর্তি গড়ে উঠেছে তা হল বুদ্ধিমান কিন্তু ধূর্ত, সংস্কৃতিবিলাসী এবং স্বার্থপর মানুষ। 'আরণ্যক' আখ্যানের মধ্যে বাঙালি-অবাঙালি (বিশেষ করে বাঙালি-বিহারী) স্থাণুমূর্তির সংঘাত অত্যন্ত তীব্র এবং স্পষ্ট।

> মানুষ এখানে থাকে ? লোক নাই, জন নাই, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ— একটা কথা কহিবার মানুষ পর্যন্ত নাই। এদেশের এইসব মূর্খ, বর্বর মানুষ, এরা একটা ভাল কথা বলিলে বুঝিতে পারে না— এদেরই সাহচর্যে দিনের পর দিন কাটাইতে হইবে ?

বার বার 'মানুষ' শব্দটি উচ্চারণ করে কথক, আর বার বার 'মানুষ' শব্দটির উচ্চারণ ক'রে কথক এই অঞ্চলের মানুষের সহজাত মনুষ্যত্বকেই অস্বীকার করতে চায়। তারা মূর্খ, বর্বর। সমস্ত পৃথিবীটা ভাগ হয়ে যায় সভ্যে আর অ-সভ্যে। এই আরণ্য অঞ্চল আর তার মানুষ মূর্খ, বর্বর, অ-সভ্য। আর সভ্যজগৎ দূরে, সেখানেই 'মানুষ'-এর ভিড়।

> ...সঙ্কল্প করিলাম... চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া সভ্য বন্ধুবান্ধবদের অভ্যর্থনা পাইয়া, সভ্য খাদ্য খাইয়া, সভ্য সুরের সঙ্গীত শুনিয়া, মানুষের ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া, বহু মানবের আনন্দ-উল্লাসভরা কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাঁচিব।

এই সভ্য জগৎ-ই 'মানুষ'-এর জগৎ, শুধু এখানেই 'মানুষের ভিড়' এখানেই 'মানবের আনন্দ-উল্লাসভরা কণ্ঠস্বর'। কলকাতা এই সভ্য জগতের অন্তর্গত। এই কলকাতাই কথকের সাংস্কৃতিক পটভূমি।

আবার বলা দরকার যে কাহিনীর শুরুতে পূর্ণিয়া জেলার জঙ্গলমহাল এবং কলকাতা শহরের ভৌগোলিক পরিবেশের স্পষ্ট উচ্চারিত বৈপরীত্যের সঙ্গে, অনুচ্চারিত আছে শিক্ষিত বাঙালি ও অশিক্ষিত বিহারীর বৈপরীত্য ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের ইতিহাস। এই বৈপরীত্য, এই সংঘাত, এই বিরোধিতা ও দ্বন্দ্বের একটা দীর্ঘ বেদনাদায়ক ইতিহাস আছে, যা অনেকেরই জানা। 'আরণ্যক' এই ইতিহাসের থেকেই উদ্ভূত, যদিও এর আখ্যান থেমে নেই বাঙালি-বিহারীর বিরোধিতার মধ্যে, বরং তা বিস্তারিত হয়েছে আরও বৃহৎ সংঘর্ষের ইতিহাসে, আরও বৃহত্তর ভিন্ন টানাপোড়েনে। এ কাহিনীর কথক অবশ্যই প্রতিকূল কথক থেকে ধীরে ধীরে এক সহানুভূতিশীল কথকে পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু তার শিক্ষিত, নাগরিক সত্তা শেষ পর্যন্ত অপরিবর্তিত থেকেছে। কথকের 'মানুষ' সম্বন্ধে ধারণা সম্পূর্ণ শহরকেন্দ্রিক। 'পূর্বে কি জানিতাম মানুষের মধ্যে থাকিতে এত ভালোবাসি !' এই মানুষ শহরের মানুষ। এই অঞ্চলের মানুষ কথকের 'মানুষ'-এর ধারণার বাইরে। এই 'মানুষ'-দের সঙ্গে কথকের পরিচয় শুধু যে একটা বিরোধী সাংস্কৃতিক কাঠামোর মধ্যেই তা নয়, বৃত্তিগত দিক থেকে শক্তির বৈষম্যদ্বারাও শাসিত। কথক 'শক্তিশালী', এ অঞ্চলের মানুষ কথকের শক্তির দ্বারা শাসিত। তাদের সম্পর্ক প্রভু-ভৃত্যের না হলেও সম্পূর্ণ অসম।

আবার এই অসম সম্পর্কের মধ্যে দিয়েই এই মানুষগুলির সঙ্গে কথকের জীবনে প্রথম সহানুভূতিশীল মুহূর্তের উদয় হয়। সেই অর্থে সিপাহি মুনেশ্বর সিং-কে কথকের কড়া কিনে দেবার ঘটনাটি বিশেষ মূল্যবান। এই অপরিচিত জগৎ যে কত অপরিচিত, এবং নাগরিক ও আরণ্য জগতের বৈষম্য ও ব্যবধান যে কী বিশাল তার বোধ কথক অর্জন করে এই ঘটনার মধ্য দিয়ে। 'শুনিয়াছিলাম এদেশের লোক বড় গরীব। এত গরীব তাহা জানিতাম না।' 'সামান্য' একটি কড়া, তার জন্য এত কৃতজ্ঞতা, এত আনন্দ। ... 'সর্বপ্রথম আজ মনে হইল— বেশ লোকগুলো। বড় কষ্ট তো এদের !'

কথকের সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ 'মানুষ'-এর সংসারে এই প্রথম 'লোক'গুলি একটি স্থান অর্জন করে।

৩.

মানুষের মতোই প্রকৃতিও অপরিচিত। 'বাংলাদেশ হইতে সদ্য আসিয়াছি, চিরকাল কলিকাতায় কাটাইয়াছি'— কথকের এই উক্তিটি তার সঙ্গে এই আরণ্যপ্রকৃতির সম্পর্ক রচনায় কেন্দ্রীয় সূত্র। ইংরেজ ঔপন্যাসিকেরা যাঁরা

ভারতীয় জীবনের কাহিনী লিখেছেন তাঁদের রচনায় ভারতীয় প্রকৃতি প্রকটিত হয়েছে একটা অপরিচয়ের রহস্য নিয়ে। এই অপরিচয় অস্বাভাবিক নয় ঠিকই, কিন্তু এই অপরিচয়ের মধ্যে আছে একটা দুর্জ্ঞেয়তা, একটা প্রতিকূল বিরোধী শক্তি। মানুষের মতোই এই প্রকৃতিও 'অন্য', 'আমি' থেকে স্বতন্ত্র। বাংলা কথাসাহিত্যে নাগরিক ও পল্লী-প্রকৃতির বৈপরীত্য বার বার উচ্চারিত হয়েছে। বহুবারই এই পল্লী-প্রকৃতির গৌরবায়ণ করেছেন লেখকেরা। পল্লী-প্রকৃতিকে নগর-প্রকৃতির প্রতিষেধক হিসেবে দেখেছেন লেখকেরা। কিন্তু 'আরণ্যক'-এর প্রকৃতি শুধু নগর কলকাতা থেকে ভিন্ন নয়, তা বাংলাদেশের প্রকৃতির থেকেও ভিন্ন। সেই ভিন্নতার ফলেই কথকের পক্ষে তা আরও অস্বস্তিকর। '...এই অরণ্যভূমির নির্জনতা যেন পাথরের মত বুকে চাপিয়া আছে বলিয়া মনে হয়।'

এই প্রকৃতির লক্ষণ 'নির্জনতা'। এখানে অরণ্য ও বসতির বিরোধ, নির্জনতা ও জনতার বিরোধ। কথক যে-সংসারের অধিবাসী তা মূলত নির্জনতা-বিরোধী। কথকের প্রধান কাজ এই নির্জনতা হনন এবং মানুষের সংসার স্থাপন। কাছারি ঘর থেকে কিছু দূর গেলেই কথকের '...মনে হয় সমস্ত পৃথিবীতে আমি একাকী', কিংবা 'যত দূর চোখ যায়, এ সব যেন আমার, আমি এখানে একমাত্র মানুষ...।' অথবা 'আমাদের চারিদিকে ঘিরিয়া অন্ধকার বন ও প্রান্তর, মাথার উপরে নক্ষত্র-ছড়ানো দূরপ্রসারী অন্ধকার আকাশ। আমার বড় অদ্ভুত লাগিল, যেন চিরপরিচিত পৃথিবী হইতে নির্বাসিত হইয়া মহাশূন্যে এক গ্রহে অন্য এক অজ্ঞাত রহস্যময় জীবনধারার সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছি।' এই পৃথিবী 'অদ্ভুত', 'অজ্ঞাত', 'রহস্যময়'। এই পৃথিবী 'চিরপরিচিত' পৃথিবী থেকে স্বতন্ত্র। এখানে বসবাস, যথার্থই বনবাস, 'নির্বাসন'। শুধু মানুষ নয়, প্রকৃতিও বর্বর।

আখ্যানের একটি স্রোত যদি হয় এই 'বর্বর' অন্যভাষী মানুষের সঙ্গে কথকের ক্রম-পরিচয়, আরেকটি স্রোত এই অপরি[illegible] রহস্যময় প্রকৃতির সঙ্গেও ক্রম-পরিচয়। শুধু একটি পার্থক্য আছে দুই স্রোতের মধ্যে। মানুষের সঙ্গে এখানে কথকের ভূমিকা আধিপত্যের ; কথক আর্থিক শক্তিতে অন্যদের চেয়ে শক্তিমত্তর, তার প্রাধান্য প্রতিবাদরহিত, তার কাছে আরণ্য মানুষের প্রসাদ ভিক্ষা। কাহিনীর শেষ পর্যন্ত কথক তাই তার নাগরসত্তার গর্ববোধেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে যে পরিচয় সেখানে তার ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্ব, ক্রমশই প্রকৃতির কাছে হারমানা। '...আজকাল ক্রমশ মনে হয় এই দিগন্তব্যাপী বিশাল বনপ্রান্তর ছাড়িয়া, ইহার রোদপোড়া মাটির তাজা সুগন্ধ, এই স্বাধীনতা, এই মুক্তি ছাড়িয়া কলিকাতার গোলমালের মধ্যে আর ফিরিতে পারিব না।' এই প্রথম আখ্যানের মধ্যে কলিকাতার সমালোচনা। প্রকৃতি কি তা হলে জয় করেছে কথককে ? 'ফিরিতে পারিব না'— এই বোধ কি প্রকৃতির কাছে কথকের আত্মসমর্পণের স্বীকারোক্তি ?

কিন্তু প্রকৃতি ও মানুষ দুজনের প্রতি কথকের আকর্ষণ : মানুষের প্রতি আকর্ষণে কথকের অবস্থান একটি উচ্চতর তলে, যেখান থেকে সে এই মানুষগুলিকে অবজ্ঞা [illegible] পারে আবার সহানুভূতিশীলও হতে পারে ; প্রকৃতির সঙ্গে তার যে সম্পর্ক সেখানে তার অবস্থান নিম্নতর তলে ; প্রকৃতিই শক্তিময়ী। কিন্তু এই শক্তির উৎস রহস্যময়। একটা প্রতিরোধ চলে সেখানে, কথক যার বিরুদ্ধে কীভাবে আত্মরক্ষা করবে জানে না। '...অন্নভোজনলোলুপ সরল ব্যক্তিগুলিকে আমার সে-রাত্রে এত ভাল লাগিল !' উচ্চতরতল থেকে কথকের এই স্নেহদৃষ্টি। আর অন্য দিকে দেখি, প্রকৃতির সামনে কথকই পরিণত হয়েছে এক সরল না হলেও মুগ্ধ ও অনভ্যস্ত পুরুষে, এক নারী ধীরে ধীরে যাকে জয় করছে। 'কত রূপে কত সাজেই যে বন্যপ্রকৃতি আমার মুগ্ধ অনভ্যস্ত দৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া আমায় ভুলাইল !' এ কি তার হননকারীর বিরুদ্ধে অরণ্যের রহস্যময় সংগ্রাম ?

৪.

অসংখ্য চরিত্র 'আরণ্যক' উপন্যাসে। নারী পুরুষ বালক ; সৎ ধূর্ত গরীব ধনী ; কবি ভক্ত শিল্পী। কেউই কোনো ঐতিহাসিক নরনারী নয়, সবাই এক বানানো কাহিনীর কুশীলব। কিন্তু এই মানুষগুলির স্থানিক এবং সামাজিক

পরিচয় পরিস্ফুট করার জন্য কথক পাঠক-পাঠিকার সামনে ক্রমাগত উপস্থিত করতে থাকে নানা সামাজিক-নৃতাত্ত্বিক তথ্য। প্রত্যেক মুহূর্তে স্মরণ করিয়ে দিতে চায় এই মানুষগুলি ভিন্ন, প্রত্যেক মুহূর্তেই তুলনা এসে পড়ে বাঙালি জীবনের। এবং আমরাও বুঝতে পারি যে এর আখ্যান অবশ্যই 'উপন্যাস' কিন্তু এই উপন্যাসের জগৎ 'কল্পলোক' নয়। এখানে আছে দুটো দেশের বৈপরীত্যের কাহিনী : এ দেশ ও নিজের দেশ ('এদেশের গৃহস্থ-সংসার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবার লোভও সংবরণ করিতে পারিলাম না')। এদেশের গৃহস্থ সংসারের খুঁটিনাটি সংগ্রহ করে কথক। এদেশ অপরিচিত :

> তাহার পর দশ-এগার বছরের একটি ছোট মেয়ে আসিয়া আমার সামনে একখানা থালা ধরিল—থালায় গোটাকতক আস্ত পান, আস্ত সুপারি, একটা মধুপর্কের মত ছোট বাটিতে সামান্য একটু আতর, কয়েকটি শুষ্ক খেজুর ; ইহা লইয়া কি করিতে হয় আমার জানা নাই...
>
> প্রকাণ্ড কাঠের পিঁড়ির আসন পাতা— সম্মুখে এমন আকারের একখানি পিতলের থালা আসিল, যাহাতে করিয়া আমাদের দেশে দুর্গাপূজার বড় নৈবেদ্য সাজায়। থালায় হাতীর কানের মত পুরী, বাথুয়া শাক ভাজা, পাকা শশার রায়তা, কাঁচা তেঁতুলের ঝোল, মহিষের দুধের দই, পেঁড়া। খাবার জিনিসের এমন অদ্ভুত যোগাযোগ কখনও দেখি নাই।
>
> পাত্রের অভাবে ময়লা থান কাপড়ের প্রান্তেই ছাতুটা মাখিতেছে— এত বড় একটা তাল যে, একজন লোকে—হলই বা হিন্দুস্থানী, মানুষ তো বটে— কি করিয়া অত ছাতু খাইতে পারে এ আমার বুদ্ধির অগোচর।
>
> হঠাৎ মেয়েমানুষের গলায় আর্তকান্নার স্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম।...ব্যাপার কি ? কেহ কি হঠাৎ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল ?... এদেশের রীতিই নাকি এইরূপ, গ্রামের মেয়ে বা কোনও প্রবাসিনী সখী, কুটুম্বিনী বা আত্মীয়ার সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা হইলেই উভয়ে উভয়ের গলা জড়াইয়া মড়াকান্না জুড়িয়া দিবে। অনভিজ্ঞ লোকে ভাবিতে পারে উহাদের কেহ মরিয়া গিয়াছে, আসলে ইহা আদর-আপ্যায়নের একটা অঙ্গ।
>
> মুক্তিনাথ সিং জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ নাচ তাহারা দেখাইতে পারে। দলের মধ্যে একজন ষাট-বাষট্টি বছরের বৃদ্ধ সেলাম করিয়া বিনীতভাবে বলিল— হুজুর, হো হো নাচ আর ছক্কর-বাজি নাচ। ...বেলা পড়িবার সময় তাহারা আসিয়াছিল, ক্রমে আকাশে জ্যোৎস্না ফুটিল, তখনও তাহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাত ধরিয়া নাচিতেছে ও গান গাহিতেছে। অদ্ভুত ধরণের নাচ ও সম্পূর্ণ অপরিচিত সুরের গান।
>
> এদেশে পয়সা জিনিসটা বাংলা দেশের মত সস্তা নয়, এখানে আসিয়া পর্যন্ত তা দেখিতেছি। শুকনো কাশ ও সাবাই ঘাসের ছোট্ট একটা ছাউনি কেঁদ ও আমলকীর বনে, সেখানে বড় একটা মাটির হাঁড়িতে মকাই সিদ্ধ করিয়া কাঁচা শালপাতায় সকলে একত্রে খাইতে বসিয়াছে....
>
> কুণ্ডীর চারিধারে কাদার উপর আট-দশটা ছোট-বড় সাপ, অন্য দিকে তিনটি প্রকাণ্ড মহিষ একসঙ্গে জল খাইতেছে।... মহিষ দেখিয়া মনে হইল এ ধরণের মহিষ আর কখনও দেখি নাই। প্রকাণ্ড একজোড়া শিং, গায়ে লম্বা লোম—বিপুল শরীর।

উদাহরণ বাড়ানো যায়, কিন্তু সম্ভবত তার প্রয়োজন নেই। আরণ্য মানুষের আচার-আচরণ, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান,

ধর্মবিশ্বাস-উৎসব-কুসংস্কার, আরণ্য অঞ্চলের পশু-পাখি-সরীসৃপ সমস্ত কিছুর মধ্যে কথক দেখে এক 'ভিন্নতা'। তথ্য সংগ্রহ করে, তথ্যের ঘন বুনটের মধ্য দিয়ে 'উপন্যাস'কে প্রতিষ্ঠিত করে। পাঠক-পাঠিকার বুঝতে সামান্য মাত্র অসুবিধে হয় না যে শুধু বহিঃপ্রকৃতি মাত্র নয়, এখানকার মানবসমাজও একটা কল্পিত সমাজ নয়। কল্পিত শুধু এই আখ্যান। এই তথ্যগুলি নৃতাত্ত্বিকের 'নিরপেক্ষ' তথ্য নয়, কথকের 'ভিন্নতা'-র বোধে নিষিক্ত। প্রত্যেক মুহূর্তে এই তথ্য বর্ণনার পেছনে ক্রিয়াশীল একটা নাগরিক মন। কথক এসেছে শহর থেকে, শহরের সভ্যতার অভিমান নিয়ে, আরণ্য মানুষের ওপর আধিপত্যের বোধ নিয়ে। শহর থেকে সে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু এখানেও সে শহরের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। শুধু শাহরিক শিক্ষা ও সংস্কারের দ্বারাই নয়, শহরই এই অরণ্যপ্রকৃতির নিয়ামক। কথকের কাজ তার মালিকের নির্দেশপালন। মালিকের নির্দেশ শহরেরই নির্দেশ। 'ডাক আসিবার সঙ্গে সঙ্গে আবার একরাশি কাজ আসিয়া পড়ে। শহরের নানা ধরণের চিঠি, নানা ধরণের আদেশ...'। তা ছাড়া যতই লড়াই চলুক কথকের সঙ্গে অরণ্যপ্রকৃতির, শহরের প্রতি আকর্ষণ ছিন্ন হয় না। ডাক আসে শহরের আহ্বান নিয়ে। 'একখানা বিলাতী ম্যাগাজিনের গ্রাহক হইয়াছি, আজ সেখানা আসিয়াছে। মোড়কের উপরে লেখা "উড়ো জাহাজের ডাকে"।'

৫.

'আরণ্যক' উপন্যাসটি যাঁরা মানুষ ও প্রকৃতির এক তীব্র আকর্ষণের কাহিনী হিসেবে পাঠ করতে অভ্যস্ত তাঁরা এই পাঠে বিরক্ত হবেন। কিন্তু এই কথক এবং এখানকার মানুষগুলির সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক ভিন্নতাকে অস্বীকার না করলে এই আখ্যানকে একটি নিছক প্রকৃতিপ্রীতি এবং আধুনিক সভ্যতা-কর্তৃক অরণ্যভূমির নিধনের বেদনাদায়ক কাব্য হিসেবে গ্রহণ করা কঠিন। এখানকার প্রকৃতি এবং মানুষ একদিকে একটা জগৎ তৈরি করেছে, অন্য দিকে কথক এবং কথকের পরিচিত ভূগোল আর-একটা জগৎ তৈরি করেছে। সিপাহি মুনেশ্বর সিং, গনোরী তেওয়ারী, গনু মাহাতো, নন্দলাল ওঝা, জওয়াহিরলাল সিং, রামধনিয়া টহলদার, ধাওতাল সাহু, জয়পাল কুমার, কুন্তা, দশরথ, ধাতুরিয়া, রাজু পাঁড়ে, যুগলপ্রসাদ— আরও আরও অনেক চরিত্রের সমাবেশ এই আখ্যানে। তাদের জীবন, আচরণ, তাদের চিন্তা কর্ম সবই পাঠকপাঠিকাকে এক ভিন্নজগতের স্বাদ এনে দেয়। এই মানুষগুলি প্রত্যেকে অ-বাঙালি এবং এদের অ-বাঙালিত্ব প্রতিমুহূর্তে কথকের চোখে স্পষ্ট। কথকও আখ্যানের মধ্যে মধ্যে বার বার তার বাঙালিত্ব এবং বাঙালি সংস্কৃতি ও প্রকৃতির সঙ্গে তার যে যোগ তা মনে করিয়ে দেয়। 'প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে এক-এক সময়, বাংলা দেশ ভুলিয়া গিয়াছি, কত কাল দুর্গোৎসব দেখি নাই, চড়কের ঢাক শুনি নাই' এমন-কি, 'বৈশাখী প্রভাতে পাখীর কলকূজন উপভোগ করি নাই'। শুধু বাংলার পরিচিত প্রকৃতি নয়, পরিচিত গার্হস্থ্য জীবন তার স্মৃতিকে উদ্‌বেলিত করে— 'বাংলার গৃহস্থালির যে শান্ত পূত ঘরকন্না জলচৌকিতে পিতল-কাঁসার তৈজসপত্র পিঁড়িতে আলপনা, কুলুঙ্গীতে লক্ষ্মীর কড়ির চুপড়ি...'। এই টানাপোড়েনকে বাদ দিয়ে 'আরণ্যক'কে মানব ও প্রকৃতির সম্পর্কের কাহিনী হিসেবে দেখা একটা অসম্পূর্ণ পাঠ। প্রকৃতির প্রতি কথকের যে সাড়া এই আখ্যানে তা বিভূতিভূষণের অন্যান্য আখ্যানে (যেমন : 'পথের পাঁচালী' কিংবা 'ইছামতী') মানুষ-প্রকৃতির সম্বন্ধ এবং প্রকৃতির প্রতি সাড়া থেকে তাই বিশেষভাবে পৃথক।

আগেই বলেছি এই আখ্যানের কথক শুরুতে ছিল এক প্রতিকূল-কথক। ধীরে ধীরে সে পরিবর্তিত হয়েছে। পরিবর্তন সম্পূর্ণ হবার আগেই কথক ফিরে গেছে তার নিজস্ব পরিবেশে, কলকাতায়, বাংলাদেশে, সভ্যতার মধ্যে। আখ্যান সেই সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। বাঙালি এবং অবাঙালি, সভ্য এবং অসভ্য, নাগর ও আরণ্য— এই দ্বৈততার মধ্যে কাহিনী শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছে দুই সভ্যতার সংঘাতে। কিন্তু সেখানেও কাহিনী শেষ হয় নি। আখ্যানের এই অংশটিকে একটু ঘনিষ্ঠভাবে দেখা যাক।

'আরণ্যক' আখ্যানের তুঙ্গ কথকের সঙ্গে সাঁওতালরাজ দোবরু পান্নার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতায়। দোবরু পান্না সাঁওতালরাজ। তাঁর 'রাজধানী খুব ছোট, কুড়িপঁচিশ ঘর লোকের বাস।'

দোবরু পান্নার কাহিনী মূল আখ্যানে প্রবেশ করার সময় লেখককে একটি কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে। এইখানে আর-একজন কথকের আবির্ভাব হয়েছে। সেই কথক বা উপকথক বুদ্ধু সিং। বুদ্ধু সিং স্থানীয় লোক, এই অঞ্চলের ইতিহাস তার জানা। সে বলে, আর মূল কথক এবার বদলে যায় কৌতূহলী শ্রোতায়। কথক বুদ্ধু সিং বলে, এই অঞ্চলে একদিন ছিল 'অসভ্য বুনোজাতির রাজ্য'। সেই বুনো জাতি মুঘল সৈন্যদের সঙ্গে লড়েছে। '১৮৬২ সালের সাঁওতাল-বিদ্রোহের পর' তাদের সমস্ত রাজ্য যায়, প্রতিপত্তি যায়। কিন্তু এখনও আছে কিছু স্মৃতি, কিছু অবশেষ— 'খুব বৃদ্ধ আর খুব গরীব' রাজা 'সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা' দোবরু পান্না।

কথক বুদ্ধু সিং-এর আখ্যান 'আরণ্যক' কাহিনীর মধ্যে একটা নূতন মাত্রা আনে। বুদ্ধু সিং-এর আখ্যান এক প্রাচীন জাতির প্রতিপত্তি ও সম্মানের উত্থানপতনের কাহিনী। বুদ্ধু সিং ব্যক্তিগতভাবে এই আখ্যানের এক নিরপেক্ষ এবং নিরাসক্ত কথক মাত্র। সে বর্তমান কালেরই প্রতিনিধি। সভ্য জগৎ যে দোবরু পান্নার পূর্বপুরুষদের সভ্যতাকে ধ্বংস করেছে সে তা জানে এবং আরও জানে যে তার অবশিষ্ট সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হবার শেষ দিন বেশি দূর নয়। সে যেমন নিরাসক্তভাবে মূল কথককে দোবরু পান্নার ইতিহাস শোনায়, তেমনই আবার মূল কথকের সম্ভাব্য মানসিকতার অনুকূলতা করতেই চায়। 'খুব বৃদ্ধ খুব গরীব', দোবরু পান্না, কিন্তু বুদ্ধু সিং জানায় যে '...এ দেশের সকল আদিম জাতি এখনও তাঁকে রাজার সম্মান দেয়। রাজ্য না থাকলেও রাজা বলেই মানে।' বুদ্ধু সিং মূলকথকের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া অনুমান করেই এই রাজ্যহীন রাজার বিরোধাভাস কৌশল হিসেবে ব্যবহার করে। এমন-কি, মূলকথকের সঙ্গে রাজার পরিচয় হওয়ায় তার কোনো উৎসাহ নেই, বরং সে সতর্কভাবেই বিরোধিতা করে। 'পাহাড়ী অসভ্য জাতের রাজা, তাই বলে কি আর আপনাদের সমান সমান কথা বলার যোগ্য বাবুজী?' এইসঙ্গে লক্ষণীয় যে দোবরু পান্নার সঙ্গে কথকের আনুষ্ঠানিক পরিচয় সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কাহিনী থেকে বুদ্ধু সিং-কথকের প্রস্থান।

'আরণ্যক'-এর কথক এবার নিজস্ব ঐতিহাসিক অবস্থান থেকেই প্রাচীন বৃদ্ধ রাজার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে দোবরু পান্নার সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের আগে থেকেই কথকের চিন্তায় সভ্যতা সম্পর্কে একটি বিশেষ জিজ্ঞাসা ছিল। 'বুঝি না কেন এক-এক জাতির মধ্যে সভ্যতার কী বীজ লুক্কায়িত থাকে, তাহারা যত দিন যায় তত উন্নতি করে— আবার অন্যজাতি হাজার বছর ধরিয়াও সেই একস্থানে স্থাণুবৎ নিশ্চল হইয়া থাকে?' এই জিজ্ঞাসার কোনো উত্তর কথক দেন নি। কিন্তু জানেন যে আর্যজাতি 'বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, কাব্য, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি, চরক-সুশ্রুত লিখিল, দেশ জয় করিল, সাম্রাজ্য পত্তন করিল'— এই যে আর্যজাতি তা শুধু ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ নয়, কথক আর্যজাতির গৌরবময় ইতিহাসের কথা বলে চলেন— 'ভেনাস দ্য মিলোর মূর্তি, পার্থেনন, তাজমহল কোলোঁ ক্যাথিড্রাল গড়িল, দরবাড়ী [দরবারি] কানাড়া ও ফিফথ্ সিম্ফোনির সৃষ্টি করিল— এরোপ্লেন, জাহাজ, রেলগাড়ী, বেতার, বিদ্যুৎ আবিষ্কার করিল'। অথচ 'পাপুয়া, নিউগিনি অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা, আমাদের দেশের ওই মুণ্ডা, কোল, নাগা, কুকিগণ যেখানে সেখানেই কেন রহিয়াছে এই পাঁচ হাজার বছর?'*

* কথকের এই জিজ্ঞাসার উদ্রেক করেছিল এক অতি বৃদ্ধা— 'তাহার বয়স আশী-নব্বুই হইবে, শণের-নুড়ি চুল, গায়ে খড়ি উড়িতেছে... এ অঞ্চলের বন্য সভ্যতার প্রতীক ওই প্রাচীন বৃদ্ধা— পূর্বপুরুষেরা এই বন জঙ্গলে বহুসহস্র বছর ধরিয়া বাস করিয়া আসিতেছে। যীশুখ্রীষ্ট যেদিন ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিলেন সেদিনও উহারা মহুয়াবীজ ভাঙিয়া যেরূপ তৈল বাহির করিত, আজ সকালেও সেইরূপ করিয়াছে। হাজার হাজার বছর নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে অতীতের ঘন কুজ্ঝটিকায়। উহারা আজও সাতনলি ও আঠাকাঠি দিয়া সেইরূপই পাখী শিকার করিতেছে— ঈশ্বর সম্বন্ধে, জগৎ সম্বন্ধে উহাদের চিন্তাধারা বিন্দুমাত্র অগ্রসর হয় নাই।'

অসভ্য জাতির রাজার সঙ্গে কথকের পরিচয় তাই গুরুত্বপূর্ণ— এই পরিচয়ের পটভূমি নিষ্কলঙ্ক শুভ্র নয়, ইতিহাসের জিজ্ঞাসাহীন এক সম্পর্কমাত্র নয়। কথক এক সভ্য 'আর্য' জাতির প্রতিনিধি। দোবরু পান্নার রাজ্যে যার সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ হয় সে দোবরু পান্নার বংশধর— তার নাতির মেয়ে, ভানুমতী। ভানুমতীর 'লাবণ্য মাখা মুখশ্রী— তবে পরনের কাপড়, সভ্যসমাজের শোভনতা রক্ষা করিবার উপযুক্ত প্রমাণ মাপের নয়।' ইতিপূর্বে একদিন এক গ্রামের বৃদ্ধাকে দেখে কথকের মনে হয়েছিল 'বন্য সভ্যতার প্রতীক।' আজ এই তরুণীকেও সেই বন্য সভ্যতার বংশধরই মনে হল কথকের। 'আরণ্যক' অবশ্যই সভ্য সমাজ থেকে দূরে অবস্থিত এক মানবগোষ্ঠীর আখ্যান, উপন্যাস, বানানো কাহিনী ; কিন্তু তা সত্ত্বেও বৃহত্তর এবং গভীরতর অর্থে 'বাস্তব' কাহিনী। ভানুমতী এক প্রাচীন সভ্যতার বংশধর। সে সভ্যমানুষের পলায়নী প্রয়োজনে নির্মিত যৌনতা-সোচ্চারিত আদিবাসী রমণীর দেহসর্বস্ব সত্তা মাত্র নয়। সে রাজকন্যা ভানুমতী— তার রাজ্য কয়েকটি গ্রামে সীমাবদ্ধ। সে রাজ্যের রাজা 'গরু চরাইতেছেন।' রাজ্য-রাজা-রাজকন্যা অরণ্য-আদিম জনজাতি ইত্যাদি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের রোম্যান্টিকতাপূর্ণ সাহিত্যের রমণীয় উপকরণ। দোবরু পান্না-ভানুমতী-কথক সম্পর্ক এই রোম্যান্টিক জগৎকে তীব্রভাবে ধাক্কা দেয় ; অন্তঃশীল পরিহাসে ম্লান হয়ে আসে লুপ্ত রাজবংশের সম্মান ও মর্যাদার কাহিনী। আর ধীরে ধীরে বর্তমান ইতিহাসের স্তর ভেদ করে এক লুপ্ত ইতিহাস আত্মপ্রকাশ করে। দোবরু পান্না কথককে নিয়ে যায় পাহাড়ের ওপর পূর্বপুরুষদের সমাধিস্থানে। আর সেইখানে দাঁড়িয়ে হঠাৎ কথক দেখতে পায় 'অন্য এক অভিজ্ঞতার জগৎ'।

> দেখিতে পাইলাম যাযাবর আর্যগণ উত্তর-পশ্চিম গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া স্রোতের মত অনার্য-আদিমজাতি-শাসিত প্রাচীন ভারতে প্রবেশ করিতেছেন...ভারতের পরবর্তী যা কিছু ইতিহাস এই আর্যসভ্যতার ইতিহাস—বিজিত অনার্য জাতিদের ইতিহাস কোথাও লেখা নাই— কিংবা সে লেখা আছে এই সব গুপ্ত গিরিগুহায়, অরণ্যানীর অন্ধকারে, চূর্ণায়মান অস্থি-কঙ্কালের রেখায়। সে লিপির পাঠোদ্ধার করিতে বিজয়ী আর্যজাতি কখনও ব্যস্ত হয় নাই। আজও বিজিত হতভাগ্য আদিম জাতিগণ তেমনই অবহেলিত, অবমানিত, উপেক্ষিত। ...আমি, বনোয়ারী সেই বিজয়ী জাতির প্রতিনিধি ; বৃদ্ধ দোবরু পান্না, তরুণ যুবক জগরু, তরুণী কুমারী ভানুমতী সেই বিজিত, পদদলিত জাতির প্রতিনিধি— উভয় জাতি আমরা এই সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছি—

ক্ষমতা ও আধিপত্যের যে কাঠামোর মধ্যে এক জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে অন্য জনগোষ্ঠীর ধারণা তৈরি হয়, যে মনোভাব থেকে একটা স্থাণু মূর্তি রচিত হয়, তা আজ প্রবলভাবে আহত হল। শুধু বাঙালি-বিহারী নয়, শুধু নাগরিক-আরণ্য নয়, শুধু সভ্য-অসভ্য নয়, সমস্ত 'স্টেরিওটাইপ' চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে চায় এই অভিজ্ঞতা। আর সম্ভব নয় 'স্টেরিওটাইপ'-এর নিরাপদ দূরবীক্ষণ দিয়ে জগৎকে দেখা— এইবার উন্মোচিত হয় এক জটিল আত্মজিজ্ঞাসা : 'আত্ম' এবং 'অন্য'-এর সম্পর্ক নিয়ে এক কঠিনতর প্রশ্ন। কথক বুঝতে পারে যে সে এবং 'আরণ্যক'-এর নরনারী এক দেশে থাকে না। 'আরণ্যক'-এর নরনারী তার রচিত 'ভারতবর্ষ'-এর প্রতিবাদ। ভানুমতীর সঙ্গে কথকের শেষ সাক্ষাতে এই সমস্যাটি বিপুল শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। 'ভানুমতীর পৃথিবী কতটুকু' তা জানার উৎসাহে কথক প্রথম প্রশ্নই করেছিল 'ভানুমতী, কখনও কোন শহর দেখেছ?' ভানুমতী কোনো শহরই দেখে নি। দু-একটা শহরের নাম শুনেছে।

—দু-একটা শহরের নাম বল তো ?

—গয়া, মুঙ্গের, পাটনা।

—কলকাতার নাম শোন নি ?

—হাঁ বাবুজী।

—কোন্‌দিকে জান ?
—কি জানি বাবুজী।
—আমরা যে দেশে বাস করি তার নাম জান ?
—আমরা গয়া জেলায় বাস করি।
—ভারতবর্ষের নাম শুনেছ ?

ভানুমতী মাথা নাড়িয়া জানাইল সে শোনে নাই। কখনও কোথাও যায় নাই চকমকিটোলা ছাড়িয়া। ভারতবর্ষ কোন্‌দিকে ?

এইভাবে শেষ হয় 'আরণ্যক' উপন্যাস। কুশী নদীর অপর প্রান্তের অরণ্য ভূমির বাকি ইতিহাস অবশ্যই আমাদের কৌতূহলী করে তোলে। কিন্তু জানি সে ইতিহাস অরণ্যহননের ইতিহাস। সেইসঙ্গে জানি 'আরণ্যক'-এ শেষ পর্যন্ত মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় দুই ভারতবর্ষের কাহিনী। একদল মানুষ, কথক তাদের প্রতিনিধি, গড়ে তুলতে চাইছে এক 'ভারতবর্ষ', আর-একদল মানুষ সেই 'ভারতবর্ষ'-এরই অধিবাসী তারা, তারা জানে না কোথায় সেই ভারতবর্ষ।

স্মরণ-প্রতিস্মরণ : ঋত্বিক ঘটকের শিল্প

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়

'একবার একটা ছেলে বেড়াতে গিয়েছিল সেই দেশে, যেখানে যাবার জন্য তোমার আমার আর চেষ্টার অন্ত নেই।'[১] —এই বাক্যটি ঋত্বিক ঘটকের 'আকাশগঙ্গার স্রোত ধরে' গল্পের সূচনাবাক্য। যেখানে যাবার জন্যে সবাই সদাই ব্যগ্র, যে-দেশের স্বাদ থেকে-থেকে মনের মধ্যে জেগে উঠে মানুষকে হঠাৎ-হঠাৎ উতলা করে দেয়, সেখানে অকস্মাৎ, নিজের অজান্তে এবং বিনা প্রস্তুতিতে পৌঁছে গিয়েছিল ছেলেটি। কথকের বিবৃতি অনুসারে, ওই সদ্য-যুবা তরুণটি নিপাট ভালোমানুষ, একরকম বোকাই ; সে যে মাথা খাটিয়ে বানিয়ে-বানিয়ে কিছু বলবে, লোককে চমকে দেবার জন্যে গোটা একখানা আষাঢ়ে কাহিনী ফেঁদে বসবে, এমন সম্ভাবনা নেই— গল্পের নায়কের নির্বুদ্ধিতা বিষয়ে কথক এতটাই নিশ্চিত যে বিবরণের সত্যতা প্রমাণ করতে, দরকার হলে, আদালতে তামা-তুলসী হাতে নিয়ে দাঁড়াতেও সে রাজি। ছেলেটি গিয়েছিল পাহাড়-জঙ্গলে ভরা এক জায়গায় ; অঞ্চলটা আবার রামগিরির বেশ কাছে। পৌঁছে প্রথম রাত্রেই সে উপলব্ধি করে, সেখানে চার পাশে ছড়ানো আছে অজস্র সব পৌরাণিক সংকেত, সেখানকার নিসর্গপরিবেশ নেহাত জড় বা প্রাকৃত নয়, তাতে রয়েছে চেতনার প্রসঙ্গ। এই আবিষ্কারের সুবাদে সে ভাবে, সময়টাকে যদি ধাক্কা দিয়ে হাজার-দুয়েক বছর পিছিয়ে দেওয়া যেত তা হলে হয়তো তার পক্ষে স্বাধিকারপ্রমত্ত যক্ষের ভূমিকায় নামতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হত না। সে রোজ দেখে, রাতের অন্ধকারে সমস্ত বনভূমি আস্তে আস্তে কেমন সরব হয়ে ওঠে, আর সেইসঙ্গে তার মনে হানা দিতে থাকে বিচিত্র সব অনুভূতি : যেন এক রহস্যময় 'অব্যক্ত বাণী' তার চৈতন্যের তলদেশ থেকে বেরিয়ে এসে ক্রমশ জমাট বাঁধে ; তার বুকের ভেতরটা টন টন করে ওঠে, নাড়ীর স্পন্দনে সে শুনতে পায় 'আদিম পৃথিবীর মাতৃ-আহ্বান'। এরকম যখন তার মনের অবস্থা তখন ছেলেটির হঠাৎই আলাপ হয়ে যায় এক বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে : গল্পের নায়কের চেয়ে অন্তত বছর-আষ্টেকের বড়ো তিনি, তিন পুত্রকন্যা-সহ তিনিও এসেছেন বেড়াতে। প্রথম দর্শনেই পরিণত-বয়স্কা মহিলাটির প্রতি সে এক প্রবল আকর্ষণ বোধ করে ; কিন্তু তার ওই মনোভাবকে সমাজ-স্বীকৃত সংজ্ঞা অনুসারে প্রেম বলা মুশকিল। কারণ প্রধানত তাকে যা আকৃষ্ট করেছিল তা তাঁর সহজ স্বাভাবিক মাতৃভাব। তাঁকে দেখবামাত্র তার মনে পড়েছিল বিস্মৃত শৈশবে ফেলে-আসা মায়ের কথা। অবশ্য এ-ও সমান সত্যি, ভুলে-যাওয়া মায়ের জন্যে তীব্র বিরহব্যথার পাশাপাশি মহিলাটি তার মনে জাগিয়ে তুলেছিলেন আর-এক জাতের ব্যাকুলতাও। পর পর কয়েকদিন একরকম ঘোরের মধ্যেই কেটে যায় ছেলেটির ; তবু সব-কিছুরই ইতি আছে— ছুটি ফুরিয়ে গেলে, কর্তব্য-দায়িত্বের অনক্রমণীয় টানে পাহাড়-জঙ্গল ছেড়ে তাকে ফের নেমে আসতে হয় সমতলে। গতানুগতিক জীবনের বদ্ধ ঘেরে আটকা পড়ে গেলেও তার ভেতরে এক নতুন বোধ কিন্তু সবসময় কাজ ক'রে চলে। প্রবাসে দৈবের বশে তার মন যেরকম আলোড়িত-আলোকিত হয়েছিল তার জের যেন মেটবার নয়। সে এসে কথককে জানায় 'অতীত' বিষয়ে সাধারণ যা ধারণা তা একেবারেই ভুল, মস্ত ভুল। লোকে বলে, যা চলে গেছে, চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেছে, তা-ই অতীত। কিন্তু তার মতে, অতীত আদপেই মৃত বস্তুর সংকলন নয়, নিরাবেগ প্রত্নতাত্ত্বিক কৌতূহলের লক্ষ্যমাত্র নয়, তা সজীব এবং নিত্য-উপস্থিত ; মানুষের স্মৃতিতে যার লয়-ক্ষয় হয় না, যা অব্যয়, যার রূপ স্থিরনির্দিষ্ট, তা-ই অতীত : 'মানুষের যা কিছু নিজস্ব, সে তো অতীত'।[২] এ-গল্প এখানে শেষ হলেই ভালো হত ; ছেলেটি বাকি জীবন তার ওই কদিনের স্মৃতিকে দুর্মূল্য সম্পদ বিবেচনায় যখের ধনের মতো আগলে রাখতে পারবে, এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছেদ টেনে দিলেই

সব দিক বজায় থাকত— কিন্তু তা হয় না। হয় না ছেলেটির বুদ্ধির দোষেই : সেই মহিলা শহরে এসেছেন শুনে সে দৌড়ে যায় তাঁকে দেখতে। একদা রামগিরির অতি কাছের রম্য স্থানটিতে, বর্ষারম্ভের সাড়ম্বর উৎসবের দিনে, তাঁর সঙ্গ তাকে কুহকময়তার আস্বাদ এনে দিয়েছিল ; তাঁর সান্নিধ্য পেলেই সে-সুখবিহ্বলতার পুনর্যাপন সম্ভব, এই আস্থাতেই ছুটে যায় সে। মহিলা তার যথেষ্ট আদর-আপ্যায়ন করেন, কুশলবার্তা নেন, তবু ঠিক সুরটি যেন লাগে না, কথার ফাঁকে-ফাঁকে সে অনুভব করে আগের সে-ছন্দসংগতি চিরকালের মতো চুরমার হয়ে গেছে। এ আশাভঙ্গ আসলে অনিবার্য ছিল ; ছেলেটির ছক-কষা অঙ্ক ভণ্ডুল না হলেই অবাক কাণ্ড হত। কথকের তাই বাঁকা মন্তব্য : 'ও গর্দভ জানে না, যে দেব দেশে ও গিয়েছিল, এ হচ্ছে সে দেশের জিনিশ। এখানে পাবে, এতই সুলভ ?'[৩]

বিস্মরণ-প্রতিস্মরণ

স্মরণ-বিস্মরণের এই আলেখ্যে, পটভূমি হিসেবে রামগিরির নিকটবর্তী অঞ্চলের নির্বাচন, আর যাই হোক, অকারণ বা আপতিক নয় ; কালিদাসের নির্বাসিত যক্ষের ওই চকিত উল্লেখ কাব্যিক চটক তৈরি করার খেলো চমক আদৌ নয়। উলটে, একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, আখ্যানযুক্তি, বুননকৌশল বা বয়ানস্থাপত্য, যে-কোণ থেকেই গল্পটিকে বিচার করা হোক, বিরহকাতর যক্ষের প্রসঙ্গ সেই ফিরে আসবেই। তৎসত্ত্বেও কালিদাসের যক্ষ আর ঋত্বিকের যক্ষ আত্মীয়সম্পর্কে খুব কিছু ঘনিষ্ঠ নয়, সম্পৃক্ত হয়েও ভিন্ন সাহিত্য ঘরানার শরিক তারা, তাদের ভাবমূর্তি দুই আলাদা ধাতুতে গড়া। এর কারণ, কালিদাস এবং ঋত্বিকের মাঝখানে আর-একজনের সাহিত্যগত মধ্যস্থতা ইতিপূর্বে আগাগোড়া পালটে দিয়েছে যক্ষের চেহারা, প্রাচীন কাব্যটিতে যোগ করেছে এক নতুন মাত্রা— ঋত্বিকের অতীত বিষয়ে ওই স্ববিরোধী দার্শনিক ভাষ্যে আছে সেই আধুনিক পঠনের ছাপ। না, 'আকাশগঙ্গার স্রোত ধরে' গল্পে কালিদাস নন, তাঁর বকলমে, নাম ভাঁড়িয়ে উপস্থিত আছেন রবীন্দ্রনাথ। 'মেঘদূত' নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং আলোচনা গল্পটির একাধারে প্রস্থানভূমি ও প্রধান আলম্ব, তার গোপন আশ্রয়-পাঠ। কালিদাসকে সাক্ষী মেনে, 'মেঘদূতে'র কাঠামোকে কাজে লাগিয়ে, রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন 'বন্দী-হৃদয়ের বিশ্বভ্রমণের'[৪] এক স্বতন্ত্র ইতিবৃত্ত, উদ্ভাবন করেছিলেন অতীত-প্রয়াণের এক বিশেষ রূপবন্ধ। রবীন্দ্রনাথের যক্ষও অভিশপ্ত, বিচ্ছেদ-ভাবনায় অস্থির, কিন্তু তার অস্থিরতার উপলক্ষ অচরিতার্থ কামের যন্ত্রণা নয়। এমন-কি, সে বিশেষ কোনো ব্যক্তিও নয় ; বরং যারাই 'বর্তমান' নামক বিনষ্ট কালখণ্ডের বাসিন্দা, একই সঙ্গে এই দুঃসময়ের সন্তান ও বলি, তাদেরই মুখপাত্র সে। কুবেরের কোপ নয়, তার বন্দীভাব ও অন্তর্বিক্ষোভের কারণ চার দিকের 'ইতর কলকাকলি'[৫]। তার মানসবিহার, দূষিত পারিপার্শ্বিক থেকে রেহাই পাওয়ার, চোখ থেকে সাম্প্রতের প্রচ্ছদ খসিয়ে ফেলার উপায় মাত্র। বিষণ্ণ, বিবিক্ত যক্ষের মনে হয়, প্রাচীন ভারতের শ্রী-শোভা-সম্ভ্রম কিছুই আর টিঁকে নেই ; এক ধারাবাহিক রুচিবিপর্যয় ধ্বংস করে দিয়েছে তার আভিজাত্যের গৌরব। আজকের ভাষা ব্যবহার মনোবৃত্তি সবকিছুই বিকৃত, মূলের অপভ্রংশ মাত্র। ভাগ্যের রূঢ় পরিহাসে, সেই কৈবল্যধাম থেকে আমরা চিরতরে বহিষ্কৃত, মোক্ষলোকে পুনঃপ্রবেশের সমস্ত রাস্তাই রুদ্ধ। তবু আর কিছু না থাক, লুপ্ত বৈভবের অভিজ্ঞান হিসেবে রয়েছে কালিদাসের 'মেঘদূত' : কবির কল্যাণে সেই অতীতকাল এখন পরিণত হয়েছে 'অমর সৌন্দর্যের অলকাপুরী'তে[৬]। তাই অমরাবতীতে সশরীরে উপনীত হওয়া না গেলেও বিরহবিচ্ছিন্ন বর্তমান মর্ত্যলোক থেকে সেখানে অন্তত কল্পনার মেঘদূত পাঠানো যায়, যক্ষের যে-মেঘ নগনদীনগরীর ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে তার সহচর হতে পারে পাঠকের বিরহকাতরতার দীর্ঘনিশ্বাস।

কালিদাসের কাব্যের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ গড়ে তোলেন স্মৃতি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের এক নতুন প্রকল্প। এমন-কি, অতীতভারত নামক তাঁর কল্পকাহিনীর উপাদানগুলোও নিত্যপরিচিত, নিরেট তথ্যপুঞ্জ নয় : স্মৃতি

থেকে সেসব আসলে হারিয়ে গেছে, অথচ স্মৃতি তাদের আগলে রাখতে আঁকড়ে ধরতেও চায়। ফলে, তারা থেকেও নেই, না থেকেও আছে : তারা বিদ্যমানতার মধ্যেও অবিদ্যমান, আবার অনুপস্থিতির ভেতরেও উপস্থিত। মাঝ-উনিশ শতকে, বাংলায়, চালু হয় এক নতুন বাচনপ্রকরণ, তৈরি হয় এক নতুন ধাঁচের বয়ান : হারিয়ে-যাওয়া অতীতের জন্য মনোবেদনা তার বিষয়, উঁচু-পর্দায় বাঁধা মন্দ্রগম্ভীর তার কথনভঙ্গি। রবীন্দ্র-যক্ষের বিরহবিলাপও এই বাচনপরিধির শর্তনির্ভর। সেজন্যেই, রবীন্দ্রনাথের ভারতবিগ্রহে অত বর্ণবিভা, যা শুধু ব্যবধান নয়, এক অনভিগম্যতারও চিত্ররূপ। দূরান্বয়ী যক্ষের মূল বক্তব্য : কোনো এক দিন আমরা এক মহাদেশে ছিলাম, সে-জগতের সঙ্গে 'মনুষ্যত্বের নিবিড় ঐক্য' এখনও আমাদের কাছে, কিন্তু সময়ের 'নিষ্ঠুর ব্যবধানে' সে-ঐক্য 'আজ কেবল ভাষায়-ভাবে আভাসে-ইঙ্গিতে' কদাচিৎ উপলব্ধি করা যায়। ফলে, এক মহা দোটানায় পড়েছে সে : সে যেন সেকালেও নেই একালেও নেই, সেদেশেও নেই এদেশেও নেই, স্থান-কালের যে-জোড় সুস্থিতির জন্যে, নিরাপত্তার জন্যে দরকার, সেই জোড়টাই গেছে ভেঙে। সে এক নির্বাস মানুষ— তার ঘর নেই, বাড়ি নেই, নিশ্চিত কোনো পরিচয় নেই। নেতির নৈরাজ্যে তার নিজের বলতে আছে শুধু স্বপ্নলব্ধ ভারতের ছবি— তাকে ঘিরেই আত্মতার এক নতুন প্রসঙ্গ গড়ে নিতে চায় সে। সেই আশ্রয়ভূমির দিকে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া নিঃস্ব শরণার্থীর আর করারই বা কী আছে। যক্ষের স্মৃতিতর্পণে তাই অতখানি উদ্‌বেগের চাপ— তাকে লড়তে হচ্ছে প্রতিকূল প্রতিবেশের বিরুদ্ধে, অবচেতনের জমাট অন্ধকার সরিয়ে আবিষ্কার করতে হচ্ছে ভুলে-যাওয়া বিশ্বকে। তার স্মরণ-অভিযানে আর যাই থাক্, অনায়াস রোমন্থনের অবকাশ নেই। এই সবিশেষ স্মরণ-উদ্যোগের অপর নাম প্রতিস্মরণ। ক্রিয়ার আবেগ ছাড়া, প্রতিরোধের তাগিদ ছাড়া, প্রতিস্মরণের কোনো মানে নেই ; সাধারণগ্রাহ্য চিহ্নব্যবস্থাকে এলোমেলো করে দেওয়াতেই তার সার্থকতা। প্রতিস্মরণের চারণেরা তাই বিধিবদ্ধ শৃঙ্খলার শ্রী চায় না, চায় কেবল বর্তমানের বিপর্যাস। সমাজসম্মত স্মরণগাথার সাহায্যে মানুষকে যে আসলে ভুলিয়ে রাখা হয়, একই কথার ক্লান্তিহীন আবৃত্তি লোকজনকে যে ক্রমে নিঃসাড় করে ফেলে, এই সরল সত্যটা তাদের কাছে জলের মতো পরিষ্কার। সেজন্যেই তারা প্রাতিষ্ঠানিক বয়ানের ঘেরাটোপ ছেড়ে, অনুমোদিত কথন-এলাকার সীমানা পেরিয়ে, বিকল্প উৎসের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে ; হোক-না চূর্ণ, ইতস্তত ছড়ানো, স্মৃতির যেসব উপকরণ এতদিন উপেক্ষিত, অবহেলিত ছিল, সেসবই তারা জড়ো করে তুলবে, গেঁথে নেবে নিয়মের এক নতুন বন্ধনে। প্রতিনির্মাণ যখন পুনর্নির্মাণ, তখন আশ্চর্যের কী যে পুরোনো বনেদের ফাটফাটলের ওপরেই বেশি নজর দেবে নব্যস্থপতিরা। সংরচিত অতীত যদি অব্যবহিত বর্তমানের সঙ্গে ছিন্নযোগ হয়, তা হলে না মেনে উপায় নেই যে মাঝখানে কোথাও সাংঘাতিক কিছু ঘটে গেছে। স্বভাবতই প্রতিস্মরণের প্রকল্পে ছেদ-মুহূর্তের গুরুত্ব অনেক। সে-কারণেই দগ্ধহৃদয় যক্ষদের মতিগতিও বেয়াড়া গোছের : ইতিহাসের ক্ষতচিহ্নগুলোকে ঢেকে না রেখে সুযোগ পেলেই তারা সবার সামনে মেলে ধরে। এরকমই তো হবার কথা ; স্মরণপন্থা যে একধরনের অঘোরপন্থাও।

কিন্তু এও তো সম্ভব, আজ যা প্রতিস্মরণ, কাল তা-ই সরকারি, নিত্যমান্য ধ্যানজ্ঞান— এমন উপদ্রব তো হামেশাই হয়। ইতিহাসের পাকেচক্রে রবীন্দ্র-যক্ষেরও কি সে-দশা হয় নি ? যক্ষের আকুতি যে-বয়ান নির্ভর তাও কি ব্যবহৃত-ব্যবহৃত-ব্যবহৃত হতে-হতে ক্রমশ রীতিসিদ্ধ এবং প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে ওঠে নি ? ঔপনিবেশিক দুর্গতির প্রতিকার চেয়ে, স্মৃতিভ্রষ্ট মানুষের চৈতন্যে অতীত সম্পর্কে শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময় জাগাবার কৃত্যসূচি শেষ পর্যন্ত কি আর-এক বিভ্রমের জন্ম দেয় নি ? অতীত-সংকীর্তনের নামে, ঔপনিবেশিক অধীনতার পাশাপাশি ইসলামি মধ্য-অধ্যায়কে একনাগাড়ে নস্যাৎ করে করেই তো প্রাচ্যতাত্ত্বিক-জাতীয়তাবাদ তার পাকাপোক্ত আকার পেয়েছে— সক্রিয় স্মরণের ওই দীক্ষাই তো একদিন আমাদের সমাজদেহে ও মনে এক নিদারুণ ক্ষতচিহ্ন রেখে যাবে। প্রতিবিধান যখন প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় তখন ফের দরকার পড়ে প্রত্যাঘাতের। এর ইঙ্গিত কি রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' প্রবন্ধেও নেই ? যে-লেখায় কথক যক্ষের সুরে সুর মিলিয়ে অতীত-ঐশ্বর্যের জন্যে হাহাকার করেছে, তাতেই সে, শেষ অনুচ্ছেদে, নিজের অগোচরেই হয়তো-বা, পালটে ফেলেছে তার অবস্থান— এক

মোচড়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে খোদ যক্ষের বিরুদ্ধে। কথকের সন্দেহ, যক্ষের মানসভ্রমণ একপ্রকারের মস্তিষ্কবিকার নয় তো, তার যে চেতন-অচেতনে পার্থক্যজ্ঞান নেই, যদি সে সত্য ও কল্পনার মধ্যেও প্রভেদ হারিয়ে থাকে! একদিকে বর্ণাঢ্য অতীতের নির্মাণ, অন্যদিকে সে-নির্মাণ সম্বন্ধে খট্‌কা, একদিকে চলিষ্ণুতার সংকল্প, অন্যদিকে সে-সংকল্প সম্পর্কে সংশয়, একদিকে ধ্বনিগাম্ভীর্য, অন্যদিকে রঙ্গশ্লেষ— এই দুইয়ে মিলে আমাদের লঘুগুরু জ্ঞান, আমাদের আধুনিকতা ; এই দ্বিস্বরের টানাপোড়েনের ভেতর থেকেই বেরিয়ে এসেছে আমাদের নানান ভবিষ্যভাবনা। অতীতজল্পনার পেছনে আছে পীড়িত অহং-এর নঞর্থক প্রতিক্রিয়া, আছে নঞর্থকতার নিষ্ফলতা থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা— আশা, এ-দুইয়ের দ্বান্দ্বিক পরিণামে একদিন অর্জিত হবে স্বাধিকার, শান্ত হবে ক্ষুব্ধ অভিমান। বলা বাহুল্য, ওই ইতিবাচক লক্ষ্যের এক নয়, বহু আদর্শ রয়েছে, তাদের রাজনৈতিক তাৎপর্য ভিন্ন, কখনো পরস্পরবিরোধীও— শেষমেশ এদের অনেকগুলোই হয়তো দেশের-দশের নামে সমাজের একটি অংশ, গোষ্ঠী বা শ্রেণীর আধিপত্য কায়েম করার কৃৎকৌশল মাত্র। ঠিক সে কারণেই, অতীতপ্রয়াণের রূপবন্ধে, প্রতিস্মরণের প্রকল্পে, হাজার বদ্ধতা সত্ত্বেও, চূড়ান্ত ইতি বলে কিছু নেই, তার কাঠামোর মধ্যেই মজুত থাকে কাটানের অস্ত্র। তেমনি আমার আপনার বা ঋত্বিক, কারো পক্ষেই, আধুনিকতার দ্বিস্বরের দায় এড়িয়ে যাওয়ার জো নেই। তাই 'যেখানে যাবার জন্য তোমার আমার আর চেষ্টার অন্ত নেই', সেই দেবদেশে গিয়েও ফিরে আসতে হয় আমাদের, একসময় নিজেদেরই মুগ্ধতায়, মূঢ়তায় বিরক্ত হয়ে তির্যক আত্মসম্বোধনে ব'লে উঠতে হয় : 'গর্দভ'!

'ছিন্নমূল' থেকে 'বাস্তুহারা'

সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূতে'র যক্ষ এবং ঋত্বিকের 'আকাশগঙ্গার স্রোত ধরে'-র যক্ষ, দুজনেই সমান গর্দভ। তাও, ওই চারিত্রিক মিল সত্ত্বেও তারা কি হুবহু এক ? রবীন্দ্রনাথ একবার লিখেছিলেন : 'আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, ঐ-যে যক্ষের নির্বাসন প্রভৃতি ব্যাপার ও-সমস্তই কালিদাসের বানানো, কাব্যরচনার ও একটা উপলক্ষমাত্র। ঐ ভারা বাঁধিয়া তিনি এই ইমারত গড়িয়াছেন ; এখন আমরা ঐ ভারাটা ফেলিয়া দিব।'[৭] রবীন্দ্রনাথ যেমন কালিদাসের, তেমনি ঋত্বিকও কি রবীন্দ্রনাথের ভারাটা ফেলে দিয়েছেন, আঁতাত মেনেও রবীন্দ্র-যক্ষের সঙ্গে সংঘাতে নেমেছেন ? গ্রথিত হয়েও গ্রন্থিমোচন, যুক্ত থেকেও বিযুক্তি, বিনির্মাণের পরিচিত করণকৌশল— সে-কৌশল ছাড়া কি ঋত্বিকের পক্ষে 'মেঘদূতে'র পুনর্লিখন সম্ভব ছিল ?

'আকাশগঙ্গার স্রোত ধরে' গল্পেই নয়, ঋত্বিকের অনেক লেখাতেই— যেমন, 'এক্সট্যাসি', 'রাজা'— 'মেঘদূতে'র উল্লেখ রয়েছে, উপস্থিত আছে স্মৃতিবিধুর গর্দভ যক্ষেরা। এদের কেউ প্রাক্তন দেশসেবক, কেউ পকেটমার, কেউ নেহাতই গবেট— কিন্তু সকলেই বিকলহৃদয়, বিবশ, মানুষ হিসেবে নিঃসঙ্গ এবং নির্বাস। যদিও 'কামনার মোক্ষধাম', 'অনন্ত সৌন্দর্যের চির নিকেতন'[৮]-এর ঠিকানা তাদের অজানা, ঘুরে-ফিরে তারা কেবল একটি কথাই বলে : 'হেথা নয়,... অন্য কোন্‌খানে'। সুতরাং সন্দেহ কী— 'বিকলহৃদয়', 'বিবশ', 'নিঃসঙ্গ', 'নির্বাস', এই চারটির মধ্যে চতুর্থটিই গল্পের নায়কদের বিশেষিত করার ক্ষেত্রে সবচাইতে লাগসই। ওই 'নির্বাস' শব্দটিই কি ঋত্বিকের চাবিকাঠি— তাঁর গল্প-চলচ্চিত্রে শুধু আলংকারিক নয়, আক্ষরিক অর্থেও প্রযোজ্য ?

'আকাশগঙ্গার স্রোত ধরে' প্রকাশিত হয় ১৯৪৭-এ, দেশভাগের বছরে : ওই বছরেই তো এতকাল যা ছিল বিমূর্ত রূপক, তা নেয় প্রত্যক্ষ রূপ, নির্বাস মানুষের কল্পনা পায় উদ্বাস্তু মানুষের অবয়ব। জাতীয়তাবাদী তত্ত্ব ও কর্মের সাক্ষাৎ পরিণতি, বাংলাদেশের অঙ্গচ্ছেদ— ইতিহাসের ওই ছেদ-মুহূর্ত ঋত্বিকসৃষ্ট প্রতিস্মরণের ভরবিন্দু ; তাঁর ঘোষিত কার্যক্রম : ' "বাস্তুহারা" কথাটিকে... বিশেষ ভৌগোলিক স্তর থেকে সামান্য স্তরে উন্নীত করাই আমার অভিষ্ট।'[৯] বাংলাভাগকে তিনি যে কোনোদিন মেনে নিতে পারেন নি, নানাভাবে বহুবার

ঋত্বিক তা বলেছেন। অনেকের মতেই যা বাস্তবসিদ্ধ, *fait accompli*, যা নিয়ে কান্নাকাটি বা তর্কাতর্কি করাটা হাস্যকর, ঠিক সেটাই তিনি ভুলতে চান নি, অন্যদেরও ভুলতে দেন নি। মনে রাখবার ওই অদম্য স্পৃহাই পালটে দিয়েছে দেড়শো বছর ধরে চলে-আসা 'ছিন্নমূল সত্তা' নামক গূঢ়ার্থের ব্যঞ্জনা : সে গূঢ়ার্থের ভেতর এখন জমা হয়েছে উৎপাটিত মানুষের যমযন্ত্রণা। ঋত্বিকের বয়ানে দেশভাগ বিরামচিহ্ন নয়, বিচ্ছেদ-যতি : এর ফলেই, স্বাধীনতাপূর্ব নিজদেশে-পরবাসীর রূপকল্প থেকে স্বাধীনতা-উত্তর নিরালম্ব মানুষের রূপকল্পে সম্প্রসারণের সরল অঙ্কে পৌঁছোনো যায় না, আগে-পরের ওই দুই বিমূর্ত আদিরূপের মাঝখানে, একযোগে সংযোজন ও বিয়োজন চিহ্নের মতো, আছে ভিটেমাটি উচ্ছেদ হয়ে-যাওয়া লক্ষ লক্ষ রক্তমাংসের লোক। এদের অনেকেই কোনোমতে ঠাঁই করে নিয়েছে শহর কলকাতার উপকণ্ঠে ; অন্তেবাসী যারা, কেবল তারাই তো বাসাবদলের স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে, যে-যুগের মূল কথা 'উদ্বাস্তু ! কে উদ্বাস্তু নয় ?' সে-যুগের তারাই তো সেরা প্রতিনিধি। আর যারা দেশগাঁ ছেড়ে না এলেও, আর্থিক অনটনে ভদ্রসংস্থানের আশা মেটাতে পারে না, অভাবের দরুন থাকবন্দী সমাজের নীচের দিকে তলিয়ে যায়, তারাও তো উদ্ভিন্ন, উদ্বাস্তুই একরকম। প্রাচীন যক্ষ এখন তাই নাগরিক, এক বাস্তুহারা নাগরিক। শুধু কালিদাসের যক্ষকে কেন, কালিদাসের শকুন্তলাকেও, কণ্বমুনির আশ্রম থেকে মহানগরীর রাজপথে নিয়ে আসেন ঋত্বিক— 'কোমলগান্ধার'-এ রবীন্দ্রনাথের মারফত আবার, শকুন্তলাকে রূপান্তরিত করে নেন ভাঙা বাংলার প্রতিবিম্বে।

উদ্ধৃতির রাজনীতি

ঋত্বিকের শিল্পকর্মের মতো উদ্ধৃতিবহুল শিল্পকর্ম অল্পই আছে— এক পুরাণকল্পের সঙ্গে আর-এক পুরাণকল্পের সংযোগ ঘটিয়ে, এক পাঠ্যের ভেতর আর-এক পাঠ্যের সংক্রাম ঘটিয়ে, আন্তর্বুননের জটিল থেকে জটিলতর নকশা তৈরি করেন তিনি। ইয়োরোপীয় ইতিহাসের এক মারাত্মক ক্রান্তিলগ্নে, নাট্শি পর্বে, ওয়ালটার বেনজামিন ভেবেছিলেন, সময়ের সহজ পারম্পর্য যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন অতীতকে উদ্ধার করবার একমাত্র পথ হয় উদ্ধৃতি : টুকরো উল্লেখ জুড়ে জুড়ে আর কিছু না হোক, অপস্মারগ্রস্ত বর্তমানের আত্মতুষ্টিকে খুঁচিয়ে তোলা খুব সম্ভব। উদ্ধৃতি সে ক্ষেত্রে যান্ত্রিক পুনরুক্তি বা বোবা প্রতিধ্বনি নয়, তার মর্মে থাকে অন্তর্ঘাতের পরিকল্পনা, ভবিষ্যতের জন্যে পিছুটান। ঋত্বিক অন্তত এ-বিষয়ে বেনজামিনের সঙ্গে শতকরা একশো ভাগ সহমত হতেন। সংস্কৃতির কত বিভিন্ন মহাফেজখানা থেকে যে তিনি তাঁর উপাদান আহরণ করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই— বেদ-উপনিষদ, ধ্রুপদী ও লোক-সংগীত, রবীন্দ্রনাথের গান-কবিতা, কী নেই। সাংস্কৃতিক-স্মৃতির সচেতন সংগঠনে, পুনর্লিখনের অবিরত প্রক্রিয়ার জোরে অনেকান্ত ঋত্বিকের ছবি— যেমন খোলামুখ, জননকালের নির্দিষ্ট পরিসর ও প্রয়োজনের বাইরেও প্রাসঙ্গিক, তেমনি দুরূহ, কখনো দুর্বোধও। সে-কারণেই তাঁর সামাজিক মতাদর্শ নিয়ে এত বিভ্রান্তি, এত বিতর্ক।

আলোচনার সুবিধের জন্যে, সামাজিক মতাদর্শকে দুই উপভাগে সাজিয়ে নেওয়া যাক : সমস্যাপট ও যুক্তিপট। সমস্যাপট বুনে দেয় বয়ানের ক্ষেত্র, ছকে নেয় অভীষ্ট লক্ষ্যের আদল ; সমস্যাপটের বিন্যাস অনুসারে নির্ধারিত হয় অনুসন্ধানের কক্ষপথ, তার সাপেক্ষেই ফুটে ওঠে সম্ভাব্য ভবিষ্যের আভাস। অন্য দিকে, সেই ঐতিহাসিক সম্ভাবনা যে বিচারগ্রাহ্য, ন্যায্য, তার নথিপ্রমাণ দাখিল করে যুক্তিপট। যুক্তিপট, জ্ঞানতাত্ত্বিক ও নৈতিক শৃঙ্খলার নামবিশেষ ; যে-কাঠামো ছাড়া বিক্ষিপ্ত সব উপাদান গোনাগাঁথা যায় না, অর্থবহ হয় না, তার জোগানদার। প্রশ্ন যেখানে আত্মপরিচয়ের প্রতিষ্ঠা, আত্মতার নবনির্মাণ, নৈতিকতার প্রসঙ্গ সেখানে অপরিহার্য। প্রচলিত জাতীয়তাবাদী বীক্ষায়, সমস্যাপট ও যুক্তিপটের পারস্পরিকতা অত্যন্ত পরিষ্কার, হয়তো-বা অতিমাত্রায় প্রকট : হিন্দু আধ্যাত্মিকতার, প্রাচ্য শ্রেষ্ঠতার, জিগির দিতে দিতে একসময় তা কতখানি

উৎকট আকার নেবে, তার পূর্বাভাস কি 'সুবর্ণরেখা'য়, হনুমানজির অনুগত সেবক এবং প্রচারক, জাতপাঁতে ঘোর বিশ্বাসী, রামবিলাসের ব্যাবসাবুদ্ধি ও কার্যকলাপে নেই? জাতীয়-রাষ্ট্রীয় সমস্যাপটটাই যাঁর কাছে সমস্যা, জাতীয়তাবাদী বদ্ধ ছাঁচ থেকে অধিকৃত অতীতকে বের করে আনা যাঁর অভিপ্রেত, তাঁর যুক্তি, প্যাঁচ-দেওয়া পাক-খাওয়া হতে বাধ্য। ঋত্বিকের জগৎ ভাঙচুরে ভর্তি, ট্যারাব্যাঁকা আবার জঙ্গম ; সমস্যা ও যুক্তির গ্রন্থিও তাই আলগা, মীমাংসা মাত্রেই অস্থায়ী, সাময়িক। এমন টালমাটাল অবস্থায়, দুই পটের ভেতর পরিচ্ছন্ন কোনো সম্বন্ধ না থাকাই স্বাভাবিক ; ওই অস্বাভাবিকের কল্যাণে, খোদ যুক্তিপটটাই তাঁর শামিল হয়ে গেছে সমস্যাপটে— সমস্যার যুক্তির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে যুক্তির সমস্যা, যুক্তিতর্কের মধ্যে ঢুকে পড়েছে গপ্পো।

রচনার ভেতরকার কলকব্জাগুলোকে, বাস্তববাদী-স্বভাববাদী বিধানমাফিক, পাঠ্যশরীরের খাঁজে-ভাঁজে লুকিয়ে না রেখে একেবারে উদ্ঘাটিত করে দেন ঋত্বিক, লেখনের যুক্তি ও প্রযুক্তি, পুরো পদ্ধতিটাকেই, করে তোলেন পাঠ্যের বিষয়বস্তু। শিল্পসংক্রান্ত যে বিশ্বাস-অভ্যাস আমাদের প্রায় মজ্জাগত, তার নিরিখে এ এক অসাধ্যসাধন— শিল্পগত এ পালাবদলের পেছনে আছে আর-এক পালাবদল : দেশভাগ। ঋত্বিকের প্রতিস্মরণে দেশভাগ, সমস্যা আর যুক্তিকে এক জায়গায় মেলায় আবার পরক্ষণেই ভেঙে দেয় পরস্পরের অন্বয়। তাঁর বেশিরভাগ ছবিতে বাংলাভাগ মূলধুয়ো যেমন, তেমনি প্রকরণের অঙ্গ। হৃদয় খুঁড়ে খুঁড়ে বেদনা জাগাবার এই চেষ্টার ফাঁড়াও কিন্তু ঢের— সামান্য অসাবধান হলে, যা প্রদাহ, প্রবহমান যন্ত্রণার মতো তা-ই এক অন্তরঙ্গ অন্ধ আবেশে দাঁড়িয়ে যেতে পারে, অনন্তর অন্তঃক্ষরণের চরম পরিণতি হতে পারে আত্মঘাতী অবসাদ। এই বিপদ সম্পর্কে, নিজের মুদ্রাদোষে একা আলাদা হয়ে যাওয়ার বিপাক সম্বন্ধে গোড়া থেকেই অবহিত ছিলেন ঋত্বিক। যে-বোধ তাঁকে সারাজীবন তাড়া করে ফিরেছে, ভেতরে-ভেতরে কুরে-কুরে খেয়েছে, তাকেই তিনি চার ধারে ব্যাপ্ত করে দিয়েছেন। ঋত্বিকের মূল প্রতিপাদ্য : খণ্ড খণ্ড ব্যক্তি নয়, গোটা ইতিহাসটাই এখন স্নায়বিক পীড়ায় আক্রান্ত, উদ্বায়ু।

ঋত্বিকের রণরীতি : দৃশ্য-অবরোধ

'কোমলগান্ধার'-এর সেই দৃশ্যটির কথা স্মরণ করুন : পদ্মার তীরে ক'জনে মিলে যখন, গানে-কথায়, নানান সাংস্কৃতিক উদ্ধৃতির সহযোগে, দুই বাংলার যৌথ স্মৃতির উদ্রেক ঘটাচ্ছে, নিজেদের মতো করে বানিয়ে নিচ্ছে পারাপারযোগ্য সেতু, ঠিক তখনই ক্যামেরা ট্রেন-লাইন বরাবর এগোতে-এগোতে ক্লোজ়-ইন করে বিয়োগচিহ্নের মতো আনুভূমিক কাঠের একটা ফলকের ওপর, এতক্ষণের একটানা 'দোহাই আলি'-র আর্তরবের জায়গায় শোনা যায় এক চুরমার আওয়াজ : তার পর ফ্রেম-জোড়া নিরেট অন্ধকার, আবহ বলতে কান ঝাঁ-ঝাঁ নীরবতা। ঋত্বিক একবার লিখেছিলেন, চলচ্চিত্রে টান টান আততি তৈরি করা যার লক্ষ্য, সে-ই বোঝে নৈঃশব্দ্যের, পরম নৈঃশব্দ্যের গুরুত্ব[১০]।

মনে হয়, ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও যেন ছুটছি, দৌড়োতে দৌড়োতে আচমকা ধাক্কা খেয়ে থেমে পড়ছি। অতর্কিত গতিরোধ সমস্ত শরীরটাকে নাড়া দেয়, ঝাঁকিয়ে দেয়, স্নায়ুতন্তু থেকে স্মৃতিকোষে ছড়িয়ে যায় সেই ঝাঁকুনি। সচরাচর ঋত্বিকের ক্লোজ়-আপ্ চেটালো পটের মতন : বাস্তববাদী নিরীক্ষায় চিত্রানুপাতের সংগতি যেখানে শুধু কাম্য নয়, অপরিহার্য, ঠিক সেখানেই ব্যাকরণের বেড়া ডিঙিয়ে উলটো কাণ্ড ঘটান তিনি। তাঁর ক্লোজ়-আপ যথানুপাতিক বোধ বা নির্মোহ প্রেক্ষিতের প্রত্যাশা মেটায় না, বরং তৈরি করে মুখোমুখি সাক্ষাতের ছিন্ন-ছিন্ন মুহূর্ত। তিনি যে-ভাঙনের কাহিনী শোনাতে চান, তার হাত থেকে তো আমাদের প্রথাগত নান্দনিক বোধ, দৃষ্টিসংস্কার, কোনো কিছুরই নিস্তার নেই। ফলে, আইনকানুনের তোয়াক্কা না করে প্রায় একেবারে পর্দা জুড়ে বুখে দাঁড়ায় ঋত্বিকের ক্লোজ়-আপ : দর্শক যে যন্ত্রণার সত্যকে সন্তর্পণে পাশ কাটিয়ে যাবে, তার বীক্ষণ

নিস্পৃহ অবলোকনের মতো হবে, সে রাস্তা বন্ধ, ওই দৃশ্য-অবরোধের সঙ্গে মুখোমুখি, সরাসরি সংঘর্ষে আসতে তাকে হবেই। প্রতিটি দৃশ্য-অবরোধ প্রত্যক্ষ করায়, সামনাসামনি নিয়ে আসে কোনো-না-কোনো ভগ্নস্তূপ : যেমন, 'কোমলগান্ধার'-এ বাংলা-বিভাজনের স্মারক দ্বিমাতৃক মাটির সমান্তরাল সেই বিয়োগরেখা, 'সুবর্ণরেখা'য় জনমানবহীন পরিত্যক্ত বিমানবন্দর, অথবা 'মেঘে ঢাকা তারা'-য় চোখের তলায় কালি-পড়া ক্লান্ত ক্ষয়িষ্ণু নীতার মুখ। ইতিহাসের যে-জটিল নানামুখী বিস্তারকে ঋত্বিক ভাষা দিতে চান, তারই ঘনসংবদ্ধ সংকেত তাঁর ক্লোজ-আপ, অনেক গল্প অনেক গ্লানির পুঞ্জীভূত রূপ। তাঁর দ্বিরায়তনিক ক্লোজ়-আপের অভিঘাত প্রত্যক্ষ এবং প্রচণ্ড ; তার প্রতিক্রিয়া শুধু মানসিক নয়, প্রবলভাবে শারীরিকও। দর্শক তাতে সাড়া দিতে, দৃশ্যবস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে, অংশত হলেও, বাধ্য ; কিন্তু ঋত্বিকের বৈশিষ্ট্য এখানেই যে, একাত্মতার ওই মুহূর্তগুলোই দর্শকের পক্ষে সবচেয়ে সঙ্গিন, তাকে তার দীর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থার কথা স্মরণ না করিয়ে ছাড়ে না। যতই নিবিড় সংহত হোক, তাঁর কোনো প্রতিমাই লিরিক তন্ময়তাকে বেশিক্ষণ প্রশ্রয় দেয় না। উলটে দর্শককে বার বার টেনে আনে ইতিহাসের খোলা পরিসরে, যা ঘটে গেছে এবং যা হয়ে চলেছে, এ-দুইয়ের সন্ধিস্থলে। 'সুবর্ণরেখা'য় বাচ্চা সীতা আপনমনে খেলতে-খেলতে দৌড়োতে-দৌড়োতে আচম্‌কা এক ভয়ংকর দৃশ্যের সামনে পড়ে যায় : সে দেখে, তার পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে, আর কেউ নয়, স্বয়ং করালবদনা বিবসনা কালী। সবার প্রাণে 'আদিম পৃথিবীর মাতৃ-আহ্বান' পৌঁছে দেবার জন্যেই হয়তো মহাদেবীর আগমন, কিন্তু খানিক পরেই সে মোহ ঘুচে যায় : নকল জিব সরিয়ে নিলে কালীমূর্তির আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে এক হতদরিদ্র বহুরূপী— পটভূমি যেখানে পোড়ো বিমানপোত, উড়াল যেখানে স্তব্ধ, সেখানে সত্যি কি শক্তিস্বরূপা আবির্ভূত হতে পারেন ; আধুনিকের ছোঁয়াচ সত্ত্বেও অক্ষুণ্ণ রইবে তার পূর্বমহিমা, পৌরাণিকের কি তেমন জোর আছে? ঋত্বিক যে-ধ্বংসকাণ্ডের কথাকার, তার বর্ণনায় ক্রিয়ার কাল হিসেবে অতীত একদম অচল— এমন-কি, দেশভাগের মতো ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণও পুরাঘটিত অতীতের নিরাপদ দূরত্বে পেশ করা হলে অন্বয়দোষ বর্তায়। ঋত্বিকের বয়ানে, শট্-যোজনায়, ঘটমান বর্তমান বাদে অন্য কোনো কালের প্রয়োগ নিয়মবিরুদ্ধ। যে-ক্রিয়া চলছে, এখনও সমাপ্ত হয় নি, স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ-কে যা অন্বিত করছে, তাকেই তিনি চিনতে চেনাতে চান। ইতিহাসের দৈনন্দিন আর দৈনন্দিনের ইতিহাস একজায়গায় না মেলালে, নিজে নীলকণ্ঠ না হলে এ-যুগের নচিকেতাদের কি নরকদর্শন করানো যেত?

সে-নরক কোথায় নেই— 'সুবর্ণরেখা'য় ঈশ্বর, কলেজে সহপাঠীরা একদা যাকে সমীহ করে বিদ্যাসাগর বলে ডাকত, অবদমিত রিরংসার প্রণোদনায়, নামের মর্যাদা জলাঞ্জলি দিয়ে, মেয়ের খোঁজে এক গেরস্থঘরে গিয়ে ঢোকে— গিয়ে দাঁড়ায় নিজের বোন সীতার সামনে। এই নিদারুণ সাক্ষাৎ আকস্মিক হয়েও আকস্মিক নয় ; কারণ, ঋত্বিকের মতে, বোনের অবমাননা টুকরো ব্যতিক্রমী কোনো ঘটনা নয়, তা দ্বিখণ্ডিত বাংলার রোজকার দেখা ভেঙে-পড়া ক্ষয়ে-যাওয়া চেহারার উপমানও। উপমার যুক্তিতে তিনি দেখান, এক স্তরে যা কাকতালীয় আর-এক স্তরে তা-ই অবশ্যম্ভাবী ; একভাবে যা দৈবাৎ ঘটে-যাওয়া, ব্যক্তিগত, অন্যভাবে তা-ই প্রাত্যহিক, সর্বজনীন। সীতার লাঞ্ছনার ট্র্যাজিক তাৎপর্য ভাইবোন সম্পর্কে অজাচারের নিষেধকে ঘিরে তৈরি হয়, আবার ছাপিয়ে যায় তার গণ্ডি— অতিক্রমণের সাহায্যেই ছোটো থেকে বড়োতে, কণিক-সামাজিক থেকে আয়ত-সামাজিকে অবলীলায় চলে আসেন ঋত্বিক। 'সুবর্ণরেখা'য় অনন্যোপায় সীতা, 'কোমলগান্ধার'-এ কাব্যপ্রসিদ্ধ শকুন্তলা বা 'মেঘে ঢাকা তারা'য় ভারবাহী নীতা— সবাই বাস্তুহারা, সবাই ইতিহাসের লোকজন। ঋত্বিকের জগতে দেশভাগ এক উৎপ্রেক্ষা, সচল এবং সর্বগামী, একইসঙ্গে বয়ানের ভরকেন্দ্র এবং বিকেন্দ্রায়ণের উপায়। ওই ক্ষতচিহ্নের স্বাক্ষর রয়েছে ঘরে-বাইরে, নিত্যদিনের অভিজ্ঞতায়। ঋত্বিকে তাই যেখানে-সেখানে যখন-তখন বাংলাভাগের প্রসঙ্গ উঠে পড়ে, ছিন্ন করে দেয় কাহিনীসূত্র। নির্দিষ্ট একটি স্থির কেন্দ্রকে ধরে গল্প যে দানা বাঁধবে, অবধারিত অতএব নির্ঝঞ্ঝাট কোনো সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যাবে তার জো নেই। না, ঋত্বিকের ছবিতে নিটোল সামগ্রিকের সান্ত্বনা নেই— বাংলাদেশের অঙ্গচ্ছেদও, চলতি মতের বিপরীত, হারানো শুদ্ধ উৎসের জন্যে সস্তা আকুলতা জাগাবার অজুহাত নয়। তাঁর চরিত্রসৃষ্টির পদ্ধতিও আলাদা ; না হয়ে উপায় কী— যদি

সবই পরিবর্তনময় হয়, সামাজিক স্থানাঙ্কের ঠিকানা যদি কারো না থাকে তা হলে কি, চরিত্রায়ণের বেলায় 'ত্রিমাত্রিক ঘনতা', 'পরিমিতি', 'যথাযথতা', 'অনুপুঙ্খে নিখুঁত', 'বিশ্বস্ত প্রতিলিপি' ইত্যাদি ধরতাই একতিল কাজে লাগে ? ঋত্বিকের কোনো চরিত্রই সে অর্থে স্বসম্পূর্ণ নয়, ব্যষ্টিবাদী মনস্তত্ত্ব মোতাবেক ব্যক্তিমাত্র নয়। তারা প্রত্যেকেই এক নিয়ত প্রক্রিয়ার অন্তর্গত, সামাজিকের অংশভাক্— লেন্স যতই আগুপিছু করা হোক, স্পষ্ট ফোকাসে তারা কখনোই আসে না, শত চেষ্টা সত্ত্বেও অনির্দেশ্য থেকে যায় তাদের ব্যক্তিসীমানা। 'সুবর্ণরেখা'য় ঈশ্বরের যে-দশা হয়েছিল : সীতার ঘরে চশমা-ছাড়া চোখে বোনকে সে ঠিক ঠাহর করতে পারে না, সব তার ঝাপ্সা-ঝাপ্সা ছায়া-ছায়া ঠেকে, কেমন যেন রহস্যজনক, দুর্জ্ঞেয়।

এক ও অনেক নাগরিক

'মেঘে ঢাকা তারা' 'কোমলগান্ধার' 'সুবর্ণরেখা' এই দেশভাগত্রয়ীর বেশ আগে, ১৯৫১-৫২য় ঋত্বিকের হাতে-খড়ি : 'নাগরিক' তাঁর প্রথম ছবি, আধুনিক বাংলার দুর্যোগ বিষয়ে প্রথম বিবৃতি। প্রসঙ্গের ঐক্য সত্ত্বেও আঙ্গিকের বিচারে 'নাগরিক'-এর সঙ্গে পরের তিনটি ছবির পার্থক্য অনেক। তা-ও আখ্যানবস্তু আর আখ্যানযুক্তির যে-সংশ্লেষ ঋত্বিক একদিন ঘটাবেন, তার কয়েকটি আগাম লক্ষণ 'নাগরিক'-এ আছে : আর কিছু না হোক, গোড়াপত্তনের ধরন থেকে পরবর্তী বিকাশের আঁচ নিশ্চয়ই মেলে।

মা বাবা দুই ছেলে এক মেয়ে— এই পাঁচজনকে নিয়ে 'নাগরিক'-এর পরিবার। এরা পুব বাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তু নয় ; না হলেও, শিক্ষকতা থেকে বাবা সুরেশ বাগচী অবসর নিলে, শ্যামপুকুরের বড়ো বাড়ি ছেড়ে তাদের উঠে আসতে হয়েছে কলকাতার এক ঘিঞ্জি পাড়ায়, চার পাশ চাপা স্যাঁতসেতে একটা বাড়িতে। বড়ো ছেলে রামু সাবালক হলেও স্বাবলম্বী নয়, এখনও বেকার— দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর ডামাডোলে চাকরি জোটানো মুখের কথা নয়। বাবার পেনশনটুকুই পরিবারের ভরসা— ওই যৎসামান্য আয়ে কায়ক্লেশে গ্রাসাচ্ছাদন যদিও বা হয়, সুস্থভাবে বেঁচে জীবনটাকে আরেকটু বর্ণময়, উপভোগ্য করে তোলা অসম্ভব। সৎ আদর্শবাদী পিতা জীবনের প্রান্তে বসে ভাবেন, এ আমরা কোথায় এলাম : 'আমাদের বাংলা ছিল গড়া বাংলা। আজকের বাংলা হচ্ছে ভাঙা বাংলা।... একটা পুরোনো দালানের মতো দেশটা ভেঙে পড়ছে।' হেঁশেল ঠেলে ঘরদোর সামলিয়ে মা'র দিন যায় ; ফেলে-আসা বাড়ির জন্যে আক্ষেপ তাঁর ঘোচবার নয় : 'বাড়িটা যেন হাড়েপাঁজরায় মিশে আছে।' হাঁপ-ধরা সংকীর্ণ পরিবেশে মা'র মতো রামুর মনও ঘুলিয়ে ওঠে, মুক্তির স্বপ্ন দেখে সে। সেই স্বপ্নের বিশ্বাস্য চিত্ররূপ সে খুঁজে পেয়েছে নোনা-ধরা দেয়ালে টাঙানো পুরোনো একটা ক্যালেন্ডারের ছবিতে : তাতে আঁকা, দিগন্তলীন মাঠের মাঝখানে একখানা লাল টালির বাংলো। রামু নিত্য নিজেকে স্তোক জোগায়, আর কয়েকদিনের ভেতরেই সে চাকরি পাবে— পেলেই, প্রেমিকা উমাকে বিয়ে করে অমনই এক খোলামেলা জায়গায় ঘর পাতবে দুজনে ; রূপকথার শেষে যেমন হয়, 'অতঃপর তাঁহারা সুখে-শান্তিতে রাজত্ব করিতে লাগিলেন', তেমনিভাবে 'করিতে লাগিলেন'-এর মতো নিরন্তরতাবোধক স্বস্তিদায়ক যৌগিক ক্রিয়ার আবেষ্টনে গুছিয়ে নেবে সাধের সংসার। রামুর এই সুখকল্পনা সম্পর্কে 'নাগরিক'-এর প্রচারপুস্তিকায় ঋত্বিক লিখেছিলেন : ' [রামুর] চোখে স্বপ্ন...একটি নীড় বেঁধে উমার সঙ্গে তার দিন কাটবে মন্দাক্রান্তা তালে।'[১১]

'মন্দাক্রান্তা' : শব্দটি 'নাগরিকে'র সঙ্গে 'মেঘদূত'-এর, রামুর সঙ্গে ঋত্বিকের অন্যান্য যক্ষসদৃশ নায়কদের আত্মীয়বন্ধন নির্ভুলভাবে চিনিয়ে দেয়। ১৯৪৭-এ প্রকাশিত 'এক্সট্যাসি' গল্পের ক্লান্ত তিক্ত প্রাক্তন দেশকর্মী, মধ্যপ্রদেশের জংলা রুক্ষ প্রকৃতি আর গভীর নীল আকাশের কাছাকাছি পালিয়ে যায় ; নির্জন প্রান্তরে শুয়ে-বসে ধীরে-সুস্থে বাকি কটা দিন কাটিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে তার। সে ভাবে : 'না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরা, কিছু না বুঝে ছুরি খেয়ে শেষ হওয়া, বীভৎসতা আর দৈনন্দিন জীবনের শত-সহস্র বেদনা, এবং তারই পাশে ধনিকের

টাকার জোরে সমগ্র শাসন-যন্ত্রটাকে হাতে ক'রে উল্লসিত উদ্দাম পৈশাচিকতা, এর বিরুদ্ধে আমি কি করতে পারি ?... তার চেয়ে এই ভালো ।...কি ভালো যে লাগছে, বলতে পারি না। এ সেই কালিদাসের মেঘদূতের দেশ, আমাদের অলকার দেশ ।'[১২] যদিও সে জানে বনে-বনান্তরে যে রস ক্ষরিত হচ্ছে তাতে লীন হলে পাগল হয়ে যাবে তবু ওখানেই রয়ে যেতে বদ্ধপরিকর সে। তার যাই হোক, একসময় কি রামুর অসহ্য লাগবে না ও-আত্মরতি, 'আকাশগঙ্গার স্রোত ধরে' গল্পের নায়কের মতন তাকেও কি শুনতে হবে না কথকের সেই ধিক্কার : 'গর্দভ !'

কথক-স্বর গোপন রাখবার কোনো প্রয়াস 'নাগরিক'-এ নেই। পাত্রপাত্রীদের বিশেষ কিছু মন্তব্যে কথক-কণ্ঠ পরিষ্কারভাবে উপস্থিত। বাগচী পরিবারের পেয়িং গেস্ট, রসায়নবিদ সাগর সুরেশবাবুকে বলে, প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যে এত শোচনীয়, তার মূল কারণ, শোষণ ; মানুষের এই দুঃখকষ্ট আসলে অর্থহীন। বর্তমান বাংলা যাঁর চোখে জীর্ণ দরদালানের মতো, সেই সুরেশবাবু রামুকে বলেন : 'ভাঙাটাকে মানলে গড়ার রাস্তাও দেখা দিতে পারে।' রামুর বামপন্থী বন্ধু সুশান্ত তাকে সেই গড়ার রাস্তাটাই দেখাতে চায় : যে-পুঁথিতে মানুষের অনেক অভিজ্ঞতা জমা আছে তাকে ঠিকমতো কাজে লাগিয়ে জীবনের সঙ্গে এক করে নেবার পরামর্শ দেয়, রামুকে সংঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের শরিক হওয়ার আমন্ত্রণ জানায়। বাড়িভাড়ার দায়ে ঘরছাড়া, খ্যাপাটে আধবুড়ো যতীনবাবু বস্তিবাড়িতে উঠে যাবার সময় রামুকে তার ভবিষ্যৎ পরিস্থিতির ইঙ্গিত দেয় : 'সুশান্তবাবুর কথাগুলো মনে পড়ছে ; আমাদের সকলের পথই ওই এক জায়গাতে গিয়েই শেষ হবে।' যতীনবাবু, 'সুবর্ণরেখা'র হরপ্রসাদের পূর্বসূরি ; রঙ্গপ্রিয় স্বপ্নপাগল হরপ্রসাদ যেমন সদাগম্ভীর সাংসারিক ঈশ্বরের, তেমনি যতীনবাবুও রামুর অতিকৃতি, কমিক আত্মস্বরূপ[১৩]— সহজ, একের মধ্যে আরেকজনকে আবিষ্কার করা। আর আছে এক রহস্যময় বেহালাবাদক— হঠাৎ-হঠাৎ উদয় হয়ে গল্পের জোড় ভেঙে দেয়। বেহালাবাদকের একটা বিশেষ সুর রামুকে নেশার মতো পেয়ে বসে, কিন্তু যতবারই রামু তাকে সুরটা বাজাতে অনুরোধ করে, বক্রব্যঙ্গের হাসি হেসে সে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। কে এই বিস্ময়কর বাজনদার ? বিবেক ? ইতিহাসপুরুষ ? বেহালায় ছড়ের টান, কামারশালার আওয়াজ, আন্তর্জাতিকের সুর— সাউন্ড ট্র্যাকের বিন্যাসেও স্পষ্ট কথকের পথনির্দেশ। এই ছ'টি দৃষ্টান্ত থেকে 'নাগরিক'-এ কথক-স্বর প্রক্ষেপণের রীতিবৈচিত্র্যের একটা আন্দাজ পাওয়া যায় : কোথাও সরাসরি বাচনিক, কোথাও তির্যক, প্রতীকী। ঋত্বিকে কথক-কণ্ঠ চিরকালই সোচ্চার— কেবল তাঁর ছবি যত পরিণতমনস্ক হবে, তত কঠিন হবে বাচনিক-অবাচনিকের ক্ষেত্রবিভাজন। 'নাগরিক'-এ কথক, যেন পদাধিকারবলেই, একটু উঁচু থেকে আত্মবিভোর রামুদের ওপর তদন্ত চালায়, ভর্ৎসনা করে। কিন্তু এর পর থেকে, উচ্চাসনের যত বিশেষ সুযোগ-সুবিধে একে একে সব ছাড়তে হয় ঋত্বিকের কথককে ; সংশয় আর জিজ্ঞাসায় ক্ষতবিক্ষত হতে-হতে, 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'-য় অবশেষে নেমে আসতে হয় অন্যদের সমতলে। কিন্তু যতই ক্ষমতাধর হোক, একা কথক কি 'নাগরিক'-এর রামুকে ঘরের বাইরে টেনে আনতে পারত— ভেতরের চাড় ছাড়া কি কেউ মঙ্গলসমাচারে কান দেয় ? রামুদের আত্মজ্ঞানের যা প্রধান অন্তরায় তা-ই যদি অশনাক্ত থাকে তা হলে তো শত আন্তরিকতা সত্ত্বেও মুক্তির আয়োজন পণ্ড হতে বাধ্য। কী সেই অন্তরাল ?

বহির্বিশ্বের চাপে পারিবারিক বিপাক, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে ঘরোয়া ব্যবস্থার সংঘাত, বাংলা গল্প-উপন্যাস-নাটক-চলচ্চিত্রের একটি প্রিয় বিষয়। এই সমস্যাটি সাধারণত যেভাবে উপস্থাপিত হয়, তাতে মনে হয় যেন, বস্তুদুনিয়া আর পরিবারকেন্দ্রিক আবেগজগৎ মানবজীবনের দুই আলাদা এলাকা— এতদূর আলাদা যে প্রথমটিতে ক্ষয়বৃদ্ধি অদলবদলের বিড়ম্বনা থাকলেও দ্বিতীয়টিতে তেমন কোনো ঝঞ্ঝাট নেই, সমস্তকিছুই সেখানে সংগত এবং সনাতন। যেন, আমাদের সংসারের একপ্রান্তে রয়েছে বিবর্তন-পরিবর্তন, অন্যপ্রান্তে নিত্য-আবর্তন, একধারে সামাজিকের অনিশ্চয়তা অন্যধারে স্বাভাবিকের বরাভয়। এই বর্গবিভাগ তথাকথিত জনপ্রিয় শিল্পসাহিত্যের মুখ্য অবলম্বন— ওই সব-খোল্ চাবিখান আছে বলেই আপতিকের দুর্ঘটকে আবশ্যিকের প্রত্যয়ে শামাল দেওয়া সোজা। আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা এবং আবেগব্যবস্থা যদি একে অপরের বিপরীত এবং পরিপূরক

হয়, তা হলে দেশ-কালে যাই হোক-না-কেন, বিভিন্ন পারিবারিক আদিরূপে ঘা পড়ে না : সব-বহা সব-সহা মা'র মমতায় ঘাটতির প্রশ্ন ওঠে না, ভাইবোন সম্পর্ক যথারীতি নির্মল অপাপবিদ্ধ রয়ে যায়, বড়োছেলে আত্মদানের শরৎচন্দ্রীয় আদর্শে সংসারের যূপকাষ্ঠে নিজের বলি দেয়, ইত্যাদি প্রভৃতি। পারিবারিক সম্বন্ধগুলোকে শুধু মৌলিক নয়, নিষ্কলুষ এবং ইতিহাস-ঊর্ধ্ব দেখিয়ে বহু সংকটের চটজলদি সুরাহা করা যায়— পারিবারিক মতাদর্শকে দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে নিলে যে সমাজজিজ্ঞাসারই বিশেষ কোনো অর্থ থাকে না, এই চেতনাটাই হারিয়ে যায় তখন। ঋত্বিক সেই বিরল শিল্পীদের একজন যাঁর চোখ-ঠারার এই চেষ্টা নেই— উলটে তিনি কেবলই মানবসম্পর্কের না-বলা বিপজ্জনক সব অঞ্চলে নিয়ে যান আমাদের। 'নাগরিক'-এ, পরে আরও সফলভাবে 'মেঘে ঢাকা তারা' এবং 'সুবর্ণরেখা'য়, চিরচেনা পারিবারিক ভুবন ও নিত্যধার্য মূল্যবোধ থেকে যাত্রা শুরু করেও প্রত্যাশিত গন্তব্য থেকে দূরে সরে যান ঋত্বিক, বহুদিনযাপিত সংস্কারের বশে আমরা যাকে সমাধান বলে ভাবি, তাকেই তিনি পালটে দেন সমস্যায়।

'নাগরিক'-এ বিয়ের অপেক্ষায় বসে-থাকা বদ্ধ ঘরে বন্দী বোন সীতার অবস্থা রামুর সারা শরীরে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। এই জ্বালা থেকে কী সাংঘাতিক কাণ্ড হতে পারে তার একটি নিদর্শন ঋত্বিকের 'এজাহার' গল্প। ভবেশরঞ্জন বাগচী বোন জয়ার শ্বশুরবাড়ি এসে বোঝে এক যৌনরোগগ্রস্ত লম্পটের সঙ্গে তার বোনের বিয়ে হয়েছে। অসুখী, অন্তঃসত্ত্বা বোনকে প্রথমে সে গৃহত্যাগের, পরে আত্মহত্যার পরামর্শ দেয় ; দুটোর একটাতেও জয়া রাজি না হলে তাকে নিজের হাতে গলা টিপে মারে ভবেশরঞ্জন। একপাশে নির্দয় স্বামী অন্যপাশে ঘাতক ভাই, কে যে বেশি ভয়ংকর জয়া কি তা জানে! বোনের অসহায়ত্ব ভাইয়ের মনে উশ্‌কে তোলে হননেচ্ছা, খুলে দেয় পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে নিহিত হিংস্রতার মুখ। 'সুবর্ণরেখা'য়, বোনের প্রতি দমিত অথচ অনির্বাণ আকর্ষণেই সীতার কাছে পৌঁছে যায় ঈশ্বর ; 'মেঘে ঢাকা তারা'-য়, মা-মেয়ের এবং দুই বোনের দ্বন্দ্বই বানচাল করে দেয় নীতার জীবন। 'নাগরিক'-এও দুই বোন আছে— রামুর প্রেমিকা উমা আর শেফালি। শেফালি, স্বেচ্ছায় নয়, টিঁকে থাকার অনমনীয় জেদেই বেছে নেয় বেশ্যাবৃত্তি। 'নাগরিক'-এ দুই বোনের গল্প সমান্তরালভাবে এগোলেও 'মেঘে ঢাকা তারা'-য় গীতার সুখস্বাচ্ছন্দ্যই নীতার কাছে কাল হয়ে আসে। 'নাগরিক'-এর শেষে রামু ভদ্রলোকপাড়ার পাট চুকিয়ে নীচের তলার ঘনবসতির দিকে পা বাড়ায়, বাসাবদলের ভেতর দিয়ে ইতিহাসের সদর রাস্তায় এসে দাঁড়ায়— সেইসঙ্গে এই ইশারাটুকু রেখে যায় যে, পারিবারিক মতাদর্শের স্নেহমায়ার ব্যূহ থেকে বেরিয়ে না এলে শ্রেণীচ্যুতির সংকল্প সার্থক হয় না, সম্পূর্ণ হয় না গোত্রান্তর। রামু যখন তার সাধের ক্যালেন্ডারের ছবিটি ছিঁড়ে ফেলে, স্বপ্নদৃশ্যের বিমোহন থেকে মুক্ত করে নেয় নিজেকে, ঠিক তখনই দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। রামুদের ছেড়ে-যাওয়া বাড়ির দখল নিতে নতুন ভাড়াটে, এক দম্পতি, ট্যাক্সি থেকে নামে : তাদের কথাবার্তায় রামু শুনতে পায় তার আবাল্যলালিত আশা-আস্থার, [illegible] হিসেব-নিকেশের প্রতিধ্বনি। পুনঃসংঘটনের এই পদ্ধতির প্রয়োগ 'মেঘে ঢাকা তারা'র অন্তিম দৃশ্যেও আছে ; ওই পুনঃসংঘটনই রামুকে বুঝিয়ে দেয়, অযুত-নিযুত নাগরিকদের মধ্যেই তার স্থান, কোনো গল্পই আসলে খাপছাড়া নয়। আর তার পর সেই আশ্চর্য বেহালাবাদককে ফের দেখা যায় পর্দায় : না চাইতেই সে রামুকে বাজনা শোনায়। মন্দাক্রান্তা তালে বাঁধা নিরন্তরতাবোধক ক্রিয়ার নিশ্চেষ্টতা ছেড়ে ঘটমান বর্তমানের বাস্তবতায় প্রবেশ করছে রামু— ইতিহাসপুরুষের আশীর্বাদ না পেলে কি তার নতুন জীবনের অভিষেকপর্ব সাঙ্গ হত ? এর খানিক আগে রামু বলেছিল : 'আমরা সবাই মিলে নতুন শিশুর জন্ম দিচ্ছি। ব্যথার মধ্যে।' 'নাগরিক'-এ— ঋত্বিকের পরবর্তী ছবিতে যেমন— 'ব্যথা' কোনো বিশ্লেষণাত্মক একক নয়, শুধুই আবেগাত্মক, 'যন্ত্রণা'র শরীরী অভিব্যক্তি বা ঘটমানতার তীব্র প্রত্যক্ষতাও নেই। কিন্তু তাও অন্তত একটি ক্লোজ়-আপের কথা না বললে অন্যায় হবে : বনেট-খোলা কালো একটা গাড়ি জানলা জুড়ে হাঁ হয়ে আছে, যেন, পাঁচিলের ঠিক ধারটাতেই মধ্যবিত্ত আঙিনার কোল-ঘেঁষেই চলছে সর্বগ্রাসের সর্বনাশের আয়োজন।

সংকটের মুহূর্তেই সংকটের ভাষ্যকারদের স্মরণ করে মানুষ। অনেক পুরোনো স্নিগ্ধ বিশ্বাস হারিয়ে আমরা অনেকেই এখন নিরাশ্রয়, বাস্তুহারা। আর সেজন্যেই হয়তো ইতিহাসের বোঝাপড়ায়, প্রতিস্মরণের নতুন চেষ্টায়, ঋত্বিকের মতো শিল্পীদের আজ এত প্রাসঙ্গিক মনে হয়। 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'-র শেষে, নীলকণ্ঠ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শিল্পী' গল্পের মদন তাঁতীর গলায় গলা মিলিয়ে বলেছিল : 'একটা কিছু করতে হবে তো!' সেই একটা কিছু যে কী, তা নিয়ে মনান্তর মতান্তরের অন্ত নেই, তবু ওই কথাটা বাঁচিয়ে রাখা আমাদের দায়। গণনাট্য আন্দোলনের প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ 'নাগরিক'-এর কাজ যখন চলছে, ঠিক তখনই, ১৯৫২য়, জীবনানন্দ একটি কবিতায় লিখেছিলেন : 'অনেক নদীর জল উবে গেছে—/ ঘর বাড়ি সাঁকো ভেঙে গেল ;/ সে-সব সময় ভেদ ক'রে ফেলে আজ/ কারা তবু কাছে চলে এল।'[১৪] 'সুবর্ণরেখা'য়, 'আমরা কি নতুন বাড়িতে যাচ্ছি ?' সীতার এই প্রশ্নে ঈশ্বরের সহকারী মুখুজ্জেবাবু বলেছিল : 'হ গিন্নি, নতুন দেশটি, নতুন বাড়িটি।...কত ফুল, কত পাখি, কত প্রজাপতি, কত বড়ো-বড়ো সুন্দর ঘর, কত গান, কত বাজনা, সুবর্ণরেখা, সোনার রেখাটি, তার পাশেই তোমার বাড়িটি।' ঈশ্বর সেদিন মুখুজ্জেকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু পরে, অনেক নদীর জল উবে গেলে, ঘর বাড়ি সাঁকো ভেঙে গেলে, নতুন বাড়ির স্বপ্নকে তার আর মতিভ্রম বা অলীক কল্পনা বলে মনে হয় নি। স্মৃতি-বিস্মৃতির গোলকধাঁধায় নতুন বাড়ির পথ বের করা দুষ্কর, কিন্তু তাও ঋত্বিকের কোনো প্রধান চরিত্রই— রামু বা নীলকণ্ঠ, নীতা বা অনসূয়া— থেমে নেই, জীবনানন্দের ভাষায় : ' "এখানে পৃথিবী আর নেই—"/ ব'লে তারা পৃথিবীর জনকল্যাণেই/ বিদায় নিয়েছে হিংসা ক্লান্তির পানে ;/... এইখানে স্মৃতি·:/ এখানে বিস্মৃতি তবু ; প্রেম/ ক্রমায়াত আঁধারকে আলোকিত করার প্রমিতি।'[১৫]

টীকা

১. ঋত্বিক ঘটক, 'আকাশগঙ্গার স্রোত ধরে', ঋত্বিক ঘটকের গল্প, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ ১৩।
২. পূর্বোক্ত, পৃ ১৭।
৩. পূর্বোক্ত, পৃ ১৭।
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র, পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৫২, পৃ ১৪০।
৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মেঘদূত', প্রাচীন সাহিত্য, কলকাতা, ১৩৯১, পৃ ১৫।
৬. পূর্বোক্ত, পৃ ১৫।
৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বাজে কথা', বিচিত্র প্রবন্ধ, ১৩৯৩, পৃ ৬২।
৮. ঋত্বিক ঘটক, 'রাজা', ঋত্বিক ঘটকের গল্প, পৃ ৫৪।
৯. ঋত্বিক ঘটক, 'সুবর্ণরেখা প্রসঙ্গে', চিত্রবীক্ষণ, ঋত্বিক সংখ্যা, জানুয়ারি-এপ্রিল ১৯৭৬, কলকাতা, পৃ ৯০।
১০. Ritwik Ghatak, '"Let There Be Sound"', চিত্রবীক্ষণ, ঋত্বিক সংখ্যা, জানুয়ারি-এপ্রিল ১৯৭৬, পৃ ২১৬।
১১. ঋত্বিক ঘটক, 'নাগরিক', চিত্রবীক্ষণ, ঋত্বিক সংখ্যা, জানুয়ারি-এপ্রিল ১৯৭৬, পৃ ২১৭।
১২. ঋত্বিক ঘটক, 'এক্সট্যাসি', ঋত্বিক ঘটকের গল্প, পৃ ৩৬।
১৩. Malini Bhattacharya, 'Nagarik : Ritwik Ghatak's First Film', *Ghatak : Arguments/ Stories,* eds. Ashish Rajadhyaksha and Amrit Gangar, Bombay, 1987, p. 39.
১৪. জীবনানন্দ দাশ, 'অনেক নদীর জল', বেলা অবেলা কালবেলা, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ ১৬।
১৫. পূর্বোক্ত, পৃ ১৭।

বাঙালি মুসলমানের লোকাচার

একরাম আলি

১. বাঙলা-মা'র বুক-জোড়া ধন—
   এত কি ছিল ব্যাকুল মন।

এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাবার জন্য নির্দিষ্ট পথ আছে। কংক্রিটের, পাথরের, কালো পিচ আর স্টোন চিপ্স-এর, ইঁটের, মোরামের, নুড়ির আর মাটির। রেলের পথ যেমন পাথর, কাঠ, আর ইস্পাত দিয়ে মাটির ওপর শক্ত করে পাতা, খোলা আকাশে উড়লেও এরোপ্লেনের পথও নিখুঁতভাবে নির্দিষ্ট করে রাখা আছে। জলপথ— উত্তাল সমুদ্রতরঙ্গ থেকে শুরু করে গাছপালা-ঘেরা শীর্ণ খালের জল পর্যন্ত তার নকশা। ন্যাশনাল হাইওয়ে, এক্সপ্রেসওয়ে, স্টেট হাইওয়ে, গিরিখাত, পাকদণ্ডী, জেলা পরিষদের সড়ক, পঞ্চায়েতের রাস্তা, অ্যাভিনিউ, সরণি, রাজপথ, গলি, কানাগলি, বাই-লেন— হারিয়ে যাবার মতো জটিলতা এইসব পথের। সারা পৃথিবীটাই রাস্তা দিয়ে হিজিবিজি নকশা-কাটা।

এতসব পথের মধ্যে আলপথই সবচেয়ে আঁকাবাঁকা, জটিল : চৌকো, লম্বা, বাঁকা, অর্ধবৃত্তাকার সব খণ্ড খণ্ড জমি। আর, এই জমির সীমানা নির্ধারিত হয়ে আছে মাটির সরু সরু বাঁধে— যাকে আমরা বলি 'আল'। তাই আলপথ এমন এক ধরনের পথ, যা কোথাও যাবার জন্য তৈরিই হয় নি ! সীমানা নির্ধারণ ছাড়াও চাষের জমিতে জল বেঁধে রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এই আলের। মাটির তৈরি, সরু আর আঁকাবাঁকা এই বাঁধকেই গ্রামের কৃষিভিত্তিক সমাজ পথ করে নিয়েছে তার জমিতে যাওয়ার জন্য। যেহেতু এই পথ জমির মধ্যেই ঘুরপাক খায়, তাই এই পথের পথিকও পথের আবর্তে আমৃত্যু ঘুরতে থাকে। ধান তুলে আলু আর সরষে, সরষে তুলে বোরো ধান বা আলু তুলে কুমড়ো— এরকম ঘুরতে ঘুরতেই নির্মিত হয় যৎকিঞ্চিৎ ফসলের আশায় তার কাদা আর মাটি দিয়ে ঘেরা বেঁচে থাকা। নির্মিত হয় তার বিশ্বাস আর মূল্যবোধ, তার ঐতিহ্য আর সংস্কার। বহির্বিশ্বের বড়ো বড়ো ধর্মীয়, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঝড়গুলি এইসব গ্রামের ওপর দিয়েও বয়ে যায়। তার ফলে গ্রামজীবনের বিশ্বাসেও চিড় ধরে, হয়তো কোথাও নতুন বিশ্বাসও তৈরি হয় ; কিন্তু হাজার হাজার বছরের গ্রামীণ আবর্ত তাতে নিশ্চিহ্ন হয় না। তার সংস্কারও নব নব বিশ্বাসের আবর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং পরিবর্তিত রূপে তা আবার প্রকাশিত হয়।

২. দিন কোথায় দিয়া যায়, রাত্রি কোথায় দিয়া যায়, কোন্ রাজ্য থেকে কি আনে,...

যদি কোনো মানবগোষ্ঠী সম্পর্কে জানার ইচ্ছা হয় যে, তারা কোন্ ভাষায় কথা বলে, কী খায়, কোন্ ধরনের পোশাক পরে, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাদের বিশ্বাস ও অবিশ্বাস নিয়ে যদি আলোচনা করতে হয়, যদি গোষ্ঠীটির লোকাচারের বিবরণ দিতে এবং সেই বিবরণের বিশ্লেষণ করতে হয়, তা হলে সেই মানবগোষ্ঠীর ভৌগোলিক অবস্থান এবং ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখাটা হয়ে পড়ে জরুরি।

বাঙালি মুসলমানের সমাজ ও লোকাচার এবং লোকাচারের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্কে কেমন ?— এই প্রশ্নটির উত্তর খোঁজার জন্য আমরা একটিমাত্র গ্রামকে বেছে নিয়েছি। এখানে স্বীকার করে নেওয়া দরকার যে, বাঙালি

মুসলমানের সামগ্রিক রূপটিকে দেখার সামর্থ্য আমাদের নেই। এমন-কি, সমাজের বৃহদংশকেও আমরা স্পর্শ করি নি এই আলোচনায়। অর্থাৎ সমাজের বিমূর্ততাকে আমরা বাধ্য হয়ে ত্যাগ করেছি। প্রলোভন একটাই ছিল যে, একটি ছোট্টো গণ্ডির মধ্যে আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখার কারণে হয়তো-বা সমাজটিকে যতদূর সম্ভব স্পষ্ট করে দেখার সুবিধেও হতে পারে।

৩. রাজা বাগান দেখিলেন, ঝরণা দেখিলেন ; দেখিয়া, শুনিয়া সুখে, দুঃখে, রাজার চোখ ফাটিয়া
জল আসে, চোখে হাত দিয়া রাজা বলিলেন,—"আর তো পারি না। ঘরে চল।"

বীরভূম জেলার যে স্থানটিতে বোলপুর-সিউড়ি আর আহম্মদপুর-সিউড়ির রাস্তা একটি যুক্তচিহ্ন তৈরি করেছে, সেই স্থানটির নাম পুরন্দরপুর। রাস্তাদুটির সংযোগস্থলের ৫০ মিটার পূর্ব দিকে আর-একটি রাস্তা বেরিয়ে গেছে সাঁইথিয়ার দিকে। সাঁইথিয়া যাবার এই রাস্তাটির ডান দিকে, পুরন্দরপুর থেকে ৩ কিমি দূরে, রয়েছে একটি গ্রাম— তেঘরিয়া। যে-কাউকে জিজ্ঞেস করলেই উত্তর পাওয়া যাবে, তেঘরিয়া গ্রামটি সম্পূর্ণভাবে মুসলমান-অধ্যুষিত। বাস্তবে, আদৌ তা নয়। এই গ্রামে ডোমদের এবং বায়েনদের ২টি ছোট্টো পাড়া সুদীর্ঘকাল থেকেই রয়ে গেছে। এটা লক্ষ করার যে, এই ডোম-বায়েনরা যে-কোনো বর্ণহিন্দু-অধ্যুষিত গ্রামের মতো এখানেও 'অন্ত্যজ' বলে চিহ্নিত হয়! আর 'অন্ত্যজ' বলেই তারা তথাকথিত 'অন্য' শ্রেণীর মানুষের স্মৃতিতে স্থান পায় না। সবাই বলে, তেঘরিয়া হচ্ছে মুসলমানদের গ্রাম! যেহেতু আমাদের আলোচ্য বিষয় বাঙালি মুসলমানের লোকাচার, তাই এই ডোম ও বায়েনদের বিষয়ে বিশেষ আলোচনার সুযোগ আমরা এখানে পাব না।

উক্ত পাড়াদুটিকে বাদ দিলে মূল গ্রামটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বাটে। গ্রামের আদি বাসিন্দাদের পরিবারগুলি ভাঙতে ভাঙতে এখন ৪৬-এ এসে দাঁড়িয়েছে। প্রায় সকলেই 'গেরস্থ'। এ ছাড়া বিহার থেকে নিয়ে আসা খেতমজুর বা অন্য কাজের লোকের ১/২ জন স্থায়ী বাসিন্দা হতে হতে এখন তারা মোট ৯টি পরিবার। মোট মুসলমান জনসংখ্যা ২৯৫ জন।

বিহার থেকে আসা পরিবারগুলি 'জোলা' হিসেবে পরিচিত। গ্রামের সর্বদক্ষিণে একটি পতিত জায়গা তাদের বসবাসের জন্য দেওয়া হয়েছিল। এবং, গ্রাম-সমাজে তাদের তখনো স্থান ছিল না, আজও নেই। আদি গ্রামবাসীদের চোখে বা বাঙালি মুসলমানদের চোখে তারা 'ছোটোলোক' নয় ঠিকই ; কিন্তু শেষপর্যন্ত তারা 'ছোটোলোক'ই। এই তথাকথিত 'হাফ ছোটোলোক'-দের পাড়ার পূর্ব দিকে মস্ত পুকুর বেহুলা। বেহুলাপুকুরের উলটোদিকে, অর্থাৎ প্রায় ২০০ মিটার জল-দূরত্বে, দক্ষিণে ডোমপাড়া ও উত্তরে বায়েনপাড়া। পাড়াদুটিতে 'গেরস্থ' কেউ নেই। প্রায় সবাই দিন-মজুরির সাহায্যে দিনাতিপাত করে। কিন্তু ২টি পাড়াই আদি, বাঙালি মুসলমানদের মতো। ফলে বহিরাগত মুসলমানরা ধর্মে বাঙালি মুসলমানদের কাছাকাছি হলেও গ্রাম-সম্পর্কের দিক থেকে অনেক কাছাকাছি রয়েছে ডোম-বায়েনরা। কেননা বংশপরম্পরায় এক ধরনের সম্পর্ক গ্রামে তৈরি হয়। শোষণ, অত্যাচার, প্রতারণা, সংঘাত সমাজে আছেই। এইসব দ্বন্দ্বের মাঝে এগিয়ে চলার প্রতিটি ধাপে জয়-পরাজয়ের চিহ্ন যেমন লেগে থাকে, তেমনই জমে ওঠে স্মৃতি। কত মানুষ এই গ্রামে জন্মেছিল, কত মানুষ মারা গেছে, দোর্দণ্ডপ্রতাপ জোতদার থেকে নিতান্ত ভালোমানুষ গেরস্থ, দিনমজুর— নানা অনুষঙ্গে এদের স্মৃতি জড়িয়ে শোষণ ও বঞ্চনার উর্ধ্বে সামাজিকভাবে একটি আত্মীয়চেতনার স্তর তৈরি হয়ে গেছে। এ কথা ঠিক যে, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে বিচ্ছিন্নভাবে পরিবারগুলি বংশপরম্পরায় তাদের রেষারেষি সুপ্তভাবেও চালিয়ে যায়। শোষিত পুত্র শোষিত পিতার মুখচ্ছবি ভুলতে পারে না। আবার, পিতৃমাতৃহীন বঞ্চিত ভাইপো প্রয়াত কাকার সন্তানদেরও ততটা নিজের করে কোনো দিন নেয় না। তবু স্বীকার করতেই হবে, এইসব গ্রামসমাজে 'ছোটোলোক' শেষপর্যন্ত 'ছোটোলোক'-ই থেকে যায়। বেহুলাপুকুরগুলির সামান্য ২০০ মিটারের জল-দূরত্ব কিছুতেই কমতে চায় না!

গ্রামের উত্তর-পশ্চিম কোণের বেশ-কিছুটা জায়গায়, যা আজ ছোটো আমবাগান আর পতিত জমির চেহারায় পড়ে আছে, অজস্র খোলামকুচি আর ভাঙা হাঁড়ি-কলসির টুকরো মাটিতে গেঁথে আছে। অর্থাৎ মনুষ্যবসতির চিহ্ন এখানে স্পষ্ট। শোনা যায়, এটা ছিল তিলিপাড়া। আজ থেকে ৫০ বছর আগেও যেসব প্রবীণ প্রয়াত হয়েছেন, তাঁরা নাকি দেখেছেন সেই বাড়ির মাটির দেওয়ালের ভগ্নাংশ, ইশারা। ঠিক কতদিন আগে এই পাড়াটি নিশ্চিহ্ন হয়েছে, জানা যায় নি। ফলে, এই গ্রামের আদি রূপটি কেমন ছিল, তার স্পষ্ট কোনো বর্ণনা আজ আর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে, আদি রূপের সন্ধানীদের জন্য আমরা কয়েকটা ইঙ্গিত দিতে পারি, শেষপর্যন্ত যা হয়তো ভূতের লণ্ঠন দেখানোর মতোই হবে!

মূল গ্রামের পূর্ব দিকে একটি পতিত জমিতে ঢিপি খুঁড়লে এখনো মানুষের কঙ্কাল বেরিয়ে আসে। এটাকেই গ্রামের লোকেরা আদি গোরস্তান ব'লে অনুমান করে। কিন্তু, এই গোরস্তানের সঙ্গে গ্রামের এখনকার কোনো পরিবারের ঐতিহাসিক সংযোগ খুঁজে পাওয়া যায় নি। যে দুটি গোরস্তানের সঙ্গে এখনকার পরিবারগুলির সংযোগ আছে, তার একটি এখন গোরস্তান হিসেবে পরিত্যক্ত এবং সেখানে ঘরবাড়িও তৈরি হয়েছে। বর্তমান গোরস্তানটি গ্রামের পশ্চিমে ব্রাহ্মণী বা বামনিপুকুর-সংলগ্ন মাঠে অবস্থিত। তা হলে 'আদি গোরস্তান' বলে বর্ণিত জায়গার নীচে প্রোথিত কঙ্কালগুলি কোন্ মানুষের?

গ্রামে এমন সব নামের পুকুর আছে, যেগুলির সঙ্গে সরাসরি হিন্দু-সমাজের যোগাযোগের ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু তারা কারা, তারা কোথায়— এসব কেউ জানে না। কোন্ ঠাকরুনের নামে খনন করা হয়েছিল ঠাকরুনপুকুর, কোন্ ব্রাহ্মণ-পরিবারের ছিল বামনিপুকুর— যা আজ লোকমুখে 'বামুনে',যা বছর-কুড়ি আগেও পদ্মফুলে ভরা থাকত— এসব জানা আজ অসম্ভব। শুঁড়িপুকুরের শুঁড়িরা আজ নেই। জানা যাবে না সেই গোবর্ধনকে, যার নামে একটি বিরাট পুষ্করিণী আজও লাল শালুকে ছেয়ে থাকে! বেহুলাপুকুরের বিস্তার দেখে সাপে-কাটা লখীন্দরকে নিয়ে বেহুলার ভেলার সেই ভাসমান দৃশ্যটি গ্রামের কোনো কিশোর যদি কল্পনা করে, আমরা তাকে থামিয়ে দেব না। কেননা, আমরা সত্যিই জানতে পারি নি, কে ছিল এই বেহুলা, কী তার পরিচয়? এ সমস্তই আজ কয়েক শতাব্দী আগে হারিয়ে গেছে। এইসঙ্গে পাঠককে আমরা লক্ষ করতে অনুরোধ করব যে, কয়েক শতাব্দী ধরে গ্রামটি মুসলমান-প্রধান হলেও পুকুরগুলির ইসলামকরণ করা হয় নি! তাদের পুরোনো নামই বহাল রাখা হয়েছে।

পুরোনো নামের প্রসঙ্গে এসে যে-কথাটা বলতেই হয়, সেই কথাটা হচ্ছে, পুরোনো শব্দের। অধুনা অপ্রচলিত, কোনোটির অর্থও আর জানা যায় না, দু-একটি শব্দ আজও থেকে গেছে এই সূত্রে। গ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খিড়কির পুকুরটির নাম 'পাইখলা'। এ নামের তাৎপর্য কী, আমরা জানি না। একটি ডোবা ছিল, এখন তা ঘরবাড়ি, 'আঁঙ্গাখালি' নামের। শব্দটির প্রথম অংশের অর্থ খুঁজে বের করা যেতেও পারে। 'লাছের গড়ে' নামে একটি ছোটো পুকুর আছে। এই 'লাছের' শব্দটি স্থানীয়ভাবে অনেক আগে ব্যবহৃত হত বলে জানা গেছে। খিড়কির দরজাকে 'লাছের দুয়োর' বলা হত। সেই অর্থে এই পুকুরটিও হয়তো কোনো এককালে ছিল খিড়কির পুকুর, যা আজ সদরে পর্যবসিত হয়েছে। খুঁজলে আরও দু-একটি স্থাননামে এরকম প্রাচীনতা পাওয়া যাবে।

কয়েকটি পুকুরের নামে হিন্দু-অনুষঙ্গ জড়িয়ে থাকলেও এই গ্রামে কোনো হিন্দু-দেবস্থান নেই। এমন-কি, কোনো চিহ্ন, ইঙ্গিত বা স্মৃতি— কিছুই নেই। ধর্মীয় স্থান বলতে, রয়েছে একটি আস্তানা, যার কোনো স্থাপত্য নেই। সামান্য একটু মাটির ঢিপিই ইমামের আস্তানা নামে খ্যাত। এখানে মানসিক করার রেওয়াজ এখনো থেকে গেছে। মানত পূর্ণ হলে সিন্নিও দেওয়া হয়। তবে এখানকার সিন্নি হচ্ছে একটাই— ঘি ও চিনি-সহযোগে রান্না আতপান্ন। অন্য সিন্নি এখানে দেওয়া যায় না। মহরমের সময় আস্তানাটি সাজানো হয়। এ ছাড়া গ্রামের মাঝখানে ইঁট দিয়ে বাঁধানো স্তূপের আকৃতির আরও একটি আস্তানা ছিল। বলা হয়, সেটিই ছিল ইমামের মূল আস্তানা। তার সামনে ছিল মাটির তৈরি ছোটো মসজিদ। মাটির মসজিদ ভেঙে ইঁট-চুন-সুরকির

মসজিদ তৈরি হয় এই শতাব্দীতেই। ১৯০৫ থেকে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। পরে, মসজিদটি সংস্কার করার সময় ইঁদারা খনন করতে গিয়ে ওই আস্তানাটি ভেঙে ফেলতে হয়। মসজিদটি এখন আবার সংস্কার হচ্ছে। পুরোনো আস্তানা ভেঙে যে ইঁদারা খনন করা হয়েছিল, তা আবার বুজিয়ে ফেলা হয়েছে জায়গা বাড়ানোর জন্য। এ ছাড়া রয়েছে একটি ঈদগাহ্। এটি রয়েছে গ্রামের পশ্চিমে, বামনিপুকুর-সংলগ্ন প্রশস্ত গোরস্তানের মধ্যে। ঈদ্গাহ্ যেরকম হয়, ছাদ-খোলা এবং প্রাচীরবেষ্টিত একটি বাঁধানো প্রাঙ্গণ, এটিও তাই।

এইসব ধর্মীয় স্থানের বাইরে কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে, গ্রামজীবনে যেগুলির গুরুত্ব কম নয়। যেমন, গ্রামের দক্ষিণে গোবর্ধনপুকুরের উত্তরপাড়ের বেলতলা। দু-তিনটি বেলগাছের সমষ্টিতে জায়গাটি বিশিষ্টতা পেয়েছে। বেলতলাটি সাধারণের ব্যবহার্য বলে কারও একক মালিকানা এখানে স্বীকৃত নয়। এখনকার কেউ জানেও না, কতদিন ধরে এই জায়গাটি গ্রামের 'ছুৎতলা' হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সন্তানপ্রসবের সময় পরিত্যক্ত যা-কিছু— অর্থাৎ 'ফুল' (প্লাসেন্টা), নোংরা কাপড়চোপড় ইত্যাদি— মাটির একটি নতুন হাঁড়িতে ভরে এখানেই ফেলা হয়। কাজটি করে দাইমা। স্থানটিকে অপবিত্র জ্ঞান করা হয়। সেইসঙ্গে ভীতিসঞ্চারীও। কোনো ডাকাবুকো ছেলেও বেল কুড়োতে গিয়ে যদি মাটিতে মিশে-থাকা ন্যাকড়ার টুকরো দেখতে পায় বা ভাঙা হাঁড়ির কানা, সে শিউরে উঠবেই। এই ভয়ের কোনো ধর্মীয় বা অধুনা-সামাজিক ভিত্তি নেই। হয়তো কোনো আদিম আতঙ্কের ইঙ্গিত এই ভয়ের মধ্যে লুকোনো থাকতে পারে। বেলগাছ এবং বেলগাছের নীচের ঝোপ কেউ নষ্ট করে না। ঠিক এরকমই, মৃত্যুর পর মৃতদেহ প্রক্ষালন করা হয় যেসব নতুন কাপড়ের সাহায্যে, সেগুলিও ফেলার জন্য একটি নির্দিষ্ট জায়গা আছে। যেসব কাপড়ের টুকরো ঘসে ঘসে লাশ ধোয়া হয়, সেগুলি মাটির ভাঁড়ে ভরে, ভাঁড়-সমেত ফেলা হয় গ্রামের পশ্চিমে একটি আমগাছতলায়। এও এক চিরাচরিত প্রথা।

গ্রামের মানুষদের নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান আমরা করি নি। তবে, গোটা গ্রাম ঘুরে খালি চোখে দেখে আমাদের মনে হয়েছে, গ্রামের অধিকাংশ মানুষই বিস্তৃতশিরস্ক। দীর্ঘশিরস্ক মানুষের সংখ্যা নগণ্য। গায়ের রঙ অধিকাংশেরই বাদামি, কেউ কেউ মাঝারি ধরনের ফর্সা, দু-একজন ঘোর কৃষ্ণবর্ণের। অর্থাৎ, গড়পড়তা বাঙালির গাত্রবর্ণ যা, তা-ই। নাকের আকৃতি মূলত দ্রাবিড় ধাঁচের। উচ্চ-নাসা মানুষ বেশ-কিছু থাকলেও এমন একটিও নাক নেই, যা প্রকৃত নর্ডিক। দীর্ঘাকার মানুষের দেখা অবশ্য পাওয়া যায়। কিন্তু, তারাও মাথায়, নাকে, চোখে ও গাত্রবর্ণে 'অন-আর্য'। এমন-কি, পশ্চিমা মুসলমান বলতে যে চেহারা আমাদের চোখে ভাসে, সেরকম চেহারাও এই গ্রামে দেখা যায় না। তবে, নাক-সচেতনতা যথেষ্ট আছে। ফর্সা, তীক্ষ্ণনাসা, দীর্ঘকায় মানুষের প্রতি দুর্বলতা প্রকট। বাচ্চা জন্মালেই তার নাক নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়। গায়ের রঙ রোদে-জলে শেষপর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তাও আত্মীয়স্বজনের চিন্তার মধ্যে থাকে। বড়ো এবং টানা চোখের বাচ্চা সবাই আশা করে। কিন্তু চাইলে কি আর মেলে! সদ্যপ্রসূত বাচ্চাটি শেষপর্যন্ত আর-পাঁচজনের মতোই হয়— যাকে আমরা গড়পড়তা বাঙালির মানদণ্ড বলে জানি।

৪. আবার খানিক দূর যাইতে, এক সেওড়া গাছ ডাকিল,— "দুখু কোথা যাচ্ছ—
আমার গুঁড়িটায় বড় জঞ্জাল, ঝা'ড়্ দিয়া যাবে?"

মানুষের জীবনধারণের সঙ্গে, তার স্বপ্ন, প্রেম, বিষাদ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে একটু ছায়াশীতল অংশও থাকুক— সে চায়। এখানেই প্রাণ আশ্রয় পায় এবং এখানেই তার অন্ধকার পল্লবিত হয়ে ওঠে। সাহিত্যে তাই বৃক্ষ ও লতাপাতার প্রসঙ্গ এত বেশি এসেছে যে, তেমনটা আর কোনো বস্তুর প্রসঙ্গ আসে নি। তেঘরিয়া গ্রামে গাছপালার শ্রেণী ও সংখ্যার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে. কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেও গ্রামটা ছিল বিরাট সব তেঁতুলগাছে ভর্তি। ছিল বিশাল কয়েকটি কয়েতবেল গাছ। এখন সেসব নেই। দীর্ঘ ঝুরি-নামানো, শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত বটগাছগুলিও বহুদিন হল চলে গেছে কাঠগোলায়। বৌড়িগাছ, বৈঁচিগাছ, পুরোনো খেজুরগাছ— এসবের চিহ্ন

আর নেই। অশ্বত্থগাছও তাই ; কবে যে কেটে বিক্রি করা হয়েছে, আলোচনা করে গ্রামবাসীদের আজ তা মনে করতে হয়। প্রচুর আমগাছের সামান্য কিছু টিঁকে আছে বিক্রিরই অপেক্ষায়। বাড়িতে বাড়িতে কিছু আম, জাম, কুল, কাগজিলেবু, পেয়ারা, পেঁপে, বেদানা, আমড়াগাছ আছে বটে— তবে তাদের জীবন গৃহকর্তার খেয়ালিপনার ওপর নির্ভর করে। ইচ্ছে হলে বা দরকার হলে, বাড়ির সংস্কার ও আয়তনবৃদ্ধির জন্য তারা কাটা পড়েই। তবে তালগাছ এখনো নেই-নেই করেও অনেক থেকে গেছে। তেঁতুলগাছ ও তালগাছ— এই দুটি গাছই তেঘরিয়া গ্রামের প্রতীক— এ কথা বলা যায়। গ্রামসমাজে গাছদুটির প্রয়োজনীয়তা কম নয়। দক্ষিণ ভারতেও এই দুটি গাছকে খুব আদর করা হয়। তেঘরিয়ায় আমরা কোনো 'দক্ষিণী সংযোগ' খুঁজতে যাই নি। তবে, বিষয়টি আমাদের মনে পড়েছিল— এ কথা অস্বীকার করি না। এ ছাড়া রয়েছে বাঁশগাছ, কদমগাছ, জিওলগাছ, বেশ-কিছু অর্জুনগাছ এবং চাকলদা গাছ। আর নতুন যা-কিছু গাছ লাগানো হচ্ছে, তার সবই বনবিভাগের দেওয়া। শিশু, সেগুন, ইউক্যালিপটাস। দেখতে খারাপ এবং ছায়াশীতল না হলেও, দামি। ইংরেজি-মাধ্যমের স্কুলের মতো!

এই হচ্ছে তেঘরিয়া গ্রাম এবং গ্রামবাসীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়। বাঙালি মুসলমান সমাজের লোকাচার বিষয়ে আলোচনায় আমরা এই গ্রামটিকে বেছে নিয়েছি।

৫. লুকিয়ে ছিল এসব কথা **'দুধ-সাগরের'** ঢেউয়ে!

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক, লিনা এম. ফ্রুজেট্টি, বাঙালি মুসলমানদের লোকাচার নিয়ে গবেষণা করেন। গবেষণার স্থান হিসেবে তিনি বেছে নেন বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরকে। ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯ এবং ১৯৭১ থেকে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ— মোট দুদফা শ্রীমতী ফ্রুজেট্টি বিষ্ণুপুরে ছিলেন। ওই ক'বছর অত্যন্ত নিবিড়ভাবে মেলামেশা করে একটি সার কথা তিনি বুঝেছিলেন যে, ইসলামি আইন সারা বিশ্বে এক ; কিন্তু দেশভেদে ও জাতিভেদে তাদের 'আদত' আলাদা। পৃথিবীর সব মুসলমান এই দুই সংস্কৃতি একই সঙ্গে মেনে চলে। আর, সেজন্যেই মিশরের মুসলিম সংস্কৃতি এবং বাংলার মুসলিম সংস্কৃতি ভিন্ন। তাঁর কথায়, 'They state that one can be a "Muslim" and a "Bengali" without creating any contradiction or conflict between the two spheres, though both the boundaries are sharply defined by their ideology and practice.'[১]

তিনি এও লক্ষ করেছিলেন এবং কথাটা ঠিকই যে, 'দেশের আদত' বলতে যা-কিছু বোঝায়, সে সবের ক্ষেত্রে 'নিয়ম' শব্দটিই ব্যবহৃত হয়। ফলে, অলঙ্ঘনীয় ইসলামি আইনের মতোই মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা পায় এই লোকাচারগুলি। বিষ্ণুপুরে তিনি দেখেছিলেন, মুসলমানরা শুধু অ-মুসলমানের সঙ্গেই নিজেদের পৃথক করে না, তারা অন্য জাতির মুসলমানের সঙ্গেও নিজেদের পৃথক ভাবে। এমন-কি, গ্রাম-ভেদেও অনেক সময় লোকাচার পৃথক হতে পারে। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে ইসলামি উৎসব আবার এককের চেহারা পায়। সেখানে উৎসব হয়ে ওঠে সাম্প্রদায়িক, সেই উৎসবের শিখায় বিশ্বভ্রাতৃত্বের জন্য আকাঙ্ক্ষা জ্বলে ওঠে। তাঁর বক্তব্য : এই যে দুটি দিক— স্থানীয় লোকাচার বা লোকায়ত ধর্ম এবং সর্বজনীন ইসলামি আইন—দুই-ই একটি মাত্র শক্ত ফ্রেমে বাঁধা।

কিন্তু একটি ফ্রেমে বাঁধা হলেও, এই দুইয়ের মধ্যে সংঘর্ষ যে হয় না, তা নয়। শ্রীমতী ফ্রুজেট্টি বাইরে থেকে এসে এবং সামান্য কয়েক বছর থেকে এই সংঘর্ষের আঁচ না-পেলেও, তা আছেই। মৌলবি-নির্দেশিত অলঙ্ঘনীয় ইসলামি আইন এবং মূলত স্ত্রী-আচারসর্বস্ব 'দেশের আদত'-এর সংঘাতে সাবধানবাণীর মতো বার বার যে-শব্দটি মৌলবির কণ্ঠে উচ্চারিত হয়, সেটি হল 'বেদাত' (innovation)। (কোরান-নির্দেশিত পথের পরিবর্তন অথবা উক্ত পথে নতুন কিছুর প্রবর্তনকে বলা হয় বেদাত। এবং 'বেদাত' ইসলাম-বিরোধী বলে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।) এখানে উল্লেখ্য, শরিয়ত-বহির্ভূত লোকাচারই সেই অর্থে 'বেদাত' বলে বিবেচ্য।

এখন ঘটনা হচ্ছে, বাঙালি মুসলমান সজ্ঞানে আল্লার অংশীদার কাউকে করতে চায় না ঠিকই। তবু, জন্ম ও মৃত্যুতে, বিবাহে ও মহরমে, ঈদে ও শব-এ-বরাতে, চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণে, চাষবাসে ও ব্যাবসা-বাণিজ্যে ইসলামি আইনের অতি-খুঁটিনাটি জানে না এবং জানতে চায়ও না। নামাজ, রোজা, মিলাদ, দান-খয়রাত ইত্যাদি মোটা রকমের ধর্মীয় আইনগুলি মেনে চলার পরই তারা আশ্রয় নেয় দূর-পূর্বপুরুষের লোকাচারের, যে-লোকাচার তাকে শিখতে হয় নি, বংশ-পরম্পরায় যে-লোকাচার মান্যতা পেতে পেতে তার কাছে এসেছে। সকালে দোকান খুলে ঝাঁটা দিয়ে দোকানঘর পরিস্কার করার পর দরজায় জল তাকে ছড়াতেই হয়। ধূপবাতিও জ্বালায় কেউ কেউ। না-হলে গোটা ব্যাপারটা তার ন্যাড়া-ন্যাড়া লাগে— যেন দোকান খোলাই হয় নি!

তা ছাড়াও, মৌলবিরা সামাজিকভাবে ইসলামি আইন মেনে চলার কথা বললেও নিজেদের বাড়িতেই বিশেষ সুবিধা করতে পারে না। যেমন, চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণের সময় না-খাওয়ার যে-লোকাচার, সেটা হয়তো বাড়ির সবাই মৌলবির কথা শুনে মানল না, খেল। কিন্তু বাড়ির যে মেয়েটি বা বউটি গর্ভবতী, গোপনে তাকে সবাই খেতে নিষেধ করবেই। বলা তো যায় না, শেষে মৌলবির কথা শুনে যদি অন্যরকম হয়! এবং এ ঘটনা মৌলবির নিজের বাড়িতেও ঘটে। নীরব থাকা ছাড়া মৌলবির কিছু করার থাকে না।

তবু সংঘাত আছে। আছে মৌলবিরও নীরবতা। এই দ্বন্দ্বের আলোয় আমরা দেখব তেঘরিয়া গ্রামটিকে। যেহেতু তেঘরিয়ার সকলেই ধর্মান্তরিত মুসলমান, সেটা যত শতাব্দী আগেই হোক-না কেন, তাই এই সমাজে পূর্বতন লোকাচার, বিশ্বাস, ছড়া, প্রবাদ, প্রবচন কখনো সামান্য পরিবর্তিত হয়ে, কখনো-বা অবিকৃত অবস্থায় আজও থেকে গেছে। কয়েক শতাব্দীর ইসলাম-চর্চাতেও সেইসব অভ্যাস সম্পূর্ণভাবে মুছে যায় নি।

মুছে যায় নি। কিন্তু কীভাবে, কোনরূপে আছে সেইসব সংস্কার?

৬. মাথার উপর হইতে কে বলিল,— "মানুষের কি কুকুর-ছানা হয়?"

ধরা যাক জন্মের কথা।

যখন হাসপাতালে যাওয়ার প্রথা ছিল না, তখন ছিল পারিবারিক আঁতুড়ঘর। এখনো অনেকের কাছে আঁতুড়ঘরই সম্বল। তাদের একদল সন্তান প্রসবের পক্ষে হাসপাতালের চেয়ে বাড়িকেই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করে, আর-একদল এখনো হাসপাতালে পৌঁছতে পারে নি।

সন্তান প্রসবের সময় ধর্মীয় কাজটুকু বাদ দিলে যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম— আঁতুড়ঘর থেকে শুরু করে দাই-মা পর্যন্ত— বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমানের ক্ষেত্রে এক। এমন-কি, পাশের দমদমা গ্রাম থেকে যে দাই-মা তেঘরিয়ায় আসে, সেই একই দাই-মা আশেপাশের হিন্দুগ্রামের ডাকেও যায়। বাগদি পরিবারের এই মহিলা বরং ডোম, বায়েন, হাড়ি -জাতীয় তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দুবাড়িতে প্রসবের কাজে যায় না। এ এক রহস্যই বলতে হবে যে, যে-দাই-মা নিজে হিন্দু, তেঘরিয়ার ডোম ও বায়েনদের আঁতুড়ঘরে ঢুকলে তাঁর পবিত্রতা নষ্ট হয়; অথচ, মুসলমানদের আঁতুড়ঘরের যাবতীয় কাজ তিনি করেন!

এখানে একটা তথ্য উল্লেখ করতেই হয় যে, এলাকার একমাত্র নাপিত-পরিবারটি থাকে পাশের গোয়ালগ্রামে। তারাও ডোম-বায়েন-বেদে-হাড়িদের ক্ষৌরকর্ম করে না; কিন্তু মুসলমানদের করে। বয়োবৃদ্ধ নাপিত দ্বিজপদ ভাণ্ডারী জানেন না, কেন এই প্রথা তাঁরা অনুসরণ করে আসছেন। তাঁর বক্তব্য: ডোম-বায়েনদের জন্য যেমন পৃথক-পৃথক ব্রাহ্মণ আছে, নাপিতও তেমনই। দ্বিজপদরা উচ্চশ্রেণীর নাপিত। এলাকার যাবতীয় প্রধান ধর্মানুষ্ঠান থেকে তাঁদের ডাক আসে, ব্রাহ্মণদের ক্ষৌরকর্ম তাঁরাই করেন। সমাজে পতিত হবার ভয় যদিও এখন আর নেই, তবু তিনি নিশ্চিত যে, ডোম-বায়েনদের ক্ষৌরকর্ম করলে এসব পুজো-আচ্চার কাজ আর করা যাবে না। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষৌরকর্ম? উত্তরে স্বতঃসিদ্ধের মতো দ্বিজপদ ভাণ্ডারীর জবাব— এ কাজ তাঁরা বংশ-পরম্পরায় করে আসছেন।

দাই-মাও তেমনই। কেন জানেন না, তবে বংশ-পরম্পরায় মুসলমানদের কাজ করে আসছেন। আমরা দেখেছি যে, তেঘরিয়া গ্রামের মুসলমানরা ডোম-বায়েন তো বটেই, পাশের ধল্টিকুরিগ্রামের শুঁড়িদেরও 'নিচুজাতি' বলে ভাবে। ধোবা, বাগদি, হাঁড়ি, বেদেরাও তাদের কাছে ওই 'নিচু জাতি'-ই। তা হলে হিন্দু সমাজে তাদের সমান্তরাল জাতি কোন্‌টি ? তেঘরিয়ার মুসলমানদের গতি-প্রকৃতি দেখে তাদের এই সামাজিক অবস্থান বুঝে নিতে আমরা পারি নি। সচ্ছল, শিক্ষিত, জোতদার পরিবারগুলির সঙ্গে যেমন আশপাশের উচ্চবর্ণ হিন্দুদের মেলামেশা দেখেছি, তেমনই কারও কারও সঙ্গে সদ্‌গোপ, বেনে বা শুঁড়িদের অন্তরঙ্গতাও যথেষ্ট। তাই এই জটিলতায় না-ঢুকে আমরা বরং আবার জন্মের প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

গর্ভবতী বাঙালি মুসলমান রমণীকে স্বামীর বাড়িতে ৭ মাসে সাধভক্ষণ করানো হয়। তাকে নতুন শাড়ি পরতে হয়। সধবা ও অবিবাহিতা মিলিয়ে ৭ জন মহিলা তার সঙ্গে খেতে বসে। সাত রকম ব্যঞ্জন সহ উৎকৃষ্ট সব খাদ্য প্রকাণ্ড কাঁসার থালায় পরিবেশন করা হয়। এই সাধভক্ষণের দিনই বাপের বাড়ি থেকে মেয়েকে নিয়ে যাবার জন্য লোক আসে। সাধ খেয়ে মেয়ে প্রসব হতে বাবার বাড়ি চলে যায়। বাবার বাড়িতে ৯ মাসে আবার সাধভক্ষণের অনুষ্ঠান। নতুন শাড়ি পরে ৯ রকম ব্যঞ্জন সহ সাধ খাবার প্রথা আছে। এবং তার পরই চূড়ান্ত দিন গোনা শুরু হয়। আঁতুড়ঘর ঝাড়ামোছা ও নিকানো হয়। তার পর প্রসববেদনা উঠলেই দাইমা-র ডাক পড়ে।

আঁতুড়ঘর অপবিত্র। কেউ ঢুকলেই তাকে স্নান করতে হবে। এবং সমস্ত প্রেতাত্মা ও মানুষের কুনজর থেকে আঁতুড়ঘরকে রক্ষা করার চেষ্টাও বেশ জোরদার। ঘরের জানালা থাকবে না। একটি মাত্র দরজা মাছধরা খেয়া জাল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। ভেতরে কুড়ুল-জাতীয় লোহা রাখতেই হবে। দরজার পাশে গোবর রাখা হয়। তাতে নাকি বাচ্চা গোবরের মতো শান্ত হবে।

লোহা প্রসঙ্গে এখানে একটা কথা বলার আছে। লোহার গুরুত্ব অপরিসীম। আঁতুড়ঘরে যেমন কুড়ুল থাকবে, তেমনই প্রসবের পর বাচ্চার মাথার কাছে অথবা বালিশের নীচে থাকবে লোহার কাজললতা। চল্লিশ দিনের অনুষ্ঠান শেষে আঁতুড়ের দশা কেটে গেলে তখন আর বাচ্চার সঙ্গে সর্বদা কাজললতা থাকার দরকার নেই। কিন্তু, ওই ৪০ দিন বাচ্চা শুয়ে থাকলে বালিশের নীচে কিংবা কারও কোলে থাকলে তার হাতে কাজললতা ধরা থাকবেই। না-হলে বাচ্চার অমঙ্গল হতে পারে। লোহা সমস্ত প্রেতাত্মা এবং মানুষের কুদৃষ্টি থেকে বাচ্চাকে রক্ষা করে বলে ধারণা।

'ফুল' (প্লাসেন্টা) এলে বাঁশ-ছাল অথবা ঘোড়ার চুল দিয়ে সদ্যপ্রসূত বাচ্চার নাড়ি কাটে দাই-মা। নাড়ি কাটার রক্ত আঙুলে নিয়ে বাচ্চার দুই চোখে সামান্য করে কাজলের মতো লাগিয়ে দেওয়া হয়। বিশ্বাস আছে যে, এতে বাচ্চার চক্ষুলজ্জা জন্মাবে। হাসপাতালের কারণে এইসব প্রাচীনতম প্রথা এখন বিলুপ্ত হবার মুখে। তবু, কারও নির্লজ্জতা দেখলে আজও বলা হয়, তোর মা কি চোখে নাড়ি-কাটা রক্ত দেয় নি ! গ্রামের প্রাচীনাদের মুখে শুনেছি যে, সব প্রথা এখন আর মেনে চলা হয় না। যেমন : কাস্তের ডগা পুড়িয়ে সদ্যপ্রসূত বাচ্চার পেটের ৭ জায়গায় সামান্য করে ছ্যাঁকা দেওয়া হত। এতে নাকি পেটের অসুখ হত না !

নাড়ি-কাটার পর হলুদ মাখিয়ে বাচ্চাকে স্নান করানো হয় এবং বাচ্চার মুখে মধু দেওয়া হয়। সেদিক থেকে মধুই পৃথিবীর প্রথম খাদ্য। তার পর 'ফুল' একটি নতুন মাটির হাঁড়িতে ভরে, সঙ্গে ৫ টুকরো গোটা হলুদ, ৫টি কড়ি ও ৫টি সুপুরি দিয়ে হাঁড়ির মুখ বন্ধ করে দাইমা গোবর্ধন পুকুরের ছুৎতলায় পুঁতে দিয়ে আসে।

মেয়ে হলে আলাদা কিছু নয়। কিন্তু ছেলে হলে জন্মের পর কোনো আত্মীয় অথবা গ্রামের মৌলবি বা মসজিদের ইমাম এসে বাচ্চার কানের কাছে আজান দেয়। তাকে আল্লার আহ্বান শোনানো হয়।

প্রসবের পঞ্চম দিনে মা প্রথম স্নান করে, স্থানীয় ভাষায় 'ডুব' দেয়। স্নান করে এসে চুল-নিংড়ানো জল বাচ্চার নাভিতে দেওয়ার নিয়ম আছে। এই বিশেষ জলে নাকি নাভির ঘা শুকোয়।

ওই পঞ্চমদিনে বাচ্চার বাবার বাড়ি থেকে নতুন জামাকাপড় আসে। সঙ্গে আসে রান্নার যাবতীয় উপকরণ।

রান্না' করে পাড়ার বাচ্চাদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয়। এবং নাড়ি-কাটার পারিশ্রমিক পায় দাইমা। এই বিশেষ দিনটিকে 'পাঁচুটে' বলা হয়। লোকের বিশ্বাস, নাড়ি-কাটার ক্ষতে সংক্রমণের ফলে টিটেনাস হলে সাধারণত ৫ দিনের মধ্যেই তা হয়। তাই 'পাঁচুটে'-র বিপদ কেটে গেলেই বাচ্চার জন্য জামাকাপড় কেনা হয়। আনন্দ-উল্লাসও হয়।

৫, ৭, ৯, ১৩ ও ২১ দিনে মাকে 'ডুব' দিতে হয়। এবং নাপিত পঞ্চম ও একুশতম দিনে এসে বাচ্চার মাথা ন্যাড়া করে নখ কেটে দেয়। বাচ্চা নিয়ে মা আঁতুড়ঘর থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। এই ২১ দিনেই বাঙালি হিন্দুর আঁতুড় শেষ। কিন্তু মুসলমানের আঁতুড় সর্বতোভাবে শেষ হয় ৪০ দিনে। ওই দিনেও মা 'ডুব' দেয়, নাপিত এসে বাচ্চার মাথা ন্যাড়া করে ও নখ কেটে দেয়।

এখানে উল্লেখ্য, তেঘরিয়ায় কারও গোরুর বাচ্চা হলেও ২১ দিনের আগে তার দুধ খাবার জন্য নেওয়া হয় না। একুশ দিন পর্যন্ত বাচ্চা দুধ খায় এবং অতিরিক্ত দুধ দুইয়ে পুকুরের জলে ফেলে দেওয়া হয়। গ্রামবাসীরা ওই দুধকে অপবিত্র জ্ঞান করে।

৭. পৃথিবী দেখিয়া মণিমালা অবাক্। মণিমালা বলিলেন, "মণি, মণি! উজ্‌লে' ওঠ্,
এই সরোবরের জলে আমি নাইব।"

এইভাবেই তেঘরিয়ায় সন্তান আসে। সে সন্তান ইসলাম ধর্মের ছত্রচ্ছায়ায় কতটা বেড়ে ওঠে, কতটা বেড়ে ওঠে লোকায়ত ধর্মের বৃক্ষছায়ায়— তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করা বেশ কঠিন। অলঙ্ঘনীয় ইসলামি আইনের আষ্টেপৃষ্ঠে এমনভাবে জড়িয়ে আছে এই লোকাচার যে, তার ব্যবচ্ছেদ করা যেমন কঠিন, তেমনই কঠিন সেই লোকাচারের উৎস ও জড়িয়ে থাকার কারণগুলিকে আবিষ্কার করা।

যেমন ধরা যাক শব-ই-বরাতের উৎসবের কথা। হিজরি মতে শাবান মাসের ১৪ তারিখ উৎসবটি হয়। মুসলমানদের বিশ্বাস, শব-ই-বরাত বা লায়লাতুল কদর-এর মধ্যরাতে ফেরেশতারা (দেবদূত) আল্লার আদেশে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের আয়ু-নির্ধারণ, ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ ও জীবিকা-বণ্টন করেন। এবং সেইসঙ্গে চূড়ান্ত বিপথ-গামীদের, যথা হিংসুক, নিষ্ঠুর, জাদুকর, গণক, নেশাখোর, ব্যভিচারী এবং পিতামাতার প্রতি দুর্ব্যবহারকারীদের বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত মুসলমানকে ক্ষমা করেন। এই রাতে আল্লা পুণ্য এবং দয়ার দরজা উন্মুক্ত রাখেন বলে ধার্মিক মুসলমানরা সারা রাত জেগে নামাজ, কোরান পাঠ করে। মিলাদ পাঠের মাধ্যমে আল্লা ও তাঁর প্রেরিত পুরুষকে স্মরণ ও শ্রদ্ধা-প্রদর্শন করা হয়। অনেকে রোজাও করে। ভালো খাবার-দাবার তৈরি হয়। পাড়া-প্রতিবেশী, আতুরজনকে দান করা হয়।

কিন্তু, এসব তো বড়োদের। ছোটোরা কী করে?

সন্ধ্যার আগে সারা বাড়ি পরিষ্কার করার তোড়জোড় লেগে যায়। সন্ধ্যার শুরুতেই বাড়ির দরজায়, জানালায়, দেউড়িতে, ছাদে, এমন-কি, গোয়ালবাড়িতেও, মোমবাতি জ্বালানো হয়। এ কাজটি ছোটোদের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। যখন মোমবাতির চল ছিল না, তখন ছোটোদের কাজ ছিল আরও বেশি। তারা সকাল থেকে কাদা দিয়ে প্রচুর প্রদীপ তৈরি করত। সলতে পাকানো হত। তার পর সেই প্রদীপ সরষের তেল দিয়ে জ্বালানো হত সন্ধ্যায়। সেসব ছিল সবাই মিলে জড়িয়ে থাকার দিন। শব-ই-বরাতের সন্ধ্যায় কেউ তেঘরিয়া এলে ভাবতে পারেন, তা হলে কি আজ দেওয়ালি?

সন্ধ্যা একটু গড়িয়ে গেলে গ্রামের বাচ্চারা একটা দল তৈরি করে। তার পর হাতে পাটকাঠির মশাল এবং বড়ো বড়ো পাত্র নিয়ে গোটা গ্রামে খাবার আদায় করতে বেরোয়। পোলাও, পিঠেপুলি, হালুয়া, মাংস। প্রতিটি বাড়ির দরজায় সমবেত কণ্ঠে সুর করে হাঁকে—

দিল্ দিল্ মহম্মদ খিল খোল্।

বাংলা ও আরবি শব্দমিশ্রিত এই পঙ্‌ক্তির অর্থ কী, গ্রামের কেউ জানে না। কিন্তু, বছরের পর বছর শব-ই-বরাতের রাতে বাচ্চারা এই শ্লোকটিই আওড়ায়। এবং বেশ জোরের সঙ্গেই। তাদের হাতে থাকে লাঠি। দরজায় নাটকীয় আঘাতও করে। তার পর সুর করে স্থানীয় উচ্চারণে বাড়ির মহিলাদের হুমকি দেয়—

যে দিবে ছেঁড়া রুটি
তার হবে কানা বিটি।
যে দিবে হালুয়া-রুটি
তার হবে ভালো বিটি।
যে খাওয়াবে পাত-পাত
তার হবে সোনার চাঁদ।

আরও নানা শ্লোক, কখনো সেগুলি শ্লীলতার সীমাও ছাড়িয়ে যায়, বাচ্চারা সমবেত কণ্ঠে সুর করে আওড়ায়। এবং সত্যি সত্যি বাড়িতে গর্ভবতী বউ বা মেয়ে থাকলে গৃহকর্ত্রী এই বাচ্চাদের আদর করে বসিয়ে প্রথমে শরবত খাওয়ায়। তার পর অন্য খাবার তো দেওয়া হয়ই। সংগ্রহ করা সমস্ত খাবার ছেলের দল গ্রামের এক জায়গায় বসে পাটকাঠির মশালের আলোয় মহানন্দে ভাগ করে খায়।

এখন এই সমগ্র দিনটির পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, শাস্ত্রীয় বিধান মেনে রোজা, নামাজ, কোরানপাঠ, মিলাদ অনুষ্ঠান এসব যেমন আছে, পালিত হয়, তেমনই শাস্ত্র-বহির্ভূত লোকাচারও শব-ই-বরাতের মতো নিছক একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও ঢুকে পড়েছে। প্রদীপ বা মোমবাতি জ্বালানোর মধ্যে দেওয়ালির ইঙ্গিতটি স্পষ্ট এবং এ ছাড়া শব-ই-বরাতে মোমবাতি জ্বালানোর কোনো ধর্মীয় কারণ নেই। এর পর সারা গ্রাম ঘুরে বাচ্চাদের খাবার চাইবার যে-শ্লোক, তার সঙ্গে যথেষ্ট মিল পাওয়া যায় পাঁচড়া-খোস-চুলকানির দেবী ঘেঁটুর আরাধনার। ঘেঁটুপুজোর দিনও বাচ্চারা সারা গ্রাম ঘুরে ওইভাবেই শ্লোক আউড়ে চাল-ডাল-সবজি আদায় করে পুজোতলায় রান্না করে খায়। এটা জেনে আমরা ঘেঁটুপুজো সম্বন্ধে আরও খোঁজখবর করি। জানতে পারি, এই দেবীর কোনো মূর্তি হয় না। নতুন মাটির ঘটে ঘেঁটুকচুর একটি ঝাড় ভরে গ্রামের কোনো তেরাস্তা অথবা চৌরাস্তার মোড়ে গাছতলায় প্রথমে কাঁচা গোবর, তাতে ৫টি কড়ি দিয়ে-তার ওপর ঘট স্থাপন করা হয়। পুজো হয় শীতকালে। কেননা ওই সময় গ্রামে ধুলোবালিতে বাচ্চাদের খোস,পাঁচড়া হয় বেশি। পুজোর শেষে অলক্ষ্মীকে দূর করার মতো কুলোর বাতাস দিতে দিতে ঘট বিসর্জন দেওয়ার প্রথা আছে। তার পর আদায়ীকৃত চাল-ডাল-সবজি রান্না করে খাওয়া-দাওয়া।

কিন্তু এতদূর জানলে আরও জানতে হয়। সেই অতিরিক্ত জানাটা হল : শব-ই-বরাতে চাওয়া হয় রান্না-করা খাবার। আর, একই ধরনের শ্লোক একই সুরে গেয়ে ঘেঁটুপুজোতে খাবার চাওয়া হলেও, তা তো রান্নাকরা খাবার নয়। বরং শব-ই-বরাতের এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে মিল রয়েছে রান্নাপুজোর। রান্নাপুজোয় ওই গান না-গাওয়া হলেও রান্না-করা খাবারই বাচ্চারা দল বেঁধে চায় এবং ভাগ করে খায়।

এর পরই আমরা অনুসন্ধানকর্ম বন্ধ করে দিই। বন্ধ করে দিই এ কারণে যে, চটজলদি অনুসন্ধান করে এই জটিলতা থেকে বেরিয়ে পরিষ্কার কোনো সিদ্ধান্ত দিতে আমরা পারব না। এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী কীভাবে, কখন, কেন, কোন্ আচার ঢুকে পড়েছে এই সমাজে— নাকি একটি পূর্ণাঙ্গ লোকাচার-জাল ছিঁড়তে ছিঁড়তে এইটুকু মাত্র আর অবশিষ্ট আছে এবং অতীতের সেই লোকাচারের পূর্ণাঙ্গ রূপটি কেমন ছিল— এসব সমাধান করা প্রায় সে অনেক শতাব্দীর গবেষকের কাজ! আমরা হাল ছেড়ে দিই।

কিন্তু ততদিনে আমাদের অবস্থা হয়েছে রূপকথার সেই সামন্তপুত্রের মতো, যে সারা বছর পড়াশোনা করে শুধুমাত্র কুকুরের ভাষা শিখে বাড়ি এসেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার পিতৃনির্দেশে অন্যত্র পড়তে বেরিয়েছে। একবছর পর সে শিখে আসে পাখির ভাষা! এইভাবে সামন্তপুত্রটি ব্যাঙের ভাষা পর্যন্ত শিখতে পেরেছিল। যদিও সে এই তিনটি মনুষ্যেতর প্রাণীর ভাষা শিখেই একদিন মহামান্য পোপ হয়েছিল, আমরা সেরকম আশা

করি না। কেননা, হয়তো বাঙালি মুসলমানের কয়েক শতাব্দীর ঘোলা জলের ঘূর্ণিতে আমরা শেষপর্যন্ত তলিয়েই যাব।

৮. নামিতে, নামিতে, দুই বন্ধু যতদূর যান— জল কেবল দুই ভাগ হইয়া শুকাইয়া যায়!

তার চেয়ে অনেক সুবিধা হচ্ছে নিজে উত্তর না-দিয়ে শুধুমাত্র একটি জিজ্ঞাসু মন নিয়ে এগিয়ে যাওয়া।

ঈদ-উল-ফিতর এবং ঈদ-উল-বকর— এই দুই ঈদে গ্রামের সচ্ছল পরিবারের বাচ্চারা চন্দনের ফোঁটা নেয়। একেবারে শিশু থেকে তরুণ বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা সকালে স্নান করে নতুন জামাকাপড় পরে। বাড়ির কোনো মহিলা তাদের কপালে চন্দনের ফোঁটা দেয়। সেইসঙ্গে সুর্মাও। তার পর যারা ঈদের নামাজ পড়তে যাবার, তারা ঈদগাহে যায়। চন্দনের ফোঁটা ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী নেওয়ার কোনো কারণ নেই। তা হলে কেন?

ঈদের মতোই মহরমের অনুষ্ঠানও খুব গুরুত্বপূর্ণ। তেঘরিয়া গ্রামে মহরম দুভাবে পালিত হয়। একদিকে কোরানপাঠ, রোজা, মিলাদ ও দান-খয়রাতের মাধ্যমে হজরত হাসান ও হজরত হোসেনের মর্মান্তিক মৃত্যুকে স্মরণ ক'রে শোকপালন করা হয়। অন্য দিকে ঢোল, কাঁসি, সানাই সহ 'মর্শিয়া' গান গেয়ে ও বুক চাপড়ে 'মাতম' করা হয়। এই 'মাতম'-এর মাধ্যমে কারবালার সেই নিদারুণ লোকের স্পর্শ পেতে চায় কিছু লোক। 'মর্শিয়া' হচ্ছে কারবালা প্রান্তরে এজিদের সৈন্যের সঙ্গে ইমাম হোসেনের অসম লড়াই ও তার পরিণতি নিয়ে বাংলায় লেখা করুণ রসের গান। এবং 'হায় হোসেন', 'হায় হাসান' বলে বুক চাপড়ে আর্তি ফুটিয়ে তোলাকে বলা হয় 'মাতম'।

তেঘরিয়া গ্রামে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে যারা মহরম পালন করে, তারা মহরম মাসের ৮, ৯, ১০, ১১— এই চারটি দিনেই মূল অনুষ্ঠানগুলি করে থাকে। আট তারিখ দুপুরে কারবালা প্রান্তরে এজিদের সৈন্যদের হাতে হজরত আলির কনিষ্ঠ পুত্র হজরত ইমাম হোসেন সপরিবারে নিহত হন। স্থানীয় ভাষায় দিনটিকে বলা হয় 'দুপুরে' বা 'দুফুরে'। এই ঘটনাকে স্মরণ করে ঢোল, কাঁসি, সানাই বাজিয়ে কলাগাছ কাটা হয়। গ্রামের আস্তানাটিকে চার পাশে চারটি কলাগাছ দিয়ে সাজানো হয়। থাকে আমপাতা, ফুল এবং ইমামের নিশান। মনে না-রাখলেও চলবে যে, কলাগাছ এবং আম্রপল্লব বাঙালির কাছে মঙ্গলপ্রতীক হিসেবে স্বীকৃত। মহরম মাসের ৯ তারিখকে বলা হয় 'খালি'। ন তারিখ বিশেষ কিছু হয় না। দশ তারিখ 'জিয়ারত'। এদিন খুব জোর 'মর্শিয়া' গাওয়া হয়। 'মাতম' চলে। সঙ্গে লাঠি খেলা। এগারো তারিখ 'মঞ্জিলমাটি'। এদিনই ইমাম হোসেনের শবদেহ 'দাফন' করা হয়েছিল। তেঘরিয়ায় কবরস্থ করাকে বলে 'মাটি দেওয়া'। এই 'দুফুরে', 'খালি', 'জিয়ারত' এবং 'মঞ্জিলমাটি'— এই চারটি দিনের নামকরণেই বাঙালি মুসলমানের অবস্থান আমরা খানিকটা বুঝতে পারি। বাংলা এবং আরবি শব্দের মিশ্রণে এমনভাবে তৈরি হয়েছে এবং এত দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে শব্দ চারটি যে, কারও মনে শব্দগুলির অর্থ জানারও আজ আর প্রয়োজন হয় না।

৯. দুয়ারে দুয়ারে মঙ্গল ঘড়া
পাঁচ পল্লব ফুলের তোড়া;

প্রথমেই আমরা জন্ম-সংক্রান্ত লোকাচার নিয়ে সামান্য আলোচনা করেছি। শব-ই-বরাত, দুই ঈদ এবং মহরম নিয়ে অতি সামান্য যা আলোচনা করলাম, তাতে নির্ভেজাল ইসলামি উৎসবেও বাংলার সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ আমরা দেখেছি। আরও নানা চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ পেলে সেসব দেখানো যেতে পারে।

এবার আমরা তেঘরিয়া গ্রামের একটি বিবাহ দেখব। এবং এই সূত্রে স্বীকার করব যে, নিবন্ধটির লেখক তেঘরিয়া গ্রামেরই এক সন্তান।

যেহেতু পারিপার্শ্বিক নানা কারণে গ্রামসমাজের ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে, বিদ্যুৎ এবং সেই সূত্রে টেলিভিশনও এসে গেছে, এসেছে পাকা রাস্তা, রাজনীতির দ্বন্দ্ব, বাস-রুট, মোটরসাইকেল, উচ্চফলনশীল ধান, বহুজাতিক কোম্পানির কীটনাশক এবং ট্র্যাক্টর— সে কারণে নগরজীবনের মতো না হলেও, গ্রামেও বিবাহ-অনুষ্ঠানের অনেক সংক্ষিপ্তীকরণ হয়েছে। আমরা তাই মোটামুটি পরিপূর্ণ একটি বিবাহ-অনুষ্ঠান দেখার জন্য সামান্য অতীতে চলে যাব।

আমার দিদির বিয়ে হয়েছিল বছর তিরিশেক আগে। সেটা ছিল আমাদের পরিবারের কর্তাদের একটা আহ্লাদের বিয়ে। বাল্যবিবাহই হয়েছিল দিদির। তখন আর কতই-বা বয়স তার, ফুলিয়ে-ফাঁপিয়েও ১১ বছর!

মনে আছে, ৭ দিনের লগ্ন ছিল। অর্থাৎ দিদির শ্বশুরবাড়ি থেকে লগ্ন নিয়ে যেদিন লোকজন এল, তার ৬ দিন পর হয়েছিল বিয়ে।

লগ্ন আসে বরের বাড়ি থেকে। বর একটা হলুদ-ছোপানো ধুতি পরে। তার পর হলুদ ও সোঁদা বেঁটে অর্ধেকটা মিশ্রণ ৯ জন সধবা মহিলা বরকে মাখায়। বরের হাতে সর্বক্ষণের জন্য ধরানো হয় একটি লোহার জাঁতি। এই জাঁতি বিয়ে করে বাড়ি ফিরে আসা পর্যন্ত টানা ৭ দিন বরের হাতে থাকবে।

বরের সারা গায়ে হলুদ ও সোঁদা মাখানোর সময় ৯ জন মহিলা বরকে কেন্দ্র করে ৭ পাক ঘুরবে 'সোহাগ' গাইতে গাইতে। এই 'সোহাগ' গানের ভাষা বিচিত্র। নমুনা হিসেবে সামান্য একটু উদ্ধৃত করার লোভ আমরা সামলাতে পারছি না :

সোহাগ মানানি ছালিও রে আল্লা-রসুলকে দরবার
দেহ রে আল্লা-রসুল আপোনা সোহাগ।
সোহাগ মানানি ছালিও রে পাঁচো পীরওকে দরবার
দেহ রে পাঁচো পীর আপোনা সোহাগ।
সোহাগ মানানি ছালিও রে মা-বাপোকে দরবার
দেহ রে মা-বাপো আপোনা সোহাগ।

এইভাবে আত্মীয়স্বজন, গ্রামবাসী গুরুজন— সকলের কাছে সোহাগ প্রার্থনা করা হয়। অতি-প্রলম্বিত 'সোহাগ' শেষ হলে হলুদ মাখানোও শেষ। তার পর ঘুরে ঘুরে ঝুমুর গাইতে গাইতে মহিলারা আনন্দ করে। সেই গানের সামান্য অংশ পাঠকদের জন্য উদ্ধৃত করা হল :

লারি লারি, সারির ঘাটে আমলা লিছে কেশে মাগো
ঘটির উপর তেলের বাটি মাঙছি হাতের শাঁখা মাগো
হাতে আছে আরশিখানি দেখছি মুখে ছটা মাগো

অবিস্মরণীয় এসব পঙ্‌ক্তি আজও গীত হয়। পরপর ৫দিন সন্ধ্যায় হলুদ-সোঁদা মাখানো এবং গীত-বাদ্য চলে। এবং বর বিয়ের আগের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত খালি গায়ে থাকে। ষষ্ঠদিনে দুপুরে হয় 'আটা উসারা'। নজন সধবা ঢেঁকি ধুয়ে ঢেঁকির গায়ে তেল-সিঁদুর লাগিয়ে গান গাইতে গাইতে, ঢেঁকিতে পাড় দেয়। চাল কোটে। সেই আটা গুলে বরকে মাখানো হয়। সারাদিন বর আটা মেখে থাকে। শেষ বিকেলে স্নান করে। এবং, সন্ধ্যায় নতুন পাজামা-পাঞ্জাবি পরে উঠোনে অস্থায়ীভাবে তৈরি আলমতলায় (ছাদনাতলা) বসে 'ক্ষীর' খাবে। এই আলমতলাও সাজানো হয় কলা গাছ এবং আম্রপল্লব দিয়ে। সঙ্গে থাকে রঙবেরঙের কাগজের ফুল, শিকলি ইত্যাদি। কিন্তু, বরের খাদ্য হিসেবে যা দেওয়া হয়, তা নামে 'ক্ষীর' হলেও সাজানো থাকে থরে থরে উৎকৃষ্ট সব রান্না। পোলাও, মোরগের মাংস, নানারকম শাকসবজি, মাছ, পরোটা, নানারকম মিষ্টি, ক্ষীর, পায়েস, দই ইত্যাদি। প্রথমে বাড়ির গুরুজনেরা, তার পর আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, গ্রামের সবাই একটু করে খাওয়ায়

আর যার যা খুশি উপহার দেয়।

আমরা একটু এগিয়ে গিয়েছি। লগ্নের দিন থেকে আবার শুরু করি। কেননা, আমরা কনের বাড়ির ক্রিয়াকর্মও একটু দেখব। লগ্নের দিন বরকে হলুদ মাখানো হয়ে গেলে শুরু হয় লগ্ন গোছানোর পালা। ফুললতাপাতা-আঁকা নতুন তোরঙ্গে, অধুনা বিশাল ভি.আই.পি. বা অ্যারিস্টোক্র্যাট সুটকেসে, যাবতীয় পমেটম, আলত্তা, চিরুনি, আয়না, সিঁদুর, খেলনা, শাড়ি-কাপড়, কাচের চুড়ি এবং একটি হলুদ-ছোপানো শাড়ি ভরা হয়। সেইসঙ্গে নতুন তৈরি ও রঙিন আলপনা-আঁকা মাটির হাঁড়িতে করে মিষ্টি সহ 'লগ্ন' নিয়ে কয়েকজন আত্মীয় যায় কনের বাড়িতে। অবশ্যই তাদের সঙ্গে থাকবে সেই হলুদ-সোঁদার মিশ্রণের বাকি অর্ধেকটা।

লগ্নের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, মেয়ের লগ্ন ধরার পর বাপের বাড়ির আর কিছুই সে ব্যবহার করতে পারবে না। বরের বাড়ি থেকে আসা লগ্নের জিনিসপত্রই ব্যবহার করবে। এমন-কি, চটিজুতোও।

মেয়ের বাড়িতে 'লগ্ন' এসে পৌঁছলে তা দেখার জন্য গ্রামবাসীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। পাড়ার মহিলারা দেখতে এলে প্রথমেই একচোট সমালোচনা হবে। তারা বলবেই— এটা ভালো নয়, ওটা কম দামি, এ কি একটা তোয়ালে হল ? এই পাউডার বাবা আমরা জীবনেও মাখি নি !

তার পর মেয়েকে বরের বাড়ি থেকে আসা হলুদ-ছোপানো শাড়ি পরানো হবে। মেয়ের বাড়িতেও তৈরি হয় আলমতলা। এবং একইভাবে সেখানেও 'সোহাগ' গাইতে গাইতে বরের-বাড়ির-পাঠানো হলুদ-সোঁদা মেয়েকে মাখানো হয়। আর, মেয়ের হাতে ধরানো হয় কাজললতা। এই কাজললতা তার সঙ্গে থাকবে বিয়ের শেষপর্যন্ত।

বরের হাতে জাঁতি এবং কনের হাতে কাজললতা— লোহার দুই রূপে সমাজের বহির্মুখী এবং অন্তর্মুখী চেহারাটি স্পষ্ট ধরা দেয়। কনের অন্তর্লীন মাতৃমূর্তি যেমন, তেমনই গৃহবন্দী অবস্থায় শুধুমাত্র সন্তানপালনের নির্দেশও যেন হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয় কাজললতা রূপে। আর জাঁতি ? যারা দুপুরে খাওয়ার পর কোনো প্রৌঢ়কে নিবিষ্টচিত্তে অত্যন্ত মিহি করে সুপুরি কেটে পানে দিতে দেখেছেন, তাঁরা বুঝবেন এর আরামপ্রিয়তা।

দিদির যেদিন লগ্ন আসে, তার আগেই কুমোরবাড়ি থেকে এসে গেছে ছোটো ছোটো অনেক চিত্রিত হাঁড়ি। সেইসব হাঁড়িতে মিষ্টি ভরে যেখানে যত আত্মীয় আছে, তাদের বাড়ি-বাড়ি লোক পাঠানো শুরু হয়েছিল নিমন্ত্রণ করতে। এবং বিয়ের আগের দিন পর্যন্ত বর ও কনের বাড়ির ক্রিয়াকর্ম প্রায় একই।

একদিন দিদির বিয়ে এল। একগাদা বরযাত্রী সহ বর। বরের সঙ্গের মহিলারা সেদিন 'ডোলার বিবি'। খাওয়া-দাওয়ার একফাঁকে বিয়েও পড়ানো হয়ে গেল। এ বিয়ে অনেকটা রেজিস্ট্রি বিয়ের মতো। অর্থাৎ বর ও কনে পরস্পরকে বিয়ে করছে কিনা জানা এবং তার সাক্ষী রাখা। কনে বসে বাড়ির ভেতরে 'ডোলার বিবি'দের সঙ্গে আর বর বসে বাইরে বরযাত্রী ও উপস্থিত গ্রামবাসীদের সঙ্গে। অবশ্য প্রথমে মেয়ে বিয়ে কবুল করে, পরে ছেলে। পুরুষতান্ত্রিকতার নিদর্শন এখানে আছেই। তার পর কাজি আল্লার কাছে প্রার্থনা করেন দম্পতির মঙ্গলকামনা ক'রে। উপস্থিত সবাই এই প্রার্থনায় অংশ নেয়। এর পরই রুমালে ঢাকা একগ্লাস শরবত আসে বাড়ির ভিতর থেকে। অর্ধেকটা বর খায়। বাকিটা চলে যায় তার সদ্যবিবাহিতা স্ত্রীর জন্য। শুরু হয় মিষ্টি বিতরণ। এবং শেষ হয় বিবাহ-অনুষ্ঠান।

কিন্তু, শেষ হয়েও হয় না। এর পরই আসে লোকাচার। বরকে নিয়ে যাওয়া হয় বাড়ির ভেতরের আলমতলায়। সেখানে বর-বউকে একসঙ্গে বসানো হয়। দুজনের পোশাকে গিঁট দেওয়া হয়। সামান্য রঙ্গরসিকতা ও মিষ্টান্ন পরিবেশনের পরই হয় কন্যাসম্প্রদান। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কান্নাকাটির আগে কিছুতেই মিটতে চায় না।

১০. রাত্রি ক'দণ্ড হইল কেহ আসিল না।...
রাত্রি একপ্রহর হইল, তবু কেহ আসিল না।

মৃত্যুতে এই জীবনের শেষ। কোনো পুরুষ মারা গেলে তার জন্য যখন 'কাফন' কিনে আনা হয়, তখনই স্বামীর

কাফনের সঙ্গে বিধবার জন্য আসে সাদা থান। হাতে কাচের চুড়ি থাকলে কাঁদতে কাঁদতে স্ত্রী নিজেই মেঝেতে দুইহাত আছাড় মারতে মারতে ভেঙে ফেলে। বিধবার জন্য সোনার চুড়ি ছাড়া অন্য চুড়ি পরা নিষেধ। তার পর নতুন বস্ত্র পরে স্বামীর কাছে সে মুক্তি চায়, জীবনের ভুলভ্রান্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। তার স্বামীর মরদেহ তখন অন্তিম স্নানের পর নতুন-কেনা সাদা কাপড়ের কাফনে ঢাকা। শুধু মুখটুকু তখনো খোলা আছে, শেষবারের মতো স্ত্রী-সন্তান ও আত্মীয়স্বজনকে দেখাবার জন্য। এর পরই লাশ নিয়ে যাওয়া হয় বামনিপুকুরের পাড়ের গোরস্তানে। এখানে এমন সব ক্রিয়াকর্ম করা হয়, যার সবগুলি ইসলাম-নির্দেশিত নয়। এখানে সে আলোচনায় না-গিয়ে আমরা সদ্য-বিধবাকে দেখি।

চতুর্থ দিনে যার যা সাধ্য সেইমতো গরিবদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায়। সেইসঙ্গে যারা কবরের মাটি খুঁড়েছিল বা গোর দিতে কায়িক পরিশ্রম করেছিল, তাদেরও নিমন্ত্রণ করা হয়। সেদিন বাড়িতে মিলাদের অনুষ্ঠান হয়। চল্লিশ দিন পর্যন্ত বিধবা চুলে তেল-চিরুনি দিতে পাবে না। বিছানায় শোবে না। বাড়ির লোকজনের বাইরে অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে কথা বলবে না। চল্লিশ দিনে মৃতের আত্মার শান্তি কামনা করে মিলাদ অনুষ্ঠিত হয়। নিমন্ত্রিত সকলের খাওয়া শেষ হলে ৫ জন মহিলার সঙ্গে পুকুরে স্নান ক'রে এসে স্বামীহারা স্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে বিধবার সাদা শাড়ি বা থান পরিধান করে। খাওয়ায় তার বিধিনিষেধ নেই ঠিকই। বাদবাকি সবেতেই আছে। এমন-কি, বিবাহজাতীয় মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানেও সে ব্রাত্য। আগে বিধবাকে বলা হত 'রাঁড়ী'। এখন তা প্রায় বিলুপ্ত।

এতক্ষণ আমরা যা আলোচনা করেছি, নানা কারণে তার সবগুলি অংশই অসম্পূর্ণ। হয়তো ভালো হত, যদি বাঙালি মুসলমানের লোকাচারের কোনো একটি দিক নিয়ে আমরা আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতাম। পরিবর্তে, আমরা যতটা বেশি সম্ভব পরিসর বাড়াতে চেয়েছি, যাতে একটা সম্পূর্ণ ছবির অন্তত আভাস একটিমাত্র নিবন্ধে ফুটে ওঠে।

আমরা দেখেছি যে, শুধুমাত্র ধর্মীয় আইন মেনে উৎসব পালনে বাঙালি মুসলমানের মন স্ফূর্তিলাভ করে না। সে আরও কিছু আশা করে। তখনই প্রয়োজন হয় লোকাচারের, যে-লোকাচার বাঙালির বলে খ্যাত। তেঘরিয়া গ্রামে এটা যেমন আমরা দেখেছি, তেমনই এও দেখেছি যে, মৃত্যু-পরবর্তী সময়ে আত্মার যাবতীয় অবস্থান, কেয়ামত, শেষ বিচার, স্বর্গ-নরক— সমস্ত কিছুতেই গ্রামবাসীদের বিশ্বাস আছে। ইসলাম-নির্দেশিত পথে চলে সে তার আত্মার সদ্‌গতি চায়। কিন্তু, যতক্ষণ সে বেঁচে আছে, তার নশ্বর দেহ ও মনকে এই পৃথিবীর যাবতীয় অমঙ্গলজনক বায়ু-বাতাস থেকে রক্ষা করার জন্য সে আশ্রয় নেয় লোকাচারের। আল্লা সর্বশক্তিমান। কিন্তু, পৃথিবীর অশুভ শক্তিকেও সে বেশ-খানিকটা মূল্য দেয়।

টীকা

এই রচনার প্রতিটি বিভাগের শুরুতে যে-উদ্ধৃতিগুলি ব্যবহৃত হয়েছে, তার সমস্তই দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার, ঠাকুরমার ঝুলি, সপ্তত্রিংশৎ সংস্করণ, কলকাতা, ১৪০০ থেকে নেওয়া, পৃষ্ঠা যথাক্রমে ১৭, ১২৩, ১৩৫, ২২৭, ২৬, ১৩৭, ১৮৩, ১৮১, ৬৭ আর ১৪৮।

১. Lina M. Fruzzetti, 'Muslim Rituals : Household Rites *vs.* Public Festivals in Rural India', in Imtiaz Ahmad, ed., *Ritual & Religion among Muslims in India*, New Delhi, 1981, p. 92.

বুদ্ধদেব বসু : মুক্তমনের মানুষ

আমরা অনেকেই তখন বিষ্ণু দে-র কবিতার ভক্ত, দু-দশ পঙ্‌ক্তি মুখস্থ বলে যেতে পারি যখন-তখন। সুধীন্দ্রনাথের চেয়ে বিষ্ণু দে-ই বেশি আপন, প্রধানত 'সন্দ্বীপের চর' থেকেই আমরা তাঁর অনুচর। অকারণে নয়, আমাদের বিশেষ রাজনৈতিক বিশ্বাসের সেইসব উদ্দীপনাময় দিনগুলোয় তাঁর কবিতা জুগিয়ে দিত আন্দোলিত হওয়ার প্রেরণা।

অন্য দিকে, একটা উলটো আয়নায় নিজেদের আমরা দেখতে পাই তখন। যা নই, হয়ে যাই তার চেয়ে লম্বা। যা জানি, বলতে শিখি তার চেয়ে অনেকটা বেশিই। কফি হাউসের টেবিলে, কফি হাউস থেকে বেরিয়ে সিগনেটের পাশের সুড়ঙ্গ-সদৃশ সরু ফালিতে বেঞ্চ-বিছোনো চায়ের আড্ডায়, ফেবারিট-কেবিনে, এবং অন্যত্রও, যে তিনজন কবিকে নিয়ে এ-মুখে ও-মুখে অনর্গল কথাবার্তা আর কিছুটা হাসি-ঠাট্টাও চলে তখন, তাঁরা হলেন বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আর বুদ্ধদেব বসু।

বুদ্ধদেব বসুর বেলায় আমাদের কলহাস্যের বহরটা ছিল অন্য দুই কবির চেয়ে কিছুটা বর্ধিত-কলেবর। অন্য দুই কবির বেলায় আমাদের কথা চলত তাঁদের সাহিত্যকে নিয়েই কেবল। জীবন বা জীবনযাপন প্রণালী মনোযোগের বাইরে। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর বেলায় সাহিত্যের সঙ্গে জুড়ে গিয়েছিল তাঁর জীবনটাও। কে বা কারা যেন হরির লুটের বাতাসার মতো দমকে দমকে বাতাসে ছুঁড়ে দিত নানান মুখরোচক সমাচার। তড়িঘড়ি সেসব চলে আসত আমাদের মুঠোয়। মুঠো থেকেই চালান হয়ে যেত রটনাবিলাসী জিভে।

মজার ব্যাপার একটাই। যদিও 'কবিতা' পত্রিকা ঘুরত ঈষৎ-সচ্ছল কারো কারো হাতে, যদিও কেউ কেউ সাদরে সংগ্রহ করত 'কবিতাভবন' থেকে বেরোনো 'এক পয়সায় একটি' সিরিজের পাতলা বইগুলো, যদিও 'কালের পুতুল'-এর একাধিক আগ্রহী পাঠক ছিল আমাদের তখনকার পরিচিত মহলের গণ্ডির ভিতরে, যদিও 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' কিংবা 'উত্তরতিরিশ'-এর রম্যরচনার স্বাদ পেতে একখানা বই ভাগাভাগি করে দশজনের পড়া চলছে তখন, তবুও, প্রকাশ্যে বুদ্ধদেব বসুর জন্যে জমিয়ে রাখা হয়েছিল এক ধরনের নিস্পৃহ শীতলতা, এক ধরনের নিরুচ্চার উপেক্ষা কিংবা ঔদাসীন্য। আবার অন্য দিকে, রাজনীতির সুবাদে, রাজনীতিকে ছুঁয়ে আমাদের দৈনন্দিন ক্রিয়াকাণ্ড, দৈনন্দিন পঠন-পাঠন, দৈনন্দিন বাগ্‌বিতণ্ডা, দৈনন্দিন লেখালেখি ইত্যাদি স্টিমারের চাকার মতো ঘুরে চলেছিল পিছনে এমনই প্রবল ফেনপুঞ্জময় জলতোড় তুলে যে, বুদ্ধদেবের মিষ্টি, মোলায়েম আর তখনকার ভাষায় 'জীবন-বিচ্ছিন্ন' অথবা 'বাস্তব-বিবর্জিত' রচনাবলির দিকে ঘুরে তাকানোরও যেন প্রয়োজন ছিল না তেমন। আমাদের নিয়ত-স্পন্দিত করে রাখার পক্ষে কবি, কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক আর পত্রপত্রিকার খামতি ছিল না কোনোখানে।

অনেক কিছু বাদ-সাদ দিয়ে মোটামুটি এই রকমই দাঁড়ায় আমাদের উঠ্‌তি বয়সের সমষ্টিগত হিস্তেবনিকেশ, বুদ্ধদেব সম্পর্কে। ব্যক্তিগতভাবে আমি ছিলাম তাঁর সম্পর্কে ভীত। কারণ লোকপরম্পরায় কানে আসত :

১. তাঁর 'কবিতা' পত্রিকায় লেখা পাঠালে লেখকের অজ্ঞাতসারেই তিনি নাকি বদলে দিতেন অপছন্দের পঙ্‌ক্তিগুলো।

২. চিঠিতে ত্রুটি নির্দেশ করে লেখককে অনুরোধ জানাতেন পুনর্বিবেচনার।

৩. লেখককে সশরীরে ডেকে পাঠাতেন সাক্ষাৎ আলোচনায়।

আমার কাল্পনিক ভীতি-বিচ্ছুরণ এই শেষটিকে ঘিরেই। কারণ ছন্দের ব্যাকরণে আমি ছিলাম এবং রয়ে গেছি

পরিপূর্ণ আনাড়ি। আমার ছন্দোবোধ একান্তভাবেই কর্ণনির্ভর। কবিতা পাঠালেই যদি ডাক আসে আর মুখোমুখি আলোচনায় বসলে যদি প্রকট হয়ে ওঠে আমার ছন্দ-কুম্ভের অতল শূন্যতা, এই অদ্ভুত আতঙ্কেই উদীয়মান কবি হয়ে ওঠার উন্মুখ পর্বেও কবিতার খামে কোনোদিনই লিখে উঠতে পারি নি 'কবিতা ভবন'-এর ঠিকানা।

২.

শুধু ব্রাহ্মণ নয়, মানুষ মাত্রেই দ্বিজ। রবীন্দ্রনাথের হিসেবে একবার সে জন্মায় মাতৃক্রোড়ে। আরও একবার তার পুনর্জন্ম ঘটে স্বদেশের পরিমণ্ডলে। ঠিক সেইভাবেই আমরা, লেখালিখির লোকজনেরাও, বাড়ি দুভাবে। আমাদের প্রস্তুতিপর্বের বাঁয়ে যখন কানে শোনা কথাবার্তার ভিড়ভাট্টা, ডাইনে তখন অপেক্ষা করে থাকে প্রত্যক্ষ বাস্তব থেকে নিজস্ব অভিজ্ঞতা অর্জনের দায়। ব্যক্তিগত সম্পর্ক নির্মাণের অথবা নির্ধারণের বেলাতেও সত্যিটা দু রকমের। অন্যের বচনে কাউকে যা জানি, চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার আলোয় আমূল বদলে যেতে পারেন তিনি। কবি, শিল্পী, লেখকদের বেলায় দ্বিজ শব্দটা মানিয়ে যায় আরও। এক কথায় প্রতিভাবান মাত্রেই দ্বিজ। প্রথম জন্মে তাঁরা নির্মাণ করে যান নিজেদের। মৃত্যুর পরেই দ্বিতীয় জন্মের শুরু। তখন আমরা নির্মাণ করি তাঁদের, মেদ ঝরিয়ে অনেক মচ্‌কানো হাড়ে জোড়া লাগিয়ে।

মনে আছে তাঁর অতর্কিত প্রয়াণের পর কোনো একটি অখ্যাত লিট্‌ল ম্যাগাজিনে লিখেছিলাম : 'এক একটা মানুষ থাকেন চওড়া উঠোনের মত। অনেক রোদ, অনেক আলো, অনেক ঝড় বৃষ্টি, অনেক লোক, অনেক মতামত, অনেক হৈ হৈ উৎসব এসে মিলতে পারে সেখানে। এবং সে উঠোনে ঢোকার দরজা সব সময়েই খোলা। এবং তাদের সকলের জন্যেই, যারা ঢুকতে চায়।...

বুদ্ধদেব বসুর চেয়ে অনেক বেশি পণ্ডিত মানুষ দেখেছি। এবং আছেনও। তাঁর চেয়ে বড় দরের কবি দেখেছি। এবং আছেনও। কিন্তু তাঁদের কাছে পৌঁছতে অনেক কুণ্ঠা। বুদ্ধদেব বসুর কাছে না-যেতে পারলেই মনে হতো ক্ষতি। যখনই ডেকেছেন ছুটে গেছি। যখন পারি নি, ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি টেলিফোনে। পরমতসহিষ্ণু মানুষ এ যুগে বড় বিরল। বুদ্ধদেব বসু নিজের জায়গায়, অর্থাৎ, মতে, সিদ্ধান্তে, আদর্শে, উপলব্ধিতে বটের মত স্থির। অথচ অন্যের, অপর পক্ষের, যাবতীয় বিরুদ্ধ-বাক্যের ঝড়-ঝাপটা সইবার বা বইবার মত ধৈর্য্য ছিল অগাধ। অপরকে অপর্য্যাপ্ত স্বাধীনতা দিতেন তিনি। গুরুগিরি বা গার্জেনি-ঢং ছিল স্বভাবের বাইরে। মনের যে কোনো কথাই তাঁর সামনে সিগারেটে আগুন ধরানোর মত দপ্‌ করে জ্বালিয়ে নেওয়া যেত।'

কথাগুলো যে লিখে যেতে পেরেছিলাম সেদিন, সেটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতারই ফলন। অল্পে অল্পে, হাঁটি হাঁটি পা পা করে পৌঁছোনো তাঁর কাছাকাছি। প্রচ্ছদ অঙ্কনের সূত্রেই ডাক আসে প্রথম। সে প্রচ্ছদও নিজের বইয়ের নয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালের। পরে এল নিজের বই। বোদলেয়র। খুশি হয়ে চেয়েছিলেন 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'-টাও আমি করি। কিন্তু দীর্ঘ ৯ মাস বন্ধ হয়ে থাকার পর জীবনের প্রথম চলচ্চিত্র 'স্বপ্ন নিয়ে'-র বাঁচা-মরা নিয়ে এমনই বিভ্রান্ত আর ব্যতিব্যস্ত যে কিছুতেই অনুরোধ রাখতে পারছিলাম না তাঁর। দীর্ঘ ৬ মাস অপেক্ষা করার পর তিনি প্রকাশক বিরাম মুখোপাধ্যায়কে জানিয়েছিলেন যে, ও যখন আঁকতে পারছে না তখন মলাটে থাকুক ভারতীয় ভাস্কর্য থেকে বেছে নেওয়া কোনো মানানসই মূর্তির ফোটোগ্রাফ। তা-ই হয়েছিল।

জানতাম, সিনেমা বস্তুটাকে শিল্পমূল্য দিতে যথেষ্ট কুণ্ঠা ছিল তাঁর। 'পথের পাঁচালী' দেখেও উল্লাস-উচ্ছ্বাসের ফুলঝুরি ফোটে নি তাঁর কলমে। আমাদের কণ্ঠস্বর যখন মাতাল হয়ে উঠতে চাইছে প্রশংসাধ্বনিতে, তখন সে ছবিকে ভারতীয় চলচ্চিত্রের নবজাগরণের সূচক হিসেবে চিহ্নিত করার বদলে তিনি শোনালেন নিরাসক্ত এই মন্তব্য— এক বিহঙ্গে বসন্ত আসে না। অথচ এমন নয় যে খাঁটি চলচ্চিত্র তাঁর বোধগম্যতার বাইরের

বিষয়। 'চ্যাপলিন' নামের সেই দীপ্তিময় প্রবন্ধটি তো তাঁরই লেখা, যার ছত্রে ছত্রে এক পরিশীলিত মন ও মননের আবেগ-মন্থনের অভ্রান্ত পরিচয়। বিষণ্ণ হয়েছি মনে মনে। বাংলা কবিতায় শুধু 'ঠ্যাং' শব্দটি সংযোজনের সুবাদে জীবনানন্দকে যিনি উপহার দিতে পারেন স্তুতিময় স্তবক, 'পথের পাঁচালী' চলচ্চিত্রের ভাঁজে ভাঁজে বা স্তরে স্তরে কর্কশ বাস্তবতার সেই প্রথম উন্মোচনের প্রত্যক্ষদর্শী হয়েও কী করে পারলেন অতখানি নিরাবেগ থেকে যেতে ? মনকে যুক্তি জোগাই এই বলে যে, বঙ্গীয় বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই সম্ভবত হতে চান বিশ্বামিত্র ধরনের তপস্বী, অন্য মাধ্যমের মেনকারা যাঁদের কাছে তপোভঙ্গের চক্রান্তের অংশীদারই শুধু।

তাঁর সিনেমা-বিমুখতা সম্পর্কে এতখানি জেনে বা বুঝেও, তবুও একদিন আমন্ত্রণ জানিয়ে বসি পূর্ণ সিনেমায় আমার সদ্য-মুক্তিপ্রাপ্ত 'স্বপ্ন নিয়ে' ছবিটি দেখার। আমন্ত্রণ জানানোর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত বুকের গোপনে টিপটিপোনি। নিশ্চয় চটে আছেন যথাসময়ে তাঁর 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'-র প্রচ্ছদটি করে দিই নি বলে। কিন্তু আশ্চর্য, খেদ-ক্ষোভের তিল-চিহ্নও নেই তাঁর সম্ভাষণে। অল্প আপত্তির পরেই রাজি হয়ে গেলেন ছবিটি দেখতে। দেখে নিন্দা এবং প্রশংসা দুটোই জানালেন স্পষ্ট ভাষায়। কখনো ভুল করেও আমার কবিতা পড়েছেন কিনা সন্দেহ। তবু বলেছিলেন, তুমি যে কবি সেটা বোঝা যায় তোমার ছবিতে।

ধরে নিই এমন উক্তির পিছনে আমার সম্পর্কে তাঁর স্নেহপরায়ণতাটাই আসল। তাঁর সম্পর্কেও ভীত আমি ক্রমে রোঁয়া ফোলাতে থাকি সাহসের। বছর খানেক পরে তাই বলে ফেলতে পারি, ছবি করব আপনার 'আমরা তিনজন' গল্পটাকে নিয়ে। তিনি হাঁকলেন একটা নির্দিষ্ট টাকা। আমি সেটাকে নামিয়ে দিলাম অনেক নীচে। তবুও তিনি রাজি। বললেন, চিত্রনাট্য করব আমি। তা নিয়ে বিশাল বিতর্ক। দফায় দফায়। শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ। বেশ, তাহলে তুমিই করো। তবে আমার মনোনয়নটা পেতেই হবে তোমাকে।

এইসব চলেছে যখন, তখন তাঁর এবং প্রতিভা বসু-র মাথায় চাপল, মঞ্চস্থ করবেন 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'। আমিও জুড়ে গেলাম সে উদ্যোগে, দৃশ্যপট আর সাজসজ্জার দায়িত্ব নিয়ে। আমার উৎসাহে তাঁরা অনেকখানি নিশ্চিন্ত। তাঁদের নিশ্চিন্ততাকে আরও ভরাট করে তুলতেই বলে বসি এর পর, এ-নাটকের সংগীত পরিচালনার যোগ্য লোক একজনই, রবিশঙ্কর। রবিশঙ্কর ? বল কি ? রাজি হবেন তিনি ? হবেন। তিনি আমার আত্মীয়। খুবই হৃদ্য সম্পর্ক আমাদের। আমি অনুরোধ জানালে রাজি হবেন অবশ্যই। আমার দিক থেকে শুরু হয়ে গেল মতি চন্দ, স্টেলা ক্রামরিশ, জিমার -ঘাঁটাঘাঁটি, রামায়ণের যুগের সাজগোজ আর স্থাপত্য নিয়ে। কিন্তু একটা-দুটো রিহার্সালের পরই সে নাটক বন্ধ। বন্ধ ঠিক সেই কারণে, 'আমরা তিনজন' ছবিও দৌড় শুরুর আগেই মুখ থুবড়ে পড়বে যাতে। শব্দে খাটো কিন্তু অর্থে ভারাতুর সে কারণটা ছিল, ফিনান্সের ঘাটতি।

নাটক শিকেয়। সিনেমা স্বর্গে। তাঁর রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এর বাড়িতে মোটামুটি ঘন যাতায়াতের পথে পড়ল কাঁটা। কিন্তু বুদ্ধদেবের সঙ্গে ছিঁড়ল না যোগসূত্রটা। বাড়লই বরং। তিনি লিখে চলেছেন বইয়ের পর বই। বেবুবার মুখে প্রচ্ছদের জন্যে অনুরোধ। টেলিফোনে শোনাতেন বিশদ বিবরণ, কী ভাবছেন তিনি প্রচ্ছদের ব্যাপারে। টেলিফোনের কথা বিস্মৃত হতে পারি, এমন দুর্ভাবনা থেকেই লিখে বসতেন চিঠি। অবশ্য টেলিফোন যখন ছিল না, তখন চিঠিই সম্বল। একটা আধটা নয়, কিছু হারিয়ে গিয়েও এখনও রয়ে গেছে গোটা পঁচিশেক। ছোটো, মাঝারি আর বড়ো মিলিয়ে। শূন্য থেকে জন্ম বলেই হয়তো পৃথিবী শূন্যতা ছাড়া বাঁচতে পারে না। টেলিফোন এসে একটা শূন্যতা ভরাট করতে-না-করতেই আর-এক শূন্যতা গড়ে উঠল চিঠিপত্রের বেলায় তাই। ভাগ্যিস টেলিফোন ছিল না কিছুকাল, তাই ফাটা কপালে এতগুলো চিঠির চন্দন টিপ। খানিকটা হালকা চালে একবার লিখেছিলাম একটা নিবন্ধ, 'প্রচ্ছদ এঁকে পদ্মবিভূষণ'। প্রচ্ছদ বিষয়ে তাঁর একগুচ্ছ চিঠি আমার জীবনে কতখানি মহামূল্যের, সেটা জানাতেই।

৩.

বেশ কয়েকবছর আগে কলকাতার প্রধানতম সাপ্তাহিকে বেরিয়েছিল বুদ্ধদেব বসু - বিষ্ণু দে পত্রাবলি.। পড়তে গিয়ে সে চিঠির পরতে পরতে যখন খুলে যাচ্ছিল এক বিশেষ যুগের সাহিত্যচর্চার প্রেক্ষাপট, তখন নজর কেড়ে নেয় ওই রচনায় ব্যবহৃত দুই কবির দুটি স্বতন্ত্র আলোকচিত্র। প্রথমে বুদ্ধদেব বসুর। পরে বিষ্ণু দে-র। এঁদের আলোকচিত্রের সঙ্গে সেটাই প্রথম পরিচয় নয়। তা ছাড়া বুদ্ধদেবের আলোকচিত্র তুলেছি আমি নিজেও। মেঘে মেঘে মলিন এক সকালে। তিনি রাজি হচ্ছিলেন না, অমন নিরালোকে ছবি ওঠা অসম্ভব জেনেই। আমি জোর করেই বসাই তাঁকে খোলা জানলার কাছে। পরে সেই ছবি দেখে উচ্ছ্বসিত। দুই চেনা মানুষের ছবিই ওই সাপ্তাহিকের পাতায়। অথচ হঠাৎ যেন নতুন আলো ছড়াল চোখে। বিস্ময়কর এক আবিষ্কারের আতশবাজিতে জ্বলে উঠল তা। বুদ্ধদেব বসু, যিনি রোম্যান্টিক কবি হিসেবে খ্যাত, এসকেপিস্ট অথবা ইনডিভিডুয়ালিস্ট হিসেবে নিন্দিত, মার্ক্সবাদ বা সমাজতন্ত্র যাঁর চিন্তাপরিধির ভিতরে কল্লোল তোলে নি কখনো, তাঁর ছবিটির দিকে তাকিয়ে মনে হল যেন এক সোভিয়েত শ্রমিক। মনে হল যেন ছবি নয়, কোনো সোভিয়েত-শোভন ভাস্কর্যের প্রতিলিপিই অনেকটা। কোদাল-বেল্‌চার মতো চ্যাপটা চোয়ালের সঙ্গে ঘাড়টা গেঁথে আছে যে আলোছায়াময় বিন্যাসে, তার মাংসপেশিতে যেন সিমেন্ট পাথরের আভাস। ম্লান হয়েও চোখ দুটো যেন ছুঁয়ে রয়েছে সুদূরপ্রসারী কোনো ভবিষ্যৎকে। ঠোঁট দুটো শুকনো, খরখরে। বিষণ্ণতায় ভারাক্রান্ত মুখমণ্ডল। তথাপি সেখানে যেন খোদাই করা রয়েছে এক শক্ত সবল চ্যালেঞ্জ। অসহায়, কিন্তু অঙ্গীকারবদ্ধ।

আর বিষ্ণু দে! প্রাজ্ঞ এবং প্রখর বুদ্ধিজীবী হিসেবে যিনি খ্যাত, মার্ক্সবাদী আদর্শের প্রহরণে যিনি বলীয়ান, নিজের কবিতার প্রদীপে যিনি জ্বালাতে চান মানবমুক্তির মঙ্গলালোক, অন্ধকারকে যিনি চিনিয়ে দেন আলোরই ঘনিষ্ঠ সহোদররূপে, ওই আলোকচিত্রে তাঁর নিঃসঙ্গতা পাথরের চেয়েও ভারী। অথচ সমগ্র মুখাবয়ব জুড়ে আভিজাত্যের দীপ্তি। আভিজাত্য পরিপাটি বেশভূষাতেও। সাদা পাঞ্জাবির উপর ঘাড়ের দুপাশে ভাঁজ করা মটকা কিংবা র-সিল্কের চাদর। একটু ঝুঁকে থাকা ভঙ্গি, শরীর বইতে পারছে না এমন কোনো ভারে। কপালের চার থাক ভাঁজ আর ঘন ভুবুর বাঁক তাঁর দীপ্ত চাউনির কৌটোর ভিতরে লুকনো মহাভারতীয় অর্জুন-বিষাদকে সুস্পষ্ট করে তুলেছে আরও। যেন আসন্ন কোনো পরাভব সম্পর্কে তিনি অতিমাত্রায় সচেতন। আজন্মলালিত স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ থেকে যেন ক্ষণকাল পরেই তাঁকে বিসর্জনের জলে ভাসিয়ে দিতে হবে তারই কোনো বৃহত্তর অংশ, এমনই এক অবরুদ্ধ শোকের কাতরতায় তিনি আচ্ছন্ন।

কী করে এমন হয়? কেনই বা মনে হচ্ছে এমন? 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র যে-গল্প অবলম্বনে টমাস মান-এর 'ট্রান্‌সপোসড হেডস্', সেখানে ছিন্ন মস্তিষ্কের দেহবদল আর দেহবদলের সূত্রে সত্তাবদলের সংকট নিয়ে যে ইতিবৃত্ত, তাকে স্বাভাবিক হিসেবে মেনে নিতে পারি এই নিরিখে যে তা কল্পিত উপাখ্যান। কিন্তু যে দুটি আলোকচিত্রে বিস্ময়াবিষ্ট তখন, তা তো আমাদের অতি পরিচিত দুটি বাস্তব মানুষের। তাঁদের কে কেমন ধাতের চরিত্র, কে কোন্ পুরুষার্থের পোষক, তার কিছুই অজানা নয় আমাদের। অথচ মিলছে না মুখের মানচিত্র। শুনতে শুনতে ধ্রুব সত্য হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছে যে ক্যামেরা মিথ্যাভাষণে অনভ্যস্ত। শুনতে শুনতে আরও মেনে নেওয়া যে মানুষের মুখমণ্ডল তার অস্তিত্বের অবিসংবাদী দর্পণ। তা হলে?

তা হলে কি এভাবে ভাবতে হবে যে কোন্ চুপিসাড়ে মস্তিষ্ক বদল, যা অন্য অর্থে, দায়িত্ব বদলই, ঘটে গেছে এঁদের দুজনের সাংস্কৃতিক ব্রতে? যদি ভাবা যায়, খুবই কি অলীক আর পলকা হবে তেমন বেদী বানানো? তুলনামূলক বিচারের তাত্ত্বিক খুঁটিনাটিকে এড়িয়ে, খুব সাদামাটাভাবে তাকালে কি অগোচর রয়ে যায় এমন দৃশ্য যে, একই সঙ্গে পা মিলিয়ে যাত্রা শুরুর পর সিদ্ধির চূড়ান্ত পর্বের কাছাকাছি পৌঁছে বিষ্ণু দে বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে যেখানে যেখানে থেমে গেছেন আকস্মিকভাবে, সেখান থেকেই অগ্রগমনের নতুন বাঁক খুঁজে পেয়েছেন বুদ্ধদেব বসু? নাকি একে সাজাতে হবে ভিন্ন গড়নে? তখন হয়তো এভাবে বলাটাই

বুদ্ধদেব বসু

বিষ্ণু দে

হবে সবচেয়ে শোভন আর গ্রহণীয় যে, সময়-সমাজ-সভ্যতা সম্পর্কে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবলতম পার্থক্য সত্ত্বেও তিরিশের যুগের এই দুই সর্বাগ্রগণ্য কবি যেন বড়ো হচ্ছিলেন একই মূল থেকে উৎসারিত দুটি ভিন্ন শাখাপ্রশাখাময় বিস্তারে। চিনে নেওয়ার স্মারকচিহ্নগুলোর দিকে তাকাতে চাইলে প্রথমেই মনে পড়ার কথা, পুরাণ-ভাবনা।

একটু আগে যে পত্রাবলির কথা, তার প্রথম পত্রের পঙ্‌ক্তিতে সদ্য-প্রকাশিত 'প্রগতি'র সম্পাদকরূপে বুদ্ধদেব বসু ঢাকার পুরানা পল্টন থেকে কলকাতায় বিষ্ণু দে-কে চিঠিতে লিখছেন

> আপনার প্রেরিত 'পুরাণের পুনর্জন্ম' শীর্ষক রচনাটি পাইলাম। গল্পটি আমাদের বিশেষ ভালো লাগিয়াছে, আপনার তীক্ষ্ণ লিখনভঙ্গী যথার্থই প্রশংসনীয়।...

মূল লেখাটার সঠিক নাম ছিল— 'পুরাণের পুনর্জন্ম/লক্ষ্মণ'। 'প্রগতি'তে বুদ্ধদেবই শুরু করেছিলেন সমকালের বিবর্তিত সমাজ-প্রেক্ষিতে রামায়ণ-এর নতুন ভাষ্য নিয়ে এক ধারাবাহিক ফিচার। বিপ্রদাস মিত্র ছদ্মনামে নিজে লিখেছিলেন, 'পুরাণের পুনর্জন্ম/ঊর্মিলা'। সে লেখার টেকনিক বা কায়দায় আকৃষ্ট হয়ে বিষ্ণু দে বেছে নিলেন লক্ষ্মণকে। কবি হিসেবে জন্মলগ্ন থেকেই তিনি পুরাণে আচ্ছন্ন। প্রাচ্য আর প্রতীচ্যের যাবতীয় পুরাণ-প্রতিমা যেন তাঁর কণ্ঠস্থ। 'উর্বশী ও আর্টেমিস' আর 'চোরাবালি'তে তার হাজারো নিদর্শন। 'সন্দ্বীপের চর' থেকে তাঁর কবিতার পালাবদল। 'অন্বিষ্ট'-য় পৌঁছলে বাইরের ঘটনা-কল্লোল থেকে সরে এসে তিনি নিমগ্ন হবেন ব্যক্তিচৈতন্যের গভীরে আলোড়িত প্রশ্ন-তরঙ্গে। আর পুরাণ ক্রমশ খসে পড়তে থাকবে তাঁর কবিতার শরীর থেকে।

অন্য দিকে যতই পরিণতির দিকে, বুদ্ধদেব বসুর লেখালেখিতে পুরাণের দিকে চুম্বক টান। যখন অনুবাদ করছেন 'মেঘদূত', কিংবা মহাভারতকে নিয়ে লিখছেন অতি-আধুনিক আর তুলনামূলক এক অবিস্মরণীয় রচনা, শুধু তখনই নয়, যখন অনুবাদ করছেন বোদলেয়ার কিংবা রিল্‌কে, তখনও, একজন নিবিষ্ট প্রত্নতত্ত্ববিদের মতোই হাতড়ে হাতড়ে জড়ো করে চলেছেন সে-সব সৃষ্টির পিছনকার পৌরাণিক অনুষঙ্গাবলি। পুরাণের পুনর্জন্ম ঘটানোই যেন ক্রমশ হয়ে উঠবে তাঁর প্রান্তিক জীবনের প্রধানতম দায়। পুরাণ তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিতে থাকবে একের পর এক নাটক আর কাব্যনাট্যও।

এর পর অনুবাদ। বিষ্ণু দে-র 'এলিয়টের কবিতা' বেরল চোখের সামনে। সেই প্রথম সত্যজিৎ রায়-এর আঁকা প্রচ্ছদ দেখে আমরা অসন্তুষ্ট। এলিয়টের কবিতার পোড়ো জমি পোড়া মাটির রুক্ষতার বিপরীতে ওই প্রচ্ছদের অবস্থান। অন্য দিকে অনুবাদ নিয়েও গুঞ্জন প্রগতি শিবিরের তলে তলে। ভাবখানা এই রকম, মার্ক্সবাদী বিষ্ণু দে-র এ এক অধঃপতন। বাঙালি পাঠককে এলিয়ট চেনালেন তিনিই। নিজের কবিতায় গ্রহণ করলেন সাগ্রহে, বর্জনও করলেন সসম্ভ্রমে। অনুবাদ থেমে রইল না। দেশ-বিদেশ থেকে আহরণ-করা মহৎ আর খ্যাত কবিদের নিয়মিত অনুবাদ করে যাওয়াটা ছিল তাঁর সমগ্র সাহিত্যচর্চার অন্তর্গত এক নিবিড় অনুশীলন। অনুবাদক বিষ্ণু দে যখন ঈষৎ ক্লান্ত, তখনই অনুবাদক বুদ্ধদেব বসুর উজ্জ্বল আবির্ভাব। বিষ্ণু দে-র এলিয়টের পাশে আর-এক বেদীতে স্থাপিত হলেন বোদলেয়র। ক্রমে আরও অনেকে। ভূমিকা, টীকা, জীবনপঞ্জির বিস্তৃতি আর বিন্যাসে তাঁর অনুবাদের বইগুলো হয়ে উঠতে লাগল অবশ্য-অনুকরণের আদর্শ।

আর ছবি। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে বিষ্ণু দে-ই প্রথম আধুনিক বাঙালি কবি, সাহিত্যের সমান্তরালে সংগীত আর শিল্পকলায় যাঁর সমপরিমাণ অন্তঃশীল অনুরাগ। তিরিশের যুগের একাধিক প্রতিভাবানের পাশে তিনিই একমাত্র, চিত্রকলা বিষয়ে যাঁর কলম নিয়তই মগ্ন ও মুখর। যতদূর জানা গেছে, তাঁর প্রথম প্রবন্ধের বিষয়টাই ছিল চিত্রকলা। শ্যামল রায় ছদ্মনামে, 'শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ'। শিল্পঅনভিজ্ঞ বুদ্ধদেব বসু তাঁর যৌবনকালে অবাক হয়ে দেখেছেন তাঁর সতীর্থের শিল্প-সচেতনতা।

শিল্পকলা বিষয়ে বুদ্ধদেব বসু কবে কখন কীভাবে স্বশিক্ষিত হয়েছেন, তার ইতিহাস জানা নেই তেমন। জানা যায় শুধু এটুকুই যে নিজের বইয়ের প্রচ্ছদ সম্পর্কে তাঁর ছিল সজাগ সচেতনতা। সমকালের দুই শিল্পী

অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য আর সৌরীন সেনকে দিয়ে তখন আঁকিয়েছেন যেসব প্রচ্ছদ, তা ছিল সেই সময়ের পটভূমিতে যথেষ্টই আধুনিক। 'যে আঁধার আলোর অধিক'-ই প্রথম সেই প্রবন্ধ, যা চিনিয়ে দিল তাঁর শিল্পমনস্কতাকে। পরে একে একে তাঁর তিনখানা অনুবাদের বইয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠল শিল্প নিদর্শন। 'মেঘদূত'-এ যা বহুল পরিমাণ। শিল্প-প্রসঙ্গকে এড়িয়ে সাহিত্যের বা কবিতার কথা বলা আর সহজ হয়ে উঠল না তাঁর পক্ষে।

৪.

তিনি ভয় পেতেন শুধু আন্দোলিত বাস্তবকে, বাস্তবের আন্দোলনকে। সেই সূত্রেই ভয়, আবেগের সামাজিক সম্বন্ধকে নিয়ে। তাই রবীন্দ্রনাথ আর জীবনানন্দের কবিতাকে, একটা উচ্ছ্বসিত সমর্থনের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে আত্মস্থতায় এগোতে পারলেন না আর। এর বাইরে আর প্রায় সব ব্যাপারেই তিনি প্রথাভঙ্গকারীরূপে সাহসী আর উৎসাহী। শেষ বয়সে সন্ন্যাসীর মতো জীবনযাপনে অসম্ভব ভোগীর মতোই ছিল তাঁর বিশ্বসাহিত্য অধ্যয়ন। আর একনিষ্ঠ শ্রমিকের মতো নিরলস কর্মনৈপুণ্য। আজকের এই সস্তায় বাজি মাৎ করার ছন্নছাড়া সময়ে এ-জাতীয় কর্মোদ্দীপনা আর অধ্যয়ন-তৃষ্ণা আর বহুমুখী অনুসন্ধিৎসা যতখানি বিরল, বিরল বলেই ঠিক ততখানি অনুসরণীয়।

তাঁর কবিতা আমাকে মাতায় না। তাঁর ছোটোগল্পে মন সাময়িক ক্ষুধা মেটালেও উপোসী থেকে যায় হৃৎপিণ্ড। তাঁর উপন্যাস থেকে আমি শালিকের ঠোঁটে খুঁটে খুঁটে নিই শুধু ভাষার লাবণ্য। আবার ভাষার কিঞ্চিৎ গুরুভারেই তাঁর নাটক সমসাময়িকতার দোরগোড়ায় এসে থমকে গিয়ে এগোতে পারে না আর। তা হলে বাকি রইল কী? রইল অনেক কিছু। কবিতা আর কবি ছিল তাঁর কতখানি অত্যাগসহন আপন, তা বুঝে নিতে চিরকাল ধরে পড়বার 'কালের পুতুল'। বাংলা ভাষাকে আরও নিবিড় করে ভালোবাসার জন্যে তাঁর রম্যরচনার বইগুলো। বুড়ো বয়সেও শৈশবে ফিরে যাওয়ার সুখভোগের জন্যে তাঁর শিশুসাহিত্য। পড়তে পড়তে নিজের ভিতরে এক বৈদ্যুতিক দ্যুতিসঞ্চারে শিউরে শিউরে ওঠার প্রবন্ধগুলো। অন্যদের অনেক গাঢ়তর বিচার, গূঢ়তম মীমাংসার পরও অবশিষ্ট থেকে যাওয়া অন্য রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য পেতে তাঁর রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক বইগুলো। নির্ঘুম শ্রমে গড়ে তোলা তাঁর আধুনিক 'মেঘদূত'। বিশ্বের অন্যতম প্রধান তিন কবিকে নিয়ে তাঁর তিনটি গবেষণাধর্মী অনুবাদ-বইয়ের জন্যে উপচে উঠতে থাকে পরিশোধহীন কৃতজ্ঞতা। আর 'মহাভারতের কথা'-র সামনে এলে মাথা নুয়ে আসে নিজেরই অজ্ঞাতসারে। টের পাই, বাংলা সাহিত্যের কতখানি প্রয়োজন ছিল তাঁর দীর্ঘতর জীবন।

আগেই বলেছি প্রচ্ছদ নিয়ে তাঁর চিঠিপত্রের কথা। তারই থেকে কয়েকটা পড়লে বোঝা যাবে যে-কোনো একটা বিষয়কে তিনি দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন কতখানি আবেগে, কত অনুপুঙ্খে :

> ১.
>
> আমার আর-একটা বই ছাপা হচ্ছে— আনুপূর্বিক আমার সমস্ত ছোট গল্প থেকে বেছে নিয়ে তিরিশটি গল্পের একটি সংকলন। অনেকদিন আগে আমার যে— 'গল্প সংকলন' বেরিয়েছিলো— দেখেছিলে কিনা জানি না— তারই পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ বলতে পারো। বইটা প্রকাশ করছেন এম, সি, সরকার, ছাপা হচ্ছে নাভানায়। নাম দিয়েছি—
>
> **ভাসো, আমার ভেলা**
>
> বেশ মোটা বই হচ্ছে, অন্তত ৩৫ ফর্মা। সুপ্রিয় কাপড়ে বাঁধাতে রাজি হয়েছে। একটা জ্যাকেট

থাকবে, তার রূপসজ্জার জন্য তোমার দ্বারস্থ হচ্ছি। আমি ভাবছি শুধু বইয়ের নাম ও লেখকের নামের লেটারিং থাকবে, কোনো হালকা রঙের জমির উপর গাঢ় রঙে ছাপা। এ ছাড়া আরো একটা আইডিয়া আমার মাথায় এসেছে— তা হ'লো, বইয়ের নামে যে-দুটো 'ভ' ও একটা 'আ' আছে, সেগুলোকে, বা তার কোন একটি বা দুটিকে যদি সাংকেতিক ও সূক্ষ্মভাবে, ভেলার ডিঙি নৌকার আকার দেয়া যায়। মনে হচ্ছে সবগুলোকে না-ক'রে একটা বা দুটো করাই ভালো হবে। লেটারিং ছাড়া অন্য কোনো সাংকেতিক অলংকরণ থাকবে কি না সেটা তোমার উপরে ছেড়ে দিচ্ছি। বইয়ের আকার ডিমাই ১/৮।

এই তো গেলো জ্যাকেট : ভিতরে, কাপড়ের উপর আমি ভাবছি শুধু লেখকের নাম বা শুধু বইয়ের নাম সোনালি জলে engraved থাকবে, পুটে বইয়ের নাম প্রেস-টাইপেও দেয়া যায়।

আমি আর পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে বিদেশে চ'লে যাচ্ছি, যাবার আগে কভারের সব ব্যবস্থা হওয়া দরকার— সেইজন্য তোমাকে অনুরোধ, যদি খুব অল্প সময়ের মধ্যে জ্যাকেটের ডিজাইন ক'রে এনে আমাকে দেখিয়ে নাও। এই লেটারিঙে বিদ্যাসাগরী টাইপ চাই না— কিছুটা নতুন ধরণের কোরো— মহাসমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে লেখক তাঁর ক্ষুদ্র ভেলা ভাসিয়ে দিচ্ছেন, কখন ডুবে যায় তার ঠিক নেই— এই ভাবটা শুধু লেটারিঙেই যদি ইঙ্গিত করা যায়। Encounter এর একটা পাতা ছিঁড়ে এই সঙ্গে পাঠালাম, তাতে কয়েকটা ভালো লেটারিং— strindbergটা আমার খুবই ভালো লেগেছে, কিন্তু তার মানে এ নয় যে তোমাকে ঠিক ঐ ধরণের করতে বলছি— কিন্তু ওটার মধ্যে এমন একটা গুণ আছে যাতে দেখতে দেখতে অনেক কিছু কল্পনা করা যায়, সেটা বাংলা হরফের চরিত্র বজায় রেখে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব কিনা ভেবে দেখো। সবচেয়ে বড় কথা, খুব শিগ্‌গির চাই— এক সপ্তাহের মধ্যে অবশ্য।

২.

পূর্ণেন্দু, এবারে তোমার ছবিটি ঠিক হয়েছে ; আমি মনে-মনে যা ভাবছিলাম সেটাই তুমি ফুটিয়ে তুলেছো। ছবিটি আমি সুপ্রিয়কে পাঠিয়ে দিয়েছি ; তুমি তার কাছ থেকে নিয়ে এবারে key drawing ক'রে ফ্যালো। ছবি ছাপার সময় তুমি দেখাশোনা করবে, এতে সুপ্রিয়র অমত নেই।

পুটের জন্য লেটারিং করবে— ধরনটা একই হবে অবশ্য। তোমার ছবি ছাপা হচ্ছে জ্যাকেটে। বই কাপড়ে বাঁধাই হবে, ভিতরের পুটে প্রেস-টাইপে বইয়ের নাম সোনার জলে ছাপা থাকবে।

শুধু একটা কথা আমার মনে হচ্ছে— 'ভেলা'র 'ভ' অক্ষরটা এবারে যেন বড়ো বেশি নিটোল হয়েছে, আর-একটু কম finished চেহারা হ'লে (কিছুটা আগে যেমন ছিলো) ভাবের পক্ষে বেশি অনুকূল হবে না কি ? অর্থাৎ, 'ভ'টাতে ঈষৎ যদি ভাঙা ভাব থাকে— কোথাও-কোথাও নুনে খেয়ে গেছে যেন, তাহ'লে কি আরো ভালো হয় না ? অবশ্য সেই সঙ্গে নয়নলোভন হওয়া চাই, কভারের যেটি ব্যবসায়িক দিক সেটিও ভাবতে হবে। আমার এই প্রস্তাব তুমি বিবেচনা করলে সুখী হবো।

মোটের উপর লেটারিং চমৎকার হয়েছে, সেটাকেই ছোটো ক'রে নিয়ে টাইটেলে ছাপাতে বলেছি, বিজ্ঞাপনেও ব্যবহার করা যাবে। ঐ গোলাপি রংটা যাতে ছাপাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার।

আমি প্রস্তাব করেছি কভারও নাভানায় ছাপা হোক— তাহ'লে বিরামবাবুর পরামর্শ ও সাহায্য পাওয়া যাবে। 'ভেলা'র চেহারা ও লেটারিঙের রং নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে পারো— তাঁর রুচির উপর আমার আস্থা আছে, তোমার সঙ্গে তাঁর মতের খুব গরমিল হবে না মনে হয়।

ছাপার সময় দুটো রঙেরই তিন-চারটে shade তুলে দেখতে হবে— কোনটা সবচেয়ে ভালো দেখায়। কভার ছাপার সময় আমি এখানে থাকবো না, তাই তোমাকে সব বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করছি।

'ভেলা'-তে ঈষৎ কোনো পরিবর্তন যদি করো তাহ'লে তুমি সেটা বিরামবাবুর কাছে একদিনের জন্য রেখে এসো, তিনি রোজই প্রুফ পাঠাচ্ছেন আমাকে, আমারও তাঁকে ফেরৎ পাঠাবার সুবিধে আছে। অত দূর থেকে তোমার পক্ষে এখানে আসা দুঃসাধ্য, তাই এই ব্যবস্থা মনে এলো।

৩.

আনন্দ পাব্লিশার্স থেকে আমার আর-একটি বই বেরোচ্ছে— কলকাতার ইলেকট্রা ও সত্যসন্ধ, এই দুটি নাটক একসঙ্গে। এই বইয়ের প্রচ্ছদপটের জন্য তোমাকে লিখছি। আকার— তপস্বী ও তরঙ্গিণীর মতো, ঐ রকম varnished paperback হবে।

বইয়ের নাম দিচ্ছি কলকাতার ইলেকট্রা, কিন্তু মলাটে সত্যসন্ধ নামটিও লেখা থাকবে। প্রথমটি বড়ো অক্ষরে দ্বিতীয়টি একটু ছোটো অক্ষরে হ'তে পারে। ভালো বুঝলে একটা "ও" (and) যোগ করতে পারো। যেমন—

কলকাতার ইলেকট্রা
ও
সত্যসন্ধ

এতে বোধহয় দর্শকের বোঝার সুবিধে হবে। "ইলেকট্রা"য় 'ক'-এর নিচে হস্ চিহ্ন থাকা দরকার।

শুধু রং ও অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ডিজাইন দিয়ে মলাটটি করতে পারো, ফণীবাবু বোধহয় তিনটে রঙে আপত্তি করবেন না। রঙের ব্যবহারে ঈষৎ আতঙ্কের ভাব ফোটাতে পারলে মন্দ হয় না, দুটো নাটকেই হত্যা আছে। ছাপার কাজ এগিয়ে যাচ্ছে, বৈশাখে বেরোবার কথা, শিগগির ক'রে দিয়ো।

৪.

আমার একটি নাটকের বইয়ের জন্য প্রচ্ছদপট চাই। আকার— 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' ও 'কালসন্ধ্যা'র মতো ; প্রকাশক— আনন্দ পাব্লিশার্স। অন্যান্য বিবরণ পরের পাতায় লিখে দিচ্ছি।

আমার ইচ্ছে এই কভারটা শুধু লেটারিং দিয়ে হোক, শুধু শাদাতে আর কালোতে। অর্থাৎ, ঝকমকে শাদা কাগজের উপর ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বড়ো-বড়ো অক্ষরে শুধু বইয়ের নাম ও লেখকের নাম থাকবে। ধরনটা এই রকম—

অনাম্নী অঙ্গনা
ও ————→ Smaller
প্রথম পার্থ

দুটি কাব্যনাট্য ————→ Smaller

বুদ্ধদেব বসু

'অনাম্নী অঙ্গনা' যত বড়ো অক্ষরে দেবে, 'প্রথম পার্থ'ও তা-ই। বইয়ের নাম হবে— অনাম্নী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ।

এই কথাগুলিকে তুমি তোমার অভিরুচি অনুসারে সাজিয়ে দাও— নাটক দুটির নাম বিশাল অক্ষরে হ'তে পারে, লেখকের নাম সে-তুলনায় ছোটো, 'দুটি কাব্যনাট্য' আরো ছোটো। লে-আউট বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ তোমার উপর নির্ভর করছি। তোমার ভালো মনে হ'লে লেখকের নাম ভিন্ন ছাঁদের অক্ষরে দিতে পারো (বইয়ের নাম সোজা বিদ্যাসাগরী চাই), যদি দ্বিতীয় রং ব্যবহার করতে চাও তাতেও আমার চরম আপত্তি নেই, তবে এ-মুহূর্তে শাদা-কালোই আমার কল্পনায় বাসা বেঁধে আছে। বইটি পুজোর আগেই প্রকাশের চেষ্টা করা হচ্ছে— তুমি সপ্তাহখানেকের মধ্যে বাদলবাবুকে পাঠাতে পারবে কি ?

৫.

দুটি বইয়ের কভারের জন্য তোমাকে লিখছি। একটি আমার নাটক

পুনর্মিলন

'দেশ'-এর গত পূজাসংখ্যায় বেরিয়েছিল। পাঁচজন মৃতব্যক্তি (পরস্পর-সম্পৃক্ত) তাদের জীবৎকালের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে আবার যাচ্ছে— বার-বার— এই হলো নাটকটার বিষয়। এই ভাবটি কোনো অ্যাবস্ট্রাক্ট ডিজাইনের সাহায্যে ইঙ্গিতে ফোটানো যায় কিনা ভেবে দেখো। লেটারিং শুধু বইয়ের ও লেখকের নাম, অবশিষ্ট অংশ এই ডিজাইনে ভরাবে। (আকার— 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'র মতো।) কিংবা শুধু দুটি বা তিনটি বর্ণবিন্যাসে ঈষৎ গা-ছমছম-করা ভাব যদি ফোটাতে পারো। যেন জলের তলা থেকে বইয়ের নাম ভেসে উঠছে। এই ভাবটাও হয়তো চলতে পারে। আমি ঠিক ভেবে পাচ্ছি না, তুমি যা ভালো বোঝো কোরো।

অন্য বইটি প্রতিভা বসুর উপন্যাস, নাম—

বেলা-অবেলার গান

আকার ডিমাই ১/৮। কভার বিষয়ে লেখিকার বিশেষ কোনো বক্তব্য নেই, সুদৃশ্য মন-ধরানো ছবি চাই— বলা বাহুল্য, কোনো মনুষ্যমূর্তি থাকবে না।

অক্ষরবিন্যাস, বর্ণবিন্যাস, ছবির আকৃতি ইত্যাদি নিয়ে চিঠিগুলোর ভিতরে তাঁর যেসব মত, মন্তব্য, নির্দেশ, তা থেকেই আমি নিজের মনে সাজিয়ে নিতে পেরেছি এক ভিন্ন বুদ্ধদেবকে। কিন্তু সে ভিন্ন-বুদ্ধদেবও ঝলমলিয়ে উঠত আরও, যখন সেসব চিঠির ভিতরে কোনো-না-কোনোখানে চোখে পড়ত যে শিল্পী হিসেবে আমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। স্বাধীনতা নিয়ে বাগাড়ম্বর আর সত্যি সত্যিই অন্যকে স্বাধীনতা দেওয়ার মধ্যে বিস্তর ফারাক। মুক্তমনের এই মানুষটির প্রতি আজও শ্রদ্ধানত থেকে গেছি তাই।

পূর্ণেন্দু পত্রী

ভাষার অন্ত্যজ শব্দেরা

সুদৃশ্য মলাটের মধ্যে ধরার প্রয়াস অনির্দেশ্যতার জগৎ, নাকি জগতের অনির্দেশ্যতা— তাকে বোঝবার চেষ্টা, বোঝবার সমস্যা— এই হচ্ছে আলোচ্য বইটির বিষয়। এই বিষয় কি দর্শনের, নাকি বিজ্ঞানের, নাকি গণিতের ? সম্ভবত কারো একার নয়। অথচ প্রত্যেকেই একে দেখে আসছেন জ্ঞানের বিশ্বে, অযত্ন প্রয়াসে খুঁড়ে খুঁড়ে বানিয়ে তোলা, আপনার নিজস্ব কোণটি থেকে। এঁদের কি এনে ফেলা যায় একটি কক্ষে, পরস্পরের মুখোমুখি ? লেখিকা অমিতা চট্টোপাধ্যায় এই প্রচেষ্টাই করেছেন বইটিতে।

অনির্দেশ্য শব্দাবলি— অর্থাৎ যাদের প্রযোজ্যতা সম্পর্কে সঠিক নির্দেশদান অসম্ভব। সুন্দর কুশ্রী বেঁটে লম্বা মন্দ ভালো মূর্খ জ্ঞানী খুব প্রায়ই মোটামুটি ইত্যাদি শব্দগুলি যে-কোনো স্বাভাবিক কথ্য ভাষায় (natural language) অবধারিতভাবে ব্যবহৃত হয়। একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে, এই অনির্দেশ্য শব্দ বা শব্দগুচ্ছ ছাড়া কোনো স্বাভাবিক ভাষাগঠনই সম্ভব নয়। কবিতার কথা নয়, যেখানে উপমা আসে— মানুষের নিতান্ত বাস্তব জীবনযাপন এই শব্দগুলির ব্যবহার ব্যতিরেকে দুরূহ হয়ে পড়ে। একটি খেলা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন কোনো উৎসাহী পাঠক। একদিন সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত ভালোবাসার অংশটুকু নাহয় ছেড়ে দিয়েই বলছি, এমন কোনো শব্দ ব্যবহার করবেন না যার অর্থ সুনির্দিষ্ট নয়। এমন এক-একটি শব্দ যেন এক-একটি ছায়ামণ্ডল তৈরি করে। কিছু বস্তুর ক্ষেত্রে তা নিশ্চিতভাবে প্রযোজ্য ; সে বস্তুরা শব্দটির প্রচ্ছায়া-অঞ্চলভুক্ত। আর এই প্রচ্ছায়া ক্রমে তরল হতে হতে উপচ্ছায়া অঞ্চল উৎপন্ন করে করে একস্তরে এসে ছায়াহীনতায় বিস্তৃত হয়। যেসমস্ত বস্তুর ক্ষেত্রে শব্দটির প্রযোজ্যতা সম্পর্কে দ্বিধা থাকে অথবা আংশিক প্রযোজ্য মনে হয় তারা উপচ্ছায়া-অঞ্চলভুক্ত। এবং নিশ্চিতভাবে অপ্রযোজ্য এমন বস্তুসকল, স্বভাবতই, শব্দটির ছায়াভূমির বাইরে অবস্থান করে।

এখন প্রশ্ন— কী সূচিত করে এজাতীয় শব্দেরা। 'মানুষ' কথাটি যেমন সূচিত করে সমস্ত মানুষের সমষ্টিকে, 'লম্বা মানুষ' সেইরকমভাবে কি কোনো সমষ্টিকে সূচিত করতে পারে ? ভারতীয় মাপকাঠিতে কোনো পুরুষমানুষ ছ ফুট বা তার বেশি লম্বা হলে নিশ্চয়ই 'লম্বা মানুষ' বিধেয়টি (predicate) তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, আবার পাঁচ ফুট বা তার কম হলে নিশ্চয়ই ওই বিধেয়টি প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু এমন কোনো ছেদবিন্দু (cut-off point) কি আছে, পাঁচ ও ছ'য়ের মধ্যে, যার বেশি বা সমান হলে বিধেয়টি লাগে এবং কম হলে লাগে না ? অবশ্যই নেই। এ প্রশ্নে 'উত্তরে রব মৌন' এমত প্রকল্প গ্রহণ করেন কোনো কোনো তাত্ত্বিক। তা হলে তাঁর জেদ টিঁকে থাকে, তাঁর থিয়োরি রক্ষা পায় হয়তো, কিন্তু মানুষের জীবনও চলে না, তার ব্যাখ্যাও মেলে না। বস্তুত, বাস্তব জীবনে এই শব্দপ্রয়োগে একজন অন্যজনকে কিছু বোঝাতে চায় এবং এই অন্যজন, একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে, কিছু বোঝেও এবং সেইমতো ক্রিয়াশীলও হয়। তার প্রায় সবক্ষেত্রেই এই ক্রিয়া বক্তাকে সন্তুষ্টই করে থাকে— অর্থাৎ শব্দগুলি বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থ পরিবহন করতে সক্ষম। একইভাবে 'বেশ লম্বা মানুষ' 'অনেক সুধীজন' শব্দগুচ্ছগুলিও অর্থপরিবাহী।

কী সেই অর্থ ?

সম্ভাব্যতাতত্ত্বের আওতায় এই আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। (কেউ কেউ অবশ্য অসামান্য পরিশ্রম করে চলেছেন তার জন্য।) কেন নয় তার কারণ বোঝার জন্য এই বাক্য দুটি বিবেচনা করা যাক : 'আজ বর্ষণের সম্ভাবনা আছে' এবং 'আজ তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে'। বাক্য দুটির বিভিন্নতা লক্ষ করুন। প্রথমটি সম্ভাব্যতাতত্ত্বের আওতাভুক্ত, দ্বিতীয়টি তার বাইরে, বর্তমান আলোচ্য। 'তুমুল বৃষ্টি' শব্দগুচ্ছটি দিয়ে কী বোঝাতে চান কেউ, কীই বা বোঝেন অন্যজন ?

অনির্দেশ্যতা কি ভাষায় শুধু না জগতেও ? দার্শনিক এ প্রশ্ন করবেন। ভাষার এমন একটি শব্দ যা সূচিত করে, বিশেষ ক'রে তার উপচ্ছায়াভুক্ত বস্তুগুলি, তাও অ-সুনির্দিষ্ট হওয়াই তো স্বাভাবিক। সে জাগতিক বস্তুটি দেশকালের ঠিক কোন্ অংশটুকু জুড়ে রয়েছে ? যেমন : 'পাহাড়'। ঠিক কোথায় সমতলের শেষ এবং উন্নতির শুরু তা তো নির্দিষ্ট নয় কিছুতেই। যেমন : 'যৌবন'। কোথায় কৈশোরের ইতি এবং যৌবনের শুরু, সে কি কোনো একটি নির্দিষ্ট মুহূর্ত, কোনো একটি নির্দিষ্ট হৃৎস্পন্দন ? এ কারণেই, পাহাড় নিয়ে যৌবন নিয়ে কথা বলি আমরা, অথচ পাহাড় বা যৌবন বলতে যা বোঝায় তা খুব সুচিহ্নিত করতে পারি না, তা মোটামুটি কিছু, মোটাদাগের কিছু। লেখিকা অবশ্য জগতের এই অনির্দেশ্যতাকে, অন্য অনেকের মতোই, মানতে পারেন নি এবং অস্বীকারও করেন নি। উদারনীতিই আপাতত তাঁর দার্শনিক অবস্থান। ভাষার অনির্দেশ্যতাকেই তিনি স্বীকার করেছেন এবং আলোচনায় এনেছেন। এর পরের প্রশ্নই হতে পারে : এই শব্দেরা কি ভাষার সম্পদ না দায় ? এবং তার পরেই, দায়বোধ হলে, ভাষাকে এই জাতীয় অন্ত্যজ শব্দের দূষণ থেকে মুক্ত করে তোলাই কি কাম্য ? কিছু কিছু শব্দকে অনির্দেশ্যতার অমর্যাদা থেকে হয়তো বা মুক্ত করা সম্ভব। যেমন : পাখি। পেঙ্গুইন, অস্ট্রিচ, অথবা বাদুড়-কে পাখি বলা যাবে কিনা এ নিয়ে দ্বিধা থাকলেও, 'সিদ্ধান্ত' নিয়ে এদের ধারণাটির অন্তর্গত করে ফেললে এবং সীমারেখা টেনে দিলে অর্থাৎ আরশোলাকে অ-পাখি ধরে নিলে খুব বেশি সমস্যায় পড়তে হয় না, কাজ চলে যায়। একটু শ্রমের দাবি থাকে এ কাজে। কিন্তু কোনো কোনো শব্দের অনির্দেশ্যতা অদূরণীয়, ব্যবহর্তার মানসিক কুঁড়েমি -প্রসূত নয়, শত প্রচেষ্টাতেও অর্থাৎ যতই নতুন তথ্যে সমৃদ্ধ করে তোলা হোক-না কেন বস্তু-সম্পর্কিত জ্ঞানকে, কিছু বস্তু সর্বদাই থেকে যাবে শব্দটির উপচ্ছায়ায়। যেমন : 'যৌবন'। যে-ছায়ামণ্ডল শব্দটি তৈরি করে তার উপচ্ছায়া অঞ্চল থেকেই যায়। কিছুতেই যেন তা সরিয়ে ফেলে একটি সুনির্দিষ্ট ছায়া পাওয়া যায় না, যা শুধুই প্রচ্ছায়া। সাধারণ লোকে জিজ্ঞাসা করবেন, নিতান্তই জরুরি কি তা ? এই প্রশ্নে দার্শনিকেরা বিভক্ত, দ্বিধান্বিত।

প্রশ্নটির একরকম মীমাংসা থেকেই যাত্রারম্ভ করেছিলেন কম্পিউটর-বিজ্ঞানী জাদেহ্ (Zadeh) ১৯৬৫ সালে। 'As the complexity of a system increases, our ability to make precise and yet significant statements about its behavior diminishes until a threshold is reached beyond which precision and significance (or relevance) become almost mutually exclusive characteristics.'

কম্পিউটর-বিজ্ঞানীর কাছে বিষয়টি আসে মূলত উপস্থাপনার (representation) দিক থেকে। শব্দকে যন্ত্রের কাছে বোধ্য করে তোলাই তার উদ্দেশ্য। তাই তার পক্ষে স্বাভাবিক, একটি মাত্রা যোগ করে ভাবনা করা : 'তুমুল বৃষ্টি' বলার অর্থই হল, তার কাছে, বৃষ্টির একধরনের মাত্রার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ এবং ফলত মাত্রার একটি তুলনাও। কম্পিউটর-বিজ্ঞানীর সমস্যা হল এইসব শব্দ যে ধারণাগুলি দেয় তার একটি গ্রহণযোগ্য পরিমাণ-নির্দেশী উপস্থাপনা, যা নিয়ে যন্ত্র কষাকষি করতে পারে, কিছু input দিলে কিছু output তৈরি করতে পারে। জাদেহ্-এর Fuzzy Set Theory সূত্রায়ণ এই দৃষ্টিকোণ থেকেই। ব্যবহারের দিক থেকে এই তত্ত্বের যথেষ্ট চাহিদা এখন, বিশেষ করে অসম্পূর্ণ তথ্য থেকে সিদ্ধান্তে আসার প্রক্রিয়ায়। জাপান তো শোনা যায় উন্নতমানের কাপড়-ধোয়া কলও বানিয়ে ফেলেছে এই তত্ত্বের প্রয়োগ করে। অন্য দিকে বলা যায়, দার্শনিকমহলে অনির্দেশ্যতা সম্পর্কে নতুন করে আগ্রহ সঞ্চারিত করতে এই তত্ত্বের উদ্ভাবন খুব বড়ো ভূমিকা নিয়েছে।

সম্প্রতি অন্যতম কম্পিউটর-বিজ্ঞানী, পাভ্লাক্ (Pawlak) তাঁর Rough Set তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন যার উল্লেখমাত্র আছে বইটিতে। এই তত্ত্বও চেষ্টা করছে অনির্দেশ্যতাকে ধরতে অন্য এক পদ্ধতি দিয়ে। কতটা হচ্ছে, বিচার করবে সময়।

গাণিতিক তর্কশাস্ত্রে বিষয়টি গুরুত্ব পায় ভিন্নতর দিক থেকে। এতদিনের লজিক এমন শব্দবাহী বাক্যগুলিকে

সযত্নে (সভয়ে ?) এড়িয়ে চলেছে। তার কাছে সেই সমস্ত বাক্যই আলোচনার যোগ্য যা 'সত্য' কিংবা 'মিথ্যা' এই দুটির কোনো একটি মান প্রাপ্ত হয়। যেহেতু 'অমুক মানুষটি লম্বা' অথবা 'আজ তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে' — জাতীয় বাক্যকে সব পরিস্থিতিতেই 'সত্য' অথবা 'মিথ্যা' আখ্যা দেওয়া যায় না, এই বাক্যেরা পুরাতন লজিকের কাছে আদরণীয় নয়। অথচ মানুষ যুক্তিতর্ক করে থাকে এমনি সব বাক্য দিয়েও, অন্য বাক্যের মতনই :

শেফালি দীর্ঘাঙ্গী
মালিনী শেফালির প্রায় সমান

∴ মালিনী মোটামুটি দীর্ঘাঙ্গী

কীভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে এ জাতীয় সিদ্ধান্তের ? কী এর যাথার্থ্য ?

যদি বাক্যগুলিকে লজিকের আওতায় গ্রহণ করতে হয় তা হলে প্রথমেই মেনে নিতে হয় বাক্যের দুটি ক্ল্যাসিকাল মান ছাড়াও অন্য মানের সম্ভাবনা— এমন-কি, যে-কোনো দুটি মানের মধ্যে অন্য অসংখ্য মানের উপস্থিতিও— বস্তুত মানের একটি ক্রম, পূর্ণ সত্য থেকে পূর্ণ অ-সত্যে। ঠিক যেন অনির্দেশ্য শব্দের ছায়ামণ্ডল : প্রচ্ছায়া থেকে ছায়াহীনতায়। 'সত্য' শব্দটি তাই হয়ে ওঠে নিজেই অনির্দেশ্য। দ্বিতীয়ত, ছেড়ে দিতে হবে Law of Excluded Middle : 'জনৈক ব্যক্তি লম্বা অথবা লম্বা নয়'— এই বাক্যের পূর্ণসত্যতাকে। সেই জনৈক হতেই পারে লম্বা খানিকটা মাত্রায় এবং লম্বা নয়ও খানিকটা। এ অবস্থা কি অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর ঠেকছে ? কীভাবে আলো আসবে এই বিভ্রান্তিতে ?

তা ছাড়া রয়েছে গ্রিকদের কাল থেকে চলে আসা একটি অসামান্য প্যারাডক্স— যা খ্যাত সোরাইটিস প্যারাডক্স (sorites paradox) নামে। কেউ যদি টেকো হন তা হলে তাঁর মাথায় একটি নতুন চুল উদ্‌গত হলেও তিনি টেকোই থেকে যান। এভাবে প্রতি স্তরে একটি করে নতুন চুল যুক্ত হবে এবং তাঁর টেকোত্বও থেকে যাবে। এমনি চলতে চলতে মাথা ভর্তি চুল হয়ে গেলেও সেই হতভাগ্যের টেকো বিশেষণ ঘোচে না, যুক্তি অনুসারে। অথচ সে তো আর টেকো নেই। নতুন লজিশিয়ানরা চেষ্টা করছেন এই প্যারাডক্স-এর নানাধরনের ব্যাখ্যা দেবার। সমস্যা তো, আগের মতোই, ওই 'টেকো' শব্দটি নিয়ে। 'লম্বা', 'তুমুল' শব্দগুলির মতোই অনির্দেশ্যতাভরা এই শব্দটিও। অমিতা চট্টোপাধ্যায় তাঁর বইয়ের অনেকটা অংশই ব্যয় করেছেন বিভিন্ন স্কুলের লজিশিয়ানদের মতামত উপস্থাপনায়, বিশ্লেষণে, এবং ওই সব মতের সীমা নিরূপণে।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অনির্দেশ্যতার যে বিভিন্ন দর্শন তা একটি গ্রন্থভুক্ত করা একেবারেই সহজ প্রকল্প নয়। অমিতা সে কাজে যথেষ্ট মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন ; তিনি আমাদের ধন্যবাদ দাবি করতেই পারেন।

আলোচনাটি শেষ করার আগে আসুন আমরা এই উপলব্ধিতে আসি যে 'Understanding' এবং 'Vagueness' এই শিরোনাম শব্দদুটিই অনির্দেশ্য। প্রথমটি যে অনির্দেশ্য তা বুঝতে কোনো সমস্যা হবার কথা নয়। সবসময়েই তো কিছুটা করেই বুঝি আমরা, কোনো বোঝা-ই কি সম্পূর্ণ ? 'Vagueness' শব্দটির প্রয়োগক্ষেত্র, আমিও ধরে নিচ্ছি, স্বাভাবিক ভাষার শব্দাবলি— প্রকৃত বস্তু নয়। অনির্দেশ্যতারও তো মাত্রা-অনুভূতি আসে। যে শব্দের উপচ্ছায়া অঞ্চল যত বিস্তৃত, সেই শব্দকে তত বেশি অনির্দেশ্য বলতে বোধ হয় আপত্তি হবে না কারো। ধরে নেওয়া যেতে পারে, 'ত্রিভুজ' শব্দটির কোনো উপচ্ছায়া নেই। এবং 'সৎ' শব্দটির সবটাই উপচ্ছায়া। এবারে ক্রমে বেড়ে চলা অনির্দেশ্যতা অনুযায়ী একটি শব্দপরম্পরা আমি হাজির করছি। গ্রহণযোগ্য মনে হয় কি ?

ত্রিভুজ—গোলাকৃতি—মানুষ—পাখি—আসবাব—প্রেমিক <যৌবন / লাল> জ্ঞানী—সৎ

আপনি হয়তো চাইবেন একটু অন্যভাবে সাজাতে। এই ভিন্নতার অধিকার অনির্দেশ্যতাতত্ত্বেরই অন্তর্নিহিত চারিত্র।

Amita Chatterjee, *Understanding Vagueness*, Pragati Publications, Delhi, 1994. Rs 295.

মিহির চক্রবর্তী

মেয়েদের মনের কথা

'মেয়েদের দাম শুধু তাকে একজন মানুষের দরকারে ? সমস্ত সম্পর্ক অতিক্রম করে মানুষ হিসেবে তার মূল্য নেই ? দরকার নেই ? পৃথিবীর কোনোখানে চিরদিনের ইতিহাসে একদিনও সে মানুষ হিসেবে পরিচিত হল না কেন ?'

—এই তীব্র প্রশ্ন, এই গভীর আত্মবোধের উচ্চারণ উপন্যাসে তুলে ধরেছিলেন যে ঔপন্যাসিক, তাঁর জন্মশতবর্ষ সদ্য পার হয়ে এসেছি আমরা। একশো বছরে বিস্মৃতির মরচে ধরতে শুরু করেছে জ্যোতির্ময়ী দেবী নামে এক জ্যোতির্ময় শাণিত ইস্পাতের তরবারির গায়ে। জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সংকলনের তিনটি খণ্ডের সাম্প্রতিক প্রকাশনা, সেই অনতি-আলোচিত লেখিকার অসামান্য সৃষ্টির এক উজ্জ্বল উদ্ধার।

এক নারীমুক্তিবাদী লেখিকা জ্যোতির্ময়ী দেবী। স্বাতন্ত্র্যময়ী নারী-ঔপন্যাসিক তিনি, স্বল্পসংখ্যক উপন্যাস আর বহু ছোটোগল্পে তাঁর নারী-অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি ও গভীরতা, সম্মানিত করেছে 'নারী-ঔপন্যাসিক' এই অভিধাকে। পুরুষের অভিজ্ঞতা তার কল্পনা দিয়ে তো সবটুকু ছুঁতে পারে না নারীর জগৎকে— প্রকাশ করতে পারে না তার যন্ত্রণা, অপ্রাপ্তির বেদনা বা প্রাপ্তির আস্বাদকে। তাই পুরুষ-সাহিত্যিকের কলমে নারী কখনো হয় অধরা মাধুরী ; কখনো অর্ধেক মানবী, অর্ধেক কল্পনা। ভার্জিনিয়া উল্ফ্-এর যেমন মনে হয়েছিল, 'If woman had no existence save in the fiction written by men, one would imagine her a person of the utmost importance ; very various ; heroic and mean; splendid and sordid ; infinitely beautiful and hideous in the extreme ; as great as a man, some think even greater. But this is woman in fiction. In fact,...she was locked up, beaten and flung about the room.' বহু ভাবনার শেষে তাই ভার্জিনিয়া উল্ফের মেরি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে, নারী বিষয়ে সত্য উচ্চারণে পুরুষ-লেখকদের উপর নির্ভর করা যায় না ; নির্ভর করা যায় শুধু নারী-সাহিত্যিকের ওপরেই, যে-নারীর পায়ের তলায় আছে নিজস্ব উপার্জনের মাটি আর আছে 'a room of one's own.' ভার্জিনিয়া উল্ফের এ বই খুব ভালোভাবে পড়েছিলেন জ্যোতির্ময়ী দেবী, যদিও এই শর্তপালনের সুযোগ জ্যোতির্ময়ী দেবীর যুগে কোনো নারী-ঔপন্যাসিকেরই ছিল না ; নিজস্ব ঘর বা পায়ের তলার প্রতিষ্ঠার মাটি ছাড়াই কিন্তু জ্যোতির্ময়ী দেবী দাঁড়িয়েছিলেন স্বপ্রতিষ্ঠ হয়ে, অকুণ্ঠ সত্য উচ্চারণ করেছিলেন। বাংলাদেশে আর বাংলার বাইরের সর্বভারতীয় সমাজেও, মেয়েদের সামাজিক অবস্থান যে কোথায়, তা বুঝে নিতে চেয়েছিলেন জ্যোতির্ময়ী দেবী, খুঁজেছিলেন মেয়েদেরও জীবনের মানে— অভিজ্ঞতা দিয়ে, যন্ত্রণা দিয়ে, একাকিত্ব আর শূন্যতার বোধ দিয়ে, নারীমাত্রের প্রতি ব্যাপ্ত সমানুভবের উপলব্ধি দিয়ে। সমাজের দীর্ঘলালিত আদর্শের সমান্তরাল এক বিকল্প ঐতিহ্য তিনি গড়ে তুলতে পেরেছেন এই তীব্র অনুভূতিমালায়। তাঁর গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ— বারে বারে এই বিকল্প ঐতিহ্যকে প্রকাশ করে বলেই, আজও তিনি এত প্রাসঙ্গিক।

বাঙালি মধ্যবিত্ত মেয়ের স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার প্রয়াস থেকে বারাণসীর হিন্দু বিধবার অসহায় 'প্রাণধারণের গ্লানি', আর রাজস্থানের নির্যাতিত নারী, বা 'মর্ত্যের অপ্সরা' গণিকালয়ের অধিবাসিনী— নানা দৃষ্টিকোণ থেকে জ্যোতির্ময়ী দেবী আহরণ করে নিয়েছেন নারীজীবনের টুকরো টুকরো ছবি। আর এই টুকরোগুলোকে জোড়া দিয়ে তিনি দেখেছেন, নারীর জন্য এক অদ্ভুত বাসভূমি গড়ে রেখেছে সমাজ, যেখানে আভিজাত্যের দায় ভোগ করতে হয় অসহায় নারীকে, মর্যাদারক্ষার জন্যও প্রাণ দিতে হয় বিপন্ন নারীকেই, পণপ্রথায় পুরুষের লোভের আগুনে পুড়ে মরতে হয় নারীকে, সামান্য বিচ্যুতিতে নারীকে বিতাড়িত করার অনায়াস অধিকার আছে যেখানে তার আক্ষরিক অর্থে স্বামীর, অনিচ্ছাকৃতভাবে লক্ষ্মণের গণ্ডিঘেরা ঘরের সীমার বাইরে রাত কাটালেও যেখানে তার সামনে বন্ধ হয়ে যায় সামাজিক সম্মানের সব দরজা। জ্যোতির্ময়ী দেবী অসহায় যন্ত্রণায় দেখেছেন, এই মহান্ সমাজে পরিবারের ষষ্ঠ কন্যার কপালে থাকে হত্যার বিধিলিপি, 'বেটী কা বাপ' যে তার বাপ-জ্যাঠার

সমাজে গালাগালির ভাষা। তিক্ত কারুণ্যে জ্যোতির্ময়ী দেবীকে জানতে হয়েছে এই সত্যও, যে, শিশুকন্যার ঘাতক, পুরুষতন্ত্রের ধারক এই নারীই— পিতামহীর হাতেই আফিম-এর হিসেবের ইচ্ছাকৃত সামান্য হেরফেরে প্রাণ হারাতে হয় শিশু পদ্মিনীকে, বেঁচে থাকলে, বেড়ে উঠলে হয়তো নিষ্ঠুরতর ভবিতব্য অপেক্ষা করে থাকত তার জন্য ; পিতামহীর নিপুণ হিসেব তাকে মুক্তি দিয়েছে সেই যন্ত্রণা থেকে। এই গল্প ('বেটী কা বাপ') রাজস্থানের, যেখানে আজও রূপ কানোয়ার-রা 'সতী' হয়, মহিমান্বিত মৃত্যুর গৌরবে বছর বছর যাদের গ্রহণ করতে হয় সতীপীঠের ভক্তদের অর্চনা। জ্যোতির্ময়ী দেবীর নির্মম লেখনী অনাবৃত করে সমাজে মেয়েদের সত্যকার স্থান, সত্যিকার সম্মান। রাজস্থানের রাজকাহিনী লেখেন নি তিনি, সাধারণীদের ওপর সমাজের নগ্ন-নিপীড়নের ছবি যেমন উজ্জ্বল তাঁর ছোটোগল্পে, তেমনি জীবন্ত অভিজাত ঘরের রূপসীদের যাপিত জীবন— উজ্জ্বল মুখশ্রীর মুখোশের নীচে বয়ে চলা তাদের যন্ত্রণার অন্ধকার-মাখা মুখ।

স্কুল-কলেজে কখনো পড়া হয় নি জ্যোতির্ময়ী দেবীর, কিন্তু জীবনের পাঠশালায় মেধাবী পড়ুয়া হবার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। জন্মসূত্রে জেনেছিলেন বাংলাদেশের বাইরের ভূগোলকে জীবন্তভাবে। বাংলা সাহিত্যকে পটভূমিগতভাবে অনেকদূর বিস্তৃত করেছিলেন তিনি— সমকালীন লেখিকাদের তুলনায় এও তাঁর এক স্বাতন্ত্র্য। ১৩০০ সালে জয়পুরে অভিজাত পরিবারে জন্ম হয়েছিল তাঁর— পিতা অবিনাশচন্দ্র সেন, পিতামহ সংসারচন্দ্র সেন ছিলেন জয়পুর রাজ্যের দেওয়ান। দীর্ঘদিনের যোগাযোগে বাংলার ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম ভারতীয় ও রাজস্থানী ঐতিহ্যও মিশে গিয়েছিল তাঁদের পরিবারে। বাংলার হুগলি জেলায় বিয়ে হয়েছিল তাঁর, কিন্তু মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে বৈধব্যের পর ছেলেমেয়ে নিয়ে তিনি আবার ফিরে আসেন জয়পুরে, পিতৃগৃহে। ১৮৯৪ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত বিস্তৃত তাঁর পঁচানব্বই বছরের দীর্ঘ জীবনরেখা। শুদ্ধান্তঃপুরের আবেষ্টনেই এর মধ্যে অনেকগুলি দিন কেটেছে তাঁর। তাই মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন অন্দরমহলের চার দেওয়ালের মধ্যে মেয়েদের সংগ্রামের কতখানি হারিয়ে যায়। ব্যক্তিগতভাবে জীবনে কিছুই অপর্যাপ্তভাবে পান নি তিনি, অভিজাত পরিবারে জন্ম হলেও, শিক্ষার সুযোগে যেমন কার্পণ্য ছিল তাঁর, তেমনি অনুদার ছিল বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগও, বৈধব্যের কারণে ছিল তীব্র নিঃসঙ্গতার বোধ। স্ত্রীশিক্ষার অভাব নিজের জীবনে তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন তিনি, তাঁর গল্প-উপন্যাসের নায়িকারা সেই শিক্ষাকেই জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠার হাতিয়ার করে তুলেছে। জ্যোতির্ময়ী দেবীর নিজের জীবনে লেখাই ছিল সেই হাতিয়ার, যা তাঁকে মুক্তি দিয়েছিল অবরোধের বাঁধন থেকে। এই জীবনকে তিনি চিনেছিলেন সংগ্রামের পথে। এই সংগ্রামই গড়ে তুলেছিল তাঁর নারীবাদী চেতনা, যা ব্যাপ্ত হয়ে আছে তাঁর ছোটোগল্পে-উপন্যাসে-প্রবন্ধে।

আজকের পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে, আধুনিক মানদণ্ডেও বলা যায়, নারীমুক্তিবাদই ছিল জ্যোতির্ময়ী দেবীর জীবনবোধ। তাই, এই রচনা-সংকলনের প্রথম খণ্ডের সম্পাদকদ্বয়ের দাবিকে যথার্থই মনে হয়, যে, যাঁরা তাঁর লেখা প্রথম পড়বেন, তাঁদের প্রতিক্রিয়া হবে নতুন দেশ আবিষ্কারের মতো। তবে, এই রচনা-সংকলনটিই জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনার প্রথম সংকলন-গ্রন্থ নয়, এর আগে ১৯৭৫ সালে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ উপলক্ষে স্বর্ণকুমারী দেবী ও গিরিবালা দেবী-র সঙ্গে 'জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনাবলী' প্রকাশিত হয়েছিল রামায়ণী প্রকাশ ভবন থেকে। তিনটি উপন্যাস ও কুড়িটি ছোটোগল্প সেই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, কবি বা প্রাবন্ধিক জ্যোতির্ময়ী দেবীর কোনো পরিচয় সেই 'রচনাবলী' থেকে অবশ্য পাওয়া যায় নি।

তিনটি খণ্ডের এই 'জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনাসংকলন'টিও অবশ্য এখনও জ্যোতির্ময়ী দেবীর সমস্ত রচনার পরিচয় তুলে ধরতে পারে নি, হয়তো আরও একটি বা একাধিক খণ্ড প্রয়োজন সম্পূর্ণতার জন্য* ; এখনও গ্রন্থিত হয় নি তাঁর শেষ উপন্যাস 'হরিজন উন্নয়ন কথা', 'সোনা রূপা নয়' গল্পগ্রন্থের অনেক গল্প, প্রবন্ধ-সংকলনগ্রন্থ 'চিরন্তন নারীজিজ্ঞাসা'র প্রায় সব প্রবন্ধ।

---

* সম্প্রতি 'জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সংকলন'-এর চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। পঞ্চম খণ্ডের প্রকাশ আসন্ন।

এই 'রচনা-সংকলন'-এর প্রথম খণ্ডটির সম্পাদনা সুবীর রায়চৌধুরীর ও সহ-সম্পাদনা অভিজিৎ সেনের। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খণ্ডের সম্পাদনা গৌরকিশোর ঘোষের, সহায়তা অশোকা গুপ্ত এবং মঞ্জুশ্রী সিংহের, তৃতীয় খণ্ডে উপরন্তু সহায়তা করেছেন অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায়ও। প্রথম খণ্ডের পর শুধু সম্পাদক বদলই ঘটে নি, পরিকল্পনার বদলও ঘটেছে যেন অনেকখানিই। প্রথম খণ্ডেই জ্যোতির্ময়ী দেবীর পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থপঞ্জির পরিচয় দিয়েছিলেন সম্পাদকেরা ; গবেষকের যে অসীম নিষ্ঠা আর অনেক পরিশ্রমে বহুতথ্য-সংবলিত গ্রন্থপঞ্জি, প্রাসঙ্গিক কথা এবং বিশেষত পাঠভেদেরও পরিচয় দিয়েছিলেন অভিজিৎ সেন, সম্পাদকদের সেরকম মনোযোগের পরিচয় নেই দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে। সেজন্যই বোধহয় একই প্রবন্ধ পর পর দুটি খণ্ডে মুদ্রিত হয়ে গেছে দ্বিতীয় খণ্ডের সম্পাদকের সচেতনতা এড়িয়েই। 'নারীশালা-হারেম-নারী' প্রবন্ধটি জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'রাজারানীর যুগ' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল, পরে প্রবন্ধটি পুনঃপ্রকাশিত হয়েছিল তাঁর প্রবন্ধ-সংকলন গ্রন্থ 'চিরন্তন নারী-জিজ্ঞাসা'য়। প্রথম খণ্ডের সম্পাদকদ্বয় কয়েকটি অগ্রন্থিত প্রবন্ধ আর 'চিরন্তন নারী-জিজ্ঞাসা'র নির্বাচিত অন্য প্রবন্ধের সঙ্গে এই প্রবন্ধটিও প্রকাশ করেছিলেন। দ্বিতীয় খণ্ডের সম্পাদকগণ 'রাজারানীর যুগ' প্রবন্ধগ্রন্থটি সংকলিত করেন ওই খণ্ডে, তখন সেই গ্রন্থের অংশ হিসেবে প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয়, কিন্তু ওই বিশেষ প্রবন্ধটি যে আগের খণ্ডেই একবার প্রকাশিত হয়েছে, তার কোনো উল্লেখ দ্বিতীয় খণ্ডে নেই। অন্তত 'প্রাসঙ্গিক কথা'য় এই তথ্যগুলির উল্লেখ থাকলে, সম্পাদকীয় দায়িত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যেত।

রচনা-সংকলনের প্রথম খণ্ডে স্থান পেয়েছে জ্যোতির্ময়ী দেবীর বিখ্যাত দুটি উপন্যাস 'বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ' এবং 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' ; অগ্রন্থিত গল্প 'অহল্যা দ্রৌপদী তারা'সহ আরও পাঁচটি নির্বাচিত গল্প, ছটি অগ্রন্থিত প্রবন্ধসহ আটটি প্রবন্ধ এবং 'স্মৃতিচিত্র ও সেকালের কথা' পর্যায়ের ছটি অগ্রন্থিত রচনা। পাঠককে নতুন দেশ আবিষ্কারের আনন্দ দেবার জন্যই যেন সম্পাদকদ্বয়ের এই নির্বাচন-পরিকল্পনা। যতদূর সম্ভব জ্যোতির্ময়ী দেবীর প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা প্রকাশ করেছেন তাঁরা, অগ্রন্থিত গল্প, প্রবন্ধ, স্মৃতিচারণ প্রকাশে যেমন তাঁদের পরিশ্রমী নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি স্পষ্ট হয় লেখিকা জ্যোতির্ময়ী দেবীর সামগ্রিক পরিচয় দেওয়ার ইচ্ছাও।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খণ্ডে সামগ্রিকতার চেয়ে বিষয়-অনুযায়ী বিভাজনের দিকেই প্রবণতা বেশি মনে হয়। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রধানত গুরুত্ব পেয়েছে প্রবাসজীবনের বিষয়ই— বাংলার বাইরের অবশিষ্ট ভারতের নানা স্থানের কাহিনী যার অবলম্বন। এই খণ্ডে সংকলিত একমাত্র উপন্যাসটি জ্যোতির্ময়ী দেবীর প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা না হলেও এই শর্তটি পূরণ করে : 'মনের অগোচরে' উপন্যাসটি এক বাঙালি কন্যার প্রবাসী বৈষ্ণব গোঁসাই-পরিবারের বধূ হয়ে স্বজন-সমাজ-বিচ্ছিন্ন প্রবাসজীবনেরই কাহিনী। 'আরাবল্লীর আড়ালে' এবং 'আরাবল্লীর কাহিনী'— এই দুটি গ্রন্থের গল্প ছাড়া আরও কিছু ছোটোগল্প সংকলিত হয়েছে এই খণ্ডে, যেগুলিতে প্রবাসী বাঙালির কথাই বর্ণনীয়। প্রবন্ধ হিসেবেও স্থান পেয়েছে 'রাজস্থান/সর্বভারতীয় চিত্র' পর্যায়ে 'রাজরানীর যুগ' গ্রন্থটি, যাতে রাজস্থানের নানা রীতি-নীতি, পালপার্বণের পরিচয় ধরা আছে, আর আছে তীর্থপরিক্রমা, সেটিও— 'পঞ্চনদীর তীরে'। এ ছাড়া এই খণ্ডে সংকলিত হয়েছে লেখিকার আত্মজীবনী— 'স্মৃতি বিস্মৃতির তরঙ্গ'— নারীমনের এক অনুভূতিদীর্ণ প্রকাশ।

তৃতীয় খণ্ডটি যেন তুলে ধরে নারীবাদী লেখিকা ও কবি জ্যোতির্ময়ী দেবীর পরিচয়। একমাত্র উপন্যাস 'ছায়াপথ' এবং গল্পগ্রন্থ 'মর্ত্যের অপ্সরা' ও অন্য গল্পগুলিও, অধিকাংশ ব্যঙ্গরচনাও— তাঁর নারীবাদী চেতনারই স্বাক্ষর। এই খণ্ডের তীর্থপরিক্রমা 'সময় ও সুকৃতি' নানা সাধুকথায় ও লেখিকার মনের প্রশান্তির পরিচয়ে আকীর্ণ, সেইসঙ্গে আছে 'চক্রবাল' ও 'কবিতাগুচ্ছ'-এ কবি জ্যোতির্ময়ী দেবীর নতুন পরিচয়।

২.

জ্যোতির্ময়ী দেবীকে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সেরিব্রাল লেখক বলে বর্ণনা করেছিলেন মহাশ্বেতা দেবী (ভূমিকা, দ্বিতীয় খণ্ড)। তাঁর উপন্যাসের আবেদনও আবেগের কাছে শুধু নয়, মননের কাছেও। তাঁর 'বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ', 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা', বা 'ছায়াপথ' উপন্যাসগুলি তুলে ধরেছে স্বনির্ভর, স্বাধীনচেতা, আত্মবিশ্বাসী মেয়েদের জীবনবৃত্ত, যাদের জীবনধারা এই অনির্বাণ প্রশ্ন জাগিয়ে রাখে, যে, আর্থিক স্বাধীনতা, স্বনির্ভরতা মেয়েদের কী দেয়, কতটুকু দেয় ? সমাজ, পুরুষশাসিত সমাজ কতটুকু মর্যাদা দেয় স্বপ্রতিষ্ঠ নারীকে ? শিক্ষিতা নারীর জীবিকাবলম্বনকে সমাজ সম্মানের চোখে দেখে না বলেই, তাঁর 'ছায়াপথ' উপন্যাসের নায়িকা সুপ্রিয়া বিয়ের পরে চাকরি ছাড়তে চায় না। তীক্ষ্ণতর প্রশ্ন তোলে তাঁর 'বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ' উপন্যাসের বীণা, যে বড়ো হয়ে উঠে আবিষ্কার করে— সে শুধু মেয়ে নয়, কালো মেয়ে— আর তাই বিয়ের বাজারে দর তার সবচেয়ে কম। শিক্ষার শক্তিতে অধ্যাপনার চাকরি নেয় সে, আর অবাক হয়ে ভাবে— টাকার দামও কি পুরুযনারীভেদে পৃথক হয় ? 'একটা ছেলে প্রফেসারের টাকা আর মেয়ে-প্রফেসারের টাকার দামের তফাতটা কি ?— সে ভাবে, আর মৃদু হাসির সঙ্গে বলে, 'একটা কালো কুৎসিত ছেলে যদি প্রফেসার হয়, তার দাম কিন্তু বিয়ের বাজারে কম হয় না' (খণ্ড ১, পৃ. ৬৮)। এই বীণাই মহাত্মাজির দাণ্ডী-অভিযানে শামিল হয়, নিজের মতো ক'রে এই অভিযানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে আর এমনি ক'রে মেয়েদের চার পাশের চার দেওয়ালের গণ্ডি ছাপিয়ে যায়, মিশে যায় দেশের বৃহত্তর জনপ্রবাহে। আর, দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে যেন জড়িয়ে যায় মেয়েদের স্বাধীনতার প্রসঙ্গও। জ্যোতির্ময়ী দেবীর উপন্যাসের এই সচেতন তাৎপর্যের সূত্রটি যথার্থভবে আলোকিত হয়েছে যশোধরা বাগচীর আলোচনাতেও (ভূমিকা, প্রথম খণ্ড)।

জ্যোর্তিময়ী দেবীর বিখ্যাত উপন্যাস 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা'-তে মুসলমানে ছোঁয়া, স্বজন-পরিত্যক্তা সুতারা মনে মনে 'অকারণে লাঞ্ছিতা, উৎপীড়িতা, উপেক্ষিতা, পরিত্যক্তা নারীর, সবকালের মেয়েদের প্রতিনিধি' হয়ে উঠেছে। আর্থিক স্বাধীনতা পেয়ে এই একলা মেয়েটির মনে হয়েছিল, 'তবে সে কি স্বাধীন হয়ে গেল ? মেয়েরা কি স্বাধীন হয় ?' (খণ্ড ১, পৃ. ১৯০)— এই প্রশ্নটিই কতভাবে, কত ভাষায়, কতবার তুলেছেন জ্যোতির্ময়ী দেবী, পৌঁছে দিতে চেয়েছেন সমাজের বধির কানে।

এই মেয়েদের জীবনেও প্রেম আসে, প্রেমের বঞ্চনা আসে, কখনো কখনো আসে প্রাপ্তির পরিপূর্ণতাও। কিন্তু, যথার্থ পুরুষকে চিনে নিতে চায় তাঁর গড়া নারীচরিত্রেরা। যে পুরুষ পাণিপ্রার্থী শুধু নয়, পণপ্রার্থীও, বধূর যোগ্যতার চেয়ে বধূর পিতার অর্থকৌলীন্যের দিকে যে পাত্রের নজর বেশি, তেমন 'সৎপাত্র'কে করুণায় উপেক্ষা করে জ্যোতির্ময়ী দেবীর নায়িকারা। 'ছায়াপথ' উপন্যাসের সুপ্রিয়া যেমন বলেছিল— 'আমিই যদি কোনদিন বিয়ে করি, ওরকম সৎ পাত্রকে করব না, পুরুষ মানুষকে করব।' 'ওরা কি সব মেয়েমানুষ'— এই প্রশ্নের উত্তরে নির্মম উপেক্ষায়, তীব্র ব্যঙ্গে মৃদু হেসেই সে বলে— 'না তার চেয়েও বেশী, ওরা ছেলেমানুয' (খণ্ড ৩, পৃ. ৪৬)। এই ব্যঙ্গের কশাঘাত কি পুরুষ-পেষিত সমাজের জন্য যথেষ্ট নয় ? সুপ্রিয়া তো আর ছেলেমানুযকে বিয়ে করতে পারে না, তাই করুণায় উপেক্ষা করে তাদের, কিন্তু অপেক্ষা করে যথার্থ পুরুযের জন্যই, অল্পদামে নিজেকে বিকিয়ে দেয় না। প্রেমের কাছে এই দাবি জ্যোতির্ময়ী দেবীর— দাবি যোগ্যতার, দাবি সহমর্মিতার। এমন-কি, মেয়েদের দামকে শুধু পুরুষের যাচাই-নির্ভর করেও রাখতে দেন নি তিনি, কালো মেয়ে বীণা দেখতে চেয়েছে— 'সম্পর্কের নাম খ্যাতিকে ছাড়িয়ে গিয়ে আমার নিজস্ব কিছু আছে কি না, আমার দাম আমার কাছে যদি কিছু পাই!' (খণ্ড ১, পৃ. ৬৯)।

শিক্ষা এই মেয়েদের দিয়েছে স্বচ্ছ দৃষ্টি, মানুষের গড়া সম্পর্কের নির্মোহ মূল্যায়ন করতে শিখেছে তারা, স্বামী-স্ত্রীর সমাজপূত সম্পর্কের বীতংস ভেদ করে ভাবতে পেরেছে— 'সেখানেও তারা ওদের সম্পত্তি। তাদের ওরা স্নেহ করে, সোহাগ করে, সাজায়, যত্ন করে। আসলে নিজের জিনিসটি ঝাড়ে-মোছে, পরিস্কার রাখে

না লোকে ?' (খণ্ড ৩, পৃ. ১৫৪)। আর বীণা পিতামাতার স্নেহকে 'সম্মান করে, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারে না', 'ভাইবোনের সম্পর্ককে মধুর মনে করতে চায়, কিন্তু সত্য মনে করতে পারে না'— সামাজিক মানুষের স্বার্থবোধ, এই উপলব্ধি উপহার দেয় প্রতিটি সচেতন, সংবেদনশীল মেয়েকে। বীণাকে দেখে সমব্যথী প্রতুল ভেবেছিল— সে কি মেয়েদের জীবনে 'সবটাই প্রসাদ, প্রাপ্য কিছু নেই, জানতে পেরেছে ?' (খণ্ড ১, পৃ. ৬৯)। কিন্তু, এইখানে থেমে থাকেন নি জ্যোতির্ময়ী দেবী, তাঁর গড়া নারীচরিত্রগুলি জীবনের প্রসাদকে প্রাপ্যে রূপান্তরিত করে নেয় ব্যক্তিত্বের জোরে।

'নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী'— এক কথায় এই হতে পারে জ্যোতির্ময়ী দেবীর নারীচরিত্রগুলির পরিচয়। পুরুষের পাশে সংকটে, সম্পদে, কঠিন ব্রতে সহায় হয়েই তাদের সহধর্মিণীত্ব। পুরুষের পৃথিবীতে মেয়েমানুষ নয়, মানুষের যোগ্য পরিচয় খোঁজে তারা।

৩.

জ্যোতির্ময়ী দেবীর ছোটোগল্পের পরিধি বহুধাবিস্তৃত— যেমন ভৌগোলিকভাবে, তেমনই বিষয়গত বলিষ্ঠতায়। উপন্যাসের চেয়েও ছোটোগল্পে জ্যোতির্ময়ী দেবীর নারীবাদী চেতনা, বলিষ্ঠ সমাজভাবনা তীক্ষ্ণতর মাত্রায় প্রকাশিত। (অবশ্য তাঁর সব ছোটোগল্প এখনও, এই তিনটি খণ্ডে মুদ্রিত হয় নি।) তাঁর ছোটোগল্পে যেমন স্থান পেয়েছে রাজস্থানের নির্মম প্রথায়, বিশ্বাসে, সংস্কারে আবদ্ধ চিরন্তনী নারীজীবন, তেমন আছে দুর্ভাগিনী, সুখবঞ্চিতা, সমাজচ্যুতা নারীর দুর্ভাগ্যপীড়িত জীবনকাহিনী।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'বেটী কা বাপ' গল্প সহজ নিষ্ঠুরতায় এই সরল সত্য উদ্‌ঘাটন করে, যে, পরিবারের ষষ্ঠ কন্যার বেঁচে থাকার অধিকার নেই। তাঁর আরাবল্লীর নানা কাহিনী— 'ধাপি', 'সুমেরু রায়', 'শেঠানীজী', প্রভৃতির জীবনে রাজস্থানের নতুন রাজকাহিনীই রচিত হয়েছে যেন। পরম বেদনায় তিনি অনুভব করেছেন, নারী সেখানেও পণ্যই, সবদেশেই নারীর ভাগ্যে অপেক্ষা করে থাকে একই বঞ্চনা, 'রাজনেত্রবর্তিনী' হবার আকাঙ্ক্ষায়, অপেক্ষায় অকালেই ঝরে পড়ে কত কিশোরীর অম্লান জীবন, 'আরাবল্লীর আড়ালে' গল্পের রূপসী ধাপির ঘুম যেমন আর ভাঙে না; কখনো বা রাজঅনুগ্রহপ্রাপ্তিই হয়ে দাঁড়ায় অভিশাপ— রূপ-যৌবন ফুরিয়ে এলে রাজপ্রিয়া 'শেঠানীজী'কে বিবর্ণমুখে 'ওষুধ' তুলে নিতে হয় মুখে ('শেঠানীজী' গল্পে) বা, একদা নূরজাহানের মতো প্রতাপশালিনী সুমেরু রায়-কে স্থবিরের মতো অপেক্ষা করতে হয় দিনাবসানের ('সুমেরু রায়' গল্পে)।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর নারীবাদ কখনোই পুরুষ-বিদ্বেষের আকারে দেখা দেয় নি, মানুষের দুঃখ-বঞ্চনা তাঁর কাছে মানুষেরই দুর্ভাগ্যের রূপে ধরা দিয়েছে, পুরুষের বা নারীর নয়। সমাজে পুরুষের জন্যও যে বঞ্চনা অপেক্ষা করে থাকে, তারও সহানুভূতিশীল রূপায়ণ ঘটেছে তাঁর 'লালজী সাহেব'-এর মতো গল্পে। রাজমহিমার অত্যাবশ্যক অনুষঙ্গ এই অবৈধ সন্তান লালজীসাহেব-রা, যারা রাজার ছেলে কিন্তু রাজপুত্র নয়, সামন্ততন্ত্র তাদের যে সম্মানই দিক, বাইরের আধুনিক সমাজে সব সম্মানের সুযোগই তাদের আয়ত্তাতীত, মেধাবী যুবকের এই অসহায় গ্লানির যন্ত্রণাকেও জ্যোতির্ময়ী দেবী তাঁর গল্পের বিষয় করেছেন।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর তাৎপর্যময় গল্পগ্রন্থ 'মর্ত্যের অপ্সরা', বিভিন্ন সময়ে লেখা— 'আন্নাকালী', 'পিঁজরাপোল', ও 'মর্ত্যের অপ্সরা'— এই তিনটি বড়ো গল্পের সমন্বয়। 'পিঁজরাপোল' গল্পটি নানা দিক থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ। কাশীর বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা তরুণী কুমারী হৈম-র চোখে দেখা হয়েছে এ গল্পের জগৎ, যার পদে পদে মনে হয়— মেয়েরা কি 'মানুষ' হয় কারো চোখে ? সমাজের নানা আঘাতে সে বাধ্য হয় ভাবতে— 'মনে হয় এই মানুষ হওয়া কথার কথা !... ওরা সবাই জানে, তারা মানুষ নয়। পরজীবি [পরজীবী] পরগাছাজাতীয় জীব এবং সেইটাই তাদের জাতীয় স্বভাব। বিবাহ হলে পতির, পিতার ধন থাকলে বসে খাওয়াই তাদের নিয়ম এবং

গৌরবের' (খণ্ড ৩, পৃ. ১৫৪)। হৈম-র মতো যারা 'তোমার গরবে গরবিনী হাম' না হতে চেয়ে নিজের মূল্য খোঁজে, তারা এই সমাজে উপহসিত হয় 'টিচারিণী' বলে, তিক্ত ক্ষোভে তাদের বুঝতে হয়— 'নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানোই যেখানে পুরুষের সম্মান, ওঁরা সেখানে কৃপা ও অবজ্ঞার পাত্রী' (খণ্ড ৩, পৃ. ১৫৪)।

নিজের জীবনে বৈধব্যের অভিজ্ঞতা তাঁর মনে যে তীব্র অনুভূতি সঞ্চার করেছিল, তা দিয়ে বুঝেছিলেন জ্যোতির্ময়ী দেবী, এই নিষ্ঠুর অভিঘাত মেয়েদের কীভাবে, কী আকস্মিক আঘাতে চেনা-জগতের, চেনা অভ্যাসের বাইরে নিয়ে যায়— 'যে শোক বিয়োগের সঙ্গে মানুষের নিয়তই পরিচয় হয়— মেয়েদের বৈধব্যজীবনের শোকবিয়োগ তা নয় ঠিক।— এ শোক পুরুষদের জানা নেই।...আসলে আমার যেন নবজন্ম হ'ল। দ্বিজ নয়, অন্য এক অপাংক্তেয় শূদ্র-জগতে।...শাস্ত্রে আছে নিরালম্ব দেহমুক্ত মৃত আত্মার কথা। যার স্থিতি নেই, আশ্রয় নেই, স্বস্তি নেই, বায়ুভুক শূন্যবাসী। দেহ থাকতে সেই অমর মৃত্যু আমাদের হয়' (খণ্ড ২, পৃ. ৫১৪)। সাহিত্যে বৈধব্যের ছবি আঁকবার সময়ও জ্যোতির্ময়ী দেবী অবাক যন্ত্রণায় দেখেন প্রাণের কী অর্থহীন বিপুল অপচয়ের আয়োজন এই রীতির নিষ্ঠুরতাকে ঘিরে। নারীর ওপর সমাজের নিষ্ঠুর লৈঙ্গিক পীড়নের ছবি তুলে ধরে তাঁর লেখনী। পুরুষের সমাজে যখন অর্থহীন হয়ে ওঠে এই অনাবশ্যক নারীদের অস্তিত্ব, তখন সম্ভ্রমরক্ষার দায়ে তাদের ঠেলে দেওয়া হয় কাশীর 'পিঁজরাপোলে'— ধর্মের নামে এক আশ্চর্য ভণ্ডামির জাল বুনে। তরুণী হৈম-র চোখেই ('পিঁজরাপোল' গল্পে) অনাবৃত হয় নারীর ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচারের এই জগৎ, অনুভব করে সে মানুষের ক্ষমতার অকারণ, অকরুণ অপচয়— 'কাশীর পথে নানা বয়সের, নানা জাতের নানা বর্ণের নারী জনস্রোত' দেখে 'তার মনে হয় যেন আশেপাশে সামনে পিছনে সাদা য়ুনিফরম পরা মৃত প্রাণীর সারি চলেছে। সমাজের প্রচ্ছন্ন অভিমত পরিস্ফুট করে তাদের বাঁচবার অধিকার নেই, দাবি নেই। শুধু তাদের অস্তিত্বের অথবা দেহে আর একজনের প্রয়োজন নেই তাই' (খণ্ড ৩, পৃ. ১২৬)।

কাশীর ঘাটে ঘাটে কথকতার আয়োজন বর্ণনা করেছেন জ্যোতির্ময়ী দেবী— 'শ্বেতাম্বরা নিরাভরণা শান্ত জনতা' সেখানে যেন নিজেদেরই 'কপালভাঙার ইতিহাস' শোনে বেহুলার বাসররাত্রির বর্ণনায়। বৈধব্যের এই নিষ্করুণ অভিজ্ঞতা সমস্ত দুর্ভাগিনী নারীকে নিয়ে এসেছে সমতলে, ঘুচে গেছে ধনী-দরিদ্রের ভেদও ; এক শহরবাসিনী অভিজাত বিধবা তাকিয়ে দেখেন, কথকতার আসরে 'চারিদিকেই শুধু সাদা থানের পরিচ্ছদধারিণী। ময়লা, ফরসা, মোটা, সূক্ষ্ম, সুতী, গরদ, ছালটি পরিধৃতা সকলেই একাসনে বসার মতো। পাশাপাশি সারি সারি বসে আছেন। সকলেরই অন্তরে কোন্ বেহুলা কবে ঘুমিয়েছিল তার দুর্ভাগ্যময় দিনে তার কথা জাগছে যেন কবির কথায় : ''সে কি তার সে কি মোর সে কি সবাকার'' !' (খণ্ড ৩, পৃ. ১২৩)।

জাত-কুল-পদমর্যাদা পার হয়ে পুরুষেরা বোধহয় কখনো এমন সমভূমিতে মিলতে পারে না, দুর্ভাগ্য, বঞ্চনা— মেয়েদের যে সমভূমির সন্ধান দেয় অনায়াসেই। দুর্ভাগ্য যেমন সবশ্রেণীর মেয়েকে নিয়ে এসেছে একাসনে, তেমনি সমাজের আদিমতম পেশাটির মেয়েরা কী অকৃত্রিম সমানুভবে বাঁধা থাকে, আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টিতে তার স্বরূপ উন্মোচিত করেছেন জ্যোতির্ময়ী দেবী। আর, এই উন্মোচন নগ্নভাবে প্রকাশ করে পুরুষ-প্রবল সমাজের নির্মম দুমুখো নীতিকে— পুরুষের প্রয়োজনে, পুরুষেরই লালসায় গড়ে ওঠে গণিকালয়, আর যে জীবিত দেহটি একদিন ছিল পুরুষের লোলুপ কামনার কেন্দ্রে, দিনান্তে তা যখন নিষ্প্রাণ শবদেহে পরিণত, তখন এই মেয়েরা দেখে সমাজের নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য। মেয়েদেরই তখন কাঁধে করে শ্মশানে নিয়ে যেতে হয় সমব্যবসায়িনীর শবদেহ, ভ্রমরবৃত্ত পুরুষদের 'প্রমোদের মোহ একনিমেষে উবে' যায়। কিন্তু নিষ্ঠুর সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ায় গণিকা মেয়েরা, গভীর অনুভবে প্রশ্ন করে— 'আমাদের কাছে আসে, আমোদ আহ্লাদ করে রাত কাটিয়ে ঘরে যায়, অথচ মড়া ফেলতে আসে না। জ্যান্ততে এত কদর' (খণ্ড ৩, পৃ. ১৬৬)। নিরুপায় হতাশায় ভাবে— 'তাদের জীবিত দেহ বিনিময়ে মুদ্রা— তারা জেনে গেছে। যাদের মৃতদেহগুলি পচা গলিত প্রাণীর শব ছাড়া আর কিছুই নয়। পচা ইঁদুর, পোকামাকড়, কুকুর, বিড়াল, জীবজন্তু কীটপতঙ্গেরও অধম দেহ তাদের' (খণ্ড ৩, পৃ. ১৬৯)।

—এই শ্রেণীর মেয়েদের এমন উদার সহমর্মিতায় ক'জন দেখেছিলেন সেদিনকার সমাজে ? সেকালের [illegible]

পুরুষ-সাহিত্যিকেরও সাধ্যায়ত্ত ছিল কি জ্যোতির্ময়ী দেবীর এই দৃষ্টিভঙ্গি? এ তো চন্দ্রমুখী বা রাজলক্ষ্মীর ভালোবাসায় সঞ্জীবিত হয়ে 'সতী' হয়ে ওঠার আখ্যান নয়, শুধু অভিজ্ঞতার ব্যাপ্ত বিস্তারেও সম্ভব নয় এ গল্প ('মর্ত্যের অপ্সরা') রচনা, এজন্য প্রয়োজন নারী-মানসিকতার, প্রয়োজন যন্ত্রণালব্ধ সত্যকে চেনার চোখের, যা জ্যোতির্ময়ী দেবীর ছিল বলেই সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর লেখনী। সমাজের দুমুখো নীতিকে এ গল্পে উদ্‌ঘাটিত করার এই ক্ষমতা যশোধরা বাগচীও লক্ষ্য করেন তাঁর আলোচনায় (ভূমিকা, প্রথম খণ্ড)।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর ছোটোগল্প, নিটোল গল্পরসে ভরিয়ে পাঠকের অলস দুপুরের সময় কাটানোর সঙ্গী হয়ে ওঠে না কখনো, তাঁর পরিমিতিবোধ পাঠককে ভাবতে বাধ্য করে। জ্যোতির্ময়ী দেবীর ছোটোগল্প তাই তাঁর স্বকালকে পার হয়ে আসে অনেকদূর।

৪.

স্বকালের একজন সর্বভারতীয় লেখক জ্যোতির্ময়ী দেবী, সর্ব অর্থে। শুধু সর্বভারতের পরিবেশে গল্প-উপন্যাস লিখেছেন বলে নয়, সর্বভারতীয় সমস্যাকেও বিষয় করেছেন তাঁর রচনার। এখানে তাঁর আধুনিকতা, প্রাসঙ্গিকতাও।

বড়োমাপের দেশজোড়া সমস্যা ক্বচিৎ নারী-সাহিত্যিকদের উপন্যাস-ছোটোগল্পের বিষয় হয়েছে। বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার স্বপ্নকে যেমন বাস্তব হতে দেখেছেন জ্যোতির্ময়ী দেবী, দেশবিভাগের যন্ত্রণায় সেই স্বাধীনতাকে খণ্ডিত হতেও দেখেছেন। আর সেইসঙ্গে দেখেছেন, দেশ জুড়ে দাঙ্গা বাধায় পুরুষে আর শরীর দিয়ে, সম্মান দিয়ে তার দাম চোকায় নারী। ঘর হারানোর যন্ত্রণা নারী-পুরুষ উভয়েরই, কিন্তু মানহারা মানবীর লাঞ্ছনা, সেই যন্ত্রণায় অন্য মাত্রা যোজনা করে। জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাস আর বহু ছোটোগল্প ধরে রেখেছে এই অন্য তাৎপর্য।

সাম্প্রদায়িকতার ভেদবুদ্ধি আজকের ভারতবর্ষেও এক মস্ত সমস্যা। নারী-সাহিত্যিকেরা, যাঁদের অগ্রগণ্যা জ্যোতির্ময়ী দেবী, একভাবে এই সমস্যার উত্তর খুঁজেছিলেন এই ব্যাখ্যায়, যে, হিংসা-দ্বেষের, মৌলবাদী উন্মত্ততার জগৎ পুরুষের, মেয়েদের উপর বঞ্চনার, অবিচারের কোনো ধর্মভেদ নেই। তাই উৎপীড়িত সমস্ত মেয়েরই এক জাত, এক ধর্ম, এক বর্ণ।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'একজাত' গল্পে যেমন দেখি স্বজনহারা পথে নামা দুই কিশোরীকে— একজন হিন্দু, আর মুসলমান অন্যজন— পথের পরিচয়ে একজাত হয়ে উঠেছে, তাদের আতঙ্কের পৃথিবীতে একটি আতঙ্কই সত্য— 'দুজনেই মেয়ে, একটাই জাত তাদের। পুরুষ-ভীত জাত' (খণ্ড ৩, পৃ. ৩০৫)। দুজনেই নীরবে, তাড়া-খাওয়া-পশুর মতো পথ চলে, কিন্তু দুজনেরই বুক কাঁপে একটাই ভয়ে— 'পুরুষের চেয়ে আর কে ভয়ঙ্কর...কি ভয়ের আছে আজ' (পৃ. ৩০৬)। পুরুষের হাতে নারীশরীরের এই লাঞ্ছনা তো জাতিধর্ম নির্বিশেষে সব যুগের, সব দেশের মেয়ের অভিজ্ঞতার সত্য, তাই দুটি আতঙ্কিত ভিন্‌ধর্মী নারী বিনা পরিচয়েই আপন হয়ে উঠতে পেরেছে— 'ওরা একটাই জাত? মেয়েমানুষ' (পৃ. ৩০৬)।

'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসেরও অবলম্বন হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কেরই সমস্যা। এ উপন্যাসের নায়িকা সুতারা মুসলমান-সংস্পর্শের দোষে চিরকালই নিজের সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় থেকে গেছে; মুসলমানের উন্মত্ততা যেমন তাকে ঘরছাড়া করেছে, তেমনি মুসলমানের পরম মমতাই যে তাকে বাঁচিয়েওছে, সে কথা ভুলেই গেছে তার পবিত্র সমাজ। কিন্তু অকৃতজ্ঞতার এই গ্লানি মুছিয়ে দিয়েছে সুতারার পাণিপ্রার্থী প্রমোদ, সুতারার সংকোচ উড়িয়ে দিয়ে বলেছে— 'তুমি তোমার কাকাসাহেবের ঘরে ছিলে। আমি জানি। তাঁর চেয়ে মহৎ লোক আর কেউ তখন সেখানে ছিল না তোমার কাছে, তাও জানি' (খণ্ড ১, পৃ. ২৫১)। এই সহজ শ্রদ্ধার উচ্চারণে

সাম্প্রদায়িকতার সব সংকীর্ণতা পার হয়ে যায়, মৌলবাদী ধর্মভেদের কৌশলের জাল ছিন্ন হয়ে যায়। নানা আলাপ-আলোচনায় ভারত-ইতিহাসের অসাম্প্রদায়িক উদারতার কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন জ্যোতির্ময়ী দেবী এই উপন্যাসে। সে রাজস্থানের মেয়েরা মুসলমান-স্পৃষ্ট হবার ভয়ে জহরব্রত করেছে দলে দলে, সেই রাজস্থানেরই রানী কর্ণাবতী হুমায়ুন-বাদশাকে 'ভাই' বলে রাখী পাঠিয়েছেন, গোঁড়া আওরঙ্গজেবও উদয়পুরের রানীর 'রাখী-বন্ধ' ভাই হয়েছেন। এই দুই সম্প্রদায়ের সম্পর্ক দুটি মানুষেরই পারস্পরিক সম্পর্ক— সেই মানবিকতার বন্ধনকেই প্রকাশ করে যে নারী-সাহিত্যিকদের লেখনী, জ্যোতির্ময়ী দেবীই তাঁদের অন্যতমা।

৫.

চার/পাঁচটি মাত্র উপন্যাস আর বহু ছোটোগল্পের জনয়িত্রী জ্যোতির্ময়ী দেবীর প্রবন্ধ-রচনার ক্ষেত্রও বহুব্যাপ্ত, প্রকাশভঙ্গিতেও তিনি একইরকম স্বচ্ছন্দ এবং তীক্ষ্ণ। রাজস্থান-চিত্র 'রাজারাণীর যুগ' প্রবন্ধগ্রন্থে (দ্বিতীয় খণ্ডে গ্রন্থিত) এক বিচিত্র, অচেনা জীবনকথাকে তুলে এনেছেন তিনি। রাজা-রানীর কথাই শুধু নয়, রাজার অবৈধ সন্তান লালজীসাহেব বা বাঈজীলাল-দের দিনযাপনের বিশ্বস্ত ছবি বা সখী-পাত্রী-পর্দায়েত-পাশোয়ান-খুশনজরজীদের বিচিত্র জগৎ, এক রহস্যমায়ায় মোড়া অন্তঃপুরের ছবি— জীবন্ত হয়ে উঠেছে জ্যোতির্ময়ী দেবীর কলমে। আরও আছে রাজস্থানের মেলা, উৎসব ও ব্রতপার্বণের বর্ণনা বা ইংরেজভক্ত রাজার হিন্দুমতে বিলাতযাত্রার কৌতুককর বিবরণী। এ ছাড়া আছে 'পঞ্চনদীর তীরে' বা 'সময় ও সুকৃতি' গ্রন্থের তীর্থপরিক্রমার বর্ণনা, বা সমকালীন বা পূর্বসূরি লেখিকাদের স্মৃতিচিত্র রচনা, কিংবা স্বল্পসংখ্যক ব্যঙ্গরচনায় ধরা আছে স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের মোহভঙ্গের ছবি, কখনো নারী-পুরুষের জীবন-পরিবেশের অসাম্যের ছবি।

সমাজে নারীর অবস্থান বা নারীর সৃষ্টিশীলতা জ্যোতির্ময়ী দেবীর সচেতন মনীষায় যে আলোড়ন তুলেছে, তার পরিচয় ধরা আছে তাঁর 'চিরন্তন নারী জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে, যার কোনো কোনো প্রবন্ধ এই রচনা-সংকলনের প্রথম খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। নারীর সৃষ্টিশীলতা তাঁর মনে প্রশ্ন জাগিয়েছে, পুরুষের তুলনায় তার আত্মপ্রকাশের দীনতার উত্তর খুঁজেছেন মেয়েদের জীবন-পরিবেশে, অভিজ্ঞতা দিয়ে অনুভব করেছেন 'সঙ্গী ও সঙ্গহীন জাত' বলে মেয়েদের জগৎ সংকীর্ণ হয়ে থাকে, বা, ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, 'কেন নারীর কোনো ইতিহাস নেই' বলে, তেমনি আত্মসমালোচনাতেও নির্মম তিনি। 'মেয়েদের রচনায় স্ত্রীচরিত্র' প্রবন্ধে যেমন, নির্মমভাবেই বিশ্লেষণ করে বলেন তিনি, রচয়িতার আদর্শের ভার বইতে গিয়ে মেয়েদের গড়া চরিত্রগুলি প্রাণ পায় না, অনায়াসেই মূল্যায়ন করেন, 'পুরুষের প্রথম শ্রেণীর সৃষ্টির কাছে মেয়েদের সৃষ্টি নিতান্ত ম্লান' (খণ্ড ১, পৃ. ৩৫১)।

আর, 'স্মৃতি-বিস্মৃতির তরঙ্গ' নামে আত্মজীবনীতে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তিনি ফিরে তাকিয়েছেন তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের দিকে। বারো-তেরো বছরের নববধূজীবনের লজ্জা-সংকোচ-জড়িমা, শ্বশুরবাড়ির সংকীর্ণতায় ক্ষোভ, কষ্ট— নির্মোহভাবে বর্ণনা করেছেন ; অসহায় তরুণী বধূর সেদিনের জীবনের কথা প্রকাশ করেছেন— 'তারা কেউ গান্ধীজী নয়। গান্ধীজীর মতো সত্যের প্রয়োগ বা একস্‌পেরিমেন্ট অফ ট্রুথ তারা কোনোদিন লিখতে জানে না। তাদের তারিফ করবার মতো লোকও নেই কোথাও। ক্ষুদ্র সুখদুঃখময় জটিল ও কুটিল জীবনধারা তাদের।

'কিন্তু সে জীবনেও তো "সত্য" আছে, সত্য থাকে! সে সত্য মহৎ বা ক্ষুদ্র যাই হোক না কেন। এবং সত্য যে কঠিন সে কথাও তো সত্য। এবং সে সেকাল এখনো আছে সমাজে। ঘরের কোণে, পুঁথির পাতায়, খবরের কাগজে মাঝে মাঝে উঁকি মেরে যায়' (খণ্ড ২, পৃ. ৫০৮-০৯)।

জীবনে যা-কিছু বঞ্চনা পেয়েছেন, উদার ক্ষমায় তার উর্ধ্বায়ন ঘটানোর চেষ্টা করেন নি তিনি, অকপটে বলেছেন— 'কই কবির ভাষায় বলতে তো পারলাম না : আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই/বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে' (খণ্ড ২, পৃ. ৫১২)।

তাই, অনেক অচরিতার্থ ক্ষোভে তাঁর মনে হয়— 'এই অপচয়ের জগৎই হ'ল নারীজগৎ। যার মন আছে, মননশক্তির বিকাশ নেই। হৃদয় আছে, হৃদয়ের সম্মান নেই। যেন সুর আছে, সঙ্গীত নেই। ভাব আছে, ভাষা নেই। এমনি জীবন। সে যদি মুনি (মনন যাঁর আছে তিনিই মুনি) হতে পেত— তার প্রেম-বিরহ-মিলন, তার শোক-বিলাপ আর্তনাদ না হয়ে বাল্মীকির কাব্য হতো, কালিদাসের 'মেঘদূত' হতো, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের সুর পেত' (খণ্ড ২, পৃ. ৫৩২)।

তিনটি খণ্ড জুড়ে বহু প্রবন্ধের উপস্থিতি সত্ত্বেও প্রাবন্ধিক জ্যোতির্ময়ী দেবীর পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া গেল না এখনও। প্রথম খণ্ডে ১৩৩৩ সাল থেকে ১৩৮০ সাল— নানা সময়ের আটটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছিল, যা আভাস দিয়েছিল প্রাবন্ধিক জ্যোতির্ময়ী দেবীর বলিষ্ঠতার, কিন্তু এতগুলি খণ্ডেও তৃষ্ণার নিবৃত্তি ঘটল না। বিশেষত অতৃপ্তি থাকে সেই তাঁর প্রথম লেখাটির জন্য, ১৩২৮ সালে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'নারীর কথা' যার শিরোনাম, যা আলোড়িত করেছিল সমসময়কে। সেইকালে 'পতিদেবতা' শব্দের ব্যঙ্গাত্মক ব্যবহার, বা পাঁজিতে বার্তাকু ভক্ষণ প্রভৃতি নানা নিষেধের সঙ্গে স্ত্রীসম্ভোগকেও এক পর্যায়ে ফেলার সমালোচনা ইত্যাদি প্রসঙ্গ ছিল সে প্রবন্ধে, লেখিকা নিজেই যাকে বলেছেন 'উগ্র', সমকালীন পাঠক যে লেখার বলিষ্ঠতায় ভেবেছিল নারীর ছদ্মদেশে কোনো পুরুষের লেখা— তিনটি খণ্ডেও সেই বিশেষে প্রবন্ধটি অনুপস্থিত। অথচ, পাঠক প্রবন্ধটি রচনা ও তার নানাজাতের প্রতিক্রিয়ার কথা বিস্তারিতভাবে পড়েন দ্বিতীয় খণ্ডে, 'স্মৃতি-বিস্মৃতির তরঙ্গ'-তে, প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় পুনর্মুদ্রিত যশোধরা বাগচীর লেখায় (আকাদেমি পত্রিকা ৩-এ প্রথম প্রকাশিত) সেই প্রবন্ধের কয়েকটি উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তি থেকে একটু স্বাদও পান সে লেখার— সে স্বাদগ্রহণ, প্রবন্ধপাঠের তৃষ্ণা আরও বাড়িয়েই দেয়, কিন্তু নিবৃত্তির উপায় মেলে না।

'চক্রবাল' এবং 'কবিতাগুচ্ছ-এ সংকলিত হয়েছে জ্যোতির্ময়ী দেবী -রচিত কবিতাবলি। গান্ধারী, মৈত্রেয়ী, অহল্যা, শবরী, শূর্পণখা থেকে নিবেদিতা, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, সুভাষ, রামমোহন পর্যন্ত ব্যাপ্ত তাঁর কবিতার বিষয়। জ্যোতির্ময়ী দেবীর কবিব্যক্তিত্বের উন্মোচন কিন্তু বিস্ময়কর কোনো আবিষ্কার নয়। পৌরাণিক চরিত্রগুলিকে যদিও আধুনিক দৃষ্টিকোণে বিচার করেছেন কবিতায়, মহাপুরুষ-বিষয়ক কবিতাগুলিতে আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন, কিছু কবিতায় মনের কথা অকৃত্রিম আবেগে প্রকাশ করেছেন, কিন্তু কবিতায় ব্যঞ্জনাগর্ভ তীক্ষ্ণতা নেই, নারী-বিষয়ক কোনো কোনো কবিতাকে তাঁর গল্প-প্রবন্ধের ছন্দোবদ্ধ রূপ মনে হয়, যেমন, 'অনামিকাকে' কবিতায়—

> তুমি পাও নাই হায় অমৃতের স্বাদ
> কুড়ালে উচ্ছিষ্ট শুধু মেলেনি প্রসাদ। (খণ্ড ৩, পৃ. ৩৭৫)

বা, 'স্ফিংক্‌স' কবিতায়—

> আমরা জানি আমরা মিছে কথা বলি।
> কারণ, তোমরা সত্যি সইতে পারো না।
> তাই আমরা বলি, তোমরা মহৎ, তোমরা উদার।
> তোমরা বীর।
> আর তোমরা বিশ্বাস করো। (করো কি ?)
> এবং আমাদের খেতে-পরতে দাও, আমরা সুখে থাকি।
> আর মিছে কথা বলি, স্তবস্তুতি করি। (খণ্ড ৩, পৃ. ৩৭৬)

৬.

কিছু অপূর্ণতা, কিছু অপ্রাপ্তি, কিছু অতৃপ্তি সত্ত্বেও এই তিনটি খণ্ডের সম্পাদকদের কাছে কৃতজ্ঞ হতে হয় পাঠককে, জ্যোতির্ময়ী দেবীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাওয়ার জন্য। এখনও অগ্রন্থিত রচনাগুলির জন্য উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায় রাখবে এই পূর্বপরিচয়। এই তিনটি খণ্ডে বিধৃত জ্যোতির্ময়ী দেবীর লেখিকাজীবনের নানা সত্তা বুঝিয়ে দেয়, যদিও জ্যোতির্ময়ী দেবী সেই যুগের সাহিত্যিক, যখন মেয়েদের জন্য অজস্র বাধা জীবন ঘিরে, নারীমুক্তিবাদ এক অচেনা শব্দ ; তবু, তখনই মুক্তমনা এক নারীর জগৎ তিনি গড়ে চলেছেন তাঁর রচনায়। সেই সেকালের 'বাংলাদেশের মেয়ে' যাঁদের 'মিল হয় নি ব্যথায় আর বুদ্ধিতে/মিল হয় নি শক্তিতে আর ইচ্ছায়', তাঁদের একজন হয়েও সচেতন বলিষ্ঠতায়, জাগ্রত মনীষায় জ্যোতির্ময়ী দেবী এগিয়ে এসেছেন আমাদের বড়ো কাছাকাছি, আধুনিক মেয়েদের মনের খুব কাছে।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সংকলন ১, সম্পাদক : সুবীর রায়চৌধুরী, সহ-সম্পাদক : অভিজিৎ সেন ; প্রকাশক : দে'জ পাবলিশিং এবং স্কুল অর্ উইমেন্‌স্ স্টাডিজ্, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, কার্তিক ১৩৯৮ (নভেম্বর ১৯৯১)। মূল্য একশো টাকা।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সংকলন ২, সম্পাদক : গৌরকিশোর ঘোষ, সহ-সম্পাদক : অশোকা গুপ্ত, মঞ্জুশ্রী সিংহ ; প্রকাশক : দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৪। মূল্য একশো টাকা।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সংকলন ৩, সম্পাদক : গৌরকিশোর ঘোষ, সহ-সম্পাদক : অশোকা গুপ্ত, মঞ্জুশ্রী সিংহ, অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায় ; প্রকাশক : দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, নববর্ষ, ১৪০১ (এপ্রিল ১৯৯৪)। মূল্য একশো তিরিশ টাকা।

সুদক্ষিণা ঘোষ

সংলাপ

দরবারি চিন্তা ও আমাদের কথাপট

নবপর্যায় 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র দ্বিতীয় সংখ্যায় শ্রীদীপেশ চক্রবর্তী এজাজ় আহ্‌মদের 'ইন থিয়োরি' বইটি বিষয়ে মোটামুটি বিস্তারিত এক আলোচনা লিখেছেন। বোঝাই যায়, এ বই বিষয়ে আরও বিস্তারে লেখার অবকাশ থাকলে তাঁর আরও অনেক কিছু বলার ছিল। থাকাই স্বাভাবিক। আহ্‌মদের বই গুরুত্বপূর্ণ, সে বই নিয়ে আলোচনা তো হওয়াই উচিত। যদিও যতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে আপাতত মনে হচ্ছে, বইটি ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ কিনা এরকম একটা প্রশ্ন তোলা যেতেই পারে। আসলে কোনো বই কতটা 'গুরুত্বপূর্ণ' তারও কিন্তু অন্যনিরপেক্ষ কোনো উত্তর বোধ হয় নেই। কারণ 'গুরুত্বপূর্ণ' ব্যাপারটাও খানিকটা, অন্তত বেশ-খানিকটা দূর পর্যন্ত কিন্তু রচনা করা সম্ভব। যেমন ধরা যাক, 'পাবলিক কালচর' নামের একটি পত্রিকার অত্যন্ত শোভন এক বৃহৎ সংখ্যার গোটাটাই নিবেদিত হল একটি মাত্র বইয়ের আলোচনায়। বলা হতেই পারে, 'গুরুত্বপূর্ণ' বই বলেই তো পত্রিকার সম্পাদকেরা ওইরকম একটা সংখ্যার পরিকল্পনা করেছিলেন। ঠিক কথা। আবার এও তো ঠিক যে ওইরকম একটা সংখ্যা করা হল বলেই বইটার গুরুত্ব খানিকটা বেড়ে গেল। অর্থাৎ, 'এ বই গুরুত্বপূর্ণ'— এরকম কোনো সরল তথ্যবাক্যের বেশি অবকাশ নেই। এ বইকে কেউ কেউ গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন, আর তাই তাঁরা মনে করছেন যে এই বই নিয়ে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন, আর যতই আলোচনা হচ্ছে ততই এক অর্থে বইটার গুরুত্ব বাড়ছে। এইরকম এক ধরনের পারস্পরিকতার মধ্য দিয়েই ব্যাপারটা এগোচ্ছে। এরকম ভেবে নেওয়াই মনে হয় সংগত।

আচ্ছা, এরকম বললে কি খুব অন্যায় হবে যে এজাজের বইয়েও অনেকগুলো খুব জরুরি কথা তোলা হয়েছে, আবার দীপেশ চক্রবর্তীর সমালোচনার মধ্যেও এমন কয়েকটা প্রসঙ্গের সূত্র রয়েছে যা একটু খুঁটিয়ে ভালো করে বিবেচনা করা দরকার? যদি এরকম দুমুখো কথা বলার কোনো অবকাশ থাকে তা হলে আমাদের আলোচনা বা কথা বলার পদ্ধতি বিষয়ে একটু কথা বলে নেওয়া ভালো। সম্ভবত সব রচনার মধ্যেই একটা দ্বিরালাপ চরিত্র থাকে। অর্থাৎ, কিছু কথা বলা হয়েছে বা বলা হয়, আমার রচনায় আমি যেন সেসব কথার মোকাবিলা করছি। এর মধ্যে খুব অস্বাভাবিক কিছু নেই। আসলে সব লেখার মধ্যেই লড়াইয়ের একটা চরিত্র থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে লড়াইটা নিজেরও সঙ্গে, বা নিজেরই সঙ্গে। তবে অনেক সময়েই লড়াইয়ের প্রতিপক্ষ বাইরে থাকে। বস্তুত, বহিরঙ্গ প্রতিপক্ষ আর দ্বিরালাপের পটভূমি এই দুইয়ে মিলে একটা বিপদ তৈরি করতে পারে। বিপদটা এই যে প্রতিপক্ষের কণ্ঠে বহুস্বর ধ্বনিত হলেও তার অনেকগুলিই আমার শ্রুতির অগোচরে থেকে যেতে পারে। প্রতিপক্ষ বলেই প্রতিপক্ষীয় কণ্ঠস্বর শুনতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠি। অন্য স্বর বা নানা প্রস্বর আমাদের সমীকরণের ব্যস্ততায় হারিয়ে যেতে পারে।

এসব কথা তুলছি আমার একটা উদ্‌বেগ থেকে। আধুনিকতা, উত্তর-আধুনিকতা, মার্ক্সবাদ, কাঠামোগত চিন্তা এবং উত্তর-কাঠামোগত ভাবনা বিষয়ে যেসব কথাবার্তা উঠছে, আমি মনে করি এসব কথা খুব জরুরি। আমাদের সময়টাকে ধরবার জন্য এসব ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। দুনিয়ায় যখন খুব বড়ো বলয়ে বদলের চিহ্ন ফুটে উঠছে, তখন সেসব বদলের কিছুমাত্র হদিশ করতে গেলেও তো প্রচলিত ভাবনার মোড় ঘোরানোর দরকার হতে পারে। আর ভাবনা তো শুধু আমাদের মাথায় থাকে না, শুধুই সেখানে গড়েও ওঠে না। আমাদের কর্মের পেছনে তার উশকানি থাকে। আবার কর্মকাণ্ডের থেকে জেগে ওঠে নতুন নতুন ভাবনার ভূমিখণ্ড। এই দুইয়ে মিলে গড়ে ওঠে আমাদের জীবনযাপনের ভুবন। তত্ত্ববিশ্ব আর কর্মবিশ্বের মধ্যে তাই উঁচু করে

দেওয়াল না তোলাই ভালো। পৃথিবীটা আমি কীভাবে দেখতে চাই, আমার তত্ত্ববিশ্বে তার খবর মেলে, আর আমার কর্মবিশ্ব সাজিয়ে দেয় এই পৃথিবীর এক বিন্যাস। ফলে তত্ত্ববিশ্বের বিতর্ক পাশ কাটিয়ে যাবার জো নেই আমাদের। আমি কী খাব কী পরব কী পড়ব বা আদৌ পড়তে পাব কিনা এসব দৈনন্দিনের সঙ্গেও জড়িয়ে থাকে সমূহ দার্শনিক প্রতর্ক। তাই তো এসব কথা জরুরি। তর্কের বেনোজল ঢুকে যেন সব ঘুলিয়ে না যায়। ভুল বোঝার অবকাশ না থাকে যেন। তর্ককেই বেনোজল বলছি না কিন্তু। তর্কের মধ্যে তর্কের ঝোঁকে বেনোজল ঢুকে যায় অনেক সময়ে। কটুকাটব্যে মন চলে যায়। কেউ মূঢ় বলে, কেউ রূঢ় কথা শোনায়, আরও যা সব হয় তা অনেক সময়েই ঠিক রুচিরোচন নয়। এমনিতে তাতে যে খুব কিছু এসে যায় তা নয়, কিন্তু তর্কের কথাটাই চাপা পড়ে গেলে একটু ক্ষতি হয় বৈকি। তাই খেয়াল রাখতে হয় এই দুর্বিপাক যেন না ঘটে। শ্যাওলা পুকুরে স্নান করার মতো দুহাতে শ্যাওলা সরিয়ে রেখে ডুব দেবার জন্য খুঁজে নিতে হয় ঠিক জল। তাই আগাপাছতলা সাবধান থাকা ছাড়া গতি নেই।

বহিরঙ্গ দ্বিরালাপের ঝোঁকে আমরা অনেক সময়েই খুঁজে নিতে চাই এক প্রধান প্রতিপক্ষকে। তখনকার মতো সেই প্রধান প্রতিপক্ষের দাপটে হারিয়ে যায় অন্য সব দুশমনদের অলিগলি। এমন-কি, কখনো কখনো হয়তো অজান্তে, কখনো বা বাঁচার তাগিদে মিতালি পাতিয়ে বসি সেইসব দুশমনদের কারো সঙ্গে। তখনকার মতো চোখ বন্ধ করে থাকি, মনে ভাবি আপাতত এই প্রতিপক্ষকে তো ঘায়েল করে নিই, তখন ভাবা যাবে ছোটোখাটো বিপদআপদের কথা। কিন্তু খেয়াল রাখি না যে ইতিমধ্যে হয়তো আমারই মিতালির সঞ্জীবনীতে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠেছে সেইসব দুশমনদের কেউ কেউ। তখন আবার সেদিকে নজর ঘুরিয়ে নতুন করে প্রধান প্রতিপক্ষ বেছে নিয়ে খেলা সাজাতে শুধু সময় লাগে তা-ই নয়, বিশ্বাসের ভিত টলে যায়, নিজেরও ভেতরে এবং বন্ধুদের মধ্যেও। এই কি আমাদের সাম্প্রতিক রাজনীতির অন্তত আংশিক ইতিহাস নয়? শ্রীদীপেশ চক্রবর্তী তাঁর প্রতিপক্ষের বি.জে.পি.-আতঙ্ক বিষয়ে ঠিকই লক্ষ করেছেন যে, তাঁদের তত্ত্ববিশ্বে অনেক কিছুই, বা হয়তো সবই, এখন নির্ধারিত হচ্ছে বি.জে.পি.-নিরিখে মেপে নিয়ে। গোলমালটা হচ্ছে যে এতে করে অনেক প্রস্বর হয়তো হারিয়ে যাচ্ছে। 'প্রধান প্রতিপক্ষ'-এর রাজনীতিতে এমন হতেই পারে।

দীপেশবাবু যেভাবে তাঁর তত্ত্ব-অবস্থান থেকে কথা বলছেন তাতেও কি একটু এই একই বিপদ এসে পড়ছে না? আপাতত সাব্‌অলটার্ন-পক্ষভুক্ত তিনি দরবারি মার্ক্সবাদের মোকাবিলা করছেন। তিনি যাকে দরবারি মার্ক্সবাদ বলছেন তার মোকাবিলার প্রয়োজন বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। আমার দ্বিধা শুধু ভঙ্গি নিয়ে। তত্ত্বভঙ্গির কথা বলছি। তিনি তো নিজেকে সাব্‌অলটার্ন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হিসেবে দেখছেন। সেটা এক পক্ষ। আর প্রতিপক্ষ হল দরবারি মার্ক্সবাদ। এই দরবারি নামটা বেশ বেছেছেন তিনি। তবে এই নামকরণের পেছনে দিল্লির অনুষঙ্গ খুব সম্ভব তাঁর মনে কাজ করেছে, সম্ভবত তিনি একটু বেশি দিল্লিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন, নইলে আরও কি একটু পেছিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না? মোদ্দা কথাগুলোতে এবং ধরনধারণে অন্তত প্রায় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক পর্যন্ত? তা হলেই ও.আই.এম.— অফিসিয়াল ইন্ডিয়ান মার্ক্সিজমও যেমন হতে পারত, তেমনি হতে পারত অফিসিয়াল ইনটারন্যাশনাল মার্ক্সিজমও। আর তা হলেই হয়তো দেখা যেত যে 'মার্ক্সবাদ' তার জীবনচরিতের বিভিন্ন তত্ত্বমুহূর্তে এরকম বিভিন্ন প্রধান প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। অ্যানার্কিজ্‌ম, পপুলিজ্‌ম, সোশ্যাল ডিমোক্রেসি, এ সবই ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে, বিভিন্ন দেশে 'মার্ক্সবাদ'-এর বিভিন্ন প্রধান প্রতিপক্ষের নাম। স্নায়ুযুদ্ধের পৃথিবীতে অস্তিত্ববাদের সঙ্গে তার যে-সংঘর্ষ তা যেমন স্মরণীয় তেমনি তার মধ্যে আমাদের শিক্ষণীয়ও অনেক কিছু আছে। এমনি ধরনের শিবিরবিভক্ত সংগ্রামে শিবিরের সীমারেখা বড়ো বেশি পরিষ্কার দাগে টানা হয়। তাতে আমাদের অভ্যাস ও মানসিক প্রবণতাগুলি সন্দেহ ও অবিশ্বাসে জীর্ণ হয়ে পড়ে। অন্য কণ্ঠস্বরকে শুধুই সন্দেহ করতে শিখলে আমরা খুব দ্রুত পৌঁছে যাই বিরোধীপক্ষের সঙ্গে কখনো ফাসিবাদের, কখনো সাম্প্রদায়িকতার, কখনো বিচ্ছিন্নতাবাদের সমীকরণে। কিন্তু সবই যে এত সহজ ও স্নিগ্ধ তা হয়তো নয়। মার্ক্স-এর তত্ত্ব প্রসঙ্গে সার্ত্র্-এর পরিণতি ও দেরিদার সাম্প্রতিক মার্ক্স-বিষয়ক বইয়ের

কথা তো আমাদের খেয়াল রাখাই উচিত। আমাদের আরও ঘনিষ্ঠ তত্ত্ব-আবহে আমরা 'মার্ক্সবাদ' ও 'গান্ধিবাদ'-এর সংঘাতের চেহারা দেখেছি। প্রধান প্রতিপক্ষের সন্ধান করতে গিয়ে আমরা কোনো তরফেই অন্য পক্ষের অন্য কণ্ঠস্বর শোনবার চেষ্টা করি নি। আর তাতে জাতীয় জীবনে তো আমাদেরই ভোগান্তি।

অন্য কণ্ঠস্বর শুনতে বা খুঁজে নিতে চাইলে এজাজের বইয়ের একটা প্রসঙ্গ থেকে আমরা হয়তো আরও কিছুটা ফসল আদায় করতে পারি। দীপেশবাবুও সে প্রসঙ্গ শুরুতেই ছুঁয়েছেন, কিন্তু মনে হয় শ্যাওলার আড়াল এসে বাধা দিল। নির্বাসনের প্রশ্ন। খুব জরুরি প্রশ্ন কোনো সন্দেহ নেই। এজাজের বইয়ে প্রসঙ্গটিকে যে-গুরুত্বে স্থাপন করা হয়েছে তার জন্য আমাদের সাধুবাদ তাঁর প্রাপ্য। তাঁর নিজের তোলা প্রশ্নের পরিধি হয়তো যথেষ্ট বিস্তৃত নয়। তাতে কী? কথাটা ধরে আমাদের কথা বাড়াবার বাধা কোথায়? যে-সব লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবী দেশের স্বৈরাচারের দাপটে দেশচ্ছিন্ন তাঁরা তো নির্বাসিত, কিন্তু শুধু তাঁরাই কি? নির্বাসন কি শুধুই কোনো ভৌগোলিক ধারণা? বিশেষ করে আজকের পৃথিবীতে? পশ্চিম-কেন্দ্রিক জীবনযাপন শিক্ষাদীক্ষা বিলাসব্যসন চিন্তার ধাঁচধোঁচ ও রচনাপদ্ধতি পর্যন্ত আজ যে পৃথিবীতে এক অদৃশ্য কেন্দ্রশাসিত সেখানে নির্বাসনের অর্থ জটিল হতে বাধ্য। দীপেশবাবু তো সেই 'অত্যন্ত সচ্ছল' শিকড়-প্রোথিত মানুষের জবানিতে বাহিরে অন্তরে নির্বাসনের প্রশ্ন তুলেওছেন। ভারতীয় মার্গসংগীতের অনধীন অস্তিত্বের কথা বলেছেন তিনি। এসব কথা খুব জরুরি। আর একটু এগোলেই তো আমরা সেই চেহারা ছুঁতে পারি যেখানে নির্বাসনের জন্য দেশচ্ছিন্ন হতে হয় না, বিদেশ বিভুঁয়ে না গিয়েও নির্বাসিতের অভিশাপ বহন করে যেতে হয় প্রায় অজান্তে। অন্তরে বাহিরে আমি কতটা পরবাসী সেই তো আমার নির্বাসনের মানদণ্ড। আমাদের শিক্ষাধারা? আমরা যে যত 'উচ্চশিক্ষিত' সে কি প্রায় ততটাই নির্বাসিত নই? আমার জীবন থেকে, আমার সংস্কৃতির বিভিন্ন উপচার থেকে? আমাদের প্রচলিত শিক্ষার ধরনে 'শিক্ষিত' হতে গিয়ে আমি কি নিজেরই চার পাশে উঁচু করে দেওয়াল তুলি না? আর সেই দেওয়ালের আড়ালে দিনে দিনে রচনা করে তুলি আমার ক্রমাগত পালানোর ইতিবৃত্ত। আমার আন্তর্জাতিকতার গায়েও কখনো লেগে থাকে সেই পালানোর দাগ। এর থেকে পরিত্রাণ, সেও এক লড়াইয়ের কথা। জীবন ও সমাজ-ইতিহাসের বিন্যাসে যতক্ষণ আমার পালানোর প্রশ্রয় থাকছে ততক্ষণ নিরন্তর লড়াই ছাড়া গতি কী? জগাইয়ের রূপককে ঘুরিয়ে নিয়ে সদর্থক অর্থেও তো পড়তে পারি আমরা। জগাইয়ের প্রতিপক্ষে আছে সাত জার্মান, জগাই একা লড়ে। জগাই কোনো প্রধান প্রতিপক্ষ বেছে নেয় নি। সপ্তরথীর মার বলেই জগাইয়ের লড়াই আরও জটিল। আমাদের লড়াইও কিন্তু বেশ জটিল। 'দরবারি' মার্ক্সবাদীরা হয়তো অনেক সময়ে ছবি সরল করে এঁকে নেবার চেষ্টা করেন। তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভালো যে ছবির হিসেব অত সোজাসাপটা হয়তো মিলবে না। কিন্তু তাঁদের প্রতিপক্ষে যাঁরা দাঁড়াবেন তাঁদেরও কথায় নানা স্বর যেন ধরা পড়ে। অনেক কথাই কিন্তু শুনতে না চাইলে শোনা যাবে না। আর তাতে আমাদের কথার বুনোট তেমন ঘন হবে না। পরতে পরতে নানা স্বরে নানা কথা সাজাতে পারলে গড়ে তোলা যাবে এক কথাপট। এই জটিল সময়ে এমনি এক পটরচনাই তো হতে পারে আমাদের এক কাজ।

দীপেশবাবু তো ঠিকই লিখেছেন, 'আক্রমণটা বড়ো কথা নয়, কী নিয়ে তর্ক সেইটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।' আক্রান্তের অভিমানে আমরা যেন সে কথা ভুলে না যাই। আমাদের তো সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতাও এড়িয়ে চলতে হবে, আবার সাংস্কৃতিক সমতাও পাশ কাটাতে হবে। আমরা সব বৈশিষ্ট্যকে, সব ভিন্নতাকে কি একাকার হয়ে যেতে দিতে পারি? পালানো নয়, আড়াল রচনা করাই হতে পারে আমাদের এক ধরনের প্রতিরোধ। হয়তো চাই ভাষারও নতুন ইডিয়ম।

সৌরীন ভট্টাচার্য

দরবারি চিন্তা : কিছু সংশয়

বিশ্বভারতী পত্রিকায় (নবপর্যায় ২) প্রকাশিত শ্রীদীপেশ চক্রবর্তীর 'এজাজ় আহ্‌মদ, দরবারি চিন্তা ও একটি সাম্প্রতিক বিতর্ক' পড়ে কয়েকটি সংশয় জেগেছে, সেগুলি জানাতে চাই।

দীপেশ তাঁর লেখায় আপত্তি জানিয়েছেন, তাঁরই ভাষায় যাঁরা 'দরবারি মার্ক্সবাদী' তাঁদের বিরুদ্ধে। এই দরবারি মার্ক্সবাদীদের তিনি আবার 'দিল্লিস্থিত' বলে চিহ্নিত করেও দিয়েছেন। তাঁর মতে এঁদের মার্ক্সবাদ আক্রমণাত্মক। আক্রমণাত্মক হওয়াটাই অপরাধ কিনা, তা নিয়ে তো প্রশ্ন উঠতেই পারে। বিতর্কেরও একটা সাধারণ নিয়ম তো প্রতিপক্ষের যুক্তি বা কুযুক্তিকে আক্রমণ করা। তবে দীপেশ বলতে চান, এজাজ় আহ্‌মদের ক্ষেত্রে সেই আক্রমণের মূল লক্ষ্য দক্ষিণপন্থীরা নন— অর্থাৎ এজাজ় বামপন্থীদেরই আক্রমণ করতে চেয়েছেন। সেই বামপন্থী কারা ? এডওয়ার্ড সইদের বক্তব্য কী ঘোরতর প্রাচ্য মরমীয়াবাদের নেশায় আচ্ছন্ন, তা কি দীপেশ জানেন না ? তিনি নিজেই তো সইদের 'ওরিয়েন্টালিজ়ম' সম্পর্কে এজাজ়ের আলোচনাকে মনোনিবেশযোগ্য বলেছেন। আর সলমন রুশদি ! ইরানের ধর্মগুরুদের মৌলবাদী মানসিকতাজাত রুশদির প্রাণদণ্ডের ফতোয়া নিঃসন্দেহেই ঘৃণার্হ, রুশদির পক্ষে দাঁড়ানোও প্রয়োজন, কিন্তু তাতেই রুশদি বামপন্থী হয়ে যান না, বা সমালোচনার ঊর্ধ্বে উঠে যান না। বিশেষত 'স্যাটানিক ভার্সেস'কে তো যথেষ্টই সন্দেহজনক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রচনা মনে হয়। এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে এন্‌লাইটেন্‌মেন্ট, যুক্তিবাদ, পাশ্চাত্য আধুনিকতা ইত্যাদিকে প্রত্যাখ্যান করে কোথায় পৌঁছোন যায়, তার একটা বড়ো উদাহরণ কি খোমেইনির ইরান নয় ? দীপেশ অবশ্য খারিজ বা প্রত্যাখ্যানের কথা বলেন না, বলেন বিচারের কথা, কিন্তু বিচার থেকেই খারিজে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থেকে যায়, যথেষ্ট সতর্ক না থাকলে।

এজাজ় বা তাঁর সমগোত্রীয় অর্থাৎ দরবারি মার্ক্সবাদীদের সম্পর্কে দীপেশের আপত্তি— এই মার্ক্সবাদ নৈতিক অধঃপতন বিচার করে বেড়াতে চায়, 'তার মুখ স্বভাবতই ক্ষমতার দিকে ফেরানো।' এই দুই-এর সংযোগকে দীপেশ যেরকম স্বতঃসিদ্ধ ভেবেছেন, তা সত্যি কিনা সন্দেহ। 'নীতিবায়ুগ্রস্ত' হওয়াটা সমীচীন নয়, কিন্তু নৈতিক অধঃপতনকে চিহ্নিত করাই কি আপত্তিকর ? কাকে বলা হবে নৈতিক অধঃপতন, সে-বিষয়ে এজাজ়দের মতই মেনে নিতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু নৈতিক অধঃপতন বিচারের ধারণাতেই দীপেশ যদি আপত্তি জানান, তা হলে তো কোনো ধরনের নীতি বা মূল্যবোধেরই প্রয়োজন থাকে না, বাতিল হয়ে যায় আদর্শ এবং আদর্শবাদ। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে নীতি বা মূল্যবোধ বদলাতেই পারে ; দীপেশ সে-প্রসঙ্গ না তুলে নৈতিক অধঃপতন বিচার করতে চাওয়াকেই অপরাধ বলে গণ্য করেছেন। আর যেহেতু বিচার করতে চাওয়াটা অপরাধ, তা হলে তো সে-অপরাধে 'দরবারি' মার্ক্সবাদীরাই শুধু নয়, সাবঅলটার্ন ধারণাও সমান অপরাধী হয়ে পড়ে— দীপেশ কি তা মানবেন ?

এজাজ় আহ্‌মদের রচনার হয়ে সাফাই গাইতে চাওয়া হচ্ছে না। মার্ক্সবাদীদের তাত্ত্বিক রচনা বহুসময়েই দলীয় কর্মসূচির আদলে রচিত হয়েছে, বহুসময়েই সেখানে দ্বান্দ্বিক বিচারের বদলে মোটা রেখায় সাদা-কালো ভাগ করার প্রবণতা দেখা গেছে, ফলে একধরনের অসহিষ্ণুতাও দেখা গেছে— এইসব প্রবণতা নিশ্চয়ই সমালোচনার যোগ্য। কিন্তু সংশয় জাগছে দীপেশের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। মার্ক্সবাদের পুনরুজ্জীবনের প্রশ্নে এজাজ় আহ্‌মদ ফিরে যেতে চান পার্টির মার্ক্সবাদের পরিচিত ভাষায়, এই বলে দীপেশ 'শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব' সম্পর্কে বিরাগ দেখিয়েছেন। শ্রেণীসংগ্রামের ধারণা কি তবে বাতিল ? শ্রেণীও কি বাতিল ? যদি শ্রেণীবিভেদ থাকে, তা হলে তাদের সম্পর্ক কী ? শ্রেণী ও শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব বাতিল হলে এর পর কি ফুকুইয়ামা-র পথ ধরে বাতিল হবে ইতিহাসও ? অবশ্য শ্রেণীসংগ্রামের প্রয়োজন যদি হয় ক্রমশ উন্নততর সমাজের দিকে যাওয়ার জন্য, তা হলে ভুল ভাবা হবে, কেননা 'ইতিহাসে এমন কোনো সাক্ষ্য নেই যে সমাজ ভালো হবে।... ইতিহাসে কোনো সাক্ষ্য নেই যে পৃথিবী উন্নততর হবে : একটা political desire to improve the world is a

defiance of history'— এ কথা দীপেশই বলেছেন 'নাইয়া' পত্রিকার বৈশাখ-আশ্বিন ১৪০০ সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর কথাবার্তায়।

দীপেশ অভিযোগ করেছেন, দরবারি মার্ক্সবাদের আত্মসমীক্ষার অভাব নিয়ে। এডওয়ার্ড সইদ বা নেহরুর রচনায় 'we' বা 'আমরা'-র ব্যবহার নিয়ে এজাজের সমালোচনার পাশেই এজাজ় নিজেও 'our literary traditions' ইত্যাদি বলেন। সেখানে এই 'we' কারা, দীপেশ বুঝতে চেয়েছেন। সেই প্রসঙ্গেই এজাজের ব্যবহৃত 'our canonical nationalism নিয়ে দীপেশ প্রশ্ন করেছেন। এখানে আনুশাসনিক জাতীয়তাবাদ-এর আধিপত্যবিস্তারকামী মনোভাবকে 'our' বলে বিশেষিত করে এজাজ় যে কোনো দায়ের অংশীদার হতে চান, সেই সততায় সম্ভবত দীপেশ বিশ্বাস করেন না। তবে দীপেশ যখন 'আমরা আত্মীয়তায়, সংগীতে... এমন অনেক মনোভাব ও সামাজিক সম্পর্ক প্রকাশ করি' বা 'আমাদের রাগরাগিণীর তত্ত্ব' ইত্যাদি বলেন, তখন এই 'আমরা' কারা তা নিয়ে প্রশ্ন করা যাবে কি ?

সে যাই হোক— আনুশাসনিক জাতীয়তাবাদের প্রসঙ্গে দীপেশ এজাজ় আহ্‌মদ বা দরবারি মার্ক্সবাদীদের মতবাদকে কংগ্রেসি জাতীয়তাবাদের সমতুল্য বলে চিহ্নিত করেছেন। এই মতবাদ মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগঠনের সংগ্রামকে অবৈধ বলে উড়িয়ে দিতে চায়— সে-কারণেই এই মতবাদ ভারতীয় জাতিরাষ্ট্রের স্বার্থে নিযুক্ত একটি দৃষ্টিভঙ্গি মাত্র— এইরকম অভিযোগ করেছেন দীপেশ। মনোলিথিক নেশন-স্টেটের ধারণা স্পষ্টতই শাসক শ্রেণীর স্বার্থে তৈরি, এ-ব্যাপারে দীপেশের সঙ্গে একমত হওয়া চলে। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রগঠনের দাবিকে বৈধ বলে মানা হবে কোন্ যুক্তিতে ? পাকিস্তানের দাবিতে আদৌ কোনো সংগ্রাম হয়েছিল কি না, সে-প্রশ্ন নাহয় বাদই দিচ্ছি, এই রাষ্ট্রগঠনের বৈধতার প্রশ্নটিই জরুরি। স্বাধীনতা-আন্দোলনের একটা বড়ো অংশে হিন্দুত্বের প্রভাব, দীর্ঘকাল ধরে মুসলিমদের উপর নিপীড়নের নানা ইতিহাস ইত্যাদি সত্ত্বেও ধর্মের ভিত্তিতে জাতিপরিচয় নির্ধারণ ও তারই জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগঠনের দাবি কি সত্যি যুক্তিসংগত ? পৃথিবীর নানা প্রান্তে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রগঠনের দাবি তা হলে মেনে নিতে হয় ; মেনে নিতে হয় হিন্দুরাষ্ট্রের দাবিকেও। ধর্ম তা হলে জাতির বিকল্প, সামাজিক-রাষ্ট্রিক পরিচয় হিসেবে— জাতিরাষ্ট্রের বিকল্প তা হলে ধর্মরাষ্ট্র। সেই ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টির বৈধতা মেনে নিলে পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে এসে বাংলাদেশ তৈরির বৈধতা কীভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে ? আর বাংলাদেশ-এর জন্য সংগ্রামকে বৈধ বলে মেনে নিলে পাকিস্তান সৃষ্টির বৈধতা কি সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে যায় না ? ধর্ম ও জাতীয়তাকে গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা নানাস্তরেই হয়। বস্তুত সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের অন্যতম চেষ্টাই তাই— কাশ্মীরিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জনের লড়াইকে তাই মৌলবাদীরা ব্যবহার করতে চায় ইসলামি বিজয়ের লক্ষ্যে, অন্য দিকে 'ঐক্য-ফেরি-করা' মনোলিথিক নেশন-স্টেটের প্রবক্তারা, তাদের সংবাদমাধ্যম ও অন্যান্য অনুচররাও এই লড়াইকে চিহ্নিত করতে চায় মুসলিমদের জঙ্গিপনা বলে। এই ফাঁদ কাজেও দেয়— প্যালেস্টাইনের মুক্তিসংগ্রামে তাই বারেবারেই মুসলিম মৌলবাদীরা প্রাধান্য পেয়ে যায়। দীপেশ কি সেই বৈধতার পক্ষপাতী ? মুসলিম, খ্রিস্টান, হিন্দু— না নাগা, কুকি, বালুচ, কাশ্মীরি— কোন্ পরিচয়কে মানতে চান দীপেশ ? দরবারি মার্ক্সবাদের বিপরীতে যাত্রা করে শেষ পর্যন্ত দীপেশ পৌঁছে যান ধর্মের আঙিনায়।

এখানে এসে যায় স্বদেশিয়ানার প্রশ্নটিও। তার আগে দু-একটি ব্যাপার বোধহয় একটু স্পষ্ট করে বুঝে নেওয়া দরকার। কারও রচনা বা মতামতকে কেউ যদি নিজের সুবিধামতো বিচ্ছিন্নভাবে, উলটে-পালটে বা একটু বদলে ব্যবহার করে তা হলে তার দায় নিশ্চয়ই সেই রচনাকারের নয়। কিন্তু কারও রচনায় বা মতামতেই যদি থেকে যায় কোনো বিপদের বীজ, তবে ? 'আনন্দমঠ'-এ যে বিপদের বীজ ছিল তার দায় বঙ্কিমের উপর বর্তায় বৈকি। তেমনি নীট্‌শে এই শতকের গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক, সে তো এই অর্থেই যে তাঁর রচনা তৈরি করে দিয়েছিল ফ্যাসিবাদের দার্শনিক ভিত্তি। দীপেশ নীট্‌শের গুরুত্ব একটু বেশি বাড়িয়ে দেখতে চান মনে হয়। তেমনি স্বদেশিয়ানার ব্যাপারে ইয়োরোপীয় এন্‌লাইটেন্‌মেন্ট যুক্তিবাদের সমালোচনায় যদি এমন ঝোঁক দেখা যায় যা স্বদেশের মুখ খোঁজার নাম করে, শিকড় খোঁজার নাম করে আঁকড়ে ধরতে চায় এমন-সব উপাদানকে, যা

কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, আর সামন্ত-ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত ? এই ঝোঁকটি সম্প্রতি খুবই প্রবল— সামাজিক রীতিনীতির ব্যাখ্যায়, শিল্পসাহিত্যের আলোচনায়। সিনেমার আলোচনায় [illegible]শিস রাজাধ্যক্ষরা যা করেন, ঋত্বিকের ছবির ব্যাখ্যা দিয়ে যার শুরু, তা পৌঁছে যায় গভীর অতলে, যেখানে শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় সংস্কারের অন্ধকার ছাড়া আর কিছু থাকে না। এই ধারায় এডওয়ার্ড সইদকে বাদ দিলে সব থেকে বিপজ্জনক সংযোজন বোধহয় রুস্তম ভারুচা। তাঁর 'দ্য কোশ্চেন অব ফেইথ্'-এ তিনি রামলীলা আর কুম্ভমেলাকে কেন্দ্র করে বিশ্বাসীদের জগৎকে বোঝার যে আবেদন জানিয়েছেন, তা আসলে মেনে নেওয়ার আবেদন। রুস্তম সময়ের পরিবর্তনকে স্বীকার করেন না, কোনো একদিন যা মানুষের আশ্রয় হয়েছিল, আজও সেই আশ্রয়ের বিশ্বাসকে যৌক্তিক বলে প্রতিপন্ন করতে চান। আর এটা কি শুধুই কাকতালীয় যে রুস্তম বার বার তাঁর সমর্থন খোঁজেন সাবঅলটার্ন ঐতিহাসিকদের রচনায় ?

এন্‌লাইটেন্‌মেন্টের বিচার প্রসঙ্গে দীপেশ অবশ্য গান্ধির কথা না তুললেই পারতেন। ইয়োরোপীয় যুক্তিবাদকে গান্ধি কি বিচার করেছিলেন, না খারিজই করেছিলেন ? তিনি তো জোর দিয়েছিলেন বিশ্বাসেরই উপর। কলকারখানার বিরোধী গান্ধি এমন-কি, বই-পড়ার ব্যাপারেও প্রশ্রয় দিতে চান নি— রাধারমণ মিত্রের সবরমতী আশ্রমের অভিজ্ঞতা তো তাই বলে। তা ছাড়া পাশ্চাত্য থেকে মুখ ঘুরিয়ে গান্ধি কি আশ্রয় খোঁজেন নি ধর্মে ? এমন-কি, কুসংস্কারেও ? ব্যক্তিক সদিচ্ছা যাই থাক না কেন, রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে যুক্ত করায় গান্ধির দায় কিছু কম নয়। তাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক গোঁড়ামি রাজনীতিতে প্রতিফলিত হয়েছে— তার ফল পরবর্তীকালে ফলেছে।

ইয়োরোপীয় আধুনিকতার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দীপেশ দু-একটি সরলীকৃত মন্তব্য করেছেন। যেমন : সত্তরের দশকে নাকি 'যে-ক্যাটিগরির সাহায্যে আমরা "গণতন্ত্র" বা "সমাজতন্ত্র" বা "ধনতন্ত্র" জাতীয় বিমূর্ত সামাজিক সম্পর্কগুলি চিন্তা করতে পারি, সেগুলিকে স্বতঃসিদ্ধ ব'লে ধরে নেওয়া হত। তাই কি ? ষাটের শেষে ও সত্তরের প্রারম্ভেই তো ভারতীয় রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র নিয়ে নানা প্রশ্ন ওঠে, 'আধা-সামন্ততন্ত্র' বা অন্যান্য জটিলতার কথা শোনা যায়। আবার এই সময়েই তো ইয়োরোপীয় এন্‌লাইটেন্‌মেন্টের ছাপ উনিশ শতকের যে তথাকথিত রেনেসাঁসে, তা নিয়ে নানা অস্বস্তিকর প্রশ্ন তোলা হয়। আর সত্তরের দশকে নানাভাবে চীনের বিপ্লবের অভিজ্ঞতা ও মাও-চিন্তাধারার প্রভাব ছিল, দীপেশ নিজেই তো বলেছেন 'মতাদর্শগত আধিপত্য-বিষয়ক চিন্তার ক্ষেত্রে অবশ্য ষাটের দশকের মাওবাদের কিছু অবদান ছিল।'(দীপেশ অবশ্য মাও-চিন্তাধারা বলেন না, বলেন মাওবাদ)। এ ছাড়া মধ্যবিত্তের দোদুল্যমানতা, জমিদারের শোষণ, মহাজনের সুদ, এইসব কথাবার্তাকে দীপেশ যেন একটু ব্যঙ্গ করতেই চেয়েছেন। এগুলো কি ইতিহাসচর্চায় কোনো বিবেচ্য উপাদানই নয় ? সাবঅলটার্ন ইতিহাসচর্চাও কি এগুলি বাদ দিয়েই এগোতে পারে ?

কৃষকচৈতন্যের কথা এসেছে। সেখানেও কোনো সরলীকরণ সম্ভব নয়, আদিবাসী সমাজ আর হিন্দু-মুসলিম কৃষকসমাজের বিন্যাস, সমস্যা, ধ্যানধারণায় বহু তফাত। দ্বন্দ্ব অন্যত্রও। উনিশশতকের আলোকপ্রাপ্তরা যেমন ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে সহজে মোহমুক্ত হতে পারেন নি, তেমনি পীর-ফকিরদের মোহ থেকে মুক্ত করতে গিয়ে তিতুমীর পীর হয়ে যান, বিরসা হয়ে যান ভগবান। আবার অন্য দিকে ১৮৫৭-র বিদ্রোহের সৈনিকরা বাহাদুর শাহকে বরণ করে নেয় নেতৃত্বে। এগুলি ইতিহাসের সত্য। কিন্তু সেই দ্বন্দ্ব নিরসনের চেষ্টা কী করে সম্ভব— যুক্তিবাদের প্রয়োগ ছাড়া ? পুরোনো সমাজ থেকে বয়ে-আনা ডাইনি-বিশ্বাস, ওঝা, ঝাড়ফুঁক— এসবের বিরুদ্ধে লড়াই-এর পদ্ধতিটা কী হবে ? এখানে দীপেশ আবার কৃষকসন্তানের ভারতীয় নাগরিক হয়ে-ওঠার প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন করেছেন। এই প্রক্রিয়া 'ভারতীয় ধনতান্ত্রিক শোষণ ও শহুরে মধ্যবিত্তের জাতীয় জীবনে হিগেমনি বাড়াবার প্রক্রিয়া'— কিন্তু এই প্রক্রিয়াকে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব কি ? এখানেও তৈরি হয় আরেক ধরনের দ্বান্দ্বিকতা। (দ্বন্দ্ব, দ্বান্দ্বিকতা— এসব আবার দরবারি মার্ক্সবাদের বুলি নয় তো ?)। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে দীপেশ বিচারযোগ্য মনে করেন পাশ্চাত্য মডেলকেই— অর্থাৎ মার্ক্সবাদীদের পরিভাষায়

যা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সৃষ্টি। দীপেশ অন্য কোনো বিকল্প মডেলের কথা ভাবেন না, তাঁর মনে পড়ে না চীনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা। এতেও কি একধরনের ইয়োরোপ-আচ্ছন্নতাই ধরা পড়ে না ? আবার ইয়োরোপীয় আলোকপ্রাপ্তির ইতিহাসকে তিনি ফুকো-দেরিদার সাহায্যে বোঝার সুপারিশ করেন। কেউ ফুকো-দেরিদা পড়তেই পারেন, কিন্তু ইয়োরোপীয় এন্‌লাইটেন্‌মেন্ট, যুক্তিবাদ, আধুনিকতাকে বোঝার তাগিদটা যদি হয় ভারতীয় সমাজের ইতিহাসে তার ভূমিকাকে বোঝার জন্য, সে ক্ষেত্রে ফুকো-দেরিদার সহায়তা কেন জরুরি ? কেন তার বদলে ভারতীয় আধুনিকত্বের ধারণা তৈরির চেষ্টা হবে না ? সম্প্রতি বিভূতিভূষণের উপন্যাস থেকে এই ভারতীয় আধুনিকত্বের আদর্শ খোঁজার চেষ্টা তো কেউ কেউ করেছেন। তাতে অবশ্য ইয়োরোপীয় সংযোগ বা ভারতীয় জীবনে তার অভিঘাতকে এড়ানো যায় না।

দীপেশের প্রবন্ধ প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় মন্তব্যেও এই দেশজ আধুনিকতার পথ খোঁজার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সেখানে যে কৌমসমাজ, আদিবাসী সমাজের কথা বলা হয়েছে, তার চেহারাও তো বদলে গেছে অনেকটাই।* সামাজিক বিবর্তন, রাজনৈতিক লড়াই-এর অভিজ্ঞতার পাশাপাশি প্রত্যন্ত গ্রাম-অঞ্চলে ভিডিও-র অনুপ্রবেশ তো ধাক্কা দিচ্ছে সমাজ কাঠামোকেই— ফলে বদলে যাচ্ছে ধ্যানধারণা, মূল্যবোধ, সেই সমস্যাটা মনে রাখা খুব জরুরি।

ইয়োরোপীয় অভিজ্ঞতা বাদ দিয়ে চলার উদাহরণ হিসেবে দীপেশ ভারতীয় মার্গসংগীতের কথা তুলেছেন। কিন্তু মার্গসংগীতও কি এক অর্থে দরবারি নয় ? দীপেশের কৃষকচৈতন্যে কি এর কোনো জায়গা আছে ? তা হলে আমাদের রাগরাগিণী কাদের রাগরাগিণী, কোন্ 'আমাদের' ? দীপেশ লোকসংগীতের কথা কিন্তু তোলেন নি।

দীপেশ একবার মার্ক্সবাদের পুনরুজ্জীবনের কথা বলেছেন, আরেকবার বলেছেন 'আমাদেরই সংগ্রাম করে এমন মার্ক্সবাদ তৈরি করতে হবে...'। দুটো কি এক— না পরস্পরবিরোধী ?

দিল্লিস্থিত দরবারি মার্ক্সবাদীদের প্রতি দীপেশের বিরাগ বেশ প্রকট। দীপেশ অভিযোগ করেছেন, এঁরাও বিশেষ সুবিধাভোগী অর্থাৎ পাশ্চাত্যে যাতায়াতের সুযোগপ্রাপ্ত। তা সে-অভিযোগ তো অনেকের বিরুদ্ধেই করা যায়। এজাজ্-এর দেওয়া তথ্য-অনুযায়ী তাঁর ভারতে জন্ম নেওয়া, উর্দুতে কবিতা লেখা ও পাকিস্তানে বড়ো হওয়ার প্রসঙ্গে দীপেশ অভিযোগ করেছেন যে এজাজ্ তাঁর আমেরিকায় অধ্যাপনার দীর্ঘ ইতিহাস চেপে গেছেন। বইটি এজাজের আত্মজীবনী নয়, তাই সব তথ্য জানানোর দায় তাঁর ছিল না। আর এই ইতিহাসটি প্রয়োজনীয় হত যদি এজাজের চিন্তাভাবনার বিকাশে তার কোনো ভূমিকা থাকত। তা না হলে কে আমেরিকায় পড়িয়েছেন, কে অস্ট্রেলিয়ায় পড়ান, তা জানার বা জানানোর বাধ্যতা কী ?

সব্যসাচী দেব

---

* কৌমসমাজ বদলায় না, বদলায় নি, এমন অলীক ধারণা আজ কেই বা লালন করেন ?—সম্পাদক

প্রামাণিক ইংরেজি-বাংলা অভিধানের দিকে

নবপর্যায় বিশ্বভারতী পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী -সম্পাদিত ইংরেজি-বাংলা অভিধানের সমালোচনাটি পড়লাম। অশোক মুখোপাধ্যায়ের লেখা এই সমালোচনা পড়ে কয়েকটি কথা মনে এল।

প্রায় আশি বছর আগে, একটি ইংরেজি-বাংলা অভিধান সংকলন করেছিলেন চারুচন্দ্র গুহ : *The Modern Anglo-Bengali Dictionary* (1916)। কয়েক প্রজন্ম ধ'রে আমাদের ইংরেজি-ভাষাচর্চায় এই অভিধানটি এক প্রামাণিক আকরগ্রন্থ হিসেবে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী যেমন তাঁর অভিধানটি *Oxford Advanced Learner's Dictionary* (OALD, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৩)-কে অনুসরণ করে লিখেছেন, চারুচন্দ্র গুহ তাঁর অভিধানটি লিখেছিলেন মূলত *Concise Oxford Dictionary* (COD, প্রথম সংস্করণ, ১৯১১)-কে অনুসরণ ক'রে। আজ এই মূলগত প্রশ্নটি তোলার দরকার আছে : আমাদের ইংরেজি-বাংলা অভিধানের মডেল হিসেবে কোন্‌টা বেশি গ্রহণযোগ্য ? OALD আর COD ছাড়াও, আরও কয়েকটি ভালো ইংরেজি অভিধান প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য : *Collins Cobuild English Language Dictionary* (CCELD, ১৯৯২) এবং *Longman Dictionary of Contemporary English* (LDCE, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৯)। COD আর OALD-র নবতর সংস্করণও পরিবর্তিত-পরিবর্ধিত চেহারায় উপস্থিত। এর মধ্যে কোনো একটিমাত্র অভিধান কি আমাদের ইংরেজি-বাংলা অভিধানের মডেল হিসেবে গৃহীত হতে পারে ?

আমার বিবেচনায়, বাংলাভাষী লেখক-পাঠক-অনুবাদক আর ইংরেজি-শিক্ষার্থীর বিশেষ প্রয়োজনের কথা ভেবে, ইংরেজি-বাংলা অভিধানের একটি মডেল আজকের অভিধান-সংকলককেই তৈরি করে নিতে হবে। এ ব্যাপারে কোনো একটি ইংরেজি অভিধানকে হুবহু অনুকরণ করা বিধেয় নয়। ইংরেজি-বাংলা অভিধানের এই নিজস্ব মডেলটি নির্ধারণ করতে হলে, অভিধানকারকে বিশেষভাবে দেখতে হবে এই তিনটি অভিধান : OALD (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬৩), COD (পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৬৪) এবং LDCE (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৯)। তুলনায় OALD (চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৮৯) বা COD (অষ্টম সংস্করণ, ১৯৯০) বা CCELD (১৯৯২)-কে ইংরেজি-বাংলা অভিধানের আদর্শ হিসেবে আমার তেমন গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না, যদিও দরকারমতো এই অভিধানগুলোর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। OALD (চতুর্থ সংস্করণ) বা COD (অষ্টম সংস্করণ) বা CCELD-র তুলনায় OALD (দ্বিতীয় সংস্করণ), COD (পঞ্চম সংস্করণ) আর LDCE (দ্বিতীয় সংস্করণ) কেন অনুসরণযোগ্য, সে কথা একটু বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করছি। ইংরেজি-বাংলা অভিধানের পাঠক হবেন সাধারণ শিক্ষিত বাঙালি, কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞরা নন। ইংরেজি নিয়ে যাঁরা উচ্চতর পড়াশোনা করবেন, তাঁরা অবশ্যই OALD (চতুর্থ সংস্করণ), COD (অষ্টম সংস্করণ), CCELD, *The Shorter Oxford English Dictionary*, OED ইত্যাদি সবকটি অভিধান খুঁটিয়ে দেখবেন। ইংরেজি-বাংলা অভিধান-সংকলকের লক্ষ্য হবে, যেন সাধারণ শিক্ষিত পাঠক তাঁর অভিধান পড়ে যে-কোনো ইংরেজি লেখা বুঝতে পারেন, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে উৎসাহিত হন। ইংরেজি-বাংলা অভিধানকে হতে হবে সহজবোধ্য। কিন্তু OALD (চতুর্থ সংস্করণ) বা COD (অষ্টম সংস্করণ) বা CCELD-তে শব্দের এত বেশি ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে, এত বেশি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, ব্যাকরণ ও প্রয়োগ -সংক্রান্ত নির্দেশ এত বেশি টেকনিক্যাল আর বিস্তারিত যে পাঠক বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। একটা উদাহরণ দিলে কথাটা হয়তো পরিষ্কার হবে : OALD (দ্বিতীয় সংস্করণ)-এ **get** শব্দের ১৯টি অর্থ দেওয়া হয়েছিল এবং ১১ নং অর্থে ছিল সমস্ত phrasal verbs। OALD (চতুর্থ সংস্করণ)-এ **get** শব্দের মোট ২১ অর্থ দেওয়া হয়েছে ; এ ছাড়া **get**-সম্পর্কিত phrasal verbs-এর অর্থ দেওয়া হয়েছে পৃথকভাবে। ওই ২১টি অর্থকে আবার ৬টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা : (a) Receiving or Obtaining, (b) Reaching or bringing to a particular state or condition, (c) Making something happen, (d) Reaching

the point where one does something, (e) Moving or causing to move, (f) Other meanings। এই যে এতগুলি শ্রেণীবিভাগ, এত বেশি অর্থ ও দৃষ্টান্ত, এতে কি ইংরেজি-শিক্ষার্থী বিদেশী ছাত্রের সত্যিই বেশি সুবিধে হয়? বিশেষ করে যখন এই শ্রেণীবিভাগ সর্বদাই খুব যুক্তিসংগত নয়। যেমন : ওপরের (c)-সংখ্যক শ্রেণীতে একটি দৃষ্টান্ত-বাক্য দেওয়া হয়েছে : *Can you really get that old car going again?* এই বাক্যটি কেন (b)-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবে না, সেটা বোধগম্য নয়। COD থেকেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে। COD-র পঞ্চম সংস্করণে **beautiful** শব্দটির অর্থনির্দেশ করা হয়েছে এভাবে :

> **beautiful** – a. Delighting the eye or ear, gratifying any taste, (~*face, voice, poem, picture, soup, batting*); morally or intellectually impressive, charming, or satisfactory (~ *patience, organization, specimen*). Hence ~ LY^2 adv. [BEAUTY + FUL]

অষ্টম সংস্করণে আছে :

> **beautiful** /ˈbju:tɪfʊl/ *adj.* 1. delighting the aesthetic senses (*a beautiful voice*). 2. pleasant, enjoyable (*had a beautiful time*). 3. excellent (*a beautiful specimen*) □□ **beautifully** *adv.*

এখানে 1, 2, 3 সংখ্যা দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু । আর 3 নম্বর অর্থের মধ্যে পার্থক্য কোথায়, প্রদত্ত দৃষ্টান্ত থেকে সেটা স্পষ্ট নয়। এই শ্রেণীবিভাগ পাঠককে সাহায্য করার চেয়ে বিভ্রান্ত করছে বেশি।

CCELD-তেও এই একই অতিরেক চোখে পড়বে। বরং LDCE (দ্বিতীয় সংস্করণ)-এ একধরনের যুক্তিসংগতি লক্ষ করা যায়। এই দুই অভিধানের **get** ভুক্তির তুলনা করলেই সেটা বোঝা যাবে।

শব্দকোষ-সংকলকের কাছে দাবি করব : পরিমিতিজ্ঞান, ভারসাম্যের বোধ। ঠিক এই গুণটি ছিল ফাউলর সাহেবের চরিত্রে। সেটা তাঁর অভিধানের মধ্যেও ধরা পড়েছে। আমরা যারাই COD-র পঞ্চম সংস্করণ পড়েছি, তারাই আবার উৎসাহিত হয়েছি ফাউলর-এর *Dictionary of Modern English Usage* পড়তে। তাতে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আমাদের আগ্রহ আরও উদ্দীপ্ত হয়েছে। COD-র অষ্টম সস্কেরণে বৈজ্ঞানিক শব্দের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ও লিখনভঙ্গির নৈর্ব্যক্তিকতা, ইংরেজি ভাষার প্রতি আমাদের অনুরাগ আর আগ্রহকে সেভাবে উদ্দীপ্ত করে না।

পরিমিতি ও ভারসাম্যের বোধ চারুচন্দ্রের অভিধানেরও বৈশিষ্ট্য। এর অন্য বৈশিষ্ট্য : এক বিস্তীর্ণ পরিসর। সাধারণ পাঠক, ভাষাশিক্ষার্থী, লেখক, অনুবাদক, সকলেরই পক্ষে সুগম অথচ এক সমৃদ্ধ আকর এই শব্দকোষ। বাস্তবিক, শব্দকোষ-সংকলনের প্রয়োজনে আমাদের ভাষাসংস্কৃতিকে চারুচন্দ্র কীভাবে মন্থন করেছিলেন, একটা উদাহরণ দিলে তার আভাস পাওয়া যাবে।

> **Cipher, cypher,** -*n.,v.i.&t..* 1. The arithmetical character 0 ; শূন্য অঙ্ক। 2. A nonentity, নগণ্য ব্যক্তি, সাক্ষীগোপাল। 3. Any Arabic numeral ; a figure ; ১, ২, ৩ প্রভৃতি যে-কোন সংখ্যা ; অঙ্ক। 4. Interlaced initials of person, company etc ; কোন সম্প্রদায় বা ব্যক্তির নামের জড়িত আদ্যক্ষর সমূহ। 5. A secret writing ; গূঢ়লিপি, গূঢ়াক্ষর, গুপ্তলিপি। *Verb i.* To do sums in arithmetic; পাটীগণিতের অঙ্ক কষা। 2. To calculate, গণনা করা। *Verb t.* To put into secret writing ; গুপ্ত অক্ষরে লিপিবদ্ধ করা।

এখানে এই 'সাক্ষীগোপাল' শব্দটির প্রয়োগ কী লক্ষ্যভেদী!

চারুচন্দ্রের অভিধানের একটি মহৎ গুণ : প্রচুর প্রতিশব্দ। প্রতিশব্দের এই সম্ভার আমাদের অনুবাদচর্চায় কাজে লাগছে দীর্ঘ দিন ধরে ; আর তাই একাধিক প্রজন্মের অনুবাদক চারুচন্দ্রের কাছে ঋণী। কিন্তু শুধু সেই কারণেই তাঁর অভিধান-রচনার এই বৈশিষ্ট্যের প্রশংসা করছি না আমি, আসলে এই-যে বহুতর বাংলা প্রতিশব্দ দিয়ে এক-একটি ইংরেজি শব্দের অর্থনির্ণয়ের প্রয়াস, একে বলতে পারি : দুই ভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে সেতুবন্ধনের চেষ্টা। বাস্তবিক, অনেক ইরেজি শব্দ আছে, বাংলায় যার মানে এককথায় বলে দেওয়া দুরূহ। কারণ ইংরেজি শব্দে নিহিত আছে অন্য ইতিহাস, এক ভিন্নতর জীবনধারা।

ঠিক এই কারণে বাংলাভাষী ইংরেজি-শিক্ষার্থী সচরাচর কয়েকটি বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হন। ইংরেজি-বাংলা অভিধান-সংকলকের এ-বিষয়ে সজাগ থাকা প্রয়োজন। একটা দৃষ্টান্ত দিলে, বাঙালি ছাত্রের এই বিশেষ সমস্যার দিকটি স্পষ্ট হবে। বাঙালিরা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই 'সুন্দর' বিশেষণটা প্রয়োগ করেন। কিন্তু সুন্দর বলতে ইরেজিতে handsome, beautiful, pretty, attractive, lovely ইত্যাদি একাধিক শব্দ আছে। এদের অর্থপার্থক্য বাঙালি পাঠককে স্পষ্ট করে বোঝানো দরকার। কোনো ব্যক্তির চেহারার সৌন্দর্য বোঝাতে handsome, pretty, good-looking বা attractive-এর চেয়ে beautiful অনেক বেশি জোরালো। Beautiful ও pretty নারী, শিশু ও বস্তু সম্বন্ধে ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু পুরুষ সম্বন্ধে সাধারণত ব্যবহৃত হয় না। যথা : a beautiful girl / house, a pretty child / picture। Handsome সাধারণত পুরুষ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়, বস্তু সম্পর্কে নয়। Attractive সকলের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হয় ; যথা : an attractive young man / an attractive pattern। Lovely সাধারণত পুরুষের সৌন্দর্য সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয় না। এই শব্দগুলোর প্রয়োগের এইসব পার্থক্য আমরা এই শব্দগুলোর যে-কোনো একটির প্রসঙ্গে বুঝিয়ে দিতে পারি। একইভাবে, roof - ceiling, live - stay - dwell - reside - inhabit প্রভৃতি একজাতীয় শব্দগুচ্ছের অর্থপার্থক্য ইংরেজি-বাংলা অভিধানে যথাসম্ভব স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।

আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে। ইংরেজি-বাংলা অভিধানে শব্দার্থের সঙ্গে অনেক ছবিও থাকা প্রয়োজন। ছবি আর লেখা যেন হয় পরস্পরের পরিপূরক। চারুচন্দ্র গুহ প্রাণীবাচক আর বস্তুবাচক বহু শব্দের অর্থ বোঝাবার জন্য প্রচুর ছবি ব্যবহার করেছিলেন। তবে ছবিগুলো তেমন ভালো ছাপা হয় নি। সিদ্দিকী সাহেব তাঁর অভিধানে কোনো ছবি দেন নি। সেটা এই অভিধানের একটা বড়ো ত্রুটি।

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী শব্দার্থের ক্ষেত্রে OALD থেকে প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন, যেটা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। অনুবাদ করতে গিয়ে কী বিভ্রাট হয়েছে অশোকবাবু তা দেখিয়েছেন। চারুচন্দ্র গুহ COD-কে অনুসরণ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু আক্ষরিক অনুবাদ করেন নি।

সাধারণত ইংরেজি-বাংলা অভিধানে শব্দের ব্যুৎপত্তি দেওয়া হয় না। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীও দেন নি। কিন্তু আমার তো মনে হয়, সংক্ষেপে ব্যুৎপত্তি দিলে শুধু বিশেষজ্ঞ কেন, সাধারণ ভাষা-শিক্ষার্থীও উপকৃত হবেন। এ-থেকে ভাষার অন্তর্নিহিত চরিত্র সম্পর্কে ধারণা বাড়ে ; এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার, এক সংস্কৃতির সঙ্গে অন্য সংস্কৃতির, এক মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য মানবগোষ্ঠীর পার্থক্য আর সংযোগের বোধ জন্মায়।

ইংরেজি-বাংলা অভিধানে উচ্চারণ-নির্দেশের পদ্ধতি নিয়েও ভাববার আছে। সিদ্দিকী সাহেব তাঁর অভিধানে International Phonetic Alphabet (IPA) ব্যবহার করেন নি। তিনি বাংলা হরফের সাহায্যে একটি বিকল্প পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। কিন্তু IPA ব্যবহার না ক'রে শুধুমাত্র এই বিকল্প পদ্ধতির প্রয়োগ কতদূর সমীচীন, সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। IPA-ই উচ্চারণ-নির্দেশের পক্ষে প্রকৃষ্ট বর্ণমালা— IPA-তে আছে প্রত্যেক ধ্বনির জন্য একটিমাত্র বর্ণ, প্রত্যেক বর্ণের জন্য একটিমাত্র ধ্বনি। পৃথিবীর সমস্ত উন্নত দেশেই অভিধানে উচ্চারণ-নির্দেশের জন্য IPA ব্যবহৃত হয়। কিছুকাল আগেও অক্সফোর্ড অভিধানগুলোতে IPA ব্যবহৃত হত না ; কিন্তু বর্তমানে অক্সফোর্ড-এর সবরকম অভিধানেই একমাত্র IPA-ই ব্যবহৃত হচ্ছে। ইংরেজি-বাংলা

অভিধানে এখন কিছুদিন একইসঙ্গে IPA আর বাংলা অক্ষরের সাহায্যে উচ্চারণ-নির্দেশ করা যেতে পারে, যতদিন না বাঙালি পাঠক IPA-তে অভ্যস্ত হন। তবে, সিদ্দিকী সাহেবের উদ্ভাবিত পদ্ধতি বাঙালি পাঠক যদি রপ্ত করতে পারেন, IPA আরত্ত করাও তাঁদের পক্ষে কঠিন হবে না।

আসলে এসব প্রশ্নের মীমাংসা শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে আছে অন্য একটি প্রশ্নের ওপর : আমরা ইংরেজি শিখব কী উদ্দেশ্যে ? ইংরেজি আজ এক বিশ্বভাষা। এই বিশ্বভাষা আমরা আয়ত্ত করব শুধু ব্যবসায়িক, রাজনৈতিক স্বার্থে ? শুধুই টেকনোলজি আমদানি করার গরজে ? কম্পিউটার-ম্যানুয়াল রপ্ত করার জন্যে ? বহুজাতিক কোম্পানির এগ্‌জিকিউটিভ বানানোর তাগিদে ? 'কেজো' স্বার্থসিদ্ধির চৌহদ্দির মধ্যে আমাদের ইংরেজিচর্চাকে সীমাবদ্ধ রাখা হয়তো খুব কাজের কথাও নয়। আমাদের ইংরেজি-জ্ঞান যেন খুলে দিতে পারে বিশ্বজনীন সংস্কৃতির প্রবেশদ্বার। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানদর্শন শিল্পসংস্কৃতির মহাভোজে আমরা যেন যোগ দিতে পারি। ইংরেজি-বাংলা অভিধান-সংকলক যেন অবান্তর অনুপুঙ্খের জটিলতায় এই মানবিক পরিপ্রেক্ষিত হারিয়ে না ফেলেন।

ইংরেজি-বাংলা অভিধানের একটি বড়ো সমস্যা : পরিভাষার সমস্যা। আমাদের পরিভাষার জগতে একটা নৈরাজ্য চলছে। নানান লেখক নানান পারিভাষিক ব্যবহার করছেন। আবার বহু শব্দের যথার্থ প্রতিশব্দ তৈরি হয় নি ; বিশেষ করে জীবজন্তু, পাখি, কীটপতঙ্গ, গাছপালা ও ফুলের বৈজ্ঞানিক নাম, ভূতত্ত্বের, সমাজবিজ্ঞানের বহু পারিভাষিক শব্দের, সর্বজনগ্রাহ্য বাংলা প্রতিশব্দ আজও তৈরি হয় নি। পরিভাষার এই দৈন্যে আমাদের চিন্তাভাবনার দৈন্যই শুধু প্রতিফলিত হয়। আমাদের উচিত, শীঘ্রই একটি পরিভাষা-সমিতি গঠন করা, যে সমিতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কারিগর-প্রযুক্তিবিদ-গ্রন্থপ্রণেতা, সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে একটি পরিভাষাকোষ প্রণয়ন করবেন। অবশ্যই সমিতির পরিভাষা সকলের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে না ; কিন্তু একটা নির্ভরযোগ্য পরিভাষাকোষ থাকলে কালক্রমে পরিভাষাজগতের দৈন্য ও নৈরাজ্য দূর হবে, সমতা ও শৃঙ্খলা আসবে।

চারুচন্দ্র গুহ তাঁর অভিধানে পরিভাষা-সংকলনের কাজ অনেকটা এগিয়ে দিয়েছেন। তাঁর সমকালে বাংলায়, এমন-কি হিন্দিতেও, যত-কিছু পরিভাষা রচিত হয়েছিল, তার সমস্তই, ঐকান্তিক নিষ্ঠায় তিনি সংকলন করেছিলেন তাঁর অভিধানে। তাঁর পরিভাষা-সংকলনের নীতি আমরা অনুসরণ করতে পারি।

কোনো অভিধানই এখন আর একজন ব্যক্তির পক্ষে সংকলন করা সম্ভব নয়। তাই, শুধু পরিভাষা কেন, ইংরেজি-বাংলা, বাংলা-ইংরেজি, বাংলা-বাংলা ইত্যাদি সবরকম অভিধান সংকলনের জন্য আমাদের উচিত উপযুক্ত সংগঠন প্রস্তুত করা এই সংগঠন অভিধান প্রণয়ন করবেন এবং প্রয়োজনমতো সংশোধন ও পরিবর্ধন করবেন ; সংশোধন-পরিবর্ধন নিরন্তর চলতে থাকবে, কারণ ভাষা এক নিত্য-পরিবর্তনশীল প্রবাহ।

পিনাকী মিত্র

সুব্রহ্মণ্যন্‌-এর সাম্প্রতিকতম ম্যুরাল

রামন শিব কুমার

স্থান : কলাভবন, ডিজ়াইন বিভাগের বাড়ি, অঙ্কন-কাল : ১৯৯০-১৯৯৩,
চার দেওয়াল জোড়া টানা দৈর্ঘ্য : ৩২২০ সেন্টিমিটার, উচ্চতা : ৫৯২ সেন্টিমিটার

একটি গোটা বাড়ির চার দিক জুড়ে এই ম্যুরালটি এঁকেছেন কল্পাতি গণপতি সুব্রহ্মণ্যন্। ছবিটির উচ্চতাও বাড়িটির উচ্চতার সমান। দূর থেকেই এই ম্যুরালের বলিষ্ঠ বিন্যাস নজর কাড়ে আমাদের ; আবার কাছে এসে খুঁটিয়ে দেখলে, গাছপালা পশুপাখির স্পন্দিত চিত্রকল্প আমাদের মনকে আকৃষ্টও করে, জাগিয়েও তোলে। ক্রমে ক্রমে টের পাই, এর গোটা গড়নে নানান বিপরীতের টানাপোড়েন : স্থাপত্যের সঙ্গে চিত্ররূপের ; বিমূর্ত নকশার সঙ্গে বিমিশ্র চিত্রকল্পের ; বিমূর্তরীতির সঙ্গে সাদৃশ্যসন্ধানী উপস্থাপনার (রিপ্রেজ়েন্টেশন)।

ইমারতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছবিটি আঁকেন নি শিল্পী ; বরং স্থাপত্যের মামুলিপনার সঙ্গে তিনি যেন দ্বন্দ্বেই নেমেছেন। ইমারতের সৌষ্ঠবহীন গড়নকে এই ম্যুরাল মুড়ে দেয় এক ঝলমলে কিংখাবের মতন। ফলে, বাড়িটা সমস্ত শরীর দিয়ে ধরে রাখে পরিকীর্ণ, বিচ্ছুরিত, স্পন্দমান প্রকৃতির প্রতিবিম্ব। আবার, কালোর ওপর সাদা চিত্রকল্পগুলি (যদিও আসলে সাদার ওপর কালোয় আঁকা) ফোটোগ্রাফ-নেগেটিভ-এর সাদা ছায়ামূর্তির মতো গূঢ়তর এক বাস্তবতারও প্রতিরূপ। তারা অবিরত ইঙ্গিত দিতে থাকে ইট-সিমেন্ট-কংক্রিটের বেহদ্দ বৃদ্ধিতে ধ্বস্ত প্রকৃতির দিকে ; পরিবেশ-ধ্বংসের দিকে। এইসব চিত্রকল্প আমাদের মনে করিয়ে দেয় : প্রকৃতির এই অপসারণের জন্যে দায়ী আমাদেরই বেহেড স্থাপত্যবিস্তার। এই কথা টের পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থাপত্যের সঙ্গে এই ম্যুরালটির দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে দেখতে পাই এক নতুন মাত্রায়।

নিসর্গকে বিষয়বস্তু করে আগেও তো শান্তিনিকেতনে কত ম্যুরাল আঁকা হয়েছে। সেইসব ম্যুরালের সঙ্গে সুব্রহ্মণ্যনের এই ছবিটির সম্পর্কের মধ্যে নিহিত আছে সূক্ষ্ম আইরনির ব্যঞ্জনা। নন্দলাল আর বিনোদবিহারীর সে সমস্ত কাজের থিমই হচ্ছে শান্তিনিকেতনের নিসর্গপটের রূপান্তর : এক ঊষর, রিক্ত নিসর্গে সবুজের বর্ণাঢ্য সঞ্চার। এই-যে সবুজায়নের প্রক্রিয়া, হয়তো এরই অন্তর্নাট্য দেখতে পাই পাঠভবনের বারান্দায় নন্দলাল-কৃত ম্যুরালে ('খোয়াই') আর কলাভবন হস্টেলের ছাদে বিনোদবিহারীর কাজে। কলাভবনে সুব্রহ্মণ্যনের নিজেরই বালিতে-সিমেন্টে-ঢালাই ম্যুরালটিকে বলা যায়, সেই পরিবেশ গড়ে তোলার প্রাক্-ইতিহাস। প্রতিতুলনায়, এই সাদা-কালো ম্যুরালটি তর্জনী-সংকেত করছে সাম্প্রতিক পরিস্থিতির দিকে : আমাদের দ্বারা নিত্য-অনুষ্ঠিত পরিবেশ-ধ্বংসের দিকে। এক দিকে এই অভিজ্ঞতা আঞ্চলিক ; অন্য দিকে এ তো এক আবিশ্ব সংকটের অঙ্গ। তবে, আমরা কিছুতেই ভুলতে পারি না, এই তো সেদিন অবধি শান্তিনিকেতনই ছিল পরিবেশ-ধ্বংসের ওই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে এক প্রতিরোধ-কেন্দ্র।

এই ম্যুরালের অনেকটাই আঁকা হয়ে যায় ১৯৯০ সালের গ্রীষ্মে। তবে দক্ষিণ দেওয়ালের উপর-দিকের এক-তৃতীয়াংশ আর গোটা উত্তর দেওয়ালটি চিত্রিত হয় ১৯৯৩ সালের গ্রীষ্মকালে। উত্তর দেওয়ালের ছবিতে অন্য-এক প্রসঙ্গে চলে গেছেন শিল্পী। এখানে ছবির বিষয় হয়ে উঠেছে : প্রাকৃতিক পরিবেশ নয়, সামাজিক পরিবেশ। এই উত্তর দেওয়ালের কেন্দ্রীয় চিত্রকল্প হচ্ছে : দুই অর্ধমানব অর্ধপশুর যুযুধান মূর্তি। ছবিতে ওই বন্দুকধারী মহিষ-মানবের দিকে ব্যাঘ্র-মানবীটি তীরবেগে ছুঁড়ছে : অজস্র ফুল। ফলে, যুদ্ধ হয়ে উঠছে লীলা ;

ঘৃণার রূপান্তর ঘটছে পূর্বরাগ-নৃত্যে। ম্যুরালের এই দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজের জন্যে শিল্পী যখন তৈরি হচ্ছিলেন, তখন দেশজুড়ে জ্বলে ওঠে উন্মাদ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ। বিজয়ী দেবতাদের প্রচলিত মূর্তির এই যে অন্তর্ঘাত দেখছি এই ম্যুরালে, এ তো সেই সময়েরই পরোক্ষ প্রতিচ্ছায়া ; সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবের বিরুদ্ধে শিল্পের ভাষায় এক তির্যক প্রতিবাদ।

কী প্রাকৃতিক পরিবেশকে, কী সামাজিক পরিবেশকে নিরন্তর সংরক্ষণ আর সংবর্ধন করে যেতে হয়। শান্তিনিকেতনের আদি-যুগের ইতিহাস এই প্রযত্নের এক বৃত্তান্ত। আর সেই উদ্যোগে শিল্পকলার ছিল খুবই বড়ো ভূমিকা। নন্দলাল বুঝেছিলেন, শিল্পকে সাধারণ্যে ছড়িয়ে দেওয়া কত জরুরি। বুঝেছিলেন, শিল্প তো শুধুই ব্যক্তিগত সৃজনক্রিয়া নয় ; বৃহত্তর-মহত্তর আরও অন্য-কিছুও বটে। নন্দলালের সঙ্গে সুব্রহ্মণ্যনের অনেক পার্থক্য আছে ঠিকই, কিন্তু নন্দলালের এই পরিপ্রেক্ষিত-বোধের তিনিও শরিক। এই ম্যুরালে অবশ্যই শিল্পীর ব্যক্তিগত বোধ আর দৃষ্টিভঙ্গি অভিব্যক্ত ; তবে, এর রূপায়ণে সহশিল্পীদের যৌথ কাজের— সহযোগের— প্রশস্ত অবকাশও রেখেছিলেন তিনি। আবার এই ম্যুরালটি উনি এঁকেওছেন এমনভাবে যাতে নানান স্তরের দর্শকের চোখে-মনে এর আবেদন পৌঁছোয়। লোকায়ত ম্যুরালের সঙ্গে এই কাজটির মিল আছে বিস্তর। তার একটি হল : লোকায়ত ম্যুরালের মতন এই কাজটিও দীর্ঘস্থায়ী শিল্পকর্ম হিসেবে আদৌ পরিকল্পিতই হয় নি। সুব্রহ্মণ্যন্ বিশ্বাস করেন : শিল্পবস্তুর অমরত্ব নয়, সৃষ্টিক্রিয়াই আরও বড়ো কথা। অতীতকে আগলে রাখা নয়, সৃষ্টিশীলতার প্রবাহকে অব্যাহত আর মুক্ত রাখাই আরও জরুরি। তাঁর এই মনোভঙ্গির ছাপ পড়েছে এই ম্যুরালে।

অনুবাদ : সৌমিক নন্দী মজুমদার

সম্পাদকীয়

এই সংখ্যার প্রথম রচনায় শান্তিনিকেতনের শিল্প-আন্দোলনের ক্রিটিক বা বিচার পেশ করছেন সুব্রহ্মণ্যন্ আর সে-বিচারের সঙ্গে সংগতি রেখে হাজির করছেন এমন এক কর্মসূচি, যা আজকের সংকটের মোকাবিলা করতে পারে। গদ্যের ভাষায় এই প্রবন্ধে তিনি যা বলছেন, কলাভবনে তাঁর সাম্প্রতিক ম্যুরালে সে-কথাই তিনি বলছেন ছবির ভাষায়। আশা করব, দীর্ঘ দিনের ভাবনা বোধ আর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা তাঁর এই প্রতিপাদ্য আমাদের মননকেও জাগিয়ে তুলবে, আবার আমাদের উশকে দেবে হাতেকলমে কাজ করারও দিকে। বস্তুত, তিনি আলোচনার ছেদ টানছেন এই ডাক দিয়ে : '...আমরা যদি আমাদেরই কাজের এক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারি, তা হলে নিজের জন্যেও কিছু করা হয়, অন্যের জন্যেও কিছু করা হয়।'

আমরা এই সংখ্যায় গুচ্ছবদ্ধ করলাম কয়েকটি বিশেষ রচনা যার কেন্দ্র হচ্ছে : ইন্টারপ্রিটেশন। ভাষ্য। সংগত কারণে এই বিষয়টি এখন আন্তর্জাতিক দর্শন সমাজবিজ্ঞান আর সাহিত্য-সমালোচনায় আলোড়ন তুলছে। কী এই ইন্টারপ্রিটেশন ? চলতি কথায় যাকে বলি, মানে বোঝা, পড়া আর বোঝা বা বোঝাপড়া, তাকেই পণ্ডিতি ভাষায় বলব, ভাষ্য। এখানে 'বোঝা' শব্দটির এতবার আবৃত্তি থেকে টের পাওয়া যায়, বোঝার প্রক্রিয়াই ভাষ্যের অন্তঃসার। ভাষ্যের সঙ্গে ব্যাখ্যার মিল আছে বিস্তর। তবে দার্শনিকরা এ দুয়ের মধ্যে এই একটা তফাত করেন : ব্যাখ্যা নৈর্ব্যক্তিক হতে পারে, ভাষ্য তা নয় ; ভাষ্যে বিষয়ী স্বয়ং, অর্থাৎ ভাষ্যকার নিজে, নিত্য-হাজির। তাই ব্যাখ্যা নিরঞ্জন ; ভাষ্যে কল্পনা আর দরদ অনুপ্রবিষ্ট।

জগৎকে বোঝাপড়ার এই সমস্যা নিয়ে আধুনিকোত্তর দর্শন অনেক প্রশ্ন তুলছে, অন্তর্ঘাতী প্রশ্ন। 'নির্মাণ থেকে বিনির্মাণ'-এ সেই প্রশ্নাবলির একটি সংবদ্ধ পটভূমি রচনা করেছেন শেফালী মৈত্র। নির্মাণ থেকে শুরু করে বিনির্মাণ অবধি ছড়িয়ে রয়েছে দর্শনভাবনার একটি দেশ ; এ রচনা মূলত তারই জরিপ। আরও যথার্থ হয় যদি বলি : এই জরিপ তুলে ধরল পশ্চিমের যুক্তিকেন্দ্রিক দর্শনের যাত্রাপথ।

যা অনির্দেশ্য তার সঙ্গে এই বোঝাপড়ার সমস্যা নিয়ে লিখেছেন মিহির চক্রবর্তী। নতুন ধরনের দর্শনচর্চার যে-বইটির আলোচনা উপলক্ষে তিনি যুক্তিবিস্তার করছেন, সেইটে হল অমিতা চট্টোপাধ্যায়ের *Understanding Vagueness*। মিহির চক্রবর্তী গণিতবিদ যুক্তিবিশারদ মানুষ। স্বভাবত এই উপাদেয় তথ্যটুকু তাঁর নজর এড়ায় নি : বইখানির শিরোনামে ওই যে দুটি শব্দ— *Understanding* আর *Vagueness*— এই দুটিই অনির্দেশ্য, ঝাপসা !

ভাষ্য পর্যায়ের আরও দুটি রচনা (ব্যাপক অর্থে প্রায় সব লেখাই তো ভাষ্য !) এই সংখ্যায় রইল। তার একটিতে 'আরণ্যক' উপন্যাসটিকে শিশিরকুমার দাশ পড়ছেন সম্পূর্ণ নতুনভাবে। অন্যটিতে ঋত্বিকের একটি ছোটোগল্প— 'আকাশগঙ্গার স্রোত ধরে'— আর একটি ফিল্ম— 'নাগরিক'— রয়েছে শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টির কেন্দ্রে ; যদিও এই রচনায় পাঠক পেয়ে যাবেন ঋত্বিকের গোটা শিল্পজগৎকেই নতুন পথে পরিভ্রমণের এক অভিজ্ঞতা।

+ + +

বাঙালি হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান পাল-পার্বণ নিয়ে যা লেখাপত্র আছে, সেসব লেখা পরিমাণেও খুব কম নয়, আর, ভাগ্যক্রমে, তা লিখেওছেন নির্মলকুমার বসু, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী বা ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতন যোগ্য লেখকরা। কিন্তু বাঙালি মুসলমানের লোকাচার নিয়ে আলোচনা দুর্লভ, বিশেষত বাঙলায় এ-বিষয়ে লেখা তো এখন প্রায় চোখেই পড়ে না। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে চার বছর ফিল্ড ওয়ার্ক ক'রে মার্কিন নৃতাত্ত্বিক লিনা এম. ফ্রুজেট্টি বাঙালি মুসলমান-সমাজের একটি লোকাচার আর মহরম নিয়ে যে-প্রবন্ধটি লেখেন, তা প'ড়ে তাই ঈর্ষা-মেশানো আক্ষেপের সঙ্গে কতবার ভেবেছি : আমরা কবে আমাদেরই সংস্কৃতির কথা এমন ক'রে জানব, বুঝব, লিখব? এই যে একটা মস্ত বড়ো ফাঁক আমাদের সংস্কৃতিচর্চায় ছিল, তা পূরণের সম্ভাবনা খুলে দিচ্ছে একরাম আলির লেখাটি।

কত জরুরি এই কাজ! আজকাল তো মনে হয়, হিন্দু আর মুসলমান সমাজের মধ্যে দেওয়াল হয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে অপরিচয়ের ব্যবধান। অথচ কুবির কবিদার (১৭৮৭-১৮৭৯) বা গোঁসাই গোপাল-এর (১৮৬৯-১৯১২) মতন লৌকিক পদকারের গানে ইসলামের সঙ্গে যে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের সাক্ষ্য পাই, তা থেকে অনুমান করা যায়, সেকালে হয়তো একটা স্তরে ওই অপরিচয়ের দেওয়াল এতটাই নীরন্ধ্র ছিল না। বাঙালি মুসলমানের ধর্ম আর ক্রিয়াকরণ কুবির-গোপালের নখদর্পণে না-থাকলে, গানে গানে শাস্ত্রীয় ধর্মের যে তীক্ষ্ণ বিচার ওঁরা করেছেন, তা কি আদপে সম্ভব হত? মফস্বলের সাধারণ্যে শ্রমে আর বিশ্রামে, ঈদে আর অম্বুবাচীতে, মেলায় আর দরগায়, দুই সমাজের মধ্যে ওই সহজ জানাশোনার প্রবাহ না-থাকলে, গ্রামীণ শ্রোতারা সে বিচার-গানের মানেই বা বুঝতেন কী করে, তার এত কদরই বা করতেন কী করে? অতীতে পরিস্থিতি ঠিক কেমন ছিল, তা নিশ্চয় ঐতিহাসিকরাই বলবেন, কিন্তু একালে হিন্দু সমাজ আর মুসলমান সমাজ পাশাপাশি থাকে না, থাকে পিঠোপিঠি— এ কথা তো মর্মান্তিক সত্যি। অপরিচয়ের ওই দেওয়ালটা ধ্বসে পড়তে খুব বেশি সময় লাগবে না, যদি একরাম আলির ধরনের সংস্কৃতিজিজ্ঞাসায় আরও বহু সন্ধানব্রতী লেখক শামিল হন। আচার-অনুষ্ঠানের এই বিবরণ-সংকলনের কাজ সম্পূর্ণতার দিকে এগোলে, অন্তত এক দিক দিয়ে, পারস্পরিক পরিচয়ের সেই সহজ প্রবাহ খুলে যাবে আর আমরা চাক্ষুষ দেখতে পাব, বহুতর অমিল সত্ত্বেও, বাঙালি হিন্দু আর বাঙালি মুসলমানের সংস্কৃতিগত মিল কত গভীর। একটা উদাহরণ দিই। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী আঁতুড়ের যে-বিবরণ দিয়েছেন, তার সঙ্গে একরাম আলির বৃত্তান্ত যেই মিলিয়ে পড়ি, তখনই প্রত্যক্ষণে ঝলক দিয়ে ওঠে বাঙালি সংস্কৃতির ওই অন্তঃশীল ঐক্য। আজকের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পটভূমিতে এই প্রত্যক্ষণ বড়ো জরুরি।

আরেকটা কথা। ধর্মের সঙ্গে জড়ানো আচার-অনুষ্ঠান উৎসব-পার্বণ একদা নৃতত্ত্বেরও উপেক্ষিত ছিল। গোড়ার দিকে এই বিষয়টিকে এড়িয়েই চলতেন নৃতাত্ত্বিকরা। এমন-কি, প্রাজ্ঞ মর্গ্যান (১৮১৮-১৮৮১), যিনি নৃতত্ত্বচর্চার একজন পথিকৃৎ তিনিও 'এন্‌শেন্ট সোসাইটি'-তে (১৮৭৭) লেখেন : 'কল্পনা আর আবেগের সঙ্গে ধর্ম এত বেশি সম্পৃক্ত, আর সেই কারণে জ্ঞানের এমন সব অনিশ্চিত উপাদানের সঙ্গে তার যোগ, যে, সমস্ত আদিম ধর্মই কিমাকার ['গ্রটেস্ক' !] আর... বুদ্ধিরও অগম্য।' নৃতত্ত্বের এই উন্নাসিক মেজাজ প্রশ্রয় পায় এন্‌লাইটেন্‌মেন্ট-এর সর্বাত্মক প্রতিপত্তি থেকে। তার পর মনোবিজ্ঞানের বিকাশ আর নৃতাত্ত্বিক ফিল্ড ওয়ার্কের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই মেজাজ ক্রমশ পালটায়।

তবে, 'কল্পনা আর আবেগের সঙ্গে ধর্ম এত বেশি সম্পৃক্ত'— মরগ্যানের এই কথা তো অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। ঠিক এই কারণেই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান লেখক-পর্যবেক্ষকের কাছে দাবি করে : কল্পনা আর দরদ। যে-দুটি গুণের খামতি নেই একরাম আলির রচনায়। সেই গুণ, এলেম, আছে বলেই তো তিনি আবহমানের রূপকথার সঙ্গে অন্তর্যোগের নকশা বুনে তোলেন পুরুষানুক্রমিক লোকাচারের। আর এই লেখার গুণেই রূপময় হয়ে ওঠে লোকাচারের কথা।

বাঙালি মুসলমানের কৌমজীবনের এইরকম আরও অনেক আলেখ্য একরামের কাছে দাবি করছি।

+ + +

শান্তিনিকেতনে তেইশে মার্চ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যু বাঙলা কবিতার সংসারে আরেকবার অন্ধকার ঘনিয়ে তুলল।

বাঙলা কবিতায় তিনি যোগ করেন এক ব্যক্তিগত স্বর, যা 'সংঘে এবং সমষ্টিতে একলা, একা।' তাঁর স্বরক্ষেপের প্রত্যেক মুহূর্তে যে-ব্যক্তিস্বরূপের মুখ জেগে ওঠে, তা খোলা বাজারের আরাধ্য সেই 'ব্যক্তি' নয়, যার মুখ নেই, আত্মপরিচয় নেই, আত্মতা নেই ; যে রোবটের মতন নিয়ন্ত্রণসাধ্য এবং নিয়ন্ত্রিত। কবির এই ব্যক্তিগত মুখ ওই রোবট-ব্যক্তির প্রতিবাদ।

গত সংখ্যায় আলেক্স আরন্‌সন-এর 'পুরোনো দিনের স্মৃতি' নামে মুদ্রিত রচনাটি বাঙলায় অনুবাদ করেন শঙ্খ ঘোষ। কলাভবনের অধ্যাপক রামন শিব কুমার এই সংখ্যায় মুদ্রিত সুব্রহ্মণ্যন্‌-এর ম্যুরালের ফোটো তুলে দিয়েছেন। তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বিশ্বভারতী পত্রিকা

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১. প্রকাশ স্থান : ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭

২. প্রকাশের সময়-ব্যবধান : ত্রৈমাসিক

৩. মুদ্রক : শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায় (ভারতীয়)। ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭

৪. প্রকাশক : শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায় (ভারতীয়)। ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭

৫. সম্পাদক : শ্রীপ্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য (ভারতীয়)। ২এফ হাজরাবাগান লেন। কলিকাতা ১৫

৬. স্বত্বাধিকারী :

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
পোঃ শান্তিনিকেতন বীরভূম
পশ্চিমবঙ্গ

আমি শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায় এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উল্লিখিত তথ্য আমার বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য।

১৫ চৈত্র ১৪০১ স্বাক্ষর : শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায়